তত্ত্বালোক

প্রথম খণ্ড

স্বসংবেদ্য স্বানুভবদেব

শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর

সংগ্রহণ ও পরিবেষণ

মতী বাণী চক্রবর্তী

সচ্চিদানন্দ সোসাইটি, কলিকাতা

প্রকাশনা
সচ্চিদানন্দ সোসাইটি

প্রথম সংস্করণ
রাসপূর্ণিমা · ১৪০৬

প্রচ্ছদ
শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র ঘোষ

প্রাপ্তিস্থান
সচ্চিদানন্দ সোসাইটি
এ-১৯০ মেট্রোপলিটন সমবায় আবাসন
কলিকাতা ৭০০ ০৩৯

কম্পিউটার কম্পোজিং
মেঘনা কম্পিউটার সার্ভিস্
৩৮বি মসজিদবাড়ি স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০ ০০৬

মুদ্রক
শ্রীজয়ন্ত বাকচি
পি. এম. বাক্‌চি অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা ৭০০ ০০৬

উৎসর্গ

ওঁ স্বসংবেদ্য স্বানুভবদেবায় নমঃ

বিশ্বাত্মা বিশ্বপ্রাণ বিশ্বদেবের অমৃতবাণী
তাঁরই উদ্দেশে তাঁরই নির্দেশে নিবেদিত হল।

সূচীপত্র

প্রকাশকের নিবেদন পঁয়ত্রিশ
ভূমিকা সাঁইত্রিশ
মুখবন্ধ সাতষট্টি

প্রথম অধ্যায় : মে ১৯৬৮

অমৃতময়ী মায়ের পরিচয়েই সন্তানের পরিচয় ১
মায়ের ঐশ্বর্য মাধুর্য ব্যবহারে সন্তানদের মধ্যে ভেদ দৃষ্ট হয় না ১
যথার্থ মাতৃবোধে প্রতিষ্ঠাই হল সাধুর লক্ষণ ১
মা-ই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই মা ২
মহাপ্রাণরূপী মায়ের অভিনবত্ব ২
সত্যের মহিমা ৩
শ্রবণ ও বিচারের গুরুত্ব ৩
সত্যানুসন্ধানের তাৎপর্য ৩
সত্যের বিজ্ঞান ৩
মায়ের লীলামাধুর্যের বিজ্ঞান ৪
মৃত্যু কী? ৪
জীববেশে মা-ই স্বয়ং ৪
দেহাদি রূপ ও ক্রিয়া প্রাণচৈতন্যেরই বিকার ৪
শোনা ও মানার তাৎপর্য ৫
অভিন্নতার উপমা ৫
প্রকাশক ও প্রকাশ অভিন্ন ৫
সকাম ও নিষ্কামের তাৎপর্য ৫
ত্যাগ হতেই হয় সেবা ৫
সৎ-এর মহিমা ৬
ঈশ্বর আত্মবাচক ওম্-এর তাৎপর্য ৬
অহংকার ও ত্বংকারের তাৎপর্য ৬
দৃক্ ও দৃশ্য—পরস্পরের মধ্যে পরিপূরক ও সম্পূরক সম্বন্ধ ৬
ইন্দ্রিয়দৃষ্টি হতে আত্মদৃষ্টি পর্যন্ত সবই মাতৃদর্শন ৭
মানার তাৎপর্য ৭
অন্তরবোধের গভীরেই আত্মবোধ ৭
সমবোধে থাকার উপায় ৮
নমস্কারের তাৎপর্য ৮
ঈশ্বরের মহিমা ৮
বিজ্ঞানাত্মার পরিচয় ৮
লীলাময় পুরুষের পরিচয় ৮
সগুণ ও নির্গুণের পরিচয় ৯
তাঁর প্রকাশবিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য ৯
শ্রবণের মাধ্যমে অন্তরবোধের বিকাশ হয় ১০
কৃতজ্ঞতাবোধের অন্যতম মাধ্যম পূজা ১০
প্রাণ দিয়েই হয় প্রাণের পূজা ১০
সগুণ ও নির্গুণের লক্ষণ ১০
মানবাত্মার পূর্ণতার লক্ষণ ১১
প্রাণের বিচিত্র লীলাবিলাস ১১
ত্রিবিধ আকাশের পরিচয় ১২
সত্যাভ্যাসের দ্বারাই সত্য লাভ হয় ১২
নিজ প্রাণবোধের মাধ্যমেই মা ও আত্মবোধের দর্শন হয় ১২
বোধময়ী মায়ের দর্শন বিজ্ঞান ১২
সত্যবোধেই সৎসঙ্গ সাধিত হয় ১২
ব্রাহ্মণের পরিচয় ১৩
হৃদয়ের তাৎপর্য ১৩
অ-মনের তাৎপর্য ১৩
প্রেমস্বরূপের তাৎপর্য ১৩
ঈশ্বরের দিব্য মহিমা ১৪
অন্তর পূজার তাৎপর্য ১৪
সর্বেন্দ্রিয় যোগে হয় অভেদ মিলন ১৪
মাতৃযোগে-হয় মাতৃবোধের স্থিতি ১৪
সচ্চিদানন্দময়ী মায়ের পূর্ণ পরিচয় ১৪
অদ্বৈতের দ্বৈত ব্যবহার ১৫
নাদব্রহ্মের নিগূঢ় রহস্য ১৫
ভাববোধের ব্যবহারিক লক্ষণ ১৫
অনুভূতির পরিণাম ১৫
স্রষ্টা ও সৃষ্টির অনুভূতি পরস্পর সাপেক্ষ ১৬
শ্রদ্ধার তাৎপর্য ১৬

চিন্ময়ী মায়ের লীলাবিলাসের মান	১৬	ভিন্ন ভিন্ন শব্দের তাৎপর্য	৩৯
দেহ ও দেহী সম্বন্ধ ভ্রান্তিমূলক	১৬	ত্যাগ ও ভোগের বৈশিষ্ট্য	৩৯
নিত্য পূর্ণ আত্মার মহিমা	১৭	ধর্ম প্রসঙ্গে নানা মুনির নানা মত	৪০
তত্ত্ব শব্দের নিগূঢ়ার্থ বা তাৎপর্য	১৭	স্বভাবাত্মার বৈশিষ্ট্য	৪০
তত্ত্বের আভ্যন্তরীণ বিজ্ঞানের তাৎপর্য	১৭	সত্যের ত্রিবিধ রূপ	৪০
ব্যঞ্জনবর্ণের প্রসঙ্গ	২০	প্রাণ ও তার অধিষ্ঠান বোধের ক্রম	৪১
স্বরবর্ণ সমষ্টির তত্ত্ব	২০	সন্ন্যাসের বৈশিষ্ট্য	৪২
ব্যঞ্জনবর্ণসমূহের তত্ত্ব (অনুস্বর যুক্ত প্রতিটি ব্যঞ্জনবর্ণই এক একটি বীজ ও মন্ত্র)	২২	আত্মানুভূতির বিজ্ঞান	৪৩
		বোধের সমতা বা পূর্ণতাই হল আত্মার স্বরূপ	৪৩
মন্ত্রের রহস্য	২৫	গুরুবোধের চতুর্বিধ স্তর	৪৩
মন্ত্রশক্তি	২৬	ভাবচতুষ্টয় হল বোধস্বরূপের প্রকাশ মাধ্যম	৪৪
গুরুই মন্ত্রসিদ্ধির সহায়ক	২৬	ইষ্টতাদাত্ম্যের বিজ্ঞান	৪৪
তপস্যার তাৎপর্য	২৬	শিক্ষাগুরুর ত্রিবিধ ক্রম	৪৪
নিত্য অদ্বৈতের বক্ষে চিতিমাতার দ্বৈতবিলাসের ক্রম	২৭	তত্ত্বের পরিচয়	৪৫
মাতৃ অঙ্গে বর্ণের বিন্যাস ও বিলাস	২৯	মাতৃগুরুর মাহাত্ম্য	৪৫
জগতের অর্থ	৩০	চতুর্বিধ গুরুর কার্যক্রম	৪৫
হৃদয়ের অর্থ	৩০	পরমাত্মারূপী মাতৃগুরুর ক্রিয়াবৈশিষ্ট্য	৪৫
সত্যের অর্থ	৩০	বেদনার ক্রমবিকাশ বা পরিণাম হল বেদ	৪৬
মূল বীজ পাঁচটি	৩০	প্রথম গুরুমূর্তির কর্মপদ্ধতি	৪৬
ব্যবহারদোষের কারণ	৩১	দ্বিতীয় গুরুমূর্তির কর্মপদ্ধতি	৪৭
পূজার তাৎপর্য	৩২	তৃতীয় গুরুমূর্তির কর্মপদ্ধতি	৪৭
পুষ্টি, তুষ্টি ও মুক্তির তাৎপর্য	৩২	বেদনার তাৎপর্য	৪৭
গুরুর কাজ	৩৩	তমাদি তিন গুণের পরিণামে জীবনের ত্রিবিধ অধ্যায়	৪৭
অহংকার ও ত্বংকারের বৈশিষ্ট্য	৩৩	অন্তরে বেদের পূর্ণ অভিব্যক্তি হলেই আত্মজ্ঞান লাভ হয়	৪৮
পঞ্চপ্রাণের তাৎপর্য	৩৩		
শরণাগতির বিজ্ঞান	৩৪	গুরুর মহিমা	৪৮
পরমাত্মলীলার বিজ্ঞান	৩৪	চতুর্বিধ গুরুমূর্তির মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ	৪৮
কর্মের দ্বিবিধ বিজ্ঞান	৩৪	সমবোধের বিজ্ঞানের তাৎপর্য	৪৮
আনন্দের মাহাত্ম্য	৩৪	নাড়ির প্রসঙ্গ	৪৮
গুরুর মহিমা	৩৫	অভী মন্ত্রের তাৎপর্য	৪৯
শ্রবণের ফলশ্রুতি	৩৬	মনের মাহাত্ম্য	৪৯
চণ্ডী স্তবের তাৎপর্য	৩৬	স্বভাবলীলার তাৎপর্য	৪৯
ধর্মের বহুমুখিতা	৩৭	নির্গুণ ও সগুণস্বরূপের পরিচয়	৪৯
মানবের মর্মার্থ	৩৭	ভগবৎ অনুভূতির বৈশিষ্ট্য	৫০
হৃদয় কেন্দ্রের বিশেষত্ব	৩৭	অবতারের বৈশিষ্ট্য	৫০
কর্মের বিশেষত্ব	৩৮	ভগবৎস্বরূপের চতুর্বিধ পরিচয়	৫০
মাতৃমহিমা	৩৮	বিসর্গের তাৎপর্য	৫০
ঋষির তাৎপর্য	৩৯	লীলাময় পুরুষের মহিমা	৫১

ব্যষ্টি ও সমষ্টির দেহের সম্বন্ধ ৫১
আহার প্রসঙ্গ ৫১
পঞ্চভূতের পরস্পরের বৈশিষ্ট্য ৫১
সত্যাদি ত্রিবিধ প্রতিষ্ঠা হল প্রাণপূজার ফলশ্রুতি ৫২
অগ্নিরূপী তৃতীয় গুরুমূর্তির মাহাত্ম্য ৫২
সত্তাভেদে প্রাণের ভিন্ন ভিন্ন পরিচয় ৫৪
তন্ত্রের তাৎপর্য ৫৪
পরমাত্মদেবতা চতুর্বিধ গুরুমূর্তির মাধ্যমে লীলায়িত হন ৫৪
ঈশ্বরদর্শনের সহজ সাধন ৫৪
অজ্ঞান ও জ্ঞানের পার্থক্য ৫৫
ভেদ ব্যবহারের কারণ ৫৫
সাত্ত্বিকাদি ত্রিবিধ জ্ঞানের লক্ষণ ৫৬
পরমানন্দই হল ঈশ্বরানুভূতি ৫৬
প্রাণচৈতন্যের অভিনব লীলা ৫৬
প্রকাশ ভেদে অজ্ঞান জ্ঞানাদির পরিচয় ৫৬
স্ববোধের তাৎপর্য ৫৬
দুঃখকষ্টের মূল কারণ ৫৭
ত্রিবিধ প্রকৃতির পরিচয় ৫৭
অন্তরের দ্বিবিধ ধর্ম ৫৭
ভেদের মূলে অভেদই নিত্যসত্য ৫৭
ঈশ্বরের স্বভাবমহিমা ৫৭
ঈশ্বরের ধর্ম ৫৮
ঈশ্বরদর্শন ও অনুভূতির বিজ্ঞান ৫৮
নিত্যসত্য অখণ্ড ও পূর্ণ ৫৮
অমৃত-আত্মার স্বরূপমহিমা ৫৮
প্রাণের অহংকার প্রাণের বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে ৫৯
দিব্য ও আসুরিক ব্যবহারের পার্থক্য ৫৯
জ্ঞানপথের বৈশিষ্ট্য ৫৯
ধর্মতত্ত্বের রহস্য ৫৯
ঈশ্বরবাদী ও ব্রহ্মবাদীদের অনুভূতির বৈশিষ্ট্য ৬০
পরদোষ দর্শনই হল আত্মবোধের অন্তরায় ৬০
শক্তিমান জ্ঞানী ও প্রেমিক ভক্তের বিশেষ লক্ষণ ৬০
'আমি'-র সত্য পরিচয় ৬১
শক্তির ভিন্ন ভিন্ন রূপের পরিচয় ৬১
প্রকাশাদির পূর্বাপর সম্বন্ধের বৈশিষ্ট্য ৬১
সত্যানুশীলনের তাৎপর্য ৬২
সচ্চিদানন্দময়ী মায়ের সম্যক্ পরিচয় ৬২
সদ্‌গুরুর স্বরূপ ও তার সঙ্গে তাদাত্ম্য লাভের বিজ্ঞান ৬২
কারণ ও কার্য সম্বন্ধ ধরে গুরুতত্ত্বের বিজ্ঞান ৬৩
সর্ব আমির মধ্যে মায়ের আমির পরিচয় ৬৪
জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে 'অভেদাভেদ' সম্বন্ধ ৬৪
ভোগের তাৎপর্য ৬৫
অন্তর নিবেদনের তাৎপর্য ৬৫
বোধের দৃষ্টিতে মানার তাৎপর্য ৬৫
দৈব ও পুরুষকাররূপে চিন্ময়ী মা-ই স্বয়ং প্রকৃতির মাহাত্ম্য ৬৬
মালার তাৎপর্য ৬৬
প্রজ্ঞান ও বিজ্ঞানের অভেদ সম্বন্ধ ৬৭
ব্যক্ত ও অব্যক্ত অভিন্ন তত্ত্ব ৬৭
অহংকার ও ত্বংকারের বৈশিষ্ট্য ৬৭
বর্তমানে বৈদিক অনুষ্ঠানে তন্ত্রের প্রাধান্য বেশি ৬৮
চৈতন্যসত্তার চতুর্বিধ অভিব্যক্তি ৬৮
সর্ববিধ সাধনা ও ভজনার মূলে এক পরমতত্ত্বই নিহিত ৬৯
নানা মতপথের রহস্য ৬৯
অবতারের রহস্য ৬৯
মনুষ্য জন্মের বৈশিষ্ট্য ৬৯
মুক্তপুরুষের বৈশিষ্ট্য ৬৯
ব্যক্তির মধ্যেই ঈশ্বরের অভিব্যক্তির তাৎপর্য ৭০
চৈতন্যের বৈশিষ্ট্য ৭০
জীবনের আদি-মধ্য-অন্তে চৈতন্যের ব্যবহার ৭০
তথ্য ও তত্ত্বের তাৎপর্য ৭০
কালত্রয়ের মধ্যে বর্তমানের ভূমিকা ৭১
জীবাত্মা তত্ত্বত ব্রহ্ম ৭২
ব্যক্ত ও অব্যক্তের মহিমা ৭২
কেন্দ্রাদি সত্তা ভেদে শক্তিবিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য ৭২
বিশ্বরূপে গুরুর মহিমা ৭২
শ্রদ্ধার তাৎপর্য ৭২
বিশ্বাসের গুরুত্ব ৭৩
ক্ষাত্রাদি ধর্মের বৈশিষ্ট্য ৭৩
জীবনাদর্শ ও ধর্মের লক্ষ্য ৭৩
বিধি ও নিষেধের তাৎপর্য ৭৪
বিশ্বাস ও মানার গুরুত্ব ৭৪
অদ্বয়তত্ত্বের স্বরূপ লক্ষণ ৭৪
হিন্দুধর্মের তাৎপর্য ৭৬
চতুর্বিধ গুরুমূর্তি ৭৭

স্তরভেদে গুরুর লক্ষণ ও তার কাজের বৈশিষ্ট্য ৭৭
তত্ত্বের বিজ্ঞানে চতুর্বিধ গুরুর পরিচয় ৭৭
গুণের মাধ্যম, শক্তির লীলা ৭৭
সচ্চিদানন্দস্বরূপে শক্তির লীলায়িত বিজ্ঞান ৭৯
দিব্যমানব অবতারের পরিচয় ৮০
অদ্বয় ব্রহ্মশক্তির অভিব্যক্তির ক্রমের মান ও পরিচয় ৮০
উপবীত বা ন'গুণের তাৎপর্য ৮০
বর্ণাশ্রম তত্ত্বের পরিচয় ৮০
শৈশবাদির মত বোধের চতুর্বিধ অবস্থা ৮১
গুণ ও অবস্থা যোগে ব্রহ্ম-আত্মবোধের বৈশিষ্ট্য ৮২

দ্বিতীয় অধ্যায় : জুন ১৯৬৮

বোধময় সত্তার বিবিধ পরিচয় ৮৪
অণুর মাহাত্ম্য ৮৪
নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্মের পরিচয় ৮৭
মা ও গুরুর গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য ৮৮
সমর্পণের তাৎপর্য ৮৯
সৃষ্টিবিজ্ঞানের অনুলোম ও বিলোম গতি ৮৯
নমস্কারের তাৎপর্য ৮৯
মাতৃতত্ত্বের গুরুত্ব ও তাৎপর্য ৮৯
আপনবোধের বৈশিষ্ট্য ৯০
সপ্তভূমির তাৎপর্য ৯০
আত্মতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্বের মধ্যে ভেদাভেদ ৯১
আত্মবিস্মৃতির কারণ ৯২
মাতৃরূপের প্রকারভেদ ৯২
শ্রবণের মাহাত্ম্য ৯২
শান্তি ও সুখ নিরপেক্ষ আত্মধর্ম ৯২
একাত্ম দৃষ্টিতে বহুরূপী মায়ের পরিচয় ৯২
অহংদেব আত্মারহ পরিচয় ৯২
'আমি'-র আমি পরিচয় ৯৩
সত্য মায়ের সত্য পরিচয় ৯৩
যজ্ঞের তাৎপর্য ৯৩
শ্রদ্ধার তাৎপর্য ৯৪
ঋষি শব্দের গূঢ়ার্থ ৯৪
শ্রবণ-মননাদির মর্মার্থ ৯৪
ঋষিদৃষ্টিতে বিচারের তাৎপর্য ৯৪
লীলাময়ী মায়ের নৃত্যের ছন্দই হল কর্ম ৯৪
প্রাণের বক্ষে প্রাণের অভিনব লীলামাধুর্য ৯৫
আত্মসমর্পণের বৈশিষ্ট্য ৯৫
ভক্তিলাভের সহজ উপায় ৯৫
'মেনে মানিয়ে চলা'-র তাৎপর্য ৯৫
সাধনা শব্দের তাৎপর্য ৯৫
বিশ্বমাতার কোলই হল তাঁর সন্তানদের নিরাপদ আশ্রয় ৯৬
ব্যবহার শব্দের তাৎপর্য ৯৬
ভিন্ন ভিন্ন সাধনার তাৎপর্য ৯৬
গুরুর সাধনাই সর্ব সাধনার সার ৯৬
গুরুতত্ত্ব ও গুরুকৃপার মাহাত্ম্য ৯৭
সমর্পণের বিজ্ঞান, ত্যাগ-বৈরাগ্য ও ভক্তির যুগপৎ বিজ্ঞান ৯৭
ঈক্ষণের তাৎপর্য ৯৭
মাতৃভক্তই অদ্বয় আত্মজ্ঞানের অধিকারী ৯৯
সকাম কর্মের অবগুণ (দোষত্রুটি) ৯৯
'হংসঃ' মন্ত্রের তাৎপর্য ৯৯
আত্মজ্ঞানের সর্বোত্তম বিজ্ঞান ৯৯
ত্যাগের তাৎপর্য ৯৯
মাধুর্য শব্দের তাৎপর্য ১০০
ভিন্ন ভিন্ন সাধনার লক্ষ্য এক ১০০
ব্রহ্মোপলব্ধির ক্রম (সোপান) ১০০
যুগপুরুষের মাধ্যমেই যুগোপযোগী সমাধান মেলে ১০০
জ্ঞানবাদ ও ভক্তিবাদ সাধনার বৈশিষ্ট্য ১০১
বর্তমানের ব্যবহারের গুরুত্ব ১০১
'মানব' শব্দের নিগূঢ় তাৎপর্য ১০১
বর্তমান যুগের সাধনা কী? ১০১
আনন্দব্রহ্মের মহিমা ১০১
সত্যযুগ প্রকাশের বৈশিষ্ট্য ১০২
নির্গুণ ও সগুণের তাৎপর্য ১০২
অদ্বয়তত্ত্বের লীলাবিলাস ১০৩
প্রকাশবিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য ১০৪
সমবোধই পূর্ণ আমির স্বরূপ ১০৪
নিত্যলীলায় মায়ের আমির তাৎপর্যপূর্ণ পরিচয় ১০৪
প্রাণের নাম অঙ্গিরস ১০৫
মাতৃমহিমার নাই তুলনা ১০৫
আত্মবোধ (জ্ঞান) ও আত্মজ্ঞানীর স্বরূপ ১০৬
শ্রেষ্ঠত্ব লাভের রহস্য ১০৬
প্রকাশের বিজ্ঞান ১০৬
অখণ্ড সত্যের ব্যবহার বিজ্ঞান ১০৭

প্রাণরূপী মায়ের লীলারহস্য ১০৭
শিব ও শক্তির তাৎপর্য ১০৭
মায়ের আনন্দলীলার তাৎপর্য ১০৮
পূর্ণপ্রেমের বৈশিষ্ট্য ও মহিমা ১০৮
ভূমা আমির পরিচয় ১০৯
বিশ্বাসের তত্ত্ব ১০৯
অস্তিত্বের তত্ত্ব ১০৯
মায়ের অভিনব পরিচয় ১১০
আপনবোধের স্বরূপ ও তাৎপর্য ১১১
সত্য এবং মিথ্যার স্বরূপ ও তাৎপর্য ১১১
মানা ও না-মানার লক্ষণ ১১১
প্রকাশক ও প্রকাশের অভেদ সম্বন্ধ ১১২
সত্য ও শ্রদ্ধার অভিন্ন সম্বন্ধ ১১২
প্রজ্ঞানাত্মা ও বিজ্ঞানাত্মার তাৎপর্য ১১২
মাধুর্যের স্বরূপলক্ষণ ১১৩
মাতৃলীলার নিগূঢ় তাৎপর্য ১১৩
একের মধ্যে বহুত্বের তাৎপর্য ১১৪
বহুত্বের মধ্যে একের তাৎপর্য ১১৪
সংসার লীলায় আমির ভূমিকা ১১৪
অখণ্ডের তাৎপর্য ১১৫
নাম ও নামী অভেদ ১১৬
প্রাণচৈতন্য বা বোধসত্তার বৈচিত্র্যময় অভিব্যক্তির সত্য পরিচয় ১১৬
পরমাত্মসত্তার মাধুর্যবিলাস ১১৭
ভিন্ন ভিন্ন গুরুমূর্তির মাধ্যমে অভিন্নভাবে পরমাত্মগুরুর অভিনব লীলা ১১৭
মহাপ্রাণচৈতন্যের অভিনব লীলাচাতুর্য ১১৭
আত্মলীলার তাৎপর্য ১১৭
আত্মলীলায় স্বাত্মমহিমা ১১৮
বৈচিত্র্য সৃষ্টির মধ্যে সত্তার অধিষ্ঠান নিত্যবর্তমান ১১৮
সত্তার বোধে পূর্ণতা ১১৮
সমর্পণের তাৎপর্য ১১৯
ধ্যানসিদ্ধি ও জ্ঞানসিদ্ধির তাৎপর্য ১১৯
ভক্তিসিদ্ধির তাৎপর্য ১১৯
সর্ব অধ্যাত্মসাধনার লক্ষ্য ও পরিণাম এক ১১৯
ঈশ্বরের জীবলীলার তাৎপর্য ১২০
শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের তাৎপর্য ১২০
আমিবোধের ব্যবহারবিজ্ঞান ১২০
চৈতন্যসত্তার চতুর্বিধ গুরুমূর্তির তাৎপর্য ১২০
গুরুর কর্মপদ্ধতি ১২১
গুরুর কৃপাতেই শিষ্য গুরুতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় ১২১
নাদ, নাম ও শব্দের তাৎপর্য ১২১
শুদ্ধচিত্তই শ্রীনামের লীলাভূমি ১২২
অনুভূতির বিজ্ঞান ১২২
নিত্য অদ্বয় বোধস্বরূপ ব্রহ্ম আত্মাই সত্য— বৈচিত্র্যই হল অজ্ঞান মায়া ভ্রান্তি ও মিথ্যা ১২৩
জ্ঞানীর দৃষ্টিতে জগৎ স্বপ্নবৎ মিথ্যা ১২৩
ভক্তের দৃষ্টিতে জগৎ ঈশ্বরের মহিমা ও লীলা ১২৩
ঈশ্বর আত্মা ব্রহ্মের পুর হৃদয়ের তাৎপর্য ১২৪
ভূমি বা মাটির তাৎপর্য ১২৪
তত্ত্ববিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত বিষয়বস্তুসকলের তাৎপর্যপূর্ণ অভিনব সংজ্ঞা ও বিশ্লেষণ ১২৫
ত্রিগুণের বিস্তার এবং কার্যই হল সৃষ্টি স্থিতি সংহার ১২৬
ত্রিগুণা প্রকৃতির অধিষ্ঠানচৈতন্যই হল ঈশ্বর আত্মা ব্রহ্ম ১২৬
অব্যক্ত প্রকৃতির ব্যক্ত অবস্থাই হল কার্য-কারণ ও কারণ-কার্য সম্বন্ধ ১২৬
তপস্যার তাৎপর্য ১২৬
তত্ত্বানুভূতির ভিত্তিতে হিন্দু ও হিন্দুত্বের তাৎপর্য ১২৭
বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্ব ও সমত্বের দর্শনই হল আত্মদর্শন ১২৭
মায়ার লক্ষণ ও কার্য ১২৮
প্রেমের লক্ষণ ১২৮
সত্যবোধের অনুশাসন ১২৮
সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মসত্তা ও সচ্চিদানন্দময়ী মাতার জীবনলীলার নিগূঢ় তাৎপর্য ১২৯
অদ্বৈত দৃষ্টিভঙ্গিতে একের মাঝে একের ব্যবহার ১৩০
স্বভাবের বিস্তারই হল আত্মলীলার রহস্য ১৩০
শিক্ষা ও দীক্ষার নিগূঢ় তাৎপর্য ১৩১
আত্মচৈতন্যের স্বভাবমহিমার তাৎপর্য ১৩১
প্রাণের চাওয়ার পরিণাম ১৩১
পরিণামের তাৎপর্য ১৩২
প্রেমের স্বভাব ১৩২
প্রাণচৈতন্যের দেহরূপ ধারণের তাৎপর্য ১৩২
উপাধিযোগে এবং উপাধি ছাড়া চৈতন্যের কোন বিকার হয় না ১৩২

ভূমা চৈতন্যসাগরে গুণ-উপাধিযোগে হয় জগৎলীলা	১৩৩
চৈতন্যের বহুমুখী লীলায় চৈতন্যের তাৎপর্য	১৩৩
অখণ্ড চৈতন্যস্বরূপের পরিচয়	১৩৩
চৈতন্যের লীলাবৈশিষ্ট্য	১৩৩
চৈতন্যের বিকার হয় ভাব-উপাধিযোগে	১৩৪
চৈতন্যের বক্ষে চৈতন্যের অভাব কখনওই সম্ভব নয়	১৩৪
মৃত্যুর রহস্য	১৩৪
প্রাণরূপী মাতার মাহাত্ম্য	১৩৪
মাতৃস্বরূপের অনুভূতির ক্রম	১৩৫
শ্রীনাম ও মন্ত্রের তাৎপর্য	১৩৫
মাতৃবোধ বা আত্মবোধের মাহাত্ম্য	১৩৫
বোধস্বরূপের বৈশিষ্ট্য	১৩৬
প্রাণচৈতন্যের বিকার বা ভেদ হল আপেক্ষিক	১৩৬
অভেদ প্রাণের অনুভূতির উদয়	১৩৬
কৃতজ্ঞতাবোধে হয় সমবোধের পূজা	১৩৭
প্রাণের ক্রম অভিব্যক্তির পরিচয়	১৩৭
দ্বৈতভাবের মাধ্যমে নিত্যাদ্বৈত নির্গুণ ব্রহ্মের সগুণ ঈশ্বরলীলা	১৩৮
জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে ভেদ হল উপাধিগত, তত্ত্বত নয়	১৩৮
অদ্বৈতে যিনি নির্গুণ, দ্বৈতে তিনি সগুণ	১৩৮
দ্বৈত ও অদ্বৈত এবং বন্ধন ও মুক্তির রহস্য	১৩৯
ত্রিগুণের বৈশিষ্ট্য	১৩৯
আত্মলীলায় আমি-তুমি বোধের গুরুত্ব	১৩৯
সর্বভেদের মূলে অভেদ	১৩৯
শুদ্ধবোধ হল আত্মজ্ঞান এবং অশুদ্ধবোধ হল অনাত্মজ্ঞান	১৪০
ঈশ্বরের দিব্য আবির্ভাবের তাৎপর্য	১৪০
বিশ্বপ্রাণের কাছে সবাই ঋণী	১৪১
ঋণ পরিশোধের সাধনা	১৪১
বস্তুযজ্ঞ নয়, জ্ঞানযজ্ঞই হল আত্মসিদ্ধির বিজ্ঞান	১৪১
অমৃতস্বরূপ আত্মার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মহিমা	১৪১
অমৃতানুভূতির উপায়	১৪২
অমৃতত্বের মাহাত্ম্য	১৪২
উপাধি যোগে বন্ধন, উপাধি নাশে মুক্তি	১৪২
জীব ও ঈশ্বরের ভেদাভেদ স্বীকৃত	১৪২
নিত্যমুক্ত আত্মা সবার	১৪২
মায়ের অনন্ত মহিমার সাক্ষী হল মাতৃসমাধি	১৪২
জীবের উৎপত্তি পুষ্টি তুষ্টি স্থিতি ও পরম গতিই হল মা স্বয়ং	১৪৩
মাতৃলীলার অভিনবত্ব	১৪৩
কালাতীত কালী মা-ই তিনকালের সাক্ষী ও সাক্ষ্য	১৪৩
আত্মলীলা আত্মমহিমারই দ্যোতক	১৪৩
জ্ঞান-অজ্ঞানের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ	১৪৩
আলো ও আঁধারের যুগপৎ লীলা আত্মবক্ষে ছায়াচিত্রসম ভাসে	১৪৪
আত্মছায়াই হল আত্মমায়া	১৪৪
স্বভাবস্বরূপের মাহাত্ম্য	১৪৪
আপনবোধের বৈশিষ্ট্য	১৪৪
বোধাশ্রয়ে আত্মানুশাসনের সম্যক্ বিজ্ঞান	১৪৫
অবতারের তাৎপর্য	১৪৫
পূজা ও উপাসনার মাহাত্ম্য	১৪৬
সম্যক্‌বোধের বৈশিষ্ট্য	১৪৬
বিগ্রহের মাহাত্ম্য	১৪৬
নমস্কারের তাৎপর্য	১৪৬
আত্মমায়ের তাৎপর্য	১৪৬
সত্য ও সত্তাস্বরূপ ঈশ্বরের দর্শন ও প্রত্যক্ষ অনুভূতির উপায়	১৪৭
যথার্থ সাধুর পরিচয়	১৪৭
অজ্ঞানজাত কাম ও আশাই হল জীবনবন্ধন ও দুঃখকষ্টের কারণ	১৪৭
ঈশ্বরানুভূতি হলে সুখ-দুঃখ সমান হয়, অথবা উভয়েরই অবসান হয়	১৪৭
সাধক সাধন সাধ্য ও সিদ্ধি ঈশ্বরের এক অভিনব লীলাচাতুরী	১৪৮
অদ্বৈতই হল নিত্য এবং দ্বৈত হল অনিত্য	১৪৮
আত্মজ্ঞানীই হলেন সাক্ষীপুরুষ	১৪৮
বাহ্য জগৎ মোহ আসক্তি ও ভ্রান্তিমূলক	১৪৮
ত্রিগুণের মোহ আসক্তি ও বন্ধন খন্ডন ও মুক্তির উপায়	১৪৮
আত্মসাধনা ও আত্মশুদ্ধির তাৎপর্য	১৪৯
সত্য বাকের তাৎপর্য	১৪৯
সিদ্ধদের মানের পরিচয়	১৪৯
অ-মন আত্মার পরিচয়	১৫০
সিদ্ধিলাভের ক্রমিক মান	১৫০
যথার্থ সাধুর পরিচয়	১৫১

মাধুর্য ও ঐশ্বর্যের অধিপতি হলেন ঈশ্বর ১৫১
মানা ও জানার বৈশিষ্ট্য ১৫১
দিব্যজীবন লাভের উপায় ১৫২
নিত্যসিদ্ধ শান্তির অনুভূতির কেন্দ্র হৃদয় ১৫২
ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানই হল প্রাকৃত জ্ঞান ১৫৩
চিত্তের মূলে জগৎ ও জগতের মূলে চিত্ত ১৫৩
ত্যাগের বৈশিষ্ট্য ১৫৩
জ্ঞান ও ভক্তির যথার্থ স্বরূপ ১৫৪
মূর্ত ও অমূর্ত এবং ব্যক্ত ও অব্যক্তর তাৎপর্য ১৫৪
মা ও সন্তানের নিত্য অভেদ সম্বন্ধ ১৫৫
সৃষ্টির অণু পরমাণুর মধ্যেও ঈশ্বরীয় শক্তি নিহিত আছে ১৫৫
প্রাণের মাহাত্ম্য ১৫৫
চিতিমাতার সবর্ণী নামের তাৎপর্য ১৫৫
পরম তত্ত্বানুভূতির রহস্য ১৫৬
বিশ্ব সৃষ্টি জগন্মাতার অভিনব লীলা প্রকরণ ১৫৬
এক অধিষ্ঠানচৈতন্যই স্তরভেদে ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত ১৫৬
শান্তি ও বিশ্রামের প্রভেদ ১৫৭
বুদ্ধি ও বোধিস্বরূপ আত্মার মধ্যে পার্থক্য ১৫৭
এক আমির দ্বিবিধ পরিচয় ১৫৭
আত্মার পরিচয় ১৫৮
জ্ঞান ও অজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য ১৫৮
আত্মসিদ্ধি প্রকৃতিবিরুদ্ধ নয় ১৫৮
সকাম ও নিষ্কামের বৈশিষ্ট্য ১৫৯
আত্মসমর্পণের তাৎপর্য ১৫৯
অদ্বয়তত্ত্ব ও সত্তার মহিমা ১৫৯
একতার পরিণাম ১৫৯
ধর্ম ও কর্মের তাৎপর্য ১৬০
সত্যের মহান তাৎপর্য ১৬০
মা-ই মায়ের উপমা স্বয়ং ১৬০
সর্ববোধের আদি মধ্য অন্তে মা-ই স্বয়ং সর্বতত্ত্বের সমাধান ১৬০
ভূমা একের পরিচয় ১৬০
ধ্রুবাস্মৃতিই গতি ও স্থিতির মূলে ১৬০
ধর্মের রহস্য ১৬০
মহাপ্রাণের তাৎপর্য ১৬১
সন্ন্যাসের তাৎপর্য ১৬১
পরমহংসের পারচয় ১৬১
আপনবোধের তাৎপর্য ১৬২
প্রেমস্বরূপের পরিচয় ১৬২
অখণ্ড ভূমাতত্ত্বই হল প্রাচ্যের জীবনাদর্শ ও লক্ষ্য ১৬২
আত্মলীলার মহিমা ১৬৩
ভগবতী মাতার সত্য পরিচয় ১৬৩
জীবনের চরম উদ্দেশ্য ১৬৩
আত্মপ্রেমী মায়ের দিব্য মহিমা ১৬৪
স্বানুভূতির পরিচয় ১৬৪
চতুষ্পদ জ্ঞানে অহংকারের ভূমিকা ১৬৪
অখণ্ডের শরণাগতিই হল অখণ্ডের সাধনা ও সিদ্ধির উপায় ১৬৪
এক কেন্দ্রের মাহাত্ম্য ১৬৫
অধ্যাত্ম সাধনার মূল্য লক্ষ্য কী? ১৬৫
আত্মমায়ের কৃপাশিসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য ১৬৫
ধর্মের তাৎপর্য ১৬৫
প্রাণের ধর্ম ১৬৬
গতিশীল প্রাণই শক্তি ১৬৭
নিত্যযোগের তাৎপর্য ১৬৭
মহাপ্রাণের মধ্যে ছোটবড় ভেদ অবান্তর ১৬৭
মুক্তিলাভের সহজতম উপায় ১৬৭
ভেদের মাঝে অভেদ দর্শন ১৬৮
কারণ হল স্থিতি ও অভেদ, কার্য হল গতি ও ভেদপূর্ণ ১৬৮
আত্মজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য ১৬৮
আত্মদান ও আত্মসমর্পণের তাৎপর্য ১৬৮
অজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য ১৬৮
গুণভেদে কামনার ভেদ ও তার বৈশিষ্ট্য ১৬৯
গুণভেদে অভাবের লক্ষণ ও কার্যভেদ ১৬৯
গুণভেদে চাওয়া-পাওয়ার প্রকারভেদ ১৬৯
ঈশ্বর ও জীবের স্বভাবপ্রকৃতির পার্থক্য ১৬৯
মুক্তির তাৎপর্য ১৬৯
সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম-আত্মা-ঈশ্বরের সত্য পরিচয় ১৭০
অধ্যাত্ম সাধনার লক্ষ্য ও তাৎপর্য ১৭০
ব্রহ্ম-আত্মজ্ঞান লাভের বিজ্ঞান ১৭০
ভক্তের সাধনবিজ্ঞান ১৭০
ত্রিবিধ শক্তির বৈশিষ্ট্য ১৭০
শান্তি ও অমৃতত্ব লাভের উপায় (বিজ্ঞান) ১৭১

নিষ্কাম ও সকাম চিত্তের পার্থক্য ১৭১
নিত্যপুরুষের পরিচয় ১৭১
ত্যাগ, বৈরাগ্যপূর্ণ জ্ঞান ও প্রেমভক্তির গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ১৭১
নিত্যলীলায় এক পরম তত্ত্বেরই পরিচয় ১৭১
ভক্তি ও ভক্তের বৈশিষ্ট্য ১৭২
জ্ঞানী ও ভক্তের অনুভূতি পরিণামে অভিন্ন ১৭২
লীলা অবতারের বৈশিষ্ট্য ১৭২
লীলাবাদের বৈশিষ্ট্য ১৭২
মাতৃলীলার তাৎপর্য ১৭২
ব্যষ্টি ও সমষ্টির মধ্যে ভেদাভেদ সম্বন্ধ ১৭৩
আত্মসমর্পণের ফলশ্রুতিই হল আত্মজ্ঞান ১৭৩
অজ্ঞানযোগে আত্মার দেহবন্ধন ১৭৩
জ্ঞানযোগে আত্মা বন্ধনমুক্ত হয় ১৭৩
প্রকৃতির পরিচয় ১৭৪
আত্মার মাহাত্ম্য ১৭৪
ভক্তের অনুভূতির তাৎপর্য ১৭৪
মায়ের নিত্যলীলার নিত্যসাক্ষী হওয়াই হল সর্বোত্তম যোগীর লক্ষণ ১৭৪
মাতৃসত্তায় মা-ই সর্বেসর্বা ১৭৪
মাতৃ ইচ্ছার অনন্ত মহিমা ১৭৪
অজ্ঞান হতে প্রজ্ঞান পর্যন্ত সর্বস্তরে মা-ই স্বয়ং কারণ-কার্য ও কার্য-কারণরূপে বিদ্যমান ১৭৫
নমঃ শব্দের তাৎপর্য ১৭৫
সচ্চিদানন্দের ব্যবহার সচ্চিদানন্দ ভাববোধেই সিদ্ধ হয় ১৭৫
কাঁচা আমি ও পাকা আমির অভেদ সম্বন্ধ ১৭৫
আত্মদানেই হয় পূর্ণ দীক্ষা ও পূর্ণ আত্মজ্ঞান ১৭৫
নিত্যাদ্বৈতের তাৎপর্য ১৭৬
নিজবোধের ব্যবহারিক ক্রম ১৭৬
ধনী ও দরিদ্রের দৃষ্টিশুদ্ধি ১৭৬
অখণ্ড স্মৃতি ও খণ্ড স্মৃতির বৈশিষ্ট্য ১৭৬
জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে ভেদ হল দ্বৈতমূলক ১৭৬
ঈশ্বরের জীবলীলা হল তাঁর আনন্দবিলাস ১৭৭
মানবদেহের মাধ্যমে ঈশ্বরের অভিব্যক্তির অভিনব বিজ্ঞান ১৭৭
সর্বানুভূতির মূলে চিতিমাতাই স্বয়ং ১৭৮
সদ্‌গুরুর কাজের বৈশিষ্ট্য ১৭৮
ত্যাগের নিগূঢ় রহস্য ১৭৯
গুণভেদে সত্যের প্রকাশক্রম ১৭৯
আমিষ ও নিরামিষের নিগূঢ়ার্থ ১৭৯
নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্মের সাধনার তাৎপর্য ১৭৯
জীবনলীলায় প্রাণচৈতন্যের ভিন্ন ভিন্ন সাধনার বৈশিষ্ট্য ১৮০
সত্যের বক্ষে সত্যের মহিমা ১৮০
পূজা কেন জীবের স্বভাবধর্ম? ১৮০
তত্ত্বজ্ঞের লক্ষণ ১৮১
জীবনের সর্বোত্তম আশ্চর্য কী এবং তার পরিচয় ১৮১
সংস্কারের গুরুত্ব ১৮২
ব্রহ্মতত্ত্বের দ্বিবিধ মহিমা ১৮২
ভাবের মাধ্যমেই আত্মার সঙ্গে সম্বন্ধ ১৮২
ঐশ্বর্য ও মাধুর্য সাধনার লক্ষ্য ভিন্ন ১৮২
প্রেমের সাধনার তাৎপর্য ১৮৩
দৈবী ও আসুরিক ভাবের পার্থক্য ১৮৩
জীবনের ধর্ম ও কর্ম প্রবৃত্তির কারণ ১৮৩
বস্তু ও প্রকৃতির মধ্যে পার্থক্য ১৮৩
ঈশ্বরীয় শক্তির স্তরবিভাগ ১৮৩
ত্রিগুণের পরস্পর বৈশিষ্ট্য ১৮৪
তিন গুণের তিন শক্তির তাৎপর্য ১৮৪
শরৎকালের তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ১৮৪
অদ্বৈতবাদীর সিদ্ধান্ত ১৮৪
দ্বৈতবাদীর (লীলাবাদীর) সিদ্ধান্ত ১৮৪
ভক্ত ও জ্ঞানীর সাধন ভিন্ন কিন্তু লক্ষ্য এক ১৮৫
ঐশ্বর্য ও মাধুর্য ভাবের সাধনার মধ্যে পার্থক্য ১৮৫
সাধ ও সাধ্যের রহস্য ১৮৫
সমর্পণ একাধিক ভাবে হতে পারে ১৮৫
বিশ্বাস ও বোধ তত্ত্বত অভিন্ন ১৮৫
শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের সত্য পরিচয় ১৮৬
গুণভেদে শ্রদ্ধা-ভক্তি-বিশ্বাস ত্রিবিধ ১৮৬
গুণ-উপাধিযোগে চৈতন্যের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার পরিচয় ১৮৬
তপস্যার দ্বিবিধ বিজ্ঞান ১৮৭
জীবের সম্যক্ পরিচয় ১৮৭
অভিন্ন সত্তা ও শক্তির পরিচয় ১৮৭
জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ১৮৭
জীব ও আত্মার পরিচয় ১৮৮
কেন্দ্রসত্তার তাৎপর্য ১৮৮
এক ও বহুত্বের সত্য সম্বন্ধ ১৮৮

জীবের শিবত্ব লাভের উপায় ১৮৮
এক আমিরই তিন অবস্থা ১৮৯
ভাগ্য ও নিয়তির পরিচয় ১৮৯
কেন্দ্রের আমিকে গুরুবোধে ব্যবহারের ফলশ্রুতি ১৮৯
কামনার যোগে ও বিয়োগে জীবের বন্ধন ও মুক্তি ১৮৯
পঞ্চবিধ সিদ্ধির পরিচয় ১৯০
চিত্তশুদ্ধির অভিনব বিজ্ঞান ১৯০
সগুণ ও নির্গুণ তত্ত্বের পরিচয় ১৯০
পূজাতত্ত্বের নিগূঢ় তাৎপর্য ১৯০
মূর্চ্ছা, নিদ্রা ও মৃত্যুর পার্থক্য ১৯০
শৈশবাদি অবস্থা ও নানাবিধ পরিণামের সাক্ষী নিত্যমুক্ত আত্মা ১৯১
ত্রিকালের মধ্যে বর্তমানই হল মুখ্য ও তাৎপর্যপূর্ণ ১৯১
ত্বংকারবোধে ঈশ্বরের হাতের যন্ত্র হওয়ার তাৎপর্য ১৯২
অভিমান অহংকার ঈশ্বরলাভের অন্তরায় ১৯২
অভিমানশূন্য হলেই ঈশ্বরলাভ হয় ১৯২
ভ্রান্তিরূপে মায়ের মহিমা ১৯২
ভুল বা ভ্রান্তির পরিচয় ১৯২
কামনার মাধ্যমে জীব ও ঈশ্বরের লীলা সাধিত হয় ১৯২
সৃষ্টিকার্য কালাধীন ১৯৩
কর্মের প্রয়োজনীয়তা ১৯৩
কর্মী ও জ্ঞানীর মধ্যে পার্থক্য ১৯৩
ভক্তের মুক্তি সহজলভ্য ১৯৪
চিত্তশুদ্ধি সংসারে থেকেই সম্ভব ১৯৪
ঈশ্বরীয় কর্মের তাৎপর্য ১৯৪
কাম্য কর্মই হল অহংকারের কর্ম ১৯৪
কর্মতত্ত্বের উদ্দেশ্য ১৯৪
দিব্যকর্মের বৈশিষ্ট্য ১৯৪
কর্মবন্ধন মুক্ত হওয়ার উপায় ১৯৪
কর্মবন্ধনের কারণ ১৯৫
আত্মসমর্পণের বিজ্ঞান ১৯৫
ক্ষমা ও ত্যাগের বৈশিষ্ট্য ১৯৫
জ্ঞানী ও ভক্তের সাধনাদর্শ পৃথক ১৯৫
জন্ম ও জীবনের উদ্দেশ্য ব্যক্তিগত নয়, পরমার্থসিদ্ধির ১৯৬
ঈশ্বরের সেবা ও ধর্ম পালনের বিজ্ঞান ১৯৬
সাধনমাত্রই প্রস্তুতি ১৯৬
প্রকৃতির ঋণ শোধ না-করে জীবন্মুক্তি হয় না ১৯৬
যথার্থ ব্যবহার ১৯৭
সত্যধর্মের বিজ্ঞান ১৯৭
ব্রহ্মানুভূতির দ্বিবিধ ক্রম ১৯৭
অখন্ডানুভূতির সাধনা ও সিদ্ধি ১৯৭
আত্মা ও দেহের ধর্ম পৃথক ১৯৮
বন্ধন ও মুক্তির লক্ষণ ১৯৮
অখণ্ড পূর্ণের কোন বিকল্প নেই ১৯৮
আনন্দই হল সৎচিৎ-এর পূর্ণ লক্ষণ ১৯৯
শ্রদ্ধা, ভক্তি, বিশ্বাসের সম্যক্ রূপ ১৯৯
সেবাবোধের তাৎপর্য ১৯৯
বর্ণাশ্রমের তাৎপর্য ১৯৯
ধর্ম ও অধর্মের লক্ষণ ২০০
জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে উভয় ভাবেই অপরাধ হতে পারে ২০০
সদাশ্রয়ে এবং সৎ-এর সাহায্যে জীবনের সামগ্রিক শোধন ও পরিণাম সাধিত হয় ২০০
জীবনে শিক্ষা ও সাধনার রহস্য ২০০
ধর্ম ও কর্মের ভিত্তিই অনুভূতি ২০০
সনাতন ধর্মের তাৎপর্য ও মাহাত্ম্য ২০০
মানবতার নিগূঢ় তত্ত্ব ২০১
আত্মসাধনার লক্ষ্য ২০১
বুদ্ধিযোগে জীবের জীবত্ব আর বুদ্ধিশুদ্ধিতে শিবত্ব ২০১
সাধনার পরিণামের ক্রম ২০১
চৈতন্যের ভিন্ন ভিন্ন অভিব্যক্তির বৈশিষ্ট্য ২০১
দ্বৈতবাদী ও অদ্বৈতবাদীর সিদ্ধান্ত ২০১
ঈশ্বরের কৃপালাভ ও সর্বসমাধানের উপায় ২০১
স্বভাব ও স্ববোধের উৎকর্ষের ফলশ্রুতি ২০২
মৌলিক সত্যের মৌলিকতা ২০২
স্বভাবের পরিণামই স্ববোধ ২০২
স্রষ্টা ও সৃষ্টি অভিন্ন ২০২
নিষ্কাম কর্মের বৈশিষ্ট্য ২০২
বন্ধন ও মুক্তির কারণ ২০২
দ্বৈত ও অদ্বৈতের বৈশিষ্ট্য ২০৩
মনুষ্য জন্মের সার্থকতা একাত্মবোধে ২০৩
ঈশ্বরের মহিমা জীবজগৎ ২০৩
বস্তুবাদ ঈশ্বরবাদের অন্তরায় ২০৩
অসংযত অবিবেকী চিত্তের পরিণাম ২০৩
অখণ্ড সত্যই হল অধ্যাত্ম সভ্যতার ভিত্তি ২০৩
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য ২০৪

ভারত শব্দের নিগূঢ়ার্থ ২০৪
ভারতের বিপ্লবাদর্শ আধ্যাত্মিক—পাশ্চাত্যের হল বস্তুতান্ত্রিক বিপ্লবাদর্শ ২০৪
প্রাচ্যদেশের ধর্ম ও বিজ্ঞানের তাৎপর্য পাশ্চাত্য দেশের থেকে ভিন্ন ২০৫
পার্থিব সুখ ও পারমার্থিক সুখের পার্থক্য ২০৫
সত্যধর্ম ও অধ্যাত্মবিজ্ঞানের ফলশ্রুতি ২০৫
বস্তুবাদ ও অধ্যাত্মবাদের পার্থক্য ২০৫
কোন দেশেই কোন যুগের সভ্যতাই ভারতীয় সভ্যতার প্রভাবমুক্ত নয় ২০৫
ঈশ্বর জ্ঞানে দেশসেবার আদর্শ একমাত্র ভারতেই দৃষ্ট হয় ২০৬
সকাম ও নিষ্কাম ভোগের বৈশিষ্ট্য ২০৬
ভারতের দেবদেবীদের হাতে অস্ত্রের তাৎপর্য ২০৬
ভারতীয় সংস্কৃতির তাৎপর্য ২০৭
ঈশ্বরীয় মনের সঙ্গে মানবীয় মনের অভেদ সম্বন্ধ ২০৭
উর্ধ্বমন ও নিম্নমনের সম্বন্ধ ২০৭
ভারতের বৈশিষ্ট্যই হল ধর্মবিজ্ঞান ২০৮
চতুর্যুগের বৈশিষ্ট্য ২০৮
ত্যাগের মাহাত্ম্য ২০৮
প্রাচ্য দেশ ও পাশ্চাত্য দেশের ধর্ম ও সমাজজীবনের আদর্শ ও লক্ষ্য ভিন্ন ২০৮
ব্রহ্মের আমি এবং আত্মার আমিই হল পুরুষোত্তম ২০৮
তিনকালের মধ্যে বর্তমানের প্রাধান্য ও গুরুত্ব ২০৯
রাজনীতির আধ্যাত্মিক অর্থ ২০৯
বাস্তব অর্থে কূটনীতি ২০৯
আত্মজ্ঞান লাভই মনুষ্য জীবনের চরম লক্ষ্য ২০৯
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শিক্ষা ও সংস্কৃতি ভিন্ন ২১০
ধর্মের মর্মার্থ আবিষ্কারই জীবনের শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার ২১০
সমস্যা এবং সমাধান উভয়ই সংসারে বর্তমান ২১০
প্রেয় ও শ্রেয় পথের পার্থক্য ২১০
প্রবৃত্তি মার্গ ও নিবৃত্তি মার্গের রহস্য ২১০
অদ্বয়বোধ বা জ্ঞানের মহিমা ২১০
প্রেমের তাৎপর্য ২১০
আত্মসমালোচনা ভিন্ন অন্য যে-কোনও সমালোচনাই দিব্যজ্ঞানের অন্তরায় ২১১
অনুভূতিই সর্ব পরিচয়ের মাধ্যম ২১১
প্রকৃতির অধীন জগৎ, ঈশ্বরের অধীন প্রকৃতি ২১১
জ্ঞানী ও ভক্তের সিদ্ধি অভিন্ন, কিন্তু সাধন ভিন্ন ২১১
ভোগী ও ত্যাগীর লক্ষণ ২১১
অধার্মিক, ধার্মিক ও মুক্তজীবনের পরিচয় ২১১
ভাবানুরূপ অনুভূতি ও দৃষ্টিভঙ্গি ২১১
অবিবেকী ও বিবেকীর পার্থক্য ২১২
সকাম ও নিষ্কামের পার্থক্য ২১২
সমগ্র জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত ২১২
মহাচিৎ শক্তি তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে লীলা করে ২১৩
গুণভেদে অহংকার ত্রিবিধ ২১৩
গুণ ও শক্তি অভিন্ন ২১৩
ব্রহ্মাত্মশক্তির মহিমা ২১৩
ঈশ্বরীয় বিজ্ঞানে অবিদ্যার ভূমিকা ২১৩
ঈশ্বরীয় লীলায় চৈতন্যের ভূমিকা ২১৪
আত্মার আমি চৈতন্য, অহংকারের আমি তার আভাস ২১৪
অবিদ্যা অজ্ঞান-জাত কামনা কর্তৃত্ব অহংকার ২১৪
আত্মার অন্তরদর্শন ও বাহিরদর্শনের বৈশিষ্ট্য ২১৫
মৃত্যু ও অমৃতত্বের তাৎপর্য ২১৫
ব্রহ্মাত্মৈক্য দৃষ্টির তাৎপর্য ২১৫
চিত্তের বহির্মুখী দৃষ্টির পরিণাম ২১৫
বহিঃপ্রকৃতি অপেক্ষা অন্তরপ্রকৃতির গুরুত্ব অধিক ২১৫
পরমাত্মার আমির সঙ্গে তাদাত্ম্যলাভের উপায় ২১৫
পরমাত্মদেবের নিত্যস্বরূপ ও লীলাস্বরূপের পরিচয় ২১৫
পরমাত্ম-বক্ষে তাঁর স্বভাব-মনে কারণ ও কার্যরূপ ২১৬
জীবনের মাধ্যমে চৈতন্যের বহুমুখী লীলাভিনয় পরিণামে স্ববোধস্বরূপে স্থিতিলাভ করে ২১৬
অহংকারের ব্যবহারের ফল ২১৬
চতুর্বিধ আহারের বৈশিষ্ট্য ২১৭
ব্রহ্মচর্যের তাৎপর্য ২১৭
সংকল্পের বৈশিষ্ট্য ২১৭
বিষয়ানন্দ ও ভূমানন্দের পার্থক্য ২১৭
সত্য আত্মব্রহ্ম নির্বিকার ও অদ্বয় ২১৭
কামনার বৈশিষ্ট্য ২১৭
পরমাত্মলীলায় তাঁর অভিনব মহিমার পূর্বাপর সম্বন্ধ ২১৮
চৈতন্যলীলায় সত্যসাধনার গুরুত্ব ২১৮
ব্রহ্মবিদ্যা, আত্মবিদ্যার পরিচয় ২১৮
কামনার উৎস ২১৮
বন্ধন ও মুক্তির রহস্য ২১৮
অদ্বয় ব্রহ্মের মানসদৃষ্টি ও আত্মদৃষ্টি ২১৮

সমাধির তাৎপর্য	২১৯
সর্বপ্রকাশক সত্তার বক্ষে তাঁর অনন্ত প্রকাশভঙ্গিমার লীলামাধুর্য	২১৯
চিদণুর অনন্ত মহিমা	২১৯
আত্মসংকল্পের অভিব্যক্তির ক্রম	২১৯
অনুভূতির ক্রমিক মান	২২০
অনুভূতির গভীরতার বৈশিষ্ট্য	২২০
শিক্ষা ও দীক্ষার তাৎপর্য	২২০
ঈশ্বরকে অবলম্বন করে ভিন্ন ভিন্ন সাধনার পরিচয়	২২০
ঈশ্বরের নাম ও জাগতিক শব্দের মধ্যে পার্থক্য	২২০
চিৎশক্তির ভিন্ন ভিন্ন অভিব্যক্তির পরিচয়	২২০
চৈতন্যের স্বরূপস্থিতির পূর্বাবস্থা	২২১
বিশ্বাত্মার অনুভূতির উপায়	২২১
চৈতন্যশক্তির ভিন্ন ভিন্ন নাম	২২১
নামময় ব্রহ্মের পরিচয়	২২১
চৈতন্যের ব্যবহারবিজ্ঞানের পরিচয়	২২১
আনন্দস্বরূপের ব্যবহারবিজ্ঞান	২২২
উপাধিযোগে অদ্বয় আত্মার দ্বৈতবিলাস	২২২
যুগের ধর্ম ও বিভাগের লক্ষণ	২২২
সত্যানুভূতির লক্ষণ	২২২
অহংকারের সংসার এবং নিরহংকারের ব্রাহ্মীস্থিতি বা আত্মবোধে প্রতিষ্ঠা	২২২
প্রেমময় ঈশ্বরের বহিরঙ্গ অভিব্যক্তি হল বিশ্ব	২২২
চৈতন্যের বিজ্ঞানময় রূপ মহাপ্রাণের বিস্তারই হল বৈচিত্র্যময় বিশ্ব	২২৩
চিদাভাস মন-প্রকৃতির ধর্মই হল বন্ধন ও মুক্তি	২২৩
চিদাত্মার ইচ্ছাতেই জীবদশা বন্ধন এবং তাঁর ইচ্ছাতেই জীবন্মুক্তি শান্তি ও স্বরূপস্থিতি	২২৩
রাগ ও বিরাগের পার্থক্য	২২৩
মুক্তির তাৎপর্য	২২৪
মহামুক্ত দিব্যমানবদের বৈশিষ্ট্য	২২৪
দেহাত্মবুদ্ধির লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য	২২৪
অহংকারের লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য	২২৪
সত্যের লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য	২২৪
অজ্ঞান ও জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য ও লক্ষণ	২২৪
অদ্বয়বোধের লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য	২২৫
চৈতন্যস্বরূপের বৈশিষ্ট্য ও লক্ষণ	২২৫
চিদাত্মার বৈশিষ্ট্য ও লক্ষণ	২২৫
অস্তি-ভাতি-প্রীতির লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য	২২৫
স্ববোধ ও স্বভাব	২২৫
স্বানুভবদেব পুরুষোত্তমের পরিচয়	২২৫
এক চিৎতত্ত্বের অবস্থাভেদে ভিন্ন ভিন্ন পরিচয়	২২৬
চৈতন্যের বক্ষে তাঁর লীলাভিনয়ই হল কেবল অনুভূতির খেলা	২২৬
প্রাণচৈতন্যের চতুর্বিধ অভিব্যক্তি	২২৭
বুদ্ধিসত্ত্বের বৈশিষ্ট্য	২২৭
অহংকার ও অহংদেবের পরিচয়	২২৭
কর্মের প্রকারভেদ	২২৭
দিব্যজীবনের লক্ষণ	২২৭
শ্রদ্ধার বৈশিষ্ট্য	২২৮
ভক্তির ত্রিবিধ অবস্থা	২২৮
অবতার কেন?	২২৮
মনের ধর্ম ও বোধের ধর্ম	২২৮
সন্ন্যাসের তাৎপর্য	২২৮
অনুভূতির স্বরূপই হল জগৎ	২২৯
অনুভূতি ভেদ ও অভেদের মূলে	২২৯
প্রতীতি, অনুভূতি, স্বানুভূতি	২২৯
ব্যবহারিক বোধ ও আত্মবোধের পার্থক্য	২২৯
প্রাণের লীলায় প্রাণের মাহাত্ম্য	২২৯
অভিন্ন চিৎসত্তা ও শক্তির বক্ষে চিৎশক্তির বিচিত্র লীলাভিনয়	২৩০
আকাশবৎ মহাপ্রাণচৈতন্যের ত্রিবিধ পরিচয়	২৩০
সত্যানুভূতির উপায়	২৩০
বন্ধন ও মুক্তি চৈতন্যের ব্যবহারিক পরিচয়	২৩১
পূর্ণাহুতির তাৎপর্য	২৩১
অদ্বৈতবাদী ও দ্বৈতবাদীর সত্যদর্শন	২৩১
অধ্যাত্ম সাধনার তাৎপর্য	২৩১
প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির পরিচয়	২৩১
দেবাসুরের পরিচয়	২৩২
সদাশ্রিত নিবৃত্তির তাৎপর্য	২৩২
দেবাসুরের তত্ত্ব	২৩২
সদসৎ কর্মপ্রসঙ্গ	২৩২
কর্ম ও স্বপ্নদর্শন অহংকারে	২৩২
ঈশ্বর বা আত্মা অকর্তা, অভোক্তা—শুধু সাক্ষী মাত্র	২৩৩
ব্রহ্ম গুণাতীত, ভাবাতীত, দ্বন্দ্বাতীত, ভেদাতীত	২৩৩
জ্ঞানীর লক্ষণ	২৩৩

শুদ্ধ চিৎতত্ত্বের ভিন্ন ভিন্ন নাম ২৩৩
স্রষ্টা ও সৃষ্টির সম্বন্ধ ২৩৪
শুভাশুভ দর্শনের ফল ২৩৪
গৌণ ও মুখ্য প্রাণের বৈশিষ্ট্য ২৩৪
পঞ্চপ্রাণের পরিচয় ২৩৪
পঞ্চদেবতার বৈশিষ্ট্য ২৩৪
দর্শনের বিজ্ঞান ২৩৫
দেবদেবীদের পরিচয় ২৩৫
প্রবুদ্ধ আত্মার মাহাত্ম্য ২৩৫
নিয়তির পরিচয় ২৩৫
কর্মের ত্রিবিধ পরিচয় ২৩৬
চিত্তমূলে সংসার, সংসারমূলে চিত্ত ২৩৬
তুরীয়ের বৈশিষ্ট্য ২৩৬
সাক্ষী আত্মার পরিচয় ২৩৬
চিত্তের অশুদ্ধির কারণ ২৩৬
স্বপ্নদর্শন ও দিব্যদর্শন ২৩৬
ধ্যানের বিজ্ঞান ২৩৭
বিষয়বোধ ও আত্মবোধের পার্থক্য ২৩৭
মূর্তি ও বিগ্রহাদির তাৎপর্য ২৩৭
আত্মদৃষ্টি ও বৈচিত্র্যদৃষ্টি ২৩৭
চিদাত্মার পরিচয় ২৩৭
পরমার্থবিদ্যা ২৩৭
চিৎসত্তার চিদ্‌রূপতা স্বতঃসিদ্ধ ২৩৭
চিদাকাশে মনের বিলাসই হল জগৎ ২৩৭
চিদাকাশের স্তরবিন্যাস ২৩৮
কর্মের বিজ্ঞান ও মুক্তির বিজ্ঞানের নির্দেশক ২৩৮
অহংকার ও তার শোধনবিজ্ঞান ২৩৮

তৃতীয় অধ্যায় : জুলাই ১৯৬৮

তত্ত্ব সংগ্রহ ২৩৯
ব্যষ্টি আমি ও সমষ্টি আমির লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য ২৩৯
আত্মসমর্পণের বৈশিষ্ট্য ২৩৯
ভক্ত ও ভগবানের সম্পর্ক ২৩৯
শুভাশুভ কর্ম ও ফলের বৈশিষ্ট্য ২৪০
আত্মসমর্পণের পূর্বাবস্থা ও পরবর্তী অবস্থা ২৪০
অহংকারের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ ২৪০
জীবদৃষ্টি ও ঈশ্বরদৃষ্টির পার্থক্য ২৪০
পূজা শব্দের তাৎপর্য ২৪০
অখণ্ড সচ্চিদানন্দস্বরূপের অনুভূতির বৈশিষ্ট্য ২৪০
ভাবের মাহাত্ম্য ২৪০
শুদ্ধভাবের প্রকাশই হল সাত্ত্বিক বিকার ২৪১
গুরু ও ইষ্ট অভিন্ন ২৪১
ঈশ্বরের অভিব্যক্তি কর্তা, কর্ম, করণাদি ২৪১
সাধু বা মুক্তপুরুষের বৈশিষ্ট্য ২৪১
তত্ত্বদৃষ্টি ২৪১
মহাপুরুষের মাধ্যমেই ঈশ্বরের করুণা লাভ হয় ২৪১
সদ্‌গুরুমাত্রই ভগবানের মূর্ত বিগ্রহ ২৪১
'মেনে মানিয়ে চলা'র মাধ্যমেই আত্মসমর্পণ সিদ্ধ হয় ২৪১
সংসারের গূঢ়ার্থ ২৪২
'সব' ও 'শবের' ভাবার্থ ২৪২
ঈশ্বরের নিমিত্ত কর্মই হল চিত্তশুদ্ধি ও কর্মফলমুক্তির বিজ্ঞান ২৪২
আত্মসমর্পণের বিজ্ঞান ২৪২
মৃত্যুর গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ২৪২
মহাপুরুষের মাহাত্ম্য ২৪২
জীবনের চরম লক্ষ্য হল সসীমতাকে ছেড়ে অনন্ত অসীম-অস্মির দিকে এগিয়ে যাওয়া ২৪২
সমগ্র বৈচিত্র্যের মধ্যে ঈশ্বররূপে আপনাকে আবিষ্কার করাই জীবনের চরম ও পরম প্রাপ্তি ২৪২
অন্তরসত্তা ও বহিঃসত্তার বৈশিষ্ট্য ২৪৩
ঈশ্বরকে ভালবাসার লক্ষণ ২৪৩
ত্রিবিধ অধিকারীর বিশেষ লক্ষণ ২৪৩
বলা ও হওয়ার মধ্যে গভীর পার্থক্য ২৪৩
ঈশ্বরই সর্ববস্তুর মূলে ২৪৩
ভক্তের কাজ ক্ষুদ্র হলেও বিরাট ২৪৩
উত্তম ভক্তের বৈশিষ্ট্য ২৪৩
গুণভেদে ভক্তের লক্ষণ ২৪৩
ঈশ্বর আর দেবতার বৈশিষ্ট্য ২৪৩
শুভ সঙ্কল্পের তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ২৪৪
জীবনের মূল লক্ষ্যের নির্দেশ ২৪৪
অহংকারে নয়, ত্বংকারে আত্মসমর্পণ সিদ্ধ হয় ২৪৪
সর্বত্র ঈশ্বর দর্শনই জীবন লক্ষ্যের উদ্দেশ্য ২৪৪
সত্যোপলব্ধির তাৎপর্য ও গুরুত্ব ২৪৪
ঈশ্বরীয় শক্তির ত্রিবিধ স্তর ২৪৪
শক্তির বহির্ভাগে মায়া, অন্তরে মহামায়া ও কেন্দ্রে যোগমায়ার খেলা ২৪৪

অহংকার শোধিত হলে ভাব-ভক্তির উদয় হয় ২৪৫
সৃষ্টিতত্ত্বের নিগূঢ় রহস্য ২৪৫
ভাবের তাৎপর্য ২৪৫
শরণাগতির ফলশ্রুতি ২৪৫
ভক্ত, জ্ঞানী ও যোগীর বৈশিষ্ট্য ২৪৫
সিদ্ধমহাপুরুষের বৈশিষ্ট্য ২৪৫
অদ্বৈতবাদীর বৈশিষ্ট্য ২৪৬
ঈশ্বর আত্মা ব্রহ্মই সত্য, আর সব তাঁর আভাসমাত্র ২৪৬
অহংকারে বন্ধন ও মৃত্যু, অহংকারশূন্যতায় মুক্তি ও শান্তি ২৪৬
রাগে সৃষ্টি আর বিরাগে মুক্তি ২৪৬
নিত্য স্মরণই হচ্ছে ঈশ্বরাত্মার শ্রেষ্ঠ সাধন ২৪৬
পূর্ণ আত্মসমর্পণই হচ্ছে ঈশ্বরানুভূতির বৈশিষ্ট্য ২৪৬
জীববোধে অহংকার, শিববোধে ঈশ্বরাত্মা সবার ২৪৬
অসৎসঙ্গ ও সৎসঙ্গের বৈশিষ্ট্য ২৪৭
দুঃখকষ্টের মাধ্যমে ভক্তের পরীক্ষা হয় ও মুক্তের না-পাওয়া সিদ্ধ হয় ২৪৭
শান্ত ভাব দিয়ে ঈশ্বরীয় সাধনা শুরু হয় ও সমশান্ত বোধে তার পরিণাম সিদ্ধ হয় ২৪৭
চাওয়া দিয়ে জীবন শুরু, কেবল সাক্ষীরূপে চেয়ে-দেখা দিয়ে তার শেষ ২৪৭
অ-মানীকে মান দিলেই ভক্তিরাজ্যে প্রবেশ করা যায় ২৪৭
পিতামাতাকে না মেনে ঈশ্বরকে মানা যায় না ২৪৭
প্রশান্ত হৃদয়ে মহাপুরুষগণ ঈশ্বরের বাণী শ্রবণ করেন ও তাঁর রূপ দর্শন করেন ২৪৭
বাইরে বহু প্রকাশ, অন্তরে তাঁর এক নির্যাস ২৪৮
চাওয়াতে অপূর্ণতা, না-চাওয়াতে পূর্ণতা ২৪৮
চাওয়া-পাওয়ার তাৎপর্য ২৪৮
সর্ব বিকল্পের মধ্যে নির্বিকল্পকে আবিষ্কার করাই হল পরম পুরুষার্থ ২৪৮
সবকিছুর মধ্যে মাকে জানা-ই হল সর্বোত্তম জানা ২৪৮
অহংকারের উৎকর্ষই পুরুষকার, পুরুষকারের পরিণামে পরমার্থ সিদ্ধি ২৪৮
সমগ্র বিশ্বই মাতৃবিগ্রহ ২৪৮
কর্ম রহস্য ২৪৯
পূর্ণতার সর্বোত্তম মান ২৪৯
ঈশ্বর অদ্বৈত ও মুক্ত ২৪৯
বৈষ্ণবের পরিচয় ২৪৯
ভাবভক্তির তাৎপর্য ২৪৯
আন্তরিকতার বৈশিষ্ট্য ২৪৯
যথার্থ ব্যবহারের গুরুত্ব ২৪৯
অহিংসার মাহাত্ম্য ২৪৯
মহতের বৈশিষ্ট্য ২৫০
সত্যের মহিমা ২৫০
দার্শনিকদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির বৈশিষ্ট্য ২৫০
আত্মজ্ঞান, আত্মনীতিই যথার্থ রাজনীতি ২৫০
বর্তমান রাজনীতি আত্মনীতির পরিপন্থী ২৫০
'দিয়ে হয় দেবতা, নিয়ে হয় নেতা' ২৫০
তত্ত্ব লহরী ২৫০
স্বতঃসিদ্ধ স্বতঃস্ফূর্ত ঈশ্বরের মহিমাও স্বতঃসিদ্ধ ২৫১
ঈশ্বরীয় বোধের স্মৃতির তারতম্য অনুসারে মানুষের অনুভূতি হয় ২৫২
জগতের পরিচয় মন বুদ্ধি দিয়ে হয় না, আত্মার পরিচয় কেবল আত্মবোধে হয় ২৫২
সর্বোত্তম উন্নতির কারণ ২৫২
উত্তম ভক্তের বৈশিষ্ট্য ২৫২
আপনবোধই ঈশ্বরের প্রকাশমাধ্যম ২৫৩
ঈশ্বরবোধ ঈশ্বরভাবনার মাধ্যমেই হয় ২৫৩
জীবের পক্ষে ঈশ্বরের শরণাগতিই হল শ্রেষ্ঠ উপায় ২৫৩
জ্ঞানীর বিশেষ লক্ষণ ২৫৩
ভাব ও অভাবের পরিচয় ২৫৩
প্রেমের মাহাত্ম্য ২৫৪
ভাবের পরিণামে ভক্তি ২৫৪
ভাব লাভের উপায় ২৫৪
লঘুর গুরুবোধ গুরুভাব হতে হয় ২৫৪
সাধন সিদ্ধির গুপ্ত রহস্য ২৫৪
সাধনা ও সিদ্ধি নিত্য অভিন্ন ২৫৪
নিত্য স্মরণ সিদ্ধিসম ২৫৪
নাম ও নামী অভিন্ন এবং সব সাধনার গতি সমান ২৫৫
সাধ্য-সাধক-সাধন-সিদ্ধিরূপে মা-ই সব ২৫৫
সাযুজ্য যোগের পরিচয় ২৫৫
প্রেমিক ভক্তের বৈশিষ্ট্য ২৫৫
সর্বাশ্রয়েই ভগবান নিত্য বর্তমান ২৫৫
একনিষ্ঠ ভক্তির পরিচয় ২৫৫
'আমি'-র ভাবার্থ ২৫৬
শান্ত ও অশান্ত অবস্থার ব্যবহার লক্ষণ ২৫৬

অন্তরের ভক্তি সমুদ্রগামী নদীর মত ছুটে যায় পরম ইষ্টের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য ২৫৬
সাধন সিদ্ধির জন্য দেহের সাহায্যও দরকার হয় ২৫৬
সমবোধের সাধনাই হল অচ্যুতের আরাধনা ২৫৬
কুণ্ডলিনী শক্তির অভিনব পরিচয় ২৫৭
মায়ের পরিচয় সবার কাছে সমান নয় ২৫৭
শাস্ত্রের রহস্য সহজবোধ্য নয় ২৫৭
মায়ের করুণা বিনা তাঁর সংসাররূপ অতিক্রম করা যায় না ২৫৭
ব্যাকুলতাই ঈশ্বর লাভের শ্রেষ্ঠ উপায় ২৫৮
দেহ-দুর্গে মাতা দুর্গাই বাস করেন ২৫৮
শরণাগতির তাৎপর্য ২৫৮
দুর্গার অনন্ত মহিমা ২৫৮
মাতৃমহিমার সত্য পরিচয় ভক্তের হৃদয়েই প্রকাশ পায় ২৫৯
অভিনব মাতৃলীলার সাক্ষী তাঁর ভক্ত সন্তান ২৫৯
বিজ্ঞান দৃষ্টির পূর্বাবস্থা ও পরবর্তী অবস্থা ২৫৯
যোগী ও ভক্তের পার্থক্য ২৫৯
শক্তির সাধক ও জ্ঞানের সাধকের ভিন্ন গতি ২৬০
প্রাণের তাৎপর্য ২৬০
ব্রহ্মবিদ্যার অভিনব পরিচয় ২৬০
স্তরভেদে সাধন সিদ্ধির পরিণাম ২৬০
ভাবলোকের সাধন সিদ্ধির পরিচয় ২৬০
বিশুদ্ধা ভক্তি ও বিশুদ্ধ জ্ঞান অভিন্ন ২৬০
ভক্তের ব্রাহ্মণত্ব লাভের অবস্থা ২৬০
ঐশ্বর্যপ্রিয় অসুরগণ চিরকালই দেববিরোধী ২৬১
ব্রাহ্মণত্ব হচ্ছে সাধনার সর্বশেষ স্তর ২৬১
শ্রীনামের মাহাত্ম্য ২৬১
অহংকারকৃত সর্বকর্মেরই প্রতিক্রিয়া হয় ২৬১
ভক্ত ও ভগবানের সম্পর্ক মধুরতর ২৬১
সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টা স্বমহিমায় বিদ্যমান ২৬২
যাদুকর সত্য, কিন্তু তার খেলা মিথ্যা ২৬২
জগৎবোধে ঈশ্বর অজ্ঞাত এবং ঈশ্বরবোধে জগতের অভাব ২৬২
শান্ত মনই শুদ্ধ মন, শুদ্ধ মনেই হয় ঈশ্বর দর্শন ২৬২
সর্বসমপর্ণের পরিণামে হয় মুক্তি, শান্তি ২৬২
শুদ্ধ মনে হয় শুদ্ধ দেহ, শুদ্ধ দেহে হয় ইষ্টসিদ্ধি ২৬২
অসংযম ও অনিয়মই হল পাপ ও অধর্ম ২৬২
ঈশ্বরীয় সাধনার দ্বারাই জীবনের চরম পরিণতি আসে ২৬২
স্বার্থবোধে অজ্ঞান বন্ধন এবং নিঃস্বার্থবোধে মুক্তি ও শান্তি ২৬২
সাধুর ব্যবহার ২৬৩
অহংকারে কোন সাধনাই সিদ্ধ হয় না ২৬৩
ভক্তের আচরণ ২৬৩
যথার্থ ভাগ্যবানের লক্ষণ ২৬৩
স্বার্থবোধে ব্যবহার এবং ঈশ্বরবোধে ব্যবহারের পার্থক্য ২৬৩
জীবনের মূল উদ্দেশ্য ২৬৩
সমবোধের বৈশিষ্ট্য ২৬৪
নিম্নপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্য ২৬৪
জীবনে আত্মসমর্পণ ও মধ্যম পন্থার গুরুত্ব ২৬৪
ভক্তিযোগের অনুশাসন ২৬৪
নিত্য প্রেম নহে সাধ্য ২৬৪
সমবোধেই হয় প্রেমের পরিচয় ২৬৪
প্রেমের লক্ষণ স্বতন্ত্র ২৬৪
নির্গুণ ও সগুণের সাধনা পৃথক ২৬৪
ভগবৎপ্রেমী পাগলের লক্ষ্যচ্যুতি হয় না ২৬৪
বিকৃতমস্তিষ্ক ও পূর্ণ পাগলের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট ২৬৫
মৃত্যুর তাৎপর্য ২৬৫
বহুর মাঝে একের অনুভূতিই হল অমৃত আস্বাদন ২৬৫
ঈশ্বর জ্ঞানে বস্তুজগৎও আনন্দময় ২৬৫
স্বরূপের পরিচয় দ্বারাই সবকিছুর মূল্যায়ণ হয় ২৬৫
পূর্ণ 'আমি'-র পরিচয় পেলে অপূর্ণ 'আমি' শান্ত হয়ে যায় ২৬৫
পূর্ণ আমির শরণ নিলে অপূর্ণ সসীম জীবের আমি শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত হয়ে যায় ২৬৫
নির্বিকারের বক্ষেই বিকার খেলে ২৬৫
অদ্বয় নির্বিকার বোধে বিকারের অবসান ২৬৬
মহাপ্রাণের বক্ষে মহাপ্রাণেরই অভিনয় হয় স্বমহিমায় ২৬৬
অদ্বয় ঈশ্বরের স্বভাব নিত্য অদ্বয়, জীবের স্বভাব বৈচিত্র্য ২৬৬
বহুমুখী মনকে একের সেবায় লাগিয়ে রাখাই ধর্মসাধনা ২৬৬
শান্তি নিত্য আত্মার স্বরূপ, সাধনসিদ্ধি নয় ২৬৬
অহংকার আর মন অভিন্ন, একের নাশে অপরের নাশ—ফলে আত্মসিদ্ধি ২৬৬

শান্তি হল আত্মসত্তায়, সুখ আরাম হল ইন্দ্রিয় মনে ২৬৭
আত্মবোধে শান্তি, দেহবোধে শান্তি নেই—অশান্তি, অসুখ আছে ২৬৭
একেতেই ভূমা সুখ, দ্বৈতে তার অভাব ২৬৭
অবিদ্যা মায়া-ই প্রলোভনের কারণ, বিদ্যা মায়া করে তার নাশ ২৬৭
নিম্নপ্রকৃতির বিকারধর্মী প্রভাব অতিক্রম করতে ঊর্ধ্বপ্রকৃতির সাহায্য একান্ত আবশ্যক ২৬৭
দ্বৈতবোধে সবসমস্যার পূণ সমাধান হয় অদ্বৈতবোধে ২৬৭
খণ্ডের ঘরে অশান্তি, অখণ্ডের ঘরে পূর্ণ শান্তি ২৬৭
সবার অন্তরে নিহিত আত্মসত্তার প্রভাবেই সবকিছু সিদ্ধ হয় ২৬৮
ভক্তিতে মন গলে যায়, জ্ঞানবিচারে মনোনাশ হয় —ফলে মুক্তি শান্তি লাভ হয় ২৬৮
অখণ্ড মহাপ্রাণ সত্তায় তৎপরায়ণ হলে তদ্‌গতচিত্ত হয় ২৬৮
মানলে অমর, না-মানলে কেবল সমর ২৬৯
এক চাওয়ারই দ্বিবিধ রূপ—গতি ও স্থিতি, ভোগ ও ত্যাগ ২৬৯
জীবনের আদি অন্তে শান্ত, মধ্যে কেবল অশান্ত ২৬৯
বহু চাওয়া এক চাওয়ারই বিকার, সর্ববিকার নাশে চাওয়া একে ফিরে আসে ২৬৯
এক চাওয়াই বহু মানের কারণ বহু হয়, আবার একে ফিরে আসে ২৬৯
পরমাত্মার অভিনব জীবলীলা ২৬৯
জীবলীলায় চাওয়ার বৈশিষ্ট্য ২৭০
সৎসঙ্গে যাবার ও চাওয়ার তাৎপর্য ২৭০
সৎ অখণ্ড পূর্ণ ২৭০
পূর্ণ সমর্পণের গুরুত্ব ২৭০
ঈশ্বরের কৃপা-করুণার লক্ষণ ২৭১
তিন শ্রেণীর ভক্ত ২৭১
অদ্বৈতের ভক্তি স্বতঃসিদ্ধ স্বতঃস্ফূর্ত ২৭১
ভক্তির পরিপক্ব অবস্থায় ভক্তের ভার ভগবানই গ্রহণ করেন ২৭১
ভক্তের হল মানা, ঈশ্বরের হল জানা ২৭১
সত্ত্বগুণীর ভক্তির বৈশিষ্ট্য ২৭১
রাম শব্দের নিগূঢ় তত্ত্ব ২৭১
কৃষ্ণ শব্দের নিগূঢ় তত্ত্ব ২৭২
ভাব অনুযায়ী সাধনার অনুশাসন ২৭২
সৎসঙ্গের প্রয়োজনীয়তা ২৭২
সৎ ও অসতের পার্থক্য মূলত গুণগত মানের পার্থক্য ২৭২
সৎসঙ্গের মহিমা ২৭২
ভক্ত ও ভগবান অভিন্ন তত্ত্ব ২৭২
মহাপুরুষের মাধ্যমে পরমাত্মা পরমেশ্বরই নিজেকে প্রকাশ করেন ২৭৩
সংসারীদের বিষয়চিন্তা মুখ্য, ঈশ্বরচিন্তা গৌণ—মহাপুরুষদের তার বিপরীত ২৭৩
মতবাদের মাধ্যমে ঈশ্বরে পৌঁছান যায় না ২৭৩
নিজের মত না চেয়ে ঈশ্বরের মত হতে হবে ২৭৩
বিনীত ও নম্রভাব দিব্যগুণ ২৭৩
করুণাঘন ঈশ্বর ভক্ত জ্ঞানী যোগীর অতীব প্রিয় ও আপন ২৭৩
মনোরমা শব্দের তাৎপর্য ২৭৩
কাম-কাঞ্চন ভাবশূন্য মনই শুদ্ধ ও দিব্য মন, ঈশ্বরের নিত্য আসন ২৭৪
অর্থ ও পরমার্থের পার্থক্য ২৭৪
তত্ত্বের দৃষ্টিতে ঈশ্বরই স্বয়ং সাধ্য, সাধক, সাধন ও সিদ্ধি ২৭৪
প্রেমস্বরূপ ভগবানের অনন্ত মহিমা ২৭৪
সর্ব সাধনার মূল একই ২৭৪
ঈশ্বরের স্বরূপমহিমা ২৭৪
ঈশ্বরানুভূতি হল সত্যের পরিচয় ২৭৪
জগৎলীলা হল ঈশ্বরের আনন্দবিলাস ২৭৫
তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ হলেন প্রেমিক পাগল শিরোমণি ২৭৫
জীবনের সর্ব সমাধান হয় ভগবৎ (আত্ম) প্রেম ও জ্ঞানে ২৭৫
ভাগবৎ প্রেমিক পাগল এসেই জীবজগৎকে উদ্ধার করেন ২৭৫
ভক্তের বোঝা ভগবান বয় ২৭৫
সমর্পণের বিধান ২৭৬
ভক্তের মহিমা অভিনব ২৭৬
জীবনের চরম ও পরম গতি ২৭৬
ঈশ্বরের আশ্রিতের নাশ নেই ২৭৬
বিনা শর্তে যে প্রার্থনা তাই ফলপ্রদ ২৭৬
ভক্ত ও অভক্তের আচরণ ২৭৬

'আমি', 'আমার' ব্যবহারশূন্য হলে যথার্থ ভক্তের লক্ষণ প্রকাশ পায় ২৭৭
আত্মানুভূতিই হল পূর্ণ সন্ন্যাসের লক্ষণ, পূর্ণ পাগল সে-ই ২৭৭
কৃতজ্ঞতাকেই মান দেওয়ার উপায় ২৭৭
প্রেমের সাধনাই অহিংসা ২৭৭
প্রিয়বোধেই জগতের কল্যাণ করা সম্ভব ২৭৭
বিষয়প্রীতি ও ঈশ্বর-আত্মপ্রীতি এক কথা নয় ২৭৭
নানাত্ব বহুত্বের মূলে নিত্য একই বর্তমান ২৭৮
মহাপুরুষদের ব্যবহার দ্বৈতবাদীদের মত নয় ২৭৮
শরণাগতির বৈশিষ্ট্য ২৭৮
অনুভবসিদ্ধদের মধ্যে ভাষার পার্থক্য হতে পারে কিন্তু সত্যানুভূতির পার্থক্য নয় ২৭৮
পূর্ণানুভূতির পূর্বে জন্ম-জন্মান্তরের অনুভূতির পার্থক্য খুবই স্বাভাবিক ২৭৮
ভগবানের উদ্দেশ্যানুসারে লীলাবিলাস হয় ২৭৮
সাধনা ভেদে অনুভূতির ভেদ হতে পারে ২৭৮
প্রেমের সাধনার বৈশিষ্ট্য ২৭৯
নির্গুণ গুণীর স্বরূপের পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা ২৭৯
সাধনার অবলম্বন বা পদ্ধতি ভিন্ন হলেও তার পরিণাম ভিন্ন নয় ২৭৯
পূর্ণ ঈশ্বরময় হয়ে যাবার বিশেষ সাধন পদ্ধতি ২৭৯
ঈশ্বরের অনন্ত ভাবের পূর্ণ অধিকারী যুগে যুগে বিরল হলেও অসম্ভব নয় ২৭৯
পূর্ণানুভূতির পূর্বে বহুবার খণ্ডানুভূতি হতে পারে ২৭৯
সর্বসিদ্ধির রহস্য (চাবিকাঠি) আছে অনুভবসিদ্ধের কাছে ২৭৯
বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর ২৮০
ঈশ্বরকে মেনে সাধনা করাই হল পূর্ণতালাভের শ্রেষ্ঠ উপায় ২৮০
জীবনসাধনার মতপথ ভিন্ন ভিন্ন হলেও লক্ষ্য সবারই এক ২৮০
ঈশ্বরের মহিমা অনন্ত বলেই সকলের পক্ষেই তাঁকে পাওয়া সম্ভব ২৮০
রাসলীলাই হল ভগবৎ প্রেমের বিশেষ অধ্যায় ২৮০
প্রেমই সর্বোত্তম, ঈশ্বরের কৃপাসাপেক্ষ ২৮০
নিত্যসিদ্ধ প্রেম সাধনসাপেক্ষ নয় ২৮০
প্রেমিক পুরুষদের স্বাতন্ত্র্যবিলাস ২৮১
নিত্যযুক্ত ভগবানের ভক্তই ভগবৎ মহিমা উপলব্ধির অধিকারী ২৮১
শাস্ত্র অপেক্ষা জীবনদর্শনের গুরুত্ব অধিক ২৮১
সর্ব সমর্পণের পরিণামে ভক্তের হৃদয় হয় ঈশ্বরের লীলাভূমি ২৮১
'আমার' মরলেই মৃত্যুর মৃত্যু হয় এবং অমৃতত্বের প্রতিষ্ঠা হয় ২৮১

চতুর্থ অধ্যায় : আগস্ট ১৯৬৮

জীবনের চরম উদ্দেশ্য বৈচিত্র্যের মধ্যে একের আবিষ্কার ও উপলব্ধি ২৮২
মায়ের গলার মুণ্ডমালার তাৎপর্য ২৮২
অভেদে প্রতিষ্ঠার বিজ্ঞান ২৮২
নিম্ন প্রকৃতির প্রভাবমুক্ত হওয়ার উপায় ২৮২
আত্মসমর্পণ ও ভক্তিবিজ্ঞানের মর্মার্থ ২৮২
আপনবোধে স্বভাবপ্রেম সিদ্ধ ২৮২
অজ্ঞানের বিজ্ঞান ২৮৩
অজ্ঞান প্রকৃতির ক্রমবিকাশ ২৮৩
উর্ধ্ব প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য ২৮৩
সাধ্য বিকাশের বিজ্ঞানক্রম ২৮৩
সত্ত্বগুণের বিকাশের ফলে দৈবগুণের প্রকাশ হয় ২৮৩
সাধ ও সাধ্যের অতীত হল পরাসিদ্ধি ২৮৩
পরমসিদ্ধের ব্যবহার অপরে সমর্থন করে না ২৮৪
চরম ও পরম অবস্থা দুর্লভ হলেও অসম্ভব নয় ২৮৪
সাধারণত সাধকের কাছে পরাসিদ্ধি অজ্ঞাত ২৮৪
অনুরাগের পথে সচেতনতাই হল মহামিলনের পাথেয় ২৮৪
ভগবৎ সত্তা স্বতঃসিদ্ধ, স্বতঃস্ফূর্ত, স্বয়ংপ্রকাশ, সর্বতগ, মহান ২৮৪
অখণ্ডের দৃষ্টিই হল প্রেমের দৃষ্টি (ঋষি দৃষ্টি) ২৮৫
অখণ্ড একের দৃষ্টি সবার পক্ষে সম্ভব নয় ২৮৫
অভেদ ভাবনার তাৎপর্য ২৮৫
ভগবানের হাতের দিব্য অস্ত্রের গূঢ়ার্থ ২৮৫
মানুষের পক্ষে ভগবানকে পূর্ণ ভাবে জানা ও পাওয়ার সাধ ভেদজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত ২৮৫
ব্যষ্টি মনের দৃষ্টি হল সীমিত, সসীম ২৮৫
সর্ব সমর্পণ বিনা পূর্ণজ্ঞান হয় না ২৮৫
ঈশ্বরের করুণাই তাঁর সঙ্গে যুক্ত হবার শ্রেষ্ঠ উপায় ২৮৬

অহংকারের সাধনায় চিত্তশুদ্ধি হয় না এবং ঈশ্বরাত্মার সঙ্গে যুক্ত হওয়া যায় না ২৮৬
কোনও একটা ভাব ছাড়া ঈশ্বরের সাধনা হয় না এবং তাঁর দর্শনও পাওয়া যায় না ২৮৬
ভাব অনুসারে হয় সাধনা ও অনুভূতি ২৮৬
নিজেকে মাধ্যম করেই ঈশ্বর লীলা করেন ২৮৭
সৎসঙ্গের মাহাত্ম্য ২৮৭
ভগবৎকৃপা লাভের রহস্য ২৮৭
ভক্তির মাহাত্ম্য ২৮৭
পৃথক পৃথক সাধনার ফল পৃথক পৃথক ২৮৭
জীবনে পূর্ণতার সিদ্ধি পূর্ণতার মাধ্যমেই হয় ২৮৭
ছোট আমির (জীবের) পূর্ণতা অখণ্ড পূর্ণ আমির যোগেই হয় ২৮৮
ভক্তি ও জ্ঞান ভগবানেরই প্রকাশবিজ্ঞান ২৮৮
অবিদ্যাজাত জীবের অভিমান ও অহংকার নাশ হয় সাধনার মাধ্যমে ২৮৮
সৎসঙ্গের মাধ্যমেই সত্ত্বগুণের বিকাশ হয় ২৮৮
নিম্ন প্রকৃতি প্রবল হলে সৎসঙ্গ প্রিয় হয় না ২৮৮
আত্মসমর্পণের পরিণাম (ফলশ্রুতি) ২৮৮
প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উভয়েরই বৈশিষ্ট্য স্বতন্ত্র ২৮৮
মানুষের বিদ্যা অভ্যাসের ক্রমিক মান অনুসারে তার ফল লাভ হয় ২৮৯
ভগবানকে বিশ্বরূপে দেখা ও জানার অভ্যাসের ফলে সহজেই ইষ্টসিদ্ধি হয় ২৮৯
সমগ্র বিশ্বই হল ব্যষ্টির মূল ও পরিণাম ২৮৯
দ্বন্দ্বের উৎস নির্দ্বন্দ্ব, ভেদের উৎস অভেদ, বৈচিত্র্যের উৎস ঐক্যে বা সমতায় ২৮৯
সাধনার সিদ্ধির তাৎপর্য ইষ্ট দর্শন—অভেদ দর্শন ২৮৯
সাধনার প্রথমে ভেদ দর্শন, মধ্যে ভেদাভেদ এবং অন্তে অভেদ দর্শন ২৯০
সত্যস্বরূপের পরিচয় ২৯০
গতি বা লক্ষ্য এক, কিন্তু মত ও পথ বহু ২৯০
আপনতা ও স্বয়ংতাই স্বয়ং-এর পরিচয় ২৯০
তত্ত্ব শ্রবণের অভিনব তাৎপর্য ২৯১
সৎসঙ্গের মহিমা ২৯১
দিব্যজীবনে ভগবানের প্রকাশলক্ষণ ও তার সত্য প্রমাণ ২৯১
আত্মবিস্মৃতি সর্ব দুঃখের মূল ২৯১
ঈশ্বরের অনুগ্রহই আশ্রিত ভক্তের হৃদয়েতে সৎসঙ্গের গুরুত্ব ও মহিমা প্রকাশ করে ২৯১
আত্মবিস্মৃতির ফলে অবিদ্যা মায়ার জালে বদ্ধ হয় জীব ২৯২
নিষ্ঠার অভাব মায়ার বিলাস ছড়ায় ২৯২
নিষ্ঠার গুরুত্ব ও তাৎপর্য ২৯২
নূতন প্রজন্মের সমস্যাসকলের সমাধান নূতন ভাবেই হয় ২৯২
যুগে যুগে মহাপুরুষদের মাধ্যমেই যুগোপযোগী সত্যের প্রকাশ হয় ২৯২
সব সাধকের সিদ্ধির তাৎপর্য অপরিহার্য ২৯৩
সবার উপযোগী সত্যের বিধানও শাস্ত্রে আছে ২৯৩
সত্যই সত্যের পরিচয় ২৯৩
একে সত্য, বহুতে দ্বন্দ্ব ও মিথ্যা ২৯৪
একের অধীনে বহু, বহুর মূলে এক ২৯৪
বাইরে বৈচিত্র্য, অন্তরে দ্বৈত, কেন্দ্রে অদ্বৈত ২৯৪
মালার ফুলের মত এক ঈশ্বর সূত্রেই সব বৈচিত্র্য গাঁথা ২৯৪
অদ্বৈতের বক্ষেই দ্বৈতের বিলাস অদ্বৈতেরই আভাস ২৯৪
অবতারদের অভিনব জীবনের বৈশিষ্ট্য মানবসমাজকে নূতন ভাবে জাগিয়ে দেয় ২৯৪
জ্ঞানসিদ্ধি দুর্লভ হলেও ভক্তিসিদ্ধি দুর্লভ নয় ২৯৫
সৃষ্টির মধ্যে বাস করে স্রষ্টাকে অস্বীকার ও অমান্য করাই হল অজ্ঞানতার লক্ষণ ২৯৫
ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে জীবনের লক্ষ্যে পৌঁছান সম্ভব নয় ২৯৫
ঈশ্বরের স্বভাববিলাসই জীবজগৎ ২৯৫
মায়ের মহিমা শ্রবণ দ্বারাই মাতৃকরুণা লাভ হয় ২৯৫
ঈশ্বর দর্শনের ফলে অভিমান অহংকার নষ্ট হয়ে যায় ২৯৫
সমর্পণের পরিণাম কী? ২৯৬
অবতার পুরুষগণ অখণ্ডের দৃষ্টিতে সব দেখেন ও ব্যবহার করেন ২৯৬
ভগবানকে নিয়ে ভগবানের মধ্যে খেলতে হয়, ফলে বিশ্ব হয়ে যায় আপন ২৯৬
সাধুসঙ্গ/সৎসঙ্গের পরিণাম ২৯৬
অজ্ঞান প্রভাবে ব্যবহারদোষে সাধুদের কথাও তেমন কার্যকরী হয় না ২৯৬
মহাপুরুষদের সঙ্গ করলে দিব্য ভাবের অধিকারী হওয়া যায় ২৯৬

ক্ষণিকের জন্য সৎসঙ্গ সারাজীবন রাজত্ব ভোগ অপেক্ষা শ্রেয় ২৯৭
সৎসঙ্গের মাহাত্ম্য ২৯৭
শান্তি সংসারে নেই, ঈশ্বরেতেই আছে ২৯৭
সবার হৃদয়েতেই শান্তিস্বরূপ ঈশ্বর আছেন ২৯৭
স্বপ্রকাশ ঈশ্বর শুদ্ধচিত্তে অনুভূত হয় ২৯৭
ঈশ্বর-আত্মাই গুরুরূপে অন্তরে ও বাইরে সবকে চালিত করেন ২৯৮
আত্মগুরু প্রথমে শরণাগতির মাধ্যমে এবং পরে স্বানুভূতিরূপে শিষ্যের হৃদয়ে অভিব্যক্ত হন ২৯৮
ভাবশুদ্ধির পর স্বরূপে স্থিতি হয় ২৯৮
মানুষের মধ্যে ঈশ্বর নিজেকে প্রকাশ করেন স্বভাবের দিব্য রূপায়ণের মাধ্যমে ২৯৮
ঈশ্বর স্বয়ং স্বভাবে, স্ববোধে নিজের সঙ্গেই নিজে লীলা করেন ২৯৮
অবতার পুরুষ, মহাপুরুষ এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে অনুভূতির পার্থক্য ২৯৯
শান্তি মিশনের মাধ্যমে শান্তি আসে না, শান্তি আসে ঈশ্বরের কৃপায় ২৯৯
শান্তিস্বরূপ ঈশ্বরের মধ্যে বাস করলেই শান্তিলাভ ২৯৯
সর্ব চাওয়ার পরিসমাপ্তিতে হয় অহংকারের নাশ, অহংদেবের প্রকাশ ২৯৯
কাঁচা আমি অহংকার হল প্রকৃতিজাত, বিকারী ও পরিণামী কিন্তু পাকা আমি প্রকৃতিপতি, প্রভু, স্বামী, নিত্যমুক্ত, নির্বিকার, নিরাকার, অপরিণামী ৩০০
বিবেকসিদ্ধির পূর্ব পর্যন্ত স্বার্থবুদ্ধি ও ভেদজ্ঞান থাকে ৩০০
গুরু পূর্ণতার দিশারী ৩০০
ধ্যানের পরিণামে হয় চিত্তশুদ্ধি তার পরে হয় বিবেকসিদ্ধি ৩০০
প্রথম তিন প্রকার গুরুর পরিচয় ৩০০
ভগবৎ নামের সঙ্গে তার ভাব ও বোধের প্রত্যক্ষ যোগ প্রমাণসিদ্ধ ৩০০
ভক্তের অবলম্বন ৩০১
ঈশ্বর বিজ্ঞানের মর্মকথাই হল ঈশ্বর সৃষ্ট সর্ববস্তুর মধ্যেই স্বয়ং অনুস্যূত আছেন ৩০১
ঈশ্বরের পরিচয় ৩০১
সোনার সঙ্গে খাদ না-মেশালে যেমন গয়না হয় না, সেইরূপ জ্ঞানের সঙ্গে অজ্ঞান না-মেশালে জ্ঞানের ব্যবহার সম্ভব হয় না ৩০২
অনুভবসিদ্ধ পুরুষ ব্যতীত মানুষের মধ্যে অবিদ্যা অজ্ঞানের প্রভাবজনিত গোঁড়ামি থাকে ৩০২
নাস্তিক্য ও আস্তিক্য উভয়ই অজ্ঞানপ্রসূত ৩০২
ঈশ্বরের আত্মলীলার দিব্য বিজ্ঞান ৩০২
প্রবক্তা ও বক্তব্যের মাধ্যমেই মানুষ পরিণতি লাভ করে ৩০২
গুরুবাণীই হল মানুষের সর্বোত্তম রক্ষাকবচ ৩০৩
লাভ লোকসানের ঊর্ধ্বে হল perfection, অর্থাৎ পরমতত্ত্বে প্রতিষ্ঠা ৩০৩
সকলের সত্য পরিচয় ৩০৩
নিজ অতিরিক্ত কোন কিছু ভাবনা চিন্তা কামনা হল অজ্ঞান—তার ফল আত্মবিস্মৃতি ও দুঃখকষ্ট ৩০৩
হৃদয়েতে প্রত্যেকেরই পূর্ণতা নিহিত আছে—তার স্মরণ দ্বারাই তার পরিচয় জানা যায় ৩০৩
প্রবৃত্তির পথে আত্মবিস্মৃতি, সংসারদশা ও ভোগ, নিবৃত্তির পথে মুক্তি, শান্তি, আত্মস্থিতি ৩০৪
দোষদৃষ্টি হয় আত্মবিস্মৃতির ফলে ৩০৪
তত্ত্বের দৃষ্টিতে নিজের মধ্যে নিজের দ্বারা নিজেকেই পূর্ণরূপে জানা যায় ৩০৪
ভূমাই হল নিজের যথার্থ পরিচয় ৩০৪
সমগ্রতার দৃষ্টিতে ঈশ্বর অনুভূতি ৩০৪
জীবন সমস্যার সম্যক্ সমাধান ৩০৪
পূর্ণতাবোধের অন্তরায় ও তার বিকার-জনিত প্রতিক্রিয়া ৩০৫
প্রতিদিন ঐকান্তিক ভাবে বিশেষ প্রার্থনা করলে বিশেষ শুভ ফল পাওয়া যায় ৩০৫
অনন্ত অসীমের পরিবর্তে সসীমের সেবার ফলেই মানুষের দুঃখকষ্ট ৩০৫
মিথ্যার প্রভাবমুক্ত হওয়ার বিশেষ উপায় ৩০৫
প্রার্থনার মাধ্যমে পূর্ণ আত্মসমর্পণের বিধান ৩০৫
প্রার্থনার ফলশ্রুতি ৩০৬
জগন্মাতার কোলেই তাঁর শ্রেষ্ঠ সন্তানেরা পুষ্ট হয়ে চলেছে ৩০৬
ঈশ্বর-আত্মাকে বাদ দিয়ে মানুষের সর্ব সাধনার ফলই বিকারী ও পরিণামী ৩০৬
বিশেষ নির্দেশ ৩০৬

ঈশ্বরের কৃপালাভের জন্য প্রার্থনার গুরুত্ব	৩০৬
দেবতাগণই মানুষকে নিঃস্বার্থে দান ও কর্তব্যসাধনের বিজ্ঞান শিক্ষা দেন	৩০৬
বিশ্বপ্রকৃতির অনন্য মহিমা	৩০৭
প্রকৃতির পাঠাগারে শিক্ষা সমাপ্ত না-হলে পূর্ণতা লাভ হয় না	৩০৭
প্রকৃতির দেওয়া অহংকার প্রকৃতিকে ফিরিয়ে দিলেই মুক্তি	৩০৭
সর্পের তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য	৩০৭
কুণ্ডলিনী শক্তির বিশেষত্ব বা তাৎপর্য	৩০৮
তপস্যার তাৎপর্য বা আধ্যাত্মিক রহস্য	৩০৮
কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণ ও তার পরিণামে স্বভাবযোগ ও আত্মতত্ত্ব লাভ	৩০৮
গ্রন্থিভেদের রহস্য	৩০৮
কুণ্ডলিনীর জাগরণ ও গ্রন্থিভেদের পরিণাম	৩০৯
সাপের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা	৩০৯
বেদান্তবাদীর দৃষ্টি ও প্রেমিকের দৃষ্টির পার্থক্য	৩০৯
মায়ের প্রকাশসন্তান প্রথমে বৈচিত্র্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তার যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার পরিণামে মায়ের সঙ্গে মিশে এক হয়ে যায়	৩০৯
তত্ত্বানুভূতির ভিত্তিতে আত্মার ব্যাখ্যা	৩১০
সাপের কুটিল ক্রুর স্বভাবের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা এবং স্ব-স্বরূপানুভূতির রহস্য	৩১০
তন্ত্র বিজ্ঞানে সাপের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য	৩১০
তন্ত্রের আলোকে সাপের পরিচয়	৩১০
অজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য	৩১১
স্থূলতাদি ভেদে বস্তুর গুণ ও প্রকৃতির বিচার	৩১১
সত্তাশক্তির তাত্ত্বিক বিজ্ঞান	৩১১
শাক্ত ও বৈষ্ণবাদি মতবাদের ভিন্নতা আপেক্ষিক, অভিন্নতা মৌলিক	৩১১
অভেদ জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য	৩১১
মনসা শব্দের আধ্যাত্মিক রহস্য	৩১২
অধ্যাত্ম বিজ্ঞানে মনের পরিচয়	৩১২
স্বপ্ন ও ধ্যানের মাধ্যমে ভীতিপ্রদ দৃশ্য এবং মনোরম দৃশ্যের সঙ্গে সাময়িক ভাবে পরিচয় হলেও তার রহস্য কেবল আত্মবোধেই সিদ্ধ হয়	৩১২
মানবপ্রকৃতির জটিলতা এবং গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের বিজ্ঞানভিত্তিক বর্ণনা	৩১২
স্বপ্নের মাধ্যমে ষাঁড় আদি ভিন্ন ভিন্ন প্রাণী দর্শনের বিশেষত্ব	৩১২
সর্ব শব্দের মূলে যে নাদ তার মাহাত্ম্য বর্ণনা	৩১২
বৈচিত্র্যের মধ্যে একের সন্ধান হয় হৃদয়ের গভীরে	৩১২
সত্তাশক্তির অভিন্ন তত্ত্বের তাৎপর্য	৩১৩
ভাবমুখে থাকার তত্ত্বার্থ	৩১৩
মাতৃতত্ত্ব ও মাতৃমহিমা সর্বতোমুখী ও সর্বানুস্যূত	৩১৩
আমি ও আমার শব্দের নিগূঢ় তত্ত্ব	৩১৩
ঋষি শব্দের তত্ত্বার্থ	৩১৩
জগন্মাতার সঙ্গে তাঁর সন্তান যোগযুক্ত হয়েই আছে, শরণাগতির মাধ্যমেই তা অনুভবগম্য হয়	৩১৪
সত্যানুভূতির তাৎপর্য	৩১৪
সত্যের বক্ষেই মিথ্যা ভাসে, মিথ্যা মায়া অনন্তরূপিণী অসীমা মায়ের সান্ত সসীম ভাবাবেশ মাত্র	৩১৪
বিধবার তত্ত্বত কোনও বন্ধন নেই, কিন্তু ব্যবহারিক দৃষ্টিতে যে বন্ধন দৃষ্ট হয় তা বিধবা শব্দের পরিপন্থী	৩১৪
অখণ্ড আনন্দের অধিকারী কে?	৩১৪
পূর্ণ আমির পরিচয়	৩১৪
সাম্য অবস্থা সৃষ্টিশূন্য, অদ্বৈত—বিষম অবস্থা সৃষ্টি এবং দ্বৈত, বৈচিত্র্য	৩১৫
রাখী/ঝুলন পূর্ণিমার বৈশিষ্ট্য	৩১৫
সৃষ্টি তত্ত্বের রহস্য ঝুলন পূর্ণিমার অন্তর্নিহিত বিজ্ঞান	৩১৫
ঝুলনের মাধ্যমে সৃষ্টির মহিমা ব্যক্ত	৩১৬
নিরন্তর আত্মদানই মহাপ্রাণের ধর্ম	৩১৬
ঝুলনের অন্তরবিজ্ঞান ও তার বিজ্ঞাতার পরিচয়	৩১৬
তত্ত্ববিদের তত্ত্বকথা স্বানুভবসিদ্ধ ও মৌলিক	৩১৬
প্রত্যেকের সত্য পরিচয়	৩১৬
সৃষ্টির উপাদানসত্তা এক, কিন্তু তার প্রকাশভঙ্গিমা অনন্ত	৩১৭
সত্তার প্রকাশধারার মধ্যে বাহির-অন্তর ভেদে সর্ব বৈচিত্র্যের পরিণাম এক	৩১৭
প্রকাশধারার বহির্ভাগে নামরূপের ভেদ দৃষ্ট হলেও বোধের ঘরে তারা সবই অভিন্ন, এক	৩১৭
ঝুলন/রাখী পূর্ণিমায় রাখীবন্ধনের মর্মার্থ	৩১৭
অদ্বৈতের বক্ষে দ্বৈত ও নানাত্ববিলাসের মধ্যে পুনরায় অভেদ মিলনের প্রার্থনার ফলশ্রুতি	৩১৭

বেদনার মাধ্যমে বেদের পূর্ণাঙ্গ অভিব্যক্তির নিগূঢ় রহস্য ৩১৮
মিলনের বিজ্ঞান ৩১৮
সংসারে জন্ম-মৃত্যু, জরা-ব্যধি, দুঃখ-কষ্টের মধ্যে অমৃতময় অদ্বয় আত্মারই পরিচয় ব্যক্ত হয় ৩১৮
জ্ঞাতার অধীন হল জ্ঞেয় ৩১৮
একবোধে সব 'মেনে মানিয়ে চলা'ই হল রাখী পূর্ণিমার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ৩১৮
জীবনে অখণ্ডের স্মৃতি জাগলেই ব্যাকুলতার তীব্রতা পুনর্মিলন ঘটায় অখণ্ডের সঙ্গে ৩১৯
আত্মলীলায় ঈশ্বর বহু হয়েও এক ৩১৯
অবিদ্যার অভিমান অদ্বয় বোধের পরিপন্থী ৩১৯
জ্ঞানময় তপের মাধ্যমে বহির্মুখী প্রকাশে অদ্বৈতের দ্বৈতবিলাস, আবার অন্তর্মুখী প্রকাশে তার অদ্বৈতে নিবাস (স্থিতি) ৩১৯
অশান্তিময় জীবনে শান্তির সন্ধান মেলে মহাপুরুষদের কৃপায়, অন্য কোনও ভাবেই নয় ৩১৯
মহাপুরুষ ও অবতারপুরুষগণ জীবিতাবস্থায় মান পান না, দেহত্যাগের পরে তাঁদের নিয়ে কত মাতামাতি হয়, হয় কত কল্পনা, রচনা ৩১৯
আনন্দস্বরূপের বক্ষে তাঁর সমগ্র কারণ-কার্য প্রকাশে আনন্দই শুধু স্ফুরিত হয় ৩১৯
সমতার মধ্যে অসমতা হল কার্য এবং সমতা হল কারণ ৩২০
জীবন নদীর তরী, মাঝি, সওয়ারি ও গন্তব্যস্থলের তত্ত্বার্থ ৩২০
ব্যষ্টি জীবনের মাধ্যমে পরমাত্মার অভিনব লীলা খেলা ৩২০
অতীব রহস্যপূর্ণ কর্মের বিজ্ঞান, আত্মজ্ঞানে মেলে তার সমাধান ৩২০
জীবনের আদি-মধ্য-অন্তে ভেদ দৃষ্ট হলেও অভেদেই তার পরিসমাপ্তি ৩২০
অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে পিতামাতার তাৎপর্য ৩২০
সত্ত্বাদি তিনগুণের বৈশিষ্ট্য ৩২১
আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে মাতাপিতার সঙ্গে সন্তানের সম্বন্ধ ৩২১
ঋষি শব্দের তত্ত্বার্থ (১) ৩২১
অখণ্ড বোধস্বরূপে পরিণত হওয়ার অন্যতম উপায় ৩২২
ঋষি ও ষোড়শী শব্দের তত্ত্বার্থ (২) ৩২২
ষোড়শীর মর্মার্থ ৩২২
ঋষি শব্দের তত্ত্বার্থ (৩) ৩২২
স্বানুভূতির দৃষ্টিতে মাতাপিতা ও সন্তানের পরিচয় ৩২২
ঋষিদৃষ্টিতে বোধ ও মুক্তির বিশ্লেষণ ৩২৩
ত্যাগ-বৈরাগ্য ও মুক্তির তাৎপর্য ৩২৩
সব মতপথই ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত, তাদের মধ্যে ব্যবহারিক ভেদ দৃষ্ট হলেও মূলত কোন ভেদ নেই ৩২৩
অহংকার ত্যাগই হল আসল ত্যাগ, আর সব ত্যাগই হল গৌণ ও অবান্তর ৩২৩
কর্তাবোধে ভোগ ও বন্ধন, অকর্তাবোধে ভক্তি ও মুক্তি ৩২৩
বৈরাগ্যের লক্ষণ ৩২৪
ব্যষ্টি প্রাধান্যের ইচ্ছা ও চেষ্টাই হল অশান্তির কারণ ৩২৪
মুক্তি অপেক্ষা মহামুক্তি শুধু শ্রেয়ই নয়, সর্ব সমাধান তা-ই ৩২৪
কাঁচা আমি মুক্তি চায়, পাকা আমি নিত্যপূর্ণ—তাতেই মহামুক্তি ৩২৪
সাক্ষী দ্রষ্টা হয়ে থাকাই মহামুক্তির লক্ষণ ৩২৪
সহজ যোগ কাকে বলে? ৩২৪
'পুরুষোত্তমের আমি'র তাৎপর্য ৩২৫
সত্যের সত্য পরিচয় ৩২৫
ভূমাবোধের লক্ষণ ৩২৫
খণ্ডবোধে ভেদের বাহার, অখণ্ডবোধে ভেদের সমাহার ৩২৫
পূর্ণতাই সমতা, সমতাই হল সমাধান ৩২৫
শব্দের পরিচয় শব্দবোধেই হয়, অন্য বোধে নয় ৩২৫
সত্য এক কিন্তু মতপথ অনন্ত ৩২৬
অহংকারের উদয়ে মিথ্যার উদয়—অহংকার লয়ে মিথ্যার লয়, সত্যের জয় ৩২৬
সমানে মুক্তি ও ভগবান—অসমানে ভোগবন্ধন, শয়তান ৩২৬
অহংকারের মাধ্যমে শাস্ত্র ব্যাখ্যা হয়, অহংকার নাশে স্বানুভূতির প্রকাশ হয় ৩২৬
সর্বপ্রকার যোগ সাধনার পরিণামে মনের শোধন, মনোনাশ, মনোলয় হয়—ফলে ঈশ্বর-আত্ম-ব্রহ্মবোধে প্রতিষ্ঠিত হয় ৩২৬

মতবাদের ভেদ থাকলেও সত্যানুভূতি ভেদাতীত ৩২৭
মনেতেই অজ্ঞানের বিকার হয়, বোধস্বরূপ আত্মা সর্ব বিকারমুক্ত ৩২৭
ব্যবহারিক জীবনের সর্বপ্রকার ভেদ পার্থক্যের মূলে একই বোধাত্মা যা পরমসিদ্ধিরূপে জীবনে প্রকাশ পায় ৩২৭
মানুষের অধীন নয় ঈশ্বর, ঈশ্বরের অধীন মানুষ এবং সর্বসৃষ্টি ৩২৭
যোগ্যতা অনুসারে সাধনার পথ সবার ভিন্ন হলেও সমাপ্তি সবার পরম ঐক্যে ৩২৭
সমর্পণ যেখানে যে-ভাবেই হোক, নিঃশর্ত হলেই পূর্ণ ফলপ্রদ হয় ৩২৭
অহংকারের আমির উদয়াস্ত আছে কিন্তু অহংদেবের আমি স্বতঃসিদ্ধ, স্বতঃস্ফূর্ত ৩২৮
পূর্ণের আমির পরিচয় ৩২৮
পূর্ণ আমির সেবক হয়ে চলাটাও আত্মসমর্পণের অন্তর্ভুক্ত বিজ্ঞান ৩২৮
যা-কিছু ঘটে চলেছে সব কারণ-কার্য, কার্য-কারণ সম্বন্ধ ধরেই ৩২৮
ঋষিদের অনুশাসন মেনেই আশ্রমবাসীগণ তাদের শিক্ষা ও সাধনলক্ষ্যে পৌঁছাত ৩২৮
অখণ্ডের সঙ্গে নিত্যযুক্ত ভাবনার দ্বারা মনের দিব্যরূপায়ণ ৩২৯
পূর্ণের আমিবোধে থাকার লক্ষণ ৩২৯
আত্মপ্রত্যয়ের মাধ্যমেই আত্মবোধে প্রতিষ্ঠা সিদ্ধ হয়, নতুবা নয় ৩২৯
সংসারে মানুষ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি নামক দুটি পৃথক ভাবধারাতে চলে ৩২৯
সংসারে মানুষের মধ্যে দুই শ্রেণী আছে যথা, আস্তিক্য বুদ্ধিযুক্ত ঈশ্বরবিশ্বাসী এবং নাস্তিক্য বুদ্ধিযুক্ত ঈশ্বরবিরোধী ৩৩০
নাস্তিক্য বুদ্ধির বৈশিষ্ট্য ৩৩০
নাস্তিক্য বুদ্ধির ব্যবহারিক লক্ষণ ৩৩০
আস্তিক্য বুদ্ধির ব্যবহারিক লক্ষণ ৩৩০
শুদ্ধসত্ত্বগুণী সাধকের পরিচয় ৩৩০
প্রকৃতি শক্তির আবর্তন ও বিবর্তনের পরিচয় ৩৩১
নাস্তিক্য বুদ্ধির ব্যবহারের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ ৩৩১
আস্তিক্য বুদ্ধির ব্যবহারের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ ৩৩১
সর্ববোধের মাধ্যমেই স্ববিরুদ্ধ ভাববোধের সমাধান সিদ্ধ হয় ৩৩১
প্রজ্ঞাস্থিতি ও স্থিতপ্রজ্ঞের ব্যবহারিক লক্ষণ ৩৩১
কর্মবন্ধন হতে মুক্তির উপায় ৩৩১
ইষ্টের সঙ্গে যোগযুক্ত থাকার বিশেষ উপায় ৩৩২
আস্তিক্য বুদ্ধির উৎকর্ষ লাভের উপায় ৩৩২
আস্তিক্য বুদ্ধির পরিণামে আসে সমত্ববোধে বা আত্মবোধে প্রতিষ্ঠা ৩৩২
আকাশচারী পাখির সঙ্গে ঈশ্বরে সমর্পিত জীবনের তুলনামূলক বিশ্লেষণ ৩৩২
ক্রমবিবর্তনের বিজ্ঞান অনুসারে জীবনের অধ্যাত্ম বিকাশের পরিচয় মেলে ৩৩২
সব রকম গোঁড়ামি মুক্তিপথের পরিপন্থী ৩৩২
পরস্পরবিরোধী ভাব ও অবস্থার মধ্যে স্থিতপ্রজ্ঞ হয়ে থাকার বিশেষ উপায় ৩৩৩
মহাপ্রাণরূপী ঈশ্বরেতে মনোনিবেশ করার ফলে স্ববিরুদ্ধ অবস্থাগুলি আর থাকে না ৩৩৩
সর্ববস্তুকেই ঈশ্বরের নামে 'মেনে মানিয়ে চললে' স্বাত্মবোধে প্রতিষ্ঠা হয় ৩৩৩
অখণ্ড সত্যের ব্যবহার দ্বারাই অখণ্ড সত্যের অনুভূতি সিদ্ধ হয় ৩৩৩
নাস্তিক্যবাদ কী? ৩৩৩
মানা ও জানার প্রসঙ্গ ৩৩৩
কাম ও নিষ্কাম প্রসঙ্গ ৩৩৪
খণ্ড চাওয়া ও অখণ্ড চাওয়ার বৈশিষ্ট্য ৩৩৪
পূর্ণকে ও অখণ্ডকে পূর্ণ ও অখণ্ডবোধে গ্রহণ করলে, মানলেই পূর্ণতাবোধ হয়, নতুবা নয় ৩৩৪
অতীত ও বর্তমানের মধ্যে বোধের ব্যবহারের পার্থক্য ৩৩৪
মিথ্যা অজ্ঞান খণ্ড ও দ্বৈতবোধের লক্ষণ ৩৩৪
সত্যের পরিচয় অখণ্ড, খণ্ড নয় ৩৩৫
অন্তর-বাহির ভেদে সত্যের পরিচয় ৩৩৫
অখণ্ড পূর্ণ বিশ্বাসের ফল অখণ্ড, পূর্ণ এবং খণ্ড বিশ্বাসের ফল খণ্ড ও অপূর্ণ ৩৩৫
কামনা অনুরূপ সিদ্ধি হয়, পূর্ণ সমর্পণের পর আর কামনা থাকে না ৩৩৫
সকামে বিকার, নিষ্কামে নির্বিকার ৩৩৫
ঈশ্বরকে অবলম্বন করে চিন্তা ও কর্মেতে অভাব থাকে না, কিন্তু বিষয়ের অবলম্বনে ৩৩৬

তাতে অভাবই প্রাধান্য পায়
মুক্তিলাভের অন্যতম উপায় ৩৩৬
ভগবান ও জীব মূলত অভিন্ন হলেও ব্যবহারে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে ৩৩৬
মুক্তপুরুষদের বৈশিষ্ট্য ৩৩৬
মুনিদের অপেক্ষা ঋষিরা শ্রেষ্ঠ, ঋষিদের মধ্যেও স্তরভেদ আছে ৩৩৬
সত্যদর্শন ও ঈশ্বরোপলব্ধির অন্যতম উপায় ৩৩৬
সমবোধে স্থিতির বৈশিষ্ট্য ৩৩৬
অনীশ্বরীয় ও ঈশ্বরীয় ভাববোধের দৃষ্টিতে সাম্যবাদের বিশ্লেষণ ৩৩৭
সমত্ববোধের তাৎপর্য ৩৩৭
হৃদয়বৃত্তির বৈশিষ্ট্য ৩৩৭
পশুজীবন থেকে ঈশ্বরীয় জীবনে উত্তরণের বিজ্ঞান ৩৩৮
প্রাণের ধারণার তাৎপর্য অনুসারে তার পরিণামের তারতম্য হয় ৩৩৮
সীমার সাধনা অনীশ্বরীয় বোধে হয়, ভূমার সাধনা হয় ঈশ্বরীয় বোধে ৩৩৮
ব্যষ্টিবোধে অপূর্ণতা, সমষ্টিবোধে ও তদূর্ধ্বে হয় পূর্ণতা ৩৩৮
খণ্ডবোধে হয় কামনা-বাসনা, অখণ্ডবোধে তার অভাব ৩৩৮
সমত্বের মর্মার্থ ৩৩৯
'আমার আমি' বোধের পরিণামে মৃত্যু, 'ভূমা আমি' বোধে অমৃতত্ব ৩৩৯
ভূমাবোধে অমৃতময় মহাপ্রাণের সঙ্গে হয় মিলন বা ঐক্য ৩৩৯
সমর্পনের বিজ্ঞান ৩৩৯
প্রণবের রহস্য ৩৩৯
মহাপুরুষদের কথার মাহাত্ম্য ৩৩৯
অহংকারের পরিণাম ৩৪০
ঈশ্বরের স্মরণ মননের মাহাত্ম্য ৩৪০
আহার্য গ্রহণের উদ্দেশ্য ৩৪০
মহাপুরুষদের স্বভাবের বৈশিষ্ট্য ৩৪০
আহার শুদ্ধির তাৎপর্য ৩৪০
মানুষের সত্য পরিচয় ৩৪১
অহংকার ব্যবহারের ফলে কী হয়? ৩৪১
দেহের আহার ও বোধের আহার সম্পূর্ণ ভিন্ন ৩৪১
জ্ঞান-বিজ্ঞানের যথার্থ অনুশীলনের ফলে জীবনের পরম লক্ষ্যে পৌঁছান সম্ভব ৩৪১
জীবনের চরম লক্ষ্যের পরিচয় ৩৪১
মুক্ত আত্মার জীবন বন্ধনের কারণ ৩৪১
অশুদ্ধ ও শুদ্ধ উভয়বিধ আহারের ফলাফল ৩৪২
মহাপ্রাণের বক্ষে তার প্রকাশবিজ্ঞানের ফলশ্রুতি ৩৪২
শান্ত মনই শুদ্ধ মন, শুদ্ধ মনের প্রার্থনা কেমন? ৩৪২
পূর্ণ আত্মার 'আমি'র ত্রিবিধ পরিচয় ৩৪২
বিশ্বাসের মর্মার্থ ৩৪৩
ভক্ত যোগী জ্ঞানীর বৈশিষ্ট্য ৩৪৩
দিব্য জ্ঞান ও দিব্য প্রেমের বৈশিষ্ট্য ৩৪৩
কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে সর্বনাশের বিনিময়ে শ্রীগীতার প্রকাশ ৩৪৪
জ্ঞানী, যোগী ও ভক্তের পরস্পরের সাধন ভিন্ন হলেও তাদের সিদ্ধির মূল এক ৩৪৪
অবিদ্যাজাত সংশয় হল সাধন-সিদ্ধি পথের অন্তরায় ৩৪৪
ভক্ত ও ভগবানের সম্বন্ধ ৩৪৪
ঈশ্বরের নামের মাহাত্ম্য ৩৪৪
ভাব-ভক্তি ভগবানের সঙ্গে অভিন্ন ৩৪৫
ভাবশুদ্ধি না-হলে ভাবের বিকার হয় ৩৪৫
নিচুর কাছে নিচু হতে ভগবানই জীবন দিয়ে শেখান ৩৪৫
যথার্থ ভক্তকে অনেকেই মানতে পারে না ৩৪৫
ভক্তের দায়িত্ব ভগবানই নেন ৩৪৫
মতবাদের গোঁড়ামি সত্যানুভূতির অন্তরায় ৩৪৫
ত্যাগের রহস্য ৩৪৬
সান্তবুদ্ধি অনন্ত ঈশ্বরাত্মাকে জানতে পারে না, কিন্তু মানতে পারে ৩৪৬
চিত্তশুদ্ধি না-হলে সমাধিসিদ্ধি হয় না ৩৪৬
চিত্তশুদ্ধির তাৎপর্য ৩৪৬
এক ঈশ্বরীয় শক্তির ত্রিবিধ ব্যবহারিক পরিচয় ৩৪৬
এক ঈশ্বরের সাকার নিরাকার ভেদে দ্বিবিধ পরিচয় ৩৪৬
অখণ্ড রূপ-নাম-ভাবের ধারণা ও ব্যবহারের দ্বারা জীবন অখণ্ড স্বরূপের সঙ্গে একীভূত হয়ে যায় ৩৪৭
সৎসঙ্গের মাধ্যমেই সচ্চিদানন্দস্বরূপের সত্তা প্রকাশিত হয় ৩৪৭
অর্থ ও পরমার্থের ব্যবহার সিদ্ধ হয় অখণ্ডবোধে, খণ্ডবোধে নয় ৩৪৭

সৎসঙ্গের মাহাত্ম্য ৩৪৭
দ্বৈতবোধে হয় ভীতি ও ভ্রান্তি, অদ্বৈতবোধে তার হয় অবসান ৩৪৭
সৎসঙ্গের তাৎপর্য ৩৪৭
সমবোধে বা সাক্ষীবোধে অন্তরে বাইরে সবকিছু 'মেনে মানিয়ে চলাই' হল সর্ব সাধনার সার ৩৪৮
সমসার দৃষ্টিতে সংসারকে মানতে পারলেই পরাসিদ্ধি লাভ হয় ৩৪৮
অহংকারের সীমার দৃষ্টিতে অসীমকে সসীম দেখায়, গুরুবাণী অনুসারে চললে সীমার মধ্যে অসীমের প্রকাশ হয় ৩৪৮
প্রবৃত্তির পথে হয় বৈচিত্র্যের প্রকাশ, নিবৃত্তির পথে হয় বৈচিত্র্যের নাশ ৩৪৮
অনাত্মার সঙ্গ ও প্রভাবে আত্মার জীবদশাপ্রাপ্তি হয়, আবার আত্মগুরুর সঙ্গ ও অনুগ্রহে জীবের আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠা হয় ৩৪৮
অখণ্ড চিদানন্দ সত্তাই ব্যক্তি ও নৈর্ব্যক্তিক রূপে অভিব্যক্ত হয় ৩৪৮
চিদানন্দস্বরূপ ঈশ্বরাত্মা সর্বপ্রকাশের প্রকাশক ৩৪৯
সত্যের মূল হল হৃদয়ে, বাইরে তার প্রকাশ-আভাস ৩৪৯
শাশ্বত শান্তির সত্য পরিচয় ৩৪৯
সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরাত্মার সগুণ নির্গুণ দ্বিবিধ স্বভাব ৩৪৯
দৃশ্যের স্বরূপ জড় হলেও দ্রষ্টার স্বরূপ চৈতন্যময় ৩৪৯
জ্ঞানসিদ্ধ মহাপুরুষের সান্নিধ্যেই অপরেও জ্ঞানসিদ্ধ হয় ৩৪৯
ক্রমবিবর্তনবাদের বিজ্ঞান স্থূল দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না, স্ববোধের দৃষ্টিতে তা হৃদয়েতে অনুভূত হয় ৩৪৯
সৎসঙ্গের গুরুত্ব অপরিহার্য ৩৫০
সমানে শান্তি, অসমানে শান্তি ও অশান্তি ৩৫০
ভেদজ্ঞান থেকেই হয় ভীতির জন্ম, অভেদ জ্ঞান অভী করে দেয় ৩৫০
সুখী লোকেরা দুঃখীর দুঃখ বোঝে না, বুঝতেও চায় না ৩৫০
ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে পরস্পরবিরোধী স্বভাব ৩৫০
প্রাচুর্য ও অভাব উভয়ই পক্ষান্তরে শান্তির অন্তরায় ৩৫০
ঈশ্বরভিত্তিক যেই দেশের আদর্শ ও সংস্কৃতি সেই দেশই যথার্থ শান্তির ধারক ও বাহক ৩৫০
শান্তি সাধনার বিজ্ঞান স্বতন্ত্র ৩৫১
সিদ্ধিলাভের রহস্য ৩৫১
শুদ্ধভক্ত গুরুকৃপায় ঈশ্বরাত্মার উপলব্ধি পায় ৩৫১
ভাবের ঘরে চুরি না-করে শুদ্ধ ভাবের আচরণ দ্বারাই নিজের মুক্তি এবং অপরের মুক্তিও সম্ভব হয় ৩৫১
শুদ্ধ বুদ্ধির মধ্যেই সত্যের প্রকাশ হয়, স্ববোধে সব 'মেনে মানিয়ে চলার' মাধ্যমে বুদ্ধি শুদ্ধ হয় ৩৫১
প্রাণ ধরে সাধনাই সহজতম ৩৫১
শান্তিলাভের উপায় মেনে চললেই শান্তিলাভ হয় ৩৫১
মন, মুখ ও কাজ একসুরে হলেই সিদ্ধিলাভ হয় ৩৫২
ইষ্টনিষ্ঠা ও নির্ভরতাই হল পরম সিদ্ধিপ্রদ ৩৫২
যথার্থ ব্যবহারের মাধ্যমে জীবনের দিব্য রূপায়ণ হয় ৩৫২
দৃশ্যবোধে অজ্ঞানে বাস, দ্রষ্টা-সাক্ষীবোধে অজ্ঞানের বিনাশ ৩৫২
ঈশ্বরবোধে সব 'মেনে মানিয়ে চললে' এবং তাঁর উপর নির্ভর করলে অজ্ঞানমুক্ত হওয়া যায় ৩৫২
বিশ্বাসের তাৎপর্য ৩৫২
শ্রদ্ধার তাৎপর্য ৩৫৩
জগতে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের তত্ত্ববিজ্ঞান ৩৫৩
সৃষ্টির মূল সত্তার পরিচয় সাধনার মাধ্যমে সিদ্ধ হয় ৩৫৩
ঈশ্বর হলেন মৌলিক সত্তা, মিশ্র বা যৌগিক সত্তা নয় ৩৫৩
মৌলিক সত্তার বুকে নাম, রূপ কল্পিত— ইন্দ্রিয়ে বিষয় ৩৫৪
ঈশ্বরপ্রসঙ্গ অনধিকারীর কাছে শুনলে বিভ্রান্তি হয়, অনুভবসিদ্ধদের কাছে শুনলে বিভ্রান্তি কাটে, বিশ্বাস দৃঢ় হয় ৩৫৪
মানুষের জন্মজন্মান্তরের সংস্কারাদি প্রাণ থেকে উঠে প্রাণের মধ্যেই সঞ্চিত থাকে, এগুলি ঈশ্বরাত্মবোধের অন্তরায় ৩৫৪
ভগবান হলেন অখণ্ড প্রাণচৈতন্য, বহু সাধনা ও তপস্যার মাধ্যমে প্রথমে হৃদয়েতে তাঁর উপলব্ধি হয় পরে বাইরেও হয় ৩৫৪
সিদ্ধকে অনুসরণ করেই অপরে সিদ্ধ হয়, সিদ্ধগুরুর মহিমাকীর্তনই যথার্থ গুরুদক্ষিণা ৩৫৪
স্বানুভবসিদ্ধ পুরুষ তাঁর স্বানুভূতির বিজ্ঞান ব্যক্ত করে যান অপরের জন্য ৩৫৪

অন্তরাত্মাই গুরু—তিনিই স্বয়ং সাধ্য, সাধক, সাধন ও সিদ্ধি পরম ৩৫৫
প্রাণ ও মনের ঐক্যে সিদ্ধি, অনৈক্যে দ্বন্দ্ব-বিরোধ ৩৫৫
মন ও প্রাণের সম্বন্ধ মূলত অভিন্ন, বুদ্ধিদোষে ভিন্ন মনে হয় ৩৫৫
অন্তরপ্রাণ হল বোধসত্তা, তার সেবা ও ধ্যানের ফলে তার সঙ্গে অভেদে যুক্ত হওয়াই হল জীবন্মুক্তি ৩৫৫
সব সাধনাই প্রাণচৈতন্যের সঙ্গে অভেদে মিলনের সাধনা ৩৫৫
গৌণপ্রাণ ও মুখ্যপ্রাণ ৩৫৫
মুখ্যপ্রাণের সেবায় গৌণপ্রাণ মুখ্যপ্রাণে মিশে যায়, তার ফলে হয় জীবন্মুক্তি ৩৫৬
মুখ্যপ্রাণের সঙ্গে অভেদে মিলনের প্রার্থনা জীবন্মুক্তির অন্যতম সাধনা ৩৫৬
চাওয়া-পাওয়া উভয়ই অপূর্ণতার লক্ষণ ৩৫৬
ব্যাকুলতার তীব্রতা অনুসারে প্রার্থনা পূরণ করে অন্তরপ্রাণ ৩৫৬
নিত্যপূর্ণের বক্ষে চাওয়া-পাওয়া সবই অবিদ্যাজনিত কল্পনা ৩৫৬
ভক্তের বোঝা ভগবান বয়, এ-ই সত্যের পরিচয় ৩৫৭
জাগতিক বিদ্যা ও আত্মবিদ্যার মধ্যে পার্থক্য ৩৫৭
প্রাণচৈতন্য ও মনের কাজের মধ্যে পার্থক্য ৩৫৭
ভোগ নিবৃত্তির উপায় ৩৫৭
সাধুসঙ্গের মাধ্যমেই সদ্ভাব ও সদ্বোধের প্রকাশ ও বিকাশ হয় ৩৫৭
সদ্‌গুরুর অধিষ্ঠান ও কার্যাদির মূল কেন্দ্রই হল হৃদয় ৩৫৭
আত্মারামের লীলাভিনয় স্বভাবে ও স্ববোধে নিত্য সাধিত হয় ৩৫৮
আপনবোধে হৃদয়েতেই হয় ঈশ্বরাত্মার বোধোদয় ৩৫৮
ঈশ্বরাত্মার বিস্মৃতিই হল আসল দুঃখ, অন্য সব দুঃখ গৌণ ৩৫৮
পূর্ণ সমর্পণের মাধ্যমেই আত্মস্মৃতির জাগরণ হয় ৩৫৮
ভক্ত, যোগী ও জ্ঞানীর দৃষ্টিতে ঈশ্বরই স্বয়ং প্রভু ও বিভু, অন্য কেউ নয় ৩৫৮
নিম্ন প্রকৃতি স্বতন্ত্র নয়, দিব্য ঈশ্বরপ্রকৃতির অধীন, এ-ই মুক্তির বিজ্ঞান ৩৫৮
ঈশ্বরীয় বোধে জীবনযাপনের তাৎপর্য ৩৫৮
চাওয়ার মৌলিক তত্ত্ব ৩৫৯
সদ্‌গুরুর অনুশাসন লঙ্ঘন করে ইচ্ছামত কোনও সাধনাই সফল হয় না—ফল বিপরীত হয় ৩৫৯
পূর্ণ আত্মসমর্পণের ফলসিদ্ধি হল দিব্যজীবন লাভ ৩৫৯
যিনি অন্তর্যামী তিনিই জগতের নিয়ন্তা ৩৫৯
ভক্তিসাধনার ফলসিদ্ধি ৩৫৯
দিব্যজীবন লাভের সাধনা ৩৫৯
দ্বৈতবোধে পূর্ণতা সিদ্ধ হয় না ৩৫৯
ভক্তিসিদ্ধিতে অভিমান অহংকার সুসংযত ও মার্জিত হয়ে যায় ৩৫৯
আত্মসমর্পণের ফলে অহংকার ইষ্ট-গুরু-মাতাই স্বয়ং ব্যবহার করেন ৩৬০
অহংকার অভিমানের ব্যবহারে বিকার বাড়ে, নাশ হয় না ৩৬০
সত্যানুভূতি অদ্বৈতবোধে হয়, দ্বৈতবোধে নয় ৩৬০
সত্যানুভূতিতে আমি-তুমি, ইহা-উহা, অস্তি-নাস্তি প্রভৃতি কল্পনার অবকাশ নেই ৩৬০
অহংকার মাকে জানেও না মানেও না ৩৬০
পূর্ণ সাত্ত্বিক ও দৈবভাবের মাধ্যমেই ঈশ্বরের প্রকাশ অভিব্যক্ত হয় ৩৬১
নানাত্ব বহুত্বই হল জীববোধের লক্ষণ ৩৬১
পূর্ণ সমর্পণের ফলে আর দ্বন্দ্ব-বিরোধ থাকে না, ইষ্টস্ফূর্তি বা অদ্বৈতানুভূতি হয় ৩৬১
চিত্তমূলে কারণ সন্ধান দ্বারাই চিত্তবিকার প্রশমিত ও শান্ত হয়, শান্তচিত্তই হল শুদ্ধচিত্ত যার মাধ্যমে ঈশ্বরাত্মার প্রকাশ বিকাশ স্বতঃসিদ্ধ হয় ৩৬১
প্রকৃতির বৈচিত্র্যময় প্রকাশের মূলে যে এক সত্য নিহিত আছে তা তপস্যার মাধ্যমে মানুষ আপন হৃদয়ের গভীরে স্ববোধে অনুভব করে ৩৬১
ঋষিদের তপস্যার ফলে স্বহৃদয়ে ভূমা এক চিদানন্দসত্তার সাক্ষাৎ দর্শন পেয়েছেন, তাঁকেই তাঁরা ব্রহ্ম, আত্মা নামে অভিহিত করেছেন ৩৬১
সাধকের পরিচয় ৩৬২
অখণ্ডবোধের অনুভূতিই পরাসিদ্ধি ৩৬২
খণ্ড খণ্ড অনাত্মাবোধের প্রভাব অখণ্ড একাত্মবোধে লয় হয়ে যায় ৩৬২
জীবের হৃদয়ে পরমাত্মা স্বয়ং বিরাজিত, তথাপি স্ববুদ্ধিদোষে সে আত্মবিস্মৃত ৩৬২

উনত্রিশ

"সবার উপরে মানুষ সত্য"—এর অর্থ মানুষই দিব্য অমৃত আত্মবোধের অধিকারী ৩৬২
অনুভবসিদ্ধ আত্মজ্ঞ পুরুষের সঙ্গ প্রভাবে জীবের জীবত্ব নাশ হয়ে শিবত্বে প্রতিষ্ঠা হয় ৩৬২
আত্মবিজ্ঞানের মাধ্যমে জড়বিজ্ঞানের পরিপূর্ণতা সিদ্ধ হয় ৩৬৩
আত্মজ্ঞানের মাধ্যমে আত্মজ্ঞানের বিকাশে সর্বজ্ঞান-বিজ্ঞানের সমাধান ৩৬৩
আত্মজ্ঞ মহাপুরুষের কৃপায় ও স্বকীয় অনলস প্রচেষ্টায় বস্তুবাদী লোক কী ভাবে আত্মবাদী হয়? ৩৬৩
বহির্বিশ্বের বৈচিত্র্যের ধারণা অন্তরবোধের মাধ্যমে সিদ্ধ হয়ে পরিণামে আত্মবোধে পর্যবসিত হয় ৩৬৩
ভারতের জীবনাদর্শের বৈশিষ্ট্য একত্ববোধ/সমত্ববোধ, তার যথার্থ ব্যবহারের মাধ্যমেই সাম্যবাদ সিদ্ধ হয়, অন্যথা নয় ৩৬৩
মনোধর্ম সর্বতোভাবেই আত্মবিরোধী, কিন্তু আত্মধর্ম পরামুক্তি ও শান্তিভিত্তিক ৩৬৩
একাত্মবোধই হল জীবনের সমগ্র দ্বন্দ্ব-বিরোধের অবসান ও শান্তি প্রতিষ্ঠার মহৌষধ ৩৬৪
অখণ্ড বোধই ঈশ্বরাত্মা বোধ, সেই বোধে সংসারে বাস করে নির্বিকার, অনাসক্ত ও মুক্ত থাকা যায় ৩৬৪
সমত্ববোধের সাধনা সবার পক্ষেই সম্ভব, কেবল সৎসঙ্গের সঙ্গে যোগাযোগের প্রয়োজন ৩৬৪
চিত্তের মাধ্যমেই চিৎস্বরূপ আত্মার প্রকাশ-বিকাশ হয়, মাধ্যমের দোষে আত্মা জীবদশা প্রাপ্ত হয়, চিত্তের দোষ কাটে চিদাত্মার স্মৃতির মাধ্যমে ৩৬৪
অখণ্ড আত্মস্বরূপের বক্ষে খণ্ড দৃষ্টি হল অজ্ঞানতা, অখণ্ড দৃষ্টি হল জ্ঞানসত্তা ৩৬৪
মনের বোধে না-চলে বোধের মনে চলাই সহজ যোগ, বোধের বোধে চলা হল পরাসিদ্ধি ৩৬৫
মনের বোধে বন্ধন, সমবোধে বা একবোধে হচ্ছে মুক্তি বা আত্মপ্রতিষ্ঠা ৩৬৫
মলিনচিত্তে আত্মভাবনা হয় না, শুদ্ধচিত্তে আত্মা অতিরিক্ত কোনও ভাবনা আসে না ৩৬৫
চিত্ত শুদ্ধ হয় সৎসঙ্গের প্রভাবে ও সদাচারের মাধ্যমে, তার ফলে আত্মার ধ্রুবাস্মৃতি জেগে ওঠে ৩৬৫
আত্মপ্রসঙ্গ শ্রবণই হল মঙ্গল, কল্যাণ, মুক্তি—অনাত্মার কথা হল দুঃখ-কষ্ট, ব্যথা-বেদনা ৩৬৫
তাপের দ্বারা চিত্তের প্রসারণ হয়, আরাম ভোগের দ্বারা চিত্তের সঙ্কোচন হয় ৩৬৫
সর্ববিধ প্রতিকূল অবস্থাকে অনুকূলে সমান গ্রহণ করলে বা মেনে নিলে অতি সহজেই বিকারমুক্ত হওয়া যায় ৩৬৫
আত্মবোধে মনের সমস্ত বিরুদ্ধ ধর্মগুলি সমত্বে মিশে যায় ৩৬৬
সর্বশূন্য তত্ত্বের তাৎপর্য ৩৬৬
বিভিন্ন অভিব্যক্তির মধ্যে এক তত্ত্বই পূর্ণ ভাবে নিহিত আছে ৩৬৬
আত্মবক্ষে আত্মলীলা দ্বৈতবোধে শুরু হয়ে অদ্বয়বোধে পরিসমাপ্ত হয় ৩৬৬
সমত্বের পূর্ণস্থিতিই হল আসল একত্ব বা সমত্ব ৩৬৬
এক তত্ত্বের দ্বিবিধ প্রকাশ—সবেতে এক, একেতে সব ৩৬৬
খণ্ড বোধে খণ্ড সিদ্ধি, অখণ্ড বোধে অখণ্ড সিদ্ধি ৩৬৭
ব্রহ্ম ও জগৎ অভিন্ন তত্ত্ব—প্রজ্ঞানের বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের প্রজ্ঞান ৩৬৭
মনের বোধে জগৎ, বোধের মনে ঈশ্বর, বোধের বোধে ব্রহ্ম আত্মা স্বয়ং ৩৬৭
আত্মার স্বকল্পিত কল্পনাই হচ্ছে অবিদ্যা মায়া, কল্পনাশূন্য শুদ্ধ চৈতন্যই হল আত্মার নিত্যস্বরূপ ৩৬৭
আত্মজ্ঞানের অভাবেই অর্থাৎ অজ্ঞানে হয় জগৎলীলা, জ্ঞানে হয় তার অবসান ৩৬৭
অজ্ঞান মায়ার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পরিচয় ৩৬৭
অজ্ঞান মায়া প্রকৃতির প্রভাবমুক্ত হওয়া সম্ভব একমাত্র ঈশ্বর-আত্মা-গুরুর কৃপায়, নতুবা নয় ৩৬৮
বৈচিত্র্যের মাঝে অছে মিলন মহান, সমষ্টিবোধ তথা আপনবোধে তা অনুভূত হয় ৩৬৮
একবোধ বা সমবোধেই হল ঈশ্বরাত্মানুভূতি ৩৬৮
দ্বৈতবোধ বা ভেদবোধের বৈশিষ্ট্য ৩৬৮
আত্মবোধের নিরন্তর অভ্যাসের ফলে সমবোধের প্রতিষ্ঠা হয় এবং বিশ্বাস দৃঢ় হয় ৩৬৮
দেশের ও দশের সেবা যথার্থভাবে সম্ভব হয় ঈশ্বর-আত্মা-গুরুর কৃপায়, নতুবা নয় ৩৬৯

ঈশ্বর-আত্মা-গুরুর কৃপায় হৃদয়বৃত্তি ও বিবেকের উদয় হয়, তার দ্বারাই দেশের ও দশের যথার্থ মঙ্গল-কল্যাণ সম্ভব ৩৬৯
সমগ্র সৃষ্টি, সর্ব রূপ-নাম-ভাব হল অখণ্ড বোধের স্বভাবের বিস্তার ৩৭০
আত্মবিদ্যা পুঁথিগত জ্ঞানের অধীন নয়, হৃদয়বোধের সম্যক্ পরিচয় ৩৭০
বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহুদুর ৩৭০
ঈশ্বর-আত্মবোধে সব 'মেনে মানিয়ে চলার' ফলে হয় জীবনের সর্ব সমস্যার সমাধান ৩৭০
সর্ব প্রশ্নের উত্তর প্রশ্নের মুলেই নিহিত থাকে ৩৭০
আত্মযজ্ঞ হল স্ববোধে স্বভাবের বিলাস ৩৭০
আত্মযজ্ঞই হল আত্মলীলা, আপনে আপন, পরমে পরম, স্বয়ং-এ স্বয়ং ৩৭০
দ্বৈতবোধে কাম-কর্ম-কর্তৃত্বের ব্যবহার সিদ্ধ হয় কিন্তু অদ্বৈতবোধে অসিদ্ধ ৩৭০
নিত্যাদ্বৈত স্ববোধ আত্মার বক্ষে তার লাস্যভাব স্বভাব মাধ্যমে হয় লীলাবিলাস ৩৭১
আত্মার লীলাময় রূপই হচ্ছে তাঁর ঈশ্বরীয় রূপ ৩৭১
সমগ্র জীবজগৎ হল তাঁর লীলাবিলাস, আত্মজ্ঞানীর কাছে এটাই স্বানুভূতি ৩৭১
স্বপ্রকাশ ঈশ্বরের বৈশিষ্ট্য হল তিনি স্বয়ং প্রকাশক ও প্রকাশরূপে অভিন্ন ৩৭১
আমিতত্ত্বের তাৎপর্য ৩৭১
পরমাত্মার আমিই সর্ব আমির অধিষ্ঠান, সুতরাং আত্মলীলার অধিষ্ঠানও এই অদ্বয় আমি ৩৭১
অদ্বৈতের দ্বৈতবিলাস ৩৭২
মনের তাৎপর্য ৩৭২
অখণ্ডবোধের আমি হল প্রজ্ঞানের আমি, তারই বিজ্ঞানময় রূপ হল লীলাময় ঈশ্বরের আমি, তারই স্বভাব বিজ্ঞান হল বিশ্বমন ৩৭২
অদ্বয় আত্মার ত্রিবিধ পরিচয় ৩৭২
যজ্ঞ শব্দের তাৎপর্য (তত্ত্বার্থ) ৩৭২
যজ্ঞ ও কর্মের পার্থক্য ৩৭২
বোধ ও মনের পার্থক্য—বোধের স্বরূপ অদ্বৈত, মনের স্বরূপ দ্বৈত ৩৭৩
আহুতির তত্ত্বার্থ ৩৭৩
আহুতির প্রকারভেদ ৩৭৩
আত্মাহুতির বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পরিচয় ৩৭৩
পূর্ণ আহুতির নিগূঢ়ার্থ ৩৭৩
প্রাণচৈতন্যের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ/অভিব্যক্তির বৈশিষ্ট্য ৩৭৩
প্রাণচৈতন্যের স্পন্দনে গড়া, স্পন্দনে ভরা জীবন সবার ৩৭৩
বোধে গড়া জীবনে বোধের প্রকাশ-বিকাশের মানের তারতম্য হয় ব্যবহার দোষে ৩৭৩
বৃহত্তর স্পন্দনের অধীনের ক্ষুদ্রতর স্পন্দনের সমষ্টি সক্রিয় হয়ে বৃহত্তর স্পন্দনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় ও বৃহত্তর বোধে মিশে যায় ৩৭৪
বোধের বহির্মুখী ধারাকে অবিদ্যা এবং অন্তর্মুখী ধারাকে বিদ্যার ব্যবহার বলা হয় ৩৭৪
বোধের প্রকাশের মধ্যে সঙ্কোচন ও সম্প্রসারণ বিজ্ঞান জীবজগতের সমগ্র কার্য নিষ্পন্ন করে ৩৭৪
নিম্ন প্রকৃতি ও ঊর্ধ্ব প্রকৃতির পরস্পরের কার্য ও তার সমাধান ৩৭৪
ঊর্ধ্ব প্রকৃতির মাধ্যমে নিম্ন প্রকৃতির সমগ্র বিজ্ঞান ঊর্ধ্ব প্রকৃতির বিজ্ঞানে রূপান্তরিত হয়, তার ফলে হয় সম্যক্ বোধ সংবিৎ-এর উদয় ৩৭৪
পুরুষকার ও তার কার্যের তত্ত্বপূর্ণ বিশ্লেষণ ৩৭৫
বহুবিধ নামেই পূর্ণতার ব্যবহার হয় ৩৭৫
পূর্ণতা সিদ্ধির জন্য শ্রদ্ধা-ভক্তি-বিশ্বাসের ভূমিকা সর্বোত্তম ৩৭৫
শুদ্ধজ্ঞান ও প্রেমের লক্ষণ হল একত্বে স্থিতি ৩৭৫
দ্বৈত ও অদ্বৈত বোধের সাধন ও সিদ্ধির বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পরিচয় ৩৭৫
কাম-কর্ম-কর্তৃত্বের সাধনায় চিত্তের মুলে জগৎ, জগতের মুলে চিত্ত ৩৭৬
পূজার নিগূঢ়ার্থ, মনের বোধ ও প্রাণের বোধের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ব্যবহার ৩৭৬
দ্বৈতবোধ ও অদ্বৈতবোধের ব্যবহারের লক্ষণ ৩৭৬
অহংকারের লক্ষণ ৩৭৬
দ্বৈতবোধের মুলে অদ্বৈতবোধই বিরাজ করে ৩৭৬
জ্ঞানগঙ্গা ও সুষুম্নার তত্ত্বার্থ ৩৭৬
সুষুম্নার অধ্যাত্ম পরিচয় ৩৭৬
জীবনের সর্ব সাধনার সমন্বয়ই হল মধ্যম পথ—এ-ই হল আপনবোধে সব 'মেনে মানিয়ে চলা' ৩৭৭
সর্বোত্তম তপস্যাই হল আপনবোধে সব 'মেনে মানিয়ে চলা' ৩৭৭
আপনবোধে হয় চিত্তশুদ্ধি, তার মধ্যেই হয় চিদাত্মার স্ফূর্তি (প্রকাশ) ৩৭৭

সমবোধ মানেই আপনবোধ, তার মাধ্যমেই হয় সর্বসাধনার সিদ্ধি ও সমাধান ৩৭৭
সমবোধের পূর্ণ মাহাত্ম্য ৩৭৭
জীবনবিজ্ঞানের অপরিহার্য অঙ্গ হল ধর্ম ও কর্ম ৩৭৭
ধর্ম ও কর্মের আভ্যন্তরীণ বিজ্ঞান ৩৭৮
গুণভেদে ধর্ম-কর্মের আচরণ ও ফলের তারতম্য ৩৭৮
সকাম ও নিষ্কাম ধর্ম-কর্মের ফলভেদ ৩৭৮
ধর্ম ও কর্মের তত্ত্বার্থ ৩৭৮
ধর্ম ও ধার্মিক, কর্ম ও কর্মীর আধ্যাত্মিক পরিচয় ৩৭৯
অধর্ম ও অকর্মের পরিচয় ৩৭৯
যথার্থ ধর্মের পরিচয় ৩৭৯
মুক্তি ও নির্দ্বন্দ্ব অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য আপনবোধে সব 'মেনে মানিয়ে চলাই' হল সহজতম উপায় ৩৭৯
ধর্মকর্ম হল জীবনবিজ্ঞানের অপরিহার্য অঙ্গ ৩৭৯
কাম-কর্ম-কর্তৃত্ব জীবনের বিলাস, জীবনবন্ধনের কারণ—পূর্ণ সমর্পণের মাধ্যমে অমৃতময় দিব্যজীবন লাভ হয় ৩৭৯
সাধনার মাধ্যমে ক্রমপর্যায়ে কাম-কর্ম-কর্তৃত্বের পরিশোধন হয়, তার ফলে জীবনের দিব্যরূপায়ণ হয় ৩৭৯
শুভাশুভ দ্বিবিধ সংস্কার অনুসারে সংসারজীবন তৈরি হয়; আত্মবিচার ও আত্মসমর্পণের মাধ্যমে সর্বসংস্কারশূন্য হলে জীবন্মুক্তি ৩৮০
আত্মবিস্মৃতির ফলে শুভাশুভ সংস্কার গড়ে ওঠে, তীব্র ব্যাকুলতা ও ইষ্ট-গুরুর কৃপায় আত্মস্মৃতি জেগে ওঠে, সর্বসংস্কার পালায় ৩৮০
শুদ্ধ-মুক্ত আত্মা স্বভাবপ্রকৃতি যোগে আত্মবিস্মৃত হয়ে অহংকার বশে নিজেকে কর্তা-ভোক্তা-জ্ঞাতা বলে অনুভব করে—এ-ই তার জীবদশা প্রাপ্তি; আত্মার জীবদশা হচ্ছে আত্মার স্বপ্নবিলাস ৩৮০
সববোধই আত্মবোধ—আত্মবোধে কোন বিকার থাকে না ৩৮০
দ্বৈতবোধে হয় বোধ, অদ্বৈতবোধে হয় তার নাশ ৩৮০
বোধস্বরূপ ঈশ্বর আত্মা তাঁর স্বভাবলীলায় যুক্ত থেকেও অবিকারী ও অপরিণামী ৩৮০
অদ্বয়বোধে (আপনবোধে) সংসার হয় সমসার ৩৮১
অখণ্ড শুদ্ধবোধস্বরূপ ঈশ্বর আত্মা মনের মাধ্যমে স্বভাবলীলা আস্বাদন করেন ৩৮১
সমবোধ হল একবোধ বা অদ্বয়বোধ, অদ্বয়বোধে সবকিছু দর্শনই হল ঈশ্বরাত্ম ব্রহ্ম দর্শন ৩৮১
মনের বোধ ও বোধের মনের তাৎপর্য ৩৮১
অখণ্ড ভূমা আমির বক্ষে তার নিরন্তর প্রকাশই হল তার লীলাভিনয়, অনন্ত বিশ্ব তারই পরিচয় ৩৮১
অখণ্ড আমির বক্ষে অখণ্ড আমির লীলায় খণ্ড আমির কোনও সত্তা নেই ৩৮১
মনের বোধে দ্বৈত এবং বোধের মনে অদ্বৈত ৩৮২
মনের বোধের বিজ্ঞান রহস্য ৩৮২
পরমাত্মার স্বভাবলীলায় স্ববোধেরই মহিমা প্রকাশ পায় ৩৮২
'বোধসাগরে বোধেরই লাগিয়া খেলে বোধ জীবনরূপ ধরিয়া' ৩৮২
বোধের বক্ষে বোধের লীলায় বোধই স্বপক্ষ ও বিপক্ষ আবার বোধই স্বয়ং নিরপেক্ষ ৩৮২
লীলায়িত বোধে কেন্দ্রসত্তা ঈশ্বর, অন্তরসত্তা জীব এবং বহিঃসত্তা জড় জগৎ ৩৮২
মর্ম, ধর্ম ও কর্মের তাৎপর্য ৩৮২
উপনিষদ্ শব্দের মর্মার্থ ৩৮৩
শ্রীগীতার মর্মার্থ ৩৮৩
শ্রীচণ্ডীর মর্মার্থ ৩৮৩
বোধ, প্রাণ ও মনের বৈশিষ্ট্য ৩৮৩
অখণ্ড ভূমার আমি সর্বাধিষ্ঠান—অদ্বয় অব্যয় নিত্য সমান ৩৮৩
ঈশ্বর আত্মা ভগবান এক অখণ্ড সত্যমূর্তি; তাঁর উপলব্ধির জন্য সকল মতপথই সমান সত্য ও গুরুত্বপূর্ণ ৩৮৩
বৈচিত্র্যময় বিশ্বরূপে প্রতিভাত সত্য নিত্যলীলাময় এক ঈশ্বরেরই পরিচয় ৩৮৩
সর্বসত্যময় ঈশ্বরের মহিমাও সত্যপূর্ণ ৩৮৪
ঈশ্বরের নিত্যলীলায় স্বয়ংই বেত্তা, বেদ ও বেদন ৩৮৪
প্রতি জীবনই হল সচ্চিদানন্দ ভগবানের লীলামাধ্যম—তার মধ্যে হয় তাঁর পূর্ণ লীলাবিলাস ৩৮৪
পূর্ণ সত্য ঈশ্বরাত্ম বিজ্ঞান, অপূর্ণ সত্য হচ্ছে আপেক্ষিক বিজ্ঞান ও বস্তু বিজ্ঞান ৩৮৪
ধর্মশাস্ত্রের দুটি অংশ—একটি হল বস্তুতান্ত্রিক, অপরটি হল স্বানুভূতিভিত্তিক ৩৮৪
বৈচিত্র্যের মধ্যে নিত্য এককে এবং বিকারের মধ্যে নির্বিকারকে জানা ও মানাই হল সত্য ঈশ্বরাত্মদর্শন ৩৮৫

শরণাগত ভক্তের সঙ্গে তত্ত্বজ্ঞ গুরুর অভিন্ন সম্বন্ধ স্বানুভূতির বিষয় ৩৮৫
তামসিক, রাজসিক ও সাত্ত্বিক প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ব্যবহার ৩৮৫
তমঃ-এর লক্ষণ কঠিন আবরণ, আঘাতের মাধ্যমে হয় তার সম্প্রসারণ—সত্ত্বের প্রভাবে হয় তার বিকারের শোধন, শুদ্ধসত্ত্বে মুক্তি আস্বাদন ৩৮৫
শুভাশুভ সংস্কারের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ব্যবহার ৩৮৫
অমৃত সত্তাই সবার সত্য পরিচয় ৩৮৬
ঈশ্বরীয় মহিমাকীর্তনের মাধ্যমেই ঈশ্বরের স্মৃতি জাগ্রত হয় ৩৮৬
তপস্যার সত্য তাৎপর্য ৩৮৬
ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ ছাড়া জীবনে আর উত্তম গতি সম্ভব নয় ৩৮৬
বহিৰ্প্রকৃতির কার্য হচ্ছে বৈচিত্র্যের রূপায়ণ ৩৮৬
বন্ধন ও মুক্তি সর্বসংস্কারের কারণ মন ৩৮৬
সচ্চিদানন্দের প্রকাশ-বিকাশ সচ্চিদানন্দই, তার কখনও প্রত্যবায় হয় না ৩৮৭
দিব্যজীবন লাভের সহজতম উপায় ৩৮৭
পরমাত্মাই সর্বভূতাত্মা, হৃদয়েতে আপনবোধে তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ বা স্ফূর্তি ৩৮৭
স্বানুভবসিদ্ধ জীবন সর্বযোগের সমন্বয় বিজ্ঞানে স্বানুভূতির ভাষায় সবাইকে অনুপ্রাণিত করে ৩৮৭
নির্গুণ গুণী রসরাজ ঈশ্বর স্বয়ং সর্ব ভাব-বোধের অধিষ্ঠান, কারণ-কার্যের পূর্ণ সমাধান ৩৮৭
সর্বব্যাপী মহাপ্রাণ অঙ্গের সর্বত্রই অনুস্যূত হয়ে আছে বলে তাকে অঙ্গিরস বলা হয় ৩৮৭
আত্মবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে হৃদয়ের পরিচয় ৩৮৮
সত্যানুভূতির অপরিহার্য বিজ্ঞান ৩৮৮
ঈশ্বরানুভূতির অন্যতম সাধনবিজ্ঞান ৩৮৮
আত্মসমর্পণযোগে সিদ্ধির তাৎপর্য ৩৮৮
অন্তরের তীব্র ব্যাকুলতা ও প্রার্থনা ঈশ্বরানুভূতির অতি গুরুত্বপূর্ণ পাথেয় ৩৮৮
সকাম ও নিষ্কাম সাধনার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ তাৎপর্য ৩৮৮
প্রত্যক্ষ অনুভূতি ও দর্শনের তাৎপর্য ৩৮৯
সর্বসমর্পণযোগের ফলশ্রুতি হল ঈশ্বরের নিত্যলীলার নিত্যসাথী ৩৮৯
ঈশ্বরের হাতের অস্ত্র বা তাঁর নিত্যলীলার সাথী হয় তারাই যারা বিনা শর্তে পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে ৩৮৯
নির্গুণতত্ত্ব/পরমতত্ত্বের অনুভূতি সাধক পায় সগুণতত্ত্বের অনুভূতির স্থিতি ও দৃঢ়তার ভিত্তি অনুসারে ৩৮৯
পরমতত্ত্বের অনুভূতিই হচ্ছে পরমার্থলাভ, সর্ব কার্য-কারণের পরিসমাপ্তি ৩৮৯
আত্মসমর্পণের সাধনায় শরণাগতির গুরুত্ব ৩৮৯
শরণাগতির সাধনায় 'মেনে মানিয়ে চলার' তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ৩৮৯
দেহেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে কর্মের ফলে যে অভিজ্ঞতা তার পরিণামে হয় বস্তুর জ্ঞান এবং তদনুরূপ বিশ্বাস ৩৯০
বস্তুর জ্ঞানের ব্যবহারের ফল হল বিজ্ঞান, তার পরিণাম হল বিজ্ঞানের জ্ঞান—এই জ্ঞানের ব্যবহারের ফলে হয় যে সূক্ষ্মজ্ঞান তা-ই আত্মজ্ঞান ও আত্মবিশ্বাস ৩৯০
অখণ্ড বিশ্বাসের তাৎপর্যপূর্ণ মাহাত্ম্য ৩৯০
শ্রদ্ধা-ভক্তি-বিশ্বাসের মাধ্যমে ঈশ্বরে আত্মসমর্পণের সাধনায় 'মেনে মানিয়ে চলার' তাৎপর্যপূর্ণ পরিণাম ৩৯০
শরণাগতির সাধনা হল বিনা শর্তে ঈশ্বরের উপর পরিপূর্ণ নির্ভরতা ৩৯০
বৈধীভক্তি অথবা রাগভক্তির সাধনায় যোগ্যতার অভাবে শুধুমাত্র শরণাগতির সাধনাও ফলপ্রদ হয় ৩৯০
সাধনার পরিপক্ক অবস্থায় ঈশ্বরানুরাগের মাত্রানুসারে ঈশ্বরীয় গুণ-ভাবের বিশেষ প্রকাশ সাধকের হৃদয়েতে হয় ৩৯০
পূর্ণ আত্মসমর্পণের ফলেই হয় হৃদয়ে ঈশ্বরের অভিব্যক্তি—তার ফলে হয় সাধকের মধ্যে ঈশ্বরীয় ভাব ও গুণের সম্যক্ প্রকাশ ৩৯১
শরণাগত ভক্ত হল গুরু-ইষ্টের যন্ত্র বা লীলামাধ্যম ৩৯১
সমর্পণের বিজ্ঞানে কাম-কর্ম-কর্তৃত্বের পূর্ণ সমাপন হয় ক্রমপর্যায়ে, যার ফলে হয় জীবন্মুক্তি ৩৯১
পূর্ণানুভূতির উদয়ের পূর্বেই ব্যক্তিত্বের অবসান হয়, ব্যষ্টিভাবের বীজ/কারণ নির্মূল হয় ৩৯১
সমর্পণের সাধনায় প্রার্থনার গুরুত্ব অধিক—পরিণামে ভক্ত ও ভগবানের হয় অভেদ মিলন ৩৯১
উত্তম ভক্তের হৃদয়ে ঈশ্বরাত্মার পূর্ণ অভিব্যক্তির ফলে বেদাদি শাস্ত্রের অভিনব প্রকাশ-বিকাশ ঘটে—সে হয় বহুজনের দিব্য প্রেরণা ও আনন্দের কারণ ৩৯১

মহাপুরুষদের সান্নিধ্যে অল্পকাল থাকলেও তা শুভ ফলপ্রদ হয় ৩৯২
মহাপুরুষদের প্রণাম করবার বিজ্ঞান প্রসঙ্গে নির্দেশ ৩৯২
সম্মান, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের ব্যবহার প্রসঙ্গ ৩৯২
গুরুর কাছে শিক্ষার্থীর জ্ঞানলাভের বিজ্ঞান প্রসঙ্গে নির্দেশ ৩৯২
প্রণাম প্রসঙ্গে বিধি ও নিষেধ ৩৯৩
অষ্টাঙ্গ-অষ্টবিধ প্রণামের নিগূঢ় তাৎপর্য ৩৯৩
মহাপুরুষদের চরণ ছুঁয়ে প্রণাম করা সম্বন্ধে বিধিনিষেধের নিগূঢ় তাৎপর্য ৩৯৩
মহাপুরুষদের দেহশুদ্ধি, অন্তরশুদ্ধি ও বিবেকসিদ্ধির ফলে তাঁদের অন্তরের প্রাণ ও অনুভূতির স্পন্দন স্বতন্ত্র—সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁদের স্বভাবপ্রকৃতির ভেদ বা পার্থক্য গুণাত্মক ৩৯৩
মহাপুরুষদের চরণ স্পর্শ করে সবার প্রণাম করা সম্পর্কে নিষেধের কারণ ৩৯৩
মহাপুরুষদের স্বতঃস্ফূর্ত ব্যবহারের মাধ্যমে অপরের মঙ্গল ও কল্যাণ সাধিত হয় সম্যক্ ভাবে ৩৯৪
প্রণামকারী মহাপুরুষকে স্পর্শ করে উপকার পায় না, মহাপুরুষ তাকে স্পর্শ করলে সে উপকার পায় ৩৯৪
অধ্যাত্মজগতে বিশেষ করে শক্তিসাধকদের মধ্যে মানের তারতম্য হেতু পরস্পরের প্রতি আচরণের মধ্যে অনেক সময় স্বকীয় স্বার্থসিদ্ধির বিকৃত ব্যবহার দেখা যায় প্রণামের মাধ্যমে ৩৯৪
মহাপ্রাণের অভিনব লীলাখেলা ৩৯৪
মহাপ্রাণের দ্বিবিধ প্রকাশ—চেতন ও অচেতন, পরা ও অপরা ৩৯৫
প্রকৃতির বিজ্ঞান রহস্য ৩৯৫
ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ির বিজ্ঞান রহস্য ৩৯৫
অন্তরের ও বাইরের দ্বিবিধ শক্তির মধ্যে স্থিতিলাভের সাধনা দ্বারা সাধকগণ ঈশ্বরাত্মবোধে প্রতিষ্ঠিত হন ৩৯৬
মহাপ্রাণের মধ্যে সাম্য অবস্থা হতে বিষম অবস্থার সৃষ্টি, আবার সাম্য অবস্থায় ফিরে এলে লয় বা জীবন্মুক্তি ৩৯৬
মহাপুরুষদের পদদ্বয় স্পর্শ করে প্রণাম করবার সময় প্রণম্যের অন্তর্নিহিত পরা ও অপরা প্রাণচৈতন্যের সঙ্গে প্রণামকারীর পরা ও অপরা প্রাণের গতির ক্ষণিকের যোগাযোগ হয় ৩৯৬
সাধারণ মানুষের অন্তরের স্থিতি ও গতির মান তমঃ-রজোগুণ প্রধান, সিদ্ধমহাপুরুষদের অন্তরের স্থিতি ও গতি শুদ্ধসত্ত্বপ্রধান ৩৯৬
মহাপুরুষগণ তাঁদের জীবনব্যাপী সাধনার ফল, জ্ঞান ও অনুভূতি আপামর সকলের কল্যাণের জন্যই প্রয়োগ করেন ৩৯৬
মহাপুরুষদের নিঃস্বার্থ কর্মবিজ্ঞানে স্বল্পবুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষ দোষদৃষ্টিবশত সমালোচনা করে ৩৯৭
প্রণামের মাধ্যমে অন্তরের সত্ত্বাদি গুণভেদে প্রণামকারীর মধ্যে প্রণামের ফলাফলের তারতম্য হয় ৩৯৭
অধ্যাত্ম সাধনা হল সত্ত্বগুণের সাধনা ও তার বিকাশ, তার মাধ্যমে তমঃ ও রজোগুণজাত অশুদ্ধ মলাদি বিকারের শোধন ও স্থিতি হলেই হয় চিত্তশুদ্ধি ও ঈশ্বরানুভূতি ৩৯৭
পবিত্রতাই হল শুদ্ধজ্ঞানের ভিত্তি, তা-ই মর্যাদাবোধের সম্পূরক এবং প্রণামের মাধ্যমেই হয় তার প্রতিষ্ঠা ৩৯৭
আত্মসমর্পণের সাধনা প্রথম অবস্থায় কঠিন হলেও অভ্যাসের মাধ্যমে তা সহজ ও সম্পূর্ণ হয়, ফলে ঈশ্বরাত্মার সঙ্গে অদ্বয়বোধে প্রতিষ্ঠা হয় ৩৯৭
ঈশ্বরের করুণার মাধ্যমেই হয় তাঁর সঙ্গে ভক্তের অভেদ যোগ, অন্যথায় নয়—এটা সর্বতোভাবে মাধুর্যময় ৩৯৮
ঐশ্বর্যের সাধনা ও মাধুর্যের সাধনার পরিণামের পার্থক্য ৩৯৮
সমর্পণের সাধনা স্বল্প হলেও বৃথা নয়—পূর্ণ হলে পূর্ণ ফলপ্রদ ৩৯৮
নির্জনে বসে হৃদয়েতে অনুরাগের সঙ্গে ঈশ্বরের সাধনা করলে সহজেই তা ফলপ্রদ হয় ৩৯৮
যোগ্যতার মাধ্যমেই সাধনবিজ্ঞান ফলপ্রদ হয়, অন্যথায় নয় ৩৯৮

প্রকাশকের নিবেদন

স্বসংবেদ্য স্বানুভবদেব শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরের ভাষণের তত্ত্ববিষয়ক সংগ্রহ "তত্ত্বালোক"। তিন খণ্ডে প্রকাশিতব্য এই মহাগ্রন্থে ১৯৬৮ সালের মে মাস থেকে ১৯৬৯ সালের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত প্রদত্ত ভাষণের নির্বাচিত অংশ সংগৃহীত হয়েছে। এটি প্রথম খণ্ড—মে থেকে আগস্ট পর্যন্ত প্রদত্ত ভাষণ থেকে আহৃত তত্ত্বরাজি বর্তমান খণ্ডে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। পরবর্তী খণ্ডগুলি যথাসময়ে প্রকাশিত হবে।

শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরের বিভিন্ন বিষয়ে প্রদত্ত ভাষণ থেকে তত্ত্ব সম্পর্কিত অংশবিশেষ সংকলন করেছেন শ্রীমতী বাণী চক্রবর্তী। যে নিষ্ঠা ও নিপুণতার সঙ্গে তিনি এই দুরূহ সংকলন কার্য সম্পন্ন করেছেন তা বিস্ময়কর। শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরের ভাষণ শ্রুতিলিখন করে তার থেকে তত্ত্ববিষয়ক অংশগুলি যথাযথ অন্বিত করে দীর্ঘকাল সযত্নে রক্ষা করেছেন তিনি। সংকলয়িত্রীর প্রতি শ্রীশ্রীঠাকুরের অশেষ করুণার ফলেই এই কঠিন কাজ তিনি নিষ্পন্ন করতে পেরেছেন।

ভূমিকায় শ্রীমতী বাণী চক্রবর্তী শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরের দিব্যজীবনের যে-সব ঘটনার উল্লেখ করেছেন তাতে এতাবৎকাল অজানা অনেক তথ্যই উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। সন তারিখসহ সমস্ত ঘটনার অনুপুঙ্খ বর্ণনায় তিনি পরিস্ফুট করেছেন একজন সাধকের দিব্য মহামানবে উত্তরণের কাহিনী। এ কোনও কল্পকাহিনী নয়, প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ—প্রত্যক্ষদর্শী হলেন শ্রীমতী বাণী চক্রবর্তী। এ সব ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন আরও অনেকেই, কিন্তু একমাত্র শ্রীমতী চক্রবর্তীই তাঁর দিনলিপিতে সমস্ত ঘটনা লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলেন। এ সব কাহিনী কোনওটাই স্মৃতিনির্ভর নয়—স্মৃতি তো প্রতারণা করতেই পারে। এ ঘটনাবলী তিনি উদ্ধার করেছেন তাঁর দিনলিপি থেকেই।

সাহিত্যিক তাঁর রচনার উপাদান জীবন থেকে আহরণ করলেও সমস্ত ঘটনাই ঘটে তাঁর কল্পলোকে। বর্ণিত কাহিনীকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্য চলে তাঁর নিরন্তর প্রয়াস—তাছাড়া পাঠকের মনোরঞ্জনেরও একটা প্রচ্ছন্ন তাগিদ থাকে সাহিত্য স্রষ্টার। কিন্তু রোজনামচা যিনি লেখেন তাঁর সেরকম কোনও তাগিদ থাকে না। চোখের সামনে তিনি যা ঘটতে দেখেন তা-ই লেখেন, কল্পনার মিশেল দেবার কোনও প্রয়োজন তাঁর হয় না। শ্রীমতী চক্রবর্তীও যা ঘটতে দেখেছেন, যেটুকু তাঁর অনুভবে ধরা পড়েছে, তা-ই লিখেছেন। ফলে তাঁর রোজনামচা থেকে উদ্ধৃত কাহিনীগুলি হয়ে উঠেছে পুরোপুরি মেদবর্জিত নির্ভেজাল প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ।

এ বিবরণ থেকেই জানা যাবে কী ভাবে কাঁকুলিয়া থেকে দিব্যোন্মাদ অবস্থায় শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর একদিন গৃহত্যাগ করেন, কী ভাবে তাঁকে সেদিন টালিগঞ্জে শ্রীমতী উমা রায় চৌধুরীর বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয় এবং কী ভাবেই বা পরদিন তাঁকে নিউ আলিপুরে শ্রীযুত হরিসাধন ঘোষ চৌধুরীর বাড়িতে আনা হয়। এ সব অনেক অজানা কাহিনীই শ্রীমতী চক্রবতী বর্ণনা করেছেন সাবলীল ভাষায়। "তত্ত্বালোক"-এ সংগৃহীত অমৃতবাণী যে পরমপুরুষের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে তাঁর সম্যক্ পরিচয় যাঁরা জানেন না তাঁরা গ্রন্থের ভূমিকাটি পাঠ করলে অশেষ উপকৃত হবেন।

"তত্ত্বালোক" প্রকৃত অর্থেই একটি মণিমঞ্জুষা। তত্ত্ব সম্পর্কিত অজস্র মণিমুক্তা ছড়িয়ে আছে তত্ত্বের এই আকর গ্রন্থে। তত্ত্ব কী, তত্ত্ববিদ্ কে, তত্ত্বস্ফূর্তিই বা কাকে বলে—এ সব অতি পরিচিত প্রশ্নের অপরিচিত এবং অসাধারণ উত্তর পাওয়া যাবে এই গ্রন্থে। শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর তাঁর অননুকরণীয় ভাষায় অতি সহজ করে যে-ভাবে তত্ত্বের জটিল বিষয়গুলিকে ব্যক্ত করেছেন তাতে অতি সাধারণ পাঠকের কাছেও তত্ত্বের নিগূঢ়ার্থগুলি মোটেই দুরবগাহ মনে হবে

না। তত্ত্ব সম্পর্কিত ব্যঞ্জনাময় সংজ্ঞাগুলিও জিজ্ঞাসু পাঠককে তৃপ্ত করবে। প্রতিটি সংজ্ঞাই সম্পর্কিত তত্ত্বটির ইঙ্গিতময় বাক্যবন্ধ।

দিব্যজীবনে ভগবানের প্রকাশলক্ষণ সম্পর্কিত সংজ্ঞাটির ব্যাখ্যায় শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বলেছেন, "পবিত্রতা হচ্ছে তাঁর আসন, নিঃস্বার্থপরতা তাঁর হাতল, উদারতা তাঁর ছত্র, সেবা তাঁর পরিচারক, প্রেম তাঁর দৃষ্টি, আনন্দ তাঁর গতি ও সৃষ্টি, ন্যায় তাঁর দণ্ড, দিব্যজ্ঞান তাঁর প্রকাশ, সত্য তাঁর প্রাণ; শুভ, কল্যাণ, মঙ্গল তাঁর মন। সৌন্দর্য তাঁর চিত্ত, স্নেহ করুণা তাঁর হৃদয়; ঐক্য তাঁর ধর্ম। ত্যাগ-বৈরাগ্য তাঁর কর্ম; জ্যোতি তাঁর দেহ। অমৃত হচ্ছে তাঁর দান; শূন্য তাঁর বক্ষ, শান্তি তাঁর ঘর। সমতা হচ্ছে তাঁর পদ, স্বভাব তাঁর স্বরূপের পরিচয়।"

"তত্ত্বালোক"-এ সংকলিত প্রতিটি তত্ত্বই আপন আলোকে সন্দীপ্ত—প্রতিটি তত্ত্বই শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরের স্বকীয়তায় সমুজ্জ্বল। একটি উদাহরণ দিচ্ছি। চতুর্বিশংতি তত্ত্বের তাৎপর্য প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরের বলেছেন—"দেহ হল সর্বসত্য বা অখণ্ড সত্য। মাথা হল পূর্ণ জ্ঞান বা চৈতন্য। দিকসমূহ হল তাঁর কান। তেজ বা জ্যোতি তাঁর নয়ন। আত্মজ্ঞান হল তাঁর মুখ। অগ্নি তাঁর জিহ্বা। নাক হল তাঁর ভাব ও সৌন্দর্য। ত্বক হল তাঁর স্পর্শ। বাক্ হচ্ছে প্রণব। হস্তদ্বয় হচ্ছে সেবা, কর্ম ও যজ্ঞ। পদদ্বয় হচ্ছে মুক্তি ও শান্তি। ইচ্ছা তাঁর আত্মলীলা। হৃদয় হল প্রেমানন্দ। মন হল প্রকৃতি। অনন্ততা তাঁর গুণ ও মহিমা। আসন হল তাঁর সমতা। বুদ্ধি হল আধ্যাত্মিক জ্যোতি। স্থৈর্য, ধৈর্য এবং সহিষ্ণুতা হল তাঁর গতি ও শক্তি। অমৃত তাঁর স্বভাব। অহিংসা ও ক্ষমা তাঁর ধর্ম। ন্যায় তাঁর বিচার। কাল হল তাঁর শয্যা। মৃত্যু তাঁর ছায়া। জীবন তাঁর গতি ও অভিনয়। নিত্যবর্তমানতা হল তাঁর অস্তিত্ব।"

জটিল তত্ত্বের এই সরল তাৎপর্যার্থ পাঠককে অভিভূত করে—শব্দের ধ্বনিময়তা তাঁকে আবিষ্ট করে। এ রকম অজস্র মণিমুক্তাই ছড়ানো রয়েছে "তত্ত্বালোক"-এর পাতায় পাতায়।

তত্ত্বজিজ্ঞাসু সাবধানী পাঠক এই গ্রন্থ পাঠ করে তৃপ্ত হবেন, দীপ্ত হবেন, অমৃতধারায় সিক্ত হবেন একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। তাঁদের সকলের উপরই শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরের করুণাধারা বর্ষিত হোক।

মুরারি সাহা
সচ্চিদানন্দ সোসাইটির পক্ষে

কলকাতা
রাসপূর্ণিমা, ১৪০৬

ওঁ পরমাত্মনে নমঃ

ভূমিকা

''তন্ত্রালোক' গ্রন্থখানার ভূমিকা লিখতে হলে সর্বপ্রথম শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরের একটু পরিচয় দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন। অধ্যাত্মবিষয়ক বই সাধারণত যাঁরা দর্শন শাস্ত্র নিয়ে পড়াশুনা করেছেন অথবা সাধুসন্তের সঙ্গ করে পাণ্ডিত্য অর্জন করেছেন তাঁরাই লেখেন। অধ্যাত্মবিষয় যাঁরা চর্চা করেন তাঁরা জানেন যে নানা মুনির নানা মত, নানা পথ। সব মতপথই সত্য। যে-মত বা যে-পথেই চলুন, তাঁরা সত্যের দিকেই এগিয়ে চলেছেন। শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরের অনেক গ্রন্থ আজ প্রকাশিত হয়েছে এবং অনেকেই তা পড়েছেন, তা-ও সত্য। তবে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর টাকাপয়সা যেমন ছুঁতে পারেন না, সেইরকম কলমও তিনি ধরতে বা ছুঁতে পারেন না। এ সব স্পর্শ করলেই তাঁর দেহে বিকারের অবস্থা হয়, শরীরে জ্বালা বা যন্ত্রণা হয়। এ সব কথা বর্তমানে অনেকেই জানেন না।

সংসারে থাকার সময় তিনি একলাই নিরিবিলি শান্তভাবে থাকতেন। যতদিন কর্মময় জীবনে ছিলেন, ততদিন পর্যন্ত খুব গুপ্ত ভাবে তিনি সাধনভজন করতেন। কর্মক্ষেত্রে থাকাকালে তিনি সাধারণ লোকের মত টাকাপয়সাও ধরতেন। তাঁর জীবনযাত্রা প্রণালী কেউ-ই জানত না, এমনকি পাড়াপড়শীরাও জানতেন না। ফুল ফুটলে যেমন তার সৌরভ আপনা হতেই ছড়িয়ে পড়ে, সেইরকম শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরও প্রথম জীবনে যতই গুপ্ত ভাবে থাকতে চেষ্টা করুন না কেন, তাঁর পরিচয় অনেকেই টের পেয়ে যান এবং কোন কোন লোকের মাধ্যমে আমাদের কাছেও এই সংবাদটি পৌঁছে যায়।

আমার সঙ্গে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরের পরিচয় হওয়ার প্রায় এক বছর পরে, ১৯৬৮ সালের ২৯শে ফেব্রুয়ারি রাতে, দিব্যোন্মাদ অবস্থায় তিনি গৃহত্যাগ করে বেরিয়ে পড়েন। এই অবস্থায় গৃহত্যাগের পরে কী ভাবে তিনি কোথায় রইলেন সেই সংবাদ কিছু কিছু আমার লেখার ইচ্ছা রইল। তাহলে শ্রীশ্রীবাবার অবস্থা সম্বন্ধে পাঠকগণ একটু ধারণা করতে পারবেন। গৃহত্যাগের পরে প্রথম রাত্রিতে রাখার ব্যবস্থা হয় টালিগঞ্জে উমার[১] বাড়িতে। পরদিন, ১লা মার্চ, সকালে শ্রদ্ধেয় হরিসাধনদা[২], ও মা-মণি[৩] এসে নিউ আলিপুরে তাঁদের নিজেদের বাড়িতে নিয়ে যান। সেখানে যতদিন ছিলেন ততদিন দিনরাতের অধিকাংশ সময়ই শুদ্ধ-পবিত্র-দিব্য ভাবের গভীরেই মগ্ন থাকতেন। তাঁর দেহাত্মবোধ সম্পূর্ণ লুপ্ত ছিল, আহার নিদ্রা সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। হরিসাধনদা ও মা-মণি বহু সাধ্য সাধনা করে কোনদিন মাথায় একটু জল দিতে চেষ্টা করতেন, কাপড় পাল্টিয়ে অন্য কাপড় পরিয়ে দিতেন। ভাবস্থ অবস্থায় কখনও কখনও পরনের কাপড় দূরে ফেলে দিয়ে বিবস্ত্র অবস্থায় ধ্যানমগ্ন থাকতেন। কখনও বা ভাবমুখে অনর্গল ভক্তি সঙ্গীত গেয়ে যেতেন। অবিরাম দু'নয়নে প্রেমাশ্রু ঝড়ে যেত, কখনও বা দিব্যভাবে অদৃশ্য কারও সঙ্গে কথোপকথন করতেন, কখনও বা আপন মনে হেসেই যেতেন, কখনও বা বিলাপ করতেন, কখনও বা দিব্যভাবে নৃত্য করতেন। তখন তাঁর দুই হাতে কত রকমের মুদ্রা খেলত। নৃত্য করতে করতে কখনও বা ভূমিতে লুটিয়ে পড়তেন। শরীর কুণ্ডলী আকার ধারণ করে পড়ে থাকত। কখনও বা হুংকার দিয়ে উঠে আবার নৃত্য করতেন। নামগানের আসরে এরকম ভাবোন্মাদ নৃত্য পরবর্তীকালে বহুদিন দেখা গেছে।

১। উমা রায় চৌধুরী, আমার মামাত বোন। ২। হরিসাধন ঘোষ চৌধুরী, পশ্চিম বঙ্গের ভূতপূর্ব আই.জি. (ডঃ বিধানচন্দ্র রায়ের আমলে)। ৩। হরিসাধন ঘোষ চৌধুরীর পত্নী।

আটতিরিশ

তখন তাঁর মধ্যে ক্ষুধা তৃষ্ণার কোন লক্ষণই প্রকাশ পেত না। জোর করে কখনও কখনও জল বা অন্য কিছু খাওয়ানোর চেষ্টা করা হত। ঐ-সব গ্রহণ করতে করতে সমাধিস্থ হয়ে যেতেন। সুতরাং পেটে দানাপানি পড়তই না প্রায়। সেই সময় হরিসাধনদা ও মা-মণি উভয়েই রাতদিন তাঁর সঙ্গে থেকে তাঁর শরীর রক্ষার চেষ্টা করেছেন নিরলস ভাবে। এই প্রসঙ্গে তাঁদের মুখে শুনেছি যে তাঁদেরও দেহাত্মবোধ আছে কি নেই এই বিষয়ে তাঁদের সংশয় হত। আমরা কয়েকজন যথা দ্বিজেশদা[১], উমা, বিনয়[২], কোন কোন দিন রঞ্জিত[৩] সন্ধ্যাবেলায় যেতাম, হরিসাধনদা ও মা-মণির সঙ্গে কথা হত। শ্রীশ্রীবাবার ঘরে গিয়েও কিছুক্ষণ বসতাম। কোনদিন দুই-চার-পাঁচটা কথা বলতেন, কোনদিন আপন ভাবে গান গেয়ে যেতেন অথবা সমাধিস্থ থাকতেন।

সেইসব দিনের কথা বিশদ ভাবে হরিসাধনদার ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ আছে। সেই ডায়েরির কথা কোনদিন প্রকাশ হলে লোকে জানতে পারবে তখনকার তাঁর ভাবস্থ অবস্থার কথা...।

অবশেষে ঘটনাচক্রে ২০শে মে, ১৯৬৮, রবিবার, সন্ধ্যায় তাঁকে ফার্ণ রোডে আমাদের বাড়িতে আনা হয় এবং সেখানেই দীর্ঘকাল তিনি থাকেন। হরিসাধনদার বাড়িতে কী অবস্থায় তিনি ছিলেন তার কিছু কিছু সংবাদ আমি পাঠকবর্গকে শোনাব তাঁদের অবগতির জন্য।

এপ্রিলের শেষে ১লা মে থেকে হরিসাধনদার বাড়িতে তিনি আনন্দসমাধি বা সহজসমাধি অবস্থায় ভাষণ দেওয়া শুরু করেন। এই ভাষণের ব্যবস্থা হয় একান্ত ঘনিষ্ঠ লোক এবং পাড়াপ্রতিবেশীদের অনুরোধেই। কারণ ভাষণ দেবার মত অবস্থা তাঁর তখনও হয়নি। দিনের বেশির ভাগ সময়েই তিনি আত্মস্থ হয়ে থাকতেন, আবার কখনও বা সমাধিমগ্ন হয়ে থাকতেন। কখনও কখনও বা ভাবের আবেশে গানের পর গান গেয়েই যেতেন। সেই সকল অবস্থার কথা আমার পক্ষে যতটা সম্ভব ততটুকু প্রকাশ করার ইচ্ছা আছে।

১৯৬৮ সালের ১লা মে থেকে যে-ভাষণ দেওয়া শুরু হল তা তিনি বহু বৎসর দিয়েছেন। ভাষণগুলি সাধ্যমত লিখেও রেখেছি। ১লা মে-র ভাষণ থেকে শুরু করে ১৯৬৯-এর জানুয়ারি অর্থাৎ এই ন'মাসের ভাষণ অনেকদিন পরে যখন শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর পরিপূর্ণ প্রকৃতিস্থ অবস্থায় ছিলেন, তখন আমি তাঁর কাছে বসে পরিপূর্ণ ভাবে শুদ্ধ করে রেখেছিলাম। এই ন'মাসের বেশি আমার পক্ষে রাখার সুযোগ বা সময় হয়নি। সবগুলিই বই আকারে ছাপিয়ে পরিবেষণ করার একান্ত ইচ্ছা ছিল। এই ন'মাসের ভাষণ সংকলন করে বই আকারে প্রকাশ করলে বেশ বৃহদাকারই হবে। যদিও শ্রীশ্রীবাবার অন্যান্য আরও অনেক বই-ই বার করা হয়েছে এই সময়ের মধ্যে এবং সবই তাঁর ভক্তদের বদান্যতায়। উদার হস্তে তাঁরা বই প্রকাশ করার জন্য টাকা দিয়েছেন। এত বৃহদাকারের বই ছাপাবার মত অর্থের সংস্থান আপাতত নেই। সেইজন্য যাঁরা তত্ত্বপিপাসু, তাঁদের জন্য ভাষণের মধ্য থেকে শুধুমাত্র তত্ত্বগুলি সংগ্রহ করে তার কিছু অংশ নিয়ে "তত্ত্বালোক" নাম দিয়ে প্রকাশ করা হল। এটি প্রথম খণ্ড। ইচ্ছা আছে ভবিষ্যতে অর্থের সংকুলান হলে পরিপূর্ণ আকারে ভাষণের বইগুলি প্রকাশ করা হবে।

কবে এবং কী ভাবে দিব্যোন্মাদ অবস্থায় গৃহত্যাগ করে এক রাত্রিতে তিনি বেরিয়ে যান সেই ঘটনাটি এখন আমি বলতে শুরু করি। সংসারে অর্থাৎ কাঁকুলিয়া রোডের এক বাড়িতে থাকাকালে তিনি কলকাতার কোন নামী স্কুলে শিক্ষকতার কাজ করতেন এবং খুব গোপনে সাধনভজন করতেন। শিক্ষকতার কাজ করতেন বলেই তাঁকে অনেকেই মাস্টারমশাই বলে ডাকতেন। আমিও যখন তাঁর নাম শুনে তাঁর কাছে যাই আমিও মাস্টারমশাই বলে উল্লেখ করতাম। অনেকে তাঁকে 'ঠাকুর' বলেও ডাকতেন। কেউ বা 'কর্তা' বলেও ডাকতেন। তিনি কিন্তু যে

১। দ্বিজেশ সেনগুপ্ত, হরিসাধন ঘোষ চৌধুরীর গুরুভ্রাতা। কাঁকুলিয়া থেকেই তিনি শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরের সঙ্গ করেছেন। অত্যন্ত ধীর, শান্ত ও সমাহিত প্রকৃতির লোক—সবাই তাঁকে ঋষিমশাই বলে ডাকত।

২। বিনয় ভট্টাচার্য, সার্দার্ন রেলওয়ের ক্যাটারিং বিভাগের পদস্থ কর্মী।

৩। রঞ্জিত সেনগুপ্ত, শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরের মামাত ভাই।

যে-নামেই ডাকুক সবই হাসিমুখে গ্রহণ করতেন, কোনটিতেই আপত্তি জানাতেন না। একজনকে দেখেছি বয়োজ্যেষ্ঠ হওয়ার দৌলতেই শুধু 'মাস্টার' বলেই ডাকতেন। তিনি সবেতেই নির্বিকার।

কাঁকুলিয়ার মাস্টারমশাইর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার প্রায় এক বছর শেষ হল। আমরা প্রতিদিনই সেখানে নিয়মিত ভাবে যাই।

২৪শে ফেব্রুয়ারি, শনিবার, ১৯৬৮। আমাদের বাড়িতে সাপ্তাহিক নামকীর্তনের অনুষ্ঠানটি শেষ হলে সন্ধ্যায় কাঁকুলিয়ায় পৌঁছতে আমার সেদিন একটু দেরিই হয়ে গেল। গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দেখি সেখানে লোকে লোকারণ্য, শনিবার সাধারণত লোকসমাগম একটু বেশিই হয়। শিবরাত্রি উপলক্ষে সাধারণত মাস্টারমশায়ের ঘর একেবারে বন্ধই থাকে একথা আমি আগেও শুনেছিলাম। গতবছর, ১৯৬৭ সালে, শিবরাত্রির দিন কী ঘটেছিল আমার মনে নেই। কিন্তু রথযাত্রার দিন ক'দিনের জন্য ঘর বন্ধ ছিল সে কথা আমার খুব মনে আছে। সে সময়ে ঘর বন্ধ থাকাকালে মাস্টারমশাইকে ঘরের বাইরে কেউ যেতে দেখেনি তা আমি শুনেছি। এই বন্ধ-থাকা অবস্থায় কী ভাবে যে তিনি থাকেন তা কেউই জানে না।

আজ ঘরের দরজার কাছে আসতেই দেখি যে মাস্টারমশাই গভীর সমাধিমগ্ন হয়ে শুয়ে আছেন। স্পন্দনহীন দেহ। ঘরে প্রবেশ করার পূর্বেই দেখতে পাই যে রঞ্জিত ভ্রূকুটি করে ঘর থেকে বেরিয়ে এল এবং আমার দিকে তাকিয়ে বলল যে তাঁকে কিছুতেই নিচে (প্রকৃতিস্থ অবস্থায়) নামানো যাচ্ছে না। এত নাম হল কিন্তু কিছুই হচ্ছে না। হয়তো তিনি এমন স্থানে আছেন যেখানে নামও পৌঁছায় না। জানি না কী যে হবে! আমি বিষণ্ণ হয়ে ঘরে প্রবেশ করে নির্দিষ্ট চেয়ারটিতে বসি। কিছুক্ষণ নীরবে বসে থেকে বাইরে চলে আসি।

একটু পরেই নিখিলবাবুর[১] কাছে শুনলাম যে কিছুক্ষণ আগে ভাবাবস্থায় মাস্টারমশাই একবার একসময়ে নাকি বলেছিলেন—"I am the source of all, I am the cause of all, I am the cause of all causes...." এই কথা বলতে বলতে একেবারে স্থির হয়ে গভীর সমাধিতে ডুবে যান। তখন সন্ধ্যা প্রায় হয় হয়। তার একটু পরেই আমি নাকি সেখানে যাই। তার কিছুক্ষণ পরে উমা ও বিনয় এল। আবার দূরের কেউ কেউ চলেও গেল। আবার একটু পরে রঞ্জিত সেখানে উপস্থিত হয়ে নাম করতে শুরু করে; কিন্তু প্রকৃতিস্থ হওয়ার কোন লক্ষণই তখন আর তাঁর মধ্যে প্রকাশ হল না।

কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ মাস্টারমশাই বাথরুমের দিকে চলে গেলেন। শৈলেনদা[২] ধুতিখানা পরিয়ে দিতে যাচ্ছিলেন,

---

১। নিখিল আখড়াধারী, হরিসাধন ঘোষ চৌধুরীর গুরুভ্রাতা। ২। শৈলেন ব্যানার্জী, রামকৃষ্ণ মিশনের মাদ্রাজ শাখার ভূতপূর্ব বিশিষ্ট সন্ন্যাসী স্বামী কৈলাসানন্দের ভ্রাতুষ্পুত্র। কাঁকুলিয়াতে যে-বাড়িতে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর এক সময় থাকতেন তার উল্টোদিকেই শৈলেন ব্যানার্জী থাকতেন। তিনি ছিলেন সার্দার্ন রেলওয়ের ট্রাভেলিং অডিট্ ইন্‌সপেক্টর। তিনিই রেলওয়ের বিভিন্ন কর্মীকে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে নিয়ে আসেন এবং তাঁদের মাধ্যমে ঠাকুরের পরিচয় ছড়িয়ে দেন। তাঁর বৈশিষ্ট্য ছিল যখনই তিনি কর্মসূত্রে বাইরে যেতেন তখনই সেখানকার মানুষদের ঠাকুরের কথা শুনিয়ে তাঁদের আগ্রহ বাড়িয়ে দিয়ে কাঁকুলিয়ায় নিয়ে আসতেন। এই ভাবে সকলকে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরের কথা বলতেন বলে অনেকে পরিহাসচ্ছলে তাঁকে ভগবানের দালাল বলে সম্বোধন করত। আজ যে সবাই বাবাঠাকুরকে তাঁদের মধ্যে পাচ্ছেন তার মূলে রয়েছেন শৈলেন ব্যানার্জী, যিনি তাঁর সহকর্মীদের কাছে ব্যানার্জীদা নামেই সমধিক পরিচিত ছিলেন। বাবাঠাকুর ছিলেন তাঁর কাছে এক অভিনব দেবমানব। তাঁর অনুভূতি ও দৃষ্টিভঙ্গি ছিল স্বতন্ত্র ও নির্ভেজাল। তিনি সবাইকে স্পষ্ট করে বলতেন, জীবনে চরম বস্তুর দেখার স্বাদ তাঁর মিটে গেছে। জানার স্বাদ মিটে গেছে, কারণ যাঁকে দেখলে দেখার কিছু বাকি থাকে না, যাঁকে জানলে জানার কিছু বাকি থাকে না, যাঁকে পেলে পাওয়ার কিছু বাকি থাকে না সেই পরমকে নিবিড় করে, আপন করে পেয়েছেন—"সব ছেড়ে তিনি সব হয়েছেন।" তিনি প্রায়ই বলতেন, "তোদের যুক্তিতর্কের কথা ছাড়ান দে, ছাড়ান দে।"

কিন্তু মাস্টারমশাই তাঁকে স্পর্শ করতেই দিলেন না। টল্‌মল্‌ করতে করতে তিনি বাথরুমে চলে গেলেন। শৈলেনদা ধুতিখানা খাটে রেখে দিয়ে বারান্দায় অপেক্ষা করতে থাকেন। মাস্টারমশাই বাথরুম থেকে ফিরে এসে খুব আলতো ভাবে ধুতিটি কোমরে জড়িয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লেন। বিছানায় শোবার ঠিক আগের মুহূর্তেই রঞ্জিত জিজ্ঞাসা করে—একটু চা দেব কি? মাস্টারমশাই কোন উত্তর না-দিয়ে শুয়ে পড়লেন এবং আবার সমাধিস্থ হয়ে গেলেন গভীর ভাবে।

ঘরের আবহাওয়া খুবই গুরুগম্ভীর। মাস্টারমশাই সমাধিমগ্ন। সকলেই বিস্মিত ও স্তম্ভিত। নির্বাক হয়ে নীরবে সবাই বসে আছেন। দূর থেকে যাঁরা এসেছেন তাঁরা ভারাক্রান্ত মনে নীরবে একে একে চলে গেলেন। রাত হতে আমি ও রঞ্জিত একসঙ্গে চলে যাই বিষণ্ণ মনে। ঘরে তখনও ছিলেন দ্বিজেশদা, উমা, বিনয়, শৈলেনদা ও খোকা[১]।

পরে শুনেছি—রাত ১১টায় মাস্টারমশাই তাকিয়ে ছিলেন। তিনি হাতের ইসারায় সকলকে বাইরে যেতে বললেন। সকলে বাইরে যাবার সঙ্গে সঙ্গে মাস্টারমশাই উঠে বিদ্যুৎবেগে ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। সকলেই চমকে উঠল কিন্তু তখন কিছু আর করার উপায় ছিল না। সেদিন শৈলেনদা ও খোকা দুজনেই বারান্দায় রাত কাটিয়েছিলেন। তাঁদের বিশ্বাস ছিল—হয়তো সকালে দরজা খুলবেন।

পরদিন, ২৫শে ফেব্রুয়ারি, রবিবার। সেদিনও দরজা খোলেননি। দেখা গেল ঘরের সব কয়টি জানালা ভিতর থেকে বন্ধ। সকালে সবাই এসে ঠাকুরের খোঁজখবর নিয়ে গেল। কিন্তু দরজা জানালা সারাদিন একই রকম বন্ধ। ঘরে কোন শব্দ নেই।

সন্ধে হয়ে গেল। ক্রমশ লোকের আসা শুরু হল। ঘরে জানালা-দরজার ফাঁক ফুটো দিয়েও কোন আলোর চিহ্ন দেখা গেল না। এত লোকের আনাগোনা দেখে বাইরে রাস্তায় ভিড় জমে যাচ্ছে। শৈলেনদা ও খোকা শুধু দিনে রাত্রে অতন্দ্র প্রহরীর মত পাহারায় থাকেন।

পরদিন ২৬শে ফেব্রুয়ারি, সোমবার। আজ শিবরাত্রি। আজ শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরকে প্রণাম করার জন্য কত লোক যে এল তার ঠিকঠিকানা নেই। সকলেই তাঁর উদ্দেশে নিঃশব্দে দোরগোড়ায় প্রণাম করে চলে গেল। দরজা একই ভাবে বন্ধ রয়েছে। রাত হয়েছে অনেক। দরজা-জানালার ফুটোফাটা দিয়েও আলোর রশ্মি বাইরের থেকে দেখা গেল না। গভীর তমসাচ্ছন্ন রাত, নীরব নিস্তব্ধ। একে একে সকলে চলে গেল। সচেতন ও সতর্ক হয়ে বারান্দায় রয়েছেন শুধু শৈলেনদা ও খোকা।

আজ ২৭শে ফেব্রুয়ারি, মঙ্গলবার। সরোজবাবু[২] সবার আগে আজ কাঁকুলিয়ায় গেলেন। শৈলেনদা সারারাত এখানে কাটিয়ে প্রায় উল্টোদিকেই নিজের বাড়িতে গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে এলেন, ইতিমধ্যে আমার স্বামীও[৩] উপস্থিত হয়েছেন। কোনও জানালা রাত্রিতে খোলা হয়েছে কিনা দেখতে গিয়ে শৈলেনদা ঘরের পিছনের একটা জানালা খোলা দেখতে পান। শৈলেনদা উঁকি দিয়ে দেখতে পান যে ঠাকুর খালিগায়ে খাটের উপরে বসে আছেন, তাঁর সামনে শ্রীগীতাখানি খোলা। শ্রীশ্রীঠাকুরের দৃষ্টি শ্রীগীতার উপরে নিবদ্ধ।

শৈলেনদা ঘরের চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে দেখলেন—সবকিছুই গোছানো ও ফিটফাট। কোথাও ধুলার

১। গোপাল চন্দ্র দে, কাঁকুলিয়ায় যে-বাড়িতে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর থাকতেন সে-বাড়িওয়ালির দ্বিতীয় পুত্র। অনেক দিন শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরের সঙ্গ করেছে। লেখাপড়া বেশি করেনি। তবে ঠাকুরকে সে আঁকড়ে ধরেছিল এবং অনেক দিব্যদর্শনের সুযোগ লাভ করেছিল।

২। সরোজ কর, পার্ক সার্কাস নিবাসী, দীর্ঘকাল শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরের সঙ্গ করেছেন।

৩। ননীকুমার চক্রবর্তী, কলকাতা হাইকোর্টের স্বনামধন্য অ্যাডভোকেট, শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরের প্রধানতম সেবায়েত। শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরই তাঁর ইষ্ট। পূর্ব জন্মেও ঠাকুরকে পেয়েছিলেন, আবার আগামী দিনের জন্যও ঠাকুরকে 'বুক' করে রেখেছেন।

চিহ্নমাত্র নেই। সবকিছুই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও ঝক্‌ঝকে। তাড়াতাড়ি শৈলেনদা ঘুরে একেবারে সামনের দরজার দিকে এলেন। অতি আস্তে আস্তে দরজায় একটু ঠেলা দিতেই দরজা খুলে গেল। অতি সন্তর্পণে তাঁরা তিনজনেই ঘরে প্রবেশ করলেন। সমস্ত পরিবেশ অতি প্রশান্ত। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁদের দিকে মুখ তুলে তাকালেন। দিব্য জ্যোতিতে উদ্ভাসিত মুখ। সর্বাঙ্গ দিয়ে যেন একটি শান্ত পবিত্রতা প্রবাহিত হচ্ছে। স্বর্গীয় হাসি হেসে তিনি বললেন—"শ্রীগীতার প্রতিটি অক্ষর যেন এক একটি ফুল।".

আমার স্বামী বললেন—"আমরা তো অতশত বুঝি না, আপনি যে-অবস্থা করেছিলেন আমরা তো ঘাবড়েই গিয়েছিলাম। এখন মায়ে-পোয়ে কি কথা হল বলেন দেখি।" এ কথার জবাব দিলেন না, আনমনা হয়ে বসে রইলেন।

সরোজবাবুর মুখে সংবাদ পেয়ে আমি সঙ্গে সঙ্গেই বেলের সরবৎ, মিছরির সরবৎ ও ফল মিষ্টি প্রভৃতি নিয়ে যাই। এ সব আজ কয়দিন পর্যন্তই মোটামুটি ভাবে গুছিয়ে রাখতাম যদি মাস্টারমশাই দরজা খোলেন এই ভেবেই। সব জিনিসপত্র নিয়ে মাস্টারমশাইর ঘরে ঢুকলাম। তাঁকে দেখেই চমকে উঠলাম। একেবারে স্বাভাবিক অবস্থা নয়। দিব্যভাবে তখনও আচ্ছন্ন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম—"বেলের সরবৎ খাবেন?" শিশুর মতন হেসে ঘাড় ঈষৎ কাৎ করে সম্মতি জানালেন যে খাবেন। আমি তাঁর মুখের কাছে বেলের সরবতের গ্লাস তুলে ধরি। অতি ধীরে ধীরে একটু একটু করে কয়েক চুমুক খেলেন। তার পরেই মুখ ফিরিয়ে নিলেন। অনিচ্ছা দেখে আর জোর করলাম না। তিনি আনমনা হয়ে শূন্যদৃষ্টি মেলে ঠোঁট দু'খানা ঈষৎ ফাঁক করে বসে রইলেন নীরবে। পরিপূর্ণ ভাবস্থ, কোন দিকেই হুঁশ নেই।

কিছুক্ষণ পরে আবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল—চা খাবেন? কিন্তু কোন কথাই যেন তাঁর কানে প্রবেশ করছে না। যেমন ভাবে ছিলেন, তেমন ভাবেই ঊর্ধ্বপানে কী এক রকম উদাসদৃষ্টি মেলে বসে রইলেন। আবার কিছুক্ষণ বাদে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল—চা খাবেন? একটু চম্‌কে উঠলেন। শিশুর মত হেসে ঘাড় কাৎ করে সম্মতি জানালেন। শৈলেনদা চা তৈরি করলেন। মুখের কাছে চা-এর পেয়ালাটি ধরলাম। বিস্কুট গুঁড়ো করে একটু মুখে দেবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু বিস্কুট খাওয়ানো সম্ভব হল না। দু'একবার চায়ে চুমুক দিয়েই একেবারে ভাবসাগরে তলিয়ে গেলেন। চা আর খাওয়া হল না। ঘরে সকলে নির্বাক হয়ে রইলেন, কেউ বা দাঁড়িয়ে রইলেন কেউ বা বসে পড়লেন। সকলেই হতভম্ব।

ইতিমধ্যে দ্বিজেশদাও এসে পড়েছেন। তিনি নিচে মেঝেতে বসেছেন। একটু হেসে ঠাকুরকে উদ্দেশ করে বললেন—"একটু নিচে নেমে আসুন আমাদের মধ্যে। অত উঁচুতে থাকলে আমরা ধরব কী করে?" ইতিমধ্যে মাস্টারমশাই চোখ মেলে স্থির দৃষ্টিতে একদিকে তাকিয়ে ছিলেন। দ্বিজেশদার কথা যেন শুনতে পেলেন। শিশুর মত মুখখানা করে খিল্‌খিল্‌ করে হেসে উঠলেন। হাসি স্বাভাবিক নয়। কখনও মনে হয় উন্মাদের মত হাসি; আবার কখনও মনে হয়—কী অপূর্ব দিব্য মধুর! সবকিছু তখন অভূতপূর্ব অপরূপ বলে মনে হত। কিন্তু তখন প্রায়ই ভাবের রূপান্তর হচ্ছিল। যখন উন্মাদের মত হাসি বা হাবভাব দেখি তখন নিরাশায় বুক ভেঙ্গে যায়। পরমুহূর্তেই হয়তো তাঁর মুখে স্বর্গীয় এক অপরূপ হাসির ছটা যা দেখে সকলেই আমরা অভিভূত হয়ে যাই।

সেই সময় কথা বলতেও যেন তাঁর কষ্ট হচ্ছিল। কথা জড়িয়ে যাচ্ছিল। শিশুর মত আধ-আধ স্বরে তাঁর কথা বেরোচ্ছিল। কথা বলতে গেলে জিভ্‌টিও তাঁর ঈষৎ বেঁকে যাচ্ছিল। অনেক কষ্টে তোত্‌লাতে তোত্‌লাতে (নিজের দিকে ইঙ্গিত করে) মাস্টারমশাই বললেন—"এর বাবা বেদে, মা বেদে। বাবাও ন্যাংটা মা-ও ন্যাংটা। এ মায়ের ন্যাংটা ছেলে।... বেদেটা বলে কিনা, এ মায়ের নকল ছেলে। মায়ের সাথে বেদেটার আবার প্রেমের সম্বন্ধ আছে

কিনা, কাজেই মা দিলেন এক ধমক। আর বেদেটা তখন একে (নিজেকে দেখালেন) মাথায় নিয়ে নাচতে শুরু করল।"

কথা কয়টি বলে ঠাকুর খিলখিল করে আবার হাসলেন। আহা! কী মন-মাতানো, প্রাণ-জুড়ানো সে হাসি। তার পরেই উর্ধ্বদিকে শূন্যদৃষ্টি প্রসারিত করে শ্রীচরণ দু'খানি ছড়িয়ে উদাস ভাবে অনেকক্ষণ বসে রইলেন। তার পরে শুয়ে পড়লেন। মাঝে মাঝে ছোট শিশুর মত হাসছেন।

দু'চারটে সাধারণ কথাবার্তা বলে মাস্টারমশাইর মনকে নিচে নামাবার চেষ্টা করা হল। কিন্তু ব্যর্থ হয়ে ঘরের সবাই নীরবে বসে রইলেন। এর মধ্যে ঘরে উমা, রঞ্জিত, বিনয়, খোকা প্রভৃতি আরও অনেকেই এসে গেল। দ্বিজেশদা আবার বললেন—"একটু নামুন, আমাদের মধ্যে আসুন।" ঠাকুর যেন কারওর কোন কথাই শুনতে পাচ্ছেন না। আপন মনে থেকে থেকেই কেবল হাসছেন। দ্বিজেশদা ঠাকুরকে উদ্দেশ করে আবার বললেন— "এতদিন মায়ের সাথে কী কথাবার্তা হল, আমাদের একটু বলুন।" মাস্টারমশাই যেন কারওর কথাই শুনতে পাচ্ছেন না। আপন মনে থেকে থেকে শুধু হাসছেন। দূর থেকে যাঁরা এসেছেন তাঁরা চলে গেলেন। কেউ কেউ কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় বসে রইলেন। কয়েকবার বাহ্য হুঁশ্ ঈষৎ ফিরে এলেও তিনি ভাবসমুদ্রের গভীরেই ডুবে রইলেন।

ক্রমশ বেলা বাড়তে থাকে। আমি বাড়ি এসে ভাত, জল, তরকারি নিয়ে গেলাম। উমা ভিজে গামছা দিয়ে হাত-পা মুছিয়ে দিল। অনেক চেষ্টায় বিনয় মাস্টারমশাইর ধুতিটি পালটে আরেকখানা ধুতি কোনপ্রকারে কোমরে গিঁট্ দিয়ে লুঙ্গির মতন করে পরিয়ে দিল। মেঝেতে আসনে বসানো হল। ভাতের থালা সাজিয়ে সামনে দেওয়া হল। ঠাকুর আসনে বসে, থালা সামনে-রাখা অবস্থায় চুপ করে বসে রইলেন। খাবারের দিকে কোন লক্ষ্যই নেই। উমা খুব নরম করে মেখে দুই এক গ্রাস খাইয়ে দিল। তারপরেই ভাত মুখে নিয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন। কোন বাহ্য হুঁশ্ নেই তাঁর। তাড়াতাড়ি মুখের ভাত ফেলে দিয়ে মুখ মুছিয়ে দেওয়া হল। তাঁর শরীর একেবারে কঠিন হয়ে গিয়েছে। তাড়াতাড়ি তাঁকে আসন থেকে তুলে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হল। ঠাকুরের দেহ এখন স্পন্দনহীন। সকলেই বিষণ্ণ। ঘরে শৈলেনদা, দ্বিজেশদা, উমা ও খোকা রইল। আমরা যে-যার বাড়িতে চলে গেলাম।

বিকেল হতে না হতেই আমি আবার কাঁকুলিয়ায় যাই। মাস্টারমশাইর অবস্থার বিশেষ কোন হেরফের হয়নি। কখনও বা পা ছড়িয়ে বসে থাকেন অর্ধবাহ্য অবস্থায়, আবার কখনও বা চোখ বুজে স্থির হয়ে শুয়ে থাকেন স্পন্দনহীন অবস্থায়। কখনও দেহে মৃদু মৃদু কম্প, কখনও আবার দেহ স্থির প্রশান্ত। কখনও মুখে মৃদু মধুর হাসি, আবার কখনও বা গুরুগম্ভীর ভাব, নয়নে উদাস দৃষ্টি। ঘরে সকলেই বিষণ্ণ। নিরুপায় হয়ে সবাই বসে আছেন।

বিকেলের পরে সন্ধে হতেই আরও লোকজনের আসা-যাওয়া শুরু হল। কোথা হতে কী করে এত লোকজন খবর পেল জানি না। চারিদিকেই লোক। ঘরে লোক, বারান্দায় লোক, উঠানে, গলিতে লোক। রাস্তায়ও লোকের ভিড়। সকলে উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখবার চেষ্টা করছে। চেনা-অচেনা সবরকম লোকের সমাবেশ। ভিড় না-থাকাই উচিত ছিল, কিন্তু কে কাকে চলে যেতে বলবে? কেউ কেউ দু'একবার বলেছিলেনও, কিন্তু লাভ হয়নি।

এদিকে ঠাকুর ভাবের আবেশে কত কী অস্ফুট স্বরে বলে চলেছেন—কিন্তু কিছুই পরিষ্কার ভাবে বোঝা যাচ্ছিল না। একবার উঠে বসলেন। আপন মনে মৃদু মৃদু হেসে বললেন—"বেদেটা বলে আমি মায়ের নকল ছেলে। নয়টা কল আছে কিনা সেইজন্য নকল।" কথা কয়টি বলে খিলখিল করে হেসে উঠলেন।

আবার একবার মধুর হাসি হেসে তিনি বললেন—"বাবার ছেলেগুলো সব পাঁঠা, ওরা ঘাস খায়।" এ কথা বলেই আবার শিশুর মত হাসলেন। একটু পরেই আবার তাঁর ভাবান্তর ঘটে। বিষণ্ণ গম্ভীর হয়ে বলেন—"মা ওদেরও টেনে নেবেন, তবে অনেক আঘাত দিয়ে।"

কিছুক্ষণ পরে বিনয় এল অফিস ফেরত। আসবার সময়ে বাসে একটা accident হয়, তার ফলে বিনয়ের বুকে

একটু চোট্ লাগে। সেই কথা রঞ্জিত রহস্য করে ঠাকুরকে বলে—"বিনয়দা বুকে আঘাত পেয়েছে, এবার মা তাকে কোলে টেনে নেবেন।"

ঠাকুর বিনয়ের দিকে তাকিয়ে পরম স্নেহে বললেন—"নারে, বিনয়কে কে আঘাত দেবে? ও মায়ের বড় আদরের ছেলে রে।" এই কথা বলেই বিনয়কে কাছে ডাকলেন, আদর করে স্নেহের ভঙ্গিতে গলা জড়িয়ে ধরে বললেন—"রাতে একটু গরম সরষের তেল মালিশ করিস এবং গরম সেঁক দিস্।"

ক্রমশ রাত হতে লাগল। রাত প্রায় ন'টা নাগাদ আমার স্বামী এসে বললেন—"রাত্রিতে খাওয়া-দাওয়া হবে তো? কী খাবেন বলুন।" মাস্টারমশাই কোন কথা না-বলে উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। আমার স্বামী আবার বললেন, "সুজির পায়েস নিয়ে এসেছি, খাবেন তো?" ঘাড় কাৎ করে সম্মতি জানালেন। উমা চামচে করে ধীরে ধীরে একটু একটু করে পায়েস খাইয়ে দিল। খানিকটা পায়েস খেলেন। মাস্টারমশাই সকলের দিকেই চেয়ে হাসিমুখে দেখছিলেন। আমার স্বামী ঠাকুরকে বললেন—"আপনার এ সব করার দরকারটা কী?" এ সব করে কী হবে? ঠাকুর একটু হাসলেন। মৃদু হেসে বললেন—"প্রয়োজন আছে সবার জন্য।"

একে একে সবাই চলে গেলে আমিও বাড়ি ফিরে যাই। সেই রাত্রে ঠাকুরের ঘরে শৈলেনদা ও খোকার থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। পরে শুনেছি যে সেই রাত্রিতে বিনয় বাড়ি চলে যাবার আগে বিনয়কে নাকি ঠাকুর বলেছিলেন—"কাঁকুলিয়ার chapter শেষ হয়ে গেল। আমাকে নিয়ে চল, কোথায় নিয়ে যাবে।" এই রকম কথা দুপুরেও দুই একবার শোনা গিয়েছিল। উমা মশারী টাঙিয়ে দিল। মাস্টারমশাই শুয়ে পড়লেন। উমা, বিনয় ও দ্বিজেশদা ভারাক্রান্ত মনে বাড়ির দিকে রওনা হলেন। ২৭শে ফেব্রুয়ারি চলে গেল।

২৮শে ফেব্রুয়ারি, রবিবার, ১৯৬৮। সকালে কাঁকুলিয়ায় যাই। ইতিমধ্যে খোকা ঘরদুয়ার ঝাঁট-পাট দিয়ে মুছে রেখেছে। শৈলেনদা ঠাকুরের ঘাড়-কাত-করা সম্মতি নিয়ে চা তৈরি করে ফেলেছেন। কিন্তু চা তৈরি হলে দেখা গেল যে চা খাওয়ার মত অবস্থা তাঁর নেই। ক্রমে ক্রমে দ্বিজেশদা, সরোজবাবু, রঞ্জিত, উমা প্রভৃতি আরও কেউ কেউ কাঁকুলিয়ায় এসে গিয়েছেন। সময় চলে যেতে লাগল। ঠাকুরের অবস্থা দেখে সকলেই স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন। মাঝে মাঝে অতি মৃদুস্বরে নিজেদের প্রয়োজনীয় টুকি-টাকি দুই একটা মাত্র কথা হচ্ছে শুধু। ঠাকুর ভাবসাগরেই ডুবে আছেন। আবার কখনও কখনও একটু বসেন। একেবারেই প্রকৃতিস্থ নন, খুবই অন্তর্মুখী হয়ে আছেন। ঘরে কে এল বা গেল অথবা কে, কী কথা বলছে, কোন দিকেই তাঁর হুঁশ নেই। সম্পূর্ণ অন্য জগতের মানুষ। আমাদের থেকে সম্পূর্ণ এক আলাদা জীবনযাপন করছেন এক ভিন্ন জগতে। সর্বদাই এক রকম আচ্ছন্ন অবস্থার মধ্যেই আছেন। একবার উঠে পা ছড়িয়ে বসলেন, উদাস দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। তারপরেই আবার চোখ বুজে শুয়ে পড়লেন। কোন কিছুই সজ্ঞানে করছেন বলে মনে হল না।

সকালে ঠাকুরের আজ কিছুই খাওয়া হল না। মধ্যাহ্নে আগের দিনের মত খাওয়াবার চেষ্টা করা হল, কিন্তু বৃথা। বাহ্য জগতের কোন হুঁশই নেই। সারাক্ষণই শুধু সমাধিমগ্ন হয়ে রইলেন। বসে আছেন তো এক নাগাড়ে বসেই আছেন। কখনও গুরুগম্ভীর প্রশান্ত ভাব; কখনও নিথর নিশ্চল প্রস্তরমূর্তিবৎ কঠিন দেহ। আবার কখনও দিব্যভাবে আবেশিত তনু। কখনও মুখে একটা স্মিত হাসির রেশ দেখা যাচ্ছে, কখনও সমাধির কঠোরতা ফুটে উঠছে। কখনও মুদিত নয়নে শুয়ে থাকেন, কখনও আবার পা ছড়িয়ে উদাস দৃষ্টি মেলে বসে থাকেন।

বেলা একটার সময় দেখা গেল সামনের দিকে পা ছড়িয়ে বসে আছেন। অপলক নয়নে সামনের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করা। ধীরে ধীরে তাঁর দেহ শক্ত ও আড়ষ্ট হয়ে গেল। দেহে তখন প্রাণের বিন্দুমাত্রও স্পন্দন টের পাওয়া যাচ্ছিল না। চোখের পলক একবারও পড়েনি। পলকহীন নয়নে এক ভাবে তাকিয়ে পাথরের মূর্তির মত বসে আছেন।

চুয়াল্লিশ

অনেকক্ষণ পরে দেখা গেল ঠোঁট দু'খানি ঈষৎ ফাঁক হয়ে আছে। ঠোঁটের দুই দিকের দুই কশ বেয়ে অনবরত লালা গড়িয়ে পড়ছে। প্রথম প্রথম গামছা দিয়ে মুছে দেওয়া হচ্ছিল। গামছা ভিজে জব্‌জবে হয়ে গেল। এবার নরম কাপড় দিয়ে অনবরত মুছে দেওয়া হচ্ছে। আবার দু' দিক দিয়ে ফেনার মত লালা গড়িয়ে পড়ছে। চোখের পাতা এক মুহূর্তের জন্যও বন্ধ হল না। এই রকম ঘণ্টার পর ঘণ্টা চোখের পলক না-ফেলে থাকা কী করে যে সম্ভব হচ্ছে তা নিজের চোখে না-দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত। লালা নির্গত হওয়া বন্ধ হল না। বাড়িতে গিয়ে আমি খুব নরম পুরানো ধোওয়া ধুতি নিয়ে এলাম মোছার জন্য। লালা মোছা শেষ আর হয় না। এ সব দেখে সকলেই খুব চিন্তিত। দ্বিজেশদা ও শৈলেনদা তাঁদের পঠিত বিদ্যার অভিজ্ঞতা থেকে ভাবছেন—তবে কী কৈবল্য সমাধি হয়ে গেল নাকি? ঠাকুরকে কি আর ফিরে পাওয়া যাবে না? নানারকম দুশ্চিন্তায় সময় কাটতে থাকে। আধ্যাত্মিক জগতের অভিজ্ঞতার অভাবে কী যে করণীয় তা কারওরই জানা নেই। কাজেই অসহায়ের মত বসে থাকা ছাড়া কোন উপায় ছিল না। সকলেই বিষম চিন্তিত—এ ভাবে আর কতদিন চলবে? খাদ্য বা পানীয় সবই বন্ধ। এমন কি চা বা জল প্রভৃতি কোন প্রকার তরল পদার্থও তিনি গ্রহণ করছেন না।

নিরুপায় হয়ে রঞ্জিতের তাগাদায় কাশীর শ্রীমাধববাবার কাছে যতটা সম্ভব বিস্তৃত সংবাদ দিয়ে এবং এই অবস্থায় কী করণীয় সেই নির্দেশ চেয়ে শৈলেনদা এক টেলিগ্রাম করে দিলেন, যদিও মাধববাবার কাছে নির্দেশ চাওয়ার ইচ্ছা শৈলেনদার একটুও ছিল না। টেলিগ্রামের উত্তর পরে এসেছিল ঠিকই, কিন্তু উত্তর শুনে সকলেই ক্ষুণ্ণ। সবাই স্পষ্ট বুঝতে পারলেন যে ঠাকুরের অবস্থা সম্বন্ধে মাধববাবার ধারণা ঠিক নয়।

দুপুর পার হয়ে বিকেল হল। মাস্টারমশাইর দেহ আরও শক্ত হয়ে গেল। চেতনার কোন লক্ষণই নেই। এক ভাবে অপলক দৃষ্টিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসেই আছেন। আমি ৪টা বাজতেই বাড়ি চলে আসি। রঞ্জিতকে মাস্টারমশাইর অবস্থা ফোনে জানাই এবং তাড়াতাড়ি করে কাঁকুলিয়ায় যেতে বলে দেই। রঞ্জিতকে আমি আরও বলেছিলাম—আমি বহুদিন আগে শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গে পড়েছিলাম যে শ্রীরামকৃষ্ণদেবেরও এই রকম অবস্থা অনেকদিন ছিল। দক্ষিণেশ্বরে কয়েকজন সাধু তখন তাঁর পিঠে, মেরুদণ্ডে গরম ঘি মালিশ করতেন এবং তাতে নাকি ফল পাওয়া যেত।

এক ঘণ্টা পরেই আমি আবার কাঁকুলিয়ায় যাই। এর মধ্যে রঞ্জিত তাঁর পায়ে ও মেরুদণ্ডে গরম ঘি মালিশ করেছিল, তাতে একটু প্রাণের স্পন্দন পাওয়া গেল সত্য, কিন্তু বিশেষ কোন লাভ হল না। আবার যে কে সেই। ফ্যালফ্যাল করে একটু তাকিয়ে, একটু নড়েচড়ে চোখ বুজে শুয়ে পড়লেন।*

রঞ্জিত প্রায় এক ঘণ্টা মাস্টারমশাইর পাশে বসে বেশ জোরে জোরে নাম গান করল—

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।"

কিন্তু তাঁর কোন রকম ভাবান্তর হল না। বিষাদগ্রস্ত হয়ে রঞ্জিত বাইরে চলে এল। রঞ্জিত বাইরে চলে গেলেও ঘরে যারা ছিল তারা আস্তে আস্তে সকলেই নাম করে যাচ্ছিল।

সন্ধেবেলা হঠাৎ হরিসাধনদা এসে উপস্থিত। তিনি কয়েকদিনের জন্য হাজারিবাগ গিয়েছিলেন—এর মধ্যে এত কাণ্ড ঘটেছে তিনি সে-সব কিছুই জানতেন না। বারান্দায় এসে শৈলেনদার কাছে সব কথা তিনি শুনলেন বিস্তারিত ভাবে। পরে তিনিও ঘরে নাম শোনালেন।

সন্ধ্যার পর থেকে মুখ থেকে লালা নির্গত হওয়া বন্ধ হয়ে যায়। ক্রমশ লোকের ভিড় হতে থাকে। ঘরে

* পরবর্তীকালে এই ঘটনার কথা শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর এ বিষয়ে সমালোচনা করেছিলেন, তা-ও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বারান্দায়, গলিতে এমনকি অন্যদিনের মত রাস্তায়ও ভিড় জমতে থাকে। চেনা-অচেনা কত লোক যে জমায়েত হল তার ঠিক ঠিকানা নেই। সকলেই বিস্ময়ে হতভম্ব। কী যে করতে হবে কারও জানা নেই। এরকম অবস্থার কথা কারও শোনাও নেই।

শৈলেনদা একসময় হরিসাধনদাকে বললেন যে গত শনিবার হতেই ঘটনার সূত্রপাত। ঠাকুর শৈলেনদাকে লক্ষ্য করে নাকি বলেছিলেন—একটা ঝড় আসছে। কথাটির তাৎপর্য তখন শৈলেনদা বুঝতে পারেননি। তিনি ভেবেছিলেন যে ঠাকুর শৈলেনদার ব্যক্তিগত সাংসারিক অবস্থার ব্যাপারে এই ঝড়ের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। কিন্তু ঘটনা ঘটে যাবার পরে বুঝতে পারছেন যে তাঁর বোঝবার ভুল হয়েছে। তখন ঠাকুর তাঁর এই দিব্যোন্মাদ অবস্থার কথাই ইঙ্গিত করেছিলেন। এখন শৈলেনদার অনুশোচনা হচ্ছে এই ভেবে যে—তখন যদি তিনি বুঝতে পারতেন যে ঠাকুরকে কেন্দ্র করেই এই অবস্থার সৃষ্টি হবে তাহলে তো এই অবস্থায় কী করণীয় সেই নির্দেশগুলিও জেনে রাখা যেত।

হরিসাধনদা ঘরে ভিড় কমিয়ে ফেলতে বলেন। সবাইকে তিনি বুঝিয়ে বলেন—কোনরকম আজেবাজে কথা বলা ঠিক নয়। আজেবাজে কথা বললে ঠাকুরের আরো disturbance হবে। সমবেত ভাবে সবাইকে নাম করতে বলে হরিসাধনদা চলে গেলেন। যাবার আগে তিনি বলে গেলেন যে গড়িয়ায় শ্রীমৎ স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী মহাশয়ের সঙ্গে এই প্রসঙ্গে একটু আলাপ-আলোচনা করে আসবেন তিনি। সেদিনও ঘরে খোকা ও শৈলেনদার থাকার ব্যবস্থা হল। সকলেই ধীরে ধীরে চলে গেল বাড়ির দিকে। আরও একটি দিন পার হয়ে গেল।

২৯শে ফেব্রুয়ারি, বৃহস্পতিবার, ১৯৬৮। সকালেই আমি কাঁকুলিয়ায় গিয়ে উপস্থিত হলাম। মাস্টারমশাইর অবস্থার কোন পরিবর্তন নেই। শৈলেনদার কাছে শুনলাম যে তিনিও আগের দিন রাত্রিতে খোকাকে ইশারায় ঘর থেকে চলে যেতে বলেছিলেন। কিন্তু তাঁরা সে কথা শোনেন নি। শৈলেনদার মুখে আরও শুনলাম যে গত রাত্রিতে ঘর বন্ধ করার সময় একবার এবং আজ ভোর ৩টার সময় একবার সম্পূর্ণ বিবসন অবস্থায় তিনি বাথরুমে গিয়েছিলেন। বাথরুম থেকে ফিরে কোন প্রকারে ধুতিটি কোমরে আলতো ভাবে জড়িয়ে আবার বিছানায় শুয়ে পড়লেন।

ঠাকুরকে দেখে সেই সময় শৈলেনদার মনে হয়েছিল যে তিনি সম্পূর্ণ সজ্ঞান নিজের অন্তর্লোকে, কিন্তু বহির্জগৎ তাঁর কাছে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। নিজের ভিতরে তিনি সম্পূর্ণ সজ্ঞান অর্থাৎ জাগ্রত। কিন্তু সাধারণ জাগরণ অর্থাৎ জাগতিক জাগরণ বলতে যা বোঝায় এটি ঠিক সে রকম নয়। এ জাগরণে জগৎ সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন, অন্তর্জগতের কোন কল্পলোকে পূর্ণ জাগ্রত।

শৈলেনদার কথার সত্যতা আমরাও অনুভব করলাম মাস্টারমশাইকে দেখে। বাহ্যজগতের সঙ্গে কোন সম্পর্কই যেন নেই তাঁর। পরিপূর্ণ আত্মস্থ হয়ে আছেন। দেহে নানারকম দিব্য ভাব। কখনও উপবিষ্ট অবস্থায় শান্ত স্থির সমাহিত, আবার কখনও বা শায়িত অবস্থায় স্পন্দনহীন দেহ। কখনও তিনি আপন ভাবে বিভোর হয়ে কী যেন অস্ফুট ভাবে বলে চলেছেন। আবার কখনও স্বর্গীয় অপরূপ মধুর ভঙ্গিতে হাসছেন ঊর্ধ্বপানে তাকিয়ে। পার্থিব জগতের সঙ্গে সকল সম্বন্ধ তাঁর ছিন্ন হয়ে গেছে। ঘরে কে যায়, কে আসে, কী হচ্ছে বা না হচ্ছে কোন দিকেই দৃকপাত করে তিনি দেখছেন না। কখনও কখনও মনে হয় বুঝি বা বদ্ধ উন্মাদ। আবার পরমুহূর্তেই তাঁর মুখে দিব্য মধুর হাসি দেখে আশান্বিত হই—না, না, তিনি উন্মাদ নন।

দুপুর গড়িয়ে এল, সম্পূর্ণ অভুক্ত অবস্থায় রয়েছেন তিনি। একফোঁটা জলও খাওয়ানো যাচ্ছে না। ক্রমে ক্রমে লোকজন সব কমে যেতে থাকে। তবুও প্রচুর লোক। কিছু লোককে চলে যেতে অনুরোধ করা হল এবং তাঁরা চলেও গেলেন। ঘরে দু'চারজন মাত্র রইলেন। ঠাকুরের একই অবস্থা।

ছেচল্লিশ

বিকেল হল। হরিসাধনদা গড়িয়ার স্বামীজীর (শ্রীমৎ প্রত্যগাত্মানন্দ) কাছ থেকে এলেন। তিনি নাকি সব শুনে বলেছেন—বাইরে তাঁর স্থূল গুরুকরণ থাকলে মনুষ্যদেহের সাহায্য হয়তো প্রয়োজন হত। কিন্তু আপনার মুখেই শুনলাম যে মনুষ্যদেহদারী স্থূল গুরু তাঁর নেই। অন্তরের ইষ্টদেবতাই যাঁর গুরু তিনি অন্তর হতেই সাহায্য পাবেন। ইষ্টই তাঁকে সাহায্য করবেন। মনুষ্যদেহধারী কারও তাঁকে সাহায্য করার ক্ষমতা নেই। যা করবার অন্তরের ইষ্টই তাঁকে তা করবেন। কোন ভয় পাবেন না।

হরিসাধনদার মুখে স্বামীজীর এই কথা শুনে সকলেই একটু আশ্বস্ত হলেন। নানা লোকের নানা রকম কথায় সকলের মনই বিষণ্ণ হয়ে গিয়েছিল, সকলেই একটু বিভ্রান্ত হয়েছিলেন। স্বামীজীর কথাতে সকলেই নিরুদ্বেগ বোধ করলেন।

এ প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা উল্লেখ করা অতীব প্রয়োজন। কথা প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর সবার সামনে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা অনেকবার বলেছেন, তা হল—"এই শরীরটার অধিকার একমাত্র ভগবতী মাতার। তিনি ভিতরে বসে তাঁর প্রয়োজন মত শরীর ও মনকে তৈরি করে নিয়েছেন। তাঁর যখন যে-রকম প্রয়োজন সে ভাবেই তিনি অন্তরে সেই ভাব প্রকাশ করেন। বাইরে থেকে অপরের পক্ষে তা বোঝা সম্ভব হবে না। অন্তরে বসে মা এমন অনেক কিছু প্রকাশ করবেন যার বহির্লক্ষণ সব্বার কাছে দুর্বোধ্য ও ভীতিপ্রদ হতে পারে। এ প্রসঙ্গে সবাই বিশেষ করে মনে রেখ যে এরকম বিশেষ দুর্বোধ্য অবস্থা যখন প্রকাশ পাবে এবং দীর্ঘকাল তা স্থায়ী হবে তখন যেন ডাক্তার বদ্যি, সাধু সন্ত, ফকিরের হাতে এই শরীরটার দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া না হয়। তারা শরীরটা ছুঁয়ে কিছু করতে গেলে শরীরের বিশেষ ক্ষতি হবে। তখন কিন্তু তোমাদের আপসোস আর অনুশোচনার অন্ত থাকবে না। যার তার কথা ও পরামর্শ অনুসারে এই শরীরের কোনও ব্যবস্থা কেউ করবে না। মায়ের এই শরীর প্রয়োজনবোধে মা-ই দেখবে, এবং শেষ করে দেবে।

"...এই কাঁকুলিয়ার ঘরে তোমরা তো অনেক ঘটনাই লক্ষ্য করেছ। কত কু-মতলব নিয়ে কতজন এসেছে, সময় ও সুযোগ বুঝে শরীরটাকে হঠাৎ ছুঁয়ে দিয়ে তাদের মতলব হাসিল করার চেষ্টা করেছে। সামান্য তন্ত্রবিদ্যা চর্চা করে তারা এই শরীরের শক্তি চুরি করার বা কেড়ে নেবার চেষ্টা করেছে। ফলে তারা নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে, অসুস্থ হয়ে, দুর্ভোগ ভোগ করেছে।... তন্ত্রবিদ্যার শক্তি-সাধকদের মধ্যে তামসিক অধিকারীরা উচাটন, মারণ, বশীকরণ প্রভৃতি গুপ্তবিদ্যা প্রয়োগ করে অনেকেরই অনিষ্ট সাধন করে। বিশেষ বিশেষ মতলব নিয়ে তো অনেকেই আসে এখানে, কিন্তু সুযোগের অভাবে তারা সফল হতে পারেনি। মা যা বোঝাবার, দেখাবার তা দেখিয়ে সরিয়ে দিয়েছে। সে সব কথা তোমরা ভাবতেও পারবে না, বুঝতেও পারবে না। মূল কথা হল, তোমরা উপস্থিত থাকলে নবাগত কাউকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে দিও না, বা ছুঁতে দিও না। শুধু তাই নয়, 'এর' জন্য কোনও উপদেশ বা পরামর্শ নিলে তা 'এর' উপর প্রয়োগ করবার চেষ্টা করো না। 'এর' কাছে অনেকেই আসবে, অনেকেই নিজের যোগ্যতার গুণগান করবে। তোমরা ভুলে যেও না। সত্যের সাধন জটিল পথে সিদ্ধ হয় না। নিজেকে সহজ সরল হতে হয়, শুদ্ধ হতে হয়। সাধুকে বেশে বা কথায় চেনা যায় না। নিজে সাধু না-হলে সাধু চেনা যায় না।"

এরকম অনেক কথাই বলেছিলেন, এখানে আর সে সব উল্লেখ করা হল না।

পূর্বের কথায় ফিরে আসি। সন্ধ্যার দিকে আবার খুব ভিড় হতে লাগল। ঘরে বাইরে মিলিয়ে তিরিশ-চল্লিশ জন লোক হবে। শ্রীশ্রীঠাকুরের এইরকম অবস্থা অথচ ঘরে অবিরত লোকের আনাগোনা কারওরই ভাল লাগছিল না। মনে হচ্ছে সবাই যেন মেলা দেখতে আসছে। অথচ কাউকে কিছু বলবারও উপায় নেই। ঠাকুর কারওর মনে ব্যথা দেওয়া পছন্দ করতেন না। এই ঘরে কত লোক সময়ে অসময়ে এসে তাঁর সঙ্গে আজেবাজে কত তর্ক করেছে তা সত্ত্বেও তিনি কোনদিন কারও সঙ্গে উঁচু স্বরে কথা বলতেন না। ওদের সকলের কথাবার্তা হাসিমুখে শুনে যেতেন। কত সময় তো রান্না বা খাবার সময়ও পেতেন না। এ সব আমরা নিজের চোখেই দেখেছি। সকলের প্রতি সব সময়

তাঁর সহৃদয় সস্নেহ ভাব দেখা যেত। এই অবস্থায় কেউ যদি অন্তরে ব্যথা পায় তাহলে ঠাকুরের খুবই কষ্ট হবে— এই ভেবে কাউকেই কোন কথা বলা যাচ্ছিল না। নীরবে সকলেই ভিড় সহ্য করে যাচ্ছিলেন। কিন্তু অবস্থা শেষ পর্যন্ত এমন হয়ে দাঁড়াল যে বাধ্য হয়ে অতি বিনীত ভাবে ভিড় কমাবার কথা বলতে হল। তাতেই অনেকের মুখ একটু বিষাদগ্রস্ত হয়ে গেল। ক্ষুণ্ণ হয়ে অনেকেই চলে গেলেন। অনেকে জানালার কাছে ভিড় করে দাঁড়ালেন। সকলেই কেমন যেন অবুঝ হয়ে গেল। দোতলায় প্রচণ্ড শব্দে মশলা পেষাও চলছে। চারিদিকের লোকই যেন বুদ্ধিহীন পাগলের মত হয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছিল।

আমি বিকেল প্রায় ৬টায় বাড়ি এসেই দেখতে পাই Mother Hamilton[১], Mrs. Marjori[২], সুরথ চক্রবর্তী[৩] মহাশয় এবং আরও কয়েকজন পাঞ্জাবি ভক্ত আমাদের বাড়িতে এসেছেন। কয়েক মাস আগে যখন Mother এবং Mrs. Marjori ঠাকুরকে দর্শন করার জন্য কাঁকুলিয়ায় এসেছিলেন তখন ঠাকুরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যাবার সময়ে ঠাকুর তাঁদের আবার আসতে বলেছিলেন। সেইজন্য দেশে ফিরে যাবার আগে তাঁরা আবার এসেছেন তাঁকে দর্শন করতে। ঠাকুরের বর্তমানের সব অবস্থার কথা খুলে বলা হল। Mother খুব উচ্চ পর্যায়ের সাধিকা, এই দিব্যভাবের কথা শুনে তাঁকে তিনি দেখতে চান। কাজেই তাঁকে নিয়ে গেলাম কাঁকুলিয়ার বাড়িতে। তাঁর সঙ্গে তাঁর অন্যান্য সঙ্গীরাও এলেন।

রাত ৭টার পরে Mother-কে নিয়ে আমি ঘরে ঢুকতেই সকলে সরে গিয়ে তাঁকে পথ করে দিল। Mother কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে তাঁকে দেখলেন এবং তাঁকে স্পর্শ করতে পারেন কিনা তা একবার জিজ্ঞাসা করলেন। সম্মতি পাবার পরে তিনি বিছানায় ঠাকুরের কাছে বসলেন। ঠাকুর তখন পা দু'খানা সামনে ছড়িয়ে স্থির হয়ে বসেছিলেন।

Mother Hamilton পায়ে হাত বুলিয়ে সস্নেহে বলতে লাগলেন, "Sushil, (তাঁর কর্মক্ষেত্রে ও সংসারে থাকাকালীন নাম) I have come, your mother has come. My son ! look at me, I have come. You told me to come again. Open your eyes and talk to me." ঠাকুরের তরফ থেকে কোন ভাবান্তর নেই। যেমন ছিলেন তেমনি রইলেন। Mother পিঠে মাথায় গায়ে পরম স্নেহে হাত বোলাচ্ছেন, কখনও বা অতি ধীরে ধীরে পায়ের তলায় হাত দিয়ে চাপড়াচ্ছেন, আর মুখে শুধু my child, my child করছেন। আবার কখনও your child, your child বলছেন। সেই দৃশ্য এমনই মর্মস্পর্শী যে সকলেই অভিভূত হয়ে রইলেন। কিছুক্ষণ এইরকমই চলল।

কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর চোখ মেলে তাকালেন। মুখে তাঁর অতি কমনীয় ভাব। প্রেমঘন মূর্তিতে Mother-এর দিকে শান্ত ভাবে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। ধীরে ধীরে স্মিত মধুর দিব্যহাসিতে মুখটি তাঁর উজ্জ্বল হয়ে উঠল। দু'নয়নের কোন বেয়ে প্রেমাশ্রু ধারা গড়িয়ে পড়ল। Mother-এরও সজল নয়ন।

ঠাকুরের মুখে স্মিত হাসি ও নয়নের উজ্জ্বল দৃষ্টি দেখে প্রথমে আমাদের মনে আশা হয়েছিল হয়তো তিনি একটু প্রকৃতিস্থ হয়েছেন এবং Mother-কে চিনতে পেরেছেন। কিন্তু আমাদের সে ভুল ভাঙতে আর দেরি হল না। Mother-এর দিকে তাকিয়ে ঠাকুরের মুখাবয়ব স্নিগ্ধতায় ভরে গেল সত্য, কিন্তু সম্পূর্ণ জাগ্রত হতে পারলেন না তিনি। এবার নয়নে শূন্যদৃষ্টি ফিরে এল। বহুদূর থেকে কী যেন শুনছেন অথচ কানে কিছুই প্রবেশ করছে না বলে মনে হল। Mother-এর দিকে শূন্যদৃষ্টি মেলেই বসে আছেন সত্য, কিন্তু এ দেখাও ঠিক দেখা নয়। অন্তর্লোকেই তিনি বিচরণ করছেন।

Mother তাঁকে জাগ্রত করার জন্য থেকে থেকে সস্নেহে পায়ের তলায় চাপড়াচ্ছেন, কখনও আবার বুকে পিঠে

১। পরমহংস স্বামী যোগানন্দের অন্যতমা শিষ্যা, আমেরিকাবাসিনী। তিনি ক্রিয়াযোগের উন্নত পর্যায়ের সাধিকা ছিলেন। শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরকে তিনি "My little saint" বলে ডাকতেন। ২। Mother Hamilton-এর অন্যতমা শিষ্যা। ৩। শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরের ভক্ত।

হাত বুলিয়ে আদর করছেন। ঠাকুর তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েছেন ঠিকই তবুও বহির্জগতে যেন আসতে পারছেন না। Mother-এর দিকে নিবদ্ধ দৃষ্টি সহসা তিনি ফিরিয়ে নিলেন। অপরূপ স্বর্গীয় হাসি হেসে ঊর্ধ্ব দিকে তিনি দৃষ্টি ফেরালেন। এবার মুখভাবের পরিবর্তন হল। গুরুগম্ভীর ভাব। দিব্যমধুর হাসিটি ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। নয়নের পলকহীন দৃষ্টি অনন্ত অসীম শূন্যের মধ্যে কোথায় যেন হারিয়ে গেল।

ঠাকুরের বাহ্য হুঁশ হওয়ার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। কিছুক্ষণ পরে তিনি শুয়ে পড়লেন চোখ বুজে। ভাবের গভীরেই তিনি ডুবে রইলেন। অপার্থিব কোন অমৃতসাগরেই যে ডুবে গেলেন তা কে বলবে?

Mother ধীরে ধীরে বাইরে চলে আসেন। সঙ্গে সঙ্গে আমরাও যাই। Mother-এর মুখ থেকে কিছু instruction শোনার জন্য এবং আশাব্যঞ্জক কোন ভাল কথা শুনতে পাব এই আশায় রঞ্জিত, আমি আরও কেউ কেউ Mother-এর সঙ্গে সঙ্গে রাস্তায় গাড়ির কাছে চলে আসি। গাড়িতে ওঠার আগে তিনি বললেন—"No need of any worry. He is in a high state of Samadhi. He will come down in due course. Supreme Mother is in charge of Her child, we have got nothing to do. Don't crowd in the room and don't create noise. Don't allow anybody to disturb Him. Guard Him and always pray for His safety. Don't worry about His food. If He has to do something good for the society then Almighty will return Him back to you. I will come again." এই বলে তিনি চলে গেলেন। তাঁর এই আশ্বাসবাণীতে সকলেই একটু নিশ্চিন্ত হলেন।

রাত প্রায় ১০টা। ক্রমে ক্রমে লোকের ভিড় কমতে থাকে। আমরাও যে যার বাড়ি চলে যাই। শুধু শৈলেনদা, খোকা, দ্বিজেশদা, বিনয় ও উমা সেখানে রয়ে গেল তখনও পর্যন্ত। ঠিক হল শৈলেনদা ও খোকা রাত্রির খাওয়া শেষ করে ঠাকুরের ঘরে এলে বিনয়, উমা ও দ্বিজেশদা চলে যাবেন নিজেদের বাড়িতে।

১লা মার্চ, শুক্রবার। তখন সকাল প্রায় ৮টা। হঠাৎ বিনয় এসে হাজির আমাদের বাড়িতে। এই সময়ে বেহালা থেকে ফার্ণ রোডের বাড়িতে বিনয়কে আসতে দেখে শঙ্কিত হলাম, না জানি কী সংবাদ আজ কাঁকুলিয়ার ঘরের। ভয়ে নির্বাক হয়ে বিনয়ের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। কোন কিছু জিজ্ঞসা করতেও সাহস প্যাচ্ছিলাম না। বিনয় আমার মুখভাব দেখে মনের অবস্থা বুঝতে পেরে গোল বারান্দায় একটি চেয়ারে বসে কিছুক্ষণ নীরব থেকে আমাকে সংবাদ দিল—ঠাকুর কাঁকুলিয়ায় নেই, গতরাত্রেই গৃহত্যাগ করে চলে গেছেন। আমি চমকে উঠলাম। বিনয় আমাকে অভয় দিয়ে বলল—"ঘাবড়াবেন না, বর্তমানে তিনি উমাদির বাড়িতে আছেন।" তারপরে গতরাতের স্বচক্ষে দেখা ঘটনার কিছু কিছু বিবরণ দিল এবং আজ সকালে কাঁকুলিয়ায় এসে শৈলেনদার কাছে যা শুনেছে সে সব কথা খুলে বলল। ঘটনাটির সারাংশ হল—

রাত ১০টায় সবাই চলে গেলে বিনয়, উমা, খোকা ও দ্বিজেশদা ছিলেন। শৈলেনদা প্রায় উল্টোদিকে নিজের বাড়িতে খেতে যান এবং খোকাও দোতলায় যেতে চায়। শৈলেনদা ও খোকা দুজনেই ঘরে থাকবেন এই জন্যই তাঁরা খাওয়ার ব্যাপারটা চুকিয়ে আসতে গেলেন। বিনয় উমাকে মশারী টাঙাতে বলে বাথরুমে গিয়েছিল। দ্বিজেশদা বসেছিলেন তাঁর নির্দিষ্ট গোল টেবিলটির উপরে। উমা মশারী টাঙাতে আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুর রুদ্রমূর্তিতে উঠে দাঁড়ালেন। ঝট্ করে মশারীটা টেনে খুলে ফেললেন এবং দু'হাত দিয়ে প্রায় ঠেলে ওদের ঘর থেকে বার করে দিয়ে বিদ্যুৎবেগে সশব্দে দরজা বন্ধ করে ভিতর থেকে খিল দিয়ে দেন। দরজার বাইরে ওঁরা হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। এই অভাবনীয় ঘটনায় সকলেই স্তব্ধ হয়ে গেল। যথাসময়ে বিনয় ও শৈলেনদাও ফিরে এলেন। খোকাও খাওয়া শেষ করে নিচে চলে এসেছে। কী করণীয় কেউ বুঝতে পারছে না। ঠিক হল খোকা ও শৈলেনদা বারান্দায় বিছানা পেতে শোবেন।

উনপঞ্চাশ

রাত প্রায় সাড়ে ১০টায় উমা, বিনয় ও দ্বিজেশদা একটা ট্যাক্সি ধরে বাড়ির দিকে চলে যান। শৈলেনদা ও খোকা নিজেদের বিছানা পেতে মোড়ের দোকানে পান খেতে গিয়েছিলেন। সেই সময় ন্যাড়া নামে ওই পাড়ারই একটি ছেলে শৈলেনদাকে ঠেলা দিয়ে আঙুল দেখিয়ে বলল—"আপনাদের ঠাকুর যে চলে যাচ্ছেন।" খোকা দেখতে পায় যে ঠাকুরের খালি গা। অবিন্যস্ত ভাবে ধুতিখানা পরনে। একখানা ঘিয়ে রংয়ের চাদর গায়ে জড়ানো। ঘরছাড়া বৈরাগী খালি গায়ে হন্‌হন্‌ করে এগিয়ে চলেছেন গোল পার্কের দিকে।

শৈলেনদা ও খোকা প্রায় দৌড়ে গিয়ে ঠাকুরের অনুসরণ করতে থাকে। একটু কাছাকাছি এসে শৈলেনদা বললেন—"কোথায় যাচ্ছেন?" ঠাকুর আচ্ছন্ন ভাবে ছিলেন। হঠাৎ চমকে উঠে থমকে বললেন—"জানি না কোথায়। মা বলেছেন—'কাঁকুলিয়া ছেড়ে চলে যা'। তাই চলে যাচ্ছি।" কথা বলতে বলতে তিনি এগিয়ে চলেছেন।

এবার তিনি সাদার্ন এভিনিউ ধরে চলেছেন। এখন গতি তাঁর মন্থর হয়ে এসেছে। নিজেকে যেন আর সামলাতে পারছেন না। কখনও কখনও যেন টলে পড়ছেন—এরকম ভাব। খোকা ও শৈলেনদা দুজনেই সঙ্গে সঙ্গে, কখনও বা পিছে পিছে, চলছেন। ঠাকুরের কোন দিকেই হুঁশ নেই। আপনভাবে মগ্ন হয়ে চলেছেন। শৈলেনদা ও খোকা হাত দিয়ে গাড়ি প্রভৃতি ঠেকাবার চেষ্টা করছেন।

এর মধ্যে এক সময়ে ওঁদের দিকে মুখ ফিরিয়ে ঠাকুর বললেন—"আমি কাঁকুলিয়ার ঘরে সব রেখে এসেছি। যার যা প্রয়োজন সেখান থেকেই সব পাবেন। আমার কাছে আর কিছু নেই।"

শৈলেনদা—"কোথায় যাবেন?"

ঠাকুর—"একজনের সঙ্গে দেখা করব, তারপরে চলে যাব। পথে পথে ঘুরে বেড়াব, গাছতলায় থাকব। নাম বিলাব। আপনাদের আরও কিছু ভোগ আছে; তারপরে মুক্ত হয়ে যাবেন।"

শৈলেনদা জিজ্ঞাসা করলেন—"কার সঙ্গে দেখা করতে যাবেন?" সে-কথার কোন উত্তর দিলেন না, হন্‌হন্‌ করে হাঁটতে শুরু করলেন। ন্যাড়া হাত ধরতে গিয়েছিল, অমনি ঠাকুর বললেন—"ছোঁবেন না আমাকে, আপনারা চলে যান। মাকে তো কেউ চায় না। কাঁকুলিয়ায় সব মজা দেখতে আসে।"

আবার তিনি হাঁটা শুরু করেন সাদার্ন এ্যাভিনিউর রাস্তার মাঝখান দিয়ে। টলতে টলতে যাচ্ছিলেন বলে ওঁরা হাতটা ধরতে যাচ্ছিলেন কিন্তু মাস্টারমশাই সঙ্গে সঙ্গে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললেন—"তোমরা কেন আমার সঙ্গে সঙ্গে আসছ? তোমরা কেন পথে পথে ঘুরে বেড়াবে? তোমাদের ঘর সংসার রয়েছে। তোমাদের এখনও সময় হয়নি।"

শৈলেনদা নির্বাক হয়ে তাঁর কথা শুনছেন ও পাশে পাশে হেঁটে চলেছেন। শৈলেনদার মুখেই শুনেছি যে সেই সময় তাঁর মনে হয়েছিল যে কাঁকুলিয়ার সুশীলবাবু থেকে সম্পূর্ণ একজন নতুন লোক, নতুন সত্তা যেন জন্মগ্রহণ করেছে। পুরানো পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, পুরানো সঙ্গীসাথী সবই এই সত্তার কাছে অপরিচিত এবং অসামঞ্জস্যপূর্ণ। সেই সত্তার কাছে পৃথিবীও লুপ্ত। শুধু বিশ্বমাতা ছাড়া তাঁর আর কোন সঙ্গী নেই এবং দরকারও নেই। এই কয়দিনের যে দৈহিক পরিবর্তন সেটা যেন সেই সত্তার জাগৃতির পরিচয়। তাঁর দেহের বর্ণ পর্যন্ত পরিবর্তিত হয়ে গেছে। শরীর থেকে যেন শুভ্রতার দ্যুতি বেরোচ্ছে। দেহ প্রাণ মন বুদ্ধি লোপ হয়ে যেন একটি সত্তাতে পরিণত হয়েছে। শৈলেনদার মনে হয় এ যেন সেই—'সর্বেন্দ্রিয় গুণাভাসং সর্বেন্দ্রিয় বিবর্জিতং' অবস্থা। অশরীর বিশ্বের অন্তর্নিহিত সূক্ষ্মতম সত্তা যিনি সর্বভূতে সর্বজীবে ব্যাপ্ত হয়ে আছেন, কিন্তু তাঁর মধ্যে কেউ নেই।

রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার ছাড়িয়ে, লেকের কাছাকাছি একটা রাধাচূড়া গাছের নিচে বহু ফুল ঝরে পড়ে আছে। সেখানে এসে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। গাছটার দিকে আনমনা ভাবে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে

থেকে আবার তাঁর চলা শুরু হয়। রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামের দিকে এগিয়ে যেতে থাকেন। শৈলেনদা ও খোকা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে সঙ্গে সঙ্গে চলেছেন। ঠাকুর রাস্তার মাঝখান দিয়েই হেঁটে যাচ্ছিলেন এতক্ষণ। হঠাৎ উল্টোদিকের পথ থেকে রঞ্জিতকে আসতে দেখা গেল। খোকা চেঁচিয়ে রঞ্জিতকে ডাকে এবং ইশারা করে ঠাকুরের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রঞ্জিত ছুটে এসে ঠাকুরকে ধরে ফেলে এবং সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে। রঞ্জিত তাঁকে জিজ্ঞাসা করে—"আপনি কোথায় যাচ্ছেন এবং কেনই বা যাচ্ছেন?"

ঠাকুর দাঁড়িয়ে পড়েন এবং বলেন, "মা আমাকে কাঁকুলিয়ার বাড়ি থেকে চলে যেতে বলেছেন, তাই যাচ্ছি। কোথায় যাচ্ছি জানি না।"

(এখানে একটি বিশেষ কথা না-বলে পারছি না। রঞ্জিতের বাড়ি হল একডালিয়া রোডে। তাদের বাড়ির নিয়ম অনুযায়ী প্রতিদিন তাকে রাত ১০টার মধ্যেই বাড়ি ফিরতে হয়। আমি প্রায় একবছরের বেশি কাঁকুলিয়ায় যাতায়াত করছি, তাতেই দেখেছি যে রঞ্জিতের এই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাড়ি ফিরবার ব্যতিক্রম কোনদিনই হয়নি। মাস্টারমশাই কত সময়ে যে সমাধিস্থ হয়ে থাকতেন, কত সময় যে ভাবস্থ হয়ে থাকতেন তার ঠিকঠিকানা নেই। সেই সব জটিল অবস্থাতেও রঞ্জিত ১০টার মধ্যেই বাড়ি চলে যেত। এর অন্যথা কোনদিন কোন অবস্থাতেই হয়নি। কিন্তু কী এক অদৃশ্য শক্তির পরিচালনায় সে এই বিশেষ দিনটি অর্থাৎ আজ ২৯শে ফেব্রুয়ারীতেই ঠাকুরের এই অস্বাভাবিক অবস্থায় কিংকর্তব্যবিমূঢ়চিত্তে রথীন[১], সুবীর[২] ও ভনাকে[৩] পৌঁছে দিতে গিয়েছিল টালিগঞ্জের দিকে। তাদের মেনকা সিনেমা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে বাড়ির দিকে ফিরে আসছিল এবং তখনই ঠাকুরকে রাস্তায় দেখে। এই বিশেষ ঘটনাটিতে পরবর্তীকালে আমরাও কম বিস্মিত হইনি। সবকিছুই যে মঙ্গলময়ী জগন্মাতা দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে এ কথা বুঝতে আর বাকি থাকে না।)

মাস্টারমশাই আবার চলতে শুরু করেন। রঞ্জিত তাঁকে বোঝাতে লাগল—"যেখানে আপনি থাকতে চান সে ব্যবস্থাই করা হবে। কাঁকুলিয়ায় না-গিয়ে অন্য কোথাও তো ব্যবস্থা করা যায়। আর তা ছাড়া যাদের যাদের ভার আপনি নিয়েছেন এবং যাদের আপনি দেখবেন তাদের কাজ তো শেষ হয়নি এখনও। আপনার কার্য সমাধা না-হলে আপনি যাবেন না বলেছিলেন, কাজেই এখন কী করে যাওয়া সম্ভব হতে পারে?" এই কথায় ঠাকুর একটু থমকে গেলেন।

রঞ্জিত বলল, "কোথায় যাবেন আজকে? আজ রাতটা না হয় উমাদির বাড়িতেই থাকুন। তারপরে দেখা যাবে কোথায় যাওয়া যায়।" ঠাকুর বললেন—"হ্যাঁ, উমা-মার কাছে যেতে হবে।" রঞ্জিত বলল—"যেখানে হোক আজকের রাতটা থাকুন। কাল সকালে যা হবার হবে। এখানে কাউকে না-জানিয়ে গেলে সবাই মনে কষ্ট পাবে। যাওয়া যখন আপনি স্থিরই করেছেন, সকলের কাছ থেকে হাসিমুখে বিদায় নিয়ে যাবেন।"

রঞ্জিত খোকাকে একটা ট্যাক্সি ডাকতে বলল। ঠিক এমন সময়েই একটা খালি ট্যাক্সি ওদিক দিয়েই যাচ্ছিল। ওরা হাত দেখিয়ে ট্যাক্সিটা থামাতেই খোকা প্রায় ঝাঁপিয়ে গিয়ে ট্যাক্সিটা ধরে ফেলে। ঠাকুরকে নিমরাজি অবস্থাতেই প্রায় ধরে ধরে ট্যাক্সিতে তোলা হয়। তারপরে টালিগঞ্জে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস রোডে (উমার বাড়ির দিকে) যেতে নির্দেশ দেওয়া হল। ঠাকুর নির্বাক হয়ে শূন্য দৃষ্টি মেলে ট্যাক্সিতে বসে রইলেন।

১। রথীন ভট্টাচার্য, হরিসাধন ঘোষ চৌধুরীর নির্দেশে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরের কাছে প্রায়ই আসত। ঠাকুরের সঙ্গে অনেক জায়গাতেই গেছে।

২। সুবীর কর পুরকায়স্থ, শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরের একনিষ্ঠ ভক্ত।

৩। চন্দ্রকেতু দাস, হরিসাধন ঘোষ চৌধুরীর নির্দেশে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরের কাছে প্রায়ই আসত।

একান্ন

রাত প্রায় সাড়ে এগারোটার সময়ে উমার বাড়ির সামনে ট্যাক্সি দাঁড় করানো হল। সকলের আগে খোকা ট্যাক্সি থেকে নেমে দরজার কড়া নেড়ে উমার ঘুম ভাঙায় এবং সংক্ষেপে সমস্ত অবস্থাটা জানায়। উমা সব শুনে ছুটে গেটের কাছে চলে আসে। সকলে ধরাধরি করে ঠাকুরকে ট্যাক্সি থেকে নামিয়ে আনে। দরজার কাছে এসেই তিনি আবার সমাধিস্থ। কোনও রকমে সকলের সাহায্যে তাঁকে দোতলায় তোলা হল এবং টুকুনের[১] বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হল।

কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর বিছানায় উঠে বসলেন। আরম্ভ হল আবার সেই এক কথা—"কেন এখানে আমাকে নিয়ে এলে। আমি পথে পথে ঘুরে বেড়াব। আমাকে গাছতলায় রেখে এসো।"

রঞ্জিত বলল—"আপনি গাছতলাতে থাকতে চান? তা-ই হবে। আজকের মত তো এখানে থাকুন। কাল এসে আপনাকে গাছতলাতেই রেখে আসব। আজ কিন্তু বেরিয়ে যেতে পারবেন না। আর তাছাড়া, আপনি কিছুক্ষণ আগেও তো বলেছিলেন যে উমা মায়ের কাছে একবার যেতে হবে। তাহলে এখন থাকুন ওঁর কাছেই।"

তখন ঠাকুর চুপ করে গেলেন এবং একটু পরে বললেন—"ওর কাছে আমায় আসতে হবে।" এই বলেই ক্রন্দন শুরু করলেন এবং তারই মাঝে মাঝে বলতে শুরু করলেন—"হ্যাঁ, আমি মাকে ঘর থেকে বার করে দিয়েছি, আমি আর মা বলে ডাকতে পারব না।" তাঁর কান্না আর থামে না। অবশেষে অনেকক্ষণ পরে চুপ করে রইলেন। শৈলেনদা ও রঞ্জিত ঠাকুরকে একটু হরলিকস্ খাইয়ে বাড়ি চলে গেলেন। খোকা রাত্রিতে সেখানেই রয়ে গেল।

উমার কাছে পরে শুনেছি যে সেদিন রাতে টুকুনের খাটে মাস্টারমশাই শুয়েছিলেন, পাশে নিজের খাটে উমা ছিল। তার পাশের ঘরে খোকা ও টুকুন শুয়েছিল। মনে সকলেরই ভয় আবার যদি বেরিয়ে যান। তাই সকলেই প্রায় জেগে রইল। উমার বড় ছেলে ও বৌমা অমিতাও দরজা খুলেই শুয়ে রইল নিজেদের শয়ন ঘরে। সারা রাত ধরে ঠাকুরের উচ্চরোল ক্রন্দন থেকে থেকেই। কী করুণ স্বর। বারবার তিনি একই কথা বলছেন—"আমি মাকে তাড়িয়ে দিয়েছি, আমি মা বলে কি আর ডাকতে পারব?" উপস্থিত সকলের চোখেই তখন জল এসেছিল। উমা ঠাকুরের মশারী সরিয়ে তাঁর মুখে হাতে পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল ও শান্ত করার চেষ্টা করছিল। তিনি কিন্তু বার বার বলে চলেছেন—"আমাকে গাছতলায় রেখে এস।" তখন উমা বলল—"আমি মা হয়ে ছেলেকে কী করে গাছতলায় রেখে আসব? ছেলে যদি গাছতলায় থাকে তবে মা ঘরে থাকতে পারে কি?"

এই কথাতে ঠাকুর চমকে উঠে চুপ করলেন। তারপর আবার কান্নায় ভেঙে পড়লেন। পরে বললেন—"তোমাদের ঘর থেকে বার করে দিয়েছি, আমাকে ক্ষমা করো।" রঞ্জিতরা চলে যাবার পরে হঠাৎ খোকাকে দেখতে পেয়ে কীরকম এক অপ্রস্তুত উদাস ভঙ্গিতে ঠাকুর বলেছিলেন—"কিরে, তুই বুঝি আমাকে পাহারা দেবার জন্য রইলি। পারবি?"

সারারাত ধরেই থেকে থেকে ঠাকুর এমন করুণ সুরে ক্রন্দন করেছিলেন যে পরদিন পাশের বাড়ির লোকজনও এ বাড়ির লোকদের জিজ্ঞাসা করেছিল যে কে এমনভাবে কাল সারারাত ধরে কেঁদেছিল?

ভোরের দিকে ঠাকুর একটু ঘুমান। সেই সময় উমা ঘর থেকে একটু বাইরে আসে। খোকাও উঠেছে। কী হবে এই ভাবনায় দুজনেই বসে আছে। আস্তে আস্তে বেলা হতেই বিনয় এসে যায়। বিনয় আসবার পরে খোকা চলে যায়, দ্বিজেশদাকে এই রাত্রির ঘটনা জানাবার জন্য। সব শুনে দ্বিজেশদা কিছু তরিতরকারি ও পান কিনে নিয়ে উমার বাড়িতে চলে আসেন।

ঠাকুর তখনও মশারীর মধ্যে শুয়ে আছেন। ঘরের মধ্যে উমা উঁকি দিয়ে দেখতে পায় যে তিনি চোখ মেলেই

১। সুকান্ত রায় চৌধুরী, উমা রায় চৌধুরীর কনিষ্ঠ পুত্র।

নীরবে শুয়ে আছেন। কিন্তু ভয়ে কেউ ভিতরে ঢুকতে সাহস পাচ্ছিল না এবং মশারী খুলতেও সাহস পাচ্ছিল না। অমিতা রান্না চাপিয়ে দেয়।

বেলা প্রায় ১০টার সময় শৈলেনদা, রঞ্জিত, হরিসাধনদা ও মা-মণি এলেন। রঞ্জিতই প্রথম ঠাকুরের ঘরে ঢুকল এবং মশারী খুলে ফেলল। তারপরে অনেক বলে কয়ে বুঝিয়ে হরিসাধনদার বাড়িতে যেতে রাজি করাল। একটু পরেই হরিসাধনদা ও মা-মণি দুজনেই ঠাকুরের ঘরে ঢোকেন। ঠাকুরের তখন অর্ধবাহ্যদশা। অবিন্যস্ত ভাবে ধুতিখানা কোমরে জড়ানো। হরিসাধনদা ঘরে ঢুকেই 'বাবা সোনাগো' বলে ঠাকুরকে ধরেই কাঁদতে শুরু করেন। তাঁর কান্না দেখে সকলেরই যেন কান্নার বাঁধ ভেঙে গেল। সকলের চোখেই জল।

ঠাকুর হরিসাধনদাকেও তখন একই কথা বলতে থাকেন—''আমি গাছতলায় থাকব, আমাকে গাছতলায় রেখে এসো।''

গাছতলাতেই রাখা হবে এই আশ্বাস দিয়ে কোন প্রকারে আগে নিউ আলিপুরে নিজের বাড়ি নিয়ে যাবেন এই কথা বলে হরিসাধনদা অতি কষ্টে তাঁকে রাজি করান।

ঠাকুরকে নিউ আলিপুরের বাড়িতে থাকতে রাজি করিয়ে হরিসাধনদা মা-মণি ও উমার সাহায্যে অনেক কষ্টে তাঁকে বাথরুমে নিয়ে যান। তখন বেলা প্রায় ১০টা। হাতমুখ ধোওয়া তখনও হয়নি। বাথরুমে নিয়ে যাবার সময় বোঝা গেল যে দেহজ্ঞান তাঁর লুপ্ত হয়ে গেছে। অঙ্গের বসনখানা তাঁর খুলে পড়ে গেছে, সেদিকেও তাঁর কোন হুঁশ নেই। প্রস্রাব করতে বলায় হরিসাধনদার পায়ের উপরেই বসে পড়লেন। সেখানেই প্রস্রাব করানো হল। মা-মণি মুখ ধুইয়ে দিলেন। মা-মণি ও উমা দু'জনে মিলে কাপড় পরিয়ে দিলেন। তারপরে তাঁকে ঘরে এনে একটু হরলিকস্ খাওয়ানো হল। একটি সন্দেশ কোন রকমে খাইয়ে জল খাওয়ানো হল।

উমা, তার ছেলে ও বৌমা ভাবতে পারেনি যে তখুনি তাঁকে নিউ আলিপুরে নিয়ে যাওয়া হবে। রঞ্জিতের নির্দেশ মতই সব ব্যবস্থাদি হচ্ছিল। তার নির্দেশ মত যন্ত্রচালিতের মত সবাই সবকিছু করছিল। উমাকে রঞ্জিত যা যা বলছিল সেইরকম ভাবেই সে সবকিছু করছিল। কোন প্রতিবাদ সে করেনি। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথিতে, এই স্মরণীয় দিনটিতে, মাস্টারমশাইর চলে যাওয়াটা তার কাছে খুবই দুঃখদায়ক বলে মনে হচ্ছিল। কিন্তু প্রতিবাদ করার মত মানসিক অবস্থা তার ছিল না।

ঠাকুরকে ধরে ধরে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামিয়ে আনা হল। হরিসাধনদার গাড়িতে তোলার জন্য নিচে দরজার কাছে এসে ঠাকুরের আবার ক্রন্দন শুরু হল—''আমি মাকে তাড়িয়ে দিয়েছি, তাই মা আমাকে রাখল না।''

যাবার সময় গাড়িতে ওঠবার আগে স্থির শান্ত ভাবে নীরবে তিনি অনেকক্ষণ ধরে গৃহের সকলের মঙ্গল ও কল্যাণ প্রার্থনা করে গাড়িতে উঠলেন। গাড়িতে উঠে উমাকেও গাড়িতে ডেকে নিলেন। হরিসাধনদা ও মা-মণি ঠাকুর ও উমাকে সঙ্গে নিয়ে নিউ আলিপুরে নিজ বাসভবনের দিকে রওয়ানা হলেন।

১লা মার্চ, শুক্রবার, বেলা প্রায় ১১টা। উমা আমাকে ফোনে জানায় এবং অনুরোধ করে নিউ আলিপুরে হরিসাধনদার বাড়িতে যাবার জন্য। সেখানে আমারও খুব যাবার ইচ্ছা, কিন্তু বাড়ি চিনি না বলে কী ভাবে যেতে পারি তা-ই ভাবছিলাম। হঠাৎ এরই মধ্যে ভনা ও সুবীর এসে যায় আমাদের বাড়িতে। ঠিক হল ওরাই আমাকে ট্যাক্সিতে হরিসাধনদার বাড়িতে পৌঁছে দেবে এবং পরে আবার ৩টার সময় ট্যাক্সি করেই বাড়ি পৌঁছে দেবে।

তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া সেরে ১টার সময় নিউ আলিপুরে রওয়ানা হলাম। সেখানে আমাকে পৌঁছে দিয়ে যাবার সময়ে বলে গেল যে ৩টার সময়ে একেবারে ট্যাক্সি নিয়ে ওরা আসবে। হরিসাধনদার বাড়িতে দোতলায় উঠেই উমার সঙ্গে দেখা। তার পরেই মা-মণি এলেন। অনেক কথার সঙ্গে উমা ও মা-মণি যা বললেন, সেই কথার সারমর্ম হল যে আজ শ্রীশ্রীবাবাকে নিয়ে দোতলায় ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুর নাকি একেবারে অবোধ শিশুসুলভ

ভঙ্গিমায় মা-মণিকে বলেছিলেন—"আমাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখবে না তো?" হরিসাধনদা ও মা-মণি সঙ্গে সঙ্গে বলেন, "না, না, বাবাসোনা তোমাকে বেঁধে রাখব কেন? চল তুমি শোবে চল।" এই বলে তাঁরা দু'জন তাঁদের বাবাসোনাকে নিয়ে তাঁদের বসবার ঘর ও শয়নঘর পেরিয়ে একেবারে হরিসাধনদার শয়নঘরে তাঁর নিজের খাটটির উপরে বসিয়ে দিলেন।

খাটে বসে ঠাকুর মা-মণির দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন—"আমার নাড়ু কই?" দিনকয়েক আগে হরিসাধনদা ও মা-মণি হাজারিবাগে বেড়াতে গিয়েছিলেন যখন, আসবার সময় সেখান থেকে প্যাঁড়া নিয়ে এসেছিলেন। তাড়াতাড়ি মা-মণি সেই প্যাঁড়াই নাড়ুর আকারে গোল করে পাকিয়ে তাঁর হাতে দেন। শ্রীশ্রীবাবা আনন্দের সঙ্গে তা মুখে দিলেন। এমন সময় calender-এ মাহাত্মা তুলসীদাসের ছবিতে দৃষ্টি পড়ায় অন্তঃস্থ হয়ে পড়লেন ঠাকুর। অনেকক্ষণ সেই ভাবেই ডুবেছিলেন। আরেক দিকের দেয়ালে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাসবেশ ধারণের আরেকটি ছবি ছিল সেটিও তাঁরা সেই অবসরে সরিয়ে ফেললেন। সারাক্ষণ ভাবের ঘোরেই ছিলেন সকাল থেকেই। কিছুক্ষণ পরে মা-মণি অনেক কষ্টে তাঁর বাবাসোনাকে কিছু খাইয়ে দিয়েছিলেন।

গতরাত্রের ও আজকের কিছু কিছু সংবাদ শুনে আমি ধীরে ধীরে মাস্টারমশাইর ঘরের দিকে গেলাম। আমি দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে পড়লাম। ঠাকুর একেবারে নীরবে বসেছিলেন। উমা ঘরে প্রবেশ করে আমার কথা জানাবার সঙ্গে সঙ্গে আবার তাঁর কান্না শুরু হল। শিশুর মত ডুকরে ডুকরে তার আকুল করুণ ক্রন্দন। ঘরে ঢোকা আর সম্ভব হল না। স্থানুর মতন নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। উপস্থিত সকলের চোখেই জল। মা-মণি এবং উমাও হতভম্ব ও নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

এই হৃদয়বিদারক করুণ সুরে ক্রন্দনের তাৎপর্য বোঝবার মত জ্ঞানগম্যি আমাদের কারওরই ছিল না। চোখে দেখা তো দূরের কথা, এই রকম অবস্থার কথা কোথাও শুনিওনি কোন দিন। অবশ্য বহু পরে জানবার সুযোগ হয়েছিল যে এ সব হল প্রেমাতিশয্যের কান্না। এ সবকিছুই প্রেমের লক্ষণ, প্রেমের প্রকাশ। পরবর্তী কালে ফার্ণ রোডে এই প্রেমময় পুরুষের কাছে শুনেছি যে এই প্রেমে দ্বৈতবোধ একেবারেই থাকে না। থাকে শুধু একবোধ, সমবোধ ও আপনবোধ। এই আপনবোধে আপন ভিন্ন অন্য কেউ থাকে না। এ-ই হল সমরসসার বা পরমতত্ত্ব বা সচ্চিদানন্দের বোধ। এ-ই হল প্রেমের পরাকাষ্ঠা।

অল্পসময় পরেই মাস্টারমশাই বিছানার একপাশে সরে বসলেন এবং আমাদের জন্য বসবার জায়গা করে দিলেন। আমি বিছানার এককোনে খুব সংকুচিত ভাবে বসেছি। তিনি শান্তভাবে উদাস দৃষ্টি মেলে এক ভাবে নীরবে বসে রইলেন এবং পরে আত্মস্থ হয়ে গেলেন। যতদূর মনে হল আগাগোড়া তিনি ভাবাবেশেই ছিলেন। কখনও কখনও একটু জাগতিক হুঁশ হয়, আবার পরমুহূর্তেই আত্মস্থ হয়ে যান।

তারপরেই পাশের ঘরে চলে আসি। ৩টার সময় সুযোগ-সুবিধা মত ঠাকুরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সুবীর ও ভনার সঙ্গে আমি বাড়ি চলে যাই। এরপর থেকে প্রতিদিনই আমি বিকালের দিকে চলে আসতাম হরিসাধনদার বাড়িতে। সেই সময় শুনেছি ঠাকুর প্রায় সারাদিনই আত্মভাবে বিভোর হয়ে থাকতেন। মা-মণি ও হরিসাধনদা অনেক কষ্টে দুজনে মিলে সকালে হাতমুখ ধোওয়াবার কাজ শেষ করে, কাপড় বদলে, ঠাকুরকে কিছু খাইয়ে দিতেন। প্রথম প্রথম বিনয় ও উমাকে রাতেও থাকতে হত। হরিসাধনদা ও মা-মণি দু'জনেই ভরসা পেতেন না ঠাকুকে নিয়ে থাকতে। সর্বদাই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবার একটা ভাব প্রকাশ পেত। তখন তিনি শুধু বলতেন—"আমি গাছতলায় থাকব, যেতে দাও আমাকে।"

ঠাকুরের এই দিব্যোন্মাদ অবস্থায় পরমশ্রদ্ধেয় হরিসাধনদা ও মা-মণি যে-রকম যত্ন করে তাঁকে রেখেছেন ও তাঁর সেবা করেছেন তার তুলনা কোথাও মেলে না। কাঁকুলিয়ায় থাকাকালীন হরিসাধনদা ও মা-মণি তাঁকে 'ঠাকুর' বলেই উল্লেখ করতেন এবং সম্বোধন করতেন। কিন্তু ১লা মার্চ সকালে রঞ্জিতের কাছে আগের রাত্রিতে তাঁর

গৃহত্যাগের কথা শুনে এবং উমার বাড়িতে অবস্থানকালে তাঁর দিব্যোন্মাদ অবস্থার কথা জেনে রঞ্জিতের ইচ্ছাতেই সকালে গাড়ি নিয়ে নিজের বাড়িতে তাঁকে আনার জন্য চলে যান। সেখানে দেহবোধ ও জগৎবোধশূন্য অবস্থার এবং কখনও বা উন্মাদবৎ দেখে আবার কখনও বা একেবারে অসহায় বালকবৎ দেখে তাঁকে—'বাবাসোনা, আমার সোনামণি' বলে পরমস্নেহভরে তাঁকে জড়িয়ে ধরেন ও আলিঙ্গন করেন। তাঁরা দু'জনেই পরমাদরে ঠাকুরকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যান। সেই বিশেষ মুহূর্ত থেকে ঠাকুর হয়ে গেলেন তাঁদের 'বাবাসোনা'।

কত আদরে, কত স্নেহে যে তাঁরা দ'জনে তাঁদের 'বাবাসোনা' ঠাকুরের সেবা করেছেন তার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে আর দ্বিতীয় কোন আছে কিনা আমার জানা নেই। তাঁদের কাছে ঠাকুর চিরকাল পরম আদরের 'বাবাসোনাই' রয়ে গেলেন। অতি আদরের ধনকে তাঁরা কি সেবাই না করেছেন।

ঐ সময় ঠাকুর সর্বদাই ভাবে বিভোর হয়েই থাকতেন। স্থান-কাল পারিপার্শ্বিকতার কোন খেয়ালই তাঁর থাকত না। জগৎবোধ সম্পূর্ণভাবে অবলুপ্ত তাঁর কাছে। কিবা দিন, কিবা রাত্রি সবই তাঁর কাছে সমান। বিছানায় উন্মনা হয়ে বসে আছেন তো বসেই আছেন। আর কোন দিকেই তাঁর হুঁশ নেই। ঘরে কে এল বা কে গেল তারও কোন খেয়াল নেই। আবার ভাবাবস্থায় গান গাইছেন তো গানই গেয়ে চলেছেন একটার পর একটা। থামবার কোন লক্ষণই নেই। এত উচ্চ তত্ত্বমূলক গান শুনে হরিসাধনদা বিস্মিত ও হতভম্ব হয়ে যেতেন। তাঁর স্মরণ হল যে এ সব তো হারিয়ে যাচ্ছে। গানগুলি তো লিখে রাখার প্রয়োজন। তাড়াতাড়ি খাতা-কলম নিয়ে বসলেন লিখতে। একবার তিনি ঠাকুরকে সামলান, আরেকবার গান লেখেন। আর এদিকে তত্ত্বকথারও কোন বিরাম নেই। তাড়াতাড়ি তিনি তত্ত্বকথা লিখতে শুরু করলেন। কতটা রাখবেন, কোনটা লিখবেন বা কোনটা বাদ দেবেন অথবা তাঁর 'বাবাসোনা'-কে সামলাবেন? কত যে রাখা হল না। কত যে হারিয়ে গেল! অনুশোচনা শুরু হল হরিসাধনদার—আহা, এমন জিনিস সব ধরে রাখা গেল না।

কখনও দেখা গেল যে গাইতে গাইতে খাটের উপরে দাঁড়িয়েই তিনি হয়তো নৃত্য শুরু করলেন। বিবসন হয়ে গাইতে গাইতে তিনি নৃত্য করে চলেছেন মহাভাবের অবস্থায়। তীব্র অঙ্গ সঞ্চালনের জন্য কখনও কখনও খাটের ছত্রি উল্টে যেত। কখনও বা গভীর রাতেও এরকম অবস্থা হত। চারিদিকের নিস্তব্ধতা ছিন্নভিন্ন হয়ে যেত তখন। 'বাবাসোনাকে' সামলাতে গিয়ে তিনি হিম্‌সিম্ খেতেন।

এবার খাতা-কলম দিলেন উমার হাতে ও বিনয়ের হাতে। তাঁর 'বাবাসোনার' অঙ্গে যেন আঘাত না লাগে সেজন্য তিনি দুইবাহু ঊর্ধ্ব দিকে বাড়িয়ে ঘরের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে একবার এবং ও প্রান্ত থেকে এ প্রান্তে একবার ছুটে ছুটে আগলে চলেন তাঁকে। তাঁর এইরকম স্বতঃস্ফূর্ত সঙ্গীত বা মহাভাবে নৃত্য কখন যে শুরু হতে পারে তার নির্দিষ্ট কোন সময় নেই। কখনও সকালে, কখনও দুপুরে, কখনও বিকালে, আবার কখনও বা শুরু হয় গভীর নিশীথে। কখনও বা রাতভর করুণ সুরে ক্রন্দন করেই চলেন। আবার কিছুক্ষণ পরেই হয়তো গান গাইতে থাকেন। পাড়ায় লোকের কৌতূহল—এত গভীর রাতে কে গায় এমন মর্মস্পর্শী কণ্ঠে? আহা! সুমধুর কণ্ঠের কী অপরূপ মাতৃসঙ্গীত! আবার কখনও বা করুণ কণ্ঠে বুকফাটা ক্রন্দনের আওয়াজ।

পরের দিন হরিসাধনদাকে সকলের কৌতূহলী প্রশ্ন। হরিসাধনদার মুখে সব শুনে তাঁরা দর্শন করতে চান এই মহামানবকে। কিন্তু সর্বদা এই দিব্যভাবে থাকা অবস্থায় বেশি লোকের আনাগোনা, কৌতূহলী লোকের দৃষ্টি একেবারেই বাঞ্ছনীয় নয়। সুতরাং হরিসাধনদা তাঁদের ভবিষ্যতের আশা দিয়ে শান্ত করে রাখেন।

কোন কোন দিন সারারাত প্রায় গান গেয়েই কাটে। সন্ধেবেলা কখনও আত্মসমাহিত, কখনও ভাবস্থ, আবার কখনও বা অসহায় শিশুর মত চুপচাপ লক্ষ্মী ছেলেটি সেজে বসে থাকেন।

দুপুরের স্নানাহার নিয়েও কম পর্ব নয় হরিসাধনদা ও মা-মণির। জগৎবোধ যাঁর অবলুপ্ত, দেহবোধ যাঁর নেই, তাঁর ক্ষুধাতৃষ্ণা বোধও থাকে না। দেহবোধের কোন লক্ষণই নেই। খেলায় মত্ত অবুঝ শিশুকে যেমন স্নানাহারের

জন্য তাগিদ দিতে হয়, সেইরকম ভাবে পরমস্নেহভরে মা-মণি দিব্যভাবে তন্ময় ঠাকুরকে বলেন—বাবাসোনা! বাথরুমে যাবে না? বেলা হল। এবার ওঠ, চল এবার পায়খানায় যাও। 'বাবাসোনা'র কিন্তু কোন কথাই বোধগম্য হচ্ছে না। কিছুই তিনি বুঝতে পারছেন না। অসহায় ভাবে ভাষাহীন দৃষ্টিতে ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করে তাকিয়ে থাকেন মা-মণির দিকে। অবশেষে হরিসাধনদাই কোলে করে নিয়ে যান বাথরুমে। পায়খানায় বসিয়ে দেন। তাগাদা দিয়ে দিয়ে একটু পায়খানা করান, আবার শেষ পর্যন্ত জল দিয়ে ধুয়ে মুছে নিজেই পরিষ্কার করে দেন এবং মা-মণি কোনরকমে ঘরে নিয়ে আসেন। মা-মণিই কাপড় পরিয়ে দেন। তারপরে ভাত মেখে বলে বলে কয়েক গ্রাস খাইয়ে দেন। সব কাজই হরিসাধনদা ও মা-মণিকেই করিয়ে দিতে হত। ঠিক এইরকম অবস্থা প্রায় ছ'-সাত দিন চলল।

তারপরে মাস্টারমশাই ঈষৎ প্রকৃতিস্থ হলেন ঠিকই কিন্তু বেশির ভাগ সময়েই আত্মস্থ হয়ে থাকেন এবং ভাবস্থ অবস্থায় একের পর এক গান গেয়ে যান; কখনও বা গভীর সমাধিতে ডুবে থাকেন। বাইরে বেরিয়ে যাবার ঝোঁকটা এখনও আছে। প্রায়ই বলেন, "আমাকে আটকে রেখেছ কেন? আমাকে যে পথে পথে নাম বিলাতে হবে।" হরিসাধনদা বলেন—"তাঁরা এখানে এসে নাম নেবেন।" ঠাকুর কিছুক্ষণ আপন মনে থাকেন। পরে ভাবাবেশে অনুযোগের সুরে শিশুর মত অভিমানভরা কণ্ঠে আবার বললেন—"চোখে জল পড়ে না সবাই বলে। মা যদি না জল পড়ান তবে আমি কী করব? আবার কেউ কেউ বলে বেলে শিব—একটুতেই গলে যায়। যদি বেলে শিব বলেন তবে আমি কী করব?" আবার একটু থেমে বললেন—"যে জানতে চায়, সে ভালবাসতে পারে না। যে ভালবাসে সে জানতে চায় না। কতগুলি মুখ দেখেছি তারা বুঝতে চেষ্টা করে। ওরা বুঝতে পারবে না। আবার কতগুলি দেখেছি তারা ঝাঁপিয়ে পড়েছে। কত পরিচিত জন দূরে সরে গেল, আবার নূতন লোক এসে কোলে তুলে নিল!"

নিউ আলিপুরে হরিসাধনদার বাড়িতে নিয়মিত ভাবে বিকালের দিকে যাই। আবার কখনও কখনও রবিবার সুবিধা হলে সকালে ১০টার সময়ও যাই। সে সময় ঠাকুরের ঘরে দ্বিজেশদা, বিনয়, উমা ও আমিই যাবার সুযোগ পেয়েছিলাম নিয়মিত ভাবে। আর কাউকে আমি নিয়মিত ভাবে যেতে দেখিনি। বিকালের দিকে শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘরে মোড়া বা চেয়ারে আমরা সকলে বসতাম। ঠাকুর দিব্যভাবে আবেশিত অবস্থায় তদ্‌গত চিত্তে বিছানাতেই বসে থাকতেন। আমরা গিয়ে নিঃশব্দেই বসতাম। কখনও তাঁর হুঁশ হলে আমাদের সঙ্গে দু'একটি কথা বলতেন, কখনও বা চুপচাপ বসেই থাকতেন।

দোল পূর্ণিমার দুই একদিন পরে ঠাকুরের ঘরে শুনতে পেলাম বিনয়ের কণ্ঠস্বর। সে ঠাকুরকে বলছিল যে অফিসে সেদিন চুঁচুড়ার ভক্তদের মধ্যে একজনের সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল। তাঁর কাছেই সে জানতে পারে যে চুঁচুড়ায় শ্রীযুক্ত নন্দলাল ব্যানার্জির[1] বাড়িতেও দোল পূর্ণিমার দিন নামকীর্তনের ব্যবস্থা হয়েছিল, সেইজন্য সেখানকার ভক্তরা হরিসাধনদার বাড়িতে কীর্তনানন্দে যোগদান করতে পারেনি। কিন্তু সেখানে নন্দলালদার বাড়িতে কীর্তনের সময় একটি বিস্ময়কর ঘটনা ঘটেছিল।

নন্দলালদার বাড়িতে নামকীর্তন শুরু হবার একটু পরেই নন্দদার স্ত্রী বেলাদি, নন্দলালদা এবং যামিনীবাবু[2] এই তিনজনেই দেখতে পান যে গুরু ইষ্টবোধে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্য যে আসনটি পেতে রেখেছিলেন সেখানে ঠাকুর উপবিষ্ট এবং সেখানে শ্রীনাম শুরু হবার একটু পরেই আবার তিনি শূন্যে মিলিয়ে যান। এই অকল্পনীয় দৃশ্য দেখে তিনজনেই তাঁরা স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। ভাবে আবেশিত হয়ে তাঁরা কীর্তনানন্দে মগ্ন হয়েছিলেন সেদিন।

১। চুঁচুড়ায় স্টেশন রোডে যাঁর বাড়িতে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর যেতেন। ভোর থেকেই তাঁর বাড়িতে শুরু হত নামসংকীর্তন। বিশাল হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন নন্দদা—সাধারণ চাকরিজীবি হয়েও বাড়িতে অতিথিদের কাউকেই না-খাইয়ে কখনও ছাড়তেন না।
২। চুঁচুড়ার অধিবাসী ভজন গায়ক, শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরের ভক্ত। চুঁচুড়ার ভক্তদের মধ্যে আরও ছিলেন অতুল ঘোষাল, শংকর প্রমুখ।

বিনয় ভক্তটিকে জানায় যে নিউ আলিপুরে হরিসাধনদার বাড়িতে ঐ একদিনে একই ভাবে ধুতিটি পরে শ্রীশ্রীঠাকুর মহাভাবে নৃত্য করেছেন। চুঁচুড়ার ভক্তটি এবং বিনয় দুজনেই এই ঘটনাটিতে বিস্মিত হয়। বিনয় অফিস থেকে সোজা হরিসাধনদার বাড়িতেই চলে আসে। শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেয়ে এই অদ্ভুত অলৌকিক ঘটনাটির কথা বলে এবং ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করে যে কী করে একই সময়ে একই ব্যক্তির দুইটি বিভিন্ন স্থানে উপস্থিতি সম্ভব হয়। ঠাকুর কী ভাবে একই অবস্থায় একই সময়ে এবং একই ভঙ্গিমায় চুঁচুড়ায় এবং নিউ আলিপুরের বাড়িতে উপস্থিত হলেন?

বিনয় প্রশ্নটি করে শ্রীশ্রীঠাকুরের দিকে তাকিয়েছিল উত্তরের আশায়। ঠাকুর উদাসভাবে জানালা দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে নীরবে বসেছিলেন। বিনয়ের কথা শেষ হলে উদাস ভাবে একই ভাবে কিছুক্ষণ বসে থেকে ধীরে ধীরে মৃদুস্বরে বললেন—"এ (নিজের দিকে ইঙ্গিত করে) কিছুই জানে না। যাকে যা দেখাবার মা-ই দেখান।" কথা কয়টি বলে ঠাকুর আবার নীরবে বসে রইলেন জানালার দিকে চেয়ে।

বিস্মিত হয়ে বিনয় একবার দ্বিজেশদাকে, আরেকবার হরিসাধনদাকে ঘটনাটির বিবরণ দিতে থাকে। বিনয়ের এই বিস্মিত ভাব ও কৌতূহলী ভাব দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর অতি ধীরে ধীরে আবার বললেন—"একই আত্মার প্রকাশ যখন সমগ্র বিশ্বসংসার, জীবজগৎ, তখন দেশ-কাল, কার্য-কারণ-পাত্র সম্বন্ধ ধরে যা কিছু সম্ভব হয় তাতো একেরই প্রকাশ। এক আত্মাই তো সবকিছুর মধ্যে আছে। এই আত্মার বিজ্ঞানই তো সত্যের বিজ্ঞান। সবকিছু এক আত্মারই প্রকাশ। তাহলে এখানে অসম্ভবের আর প্রশ্ন ওঠে কেন? প্রত্যেকের অন্তরেই তো আত্মা আছে, সর্বস্থানেই তো আত্মা আছে। আত্মজ্ঞানীর কাছে এটা স্বতঃসিদ্ধ, স্বতঃস্ফূর্ত। আত্মজ্ঞানীর দেহবুদ্ধি থাকে না, বিষয়ের ভেদজ্ঞান থাকে না। দেশ-কাল-কার্য-কারণ-পাত্রের পার্থক্য অজ্ঞানের দ্বারা সাধিত হয়। আত্মজ্ঞানী অজ্ঞানমুক্ত থাকে বলে তার দ্বৈতবোধ বা বৈচিত্র্যের ধারণা থাকে না। কিন্তু সাধারণ মানুষের এই আত্মপ্রীতির অভাবে দেহপ্রীতি ও জগৎপ্রীতির আধিক্য বশত তার ভিতরে অজ্ঞানের বিলাস স্বাভাবিক ভাবেই হয়। সেইজন্য সে অন্তরে-বাইরে এক আত্মার মধ্যে বহু জীব এবং দেশ-কাল, কার্য-কারণ সম্বন্ধ ধরে পার্থক্য বা ভেদ ও বৈচিত্র্য অনুভব করে। এগুলি সবই অজ্ঞানের বিলাস ও অধ্যাস শুদ্ধ-আত্মার বক্ষে।"

সেদিন ছিল ২০শে মার্চ। বিকালে হরিসাধনদার বাড়ি পৌঁছে মা-মণির সঙ্গে প্রথম দেখা। শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা জিজ্ঞাসা করতেই মা-মণি আমাকে বলেন যে সেদিন সকাল থেকেই 'বাবাসোনা' অন্যদিনের তুলনায় একটু বেশি রকম অন্তর্মুখী অবস্থায় ছিলেন। বেলা প্রায় ৯টার সময়ে হরিসাধনদা তাঁকে রাস্তার দিকে বারান্দায় নিয়ে গেলেন। সেখানে ধ্যানস্থ হয়ে চোখ বুজে রইলেন। রাস্তায় এক ভিখারিনী মা-মা বলে চীৎকার করে কাপড় চাইছিল। সেই আর্তনাদ শ্রীশ্রীঠাকুরের কানে পৌঁছেছিল। একটু বাদেই সচকিত হয়ে টান টান করে চোখ মেলে তাকালেন। ধীরে ধীরে তিনি চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন এবং রেলিংয়ের কাছে গিয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে দেখলেন। তারপরেই নিজের পরনের কাপড়খানা খুলে ভিখারিনী মাকে দিয়ে দিলেন; নিজে রইলেন বিবস্ত্র হয়ে। মা-মণি ছুটে এসে হাসতে হাসতে তাঁকে নিয়ে নিজের ঘরের দিকে গেলেন। ঠাকুর তখন অর্ধবাহ্য অবস্থায়—মুখে শিশুর মত হাসি। শোবার ঘরে নিয়ে তাঁকে কাপড় পরিয়ে দেওয়া হল। একটু পরে ঠাকুর বললেন—"আমি কি করব?" নিজের বুকের দিকে আঙুল দেখিয়ে আবার বললেন—"এইখান থেকে বেরিয়ে এসে চাইল।" মা-মণি বললেন—"এইবার ন্যাংটা হয়ে ঘুরবে।" ঠাকুর বললেন—"ন্যাংটা হয়ে ঘুরলে সে তো মায়ের খেলা। মা আমার মুক্তকেশী দিগ্‌বসনা না? ন্যাংটা বলবে কেন? আকাশকে কি ন্যাংটা করা যায়? ভগবান, ভগবান করছে সবাই, কিন্তু তিনি যখন কাছে আসেন তখন আর দেখি না। প্রেমের ঠাকুর কাঙাল বেশেই তো আসেন। রাজবেশে এলে তখন তাঁকে receive করার মত ঐশ্বর্য আছে কি?" আবার তিনি ধ্যানস্থ হয়ে গেলেন।

সাতান্ন

নিউ আলিপুরে শ্রীশ্রীঠাকুরকে কেন্দ্র করে যে-সব ঘটনা ঘটেছে বা যে-সব তত্ত্বকথা প্রকাশিত হয়েছে সে-সব বিশদভাবে আমার পক্ষে লেখা সম্ভব নয়। কারণ আমি বিকালে দু'-তিন ঘণ্টা শুধু থাকতাম। সেই সময় তাঁকে দেখেছি কখনও ভাবস্থ অবস্থায় গান করতে, আবার কখনও বা সাধারণ অবস্থায় ঈশ্বরীয় কথা আলোচনা করতে।

হরিসাধনদা ও মা-মণির কাছে থাকাকালে ঠাকুরকে গোপালভাবেই থাকতে দেখেছি। তাঁকে তখন শিশু ছাড়া আর কিছুই মনে হত না। একজন যথেষ্ট পরিণত বয়সের লোককে শিশুভাবে কল্পনায় যেন আনা যায় না। কল্পনা করতে গেলে ঠিক ঠিক শিশুভাব আসে না। কিন্তু যাঁরা তাঁকে ঠিক সেই অবস্থায় দেখেছেন তাঁরা তাকে শিশু বা গোপাল ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারেন নি। এ কথা প্রত্যক্ষদর্শী অনেকের কাছেই আমি শুনেছি। কী ভাবে যে এটি সম্ভব তা নিজের চোখে না দেখলে ঠিক ঠিক বিশ্বাস করা শক্ত।

সর্বদা শিশু বোধে গোপালবোধে থাকলেও অনবরত তত্ত্বকথার স্ফুরণ যখন হত তখন শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধের মত চুপচাপ বসে শুনতেন। এই কথাগুলিও খুব স্পষ্ট জোরালো স্বরে উচ্চারিত হত না। প্রায় মৃদুস্বরে বা আধোআধো স্বরে উচ্চারিত হত। ভাবস্থ থাকার পরে প্রথম প্রথম যখন তিনি কথা বলতে আরম্ভ করতেন তখন অনেকেই লক্ষ্য করেছি যে তখন তাঁর জিহ্বাও মাঝে মাঝে জড়িয়ে যেত। যত প্রকৃতিস্থ হয়ে আসতেন ততই কথাও স্পষ্ট হয়ে আসত এবং তখন শিশুসুলভ ভাবটিও কোথায় যেন অন্তর্হিত হয়ে যেত। তত্ত্বপ্রসঙ্গ আলোচনা করতে করতে কখনও তিনি গান ধরতেন। এই সকল গানগুলি স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই বেরিয়ে আসত। গাইতে গাইতে আবার সমাধিস্থ হয়ে যেতেন। কতক্ষণ পরে যে এই সমাধি ভঙ্গ হবে তা বলা যায় না। সুতরাং বহুদিনই তাঁকে এই সমাহিত হয়ে থাকার অবস্থায় রেখেই আমরা বাড়ি চলে এসেছি। পুরো মার্চ মাসই এইভাবে চলে যায়।

দিব্যোন্মাদ অবস্থায় হরিসাধনদার বাড়িতে থাকার সময় মার্চ মাসের শেষের দিকে অথবা এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহেই, যে-স্কুলে মাস্টারমশাই শিক্ষকতা করতেন সেই স্কুলের হেডমাস্টারমশাই এবং আরও কয়েকজন মাস্টারমশাই যাঁরা তাঁকে খুব ঘনিষ্ঠ ভাবে চিনতেন এবং জানতেন তাঁরা মাস্টারমশাইর (সুশীলবাবুর) কোন খোঁজখবর না-পেয়ে হরিসাধনদার বাড়িতে তিনি আছেন জেনে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন।

সেখানে তাঁরা হরিসাধনদার কাছে জানতে পারলেন যে তিনি ভাবস্থ অবস্থায় একরাতে সংসার ত্যাগ করে চলে এসেছেন। তবে তাঁর দ্বারা আর কোন কাজ করা সম্ভব হবে না। তিনি বহির্জগতের সবকিছুই ত্যাগ করে এসেছেন। বাহ্যজগতের কোনকিছুরই তাঁর আর প্রয়োজন নেই। প্রায় সর্বক্ষণ তিনি অন্তর্মুখী অবস্থাতেই থাকেন।

কয়েকদিন পরে হেডমাস্টারমশাই মাস্টারমশাই (সুশীলবাবু) যে কয়মাসের মাইনে আর নেননি সেই টাকা এবং প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকাপয়সা নিয়ে সুশীলবাবুকে দেবার জন্য এক দুপুরে এসে উপস্থিত হলেন। হরিসাধনদা সুশীলবাবুকে নিয়ে ঘরে এলেন। তিনি ভাবস্থ অবস্থাতেই ছিলেন। তাঁর দিব্যভাব দেখে হেডমাস্টারমশাই একেবারে অভিভূত হয়ে গেলেন। দু'-তিন মাসের মধ্যেই যে এইরূপ দিব্য ঈশ্বরীয় ভাবে কারও রূপান্তর হতে পারে, এইরূপ জ্যোতির্ময় রূপ হয়ে যেতে পারে, তা দেখে হেডমাস্টারমশাই একেবারে বিস্মিত হয়ে গেলেন। হেডমাস্টারমশাইর এখানে আসবার অভিপ্রায় শুনে মাস্টারমশাই (সুশীলবাবু) বললেন, " 'এর' সব প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। কোনও কিছুরই আর প্রয়োজন নেই।"

হেডমাস্টারমশাই বললেন—"আইনত আমি আপনার যত প্রাপ্য সব দিতে বাধ্য। আপনার যাকে খুশি দিয়ে দেবেন। আপনি শুধু এই কাগজটিতে একটা সই করে দেবেন।" এই কথা বলে কলমটি তাঁর দিকে একটু এগিয়ে দিলেন। মাস্টারমশাইর সর্বদেহে শিহরণ হতে লাগল। হাত কুঁকড়ে বাঁকা হয়ে গেল। হেডমাস্টারমশাই এ সব দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। হরিসাধনদা তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে মাস্টারমশাইকে সরিয়ে দিলেন। হেডমাস্টারমশাই এবং হরিসাধনদা দুজনেই বুঝতে পারলেন যে মাস্টারমশাইকে (সুশীলবাবুকে) দিয়ে

টাকাপয়সাও যেমন স্পর্শ করানো যাবে না, কলমও স্পর্শ করানো যাবে না। হেডমাস্টারমশাই বিস্মিত হয়ে এবং নিরুপায় হয়ে টাকাপয়সা সব নিয়ে চলে গেলেন।

এই বিশেষ ঘটনাটি আমি হরিসাধনদার মুখেই শুনেছি সন্ধেবেলা। সেইদিন থেকে জীবনে কোনদিন টাকা-পয়সাও ছুঁতে দেখেনি এবং কলমও ধরতে দেখিনি। সেইজন্য আজ পর্যন্ত তাঁকে টাকাপয়সা এবং কলম ধরতে কেউ কখনও দেখেনি।

এপ্রিল মাস এসে গেল। এই সময় শ্রীশ্রীবাবা আগের তুলনায় অনেক প্রকৃতিস্থ হয়ে এসেছেন। যদিও দিনের অনেক সময়েই অন্তঃস্থ হয়ে থাকেন। হরিসাধনদা ঠাকুরের স্নান ও আহারের পর্ব চুকে গেলে, তাঁকে শুইয়ে অফিসে চলে যান অল্প সময়ের জন্য। আবার অফিস থেকে ফিরে এসে দেখতে পান যে হয় তিনি শবাসনে বিছানায় সমাধিমগ্ন অবস্থায় আছেন অথবা কখনও অর্ধবাহ্য অবস্থায় বিছানায় বসে আছেন।

এই সময় একদিন অফিস থেকে ফিরে এসে তিনি দেখেন যে ঠাকুর গভীর সমাধিমগ্ন। কিছুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে বাহ্যজ্ঞান ফিরে আসতে থাকে। হঠাৎ হরিসাধনদা দেখলেন—ঠাকুরের বাঁ পা হাঁটুর নিচের থেকে উল্টে গেল। বাহ্যজ্ঞান পুরোপুরি ফিরে আসবার পরে হরিসাধনদা পা'খানা সোজা করে দিতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না। অনেকক্ষণ পরে পা'খানি আপনা হতেই সোজা হয়ে গেল। শ্রীশ্রীঠাকুর তখন ধীরে ধীরে বললেন— "মা শরীর নিয়ে কী করেন অপরে তা কী করে বুঝবে?" তখন বাঁ পা (হাঁটু থেকে নিচে পর্যন্ত) ছিল ঠাণ্ডা, কিন্তু ডান পা ছিল গরম। হরিসাধনদা এর কারণ জিজ্ঞাসা করাতে ঠাকুর বললেন—"এই দেহের একদিকে কালী, অন্যদিকে কৃষ্ণ অধিকার করেছিল।" তারপরে তিনি একটু থেমে আবার বলেছিলেন—"কত ঘটনা ঘটবে, মা কত যে খেলা দেখাবেন।"

এপ্রিল মাসের ১০ বা ১১ তারিখে আমি কয়েকদিনের জন্য পুরীতে যাই। পুরী থেকে ফিরেই আমি আবার নিউ আলিপুরের সান্ধ্য আসরে উপস্থিত হই। এসে দেখলাম আজকাল অনেক লোকের সমাগম হচ্ছে। বসবার হল ঘরের পার্টিশন সরিয়ে নিয়ে সতরঞ্চির উপরে সকলের বসবার জন্য জায়গা করা হয়েছে যাতে অনেকে বসতে পারে। নির্দিষ্ট আসনে শ্রীশ্রীঠাকুরকে এনে বসান হয়। তিনি যুক্তকরে প্রবেশ করেন। আসনে বসেই সর্বরূপে-বিরাজিতা সচ্চিদানন্দময়ী মাকে ভূমিষ্ঠ হয়ে অনেকক্ষণ ধরে প্রণাম করেন এবং পরে আসনে উপবেশন করে মুদিত নয়নে অনেকক্ষণ বসে থাকেন। ঘরে উপস্থিত সকলেই নির্বাক হয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা শুনবার জন্য প্রতীক্ষা করেন। প্রায় ১০/১২ মিনিট পরে কখনও তিনি গান ধরেন ভাবস্থ অবস্থায় নয়তো ঈশ্বরপ্রসঙ্গ করেন। এই সকল গান ও প্রসঙ্গ হরিসাধনদার ডায়েরিতে লেখা আছে। গানগুলি সবই "স্বানুভবসুধা"-র প্রথম খণ্ডে ছাপানো হয়েছে।

১লা মে থেকে সকলের ইচ্ছানুযায়ী দ্বিজেশদা, বিনয়, উমা এবং আমি শ্রীশ্রীঠাকুরপ্রদত্ত ভাষণগুলি লিখতে আরম্ভ করি। দুই সপ্তাহ পরে বিনয় ও উমা লেখা ছেড়ে দেয়, কিন্তু দ্বিজেশদা এবং আমি সেইদিন থেকে লিখে চলেছি নিয়মিত ভাবে। (শুনেছি যে হরিসাধনদা এবিষয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের অনুমতি চেয়েছিলেন; ঠাকুর কিন্তু প্রথমে কিছুতেই রাজি হননি। তিনি স্পষ্ট বলেছিলেন এ সব কথা তোমরা লিখে রাখতে পারবে না। এইগুলি লিখতে গেলে অধিকার দরকার হয়। অধিকারী পুরুষ ভিন্ন অপরের পক্ষে এ সব দিব্যভাবের বর্ণনা এবং গভীর তত্ত্বমূলক কথা সঠিক ভাবে ধরে রাখা সম্ভব নয়। সে কথা শুনে হরিসাধনদা ঠাকুরকে জড়িয়ে ধরে আদর করে অনুমতি আদায় করে নিয়েছিলেন। তাই হরিসাধনদা এই কথাগুলো এবং ঘটনা তার সাধ্যমত কিছুটা ধরে রাখার চেষ্টা করেছেন। হরিসাধনদার কথায় আর যারা আরম্ভ করেছিল তারা অল্প কিছু কথা কোনমতে চেষ্টা করেছিল ধরে রাখার, পুরোপুরি পারেনি। সেইজন্য তারা আর লিখতে চেষ্টা করেনি। কেবলমাত্র আমি আর দ্বিজেশদাই যেটুকু পেরেছি ধরে রাখার চেষ্টা করেছি। বেশির ভাগ কথাই আর ধরে রাখা সম্ভব হয়নি আমাদের অযোগ্যতার জন্য।

এযে কী দুরূহ কাজ যুক্তি ও বুদ্ধি দিয়ে তার হদিশ মিলবে না।.... পরবর্তী কালে শ্রীশ্রীবাবার ভাষণ শুনতে বহু জ্ঞানী-গুণীই এসেছেন, অনেকেই কথাগুলো ধরে রাখার চেষ্টা করেছেন কিন্তু কেউই সফল হন নি। শ্রীশ্রীঠাকুরের মুখেই শুনেছি দিব্যভাবের প্রকাশাদি সব মুখে ব্যক্ত করা যায় না তত্ত্বকথাও বুদ্ধিবিজ্ঞানের অতীত। অর্থাৎ, বুদ্ধির ঊর্ধ্ব হতে স্বতঃস্ফূর্ততা নেমে আসে, প্রকাশ পায়। বুদ্ধিশুদ্ধি না হলে তত্ত্বস্ফূর্তি হয় না, দিব্যভাবের বর্ণনাও ব্যক্ত করা যায় না। এই ব্যাপারে সাধন সংস্কার এবং ঈশ্বরের মহান ইচ্ছার এই হল সফলতার কারণ....।

আমরা আমাদের সাধ্যমত সবকিছু করি কিন্তু তার পিছনেও যে ঈশ্বরের ইচ্ছাই কারণরূপে থাকে তা আমরা জানি না, অনেকে মানেও না। যাই হোক সেই যে লেখার চেষ্টা শুরু করেছিলাম এখন বুঝি যে ঠাকুরের ইচ্ছাতেই তা সম্ভব হয়েছিল এবং যা-কিছু সংগ্রহ করা হয়েছে তা তাঁর কৃপাতেই হয়েছে। আমার মত অযোগ্যকে দিয়েই তিনি তাঁর কাজ করালেন। কত শিক্ষিত জ্ঞানী-গুণীইতো এসেছিল, তারা কিছুই ধরে রাখার প্রয়োজন মনে করেনি। অথবা তাদের যোগ্যতার অভাব ছিল, কিন্তু পরবর্তী কালে দীর্ঘকাল ঠাকুরের সঙ্গ যারা করেছে অনেক কথাই তারা জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে নিজেদের কথা বলে চালাবার চেষ্টা করেছে। এই ভাবের ঘরে চুরির অভ্যাস অনেকেরই আছে এই কথাও ঠাকুরের মুখে শুনেছি। শ্রীশ্রীঠাকুরের সোজা কথা—"নয়গো সোজা তত্ত্বকথা, যায় না পাওয়া তা যেথা সেথা। মন মুখ যার এক হয়নি তার মুখে তত্ত্বকথা সবই বৃথা।"....

সেদিন হরিসাধনদা বহু অনুনয় বিনয় ও অনুরোধ করে যে লেখার অনুমতি চেয়েছিলেন তাতে ঠাকুর ঘাড় কাৎ করে সম্মতি দিয়েছিলেন।) ১লা মে, ১৯৬৮ সন থেকে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাষণগুলি সংরক্ষিত হয়েছে বলে সে সব কথা এখানে আর উল্লেখ করব না।

৮ই মে, ২৫শে বৈশাখ, সন্ধেবেলায় একটি মজার ঘটনা ঘটেছিল। সেই বিষয়ে এখানে একটু উল্লেখ না-করে পারলাম না। সেদিন ছিল বুধবার। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় নামে একজন গায়ক এসেছেন শ্রীশ্রীঠাকুরকে শ্যামাসঙ্গীত শোনাবার জন্য। কার মাধ্যমে সংবাদ পেয়ে তিনি মহাপুরুষকে গান শোনাতে এসেছেন তা এখন আমার মনে নেই। তাঁর সঙ্গে আরও কয়েকজন বন্ধুও এসেছিলেন মহাপুরুষের দর্শন আকাঙ্ক্ষায় সেটি আমার মনে আছে।

প্রায় ৬টার সময় খালি গায়ে ধুতির আঁচলটুকু গায়ে জড়িয়ে ঈষৎ ভাবস্থ অবস্থাতেই শ্রীশ্রীঠাকুর হলঘরটিতে প্রবেশ করলেন এবং ভূমিষ্ঠ হয়ে অনেকক্ষণ ধরে উপস্থিত ভক্তদের সামনে প্রণাম করে নির্দিষ্ট আসনে বসলেন। হরিসাধনদা নিজেই হারমোনিয়ামটি নিয়ে এসে ধূর্জটিপ্রসাদের সামনে রাখলেন।

প্রণাম জানিয়ে ধূর্জটিপ্রসাদ গান আরম্ভ করলেন। চোখ বুজে গান শুনতে শুনতে ঠাকুর সমাধিমগ্ন হলেন। পরপর কয়েকটি গান গাইবার পরে গায়ক হঠাৎ চীৎকার করে শুয়ে পড়লেন এবং বলতে লাগলেন—"এ আমার কী হল? এ রকম তো কখনও হয়নি। মা, এ কী হল?" হাত পা ছড়িয়ে মেঝেতে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন তিনি। তাঁর বন্ধুবান্ধব সকলেই তাঁর অবস্থা দেখে ভয় পেয়েছিলেন। কেউ যেতে চেয়েছিলেন ডাক্তারের কাছে, কেউ বা বাড়িতে টেলিফোন করার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। এরকম ঘটনার জন্য তাঁরা কেউ প্রস্তুত ছিলেন না, কারণ কোন দিন তাঁরা এরকম ঘটনা ঘটতে দেখেন নি।

শ্রীশ্রীঠাকুর নির্বাক। পূর্ণ সমাধিস্থ। ধীরে ধীরে তিনি প্রকৃতিস্থ হলেন। গায়কের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। তারপরে তাঁর দিকে চেয়ে মৃদু মৃদু হাসছেন। ধীরে ধীরে গায়ক স্বাভাবিক হতে লাগলেন।

ঠাকুর প্রশ্ন করলেন—"কীরে, কেমন লাগছে?"

ধূর্জটিপ্রসাদ—"এখন খুব ভাল লাগছে। মনে হচ্ছে কে যেন আমার গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। সমস্ত শরীরে যেন কী রকম আমার লাগছে।"

শ্রীশ্রীঠাকুর—"আগে কেমন লেগেছিল?"

ধূর্জটিপ্রসাদ—"মনে হয়েছিল হঠাৎ একটা বিদ্যুৎপ্রবাহ সমস্ত শরীরে প্রবাহিত হয়ে গেল এবং আমার শরীর যেন অবশ হয়ে গেল।"

ঠাকুর —"এতটুকুতেই এই?"

কিছুক্ষণ নীরব থেকে আবার তিনি বলতে শুরু করেন—"আকর্ষণ সেখান থেকেই আসে যেখানে আনন্দ আছে। আনন্দ হল সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি। এই শক্তিই রাধা। এই শক্তির মূল কেন্দ্রই হল কৃষ্ণ। আনন্দ ছড়িয়ে আছে বিশ্বের সর্বত্র। সর্বপ্রকার কর্মের মূলে হল আনন্দ এবং সর্ব আনন্দের মূলে হল আত্মস্বরূপ কৃষ্ণ।

"আনন্দের প্রতিদ্বন্দ্বী নেই, তবে তার অভিব্যক্তির তারতম্য আছে। ভাবকে অবলম্বন করেই তা প্রকাশ পায়। পরস্পর প্রকাশের মধ্যে ভাবের তারতম্য হেতু দ্বন্দ্ব, বিচ্ছেদ ও মিলন হয়। ভাবেরই বিকার হল কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য ইত্যাদি।

"কামনা প্রতিহত হলেই হয় ক্রোধ। ক্রোধ বাধাপ্রাপ্ত হলে হয় সম্মোহ। সম্মোহ দ্বারা শুদ্ধবোধের স্মৃতি আবৃত হয়, তারপরে বুদ্ধিবিভ্রম হয় এবং নানাবিধ অশান্তি ও দুঃখকষ্টের কারণ সৃষ্টি হয়। তখন তামসিকতা, জড়তা, অলসতা, শোক, মোহ প্রভৃতি প্রকাশ পায়। সেইরূপ ভাব যখন আসে তখন ভাবের গতিকে বাধা না-দিয়ে একাগ্রচিত্তে লক্ষ্য করতে হয়।

"ভাব দ্বিবিধ—শুভ ও অশুভ। অশুভ ভাব বর্হির্মুখী হয়ে মনকে বিক্ষিপ্ত করে। শুভ ভাব মনকে অন্তর্মুখী করে স্থির করে দেয়। অন্তর্মুখী ভাবকেই সাত্ত্বিক ভাব বলে। সাত্ত্বিক ভাবই শ্রদ্ধা ভক্তি, বিশ্বাস ও শুদ্ধ মনের ধারক, বাহক ও পরিবেষক।

"আত্মার স্বভাবই হল বিশুদ্ধ জ্ঞান বা প্রেমভক্তি। এই বিশুদ্ধ জ্ঞানের প্রকাশের নামই অনুভূতি। এ ইন্দ্রিয়াতীত। আবার শুদ্ধমন ইন্দ্রিয়ের মধ্যেও প্রকাশিত হয়। ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে প্রকাশকালে তা বৈচিত্র্যরূপে ছড়িয়ে পড়ে। তার ফলে পরস্পর প্রকাশের মধ্যে ভেদ বা পার্থক্য প্রতীয়মান হয়। হৃদয়ের একবোধই বাইরে বহুরূপে প্রকাশ পায় মন ও ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে। আনন্দস্বরূপ ঈশ্বর বা আত্মা সর্বময়। সমগ্র বিশ্ব তাঁর পরিচয়। কিন্তু ইন্দ্রিয়ের দৃষ্টিতে পৃথক পৃথক মনে হয়।"

শ্রীশ্রীঠাকুর আরও বললেন—"সিদ্ধপুরুষদের মধ্যে কচিৎ কেউ কখনও তত্ত্বত তাঁকে জানতে পারে। শিব ও কৃষ্ণ অভেদ। শিবের মধ্যে যখন মা খেলেন তখন তিনি নিজেকে ছেড়ে শুয়ে পড়েন।

"সত্যই শিব, তিনিই হরি, তিনিই কৃষ্ণ। 'স্ব'-এর আনন্দভাবকে হ্লাদিনী শক্তি বলে। এই শক্তি জ্ঞান, আনন্দ ও প্রেমের পরিপূরক। এরই ঘনীভূত মূর্তি হল রাধা। সেই জন্য রাধার ভাবকে শিব ও কৃষ্ণ কামনা করে। সকলের প্রাণেই এই শক্তি নিহিত আছে। অনুভবসিদ্ধের মাধ্যমে এই জাগরণ ও উন্মেষণ হয়। শ্বাসে শ্বাসে নাম করতে হয়। তাহলে প্রাণ মনের শোধন হয় ও বিকার কেটে যায়। চৈতন্যময় প্রাণই হল সত্য ব্রহ্ম আত্মা ঈশ্বর। প্রাণ অমর। দেহের পরিবর্তন হয়; দেহ হল প্রাণের পোশাক। দেহ পরিবর্তনের অর্থ হল পোশাক পরিবর্তন।"....

হরিসাধনদা এই সময়ে শ্রীশ্রীঠাকুরকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে সাড়ে আটটা বেজেছে। ঠাকুর এখানেই সেদিনকার মত তত্ত্ব আলোচনা শেষ করে সকলকেই সচ্চিদানন্দময়ী মাতৃবোধে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলেন। প্রণামান্তে যুক্তকরে দাঁড়িয়ে ভাবস্থ অবস্থাতেই মৃদুস্বরে নাম করতে করতে তাঁর শয়নঘরে চলে গেলেন।

মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে শুনতে পেলাম যে হরিসাধনদা ও মা-মণি দার্জিলিং-এ তাঁদের মেয়ে-জামাই-এর বাড়িতে কয়েকদিনের জন্য বেড়াতে যাবেন। এই সময় দ্বিজেশদা, বিনয় ও উমা এসে তাঁর বাড়িতে থাকবেন ঠাকুরের সেবাযত্নের জন্য। তার কয়েকদিন পরেই শুনতে পাই আমার স্বামী ঠাকুরকে অনুরোধ করেছেন ফার্ণ রোডে আমাদের বাড়িতে থাকার জন্য। ঠাকুর তাতে সম্মত হয়েছেন। সুতরাং ঠিক হল যে ১৯শে মে, রবিবার, সন্ধেবেলায় শ্রীশ্রীঠাকুর আমাদের বাড়িতে আসবেন।

একষট্টি

১৯শে মে, রবিবার। বিকেল প্রায় ৫টায় আমার স্বামী অতি আদরের সঙ্গে মাস্টারমশাইকে নিয়ে এলেন ফার্ণ রোডের বাড়িতে, সঙ্গে এল বিনয়। মাস্টারমশাই এখনও দিব্যভাবে বিভোর। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠবার সময়ে একেবারেই স্বাভাবিক ছিলেন না। খুব সযত্নে অতি ধীরে ধীরে তাঁকে উপরে নিয়ে আসা হল। উমা আজ সকাল থেকেই আমাদের বাড়িতে ছিল। তাঁর বিছানা, বসবার জায়গা প্রভৃতি যা প্রয়োজন হবে সবই গুছিয়ে রাখা হয়েছিল। মাস্টারমশাইকে ধীরে ধীরে দোতলার মাঝখানের বড় ঘরটায়[১] খাটের উপরে বসিয়ে দেওয়া হল। মুখে তাঁর মধুর হাসিটি লেগেই ছিল। কিন্তু বাহ্যদৃষ্টি খুব প্রখর নয়। অন্তর্মুখী হয়েই তিনি বসে রইলেন।

মাস্টারমশাই আসবার পরেই খোকন ও বুলু (আমার পুত্র ও পুত্রবধূ) ঘরে এসে ভূমিষ্ঠ হয়ে দু'জনে প্রণাম করল। মাস্টারমশাই তাদের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। তারপরে খোকন ও বুলুর দিকে তাকিয়ে তাদের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করলেন। তারপরে উমা এবং আমিও ভূমিষ্ঠ হয়ে তাঁকে প্রণাম করি। তিনি আমাদেরও মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করেন। তারপরেই আবার নীরব হয়ে গেলেন। থেকে থেকেই তিনি অন্তর্মুখী হয়ে যাচ্ছিলেন। মাঝে মাঝে দুই একটি কথা বলছিলেন অতি অস্ফুষ্ট স্বরে। জিভ্ জড়িয়ে যাচ্ছিল। মনে হল কথা বলতে খুবই কষ্ট হচ্ছিল। একটু পরে দ্বিজেশদা ও রঞ্জিত এল। মাস্টারমশায়ের কথা বলতে কষ্ট হচ্ছিল দেখে দ্বিজেশদা ও রঞ্জিত নিজেদের মধ্যেই কথাবার্তা বলে চলল। এর পরেই আমাদের বাড়ির দীর্ঘকালের পুরানো লোক সরযূ এসে ধূপধুনো নিয়ে প্রবেশ করল। মাস্টারমশাইয়ের শয়নঘরে প্রবেশ করার দরজার উপরেই মা-কালীর একখানা ছবি ছিল সেই মূর্তিতে অনেকক্ষণ ধরে ধূপধুনো দেখাল। মাস্টারমশাই খাটে বসে মায়ের মূর্তির দিকে অনেকক্ষণ ধরে প্রণাম জানালেন। সেই সময় আমরাও কয়েকজন প্রণাম জানাই। ঘর থেকে ধুনুচি নিয়ে চলে যাবার সময় সরযূও ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে চলে গেল।

এর পরে চা-পর্ব শেষ হবার একটু পরেই শ্রীযুক্ত শৈলেন গুহরায়[২] এবং তার পত্নী স্মৃতি গুহরায় (আমার গুরু ভগিনী) আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন। মাস্টারমশাই এসেছেন শুনে তাঁরাও ঘরে প্রবেশ করে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলেন। মাস্টারমশাই তাঁদের প্রতিপ্রণাম করলেন। গুরুবাদ সম্বন্ধে শৈলেনদা প্রশ্ন করাতে গুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে অতি পরিষ্কার ভাবে মাস্টারমশাই তাঁদের বুঝিয়ে দিলেন। খানিকক্ষণ পরে উপস্থিত সকলকে প্রসাদ দেওয়া হল এবং একে একে সবাই চলে গেলেন।

অনেকক্ষণ বিশ্রাম নেবার পরে রাত্রির খাবার মাস্টারমশাইকে শোবার ঘরেই দেওয়া হল। মাস্টারমশাই আসবার পরে এই প্রথম রাতটির কথাই শুধু উল্লেখ করলাম আজ।

দার্জিলিং থেকে হরিসাধনদা বোধহয় দিন দশেক বাদেই কলকাতায় ফিরে এসেছেন। তার দু'এক দিন পরেই তাঁদের 'বাবাসোনা'-কে নিয়ে যাবার জন্য আমাদের বাড়িতে এলেন। তাঁর 'বাবাসোনা'র কুশল ও সকলের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করার পরে হরিসাধনদা 'বাবাসোনা'কে নিয়ে যাবার প্রসঙ্গ তুললেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মাস্টারমশাইর যাওয়া আর সম্ভব হল না—এখানকার কাজ শেষ হয়নি বলে। ১৯শে মে, রবিবার, মাস্টারমশাই ফার্ণ রোডের বাড়িতে এসেছিলেন। এই ফার্ণ রোডের বাড়িতে তিনি দীর্ঘকাল (প্রায় ৩০ বৎসর) কাটিয়েছেন।

আজ আমি আরেকটি বিশেষ সংবাদ লিখছি—যিনি পরব্রহ্ম পরমাত্মবোধে প্রতিষ্ঠিত, যাঁকে সকলে হৃদয়সিংহাসনে বসিয়ে পূজা করে তাঁকে আমাদের ব্যক্তিগত ইচ্ছানুযায়ী নামে ডাকতে দ্বিধা হয় এবং আমরা সংকুচিত হই। যিনি আদিদেব শিবমহেশ্বর তাঁকে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বলেই আমরা উল্লেখ করব, কোন জাগতিক নাম

১। এই ঘরটাই তাঁর থাকার জন্য নির্দিষ্ট হয়েছে। ঘরের লাগাও বাথরুম রয়েছে। এই ঘরেরই সামনের দিকে গোল বারান্দায় তাঁর বসবার ব্যবস্থা করা হয়েছে যাতে সেখানেই তিনি ভক্তদের সঙ্গে বসে কথা বলতে পারেন। এই বারান্দার দক্ষিণ দিকেই হল আমাদের শোবার ঘর।

২। কলকাতার বিখ্যাত মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান শ্রী সরস্বতী প্রেসের তদানীন্তন ম্যানেজিং ডাইরেক্টর।

যেন মানায় না। সেইজন্য ১৯৭০ সালের ৯ই জানুয়ারি থেকে আমরা সকলেই শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বলেই তাঁকে ডাকছি। হরিসাধনদা ও মা-মণি শুধু রামগোপাল বোধে বাৎসল্য রসে সিঞ্চিত করে চিরকাল 'বাবাসোনা' বলেই ডেকেছেন। এর অন্যথা কোনদিনই হতে দেখিনি আমরা।

এবার ১৯৬৮ সালের মার্চ মাসের শেষের দিকের একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার কথা উল্লেখ করছি। ঘটনাকালের অনুক্রম রক্ষা করে এটি আগেই উল্লেখিত হতে পারত, কিন্তু আমার বক্তব্যের সঙ্গে কিছুটা অসম্পৃক্ত মনে হতে পারে বিধায় এই বিশেষ ঘটনাটি এখানে উল্লেখ করছি।

হরিসাধনদা যথারীতি কাঁকুলিয়ার সান্ধ্য আসরে আসতে থাকেন মা-মণিকে নিয়ে। তাঁর গুরুভাইদের মধ্যে দ্বিজেশদা, নিখিল আখড়াধারী এবং কখনও কখনও তাঁদের জন্য গুরুভাইরাও আসতেন। একদিন অফিস থেকে তাড়াতাড়ি ফিরে হরিসাধনদা কাঁকুলিয়ার ঘরে শ্রীশ্রীঠাকুরকে কথাপ্রসঙ্গে খুব দুঃখের সঙ্গে জানালেন যে তাঁর দেশের বাড়ি গোপালপুরে রাধামাধবের মন্দির থেকে শ্রীরাধার অষ্টধাতুর বিগ্রহ চুরি হয়ে গেছে। তাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে মদনমোহন বলেই ভাবতেন। রাধাবিহীন মদনমোহনের পূজা শাস্ত্রসম্মত হবে কিনা এ বিষয়ে তাঁর পরিচিত কয়েকজন বৈষ্ণব মহাজনের সঙ্গে তিনি আলোচনা করেছেন। তাঁরা সবাই নূতন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার কথাই বলেছেন। এ বিষয়ে হরিসাধনদা শ্রীশ্রীঠাকুরের মত জানতে চাইলে ঠাকুরও তাঁকে এ সম্পর্কে বিশেষ নির্দেশ দিয়ে কী ভাবে অষ্টধাতুর বিগ্রহ তৈরি করা হবে সে সম্বন্ধে তাঁর মত প্রকাশ করেছিলেন।

গরানহাটার সোনাপট্টিতে এক বিশেষ পরিবার এই অষ্টধাতুর মূর্তি তৈরি করত। সবাই এই অষ্টধাতুর বিগ্রহ তৈরি করতে পারে না। যে-পরিবার তা তৈরি করত সে-পরিবারের একজনমাত্রই তখন জীবিত ছিলেন। তিনি খুবই বয়স্ক এবং নানা কারণেই তিনি এই মূর্তি তৈরি করতে অসম্মত হন। শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ নির্দেশানুসারে হরিসাধনদা তাঁকে খুব অনুনয়-বিনয় করে বলায় তিনি শেষ পর্যন্ত রাজি হন। দেড় মাস লেগেছিল তাঁর এই বিগ্রহ তৈরি করতে।

যথানির্দিষ্ট দিনে হরিসাধনদার নিউ আলিপুরের বাড়িতে বিগ্রহ নিয়ে আসা হল। শ্রীশ্রীঠাকুর সব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করে দেখে কারিগরকে বললেন যে নূতন করে কিছু অঙ্গরাগ ও চক্ষুদান করতে হবে। কারণ তা যে-রকম হওয়া উচিত ছিল তা হয়নি। সেই কারিগর একদিন পরে রঙ-তুলি দিয়ে যায়। পরের দিন সারাদিন বন্ধ ঘরে বিগ্রহের অঙ্গরাগ ও চক্ষুদান করে মূর্তিকে শালু কাপড়ের টুকরো দিয়ে ঢেকে রাখা হল এবং ঢাকা অবস্থায় মূর্তিকে কাউকে দেখতে না-দিয়ে ঘরে রাখা হল। নির্দিষ্ট দিনে ঐ অবস্থাতেই বিগ্রহকে নিয়ে গোপালপুর যাওয়া হয়। পরের দিন প্রতিষ্ঠা দিবসে বিগ্রহকে যথাবিধি স্নান করিয়ে এবং যজ্ঞ হোমাদি সম্পন্ন করে শাস্ত্রবিধি অনুসারে চারজন পুরোহিত মিলে প্রতিষ্ঠা কার্য সম্পন্ন করেন।

এই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে আগের দিন সন্ধ্যায় বন্দনাদি কীর্তন হয়। পরের দিন প্রভাত সঙ্গীত এবং কীর্তন সহযোগে প্রদক্ষিণ করা হয় এবং নাটমন্দিরে চারদল পরপর নামকীর্তন করতে থাকে। অন্য দিকে মন্দিরে একপাশে হোম চলতে থাকে, আর একপাশে ভাবগত পাঠ হয় এবং দুইজন পুরোহিত মিলে বিগ্রহের স্নান, পূজা ও ভোগারতি সম্পন্ন করেন। সকাল আটটা থেকে বেলা দু'টো পর্যন্ত চলে এই প্রতিষ্ঠা পর্ব। তারপর ভোগ বিতরণ এবং কীর্তন সমাপন। মহা ধূমধামের সঙ্গে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন হল। হরিসাধনদার প্রতিবেশীগণ এবং গ্রামের জনসাধারণও এই উৎসবে যোগ দিয়েছিলেন।

এই উপলক্ষ্যে হরিসাধনদার বাড়ির সবাই শ্রীশ্রীঠাকুরকে সঙ্গে নিয়ে যেমন গোপালপুরে গিয়েছিলেন, তেমনি আরও দু'টা গাড়ি করে আরও অনেকেই কলকাতা থেকে গিয়েছিলেন—তাঁদের মধ্যে উমা, বিনয়, দ্বিজেশদা, হরিসাধনদার মামা-মামীমা, ভনা, রথীন ও আরও কেউ কেউ। উমা, বিনয়, হরিসাধনদা শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গেই গিয়েছিল, বাকি সবাই গিয়েছিল অন্য দু'টো গাড়িতে।

তেষট্টি

হরিসাধনদার গোপালপুরের বাড়িতে দোতলার একটি ঘরে ঠাকুরের থাকবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল—ঘরের সঙ্গেই বাথরুম। অপর দিকেই হরিসাধনদা ও মা-মণির ঘর। বিনয় ও উমা ছিল একতলায়। পরের দিন সকালে একটি গাড়িতে যায় হরিসাধনদার পুত্র, পুত্রবধূ, দুই পৌত্র এবং তাঁর কন্যা, অন্য একটি গাড়িতে যায় বাকি সবাই।

এই প্রসঙ্গে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল সেদিন রাত্রে আহারের পর ঠাকুরকে তাঁর ঘরে মশারী টাঙিয়ে শুইয়ে দিয়ে হরিসাধনদা ও মা-মণি উভয়েই ঠাকুরকে অনেকক্ষণ ধরে আদর করে পাশের বাথরুম সম্বন্ধে সব বলে কয়ে তাঁদের নিজেদের ঘরে চলে গেলেন—রাত তখন ১১টা। রাত তিনটে থেকে শ্রীশ্রীঠাকুরের জলের মত পাতলা পায়খানা শুরু হয়। পাঁচ/ছয়বার ঘনঘন পায়খানা হবার পর ঠাকুর খুবই অবসন্ন হয়ে পড়েন। তৃতীয় বার যখন বাথরুমে যান তখন হরিসাধনদা ও মা-মণি উঠে আসেন এবং সব জানতে পারেন। হরিসাধনদা বাকি রাত শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘরেই থেকে যান এবং তাঁকে বাথরুমে নিয়ে যেতে সাহায্য করেন। সকাল সাড়ে ছ'টার পর প্রভাত সঙ্গীত শুনতে শুনতে ঠাকুর ঘুমিয়ে পড়েন। সেই সুযোগে হরিসাধনদা ও মা-মণি তাঁদের প্রাতঃকৃত্য সমাপন করে কাপড় বদলে শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘরে এসে দেখেন ঠাকুর শয্যায় বসে আছেন ভাবস্থ অবস্থায়। তিনি তাঁকে স্নান করিয়ে দেবার কথা মা-মণিকে বললেন। হরিসাধনদা ও মা-মণি শ্রীশ্রীঠাকুরকে স্নান করিয়ে কাপড় বদলিয়ে নিচে নেমে গেলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর নিচে যাবেন বললে তাঁকে নিচে নিয়ে যাওয়া হল। তিনি প্রথমে মন্দির হয়ে কিছুক্ষণ নামের আসরে থেকে আবার মন্দিরে চলে এলেন। তখন হোম আরম্ভ হয়েছে, বিগ্রহের স্নান আরম্ভ হয়েছে। বিগ্রহের স্নান শেষ হলে তাঁকে যথাস্থানে স্থাপন করে বস্ত্র পরিধান করানো হয় এবং যথাবিধি প্রাণপ্রতিষ্ঠা করানো হয়। সেই সময় শ্রীশ্রীঠাকুর গভীর ভাবস্থ ছিলেন এবং দু'নয়নে তাঁর প্রেমাশ্রুধারা বইছিল। কিছুক্ষণ পরে তিনি প্রকৃতিস্থ হয়ে তাকালেন। তখন ভোগারতি চলছে। তা দেখে আবার তিনি ভাবস্থ হলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি হরিসাধনদাকে ইসারায় ডেকে ঘরে যেতে চাইলেন। হরিসাধনদা ও মা-মণি তাঁকে ঘরে নিয়ে গিয়ে শয্যায় শয়ন করিয়ে দিলেন। এই অবস্থায় রেখে গিয়ে তাঁরা মাঝে মাঝেই এসে খবর নিয়ে যান। শ্রীশ্রীঠাকুর ঘুমিয়ে ছিলেন কি সমাধিস্থ ছিলেন হরিসাধনদা তা বলতে পারেননি।

এদিকে ভোগারতি শেষ হয়ে গেছে। সকলেই ভোগের প্রসাদ নিতে ব্যস্ত। দু'-তিন ব্যাচ ভোগ নিয়ে চলে যায়, পরের ব্যাচ নাম সমাপন করে ভোগ যখন নেয় তখন শ্রীশ্রীঠাকুর আবার নিচে যান। সেখান থেকে ফিরে এসে কলকাতার সবাই যখন প্রসাদ নিচ্ছিল তখন সেখানে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আবার নিজের ঘরে চলে যান। সারাদিন তিনি কিছুই গ্রহণ করেননি শুধু চরণামৃত ছাড়া। জোর করে তাঁকে পরে একটু ডাবের জল খাওয়ানো হয়েছিল।

সবার ভোগ নেওয়া হল, এবার কলকাতায় ফেরার পালা। ঠাকুর মন্দিরে ঢুকলেন। মদনমোহন ও শ্রীরাধার বিগ্রহ জড়িয়ে ধরে অনেকক্ষণ ছিলেন তিনি। অদ্ভুত ভাবে তাঁদের আদর করলেন—তা এক দেখার জিনিস। শ্রীশ্রীঠাকুরের দু'নয়নে প্রেমাশ্রুধারা। মুখে কিছু বলছিলেন কিন্তু সব শোনা যাচ্ছিল না। এদিকে দেরি হয়ে যাচ্ছে দেখে সবাই তাগাদা দিচ্ছে, মন্দিরে বহু লোকের ভিড়। হরিসাধনদা ও মা-মণি এমতাবস্থায় কী করবেন বুঝে উঠতে পারছিলেন না। আধ ঘণ্টারও বেশি এ ভাবে কেটে গেল। বহু কষ্টে তাঁরা শ্রীশ্রীঠাকুরকে বিগ্রহের কাছ থেকে সরিয়ে আনলেন। মন্দিরের দরজার কাছে এসে হঠাৎ ছুটে গেলেন আবার মন্দিরে। এ ভাবে তিন-চার বার গেলেন। পরে শেষে যখন তিনি বিগ্রহকে আদর করে চলে এলেন তখন তাঁর দু'নয়নে বিশেষভাবে প্রেমাশ্রু বইছিল। তখন সবারই চোখে জল—সে এক অদ্ভুত করুণ দৃশ্য। শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছেই শুনেছিলাম বিগ্রহ তাঁকে যেতে দিচ্ছিল না।

এদিকে উপস্থিত ভক্তদের মধ্যে অনেকের দৃষ্টিতেই ধরা পড়ল যে শ্রীরাধার দু'নয়ন থেকে অশ্রুধারা ঝরে

পড়ছে। মদনমোহনের চোখও ছলছল করছে। এই অলৌকিক দৃশ্য যাঁরা দেখেছিলেন তাঁরা পরে সে সম্বন্ধে বলতে গিয়ে অশ্রু সম্বরণ করতে পারেননি।

শ্রীশ্রীঠাকুরকে ধরে গাড়ির কাছে নিয়ে যাওয়া হল। সবাই প্রণাম করছে, সবারই চোখে জল—কেউ কেউ কান্নায় ভেঙে পড়ছে। তখন শ্রীশ্রীঠাকুর পুরোহিতদের উদ্দেশে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ দিয়ে সবাইকে প্রতিপ্রণাম ও আশীর্বাদ জানিয়ে গাড়িতে উঠে বসলেন—তাঁরও নয়নে প্রেমাশ্রু। হরিসাধনদা ও মা-মণির চোখেও প্রেমাশ্রু। তখন বেলা সাড়ে পাঁচটা। প্রথমে ভনাদের গাড়ি, তারপর ভামের[১] গাড়ি এবং সব শেষে হরিসাধনদার গাড়ি শ্রীশ্রীঠাকুরকে নিয়ে এগিয়ে চলল। রোদনভরা গোপালপুরকে পিছনে রেখে গাড়ি ছুটে চলল কলকাতার দিকে। সমস্ত রাস্তায় ঠাকুর চোখ বুজে বসেছিলেন, কোনও কথাই বলেননি। রাত সাড়ে ন'টায় নিউ আলিপুরের বাড়িতে গাড়ি এসে পৌঁছল। তার আগেই ভামের গাড়ি পৌঁছে গিয়েছে। অন্যান্যরাও ইতিমধ্যে পূর্ব নির্দেশমত নিজেদের বাড়ি চলে গেছে। রাতে কেউ কিছু আর খেতে চায়নি। কেবলমাত্র সঙ্গে-নিয়ে-আসা প্রসাদের কিছুটা ঠাকুরকে দেওয়া হল।

রাত ১১টার পর ঠাকুরকে মশারীর মধ্যে শুইয়ে দিয়ে যথারীতি তাঁকে আদর করে হরিসাধনদা ও মা-মণি তাঁদের ঘরে শুতে গেলেন। রাত্রিতে দু'-তিনবার এসে দেখে গেছেন—কখনও বসা অবস্থায়, কখনও শোয়া অবস্থায়। পরের দিন সকালে ঠাকুরের ধ্যান ভাঙ্গার পর তাঁকে প্রাতঃকৃত্যাদির জন্য বাথরুমে নিয়ে যাওয়া হয়। বাথরুমের কাজ শেষ হলে কাপড় বদলিয়ে তাঁকে ঘরে নিয়ে আসা হয়। হরিসাধনদাকে ঠাকুর জিজ্ঞাসা করেন, "তোমার মন খুশি হয়েছে তো?" সে সময় মা-মণি এসে উপস্থিত হলেন। শুনে তিনি বললেন, "তোমার লীলা তুমি বোঝ। আমরা তো কিছু বুঝি না, শুধু অবাক হয়ে দেখি। কত কাণ্ডই তো করে এলে গোপালপুরে।" কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে ঠাকুর বললেন, "সব লীলা তো তোমাদের জন্যই। তোমাদের বাদ দিয়ে আর লীলা কোথায় সম্ভব? যাক্, এখন আমার খিদে পেয়েছে, কিছু খেতে দাও।"

মা-মণি সন্দেশ আর মুড়ি নিয়ে এলেন। ঠাকুর অল্প খেয়ে বাকিটা ফিরিয়ে দিলেন।...

গোপালপুরের এই বিশেষ ঘটনাটি পাঠ করে ভক্তহৃদয় তা সাদরে গ্রহণ করবে এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। এ প্রসঙ্গে আর একটি কথা এই যে, সমাধি ভঙ্গের পরে বিশেষ ভাবে দেখা গেছে যে শ্রীশ্রীঠাকুরের মুখে তত্ত্বস্ফূর্তি হয়। সে-সব তত্ত্ব সবই অনন্যসাধারণ, অশ্রুতপূর্ব এবং গভীর ভাব ও অর্থবোধক, যা বুদ্ধির কাছে দুর্বোধ্য। অশুদ্ধ বুদ্ধি ভুল করে অথবা স্বেচ্ছায় সেগুলিকে ব্যবহার করতে গিয়ে অপপ্রয়োগ করে। তার ফলে হয় ভাবের ঘরে চুরি।

* * *   * * *   * * *

"তত্ত্বালোক" গ্রন্থের ভূমিকা লিখতে গিয়ে মনে পড়েছে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরের দিব্য ভাবসমাধির কথা। সমাধি ভঙ্গের পরে তাঁর মুখনিঃসৃত দিব্যানুভূতির কথা নিরন্তর তত্ত্বস্ফূর্তি আকারে প্রকাশ পায়—সেগুলি প্রথমে কিছুটা ধরে রাখার চেষ্টা করেছিলেন হরিসাধনদা। পরে দ্বিজেশদা ও আমি আরম্ভ করি হরিসাধনদারই নির্দেশে। বিনয় ও উমাও কয়েকদিনের কথা লিখতে চেষ্টা করেছিল, পরে তারা ছেড়ে দেয়। দ্বিজেশদা ও আমি সাধ্যমত সে কথাগুলি ধরে রাখার চেষ্টা করেছি। দ্বিজেশদা ১৯৭২ সালে দেহত্যাগ করার পর অসুস্থ শরীর নিয়ে আমি তাঁর কথা ধরে রাখার চেষ্টা করেছি। ১৯৬৯ সালের শেষের দিকে অর্চনা[২]-ও শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে অনুমতি নিয়ে

১। হরিসাধনদার পুত্র।

২। অর্চনা সেনগুপ্ত, ১৯৬৯ থেকেই শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরের সঙ্গ করেছে। কয়েক বছর শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরের ভাষণের শ্রুতিলিখন করেছে। অর্চনাই একসময় শ্রীশ্রীঠাকুরের ভজনানুষ্ঠান পরিচালনা করত।

ঠাকুরের কথা ধরে রাখার চেষ্টা করেছিল। শেষের দিকে তাঁর কথাগুলি সব ঠিকমত সে রাখতে পারেনি। তত্ত্বালোক সংগ্রহ করা হয়েছে মাত্র ১৯৬৮ সালের মে মাস থেকে ১৯৬৯ সালের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত। মে থেকে আগস্ট মাস পর্যন্ত সৎপ্রসঙ্গের থেকে তত্ত্বালোকের এই প্রথম খণ্ড গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা হল। পরে ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডে বাকি অংশ প্রকাশ করার আশা রইল।

আনন্দময় ভগবানের আনন্দবাণী সবার হৃদয়েই আনন্দ দান করবে এই বিশ্বাসে তত্ত্বালোকের প্রথম খণ্ড প্রকাশ করা হল। এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখতে গিয়ে আমি শুধু শ্রীশ্রীঠাকুরের কথার মাধ্যমে তত্ত্বজ্ঞ ও তত্ত্ববেত্তার যোগ্যতার অধিকার ও গুরুত্ব স্মরণ করে প্রবক্তার দিব্যজীবনের কিছু ঘটনার কথা উল্লেখ করেছি এই প্রসঙ্গে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য। তত্ত্বজ্ঞান ও অনুভূতির অধিকারী কারা কী ভাবে হন তার সম্যক্ পরিচয় এ ভূমিকার মধ্যে প্রকাশ করা হয়েছে। এই ভূমিকা পাঠ করে সহৃদয় পাঠকগণ নিশ্চয়ই আমার এই অনধিকার চর্চা এবং প্রচেষ্টা সম্বন্ধে ভুল বুঝবেন না। জ্ঞানী পণ্ডিত অনেকেই হতে পারেন কিন্তু তত্ত্ববিদ্ বা তত্ত্ববেত্তা সবাই হতে পারেন না। অনুভবসিদ্ধ পুরুষ মন বুদ্ধির উৎকর্ষের ফলে তত্ত্ব পরিবেষণ করতে পারেন। কিন্তু স্বানুভবসিদ্ধ পুরুষ ব্যতীত তত্ত্ববিদ্ বা তত্ত্ববেত্তা হওয়া যায় না। পূর্ণ সমাধিসিদ্ধ না-হলে কেউ স্বানুভবসিদ্ধ হতে পারেন না। নির্মোহ, নিঃস্বার্থ, নিষ্কাম, নিরভিমান, নির্দ্বন্দ্ব এবং নির্ভীক না হলে সমাধিসিদ্ধি হয় না। সৎসঙ্গ, সৎচিন্তা, সৎকর্ম, সদসৎ বিচার এবং গুরু ইষ্টের কৃপা বিনা চিত্তশুদ্ধিও হয় না এবং সমাধি, সাধন ও সিদ্ধি হয় না। সম্যক্‌রূপে শরণাগতি বিনা গুরু ইষ্টের কৃপাও লাভ করা যায় না। এ সব সাধনসিদ্ধির রহস্য কথা শ্রীশ্রীঠাকুরের মুখে বিশেষভাবে শুনতে পেয়েছিলাম। সে সব কথাগুলিই এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল।

সমাধি ভঙ্গের পরে শ্রীশ্রীঠাকুরের মুখে তাঁর দিব্যানুভূতির কথা শুনে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, জ্ঞানী-গুণী, সাধু মহাত্মাগণ খুবই বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। তাঁরা বলেছেন, উনি শাস্ত্র পড়েননি বলছেন বটে, কিন্তু ওনার মুখে শাস্ত্রের সারকথা শুনে আমরা অতীব বিস্মিত হয়েছি। ওনার ভিতরে সমগ্র শাস্ত্রের সারতত্ত্বের সম্যক্ প্রকাশ হয়েছে পরম ইষ্টের কৃপায়। উনি পরমসিদ্ধির স্তরে পৌঁছে গেছেন। এইরূপ দুর্লভ অবস্থা স্বকীয় সাধনা ছাড়া সম্ভব হয় না। ওনার তৃতীয় নয়ন অর্থাৎ বোধনয়ন খুলে গেছে। তত্ত্বজিজ্ঞাসু যাঁরা তাঁরা তাঁদের সর্ব সমাধান পাবেন ওনার কাছে।

যে আনন্দসমাধি বা সহজসমাধি অবস্থায় শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরের ভাষণ এবং তত্ত্বালোক উদগীত হয়েছিল বা উৎসারিত হয়েছিল তা পাঠ করে সকলের জীবনই যে অমৃতসাগরে অবগাহন করে ধন্য হবে এবং আত্মচেতনায় উদ্বুদ্ধ হবে তাতে সন্দেহ নেই। সকলের উপরে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরের কৃপাশীর্বাদ বর্ষিত হবে এই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। আমরাও প্রার্থনা করি ব্রহ্মাত্মৈক্যবোধের কথা স্মরণ করে সকলেই যেন পরম শান্তি ও পরমানন্দ লাভ করেন।

এই গ্রন্থের মুদ্রণ কার্য তত্ত্বাবধানে এবং গঠন ও বিন্যাসের সৌকর্য সাধনে শ্রীমুরারি সাহা ও শ্রীশান্তনু দাস প্রভূত পরিশ্রম করেছেন। শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরের করুণাধারা তাঁদের উপর বর্ষিত হোক।

ঠাকুরের কথা ও তাঁর ভাষা অবলম্বনে ভূমিকাটি তৈরি করার চেষ্টা করেছি। তবুও হয়ত লেখার মধ্যে ভুলত্রুটি থাকতে পারে। সেটা আমারই দোষ। সহৃদয় পাঠকগণ সেজন্য আমাকে ক্ষমা করবেন। পরমগুরু পরমাত্মার কাছে সকলের মঙ্গলকামনা জানিয়ে এখানেই আমার কথা শেষ করছি।

ওঁ শ্রীবাসুদেবায় অর্পণমস্তু

বিনীতা

জন্মাষ্টমী, ১৪০৬

বাণী চক্রবর্তী

মুখবন্ধ

অধ্যাত্ম বিষয়ক গ্রন্থের অন্তর্নিহিত বিষয়বস্তুর তাৎপর্য অনুসারে গ্রন্থের নামকরণ হওয়া উচিত। গ্রন্থের নামের সঙ্গে তার বিষয়বস্তুর গুরুত্ব এবং বিষয়বস্তু অনুসারে গ্রন্থের নামকরণ যুক্তিযুক্তভাবেই আবশ্যক। উভয়ই উভয়ের সম্পূরক ও পরিপূরক। এ বিষয়ে মতবিরোধের অবকাশ নেই। বর্তমান গ্রন্থটির নাম হল ''তত্ত্বালোক''। গ্রন্থের অন্তর্নিহিত বিষয়ের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বিচার করেই ''তত্ত্বালোক'' নাম দেওয়া হয়েছে।

এ বিষয়ে অত্যাবশ্যকীয় কিছু কথা বলার বিশেষ প্রয়োজন আছে, যেমন তত্ত্ব বলতে কী বোঝায়, অর্থাৎ কী তার তাৎপর্য ও গুরুত্ব; তত্ত্বের অধিকারী ও বক্তার বৈশিষ্ট্য কী; কে বা কারা যথার্থ ভাবে তত্ত্বের অধিকারী ও প্রবক্তা। তত্ত্ব বিষয়ের উদ্দেশ্য, প্রয়োজন এবং তার যোগ্যতা সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা সহজবোধ্য করে প্রকাশ করার প্রয়োজন আছে। তা ছাড়াও তত্ত্ববোধের অনুসন্ধানকারীদের তত্ত্ব সংগ্রহে প্রচেষ্টার গুরুত্ব সম্বন্ধেও প্রশ্ন উঠতে পারে। অনুসন্ধানকারীর মানের তারতম্য অনুসারে তত্ত্বের মানের নির্ণয় সম্বন্ধেও প্রশ্ন উঠতে পারে।

তত্ত্ব বিষয়ক আলোচনা সবার জন্য নয়। তত্ত্বরসিকদের জন্য তত্ত্বের পরিবেষণ যে-ভাবে হয় তা সর্বসাধারণের কাছে সুবোধ্য নয়। সর্বসাধারণের উপযোগী যে-সমস্ত বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় তার গুরুত্ব গতানুগতিক ভাবাদর্শের ভিত্তিতেই দেশ-কাল-পাত্র-কার্য-কারণসাপেক্ষ। তার মধ্যেও গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ কথা থাকে; তারও একটা কালোপযোগী দেশোপযোগী সাময়িক প্রয়োজন কিছু আছে। তার মধ্যে যথার্থ মৌলিকতা ও গভীর তত্ত্বমূলক প্রসঙ্গ না-থাকলেও তার একটা সাধারণ দর্শন ও কিছু তথ্য থাকতে পারে। যদিও সব জায়গায় তা পাওয়া যায় না এবং পাওয়া গেলেও তার গুরুত্ব ও মূল্যায়ন স্থায়ী হয় না।

অপর পক্ষে তত্ত্ব সম্বন্ধে যা কিছুই আলোচিত হয় তার অন্তর্নিহিত গুরুত্ব, তাৎপর্য ও দর্শন সর্বতোভাবেই মৌলিক ও অভিনব। এখন তত্ত্ব কী, তার উত্তর হল যা তৎ হতে জাত, তদ্ভব, তজ্জাত তন্নিষ্ঠ, তৎপরায়ণ, সর্বতোভাবে মৌলিক, অভিনব, দেশ-কাল-কার্য-কারণ নিরপেক্ষ, নিত্য, শাশ্বত, অখণ্ড, ভূমা, পূর্ণ। তৎ বলতে উপরোক্ত কথাগুলি নির্দেশ করে বা ইঙ্গিত করে। সোজা কথায় যা সর্বতোভাবে লোকোত্তরধর্মী, অর্থাৎ দ্বন্দ্বাতীত ভেদাতীত ভাবাতীত গুণাতীত অনঙ্গ অসঙ্গ অলিঙ্গ অভঙ্গ নিষ্ক্রিয় নির্বিকার নিষ্কল নিরাকার নির্বিকল্প নিরালম্ব নির্দ্বয় তা-ই তৎ পদবাচ্য। এই তৎ স্বতঃসিদ্ধ স্বতঃস্ফূর্ত স্বতঃপূর্ণ স্বয়ংপ্রকাশ। তার প্রকাশের জন্য দ্বিতীয় কোনও আশ্রয় বা মাধ্যম প্রয়োজন হয় না। স্বতঃসিদ্ধ স্বয়ংপ্রভ এই তৎ-ই হল সমরস সমধর্মী সর্বোত্তম পরম সর্বশ্রেষ্ঠ। সুতরাং এই তৎ হল পরমে পরম, স্বয়ং-এ স্বয়ং, আপনে আপন। নিত্যাদ্বৈতে এই তৎ-এ অতিরিক্ত যখন বিকল্প বা প্রকল্প নেই, কখনও হতেও পারে না, তখন এই তৎ-ই হল পরম সত্য, অজর অমর অপাপবিদ্ধ। সুতরাং তৎ-এর প্রকাশই তত্ত্ব। এ অতর্ক্যমূর্তি, অর্থাৎ তর্কাতীত।

তত্ত্বস্বরূপ হলেন ব্রহ্ম আত্মা ঈশ্বর। এ-ই হল সচ্চিদানন্দঘন। এই অদ্বয় সচ্চিদানন্দঘন তত্ত্বস্বরূপ ঈশ্বর আত্মা ব্রহ্মের স্বপ্রকাশ ধর্ম স্বতঃসিদ্ধ বলে তিনি তত্ত্বসিদ্ধ পুরুষোত্তম ভগবান। স্বপ্রকাশধর্মী এই পুরুষোত্তমের নিরন্তর প্রকাশধারা আপন বক্ষে আপন মহিমায় মহিমান্বিত। ''স্বমহিম্নানি স্বমহিম্নঃ'', অর্থাৎ তিনি নিজেই নিজের মহিমাস্বরূপ, নিজেই নিজের বেত্তা, বেদ; নিজের দ্বারাই নিজে নিজের মধ্যে পূর্ণ।

তিনিই স্বয়ং তত্ত্বস্বরূপ হয়েও নিজেই তত্ত্ববিদ্, তত্ত্ববেত্তা, তত্ত্বজ্ঞ। তাঁর কোনও বেত্তা নেই, বিকল্প নেই। প্রতিপক্ষ বা প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। পরমে পরম, স্বয়ং-এ স্বয়ং, আপনে আপন এই তত্ত্বস্বরূপ পুরুষোত্তমের স্বভাবমহিমা

অনন্ত। তিনিই স্বয়ং কারণ, স্বয়ং কার্য, স্বয়ং সত্তা, স্বয়ং শক্তি, স্বয়ং পুরুষ, স্বয়ং প্রকৃতি, স্বয়ং-ই প্রকাশক, স্বয়ং-ই প্রকাশ। এককথায় জ্ঞাতা-জ্ঞেয়-জ্ঞান তিনিই স্বয়ং আবার তদতিরিক্তও তিনি। কাজেই তাঁর বক্ষে তাঁর প্রকাশধারার মধ্যে উদ্দেশ্য প্রয়োজন, সম্বন্ধ, সাধন প্রভৃতি তিনিই স্বয়ং। অধিকারী ও অধিকার প্রসঙ্গে সবেতেই তিনিই স্বয়ং। তাঁর স্বয়ং-প্রকাশতাই তাঁর কার্য, স্বসংবেদনই হল তাঁর ধর্ম। নিত্য ঐক্য ও সমতাই হল তাঁর স্বভাব। স্বয়ং স্ববোধে বোধময় এই স্বানুভবদেব আপন বক্ষে আপন আনন্দে আপনি প্রকাশময়, লীলাময় এবং লীলানন্দে রসময় ও রসরাজ। তাঁর প্রকাশই তাঁর আলো, তিনি স্বয়ংজ্যোতি, সুতরাং তত্ত্বালোক শব্দের তাৎপর্য তত্ত্বময় পুরুষেরই পরিচয়, তদতিরিক্ত কিছু নয়।

এই স্বসংবেদ্য স্বানুভবদেব পুরুষোত্তম ভগবানের বক্ষে তাঁর অনন্ত স্বভাবমহিমার অনন্ত বিভূতি, অনন্ত রহস্য কেবল স্বানুভবসিদ্ধ ও স্ববোধে স্বতঃস্ফূর্ত। তত্ত্বালোকের মাধ্যমে স্বানুভবদেবের স্বানুভবসিদ্ধ স্বভাবলীলার মহিমা স্বয়ংপ্রকাশ বলে তা মানুষের কাছে সহজবোধ্য হয় না। মানুষের স্বভাব ত্রিগুণাপ্রকৃতির বিকারজাত। এই ত্রিগুণের বৈশিষ্ট্য হল সত্ত্ব রজঃ তমঃ। তমঃ-এর ধর্ম হল নিষ্ক্রিয়তা, জড়তা, অপ্রকাশ, আলস্য, নিদ্রা, ভীতি, মোহাদি। রজঃ-এর ধর্ম প্রবৃত্তি, কামনা-বাসনা, গতি, ক্রিয়া, অভিমান, অহংকার, দম্ভ, দর্প, দ্বেষ, ঈর্ষা, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্যাদি। সত্ত্বের ধর্ম নির্মলতা, প্রকাশ, সমতা, একতা, সন্তোষ, প্রীতি, আনন্দ, শ্রদ্ধা, ভক্তি, বিশ্বাস, অভিমানশূন্যতা, অহংকারশূনতা, লোভশূন্যতা, দ্বন্দ্বহীনতা, প্রেম, করুণা, মৈত্রী প্রভৃতি।

মানুষের স্বভাব বলতে অন্তঃকরণের ধর্মকেই নির্দেশ করে। এই অন্তঃকরণ এক হয়েও চারভাগে বিভক্ত হয়ে সক্রিয় হয়। তা হল—মন, বুদ্ধি, অহংকার, চিত্ত। মনের ধর্ম সঙ্কল্প বিকল্পাদি; বুদ্ধির ধর্ম যুক্তি, বিচার, প্রভুত্বাদি; অহংকারের ধর্ম কর্তৃত্ব, ভর্তৃত্বাদি। চিত্তের ধর্ম ভোগেচ্ছা, কাম, আশা, আকাঙ্ক্ষা, স্মরণাদি।

ত্রিগুণাপ্রকৃতির মহিমাও অনন্ত। এই প্রকৃতিশক্তি পরমপুরুষ ভগবানের স্বভাবশক্তির অন্তর্ভুক্ত। এই শক্তির মাধ্যমে পরমাত্মদেবতার জগৎলীলা, জীবলীলা, এর দর্শন বিজ্ঞানাদি সামগ্রিকভাবে দ্বৈতভিত্তিক। সুতরাং এর তাৎপর্যানুভূতি অন্তঃকরণের অনুভূতিসাপেক্ষ। এই অনুভূতি আবার স্বানুভূতির প্রকাশাদি। স্বানুভূতির স্বরূপ নিত্যাদ্বৈত।

পরমাত্মদেবতার জীবলীলা তথা নরলীলায় তাঁর স্বভাবজাত ত্রিগুণাপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃতির অধীন জীব তথা মানুষের দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মনাদির গঠন ত্রিগুণাপ্রকৃতির মাধ্যমেই হয়। ত্রিগুণাপ্রকৃতির দ্বিবিধ প্রকাশধারা অনুলোম ও বিলোম, অর্থাৎ আরোহণ ও অবরোহণ। প্রথমটি হল অব্যক্ত হতে ব্যক্তমুখী, অর্থাৎ কেন্দ্র হতে বহির্মুখী, বৈচিত্র্যধর্মী। দ্বিতীয়টি হল বার হতে অন্তরমাধ্যম কেন্দ্রমুখী, অর্থাৎ বৈচিত্র্য হতে একত্ব বা সমত্বে স্থিতি। এই দ্বিবিধ গতিধারাই হল জীবজগতের বৈশিষ্ট্য। তাই জগতের নাম দুনিয়া। জীবজগতে মানুষের স্থান সবার উপরে ধরা হয়। এই মনুষ্যদেহের গঠন ও কার্যাবলী সবই ত্রিগুণাপ্রকৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই প্রকৃতিই আবার পরমপুরুষ ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন।

স্থূল মনুষ্যদেহের মধ্যে আরও দু'টি দেহ আছে—সূক্ষ্মদেহ ও কারণদেহ। স্থূলদেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি পাঞ্চভৌতিক; সূক্ষ্মদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিও পাঞ্চভৌতিক। এই পঞ্চভূত হল ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম। এই পঞ্চভূত সূক্ষ্ম, অতীন্দ্রিয়। স্থূল পঞ্চভূত হল সূক্ষ্ম পঞ্চভূতের পঞ্চীকৃত সংমিশ্রণ। এই পঞ্চীকরণ পদ্ধতিই হল—প্রতি সূক্ষ্মভূতে প্রথমত দুইভাগে বিভক্ত হয়। একভাগ অবিভক্ত থাকে, আর একভাগ আটভাগে বিভক্ত হয়। প্রথম অবিভক্ত অর্ধভাগের সঙ্গে আটভাগে বিভক্ত অপর চার ভূতের সংযোগে হয় প্রতি ভূতের স্থূলীকরণ ($\frac{১}{২}$ আকাশ + $\frac{১}{৮}$ বাতাস + $\frac{১}{৮}$ অগ্নি + $\frac{১}{৮}$ জল + $\frac{১}{৮}$ পৃথিবী = স্থূল আকাশ; এই একই ভাবে অন্য ভূতগুলিও পঞ্চীকৃত হয়)। সূক্ষ্ম পঞ্চভূতের দ্বারা সূক্ষ্ম জগৎ ও সূক্ষ্মদেহ তৈরি হয় এবং স্থূল পঞ্চভূতের দ্বারা স্থূল জগৎ ও স্থূলদেহ তৈরি হয়। স্থূলদেহ হল পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় + পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় + পঞ্চপ্রাণ + মন ও বুদ্ধি। সূক্ষ্মদেহ হল পুরোটাই মানসিক। অন্য ভাবে

পঞ্চভূতের দ্বারা পঞ্চকোষ তৈরি হয়। এই পঞ্চকোষই হল অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়। সুতরাং স্থূলদেহ হল অন্নময় ও প্রাণময় কোষ দ্বারা গঠিত। আর সূক্ষ্মদেহ হল প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষ দ্বারা গঠিত। কারণদেহ হল আনন্দময় কোষ দ্বারা গঠিত। কারণদেহ হল সমষ্টি অজ্ঞান। এই সমষ্টি অজ্ঞান হল ত্রিগুণের সাম্য অবস্থা, অব্যক্ত।

প্রকৃতির ধর্ম যেমন ত্রিগুণাত্মিকা, পুরুষের ধর্ম তেমনি চিন্ময় (চৈতন্যময়)। প্রকৃতি হল অচিৎ, জীব হল চিদাচিৎ (মিশ্রণ), আর ঈশ্বর হলেন চিৎ এবং পরমেশ্বর, পরমাত্মা, পরব্রহ্ম হলেন পরাচিৎ, অর্থাৎ বিশুদ্ধ চিৎ। পরমাত্মা ব্রহ্মদেব হলেন গুণাতীত, ঈশ্বর হলেন সগুণ; তিনি স্রষ্টা, জীবজগৎ হল তাঁর সৃষ্টি। জীব হল তাঁর অভিন্ন অংশ বা তাঁর প্রকাশ বা লীলামাধ্যম। জগৎ হল জীবের ভোগ্য এবং আশ্রয়, ক্রিয়াভূমি। জগৎ হল পুরো তামসিক, জীব হল মিশ্র সত্ত্ব, অর্থাৎ রজস্তমোগুণযুক্ত সত্ত্ব। ঈশ্বর হলেন শুদ্ধসত্ত্ব আর ব্রহ্ম আত্মা হলেন গুণাতীত, ভেদাতীত, দ্বন্দ্বাতীত, ভাবাতীত। প্রকৃতিজাত জীবজগৎ ঈশ্বরের অধীন, অর্থাৎ সমস্ত প্রকৃতিই ঈশ্বরের অধীন। জগৎ কিন্তু প্রকৃতির অধীন। ঈশ্বর হলেন সগুণ, ব্রহ্মাধীন বা সগুণ ব্রহ্ম।

প্রকৃতিকে অষ্টবিধা বলা হয়। এই অষ্টবিধ হল পঞ্চভূত ও তিনগুণ যোগে। এই প্রকৃতিকেই বলা হয় জড় প্রকৃতি; জীব হল চিদাভাস প্রকৃতি। জড় প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে চিদাভাস প্রকৃতি। চিদাভাসের মূলে হল চিৎ। চিৎ-এর মূলে হল পরাচিৎ।

জীবের নিয়ন্তা হচ্ছেন ঈশ্বর। ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে ব্রহ্ম-আত্মার স্বরূপ জানা যায় না। পূর্বে ত্রিগুণের বিশেষ বিশেষ ধর্ম সম্বন্ধে বলা হয়েছে। ত্রিগুণ পরস্পর সংযুক্ত হয়েই থাকে, কেউই পৃথক বা বিযুক্ত হতে পারে না। গুণের খেলায় বিশেষ কোনও গুণ যখন প্রাধান্য লাভ করে তখন অন্য দুটি গুণ তার অধীন বা অভিভূত থাকে। ত্রিগুণের মধ্যে তমোরজোগুণের কোনও প্রকাশক্ষমতা নেই সত্ত্বগুণের সাহায্য ছাড়া। সত্ত্বগুণ প্রকাশধর্মী কারণ তার মধ্যে চিদাভাসের প্রতিফলন সম্ভব হয়। তমোরজোগুণে তা হয় না। প্রাকৃতবিদ্যা বলতে তমোরজোপ্রধান চিদাভাসকেই বোঝায়। অধ্যাত্মবিদ্যা হল মূলত চিদাভাস (reflection of consciousness)-প্রধান। ঈশ্বরীয় বিদ্যা হল চিৎপ্রধান, চিদাভাস, অর্থাৎ সংবিৎপ্রধান। ব্রহ্ম আত্মা হলেন বিশুদ্ধ চিৎপ্রধান, অর্থাৎ অখণ্ড চিৎস্বরূপ। একেই চিৎতত্ত্ব বলা হয়।

ব্রহ্ম-আত্মা হলেন সত্য জ্ঞান অনন্ত, অর্থাৎ প্রজ্ঞানঘন। ঈশ্বর হলেন কূটস্থ চৈতন্য, অর্থাৎ বিজ্ঞানময়। জীব হল বিজ্ঞানাধীন জ্ঞানাভাস, জগৎ হল জ্ঞানাভাস-অধীন অজ্ঞান। সোজা কথায় অজ্ঞানে জগৎ, জ্ঞানাভাসে জীব, বিজ্ঞানে ঈশ্বর, প্রজ্ঞানে ব্রহ্ম আত্মা। ঈশ্বরের লীলা অবতার হলেন ভগবান; তিনি নির্গুণ গুণী, পুরুষোত্তম, অর্থাৎ স্বভাবযোগে স্ববোধ—স্ববোধে তিনি নির্গুণ, স্বভাবে তিনি সগুণ। "স্ববোধেনান্যবোধেচ্ছা বহুবোধরূপতা হি আত্মন। স্বাত্মবোধরূপ পুরুষোত্তমহং।।" এর মর্মার্থ—এখানে স্ববোধেন তৃতীয়া বিভক্তি প্রয়োগে স্ববোধের দ্বারা এই অর্থ প্রকাশ করে, অন্য বোধ নয়। অন্য বোধে স্ববোধে হল আত্মবোধ, আপনবোধ, নিজবোধ; তা-ই হল আত্মধর্ম। এই আত্মবোধরূপ স্বয়ং আমিই হল পুরুষোত্তম। এই পুরুষোত্তম হল পরমতত্ত্বস্বরূপ। আবার পূর্ব শ্লোকটি স্ববোধে সপ্তমী বিভক্তিযোগে নান্যবোধেচ্ছা ধরলে অর্থ দাঁড়ায় স্ববোধে অন্য কোনও বোধ থাকে না, থাকা সম্ভবও নয়। কারণ এই স্ববোধ হল আপনবোধ, নিজবোধ, আত্মবোধ, বিশুদ্ধ চিৎ বা পরাচিৎ, অর্থাৎ পরমব্রহ্ম আত্মা পরমাত্মা, সুতরাং উপরোক্ত সূত্রটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ বলে তার গূঢ়ার্থ এখানে সামান্য উল্লেখ করা হল।

সমগ্র জগৎ হল মানসকল্পনা, মনোরচনা। মনোদয়ে জগৎ উদয়, মনোলয়ে জগৎ লয় হয়, অর্থাৎ চিত্তমূলে জগৎ, জগৎমূলে চিত্ত। সুষুপ্তিতে চিত্ত লয় হয়, অর্থাৎ চিত্ত তার কারণসত্তায় বীজরূপে অবস্থান করে। সেইজন্য চিত্তের অভাবে জগতের অভাব হয়, আবার এ-ই হল প্রকৃতির অব্যক্ত অবস্থা। প্রকৃতির ব্যক্ত অবস্থা হল চিত্তের উদয় ও বিস্তার। চিত্তের এই ব্যক্ত অব্যক্ত অবস্থাই হল জাগ্রত ও সুষুপ্তি অবস্থা। জাগ্রত অবস্থায় চিত্ত সক্রিয়; সুষুপ্তি

অবস্থায় অর্থাৎ নিদ্রাতে চিত্ত নিষ্ক্রিয়, নির্বীজ। জাগ্রত অবস্থা হল চিত্তের সবীজ অবস্থা। সক্রিয় অবস্থা এবং গাঢ় নিদ্রা বা সুষুপ্তি হল চিত্তের নির্বীজ ও নিষ্ক্রিয় অবস্থা। চিত্ত হল চিদাভাসজাত। সেইজন্য চিত্তের একদিকে আঁধার, একদিকে আলোর আভাস। এই উভয় যোগেই হল চিত্তের পরিচয়। চিত্ত অর্থ এখানে অন্তঃকরণ, মনকেই নির্দেশ করে। এক অন্তঃকরণই চারভাগে বিভক্ত হয়ে মন-বুদ্ধি-অহংকাররূপে ক্রিয়া করে। সুতরাং এর যে-কোনও একটিকে বললে অপরটিকেও নির্দেশ করা হয়। সাধারণত মনের সঙ্গে চিত্তের এবং বুদ্ধির সঙ্গে অহংকারের সম্বন্ধ বিশেষ ভাবে দেখা যায় বলে শুধু মন আর বুদ্ধি এই দু'টি শব্দ দ্বারা অন্তঃকরণকেই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে উল্লেখ করা হয়। সমগ্র অন্তঃকরণই চিদাভাসের পরিচয়। অন্তর আত্মা হল কূটস্থ চৈতন্য।

জড় বস্তু প্রকাশের জন্য চিদাভাসের একান্ত প্রয়োজন। কারণ চিদাভাস যোগেই জড় বস্তু প্রতিভাত হয়, কিন্তু তার অনুভূতি হয় কূটস্থ চৈতন্যের মাধ্যমে। অনুভূতি সিদ্ধ হয় কূটস্থ চৈতন্য দ্বারা, আর বস্তু প্রতিভাত হয় চিদাভাসের দ্বারা, কূটস্থ চৈতন্য দ্বারা নয়। সোজা কথায় বস্তু ভাসে মন-বুদ্ধির আভাসে, আর মন-বুদ্ধি ভাসে কূটস্থ চৈতন্যের জ্যোতিতে। কূটস্থ চৈতন্য মন-বুদ্ধির মাধ্যম ব্যতীত নামরূপকে প্রকাশ করতে পারে না।

কূটস্থ চৈতন্য বলতে কী বোঝায়? কূট মানে মায়া, মিথ্যা, আভাস—তাতে যুক্ত বা স্থিত চৈতন্যই হল কূটস্থ চৈতন্য, অর্থাৎ নানাত্ব-বহুত্বরূপ বৈচিত্র্যপূর্ণ সমগ্র নামরূপের অধিষ্ঠানই হল কূটস্থ। আবার কূট শব্দের অর্থ কামারের নেহাই, অর্থাৎ লৌহপিণ্ড যার উপরে রেখে তপ্ত লোহাকে পিটিয়ে নানা প্রকার দাঁ, কাঁচি ইত্যাদি তৈরি করা হয়। সেই অর্থে অধিষ্ঠানচৈতন্যই হল কূটস্থ। এইসব কথার তাৎপর্য অতর্ক্য, অর্থাৎ তর্কাতীত। তত্ত্ব প্রসঙ্গে কোনও তর্ক সিদ্ধ হয় না। ঋষিবাণী হল "ন তর্কেণ মতিরাপনেয়া", অর্থাৎ তর্কের দ্বারা লৌকিক সিদ্ধান্ত নির্ণীত হলেও তাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত নির্ণীত হয় না। তর্কের দ্বারা কোনও মতকে খণ্ডনও করা যায় না। তবু তর্কশাস্ত্রের উপযোগিতা ও আবশ্যকতা ন্যায়শাস্ত্রের অন্তর্গত বলে স্বীকৃত হয়। তর্কের দ্বারা অতর্কের বিষয়কে, অর্থাৎ যুক্তি দ্বারা অযৌক্তিক বিষয়কে সম্পূর্ণ না-হলেও অনেকাংশে খণ্ডন করা চলে। তত্ত্বের পরে যার গুরুত্ব ও তাৎপর্য বিশেষ ভাবে অনুমিত ও স্বীকৃত হয় তা হল তথ্য। কোনও বিষয়ের সত্য সমাধান ও মৌলিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে গেলে সেই সেই বিষয়ের অনুসন্ধানের জন্য তদুপযোগী তথ্যের (right information) প্রয়োজন হয়। আলোচিত বিষয়ে যথার্থ গবেষণার জন্য, অথবা সত্য সমাধানের জন্য তার সর্বাঙ্গীন অনুসন্ধানের জন্য এই তথ্যের একান্ত প্রয়োজন হয়। উপযুক্ত তথ্য সংগৃহীত না-হলে কোনও জিনিসের প্রমাণ সিদ্ধ হয় না।

ষড়দর্শনের প্রত্যেকেরই স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আছে আপন আপন সিদ্ধান্ত সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য। অন্য মতকে খণ্ডন করার জন্য এবং স্বমতকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রতি দর্শনেরই পদ্ধতি, প্রণালী ও প্রচেষ্টা পৃথক। তাদের শব্দকোষও ভিন্ন। সে-সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা না-থাকলে শুধুমাত্র প্রকরণ গ্রন্থ পাঠের দ্বারা সেই সব দর্শনের সম্যক্ উপলব্ধি হয় না। উপলব্ধি হল অন্তরের বিষয়। এই অন্তরের উপলব্ধি হৃদয়বৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি উভয়ের সংযোগে সাধিত হয়; যদিও হৃদয়বৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে পৃথক, তথাপি উভয় যোগে উভয় পুষ্ট। অর্থাৎ একে অপরের পরিপূরক ও সম্পূরক।

প্রকৃতিশক্তির পরিচয় সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন দর্শনের ভিন্ন ভিন্ন অভিমত। ষড়দর্শনের অন্তর্ভুক্ত সর্ব সিদ্ধান্তের প্রয়োজন ও উপযোগিতা সম্বন্ধে মতভেদ থাকলেও তার তাৎপর্যকে সর্বতোভাবে উপেক্ষা করা যায় না। প্রতি দর্শনেরই অভিমত বা বাদ এবং সিদ্ধান্ত পৃথক পৃথক ভাবে বর্ণিত হয়। সুতরাং সৃষ্টি সম্বন্ধে এইসব মতবাদের সিদ্ধান্ত পৃথক পৃথক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। সৃষ্টিতত্ত্ব ব্যাখ্যায় এইসব মতবাদের যুক্তি ও প্রমাণভিত্তিক আলোচনা পাওয়া যায়। কারও ব্যাখ্যায় পাওয়া যায় আরম্ভবাদের কথা, কারও ব্যাখ্যায় পরিণামবাদের কথা, কারও ব্যাখ্যায় প্রকৃতিবাদের কথা, পরমাণুবাদের কথা, কারও ব্যাখ্যায় রাগ-বিরাগের প্রকৃতি-পুরুষবাদের কথা। কারও ব্যাখ্যায় মায়াবাদ, কারও

ব্যাখ্যায় আভাসবাদ, কারও ব্যাখ্যায় অবচ্ছেদবাদ, কারও ব্যাখ্যায় ভেদাভেদবাদ, কারও ব্যাখ্যায় দ্বৈতবাদ, কারও অদ্বৈতবাদ, কারও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, কারও দ্বৈতাদ্বৈতবাদ,, কারও অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ। সব শেষে আছে অভেদাভেদবাদ, নিত্যাদ্বৈতবাদ—তা ছাড়া শক্তিবাদ, শৈববাদ, বৈষ্ণববাদ, গুরুবাদ প্রভৃতি তো আছেই।

ভারতীয় দর্শন বিজ্ঞানের মধ্যে ষড়দর্শন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তা হল কণাদের বৈশেষিক দর্শন (পরমাণুবাদ) গৌতমের ন্যায়দর্শন, পাতঞ্জলের যোগদর্শন, জেমিনীর পূর্বমীমাংসা, উত্তরমীমাংসা। ব্যাসের বেদান্তদর্শন, নারদের পঞ্চরাত্র, ভক্তিদর্শন। এ ছাড়াও আছে লোকায়ত দর্শন, বৌদ্ধ দর্শন, জৈন দর্শন ইত্যাদি। তথ্যমূলক সাহিত্য ও গ্রন্থের প্রচারও অনেক, তার মধ্যে পুরাণ ইতিহাস কৃষিবিজ্ঞান জ্যোতিষ অর্থনীতি রাজনীতি সমাজনীতি শিল্পনীতি চারুকলা কারুকলা নৃত্য-গীত-বাদ্য-নাটক—এ ছাড়াও আছে চিকিৎসাবিদ্যা, নৌবিদ্যা, বিমানবিদ্যা, মহাকাশবিদ্যা, নক্ষত্রবিদ্যা প্রভৃতি।

অত্যাধুনিকের মধ্যে পড়ে চলচ্চিত্র বেতার টেলিফোন দূরদর্শন। উপরোক্ত বিষয়গুলির মধ্যে তথ্য ও তত্ত্ব উভয়ই মিশ্রিত আছে, তবে এইসব তত্ত্বও মূলত পরমতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত।

গতানুগতিক জীবনে সাধারণ মানুষের কাছে তত্ত্ব অপেক্ষা তথ্যের গুরুত্বই বেশি এবং অতি সাধারণদের কাছে তথ্য অপেক্ষা পথ্যের গুরুত্বই অধিক। জীবন হল মূলত পথ্যভিত্তিক। এই পথ্য হল জীবনধারণ, জীবনযাপনের জন্য প্রাথমিক স্তরের আবশ্যকীয় বস্তু। পথ্য অর্থে এখানে নিত্য অত্যাবশ্যকীয় অর্থাৎ একান্ত প্রয়োজনীয় যা-কিছু সবই পথ্য পদবাচ্য। এই প্রসঙ্গ বিশেষ আলোচনার অপেক্ষা রাখে না।

তত্ত্ব, তথ্য ও পথ্যের প্রসঙ্গ উল্লেখ করার পরে মানুষের জীবনের মূল্যায়ন নির্ণয় করার জন্য তিনটি জিনিসের একান্ত প্রয়োজন। তা হল রুচি, যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা। রুচি অনুসারে হয় যোগ্যতা এবং যোগ্যতা অনুসারে হয় অভিজ্ঞতা। এই তিনটি একসূত্রে গাঁথা। এ প্রসঙ্গে আরও জ্ঞাতব্য হল মানুষমাত্রেরই সহজাত বুদ্ধি বা গুণ কিছু থাকে। শিক্ষার মাধ্যমে তা উৎকর্ষ লাভ করে ও পরিণতি প্রাপ্ত হয়। সহজাত বুদ্ধির অধিকারী যারা তাদের রুচি, যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা তদনুরূপ হয়। তার পরের স্তর হল দক্ষ লোক (skilled man)। তাদের রুচি, যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতাও তদনুরূপ। তার থেকে উন্নত হল পণ্ডিত (scholar)—তাদের রুচি, যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতাও তদনুরূপ। তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হল দার্শনিক (philosopher)—তাদের রুচি, যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা তদনুরূপ। (বিজ্ঞানীদের* স্তর দার্শনিকদের স্তরের পর্যায়ভুক্ত হলেও স্বতন্ত্র।) দার্শনিক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হল দ্রষ্টা পুরুষ, প্রত্যক্ষদর্শী (seer, sage)—তাঁদের রুচি, যোগ্যতা, অভিজ্ঞতাও তদনুরূপ। সর্বোপরি হল স্বানুভবসিদ্ধ পুরুষ—তিনি তত্ত্বময়, পরমতত্ত্বের বিগ্রহ, সর্বজ্ঞ, সর্বগত, মহান। তিনি ঈশ্বর আত্মা ব্রহ্মদেব পুরুষোত্তম ভগবান স্বয়ং (Supreme Personality of

* বিজ্ঞানীদের প্রসঙ্গে যে-কথা বলা হয়েছে তা হল প্রাকৃতবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত। প্রকৃতি দেশ-কাল-কার্য-কারণসাপেক্ষ। সুতরাং প্রকৃতির অন্তর্নিহিত সূক্ষ্ম রহস্য ও তত্ত্বাদি আবিষ্কার সাধারণ তত্ত্বের পর্যায়ে পড়ে, পরমতত্ত্বের পর্যায়ে পড়ে না। যদিও প্রাকৃত তত্ত্বাদি অতীব সূক্ষ্ম, সাধারণের কাছে দুর্বোধ্য এবং তার অন্বেষণ ও আবিষ্কার অতীব গুরুত্বপূর্ণ এবং স্বীকার্য, তথাপি তার প্রয়োজনবোধ এবং অভিজ্ঞতার আলোক মানুষকে প্রকৃতির অতীত, অর্থাৎ অতিপ্রাকৃত অধ্যাত্ম স্তরের গভীরতম প্রদেশে যে-পরমতত্ত্বের অনন্ত সত্তা বিদ্যমান তা জ্ঞাত করায় না। তার অন্বেষণ গবেষণা সাধনা সমাধান ও আবিষ্কার হল সর্বোত্তম যা জ্ঞানের জ্ঞান আনন্দস্বরূপ, মুক্তি ও শান্তিস্বরূপ। অপর পক্ষে প্রকৃতির অন্তর্নিহিত গবেষণাদি, এবং তার আবিষ্কার যত সূক্ষ্মই হোক, যত অসাধারণই হোক, তা দেশ-কাল-কার্য-কারণসাপেক্ষ। বস্তু, ব্যক্তি ও প্রকৃতির সগুণসাপেক্ষ। এখানে তুলনাগত ভাবে কিছু না-বলেও কেবল অনুভূতিগ্রাহ্য তত্ত্বের দৃষ্টিতে পরমতত্ত্বের সত্য পরিচয়, তার স্বমহিমা ও তাৎপর্যকে উল্লেখ করা হল মাত্র। ক্রমিক স্তরের অনুভূতির উৎকর্ষ সংক্ষেপে উল্লেখ করে বিষয়বস্তুকে ব্যক্ত করা হল। বিজ্ঞানের অন্তর্গত গবেষণা ও আবিষ্কারের বিরুদ্ধে কোনও যুক্তি এখানে দেখানো হয়নি, উদ্দেশ্যও তা নয়। মূল উদ্দেশ্য হল কেবল পরমতত্ত্বের সত্য অলোক প্রকাশ।

Godhead Absolute)—যেমন শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, যিশু, মহম্মদ, শ্রীচৈতন্য, নানক, রামকৃষ্ণ প্রভৃতি। তাঁদের রুচি, যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা, অননুকরণীয়, অননুমেয়, অপরিমেয়।

জীবজগতে প্রকৃতির প্রধান্য এত বেশি যে প্রকৃতিশক্তির বাইরে কোনও কিছু কল্পনা করা সাধারণের পক্ষে সম্ভব নয়। যাঁরা প্রকৃতিকে অবলম্বন করে গবেষণা করেন তাঁরা প্রকৃতিশক্তির তথ্যাদি সংগ্রহে ব্যস্ত থাকেন। প্রকৃতিতত্ত্ব সহজবোধ্য নয়, তা-ও সূক্ষ্ম অনুভূতিসাপেক্ষ, কারণ সামগ্রিক ভাবে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের মূলে যে প্রকৃতি তার সন্ধান সবাই জানে না। এই প্রকৃতিশক্তির সৃষ্টি-স্থিতি-লয় সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান লাভ করতে গেলে শক্তির মূলে যে অতিপ্রাকৃত শক্তি আছে তার সঙ্গে যুক্ত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। ইতিপূর্বে জীবের যে-তিন দেহের কথা বলা হয়েছে সেই তিন দেহের যে-কার্যাবলী সম্বন্ধে সামান্য উল্লেখ করা হয়েছে তার যথার্থ আলোচনা যথার্থ ভাবে এখানে সম্ভব না-হলেও মোটামুটি উল্লেখ করা দরকার। অন্তরচেতনার তিন অবস্থার সঙ্গে তিন দেহের অভিন্ন সম্বন্ধ আছে। অন্তরচেতনার তিন অবস্থা হল জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি। সুষুপ্তির অতীত হল তুরীয় চৈতন্য, চেতনার পূর্বোক্ত তিন অবস্থার সঙ্গে সম্বন্ধ রেখে তুরীয়কে কেউ কেউ চতুর্থ অবস্থা বলে উল্লেখ করেন। কিন্তু তুরীয় কোনও অবস্থা নয়—এ সর্ব গুণ-ভাব-দ্বন্দ্ব-ভেদমুক্ত। সর্বাতীত এই তুরীয় চৈতন্য হল অখণ্ড নিত্যপূর্ণ। স্বতঃসিদ্ধ, স্বতঃস্ফূর্ত বলে এ-ই হল পরমতত্ত্ব। এই তুরীয় চৈতন্য অনঙ্গ অসঙ্গ অলিঙ্গ অভঙ্গ। এরই অপর নাম হল পরাচিৎ, পরমবোধি, পরাজ্ঞান, সংবিৎ, সম্বোধি এবং প্রজ্ঞান। এই পরাচিৎই হল ব্রহ্ম-আত্মস্বরূপ, ভূমা অখণ্ড।

এবার তিন দেহের সঙ্গে চেতনার তিন অবস্থার অভিন্ন যোগ কী ভাবে সিদ্ধ হয় তা সংক্ষেপে ব্যক্ত করা হচ্ছে। স্থূলদেহের সঙ্গে চেতনার জাগ্রত অবস্থার সম্বন্ধ সিদ্ধ, সূক্ষ্মদেহের সঙ্গে স্বপ্নাবস্থার এবং কারণদেহের সঙ্গে সুষুপ্তি অবস্থার সম্বন্ধ সিদ্ধ। সোজা কথায় স্থূলদেহের কার্যাবলী সম্পন্ন হয় জাগ্রত অবস্থায়, সূক্ষ্মদেহের কার্যাবলী স্বপ্নাবস্থায় এবং কারণদেহের কার্যাবলী প্রকাশ হয় সুষুপ্তি অবস্থায়। বিশেষ ভাবে বলতে গেলে স্থূলদেহের পরিচয় হল জাগ্রত অবস্থা, সূক্ষ্মদেহের হল স্বপ্ন ও সগুণ সবীজ সমাধি এবং কারণদেহের পরিচয় হল সুষুপ্তি। এ অব্যক্ত অবস্থা বলে একেই কারণদেহ বলা হয়। অব্যক্ত অর্থ গুণ, ভাব বা শক্তির নিষ্ক্রিয় অবস্থা। এ-ই হল গাঢ় নিদ্রা বা অজ্ঞান অবস্থা। এই অব্যক্তর অজ্ঞান অবস্থায় অর্থাৎ সুষুপ্তি অবস্থায় সমগ্র সৃষ্টি, জগৎ প্রলীন থাকে। একেই বলা হয় undifferentiated state অথবা not-knowing state।

অব্যক্ত হল ত্রিগুণাপ্রকৃতির সাম্য অবস্থা। এ হল সমগ্র ব্যক্তের কারণ অব্যক্ত। এই অব্যক্ত কারণ অবস্থা হতে স্বপ্ন জাগ্রত অবস্থার সূক্ষ্ম ও স্থূল প্রকাশাদি জাত হয় আবার এই কারণদেহে এসে প্রলীন হয়। এ-ই হল কারণ ও কার্য এবং কার্য ও কারণের পৌনঃপুনিক ব্যাপার। এই অব্যক্ত কারণ অবস্থা হল সমগ্র স্থূল ও সূক্ষ্ম সৃষ্টির বীজ অবস্থা। বীজাঙ্কুর ন্যায়ের মত সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের ব্যাপারাদি সবই এই কারণ-কার্য, কার্য-কারণের অন্তর্নিহিত। এ কেবলমাত্র বুদ্ধিবৃত্তির মাধ্যমে অবগত হওয়া যায় না। স্রষ্টা প্রভু ঈশ্বরাত্মার অনুগ্রহ ব্যতীত প্রকৃতিবিজ্ঞানের অর্থাৎ প্রাকৃতবিদ্যার অংশবিশেষও অবগত হওয়া যায় না। কেবলমাত্র অনুমানের দ্বারা এবং কল্পনার দ্বারা কোন কিছুর যথার্থ সত্য পরিচয় জানা যায় না।

যে-অব্যক্তের কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে তা হল সমগ্র কার্যের কারণ অবস্থা। এই কারণ হতে কার্যের উদয় হয় এবং কার্যের পরিণামে কারণেই আবার লয় হয়। এ-ই হল প্রকৃতিবিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য। ঈশ্বর (পুরুষ) যোগে অর্থাৎ চৈতন্যের সঙ্গে জড় প্রকৃতি সংযোগে যে-সৃষ্টিলীলা হয় তাকেই প্রকৃতিবাদ বলা হয়। এই প্রকৃতিবাদের কারণ যেমন অব্যক্ত সেইরূপ অব্যক্তের কারণ হল চৈতন্যময় ঈশ্বর। ঈশ্বর পুরুষসত্তা, প্রকৃতি হল শক্তি। উভয়ের যোগে হয় সৃষ্টি এবং বিয়োগে হয় লয় অর্থাৎ সৃষ্টির অবসান। এটা ব্যষ্টি ও সমষ্টি উভয় ক্ষেত্রেই সমভাবে প্রযোজ্য (সাংখ্যমতে)।

উল্লেখিত অব্যক্ত হতে সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ আর একটি অব্যক্ত আছে তা হল পরম অব্যক্ত। সেই পরম অব্যক্তই হল সেই পরম অখণ্ড ভূমা অদ্বয় অব্যয় অমৃতসত্তা। এরই নামান্তর হল পরব্রহ্ম পরমাত্মা। এই অব্যক্তের কক্ষণও কোন বিকার বা পরিণাম হয় না। এ নিত্য নিষ্ক্রিয় অবিকারী অপরিণামী নিরাকার নির্বিশেষ নিরঞ্জন নিষ্কল নির্মল নিত্যাদ্বৈত নির্বিকল্প নিরালম্ব। প্রথম অব্যক্ত হল সগুণতত্ত্বের অর্থাৎ স্বভাবপ্রকৃতির আদি অবস্থা এবং দ্বিতীয় অব্যক্ত হল অখণ্ড ভূমা পূর্ণ অব্যক্ত। এই অব্যক্ত সর্বতোভাবে বাক্যমনাতীত। মৌন, নীরবতাই হল এর ভাষা। অন্য কোন ভাষায় এর বর্ণনা সম্ভব নয়।

জীবনবিজ্ঞানের অর্ধেক হল প্রথম অব্যক্তের অন্তর্গত এবং বাকি অর্ধেক হল দ্বিতীয় অব্যক্তের অন্তর্গত। কারণ-কার্যের মধ্যে সম্বন্ধ—কারণ হল অদৃশ্য অজ্ঞাত, অননুমেয়, অপরিমেয়, অবর্ণনীয় (অবর্ণাক্ষ্য) এবং কার্য হল কারণ ধর্মের বিপরীত। কারণ-কার্যের মধ্যে উভয়ই উভয়ের সম্পূরক ও পরিপূরক। উভয়ের পরিচয় দ্বৈতাদ্বৈত অর্থাৎ দ্বৈত হয়েও অদ্বৈত এবং অদ্বৈত হয়েও দ্বৈত। কিন্তু পরম অব্যক্ত হল কারণের কারণ পরম কারণ বা তুরীয়। এ-ই সত্যের স্বরূপ। এ হচ্ছে স্বানুভবসিদ্ধ অতর্ক্যমূর্তি। এ সর্বতোভাবে ঈশ্বরাত্মা গুরুর কৃপাসাপেক্ষ। স্বানুভবসিদ্ধ গুরু হলেন ঈশ্বরাত্ম-ব্রহ্মের মূর্ত বিগ্রহ। কেবলমাত্র তাঁর সঙ্গ ও অনুগ্রহে সত্যধর্ম অমৃতত্ব ও সত্য ঈশ্বরাত্মার যথার্থ জ্ঞান স্বানুভবসিদ্ধ হয়। স্বসংবেদ্য স্বানুভূতি হল তার প্রমাণ, পরিচয়।

পরমতত্ত্বই যে পরম অমৃতসত্তা তা পূর্বে বলা হয়েছে। জীবনবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তার অনুসন্ধান ও সাধনা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভঙ্গিমায় সিদ্ধ হয়। জীবন সাধনার সিদ্ধিলাভের পথ ও উপায় বা প্রণালী বহুবিধ। একেবারে দেহাত্মবুদ্ধি হতে আরম্ভ করে দেহাতীত সচ্চিদানন্দ পরমাত্মবোধে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্যে বহুবিধ সাধনক্রম অতিক্রম করতে হয়। সর্ববিধ সাধন প্রণালী পরিণামে কিছু নূতন অনুভূতির আলো প্রদান করে। তাদের প্রত্যেকেরই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য মূলত এক যদিও তাদের সাধনবিজ্ঞানে পরস্পরের মধ্যে বিশেষ বিশেষ পার্থক্য বা ভেদ থাকে। ভিন্ন ভিন্ন সাধনবিজ্ঞানের তাৎপর্য পৃথক পৃথক ভাবে অনুভূত হয় বলে মানুষের মধ্যে অনুভূতির মানের তারতম্য দৃষ্ট হয়। বাস্তব ক্ষেত্রে রূপে-রূপে ভেদ, নামে-নামে ভেদ, ভাবে-ভাবে ভেদ পরিলক্ষিত হয়। সর্ববিধ ভেদ, পার্থক্য বা অমিল ইন্দ্রিয় মনের স্তরেই সীমাবদ্ধ। অতীন্দ্রিয় স্তরে অনুভূতির ভেদ দৃষ্ট হয় না। কল্পনাপ্রধান মনের ধর্ম ভেদমূলক। ভেদ বা পার্থক্যই তার বৈশিষ্ট্য। অভেদের ঘর হল অদ্বৈতের ঘর। সেখানে ভেদ বা দ্বৈতের অস্তিত্বই নেই, প্রকাশ তো দূরের কথা। এই প্রসঙ্গে বিশেষ জ্ঞাতব্য হল সমগ্র দ্বৈতের মূল হল অদ্বৈত, সমগ্র ভেদের মূল হল অভেদ, সমগ্র তথ্যের মূল হল তত্ত্বস্বরূপ, সমগ্র বৈচিত্র্যের মূল হল একতা সমতা পূর্ণতা। যদবধি সাধনা তদবধি কল্পনা। বিপরীতক্রমে যদবধি কল্পনা তদবধি সাধনা। এ দ্বৈতের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, অদ্বৈতের ক্ষেত্রে নয়।

পূর্বে যে পঞ্চকোষ, তিন দেহ, তিন চেতন অবস্থার কথা বলা হয়েছে সে-সবই দ্বৈত পর্যায়ভুক্ত। অদ্বৈতানুভূতি হল পরমে পরম, স্বয়ং-এ স্বয়ং, আপনে আপন। এ সাধনসাপেক্ষ নয়, স্বতঃসিদ্ধ স্বতঃস্ফূর্ত স্বয়ংপ্রকাশ।

তত্ত্বালোচনার প্রসঙ্গে যে-কথাটি সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ তা হল আত্মা ও অনাত্মা, সত্য ও মিথ্যা, জ্ঞান ও অজ্ঞান, নির্গুণ ও সগুণ, দ্বৈত ও অদ্বৈত প্রভৃতি শব্দগুলির তাৎপর্য অর্থাৎ মর্মার্থ সদ্‌গুরুমুখে না-শুনলে কেবলমাত্র গ্রন্থপাঠে বা সংসারবদ্ধ দেহাত্মবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কাছে শুনে তার সত্যানুভূতি হওয়া সম্ভব নয়। অনুভূতির পর্যায় ভেদ অবশ্যম্ভাবী কারণ অনুভূতি হয় ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের বিষয় মন ও বুদ্ধির সহযোগে। ইন্দ্রিয়ের বিষয় নাম-রূপ হল বৈচিত্র্যপূর্ণ, বহুধা। বোধেন্দ্রিয় পঞ্চবিধ। এই সবের যথার্থ কার্য নিষ্পন্ন হয় অন্তর্মনের বুদ্ধির সহযোগে। সোজা কথায় অনুভূতির কেন্দ্রে হল অন্তঃকরণ। ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের বিষয় হল তার উপাধি ও উপকরণ। এই সবার সমবায়ে বা যৌগিক ক্রিয়া যোগেই অনুভূতি নিষ্পন্ন হয়। সেই জন্যে অনুভূতির মধ্যে ক্রম, ব্যতিক্রম এবং অনুক্রম প্রভৃতি দৃষ্ট হয়। দ্বৈতের ব্যবহারে ভেদ ও দ্বন্দ্ব স্বাভাবিক, তার ফলে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া অপরিহার্য। অনুভূতির বিষয় যেমন

ভিন্ন ভিন্ন, তদনুসারে তার ক্রিয়াদিও ভিন্ন ভিন্ন এবং তাদের ফলানুভূতিও ভিন্ন ভিন্ন। অন্তঃকরণের দু'টি বিভাগ যথা—বাহির ও অন্তর, কার্য ও কারণ, কারণ ও কার্য। বাহিরকে বা কার্যকে জানা গেলেও অন্তরকে বা কারণকে সেই ভাবে জানা যায় না। ইন্দ্রিয়াদি যেমন কার্যসাপেক্ষ, অন্তঃকরণও সেইরূপ কার্যসাপেক্ষ। চিদানন্দস্বরূপ ঈশ্বরাত্মা ব্রহ্ম কার্যসাপেক্ষ নয়, কার্যনিরপেক্ষ। দ্বৈতক্ষেত্রে সর্ববিধ কার্য হল প্রযত্ন ও অভ্যাসসাপেক্ষ। অভ্যাস আবার নিষ্ঠাসাপেক্ষ। নিষ্ঠা আবার ভক্তিসাপেক্ষ, ভক্তি আবার শ্রদ্ধাসাপেক্ষ। শ্রদ্ধা সৎসঙ্গসাপেক্ষ। সৎসঙ্গ দ্বিবিধ, একটি হচ্ছে সৎসঙ্গ আর একটি হচ্ছে সত্যসিদ্ধ পুরুষ। দ্বিতীয়টির অভাবে প্রথমটি কিছু সাহায্য করে সত্য কিন্তু পুরোপুরি নয়। অপর পক্ষে প্রথমটির অভাবেও দ্বিতীয়টি দ্বারা সর্বসিদ্ধি ফলপ্রদ হয়।

ইতিপূর্বে যে-প্রকৃতির কথা বলা হয়েছে সেই প্রকৃতি দ্বিবিধ—অপরা ও পরা। অপরা প্রকৃতি অষ্টবিধা, যথা ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এবং সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ তিনগুণ, অথবা মন, বুদ্ধি, অহংকার। পরিদৃশ্যমান জগৎ হল অপরা প্রকৃতির বিস্তার বা কার্য। পরা প্রকৃতি হল জীব প্রকৃতি, জীবের স্বভাবচৈতন্য। অপরা প্রকৃতিকে ধারণ করে রেখেছে জীবচৈতন্য। জীবচৈতন্যের মূল ঈশ্বর। ঈশ্বরের মূল হল পরমতত্ত্বস্বরূপ ব্রহ্মদেব/পরমাত্মদেব। সমগ্র প্রকৃতি হল জীবের ভোগ্য, আধার। জীব হল ভোক্তা, ঈশ্বর হলেন প্রভু, ব্রহ্ম আত্মা হলেন সাক্ষী। সমগ্র জগৎ হল বিষয়, জীব হল বিষয়ী, অর্থাৎ জগৎ হল দৃশ্য, জীব হল দ্রষ্টা ভোক্তা জ্ঞাতা। জীবজগতের মধ্যে যেমন ভেদ সম্বন্ধ আছে, তেমন অভেদ সম্বন্ধও আছে। জীব ও ঈশ্বরের মধ্যেও ভেদ সম্বন্ধ আছে এবং অভেদ সম্বন্ধ আছে। ঈশ্বর এবং ব্রহ্ম আত্মার মধ্যে ভেদ সম্বন্ধ গৌণ, অভেদ সম্বন্ধ মুখ্য। জগতের সঙ্গে জীবের সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ, ঈশ্বরের সঙ্গে সম্বন্ধ অপ্রত্যক্ষ এবং ব্রহ্ম-আত্মার সম্পর্ক আরও অপ্রত্যক্ষ। জীবের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্ক প্রত্যক্ষ কিন্তু ব্রহ্ম-আত্মার সম্পর্ক অপ্রত্যক্ষ, আবার ঈশ্বরের সঙ্গে ব্রহ্ম-আত্মার সম্পর্ক প্রত্যক্ষ।

উপরোক্ত প্রসঙ্গ অতীব সূক্ষ্ম ও দুর্বোধ্য, তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু পরস্পরের মধ্যে প্রত্যক্ষ (direct) ও অপ্রত্যক্ষ (indirect) সম্বন্ধকে হৃদয়ঙ্গম করার জন্য একান্ত ভাবে যা প্রয়োজন তা হল নিজের অন্তরের তীব্র ব্যাকুলতা, সচেতন অনলস প্রচেষ্টা, সর্বোপরি তার সঙ্গে ঈশ্বর গুরুর নিরবচ্ছিন্ন অনুগ্রহ। এখানে গুরু বলতে অনুভবসিদ্ধ নিত্যমুক্ত করুণাঘন নিঃস্বার্থপর নিরভিমান দিব্যমানব মহাপুরুষকে নির্দেশ করা হয়েছে। ইনিই হলেন যথার্থ সদ্‌গুরু। তিনি পরাপরম গুরু এবং পরমেষ্ঠিগুরু। এই সদ্‌গুরু হলেন ঈশ্বর আত্মা ব্রহ্মের মূর্ত বিগ্রহ, অর্থাৎ জীবন্ত বিগ্রহ। এই সদ্‌গুরুর মধ্যে সর্বতত্ত্বের সমন্বয়, পরমতত্ত্বের স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি। তিনি তত্ত্বস্বরূপ স্বয়ং। তাঁর বাণীই হল সদ্‌বাণী, বেদবাণী, আত্মবাণী, ব্রহ্মবাণী, ব্রহ্মবেদ—অর্থাৎ তিনি অখণ্ড ব্রহ্ম-আত্ম সংহিতা। তাঁর মাধ্যমে নিরন্তর সত্য, শিব ও সুন্দরের স্ফূর্তি প্রকাশ পায়। তিনি সমগ্র মায়া প্রকৃতির প্রভাবমুক্ত, সুতরাং তিনি গুণাতীত দ্বন্দ্বাতীত ভাবাতীত ভেদাতীত। তিনি নিত্যপূর্ণ নিরূপম, আদি অনাদি পুরুষ, সদা সচ্চিদানন্দ ভাববোধে সুপ্রতিষ্ঠিত।

সদ্‌গুরু হলেন নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, অজর, অমর, অপাপবিদ্ধ। তিনি পুরুষোত্তম, সর্ব আদর্শের ঘনীভূত বিগ্রহ। তাঁর স্বভাব হল পরশমণির চুম্বকের মত। তাঁর সংস্পর্শে যে ব্যাকুলচিত্ত শরণাগত আসে সে তাঁর মুক্ত দিব্য অমৃত আত্মস্বরূপে সহজেই সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

সংসারে মানুষের ভেদ পার্থক্য সকলের কাছে প্রত্যক্ষ, কিন্তু এই বৈচিত্র্য এবং ভেদের মধ্যে যে অখণ্ড অভিন্ন অভেদ স্বরূপ নিহিত আছে তা সাধারণের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না। তত্ত্বজ্ঞ পুরুষের কাছে তা সুস্পষ্ট ও সহজবোধ্য। সাধারণ মানুষ হল কামাহত বিষয়াসক্তচিত্তপ্রধান। তাদের কাছে তত্ত্ব ও তথ্য অপেক্ষা পথ্যই প্রিয়। সংসারে কিছু লোক আছে তারা পথ্য ছাড়াও আরও কিছুর সন্ধান করে। তারা হল শিক্ষা-সংস্কৃতিমূলক ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত। তারাই প্রয়োজনবোধে তথ্য সংগ্রহ করে। তারা নানা বিষয়ের গভীরে প্রবেশের জন্য প্রয়াস ও যত্ন চালায়। তারাই হল প্রগতিবাদী। তাদের কাছে শিক্ষা ইতিহাস রাজনীতি সমাজনীতি অর্থনীতি ও প্রাকৃতবিজ্ঞানের ভিন্ন ভিন্ন

শাখার রহস্য জানার কৌতূহলই বেশি। সেজন্য তারা তথ্য সংগ্রহ করে তথ্যবিদ্ হয়। তথ্যবিদ্দের বৈশিষ্ট্য হল তারা সর্বতোভাবেই বস্তুতান্ত্রিক, অর্থাৎ প্রাকৃত শক্তি ও বিদ্যার সেবক ও সাধক। বিষয়প্রকৃতির অতিরিক্ত জীবনবেদ সম্বন্ধে তারা সম্যক্রূপে সচেতন নয়। সেই প্রসঙ্গে তাদের জ্ঞান ও গবেষণা নেতিমূলক। তাদের কাছে নিজ স্বরূপ অপেক্ষা বিষয়বিজ্ঞানের গুরুত্ব সর্বাধিক। তারা তথ্যকেই সত্য বলে গ্রহণ করে, কিন্তু তারা জানে না যে তথ্য হল বিষয়ভিত্তিক বা সাপেক্ষ, নির্বিষয়ক নয়। অপর পক্ষে তত্ত্ব হল সম্পূর্ণরূপে বিষয়নিরপেক্ষ। কেবল শুদ্ধবোধসাপেক্ষ। এই শুদ্ধবোধের মধ্যে কোনও ভাবেই কোনও কিছুর সম্বন্ধ বা যোগ সিদ্ধ নয়।

তত্ত্ব ও তত্ত্ববেত্তার পরিচয় যথার্থ ভাবে পাওয়া গেল, এবার তার কাজ ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলা দরকার। যদবধি দেহবুদ্ধি বিষয়বুদ্ধি প্রাকৃতবুদ্ধি প্রধান ও সক্রিয় থাকবে তদবধি জীবনের তত্ত্বস্ফূর্তি (প্রকাশ) কখনও কোনও ভাবেই সম্ভব নয়। তত্ত্বস্ফূর্তির পূর্বে সম্যক্রূপে ভাবশুদ্ধি (বুদ্ধিশুদ্ধি) ও বিবেকসিদ্ধি একান্ত প্রয়োজন। বিবেকসিদ্ধি মানেই প্রজ্ঞাসিদ্ধি। প্রজ্ঞাবান পুরুষেরই বিবেকসিদ্ধি হয়। সমাধিসিদ্ধ পুরুষের প্রজ্ঞাসিদ্ধি হয়। বিষয়নিরপেক্ষ চিত্তের সমাধিসিদ্ধি হয়। সৎসঙ্গের কৃপায় ও স্বকীয় প্রচেষ্টায় চিত্ত হয় বিষয়নিরপেক্ষ। বিষয়নিরপেক্ষ চিত্তই হল শুদ্ধচিত্ত। শুদ্ধচিত্ত শুদ্ধবোধ তথা চিৎতত্ত্বের সঙ্গে সম্যক্রূপে যুক্ত বা প্রতিষ্ঠিত। সমাধিসিদ্ধ পুরুষের বিবেকসিদ্ধির কারণ প্রজ্ঞাস্থিতি হয়। অর্থাৎ তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ হন। স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষই হলেন জীবন্মুক্ত পুরুষ। এই জীবন্মুক্ত পুরুষই হলেন তত্ত্বজ্ঞ ও তত্ত্ববিদ্, অপরে নয়। ছোট একটি প্রবাদ আছে—তত্ত্বকথা যায় না পাওয়া যেথা সেথা। অনেক সময় অনেকের মুখেই তত্ত্বকথা শোনা যায়। কিন্তু তাদের যোগ্যতা বা অভিজ্ঞতার কোন লক্ষণ প্রকাশ পায় না। কি অধ্যাত্ম জগতে, কি সংসার জগতে, কি সাহিত্য জগতে সর্বত্রই ভাবের ঘরে চুরি বেশি দেখা যায়। ভাবের ঘরে চুরি করা সহজ, সামাল দেওয়া সহজ নয়। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই সেটা ধরা পড়ে, তখন কিছুতেই তারা লোকের কাছে মর্যাদা পায় না। তারা তখন গাঁয়ে না-মানে আপনি মোড়ল। মূল কথা হল যোগ্যতাসম্পন্ন অভিজ্ঞ ব্যক্তির নিজস্ব একটি মহান বা বড় আদর্শ থাকে। সেই আদর্শকে অনুসরণ করেই সে তার জীবন তৈরি করে। এইরূপ আদর্শবান পুরুষ, চরিত্রবান পুরুষই তত্ত্বের সন্ধান করে। তত্ত্বের সন্ধান পেয়ে তত্ত্ববিদ্ হয়। এইরূপ তত্ত্ববিদের জীবন অতীব দুর্লভ।

তত্ত্ববিদ্ পুরুষের হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হয়, সর্ব সংশয় নিরসন হয় এবং সমস্ত কর্মফল তার ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। (ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।) এইরূপ আদর্শ চরিত্রবান পুরুষ হলেন মুক্তপুরুষ। তিনি সমগ্র নির্গুণ ও সগুণ তত্ত্বের দ্রষ্টা ও বেত্তা। তিনি সমগ্র কারণ-কার্য ও কার্য-কারণের বিজ্ঞানবিদ্। তাঁর সম্বন্ধে গীতায় বলা আছে—

"তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো গুণকর্মবিভাগয়োঃ।
গুণা গুণেষু বর্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে।।"

অর্থাৎ তত্ত্ববিদ্ কোন কর্মের বিভাগ সম্বন্ধে সদাই সচেতন থাকেন। তাঁর কখনও ভুল হয় না। তিনি জানেন সমগ্র সৃষ্টি রহস্যই হল গুণের সঙ্গে গুণের মিশ্রণের ফল। সমস্ত কর্ম হচ্ছে গুণের ক্রিয়া বা কার্য। সমস্ত সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার হল ত্রিগুণাপ্রকৃতির তিন গুণের বিকার ও বিস্তার। তত্ত্ববিদ্ হলেন শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী। তাঁর দৃষ্টিতে হল জ্ঞানই সত্য। সুতরাং গুণের কার্যাবলী বিশ্বরচনাও মিথ্যা। শুদ্ধ বেদান্তবাদীদের এই হল সিদ্ধান্ত। একথা যুক্তিসিদ্ধ হলেও তর্কাতীত, অতর্ক্য।

তর্কবিদের দৃষ্টিতে তত্ত্ব দ্বিবিধ—অদ্বয় তত্ত্ব ও দ্বৈত তত্ত্ব। দ্বৈত তত্ত্ব অদ্বয় তত্ত্বের অধীন। দ্বৈতবাদীরা অদ্বয় তত্ত্ব মানে না। সাধারণ মানুষ অদ্বয় তত্ত্বের কথা তো অনেক দূরের কথা, তারা দ্বৈতবাদও বোঝে না। তারা ইন্দ্রিয় দিয়ে যা নাগাল পাওয়া যায় তাই মানে। তথ্যবাদীগণ দুইভাগে বিভক্ত। অধিকাংশই হল দ্বৈত মতাবলম্বী। খুব অল্পসংখ্যক ব্যক্তিই অদ্বৈতবিশ্বাসী এবং অদ্বৈতবাদের সাধনায় রত। যদবধি তারা সাধনায় রত তদবধি তারা তত্ত্ব

শ্রবণ, তত্ত্ব মনন, তত্ত্ব নিদিধ্যাসনে রত থাকে। সাধারণ অবস্থায় তারা অদ্বৈতভিত্তিক সাধনায় রত থাকলেও তারা দ্বৈত ভাবেরই অন্তর্ভুক্ত। অদ্বৈতের মধ্যে সাধ্য, সাধন ও সাধকের পৃথক অস্তিত্ব নেই। এই তিনটির নাম হল ত্রিপুটি। এই ত্রিপুটি বহুবিধ হতে পারে যথা—সত্ত্বাদি তিনগুণের, স্থূলাদি তিনগুণের, জাগ্রতাদি তিনভাবের, বর্তমানাদি ত্রিকালের ইত্যাদি।

তত্ত্বের প্রসঙ্গ তত্ত্বের দ্বারাই পূর্ণ। মূল তত্ত্ব ও তার প্রকাশাদি সবই অভিন্ন। সাগরে তরঙ্গ, লহরী, বুদ্বুদ, ফেনা সবই যেমন জলেরই ভিন্ন ভিন্ন অভিব্যক্তি মাত্র, সেইরূপ তত্ত্বসাগরে সর্ব বৈচিত্র্যময় প্রকাশাদি মূলত এক তত্ত্বেরই ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ ও অভিব্যক্তি মাত্র। কারণ তত্ত্বসাগরে তত্ত্বাতিরিক্ত কোনও সত্তাশক্তি নেই—যা-কিছু আছে তা শুধু তত্ত্বই।

তত্ত্বের আলোচনায় তত্ত্বের গুরুত্ব, মাহাত্ম্য ও তাৎপর্য তত্ত্বেই শুরু হয় এবং তত্ত্বের মাধ্যমেই তার সমাপ্তি সাধিত হয়। সুতরাং সবকিছুরই আদিতে তত্ত্ব, মধ্যে তত্ত্ব, অন্তেও তত্ত্ব। সবই তত্ত্বময়, তত্ত্বের অন্তরে বাইরে সবই তত্ত্বপূর্ণ। প্রজ্ঞান তত্ত্ব, বিজ্ঞান তত্ত্ব, জ্ঞান তত্ত্ব ও অজ্ঞান তত্ত্ব। তত্ত্বই সূক্ষ্মতম ও সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্ম ও স্থূল। তত্ত্বই তুরীয়, কেন্দ্রিয়, অন্তর ও বাহির। তত্ত্বই বোধ, ভাব, নাম ও রূপ। তত্ত্বই তুরীয়, সুষুপ্তি, স্বপ্ন ও জাগরণ। সেইরূপ প্রেম তত্ত্ব, আনন্দ তত্ত্ব, জ্ঞান তত্ত্ব ও শক্তি তত্ত্ব। একই ভাবে ভক্তি তত্ত্ব, যোগ তত্ত্ব ও কর্ম তত্ত্ব। তত্ত্বই সিদ্ধি, সাধ্য, সাধন ও সাধক।

তত্ত্বই সত্তা, শক্তি, বিভূতি ও অনুভূতি। বোধি তত্ত্ব, বুদ্ধি (মন) তত্ত্ব, প্রাণ তত্ত্ব, দেহেন্দ্রিয় তত্ত্ব। তত্ত্বই কারণ, কার্য, দেশ ও কাল।

পুরুষ তত্ত্ব, প্রকৃতি তত্ত্ব, প্রকাশ তত্ত্ব ও বিভূতি তত্ত্ব, তত্ত্বই অব্যক্ত, ব্যক্ত, অসম্ভূতি ও সম্ভূতি। নির্গুণ তত্ত্ব, সগুণ তত্ত্ব, নির্গুণ-গুণী তত্ত্ব। মোক্ষ তত্ত্ব, কাম তত্ত্ব, অর্থ তত্ত্ব, ধর্ম তত্ত্ব। অভেদাভেদ তত্ত্ব, অভেদ তত্ত্ব, ভেদাভেদ তত্ত্ব, ভেদ তত্ত্ব। তত্ত্বই সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি। তত্ত্বই নিত্যাদ্বৈত, অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত ও দ্বৈত।

ব্রহ্ম-আত্ম তত্ত্ব, ঈশ্বর তত্ত্ব, দেব তত্ত্ব, জীব তত্ত্ব ও প্রকৃতি তত্ত্ব। সৃষ্টি তত্ত্ব, স্থিতি তত্ত্ব, সংহার তত্ত্ব, বিষম তত্ত্ব, সম তত্ত্ব, জড় তত্ত্ব, চেতন তত্ত্ব, অজীব তত্ত্ব, জীব তত্ত্ব। অনীশ্বর তত্ত্ব, ঈশ্বর তত্ত্ব। নৃতত্ত্ব, মাতৃতত্ত্ব, পিতৃতত্ত্ব, অসুর তত্ত্ব, দেব তত্ত্ব, মৃত্যু তত্ত্ব, অমৃত তত্ত্ব।

বস্তু তত্ত্ব, ভূতত্ত্ব (পৃথিবী, ক্ষিতি তত্ত্ব), জল তত্ত্ব, তেজ (অগ্নি) তত্ত্ব, বায়ু তত্ত্ব, আকাশ তত্ত্ব, প্রাণ (মুখ্য) তত্ত্ব, মহৎ তত্ত্ব, অহংকার তত্ত্ব, সূক্ষ্ম ভূত তত্ত্ব (পঞ্চতন্মাত্র), পঞ্চ মহাভূত তত্ত্ব। গুণ তত্ত্ব, ভাব তত্ত্ব, অভাব তত্ত্ব, স্বভাব তত্ত্ব, স্ব তত্ত্ব (আত্ম)।

প্রকৃতি তত্ত্বের দু'টি ভাগ—বাহ্য ও অন্তর। বাহ্য ভাগ অপরা, অন্তর ভাগ পরা—তারই নাম স্বভাব তত্ত্ব। অপরা ভাগ ত্রিগুণাত্মিকা, অচেতন; পরা ভাগ চেতনযুক্ত ত্রিগুণাত্মিকা—এতে চেতনের ভাগ কখনও গুণের দ্বারা অভিভূত থাকে, কখনও গুণের ভাগ চেতনের প্রভাবে অভিভূত থাকে। এ-ই হল অনুভূতির নিম্ন মান ও ঊর্ধ্ব মানের কারণ। মতান্তরে একেই নিম্ন মন ও ঊর্ধ্ব মন বলা হয়েছে। নিম্ন মনও ব্যষ্টি-সমষ্টি ভেদে দ্বিবিধ। ঊর্ধ্ব মনও ব্যষ্টি-সমষ্টি ভেদে দ্বিবিধ। নিম্ন মনে ত্রিগুণের প্রাধান্য বেশি, চেতনের প্রাধান্য অপেক্ষাকৃত কম। অপর পক্ষে ঊর্ধ্ব মনে চেতনের প্রভাব বেশি, ত্রিগুণের প্রভাব কম। সাধনার মাধ্যমে নিম্ন মন ঊর্ধ্ব মনে পরিণত হয় এবং ঊর্ধ্ব মন সাধনার মাধ্যমে উৎকর্ষ লাভ করে অন্তরতম অর্থাৎ কেন্দ্র চৈতন্যের সঙ্গে একীভূত হয়ে যায়। তখন ত্রিগুণের প্রভাবমুক্ত শুদ্ধ চৈতন্যের অভিব্যক্তি হয়। এই শুদ্ধ চৈতন্যই হল সংবিৎতত্ত্ব বা জ্ঞানতত্ত্ব। এরই নামান্তর হল চিৎতত্ত্ব। এই চিৎতত্ত্ব সপ্রকাশ বলে প্রকাশক্রমের ধারা অনুযায়ী যে-ভাবে লীলায়িত হয় তার মধ্যে প্রকাশের দৃষ্টিতে অন্তর বাহির ভেদ প্রতীয়মান হয়। এই ভেদই হল সংবিৎ বা চিৎ-এর অনুভূতির তারতম্য। এ উপাধিমূলক অর্থাৎ গুণাত্মক—সেজন্য

বহির্ভাগকে অপরা বা অচিৎ রূপে অনুভূত হয়, অন্তরভাগকে চিৎ রূপে এবং কেন্দ্র ভাগকে পরাচিৎ রূপে অনুভূত হয়।

পরাচিৎ অর্থে শুদ্ধ চিৎকে অর্থাৎ গুণমুক্ত অবিমিশ্র চিৎতত্ত্বকেই নির্দেশ করে, আর চিৎ অর্থে অপরা ও পরার মাঝামাঝি কূটস্থ চৈতন্যকে নির্দেশ করে। অচিৎ অর্থে চিৎ-এর আভাসকে নির্দেশ করে। চিদাভাসের আবার দু'টি ভাগ—বহির্ভাগ ও অন্তর্ভাগ। বর্হিভাগে পরিদৃশ্যমান জগৎ, অন্তর্ভাগ হল জীব। এই উভয়ের নিয়ন্তা হল চিৎস্বরূপ কেন্দ্রসত্তা, অর্থাৎ ঈশ্বর। এই ঈশ্বরই হল পরাচিৎ-এর অভিব্যক্তি, পরাচিৎস্বরূপ প্রজ্ঞানতত্ত্ব বা ব্রহ্মাত্ম জ্ঞান। চিৎস্বরূপ হল বিজ্ঞান তত্ত্ব বা ঈশ্বর তত্ত্ব। চিদাভাসের অন্তর্ভাগ হল স্বভাবতত্ত্ব বা জীবতত্ত্ব, বহির্ভাগ হল প্রকৃতি তত্ত্ব বা জগৎ তত্ত্ব (নামরূপের জগৎ)।

তত্ত্বস্বরূপ বলতে প্রজ্ঞানতত্ত্ব, অর্থাৎ ব্রহ্ম-আত্ম তত্ত্বকেই নির্দেশ করে। তার সর্বোত্তম স্ফূর্তি বা প্রকাশ হল বিজ্ঞানতত্ত্ব, তার স্ফূর্তি বা অভিব্যক্তি হল জ্ঞানতত্ত্ব। এই জ্ঞান অর্থে জ্ঞানাভাসকেই নির্দেশ করে। এই জ্ঞানতত্ত্বের নিরন্তর স্ফূর্তি বা অভিব্যক্তি হল অজ্ঞানতত্ত্ব। এখানে অজ্ঞান অর্থে সম্পূর্ণ জ্ঞানের অভাব নয়। অনুভূতির দৃষ্টিতে গুণের দ্বারা বাধিত বা আবরিত উপাধিযুক্ত জ্ঞানের নিম্নতম মানকেই নির্দেশ করে। সেইজন্য জ্ঞানের পূর্বে যে 'অ' উপসর্গ যুক্ত হয় তা অভাবমূলক, নঞ-বাচক। নঞ-লক্ষণার্থ সবকিছুতেই পূর্ণতার অভাব বা অপূর্ণতার সূচক ভাবকেই নির্দেশ করে। সেইজন্য একে জ্ঞানাভাসের নিম্নতম প্রকাশ বলা হয়েছে। জড় বস্তু অর্থাৎ নামরূপাত্মক যে অনুভূতি তা একেবারে জ্ঞানশূন্য নয়। নামরূপযুক্ত জ্ঞানাভাসই হল অজ্ঞান। এই অজ্ঞানেরও মানের তারতম্য আছে। এ-ই হচ্ছে জ্ঞানাভাসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। গুণ বা ভাবযুক্ত জ্ঞান বা ভাবকেই জ্ঞানাভাস বলা হয়েছে ইতিপূর্বে। এই ভাব হল উপাধি ভেদের কারণ। এই জ্ঞানভাসের দু'টি ভাগ—এক ভাগে তা নামরূপ ধারণ করে কামনা বা ইচ্ছা যোগে, আরেক ভাগে অন্তরে স্থিত কূটস্থ চৈতন্যের সহযোগে চিদাভাস নামরূপকে প্রকাশ করে প্রকাশক রূপে অভিব্যক্ত হয়। এই প্রকাশক ভাগের নামই হল ফলকচৈতন্য (subjective consciousness), অর্থাৎ জ্ঞাতা, জ্ঞান আর নামরূপের ভাগকে বলা হয় জ্ঞেয় জ্ঞান। উভয়ের মধ্যে সংযোগ হয় জ্ঞানাভাসের যে-অংশে ইন্দ্রিয় মন সক্রিয় হয় তার দ্বারা। আভাসচৈতন্যের দ্বারা যা-কিছু ভাববোধ সিদ্ধ হয় তার জন্য কূটস্থ চৈতন্যের সাহায্য একান্ত প্রয়োজন। বস্তুজ্ঞানের ক্ষেত্রে এর প্রত্যক্ষ পরিচয় বা প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন একটা ঘটে অনুভূতি বা জ্ঞানের ক্ষেত্রে দেখা যায় ঘটের অস্তিত্ব, তার প্রকাশ ও তার অনুভূতি সিদ্ধ হয় কী ভাবে। চিদাভাসের (মনের)—যাকে অন্তঃকরণ বলা হয়—এক অংশ ঘটের অভাবকে, অর্থাৎ অনস্তিত্বকে অস্তিত্ব রূপে বা ঘটভাব বা আকার রূপে প্রকাশ করে। এই চিদাভাস অংশের কাজকে সাহায্য করে চিদাভাসের অন্তর্ভাগ। তা সিদ্ধ হয় তৎপশ্চাতে কূটস্থ চৈতন্যের প্রকাশচৈতন্যের মাধ্যমে। সোজা কথায় বুদ্ধির সর্ববিধ কাজ সাধিত হয় কূটস্থ চৈতন্যের নিয়ন্ত্রণাধীনে বা সহযোগিতায়। কূটস্থ চৈতন্যের সহায়তা ভিন্ন বুদ্ধি ঘটের অস্তিত্বের অভাবকে কিম্বা তার অস্তিত্বের প্রকাশকে এই উভয় ভাগকে ব্যক্ত করতে পারে না। কূটস্থ চৈতন্য কিন্তু স্বতন্ত্র ও স্বাধীন ভাবে বুদ্ধির সহায়তা ছাড়াই স্বয়ংপ্রকাশ। এই কূটস্থ চৈতন্য হল জীবের হৃদয়ে কেন্দ্রস্থ চৈতন্য। এই কেন্দ্রস্থ চৈতন্য ও তুরীয় চৈতন্য উভয়ই অভিন্ন এবং মূলত এক। এ-ই পরাচিৎ বা সংবিৎতত্ত্ব। এ স্বতঃসিদ্ধ, স্বতঃস্ফূর্ত, স্বয়ংপূর্ণ, স্বয়ংপ্রকাশ। সুতরাং কূটস্থ চৈতন্য নির্বিকার, নিরাকার, নিরালম্ব, নির্দ্বয়, কিন্তু আভাসচৈতন্য ঠিক তার বিপরীতধর্মী। গুণ ও ভাবযুক্ত হওয়াই হল তার কারণ।

তত্ত্বস্বরূপকেই সচ্চিদানন্দ বলা হয়। এই সচ্চিদানন্দের সৎ, চিৎ ও আনন্দ কোনও গুণ, ভাব বা শক্তি নয় (attributeless)। এ হল তার স্বরূপ লক্ষণ অর্থাৎ true nature। চৈতন্য স্বয়ংপ্রকাশ। অবলম্বনশূন্য, স্বতঃসিদ্ধ বলে গুণ-ভাবাদিবর্জিত; স্বয়ংপূর্ণ বলে সর্ব অভাবশূন্য; অখণ্ড, অনন্ত ও ভূমা বলে আনন্দঘন; অবিভক্ত ও নির্বিকার বলে

অদ্বৈত ও নিত্য এবং নিরন্তর অবিমিশ্র বলে নিষ্ক্রিয়। গুণ-ভাবাদি যোগে এর চিদাভাসের অভিব্যক্তি হয় এবং কল্পনাপ্রসূত বলে অনিত্য। নিত্যসিদ্ধ বলে এই তত্ত্বস্বরূপ সচ্চিদানন্দের কোনও বিপক্ষ, প্রতিপক্ষ বা বিকল্প নেই। তত্ত্বস্বরূপের এ-ই হল সর্বোত্তম মহিমা ও বৈশিষ্ট্য। সেইজন্য তত্ত্বের তাৎপর্য তত্ত্বের দ্বারাই সিদ্ধ হয়।

উপরোক্ত আভাসচৈতন্যের ত্রিবিধ প্রকাশ জ্ঞাতা-জ্ঞেয়-জ্ঞানের সম্যক্ বিজ্ঞানকে অন্য ভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে—জ্ঞাতা হল প্রমাতা (প্রমাতৃচৈতন্য), জ্ঞেয় হল প্রমেয়, আর ইন্দ্রিয়চৈতন্য হল প্রমাণ। প্রমাণের যে উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য তা হল প্রমিতি। এই চারভাগে জ্ঞানতত্ত্বের বিজ্ঞানরূপ সিদ্ধ হয়।

প্রজ্ঞানের যেমন বিজ্ঞানতত্ত্ব আছে, বিজ্ঞানেরও বিজ্ঞানতত্ত্ব আছে, আবার জ্ঞানেরও বিজ্ঞানতত্ত্ব আছে এবং অজ্ঞানেরও বিজ্ঞানতত্ত্ব আছে। প্রত্যেকেরই ব্যবহার স্বতন্ত্র। পরমতত্ত্ব বলতে প্রজ্ঞানতত্ত্বকেই নির্দেশ করা হয়েছে। এই প্রজ্ঞান স্বয়ংপ্রভ বলে তার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশধারাকে তার বিজ্ঞানতত্ত্ব বলা হয়েছে। প্রজ্ঞানতত্ত্ব বলতে Knowledge Absolute-কেই বোঝায়। বিজ্ঞানতত্ত্ব হল work or science of wisdom এবং জ্ঞানতত্ত্ব হল continuous reflection of wisdom এবং অজ্ঞানতত্ত্ব হল continuous reflection of reflection of knowledge or shadow (image) of reflection of knowledge।

উপরোক্ত প্রসঙ্গের তাৎপর্য সংক্ষেপে এই দাঁড়াল যে একই পরমতত্ত্ব সব আপন বক্ষে অখণ্ড ভূমা রূপে, নির্গুণ রূপে, প্রজ্ঞানঘন পরমব্রহ্মতত্ত্ব, পরমতত্ত্ব; সগুণ রূপে সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর-আত্মা, প্রভু, অন্তর্যামী, সর্বসাক্ষী, সর্বনিয়ন্তা, জগদীশ্বর, প্রকৃতিপতি, জগৎস্বামী। জগৎলীলায় জীব তাঁর অভিন্ন অংশ, লীলামাধ্যম এবং জগৎ হল জীবের ভোগ্য, জীবনাধার ও ক্রিয়াভূমি। সোজা কথায় প্রজ্ঞানে ব্রহ্ম, বিজ্ঞানে ঈশ্বর, জ্ঞানে (জ্ঞানাভাসে) জীব, অজ্ঞানে জগৎ। তুলনামূলক ভাবে সাগর, তার তরঙ্গ, লহরী, বুদ্বুদ, ফেনাদির উপাদান যেমন একই জল, সেইরূপ পরমতত্ত্বস্বরূপ পরমাত্মা পরমব্রহ্মের সমগ্র অভিব্যক্তি ঈশ্বর-জীব-জগৎ মূলত একই তত্ত্বস্বরূপ পরমাত্মা পরমব্রহ্মই স্বয়ং, তদতিরিক্ত অন্য কিছু নয়—হওয়াও সম্ভব নয়। এ-ই হল তত্ত্বস্বরূপের পরিচয়। তত্ত্বালোকের উপসংহার কেবল তত্ত্বস্বরূপের মহিমাই স্ববোধে বা আপনবোধে স্বানুভবগোচর হয় বলে তা স্বসংবেদ্য স্বানুভবসিদ্ধ স্বয়ংতত্ত্ব স্বয়ং দ্বারাই, স্বয়ং-এর মধ্যে, স্বয়ং-এর জন্য, স্বয়ং হতে, স্বয়ং-এর সাথে সতত অভেদে, স্ববোধে লীলায়িত হয়ে চলেছে। সেইজন্য এই নিরুপম অনাদিতত্ত্ব তুমি-আমি-ইহা-উহা ইত্যাদি কল্পনাশূন্য নিত্য আনন্দ একরসসত্য ব্রহ্ম-আত্মা-পুরুষোত্তম। এ 'স্বয়ং-এ স্বয়ং, পরমে পরম, আপনে আপন'। এই পর্যন্ত তত্ত্বস্ফূর্তি, তত্ত্বসিদ্ধি ও তত্ত্বানুভূতির পূর্ণ শ্রুতি সর্বোত্তম অনুশাসন।

এই অনুশাসনের দু'টি ভাগ হল পূর্বার্ধ ও পরার্ধ বা উত্তরার্ধ। পূবার্ধের প্রসঙ্গ সম্যক্ আলোচিত হয়েছে, পরার্ধের বা উত্তরার্ধের প্রসঙ্গে সম্যক্ আলোচনা ও অনুশাসন নিম্নে ব্যক্ত করা হল।

ঈশ্বর গুরু আত্মা ব্রহ্মতত্ত্বই হল পরমতত্ত্ব। এই পরমতত্ত্বই হল সর্ব অবভাসক। তাঁর প্রকাশাদি সবই আভাসতত্ত্ব। এই আভাসতত্ত্বেরই অন্তর্ভাগ স্বভাবতত্ত্ব, বহির্ভাগ প্রকৃতিতত্ত্ব। স্বভাবতত্ত্বের কেন্দ্রভাগে ঈশ্বরতত্ত্ব এবং বহির্ভাগে জীবতত্ত্ব। ঈশ্বর ও জীব উভয়ই প্রকৃতিতত্ত্বের সঙ্গে যুক্ত। তবে ঈশ্বরতত্ত্ব প্রকৃতিতত্ত্বের অধীন নয়, প্রভু; কিন্তু জীবতত্ত্ব ঈশ্বর ও প্রকৃতিতত্ত্বের অধীন। সুতরাং আভাসতত্ত্বের দ্বিবিধ গতি—বহির্মুখী ও অন্তর্মুখী। বহির্মুখী স্ফূর্তি ও অভিব্যক্তির মধ্যে ক্রমধারায় সূক্ষ্মতম, সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্ম, স্থূল, স্থূলতর, স্থূলতম এবং পরস্পরের সংমিশ্রণের ফলে আভাসতত্ত্বের বিজ্ঞান ও ব্যবহারের পরিচয় মেলে। আভাসতত্ত্বের সম্যক্ বিস্তারের প্রকাশ বিভূতিকে সপ্ত-ব্যাহৃতি বলা হয়। বাইরে থেকে ক্রমপর্যায়ে তাদের নাম হল —ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ, সত্য। এ-ছাড়াও সপ্তস্বর্গ ও সপ্তনরক এই চতুর্দশ ভুবন আভাসতত্ত্বেরই বিস্তার বা বিভূতি। সপ্তস্বর্গ হল পূর্বোক্ত ভূরাদি সপ্তব্যাহৃতি এবং সপ্তনরক হল তল, অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল।

উনআশি

আভাসের বহির্মুখী ও অন্তর্মুখী প্রকাশধারার অনুলোম ও বিলোম গতির নামান্তরই হল আরোহণ গতি ও অবরোহণ গতি। অন্তর্মুখী গতি ও বহির্মুখী গতি হল কেন্দ্রাতীগ ও কেন্দ্রানুগ। বহির্মুখী গতিধারার মাধ্যমে বৈচিত্র্যাদি সৃষ্টির বিস্তার হয়। অন্তর্মুখী গতির মাধ্যমে সৃষ্টির লয় ও অভাব হয়। সমগ্র সৃষ্টি হল কার্য এবং তার অভাব হল কারণ। আভাসতত্ত্বের বিজ্ঞান কারণ-কার্য ও কার্য-কারণ সম্বন্ধ ধরে অভিব্যক্ত হয়।

স্বয়ংতত্ত্ব বা আত্মতত্ত্বের স্ফূর্তি, প্রকাশ বা আভাস হল তার স্বভাবতত্ত্ব। স্বভাবতত্ত্বের বিস্তার বা বিভূতি হল জীবজগৎ। জীবজগতের কারণ হল স্বভাবতত্ত্ব। স্বভাবতত্ত্ব হল আবার আত্মতত্ত্বের বিস্তার বা কার্য। স্বভাবতত্ত্বের কারণ হল আত্মতত্ত্ব বা স্বয়ংতত্ত্ব। স্বয়ংতাই হল আপনতা, এ-ই হল স্ব-তত্ত্ব আত্মতত্ত্বের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ।

আভাসতত্ত্বের সম্যক্ বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত হল ক্রমপর্যায়ে ঈশ্বরতত্ত্ব, প্রকৃতিতত্ত্ব, মহৎতত্ত্ব, অহংকারতত্ত্ব, পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চভূততত্ত্ব, দেশ-কাল-পাত্র-কার্য-কারণাদি। এই অভিব্যক্তি সমষ্টি অর্থাৎ আভাসের বিস্তারাদি অন্তর্মুখী গতির মাধ্যমে ক্রমপর্যায়ে আভাসতত্ত্বের কারণ অবভাসকতত্ত্বে প্রলীন হয়ে যায়। আভাসের বোধ হল অনুভূতি এবং অবভাসকের বোধ হল স্বানুভূতি। আভাসের প্রকাশ বিভূতি হল কর্মতত্ত্ব—এর দ্বিবিধ রূপ হল ধর্মতত্ত্ব ও সাধনতত্ত্ব। এই ধর্মতত্ত্বের সাধন স্থূলতম হতে আরম্ভ করে সূক্ষ্মতম ও তদূর্ধ্বে ঈশ্বর আত্মা ব্রহ্মতত্ত্ব পর্যন্ত বিস্তৃত। ঈশ্বর আত্ম ব্রহ্মতত্ত্বে আভাসতত্ত্বের সম্যক্ প্রলয় ও প্রশান্তি অর্থাৎ অত্যন্ত অভাব।

উপরোক্ত কর্মতত্ত্ব ও কর্মবিজ্ঞান শক্তিতত্ত্বের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অভিব্যক্তি। এই কর্মের সামগ্রিক রূপ জীবজগতে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। এর দ্বিবিধ ভাগ হল বহির্ভাগ ও অন্তর্ভাগ। উভয় ভাগেই কর্মের গতি সুনিয়ন্ত্রিত হয় বিশেষ পর্যায়ক্রমে। এই পর্যায়ক্রমের মধ্যে পূর্বাবস্থা ও পরবর্তী অবস্থার সূত্র ধরে কর্মের বিজ্ঞান সাধিত হয়। সমগ্র সৃষ্টি স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ ভেদে যাই হোক না কেন সবই কর্মতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত কর্মবিজ্ঞানের বৈচিত্র্যময় অভিব্যক্তি। কার্যরূপ কর্মের কারণ অংশ অব্যক্ত ও অদৃশ্য—এই তার অন্তর্ভাগ। কারণ-কার্য তত্ত্বই হল জীবের হৃদয়ে দৈব ও পুরুষকার তত্ত্ব। প্রকৃতির মাধ্যমে যে-কার্য সাধিত হয় তা অপেক্ষা জীবের মাধ্যমে যে-কার্য সাধিত হয় তার গুরুত্ব অধিক, কারণ তাতে চেতনের প্রাধান্য থাকে। এই চেতনের প্রকাশ কোথাও আভাস পর্যায়ে আবার কোথাও আভাসক পর্যায়ে।

গীতায় বলা হয়েছে "বিসর্গ কর্মসঙ্গীতম্" অর্থাৎ দেবতা ও ঈশ্বরের উদ্দেশে ঈশ্বরের নিমিত্ত, ঈশ্বরের জন্য নিঃস্বার্থ কর্মই হল বিসর্গ। এই নিষ্কাম কর্মই হল বিষ্ণুযজ্ঞ, আত্মযজ্ঞ, ব্রহ্মযজ্ঞ। তাই বলা হয়েছে "যজ্ঞার্থে ক্রিয়তে কর্মাণি সর্বশঃ। কর্ম যজ্ঞ সঙ্গীতম্, যজ্ঞ কর্ম সঙ্গীতম্।" এই হল যজ্ঞতত্ত্বের তাৎপর্য।

ঈশ্বরের জীবলীলা মূলত যজ্ঞতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত; অর্থাৎ জীবজগতের কল্যাণ সাধিত হয় যজ্ঞতত্ত্বের মাধ্যমে। এই যজ্ঞ আবার জ্ঞানতত্ত্বের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ধর্মতত্ত্ব ও সাধনতত্ত্বের সঙ্গে যজ্ঞতত্ত্ব প্রত্যক্ষ ভাবে যুক্ত। পরস্পর পরস্পরের সম্পূরক ও পরিপূরক। পূর্বেই যে-প্রবৃত্তি মার্গের কথা বলা হয়েছে তা সাধিত হয় কর্মবিজ্ঞানের মাধ্যমে, আবার নিবৃত্তি মার্গের সাধনাও কর্মবিজ্ঞানের মাধ্যমেই সাধিত হয়।

এই কর্মের বিজ্ঞান অতীব জটিল, কারণ জীবজগতে তা সর্বতোভাবে অপরিহার্য। তবে কর্ম সকাম ও নিষ্কাম ভেদে দ্বিবিধ—আবার সঞ্চিত, প্রারব্ধ ও ক্রিয়মান ভেদে ত্রিবিধ; অকর্ম, কর্ম, বিকর্ম ভেদে ত্রিবিধ। এ-সবই কর্মতত্ত্বের অন্তর্গত কর্মবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। কর্ম সাধিত হয় দেহেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে, ধর্ম সাধিত হয় মনের মাধ্যমে, ঈশ্বর-আত্মার অনুশীলন হয় বুদ্ধির মাধ্যমে। সমগ্র ধর্মবিজ্ঞান আবার গুণভেদে দ্বিবিধ। সাত্ত্বিক কর্মই হল দিব্যকর্ম। এই দিব্যকর্মের মাধ্যমেই হয় নিবৃত্তি মার্গের সাধনা। আর প্রবৃত্তি মার্গের সাধনা হয় তমঃ-রজোগুণপ্রধান কাম-কর্ম-কর্তৃত্বের মাধ্যমে। অমৃততত্ত্বের সাধনা হল শুদ্ধসত্ত্বগুণের সাধনা। এ হল মূল তত্ত্বের পর্যায়ভুক্ত। জীবন্মুক্তির সাধন ও সিদ্ধি এরই পরিণাম।

জীবের হৃদয়েতে ঈশ্বর-আত্ম-ব্রহ্মতত্ত্ব নিহিত। তার অন্তরের বা স্বভাবের মাধ্যমে বহিরভিব্যক্তি হয়। বাহ্য ব্যাপারাদি প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণাধীন। স্বভাবের মধ্যে চেতনের স্ফূর্তি অধিক; প্রকৃতির মধ্যে চেতনের আভাস স্বল্প, গুণ বা ভাবের আভাস সর্বাধিক। অবরোহণ গতিতে স্বভাবের থেকে প্রকৃতির প্রভাব ক্রমপর্যায়ে ছড়িয়ে পড়ে। আবার আরোহণ গতিতে প্রকৃতির কার্যাদি ক্রমপর্যায়ে স্বভাবের মাধ্যমে উত্তরোত্তর স্ববোধ আত্মাতে লীন হয়। তখন স্ববোধ আত্মা স্বতঃস্ফূর্ত অবাধিত ভাবে স্বয়ংপ্রকাশ হয়। এ-ই হল স্বানুভূতি। জীবের হৃদয়েতে এই উভয়বিধ গতিধারার বিজ্ঞান পর্যায়ক্রমে লীলায়িত হয়। প্রকৃতির অন্তর্গত আভাসের সাধনায় জীবের সংসারগতি হয়। একেই প্রবৃত্তি মার্গ বলা হয়। আবার স্বভাবের অন্তর্গত আভাসের সাধনায় জীবের ধর্মজীবন ও স্ব-স্বরূপানুসন্ধান সাধিত হয়। তার পরিণামে তার পরাসিদ্ধি অর্থাৎ স্বরূপবোধে স্থিতি ও মুক্তি হয়। এই স্বরূপবোধের স্থিতির লক্ষণই হল তত্ত্বসিদ্ধি— স্বানুভূতি।

জীবের ধর্ম ও আত্মানুসন্ধানের সাধনায় স্বভাবের উৎকর্ষ ও তদনুরূপ আভাস ও প্রকাশের লক্ষণাদি সত্ত্বগুণের বিস্তার ও শুদ্ধসত্ত্বগুণের অভিব্যক্তির ফলে সুসিদ্ধ হয়। এ-ই হল নিবৃত্তি মার্গের সাধনা। প্রবৃত্তি মার্গের সাধনায় তমঃ-রজোগুণের প্রাধান্য অধিক— সত্ত্বগুণ সেখানে অভিভূত থাকে। প্রবৃত্তি মার্গের সাধনা হল ভোগের সাধনা, অভিমান অহংকার ও প্রভুত্ব বিস্তারের সাধনা। নিবৃত্তি মার্গের সাধনা হল ত্যাগের সাধনা—তাতে অভিমান অহংকার প্রভুত্বের ক্ষয় ও বর্জন হয়। প্রবৃত্তি মার্গের সাধনাই হল সংসারজীবন—ভোগের সাধনা। এই সাধনা আত্মবিস্মৃতি অর্থাৎ তত্ত্ববিস্মৃতির সাধনা, আত্মবিমুখতার সাধনা। তত্ত্বস্বরূপ আত্মাকে ভুলে, অবজ্ঞা করে, তার বিরোধিতা করে তথ্যের বা তথ্যাভাসের ভূমিক্ষেত্র দেহবুদ্ধির অধীনে জীবনযাপন, তন্নিমিত্ত শ্রম ও কর্মের অনুশীলন করে। সুতরাং দেহসর্বস্ব ভোগী জীব দেহ ও ভোগের বিষয়াদিকেই সত্য বলে মানে, তদতিরিক্ত কোনও কিছুকে সে মানেও না, স্বীকারও করে না। কেউ কেউ যদিও বা স্বীকার করে এবং নামমাত্র মানে তা-ও দেহ ও বিষয়ভোগের স্বার্থে, তদতিরিক্ত নয়। এরা সবই ঈশ্বর-আত্মত্যাগী অর্থাৎ তত্ত্ববিরোধী। এদের জীবনাদর্শ হল প্রেয়বাদ। তত্ত্বাভাসে স্থূলতম, স্থূলতর, স্থূল অভিব্যক্তির অধিকারে জীবনপাত করে। অপর পক্ষে নিবৃত্তি মার্গের সাধক বা সত্যানুসন্ধানী সাধক বিষয়ত্যাগী—ইহকাল, পরকাল, ভোগের বিরাগী—এরাই শ্রেয়বাদী। তাদের ঈশ্বরানুরাগ, আত্মানুরাগ, তত্ত্বানুরাগ বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয়। সেজন্য তারা তত্ত্ববিশ্লেষণ, তত্ত্বানুসন্ধান ও তত্ত্বানুশীলন প্রিয়। বিষয়ানুরাগী সংসারী বৃহত্তম ও বৃহত্তরকে বর্জন করে ক্ষুদ্রতম ও ক্ষুদ্রতরকে নিয়ে মেতে থাকতে চায়। অপর পক্ষে ঈশ্বর-আত্মানুরাগী, তত্ত্বানুরাগী সাধকজীবন পরিণামী দুঃখের কারণ দেহবুদ্ধি বিষয়সুখকে, দেহজ্ঞানকে পরিহার করে ভূমাপানে ধায়। বিষয়ীর বিষয়ই হল প্রিয়, বিষ্ণু হল অপ্রিয়। আর ঈশ্বর-আত্মানুরাগী ভক্তযোগীর বিষয় হল অপ্রিয়, ঈশ্বর-আত্মা বিষ্ণু হল শ্রেয় ও প্রিয়তমোত্তম—কারণ আত্মাস্বরূপ বিষ্ণুই হল সবার অন্তরাত্মা, সবার প্রেমাস্পদ।

প্রবৃত্তি মার্গের সাধনা বিবেক, বিচার ও যুক্তিবর্জিত ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধি ও পূরণের সাধনা, নিবৃত্তি মার্গের সাধনা হল তার বিপরীত— ব্যক্তিগত স্বার্থ ও সিদ্ধির বিসর্জন ও বিনাশের সাধনা। এ সাধনা সিদ্ধ হয় নিত্যানিত্য তত্ত্ববিচার, গুণ-ভাবের বিশ্লেষণ, প্রকৃতি-পুরুষ বিবেক, ভূত বিবেক, দৃক্-দৃশ্য বিবেক, তত্ত্ব ও অ-তত্ত্ব বিবেক, জ্ঞান-অজ্ঞান বিবেক, আভাসক ও আভাস বিবেক, আত্মা ও অনাত্মা বিবেক, ব্রহ্ম-অব্রহ্ম বিবেক, আমি ও আমার বিবেক, স্বয়ংতা ও অহংতা বিবেক। স্বয়ংতা হল আত্মা অহংদেব এবং অহংতা অনাত্মা প্রকৃতিজাত অহংকার।

বিবেক বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে যে-তত্ত্বসাধনা হয় তার পরিণামে তত্ত্বসিদ্ধি ও তত্ত্বে প্রতিষ্ঠা হয়। তত্ত্বস্ফূর্তি বা তত্ত্বাভাস হল তত্ত্বের পরিণাম। আভাসতত্ত্বের পরিণাম বিকারী, কিন্তু আভাসকতত্ত্বের পরিণাম বিকারবিহীন। অর্থাৎ আভাসের পরিণামে তার স্বরূপত কোনও বিকার বা বিচ্যুতি ঘটে না। যেমন জলমহাসমুদ্রে জলের পরিণাম তরঙ্গ, লহরী, বুদ্বুদাদি নিরন্তর ওঠে, ভাসে, খেলা করে, ডোবে। পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের ঘাত প্রতিঘাত তাদের

স্বরূপবিচ্যুতি ঘটাতে পারে না। স্বরূপত তারা এক জলই—অন্য কিছু নয়। এই মত স্বর্ণালংকারাদির পরিণামে স্বর্ণের কোনও বিকার হয় না, কিন্তু পরিণাম হয়, যার মাধ্যমে অলংকারাদি রূপায়িত হয়। সেই মত মৃৎপাত্রাদি উল্লেখযোগ্য। আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে জলতত্ত্ব, ধাতুতত্ত্ব ও মৃৎতত্ত্বের উল্লেখ করা হয়েছে মাত্র। অন্যান্য স্থূল সূক্ষ্মাদি আভাসতত্ত্বের ক্ষেত্রেও অনুরূপ অনুভূতি সম্যক্‌রূপে সিদ্ধ হয়। সুতরাং যে-পরমতত্ত্ব চিদানন্দস্বরূপ তার বিকারবিহীন পরিণাম সম্যক্ আভাসতত্ত্ব। তার মাধ্যমে নাম-রূপ-ভাবাদি যতরকম বৈচিত্র্য অভিব্যক্তি পরিণাম প্রাপ্ত হয় তার সমষ্টি মূলত স্বতঃসিদ্ধ, স্বতঃস্ফূর্ত সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমাত্মার বিকারবিহীন পরিণাম। তত্ত্বসিদ্ধি ও তত্ত্বানুভূতির নামান্তরই হল স্বানুভূতি। এই স্বানুভূতি হল স্বসংবেদ্য, স্বতঃসিদ্ধ, স্বতঃস্ফূর্ত, স্বয়ংপূর্ণ, স্বয়ংপ্রকাশ। এ-ই হল সচ্চিদানন্দ ঈশ্বর গুরু ব্রহ্ম আত্মতত্ত্ব। এক কথায় স্বাত্মতত্ত্বের সম্যক্ পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞান। এ তর্কাতীত, অনুমান ও অনুভূতি নিরপেক্ষ, কেবল স্বানুভবসিদ্ধ।

ঈশ্বরতত্ত্ব, ব্রহ্ম-আত্মতত্ত্ব এবং গুরুতত্ত্ব অভিন্ন। তারই নামান্তর হল স্বয়ংতত্ত্ব। স্বয়ংতত্ত্ব বলতে ব্রহ্ম-আত্মতত্ত্বকেই নির্দেশ করে। গুরুতত্ত্ব তারই বিজ্ঞানময় রূপ। যার মধ্যে, যার জন্য, যা হতে, যা দ্বারা, সত্তাস্ফূর্তি স্বানুভবসিদ্ধ হয়, তাই আত্মতত্ত্ব (স্ব-তত্ত্ব), ব্রহ্মতত্ত্ব। তা স্বতঃসিদ্ধ স্বয়ংতত্ত্ব, স্বয়ংপূর্ণ স্বয়ংপ্রকাশ। স্বয়ংপ্রভ বলে স্বয়ংজ্যোতিও বলা হয় তাকে। এ প্রসঙ্গে ঋষিবাণী হল তত্ত্বস্বরূপ এবং আত্মার দ্বিবিধ পরিচয় এবং দ্বিবিধ লক্ষ্মণ হল স্বরূপ লক্ষণ ও তটস্থ লক্ষণ। স্বরূপ লক্ষণ হল "অখণ্ড একরসবস্তু সচ্চিদানন্দলক্ষণা অসঙ্গ সচ্চিদানন্দ স্বয়ংপ্রভ দ্বৈতবর্জিত।" "(১) সত্যম্ জ্ঞানমনন্তম্ ব্রহ্ম, (২) প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম, (৩) অয়মাত্মা পরমব্রহ্ম, (৪) কূটস্থ চৈতন্য ব্রহ্ম আত্মা।" তত্ত্বস্বরূপ ব্রহ্ম আত্মার স্বরূপ লক্ষণ সম্বন্ধে শ্রুতিবাণী হল সচ্চিদানন্দ—অস্তি-ভাতি-প্রিয়ম্ একেই নির্দেশ করে।

ব্রহ্ম আত্মার তটস্থ লক্ষণ সম্বন্ধে ব্রহ্মসূত্রে বলা হয়েছে "জন্মাদস্য যতঃ। যতো ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি। যৎ প্রয়ন্ত্যভি সংবিশন্তি।" অর্থাৎ যা হতে সব জাত হয়। যার দ্বারা, যার মধ্যে সব জীবিত থাকে এবং পরিণামে যাঁর মধ্যে সব এক হয়ে যায় তিনিই হলেন ব্রহ্ম। এ-ই হল ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ। এই প্রসঙ্গে আরও বলা হয়েছে "যস্য ভাসা সর্বমিদম্ বিভাতি। যেন ভান্তমনুভাতি সর্বম্।" যাঁর জ্যোতিতে সব প্রকাশমান তিনিই সর্বপ্রকাশক, যাঁর দ্বারা সব ব্যাপ্ত, প্রকাশিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় তিনিই সর্বপ্রকাশক ঈশ্বরাত্মা ব্রহ্ম।

সুতরাং ঈশ্বরাত্মা ব্রহ্মতত্ত্বই সদ্‌গুরুতত্ত্ব, স্ব-তত্ত্ব বা স্বয়ংতত্ত্ব। এই তত্ত্বের যে-দ্বিবিধ রূপের কথা পূর্বে বলা হয়েছে তা হল প্রকাশক ও প্রকাশ—ভাসক ও ভাস্য, সাক্ষী ও সাক্ষ্য। অদ্বয় দৃষ্টি হল তত্ত্বের দৃষ্টি। তাতে প্রকাশক ও প্রকাশ অভিন্ন, ভাসক ও ভাস্য বা আভাস অভিন্ন এবং সাক্ষী ও সাক্ষ্য অভিন্ন—যেমন সূর্য ও তার জ্যোতি ও তাপ এবং অগ্নি ও তার জ্যোতি ও তাপ। কিন্তু দ্বৈতের দৃষ্টিতে প্রকাশক হতে প্রকাশ ভিন্ন, ভাসক হতে ভাস্য বা আভাস ভিন্ন এবং সাক্ষী হতে সাক্ষ্য ভিন্ন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়—যেমন প্রকাশক সূর্য হতে তার প্রকাশরূপ জগৎ ভিন্ন, ভাসক অগ্নি বা দীপ হতে তার ভাস্য বা আভাসাদি ভিন্ন এবং সাক্ষী আত্মা হতে সাক্ষ্য অনাত্মা নামরূপে প্রকাশাদি ভিন্ন।

সুতরাং প্রকাশকতত্ত্বের স্ফূর্তি হল প্রকাশতত্ত্ব, ভাসকতত্ত্বের স্ফূর্তি হল আভাসতত্ত্ব এবং সাক্ষীতত্ত্বের স্ফূর্তি হল সাক্ষ্য নামরূপাদি জগৎতত্ত্ব। তত্ত্বের স্ফূর্তি তত্ত্বই। স্ফূর্তির বৈচিত্র্য যতই হোক না কেন, মূল তত্ত্বের সঙ্গে তার সম্বন্ধ অভিন্ন থাকবেই। অভেদের মধ্যে ভেদের কারণ, অদ্বৈতের মধ্যে দ্বৈতের কারণ, একের মধ্যে বহুত্বের কারণ, সমত্বের মধ্যে বিষমের কারণ হল আত্মাতিরিক্ত কল্পনা, তা হল অবিদ্যা অজ্ঞান ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি। গুণজাত উপাধি ও ভাবাদি যোগে চিৎতত্ত্বের আভাসাদি, ভাসাদি প্রকাশবৈচিত্র্য প্রতিভাত হয়। বিশেষ ভাবে মনে রাখতে হবে যে সর্ববিধ ভেদের মূলে অভেদ, দ্বৈতের মূলে অদ্বৈত, বৈচিত্র্যের মূলে এক, বৈষম্যের মূলে সমতা, অবিদ্যার মূলে বিদ্যা, অজ্ঞানের মূলে জ্ঞান, বিকারের মূলে নির্বিকার, বিকল্পের মূলে নির্বিকল্প, তথ্যাদি নামরূপ অনাত্মা আভাসের

মূলে তত্ত্বস্বরূপ ঈশ্বর আত্মা ব্রহ্ম স্বয়ং বিদ্যমান। স্বরূপসিদ্ধি ও অনুভূতির মূলে স্বানুভবস্বরূপ স্ব-তত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব, গুরু-ঈশ্বর-ব্রহ্মতত্ত্ব নিত্য অধিষ্ঠানরূপে স্বতঃই বিরাজিত।

নামরূপের বৈচিত্র্যময় জগৎ আভাসতত্ত্বের পর্যায়ভুক্ত। এই আভাসতত্ত্ব আবার প্রকাশক বা ভাসক ব্রহ্ম-আত্মতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত। দ্বৈতের দৃষ্টিতে যদিও বলা হয়েছে দৃক্ হল দ্রষ্টা-আত্মা এবং দৃশ্য হল নামরূপের জগৎ, "দৃক্ দৃশ্যৌ পরস্পর বিলক্ষণৌ।" কিন্তু অদ্বয় দৃষ্টিতে দৃশ্যাদি নামরূপের পৃথক কোনও অস্তিত্ব নেই। নামরূপের মুখোশে দৃক্ আত্মাই স্বয়ং প্রকাশমান।

স্বয়ংতত্ত্বই অহংতত্ত্ব। অহংতত্ত্বের স্ফূর্তির প্রসঙ্গে বলা হয়েছে "স্বৈনৈব (স্বয়মেব—ময়ৈব) পূরিতং জগৎ, ময়ৈব সকলং জাতম্ ময়ি সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্, ময়ি সর্বং লয়ং যাতি তস্মাৎ ব্রহ্মাদ্বৈতাস্মিহম্।" অর্থাৎ আমা হতে (আত্মা হতে, আত্মাতে) আমাতে সকল জাত হয়। আমাতে সকল প্রতিষ্ঠিত আছে এবং আমাতেই সব লীন হয়ে যায়। অতএব অদ্বয় ব্রহ্মস্বরূপ আমিই সব। এ প্রসঙ্গে আরও বলা হয়েছে, "সর্বেষু ভূতেষু অহমেবাবস্থিতম্ জ্ঞানাত্মনা অন্তর্বহিরাশ্রয়ং সন। ভোক্তা চ ভোগ্যম্ স্বয়মেব সর্বং। জ্ঞাতা চ জ্ঞেয়ং স্বয়মেব সর্বং। দ্রষ্টা চ দৃশ্যম্ স্বয়মেব সর্বং।" অর্থাৎ সর্ববস্তুর অন্তরবহিরাশ্রয় রূপে আমি (আত্মা) সর্বভূতে বিরাজমান। ভোক্তা ও ভোগ্যরূপে স্বয়ং আমি (আত্মা)। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় রূপে স্বয়ং আমি। দ্রষ্টা ও দৃশ্যরূপে স্বয়ং আমি প্রকাশমান।

স্বয়ং ব্রহ্মা স্বয়ং বিষ্ণু স্বয়ং ইন্দ্র স্বয়ং শিব স্বয়ং ঈশ্বর স্বয়ং বিশ্বমিদং সর্বং সস্মাৎনান্যকিঞ্চম্ স্বয়ং অন্তর্বহিরব্যাপ্তম্ ভাসয়ং নিখিলং জগৎ স্বয়ং প্রকাশয়ামি বিশ্বং সমগ্রং বহ্নিবৎ প্রতপ্তায় সপিন্ডবৎ। স্বয়ং পুরশ্চাৎ স্বয়ং পশ্চাৎ স্বয়ং অবাচ্যাং স্বয়ং উদিচ্যাং স্বয়ং উর্ধ্বস্তাৎ স্বয়ং অধস্তাৎ নিত্যাদ্বৈত স্বয়মেব স্বয়ং অবস্থিতম্ (অধিষ্ঠিতম্)—(বিবেকচূড়ামণি)।

স্বয়ংতত্ত্ব আমাতে (আত্মাতে), আমা অতিরিক্ত দ্বৈত কেউ বা কিছু নেই—থাকা সম্ভবও নয়। তবে দ্বৈতরূপে যা প্রতিভাত হয় তা মনের (অন্তঃকরণের) মাধ্যমে অন্তরাত্মা (আমির) স্ফূর্তি বা আভাস বিলাস মাত্র। তত্ত্বত স্বপ্রকাশ স্বসংবেদ্য স্বানুভবদেব পরমাত্মারূপী আমি স্বমহিমায় আপনাতে আপনার দ্বারা স্বয়ং প্রকাশমান। এই হল তত্ত্বস্বরূপের সর্বোত্তম প্রকাশরূপ পুরুষোত্তমের সত্য পরিচয়।

তত্ত্বস্বরূপের সমগ্র বিষয়ই হল গুণাতীত। তত্ত্বের কোনও বিকল্প বিকার রূপান্তর ক্রিয়াবিশেষ ভাবান্তর কালান্তর সম্ভব নয়। তত্ত্ববেত্তা বা তত্ত্ববিদ্ অর্থে ঈশ্বর সিদ্ধ আত্মজ্ঞ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষকে বোঝায়, অর্থাৎ যিনি সর্বতোভাবে প্রবুদ্ধ হয়েছেন, অখণ্ড বোধসত্তার সঙ্গে মিশে বোধে বোধময় হয়েছেন যিনি তিনিই সচ্চিদানন্দ পুরুষ। সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁর ব্যবহারিক জীবনের সাদৃশ্য থাকলেও বোধের দৃষ্টিতে পার্থক্য অপরিমেয় ও অননুমেয়। এঁরা সর্বতোভাবে কর্মফলমুক্ত, সংস্কারমুক্ত, গুণমুক্ত; কিন্তু যতদিন দেহ থাকে ততদিন তাঁরা কথঞ্চিৎ প্রারব্ধ সংস্কারের ভরবেগে চলেন। তাঁদের জীবন সর্বতোভাবে কৃতকৃত্য, ধন্য এবং পূর্ণতীর্থ। পরম সত্যের জীবন্ত বিগ্রহ বলে তাঁদের উপস্থিতি হল পরম বিজ্ঞভাবে পূর্ণ। যে-বংশে তাঁরা জন্মান সে-বংশ হয় ধন্য, পিতামাতা তাঁর পুণ্যে ধন্য, মুক্ত ধরিত্রী অর্থাৎ তাঁর জন্মস্থান পুণ্য তীর্থরূপে গণ্য। পিতৃপুরুষগণ পুণ্য ও ধন্য এবং তৃপ্ত, দেবতাগণ প্রীত এবং তুষ্ট।

হরি ওঁ তৎ সৎ

শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর

মহালয়া, ১৪০৬

প্রথম অধ্যায়

অনন্ত অসীম সম্বোধি সাগরে,
প্রবুদ্ধ তত্ত্বলহরী স্বতঃস্ফূর্ত তরঙ্গাকারে।
—শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর

অমৃতময়ী মায়ের পরিচয়েই সন্তানের পরিচয়

মা-ই সকলের প্রাণচৈতন্য। ঘরে ঘরেই মা আছেন। এই বিশ্বই মাতৃমূর্তি।

অমৃতময়ী মায়ের সন্তান মরেও মরে না। সবই অমৃতময় বলে সব জায়গাতেই সে থাকতে পারে।

মাকে যেভাবে যে বোঝে বা অনুভব করে সেভাবেই সে বলে। কেউ বলে মুক্তিদায়িনী আবার কেউ বলে যোগেশ্বরী বা জ্ঞানেশ্বরী। সবার কথাই সত্য। কেউ যদি বলে ব্রহ্ম তা-ও সত্য। এ তাঁকে মা বলে। ওঁয়া ওঁয়া আরম্ভ করে এ 'মা, মা-ই' করে চলেছে। মা এবং ওঁ বা প্রাণের অর্থ সমান। এই মায়ের প্রকাশই সব। মা সব দেন বলেই সে মহাশব্দ। ব্রহ্মের অর্থ বড় মা। আত্মা হল চিদানন্দময়ী মা। ব্রহ্ম, আত্মা ও মা একই তত্ত্ব।

মায়ের ঐশ্বর্য মাধুর্য ব্যবহারে সন্তানদের মধ্যে ভেদ দৃষ্ট হয় না

যত চাওয়া যায় ও পাওয়া যায়, ততই চাওয়া বাড়ে। কিন্তু যাঁর কাছ থেকে সব পাওয়া যায় তাঁকে সকলে চায় না। অর্থাৎ মাকে সকলে চায় না।

যারা ঐশ্বর্য চায় তারা ঐশ্বর্য পায়। তারা মাকে দেখে না, দেখে মায়াকে ; কারণ মা থাকে ঐশ্বর্যের আড়ালে মাধুর্যরূপে। কিন্তু যে মাকেই চায়, সে মাকেই দেখে।

সত্যমায়ের দর্শন ও অনুভূতির অন্তরায় হল অহংকার। অহংকার সরে গেলে মাকে পাওয়া যায়।

ব্যষ্টিবোধ ও সমষ্টিবোধের মাঝে পরদা হল অহংকার অভিমান। এই পরদা সরে গেলেই ব্যষ্টি ও সমষ্টিবোধ সমান হয়ে যায়। মাকে পেতে হলে ছোট ছেলের মত অহংকার-অভিমানশূন্য হতে হয়। অহংকার থাকা পর্যন্ত চিন্ময়ী মায়ের দর্শন মেলে না।

যথার্থ মাতৃবোধে প্রতিষ্ঠাই হল সাধুর লক্ষণ

যে ঈশ্বর ছাড়া কথা বলে না—ঈশ্বরই যার ধ্যান-জ্ঞান, আহার-বিহার এবং যার কাছে সবই মাতৃময় হয়ে যায়, সে-ই যথার্থ সাধু। সৎসঙ্গের মাধ্যমেই বিষয়ের অন্ধত্ব দূর হয়। তখন সম-ই হয় সার এবং সার হয় সম অর্থাৎ সম + সার (সমসার—সংসার)।

যেখানে গেলে সত্যের প্রভাবে মন ভরে ওঠে তা-ই সাধুসঙ্গ। যার মন পুরোপুরি ঈশ্বরীয় ভাবে ডুবে আছে, যে ঈশ্বর ছাড়া অন্য কিছু জানে না, সে-ই হল যথার্থ সাধু।

সারা বিশ্বসংসারই তো মায়ের মূর্তি। বাবা বিশ্বনাথ ও মা অন্নপূর্ণা এবং আর সকলেই তাঁদের সন্তান। সত্তা হল পিতা, শক্তি হল মাতা এবং প্রকাশ হল সন্তান। এই তিনের মধ্যে বিচ্ছেদ হয় না।

বিচারের মানে বিশেষরূপে চরে বেড়ানো। ছোট শিশু যেমন মায়ের কোলে চড়ে বেড়ায়। প্রেমের আবেশকেই বলে ভাব। ভাব হল সাধনা, আপনিই হয়। অভিমানমুক্ত হয়ে সমবোধে বিচরণ করাকে যথার্থ বিচার করা বলে।

বিচরণের অর্থ হল বিষ্ণুর চরণ, বীরেশ্বরের চরণ, বিবেক বিজ্ঞানের চরণ। বিচরণ হল (১) বি + চরণ, (২) বিচর + ণ। বিচরণের দ্বিতীয় অর্থ হল পূর্ণতার মধ্যে পূর্ণবোধে বাস করা। বিচারের মানে হল বিশেষ চার অর্থাৎ বি + চার। 'বি' অর্থ হল বিশেষ এবং 'চার' মানে আহার, খাদ্য, পুরুষ। তত্ত্বকথার নাম বিচার। সন্তানবোধে পরিপূর্ণ না হলে মাকে জানা যায় না। তাঁর (মায়ের) সঞ্চারিত অংশের নাম সন্তান। প্রেমানন্দের মিলনই হল আনন্দ ও পূর্ণতা। 'আপনাতে আপনি যখন করে খেলা তত্ত্বের ভাষায় তাই লীলা।' নিত্যশুদ্ধমুক্ত সত্যই হল তত্ত্ব।

ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যাকে পাওয়া যায় তাকেই বলা হয় অক্ষিপুরুষ। সবকিছুকে মাতৃবোধে মেনে নিলে সত্যানুভূতির অন্তরায় থাকে না। অখন্ড সত্তার কোন অংশকে বাদ দিয়ে তাঁকে পূর্ণ করে পাওয়া যায় না। অংশ ও অংশী ভাগ করলে সত্যের অখন্ডতা ক্ষুণ্ণ হয়। সত্য কখনও বিকলাঙ্গ হয় না। সন্তান কখনও বিকলাঙ্গ সত্যরূপী মাকে চায় না। 'সন্তানের পূর্ণতা যার মাধ্যমে হয় তাকেই মা[১] বলা হয়'। সত্যরূপী মায়ের গর্ভেই সন্তান জাত হয়, তার দ্বারা প্রতিপালিত হয়ে অর্থাৎ পুষ্ট ও তুষ্ট হয়ে পরিণামে সত্যরূপী মায়ের সঙ্গে মিশে যায়। মায়ের সঙ্গে একীভূত হলেই সন্তান পূর্ণতা লাভ করে। এই পূর্ণতাকেই স্বরূপ উপলব্ধি, মুক্তি প্রভৃতি বলা হয়।

নামরূপকে মাতৃবোধে মানতে হয়। চিন্ময়ী মা-ই জগৎরূপ ধারণ করে আছে। আকাশ হতে মাটি পর্যন্ত সবটাই মাতৃ অঙ্গ।

মা-ই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই মা

স্থূল নাম ও রূপে এবং সূক্ষ্ম ভাব ও বোধে চিদানন্দময়ী মা-ই আছেন। চতুরঙ্গ মা-ই হলেন চতুষ্পদ ব্রহ্ম। জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয়—এই চার অবস্থা। অবস্থা থাকলেই তার অবস্থান, আয়তন ও আবরণ থাকে।

সেই জাতিই শ্রেষ্ঠ যে বিশেষরূপে বহন করতে পারে, দিতে পারে এবং সহ্য করতে পারে।

নিজে আচরণ না করে জ্ঞান শিক্ষা দিতে গেলে বা কোন কিছু সংস্কার করতে গেলে কোন সমস্যার সমাধান হয় না বরং বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। শুকনো উপদেশ দিয়ে কাউকে ধর্মশিক্ষা দেওয়া যায় না। নিজে আচরণ করে ধর্মশিক্ষা দিতে হয়। তাহলে ধর্মশিক্ষা কার্যকরী ও ফলবতী হয়। শিক্ষাগ্রহণ না করে শিক্ষা দেওয়া যায় না। আচরণের মাধ্যমেই যথার্থ অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান হয়।

মহাপ্রাণরূপী মায়ের অভিনবত্ব

মায়ের রূপ হল প্রাণসমুদ্র। প্রাণসমুদ্রের উপরিভাগ আছে আবার তলদেশও আছে। তার মধ্যে প্রাণের সন্তান বিরাজ করে। সন্তান কখনও উপরিভাগে, কখনও মধ্যে এবং কখনও বা তলদেশে ঘুরে বেড়ায়। সমুদ্রের তরঙ্গের উপরেই যা কিছু নির্ভর করে। বুদ্বুদ্ বা জলকণার পৃথক বা স্বতন্ত্র কোন শক্তি নেই।

তথ্যকে অবলম্বন করে তত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। আবার তত্ত্বের প্রসঙ্গ শ্রবণ করে ও মনন করে তত্ত্বের সঙ্গে একীভূত হওয়া যায়। [১।৫।৬৮]

১। সত্যানুভূতির দৃষ্টিতে।

সত্যের মহিমা

সত্যবোধ প্রত্যেকের অন্তরেই নিহিত আছে। এটা অন্তর হতেই জাগ্রত হয়, বাইরের থেকে নয়। বাইরের আঘাত একে জাগ্রত হতে সাহায্য করে মাত্র।

জ্ঞানের যথার্থ ব্যবহারকেই ধর্ম[১] বলে। বর্তমানই ভবিষ্যতে পরিণত হয়।

বর্তমানে যা আছে তা-ই সত্য। যা সত্য তা-ই আনন্দ। সৎ শব্দের অর্থ হল বিদ্যমানতা, থাকা। এ-ই সত্য।

যা কিছু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তা-ই মা, তা-ই ব্রহ্ম এবং তা-ই সত্য।

অতীতের চেয়েও বর্তমানের সত্য অধিক গুরুত্বপূর্ণ; কারণ বর্তমানের মধ্যে অতীত ও ভবিষ্যৎ উভয়ই নিহিত আছে। বর্তমানকে অবহেলা করলে এবং তার যথার্থ ব্যবহার না হলে ব্যবহারদোষে বর্তমানও বিকৃত হয় এবং ভবিষ্যতের জন্যও বিকৃত কারণ সৃষ্টি হয়।

সত্যই হল অমৃত। সকলেই অমৃতের সন্তান। বর্তমানই হল সত্যের মুখ। এ-ই সত্য, এ-ই অমৃত। পীড়াদায়ক হলেও এ সত্য।

শ্রবণ ও বিচারের গুরুত্ব

আগে শ্রবণ করে পরে বিচার করতে হয়। কোথাও যেতে হলে আগে গন্তব্যস্থল সম্বন্ধে জেনে নিতে হয়, তার পরে যেতে হয়। শ্রবণ দূষিত হলে মননও দূষিত হয়।

সত্যানুসন্ধানের তাৎপর্য

শ্রবণের পরে হয় দর্শন। সৎসঙ্গে গিয়ে জেনে নিতে হয় ভগবান কাকে বলে, তাঁর সঙ্গে সকলের কী সম্পর্ক, তিনি কোথায় থাকেন এবং কী করে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়। আমি কে ? কী আমার ? কোথা থেকে এসেছি ? কেন এসেছি এবং কোথায় যাব ? নামরূপময় বিশ্ব কী ? তার সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক ?—এই সব কিছুর যথার্থ পরিচয় সদ্‌গুরুর কাছে প্রথমে শুনে নিতে হয়। শ্রবণ অনুরূপ মনন হলে হয় জ্ঞান।

শ্রুত বিষয়, দৃষ্ট বিষয় এবং অনুভবিত বিষয় কোনটাই মিথ্যা নয়, সব সত্য। কিন্তু শ্রোতা, দ্রষ্টা ও জ্ঞাতা হল বৃহত্তর সত্য এবং অখন্ড ভূমা। জ্ঞানস্বরূপ হল সত্যের সত্য পরম সত্য।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সবকিছুই সত্য। যা যথার্থ তা প্রথমে হয় সর্ব ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ, পরে হয় মিলন। এ হল সংবেদন অথবা অন্তর্বোধ বা সংজ্ঞান[২]।

সত্যের বিজ্ঞান

সত্যশ্রবণের পরে সত্যজ্ঞানের বিজ্ঞান আরম্ভ হয়। এই বিজ্ঞানের জ্ঞানই হল প্রজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান। সত্যজ্ঞানের ব্যবহার দ্বারা সত্যময় হলে হয় সত্যবোধ। এই সত্যবোধের নাম হল অনুবেদন বা অনুভব[৩]। যথার্থ সত্যের সঙ্গে মিলন হলে হয় সংবেদন। একেই বলে মাতৃসঙ্গে মিলন। মাতৃসঙ্গে মিলন অর্থ অন্তর্বোধের সঙ্গে মিলন বা অন্তর্বোধের জাগরণ।

সত্যশ্রবণ, সত্যদর্শন, সত্যজ্ঞান অর্থাৎ একান্ত সত্যময় হয়ে যাওয়ার মানে হল পূর্ণ হয়ে যাওয়া। মাতৃবোধে ব্যবহারের ফলে এবং মাকে স্মরণ করার ফলে মা-ই বোধরূপে শরণাগতের মধ্যে উদয় হন। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য

১। ধর্মের অভিনব সংজ্ঞা। ২। সংবেদন, অন্তর্বোধ বা সংজ্ঞানের বিশেষ তাৎপর্য। ৩। অনুবেদন ও অনুভবের বিশেষত্ব।

বিষয়রূপে মা-ই স্বয়ং, ইন্দ্রিয়াতীত রূপেও মা স্বয়ং এবং উভয়ের মধ্যে কর্তা ভোক্তা জ্ঞাতা রূপেও মা স্বয়ং। অন্তরভাবের প্রকাশমাধ্যমকে ভাষা বলে। বক্তা, বাক্য ও শ্রোতা রূপেও মা-ই স্বয়ং। সত্য ব্যবহারের অসামঞ্জস্য ও বিকৃত রূপকেই মিথ্যা[১] বলে। সত্যবোধে সত্যকে মানাই হল সত্যের যথার্থ ব্যবহার। মানার মাধ্যমেই সত্যের প্রকাশ সত্যরূপে অনুভূত হয় এবং না-মানার মাধ্যমে তা মিথ্যা বা অসৎরূপে প্রতিভাত হয়।

নাম-রূপ-ভাবের কারণ হল মন[২]। সত্য মা—রূপে, নামে, ভাবে ও বোধে। সত্য মা—দেহে, গৌণ প্রাণে, মনে ও বুদ্ধিতে। সংবেদনের চার স্তর—স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ ও মহাকারণ। স্থূলরূপে ও নামে চিদানন্দময়ী মাকে মানলে বাকি স্তরগুলি ক্রমপর্যায়ে বোধগম্য হয়। মায়ের মধ্যে মা ছাড়া কিছুই নেই। সবই মায়ের রূপ। ঈশ্বর আত্মা সব সমার্থবোধক। জ্ঞান-অজ্ঞান, সত্য-মিথ্যা, নিত্য-অনিত্য, সগুণ-নির্গুণ, এক-বহু, সত্তা-শক্তি সবই মা। এই দুই নিয়েই মায়ের সত্য পরিচয়। অনুভূতির চরমে মা, গুরু, ব্রহ্ম, ঈশ্বর, আত্মা সব সমার্থবোধক।

মায়ের লীলামাধুর্যের বিজ্ঞান

চিন্ময়ী মা একবার নিজেকে বিশ্বরূপে ছড়িয়ে দেন আবার সমত্নে গুটিয়ে নেন। এই হল মায়ের নিত্যলীলা।

আমি আর তুমি নিয়ে জগৎ খেলা। আমি যখন মাতৃভাবে এক হয়ে যাই তখন আমি প্রধান। এ হল আমিত্বের আমি। 'আমি আছি সর্বঘটে সাকার, আকার নিরাকারে।'

মায়ের কাছে আগে বোধ পরে প্রকাশ। কিন্তু সন্তানের কাছে আগে প্রকাশ পরে বোধ।

আমি যখন সন্তান তখন তুমি মা মহান। যখন উভয়ের মিলন তখন আমি প্রধান। এ হল 'আমিত্বের আমি'। তার পূর্বে 'আমি আমার' (সূক্ষ্ম) এবং তারও পূর্বে 'আমার আমি' (স্থূল)। এই হল আমির তিনটি স্তর।

মৃত্যু কী?

শ্রবণের মাধ্যমেই সংবেদন হয়। শ্রবণই হল অভিষেক বা বোধন। বর্তমানকে মানা হল কৃতজ্ঞতার লক্ষণ অর্থাৎ অঙ্গীকার করা। অঙ্গের সাথে অঙ্গের মিলন। আদি শক্তি ও গতি যেখানে ক্রিয়াশীল তাই অঙ্গ[৩]। এই সত্যকে মানলে মৃত্যু হয় অঙ্গের অলংকার। মৃত্যু হল বোধস্বরূপের একটি বৃত্তি অর্থাৎ প্রকাশ বা অবস্থার পরিবর্তন।

জীববেশে মা-ই স্বয়ং

ইন্দ্রিয় হল অধ্যাত্ম। নয়নের মধ্যে বসে মা-ই দেখেন। শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে বসে মা-ই শোনেন। সমস্ত ইন্দ্রিয়ের মধ্যে বসে মা-ই সব কিছু করেন। শ্রবণের অভাবকেই অজ্ঞানতা বলা চলে। তার ফলে মায়ের কোলে বসেই সকলে মাকে খোঁজে। চশমা পরে চশমা খোঁজার ন্যায় মায়ের কোলে থেকেই সকলে মাকে খোঁজে এবং আত্মজ্ঞ গুরুই এই ভুল সকলকে ধরিয়ে দেন।

দেহাদি রূপ ও ক্রিয়া প্রাণচৈতন্যেরই বিকার

আদি গতি যেখানে ক্রিয়াশীল তাকেই দেহ[৪] বলে। প্রাণসাগরে রূপ বা দেহ আছে এবং রূপ বা দেহের মধ্যেও প্রাণ আছে। জন্ম ও মৃত্যু হল প্রাণচৈতন্যের দুটি বিশেষ অবস্থা, বৃত্তি ও নাম। মানুষের মধ্যে আত্মাই সত্য। সত্যই নিত্য।

১। মিথ্যার নূতন সংজ্ঞা। ২। বিজ্ঞানদৃষ্টিতে মনের সংজ্ঞা। ৩। তাৎপর্যপূর্ণ সংজ্ঞা ৪। অভিনব সংজ্ঞা।

শোনা ও মানার তাৎপর্য

শ্রবণের মাধ্যমেই সত্যের পরিচয় অবগত হওয়া যায়। পরিচয় = পরি + চয়। 'পরি' হল শ্রেষ্ঠ এবং 'চয়' মানে চয়ন করা। শ্রেষ্ঠ বস্তু হল সত্য। সত্যকে চয়ন করা বা জানা হল পরিচয়ের[১] অর্থ। মাতৃপরিচয় বা সত্যের পরিচয় যথার্থ ভাবে অবগত হলে মানুষ দিব্যজীবন লাভ করে। সবকিছুর মধ্যে মা আছেন এটা মেনে নিলেই তাঁকে পাওয়া যায়। মাকে খোঁজবার দরকার হয় না, মানলেই তাঁর সাক্ষাৎ মেলে। মুক্তি[২] মানে সব কিছুর সঙ্গে মিশে যাওয়া।

মাটি রূপেও মা। সত্তার সঙ্গে শক্তি নিত্যযুক্ত, যেমন—শিব ও শক্তি, অগ্নি ও তার দাহিকাশক্তি, সূর্য ও তার প্রকাশশক্তি অভিন্ন, নিত্যযুক্ত।

অভিন্নতার উপমা

নিজবোধ হতে নিজেকে কেউ যেমন পৃথক করতে পারে না, সেইরূপ মা হতে কেউ কখনও পৃথক হতে পারে না। নিজবোধের স্বরূপই হলেন মা[৩]। এটা যে মানে সে-ই মাকে জানে।

প্রকাশক ও প্রকাশ অভিন্ন

দেহ প্রথম সত্য, প্রাণ দ্বিতীয় সত্য, মন তৃতীয় সত্য এবং বোধ চতুর্থ সত্য। এই চতুষ্পদ বোধ হল এক সত্যেরই চতুর্বিধ প্রকাশভঙ্গিমা। কোন প্রকাশই সত্যশূন্য নয় এবং সত্য হতে পৃথক নয়। সব মিলিয়েই হল মহাসত্য বা পরমসত্য। মাতৃবোধই নিরন্তর এই চতুষ্পদ বোধরূপে খেলে। এই অনুভূতি হল বোধের বোধ আত্মবোধ বা প্রজ্ঞান। এটা এক অখণ্ড সত্যের পরিচয়। একেই মা বলা হয়। 'মা' অর্থ পরিপূর্ণতা। প্রাণরূপী, চৈতন্যরূপী, নিত্যপূর্ণা মা সকলের সাথে সাথে আছেন। মা-ছাড়া কেউ নয়।

ভূমা মায়ের অনন্ত মহিমা। অনন্ত তাঁর রূপ নাম ভাব। মায়া হল তাঁর বিশেষ এক রূপ। মায়া[৪] অর্থ মা + আয়া অর্থাৎ পৃথক পৃথক রূপে নামে ভাবে মা-ই নিজের সঙ্গে নিজে খেলেন। এই জন্য তাঁর আর এক নাম হল লীলাবতী বা লীলাময়ী।

সকাম ও নিষ্কামের তাৎপর্য

ব্যক্তিগত স্বার্থে ইন্দ্রিয়প্রীতির জন্য কোন কিছু করাকেই সকাম কর্ম বলে। সকামে হয় ভোগ এবং নিষ্কামে হয় ভক্তি[৫]। ইন্দ্রিয়াতীত আত্মার প্রীতির জন্য কর্ম করলে তখন হয় ভক্তি। ব্যক্তিগত স্বার্থ প্রতিহত হলে হয় শোক এবং পরার্থ বা সমষ্টিগত অর্থ থেকে হয় শক্তি। ব্যষ্টিবোধে হয় বন্ধন এবং সমষ্টিবোধে হয় মুক্তি[৬]।

ঈশ্বরবিমুখতাই হল অজ্ঞানতা এবং জীবভাবের কারণ ও লক্ষণ।

ত্যাগ হতেই হয় সেবা

ত্যাগভাবের বিকাশ না হলে কাউকেও সেবা করা সম্ভবপর হয় না। অর্থাৎ অন্তরে ত্যাগ না থাকলে বাইরে স্বতঃস্ফূর্ত সেবা হয় না। আত্মজ্ঞান না হলে মোহ ও আসক্তি যায় না। মোহ আসক্তি কেটে গেলেই ভক্তির বিকাশ হয়।

১। অভিনব সংজ্ঞা। ২। তত্ত্বের দৃষ্টিতে। ৩। তত্ত্বের দৃষ্টিতে। ৪। অভিনব ব্যাখ্যা। ৫। ভোগ ও ভক্তির বিশেষ তাৎপর্য। ৬। বন্ধন ভোগ শোক শক্তি ভক্তি ও মুক্তির বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ অর্থ।

একই সত্য উপাদান সকলের মধ্যে আছে। সত্যের খেলায় বা জগৎলীলায় ভিন্ন ভিন্ন সাজে এক প্রাণচৈতন্যই লীলা করে।

সৎ-এর মহিমা

যদি মিথ্যা বলে কিছু থাকে তা সত্যযোগে হয় আপন। সৎসঙ্গ, সৎচিন্তা, সৎকর্ম প্রভৃতি জীবনকে সত্যময় করে। অস্তিত্ববোধ হল সালোক্য। আশ্রিত-আশ্রয়বোধ হল সামীপ্য, আত্মীয়তাবোধ হল সারূপ্য এবং আত্মবোধ হল সাযুজ্য। আত্মীয়তাবোধ ও আত্মবোধের মধ্যবর্তী সূক্ষ্ম অবস্থাকে সার্ষ্টিবোধ বলে।

ঈশ্বর আত্মবাচক ওম্-এর তাৎপর্য

'অ্যাটম্' মানে অ্যাট্ + ওম্। ওম্-এর মধ্যে অর্থাৎ অণুর মধ্যে। ওম্-এর মধ্যে, অনুভব, অনুভূতি, উপলব্ধি, আত্মজ্ঞান। অনুভূতির অভাব আত্মবিস্মৃতিই হল মৃত্যু।

বৃহৎ বা মহৎভাব নিয়ে অণুর মধ্যে প্রবেশ করা যায় না। অণু হয়ে তার অনুভব করতে হয়।

প্রণব হল অণোরণীয়ান এবং মহতোমহীয়ান উভয়ই। এ-ই সত্যের শ্রেষ্ঠ পরিচয়। সত্যবোধ হলেই অনুভূতি হয় যে ব্যষ্টি হল সমষ্টির পরিণাম এবং সমষ্টি হল ব্যষ্টির পরিণাম। ব্যষ্টি ও সমষ্টি উভয়ে প্রণবের পরিণাম। প্রণবই হল সত্য সুতরাং অণুও সত্য। সত্যবোধ হয় অণুবোধে।

সত্যের প্রকাশ ও মায়ের সন্তান এক অর্থবোধক। এই প্রকাশ বা সন্তানেরই পরিণাম বা পরিণতি হয় সত্যময়ী মায়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ও একীভূত হয়ে মিশে গেলে। মা-ই পরিণামের মালা সন্তানের কণ্ঠে পরিয়ে দেন। 'পরি' মানে শ্রেষ্ঠ ও নাম মানে পরিচয়। 'পরিণাম' মানে শ্রেষ্ঠ পরিচয় অর্থাৎ সত্যমায়ের সন্তান (স্বরূপবোধ)। পরিণতি হতে হয় পরিণাম। এই পরিণামই হল শ্রেষ্ঠ নাম। সর্ব নামের কেন্দ্র হল মা। মাতৃনামই হল পরিণাম। সন্তানের কণ্ঠে দোলে মাতৃনামের মালা। [২।৫।৬৮]

অহংকার ও ত্বংকারের তাৎপর্য

আসল মালিক একজনই, কিন্তু সাজা মালিক বহু। অহংকার অভিমান দ্বারা কর্তা বা রাজা সাজা হল অজ্ঞানের লক্ষণ। 'ত্বংকার বোধের' আড়ালে যে থাকে সে-ই হল আসল মালিক। অর্থাৎ 'তুঁহু বোধে' যাকে নির্দেশ করা হয় সে-ই হল মালিক ও প্রভু।

দৃক্ ও দৃশ্য—পরস্পরের মধ্যে পরিপূরক ও সম্পূরক সম্বন্ধ

ঈশ্বরের মধ্যে নিজেকে এবং নিজের মধ্যে ঈশ্বরকে যে ধারণা করে সে-ই তাঁকে ভালবাসে। প্রেম ভালবাসা দ্বারাই ঈশ্বরকে সহজে আপন করে পাওয়া যায়। তাঁর মধ্যে বাস করে সকলেই এবং সকলের মধ্যেও তিনিই আছেন—একথা অবগত হলেই সকলে শান্তিতে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

ঈশ্বরেরই ব্যক্ত রূপ হল জগৎ। জগৎ ছাড়া ঈশ্বর এবং ঈশ্বর ছাড়া জগৎ অসিদ্ধ। ঈশ্বরীয় বোধে বিশ্বাস ও ব্যবহারের দ্বারা জীবজগতের সঙ্গে নিজের অভেদ সম্বন্ধ অবগত হওয়া যায়। বাহ্যিক দৃষ্টিতে পরস্পরের মধ্যে পার্থক্যই হল মিথ্যাবোধের কারণ। অন্তর্দৃষ্টিতে পরস্পরের মধ্যে এই পার্থক্য থাকে না। মিথ্যা ভাবনার দ্বারা মিথ্যার প্রভাব বাড়ে এবং সত্য ভাবনার দ্বারা সত্যের প্রভাব বাড়ে। মিথ্যার প্রভাব কাটিয়ে অখণ্ড সত্যের আবিষ্কার করাই হল জীবন ও সত্যসাধনার মূল উদ্দেশ্য।

আপন আপন প্রাণচৈতন্যই হল প্রত্যেকের কাছে নিকটতম সত্য। এই প্রাণচৈতন্য সকলের মধ্যেই আছে। এ-ই হল ভগবান। বিশ্ব হল প্রাণচৈতন্যেরই মূর্ত রূপ। প্রাণময় জগতে বৈচিত্র্যরূপে এক প্রাণই বিদ্যমান। প্রাণ হল চৈতন্যময়। সুতরাং বৈচিত্র্য হল চৈতন্যের লীলা অভিনয়। চৈতন্যই হল সমগ্র সৃষ্টির উপাদান। সৃষ্টির আদি মধ্যে অন্তে এই উপাদান একরকমই থাকে। বৈচিত্র্য সৃষ্টি হল এই চৈতন্যের নামরূপের গঠন। নামরূপ চৈতন্য দিয়েই তৈরি, চৈতন্যের মধ্যেই তার স্থিতি এবং চৈতন্যের মধ্যেই তার লয়। একেই পরমতত্ত্বানুভূতি বলে। সর্ব অনুভূতি এই অনুভূতির অন্তর্গত।

ইন্দ্রিয়দৃষ্টি হতে আত্মদৃষ্টি পর্যন্ত সবই মাতৃদর্শন

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সবকিছুকেই প্রথমে মাতৃবোধে গ্রহণ করলে সবই সত্যরূপে অনুভূত হয়। যা সত্য তাই বোধময়। শব্দ বোধেরই প্রকাশ। 'সৎ' মানে হল বিদ্যমানতা, বর্তমানতা ও অস্তি। একে মানা ও জানা হল সত্যের সাধনা। অন্তরে বাইরে সবকিছুর মধ্যে ঈশ্বর আছেন। অস্তিত্বের জ্ঞানই হল ঈশ্বরানুভূতি[১]।

যেভাবে যখন যা দৃষ্ট হয় সব বোধেরই প্রকাশ। বোধস্বরূপের অন্তর বা বার নেই। অন্তর ও বার উভয়ই হল বোধের প্রকাশ।

বোধস্বরূপের দৃষ্টিতে সবই সত্য-শিব-সুন্দর। কিন্তু মনের দৃষ্টিতে পরস্পরের মধ্যে হয় ভেদজ্ঞান। কদর্যের মধ্যে যে শিব ও সুন্দরকে দর্শন করে তারই হয় যথার্থ দর্শন[২]।

ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চভূতরূপে চিদানন্দময়ী মা-ই আছেন। ইন্দ্রিয় দিয়ে এই পঞ্চভূত ব্যবহৃত হয় বলে একে অধিদৈব বলে। এই অধিদৈবরূপেও চিন্ময়ী মা। ইন্দ্রিয়ের পরিচালক হল বুদ্ধি। বুদ্ধিরূপে অন্তরসত্তা মা-ই হলেন অধ্যাত্ম। এই অন্তরবোধ অধ্যাত্মরূপেও চিন্ময়ী মা স্বয়ং। পরমবোধিরূপে জীবনের কেন্দ্রসত্তাই হল অধিযজ্ঞ। একে সাক্ষীদ্রষ্টা আত্মা বলা হয়। এই অধিযজ্ঞরূপেও সচ্চিদানন্দময়ী মা স্বয়ং। অধিভূত, অধিদৈব, অধ্যাত্ম ও অধিযজ্ঞ হল মায়ের চতুর্বিধ পরিচয়।

পৃথক ও সসীম বোধই হল সংকীর্ণতা[৩]। স্বার্থ হল এর কারণ। সংকীর্ণতাই হল পাপ, অধর্ম, মিথ্যা, দুঃখ ও মৃত্যু।

মানার তাৎপর্য

পিতামাতার অবাধ্য হলে যেমন পিতৃসম্পদ পাওয়া যায় না, সেইরূপ ঈশ্বরকে না মানলে ঈশ্বরীয় সম্পদ লাভ হয় না।

ঘৃণা, তাচ্ছিল্য, অবহেলা, স্বার্থপরতা হল ভেদজ্ঞানের লক্ষণ। প্রেম শ্রদ্ধা ভালবাসা হল অভেদজ্ঞানের লক্ষণ।

অন্তরবোধের গভীরেই আত্মবোধ

অন্তরবোধ বা আত্মবোধের দ্বারাই বহির্বিশ্বে প্রকৃতিশক্তির লীলাবৈচিত্র্যের মধ্যে সামঞ্জস্য বা মিল পাওয়া যায়। একাত্মানুভূতির জন্য দেহধারণ করে এসে সকলে এই বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে বারবার মিলিত হয়। মানুষের অন্তরের সঙ্গে বহির্বিশ্বের সমসুর এবং পরস্পরের প্রাণধারার মধ্যে সমত্ব আবিষ্কারের জন্যই এত আয়োজন বহির্বিশ্বে। বহির্বিশ্ব হল অন্তরাত্মার অবিচ্ছেদ্য অংশ। সুতরাং তাকে বাদ দিয়ে পূর্ণতা লাভ হয় না। কাছের ঈশ্বরকে না দেখে তাঁকে দূরে খুঁজে ঈশ্বরানুভূতি লাভ হয় না। প্রাণের ঠাকুর প্রাণেতেই আছেন। একথা শ্রবণ করার পর অনুধাবন করতে হয়। তাহলেই তাঁর দর্শন ও অনুভূতি মেলে।

১। বিশেষ সংজ্ঞা। ২। বিজ্ঞান দৃষ্টিতে। ৩। তাৎপর্যার্থে।

সমবোধে থাকার উপায়

গুরু বা বৃহত্তর কোন শক্তির সঙ্গে থাকলে বিকারধর্মী অবস্থা ও ঘটনার মধ্যে সমবোধে বা উদাসীন-বোধে থাকা যায়।

নমস্কারের তাৎপর্য

মনকে উল্টা করলে হয় নমঃ[১] অর্থাৎ নমস্কার। নমঃ মানে আত্মদান ও আত্মসমর্পণ। এর তাৎপর্য হল নাও মা, মাধব, মহেশ, মহৎ। নমস্কারের যথার্থ তাৎপর্য জানা থাকলে তবেই যে-কোন ব্যক্তিকে প্রণাম বা নমস্কার করার সময় ইষ্টের কথা বা প্রাণের কথাই স্মরণ হয়। অর্থাৎ তাঁকেই মন দেওয়া হয়। এই অভ্যাসের ফলে প্রসন্নতা লাভ হয়; তার ফলে শুধু আনন্দই অনুভূত হয়।

অহংকার[২] হল নিজেকে আলাদা করে ভাবা বা নিজের পৃথক অস্তিত্ববোধ রাখা।

অশুদ্ধি ও চঞ্চলতাই হল চিত্তের মলিনতা।

যেমন কোন বস্তুকে পূর্ণভাবে চিনতে হলে তার আকৃতি প্রকৃতি গুণ শক্তি স্বভাব প্রভৃতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অবগত হওয়া দরকার, সেইরূপ ঈশ্বরকে পেতে হলেও তাঁর যথার্থ পরিচয় পূর্ণভাবে পূর্ব হতেই অবগত হওয়া দরকার, যাতে যে-কোন ভাবে নামে ও রূপে এলেও তাঁকে চিনে নেবার অসুবিধা না হয়।

ঈশ্বরের মহিমা

ঈশ্বরই সকলের প্রাণের প্রাণ, মনের মন, বোধের বোধ, জীবনের জীবন, সর্ব কারণের কারণ, সচ্চিদানন্দময়ী মাতা। তাঁকে গুরু ইষ্ট ঈশ্বর আত্মা পরমাত্মা ভগবান এবং ব্রহ্ম বলা হয়। শিব নারায়ণ রাম কৃষ্ণ দুর্গা কালী লক্ষ্মী সরস্বতী রাধা শ্যামা তারা ইত্যাদি তাঁরই ভিন্ন ভিন্ন অভিব্যক্তি মাত্র।

বিজ্ঞানাত্মার পরিচয়

বিশ্বের স্থূল পঞ্চভূত হতে আরম্ভ করে সমস্ত আধিভৌতিক, আধিদৈবিক, আধ্যাত্মিক, অধিযজ্ঞ, ব্যষ্টি, সমষ্টি, সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতি ও অনন্ত বিশ্বমূর্তি হল হরির বিজ্ঞানময় সগুণ পরিচয়।

সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মার অখণ্ড মহাভাব ও প্রেম আনন্দের আতিশয্যে তাঁর বক্ষে লীলায়িত হয়। তাঁর অনন্ত শক্তি স্বভাবপ্রকৃতির সহযোগিতায় নাম-রূপময় বিভিন্ন দেহ ও আকৃতি ধরে প্রকাশিত হয়। দেশ ও কালের মধ্যে নিজেকে সে ছড়িয়ে দেয়। বহির্বিশ্ব তাঁরই অভিব্যক্তি অর্থাৎ স্থূল প্রকাশ। স্থূল এই নাম-রূপময় জগতে যা কিছু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এ সমস্তই তাঁর প্রকাশ।

সগুণব্রহ্ম এবং তাঁর লীলাবিলাস—শক্তি ও জ্ঞানের খেলা।

লীলাময় পুরুষের পরিচয়

তিনি সচ্চিদানন্দময় নিত্যপুরুষ আবার তিনিই লীলাময়। সগুণ সাকার গতিশীল প্রাণের খেলায় জীবজগৎরূপে এবং জড় ও চৈতন্যরূপে যা কিছু আছে, সবই তাঁর পরিচয়। কাজেই বস্তুজগৎ হতে অর্থাৎ জড়ত্বের স্থূল প্রকাশ হতে আরম্ভ করে তাঁর নিত্যস্বরূপ, নির্গুণ, দ্বন্দ্বাতীত, কেবল জ্ঞানমূর্তি, প্রেমানন্দ সেই অখণ্ড, অব্যক্ত, তুরীয়

১। তাৎপর্যপূর্ণ সংজ্ঞা। ২। তন্ত্রের দৃষ্টিতে।

অবস্থা পর্যন্ত সবই পরমাত্মার নিজমূর্তি[১]। তিনি এক ও বহু উভয়ই, জ্ঞান ও অজ্ঞান উভয়ই, জড় ও চৈতন্য উভয়ই। জন্ম ও মৃত্যু, অণু ও মহান, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ, স্বল্প ও ভূমা, সগুণ নির্গুণ, আনন্দ নিরানন্দ, ব্যক্ত অব্যক্ত, মিথ্যা সত্য, ধর্ম অধর্ম, পাপ পুণ্য, সত্তা শক্তি, কর্ম ভক্তি, জ্ঞান প্রেম, পূর্ণ অপূর্ণ, প্রকাশ অপ্রকাশ, পুরুষ প্রকৃতি প্রভৃতি হল পরমাত্মবোধের ভিন্ন ভিন্ন অভিব্যক্তি। জীবজগৎরূপে দেহ প্রাণ মন, বোধরূপে ব্যষ্টি সমষ্টি, কারণ কার্য, নিমিত্ত কারণ, উপাদান কারণ, অন্তর বার, আমি তুমিবোধে এক পরমাত্মবোধই খেলে।

মাতাপিতা, পুত্রকন্যা, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন সবই তিনি। তিনি দ্রষ্টা-দৃশ্য-দর্শন, শ্রোতা-শ্রুতি-শ্রবণ, কর্তা-কর্ম-করণ, ভোক্তা-ভোজ্য-ভোজন, জ্ঞাতা-জ্ঞেয়-জ্ঞান, স্রষ্টা-সৃষ্টি-সৃজন। তিনি অণুপ্রাণ, তিনিই বিশ্বপ্রাণ। তিনি সর্বব্যাপী, সর্বধারী, সর্বজ্ঞ এবং সকলের অধিষ্ঠান। তিনি জ্ঞান, বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞানস্বরূপ। তিনিই ব্যক্তরূপে মহাপ্রাণ, ঈশ্বর ও ভগবান। যত রূপ তত নাম। যত প্রকার ভাব, তত প্রকার অনুবোধ। যত মত, তত পথ।

তিনি আবার নিত্যরূপে, অব্যক্তরূপে, অচ্যুতরূপে সত্যশিব বিশুদ্ধ চিদানন্দঘন অলখ নিরঞ্জন নির্গুণ নির্বিশেষ অরূপ অবর্ণ অশব্দ অস্পর্শ অ-মন অখণ্ড অদ্বয় অব্যয় অমর অপাপবিদ্ধ পরমাত্মা পরব্রহ্ম সনাতন। এই তাঁর অখণ্ড সত্য পরিচয়। তাঁর আদিও নেই অন্তও নেই। তিনিই শুধু তাঁকে জানেন দেখেন ও বোঝেন। তাঁর মধ্যে তিনি ছাড়া দ্বিতীয় কেউ নেই। কাজেই তিনি নিজেকে নিজেই ভালবাসেন। কারণ ভালবাসা হল তাঁর স্বভাবের সর্বোত্তম ধর্ম। তিনি একরূপেও সত্য, বহুরূপেও সত্য এবং তুরীয়রূপেও সত্য।

সগুণ ও নির্গুণের পরিচয়

এই সকল ঈশ্বরীয় অনুভূতি ক্রমপর্যায়ে সগুণ হতে নির্গুণে যায়। প্রতিটি পূর্ব অবস্থা হল কারণ এবং পরবর্তী অবস্থা হল কার্য। এভাবেই কারণ হতে কার্য এবং কার্য হতে কারণ এই সম্বন্ধ ধরে প্রকাশধারা চলে। বিশ্বজুড়ে তাঁর সগুণ অভিব্যক্তি ছড়িয়ে আছে। সগুণের বিকাশ পূর্ণ হলেই নির্গুণভাবের বিকাশ আরম্ভ হয়। সগুণ হল নির্গুণের পরিণাম এবং নির্গুণ হল সগুণের পরিণতি। উভয়ের সঙ্গে উভয়ের সম্পূরক ও পরিপূরক সম্বন্ধ। সগুণের বৈশিষ্ট্য হল বৈচিত্র্য এবং নির্গুণের বৈশিষ্ট্য হল সমতা ও একতা, পূর্ণতা ও নিত্যতা। প্রথমে সগুণের খেলায় নিজেকে তিনি বহুরূপে প্রকাশ করেন এবং পরিণামে তাদের নির্গুণ নির্বিশেষ সত্তায় মিলিয়ে নেন বা যুক্ত করেন। কাজেই বৈচিত্র্যময় নানাত্ব বহুত্ব তাঁর সবিশেষ বহিঃপ্রকাশ। এই বহিঃপ্রকাশ দ্বারা তিনি সকলকে পুষ্ট ও তুষ্ট করে পূর্ণ করে তোলেন এবং শেষে আপনার পূর্ণ স্বরূপের সঙ্গে এক করে নেন।

প্রত্যেকে তাঁর সন্তান। সকলকে নিয়ে তাঁর আনন্দের সংসার। বিশ্বজগৎ হল তাঁর প্রেমের খেলাঘর। সকলে তাঁরই সত্তায় সত্তাবান, তাঁর শক্তিতে শক্তিমান এবং তাঁর বোধে বুদ্ধিমান। আবার সবই তিনি স্বয়ং।

তাঁর প্রকাশবিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য

প্রথম পথ্য (নামরূপ) যা দ্বারা সকলে পুষ্ট হয়। দ্বিতীয় স্তরে তথ্য অর্থাৎ কৃষ্টি ও সংস্কৃতি। তৃতীয় স্তরে তত্ত্ব (তন্ময়, তদ্গত ও মাতৃময়)। চতুর্থ স্তরে তুরীয় অর্থাৎ উপরোক্ত তিনভাবের সমীকরণ। এই হল চৈতন্যের পূর্ণ স্বরূপ। একেই পরব্রহ্ম বলা হয়।

প্রথম স্তর হল 'আমার আমি'। দ্বিতীয় স্তর 'আমি আমার', তৃতীয় স্তর 'আমির আমি' এবং চতুর্থ স্তর 'আমিত্বের আমি।'।

১। 'আব্রহ্মস্তম্বপর্যন্তং পরমাত্মস্বরূপকম্'

সন্তানকে পুষ্ট করার জন্যই মা নাম-রূপ ধারণ করেন। নাম-রূপ দিয়ে হয় সন্তানের পুষ্টি। নাম-রূপের বোধ বা তথ্য দিয়ে হয় তুষ্টি। তৃতীয় স্তরে গিয়ে তদ্গত হয়ে হয় স্থিতি। এই ত্রিবিধ বোধের সম্মিলিত রূপ হল চতুর্থ স্তর বা তুরীয় স্তর। এ-ই পূর্ণ অবস্থা। একেই স্বানুভূতির স্তর বলে।

শ্রবণের মাধ্যমে অন্তরবোধের বিকাশ হয়

সকলের অভাব পূরণ বা অজ্ঞান শোধনের জন্য প্রথমেই প্রয়োজন সত্যের শ্রবণ। শ্রবণ শুদ্ধ হলে এবং শুদ্ধ শ্রবণ অনুরূপ মনন হলে হয় সত্যের বোধন। অর্থাৎ শ্রবণের পরে তা যথার্থ ব্যবহারের মাধ্যমে হয় অন্তরে সত্যের বোধন বা জাগরণ। বোধন হলেই তাঁর অভয়পদ লাভ করা যায়।

বিশেষরূপে বিচরণ করার নাম বিচার। তাঁর সঙ্গে বোধে যুক্ত হলেই যথার্থ যুক্তি ও বিচার সিদ্ধ হয়।

সবকিছু প্রাণেরই প্রকাশ। এই প্রাণের দ্বারাই প্রাণ পুষ্ট হয়। এই প্রাণকে স্বীকার করাই হল কৃতজ্ঞতা[১]।

কৃতজ্ঞতাবোধের অন্যতম মাধ্যম পূজা

কৃতজ্ঞতার অর্থ হল প্রাণ দিয়ে প্রাণের সমর্থন এবং প্রাণ দিয়ে প্রাণের পূজা। আকাশ বাতাস অগ্নি জল মৃত্তিকা প্রভৃতি পঞ্চভূতের পূজার মাধ্যমেই তাদের প্রতি মানুষ কৃতজ্ঞতা জানায়। প্রাণকে স্বীকার করলে ও মেনে নিলে সকলের সঙ্গে উপাদানগত সমান সম্বন্ধ অবগত হওয়া যায়। এক প্রাণই সকলের মধ্যে বিরাজমান এটা মানতে পারলে সকলকেই ভালবাসা যায়। বিশ্বব্যাপী অখণ্ড প্রাণের সঙ্গে নিজের অভেদ সম্বন্ধ অনুভব করার জন্য প্রাণময় সর্ব উপাদান দিয়ে প্রাণের পূজার বিধান প্রচলিত। সমস্ত রকম দেব পূজার উপকরণাদির মধ্যে অধিকাংশই বনৌষধি এবং বাকি অংশ হল পঞ্চ অধিভূত, পঞ্চ অধিদৈব, পঞ্চ ইন্দ্রিয়াদি ও নৈসর্গিক শক্তিসমূহ অর্থাৎ বহিঃপ্রকৃতি এবং পূজারী হল অন্তরপ্রকৃতি মন ও প্রাণ। এই পূজার উদ্দেশ্য হল অন্তরপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতিরূপ দ্বিবিধ প্রাণের প্রকাশের অভেদ মিলন বা সমীকরণ। জীবমাত্রই প্রাণের পূজারী। সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যেই লীলাচ্ছলে প্রাণের পূজা অবিরাম হয়ে চলেছে।

প্রাণ দিয়েই হয় প্রাণের পূজা

এক প্রাণরূপ দেবতাই সবার মধ্যে বিদ্যমান। তাঁকেই নমস্কার জানাতে হয় কৃতাঞ্জলিপুটে। এ-ই হল বৃক্ষরূপী প্রাণপূজার তাৎপর্য[২]।

অন্তরে বাইরে নামে রূপে ভাবে মহাপ্রাণই আছে। এটা না মানলে শুধু স্তব স্তুতি পাঠ করে লাভ হয় না। বিশ্বব্যাপী মহাপ্রাণই হল সগুণব্রহ্ম পরমবিষ্ণু অথবা সচ্চিদানন্দময়ী আদ্যাশক্তি। শক্তি ও শক্তিমান অভেদ। নির্গুণব্রহ্ম হল বিশুদ্ধ তত্ত্ব। এ শুধু সত্তামাত্র। সগুণব্রহ্ম হল বিশুদ্ধ প্রজ্ঞানঘন তত্ত্বের বিজ্ঞানময় রূপ।

সগুণ ও নির্গুণের লক্ষণ

নির্গুণ হল নিত্য অমূর্ত ও অব্যক্ত স্বরূপ এবং সগুণ হল মূর্ত, ব্যক্ত ও লীলা। সগুণের অনুভূতি পূর্ণ হলেই নির্গুণের অনুভূতি লাভ করা সম্ভব হয়। সগুণকে বাদ দিয়ে নির্গুণের সাধনা হয় না।

প্রাণকে দর্শন করাই হল পাঠ[৩] করা। বেদ অধ্যয়ন (অন্বেষণ) ও গীতা, চণ্ডীপাঠ করে যদি শিহরণ না হয়

১। তত্ত্বের দৃষ্টিতে। ২। অভিনব বিজ্ঞান দৃষ্টির তথা স্বানুভূতির জ্যোতিতে। ৩। অভিনব সংজ্ঞা।

অর্থাৎ প্রাণস্পর্শী না হয় তবে সেই পাঠে বিশেষ উপকার হয় না। প্রাণচৈতন্যের মহিমা ভালভাবে শ্রবণ করা থাকলে এই সকল পাঠে অন্তরে প্রাণের অনুভূতি জাগে।

মানবতার মধ্যে জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম ও প্রেম নিহিত আছে। প্রেম না হলে জীবন পূর্ণ হয় না। প্রেম মানে প্রণতি এবং প্রীতিসুলভ ব্যবহার ও কর্ম। আনন্দ ও প্রীতিযোগেই প্রাণের সঙ্গে প্রাণ একীভূত হয়।

মানবাত্মার পূর্ণতার লক্ষণ

আনন্দের স্মৃতিই আনন্দ ও পূর্ণতা লাভের কারণ। পূর্ণতা হল পূ + র + ণ + তা। 'পূ' মানে পবিত্রতা, জ্ঞান। আনন্দযুক্ত জ্ঞানই পবিত্রতার লক্ষণ। 'র' মানে রতি। 'ণ' শব্দের মানে নির্বাণ। 'তা' অর্থ সাদৃশ্য। পূর্ণতার অর্থ হল অখণ্ড ভূমা। 'আমি চাই তোমারে, তুমি চাও আমারে'। উভয়ের মধ্যে এক সত্তা থাকার জন্যই পরস্পর পরস্পরকে চায়। অভেদ যুগলতত্ত্বের মিলন ও বিচ্ছেদের ফলেই জীবজগতের সৃষ্টি স্থিতি ও ধ্বংসলীলা বারংবার সম্পাদিত হয়।

আমি ও তুমির ব্যবহার ও পুরুষ-প্রকৃতি প্রভৃতি যুগল তত্ত্বের ব্যবহার সমান। আমি থাকলে তুমি থাকে, আবার তুমি থাকলেও আমি থাকে। সেইরূপ মা ও সন্তান এবং এক ও দুই প্রভৃতির মধ্যে নিত্য অভেদ সম্বন্ধ। এইভাবে দু-এ মিলে চলে নিত্যলীলা।

মাতাপিতা মহাগুরু। তাঁরা ঈশ্বরের প্রতিনিধি, ঈশ্বরস্বরূপ। তাঁদের কৃপা বলেই সন্তান কীর্তিমান হয়। মহাগুরুর কাছে জন্ম নেয় সত্যিকারের সন্তান। মানুষ নিজের মা-বাবাকে ফেলে সাধু মহান্তের পিছনে ঘুরতে ভালবাসে; তার ফলে পূর্ণতা লাভ করতে বিলম্ব হয়। ঘর ও পুর হল সবার আগে। পুরে এসেই দিব্যমানবগণ জন্মগ্রহণ করেন। নিজ নিজ বাসস্থান হল আশ্রম, মাতাপিতা হল গুরু, স্বদেহ হল মন্দির, মন ও বুদ্ধি হল পূজারী এবং দেহের অভ্যন্তরে চিদানন্দস্বরূপ আত্মাই হল দেবতা। গুরুর উপদেশ অনুযায়ী একাগ্রমনে নিষ্ঠা সহকারে স্বাশ্রমস্থ নিজ দেহমন্দির ও নিজবোধস্বরূপ আত্মার সেবা দ্বারা প্রীতি কৃপা ও অনুভূতিলাভ করাই হল জীবনের পরম পুরুষার্থ[১]।

'ভারত' অর্থ ভা + রত। 'ভা' হল জ্যোতির্ময়। 'রত' হল যুক্ত থাকা। ভাস্বর জ্যোতির্ময় সত্তার ধ্যানে যে-দেশ রত আছে তাকেই বলে ভারত[২]।

ঈশ্বরকে সাথে নিয়েই মানুষ ঈশ্বর খোঁজে। যেমন কাঁধে গামছা রেখে বা চোখে চশমা পরে ভ্রান্তিবশত কেউ কেউ গামছা ও চশমা খোঁজে।

জ্ঞানস্বরূপ হল ঈশ্বর বা আত্মা এবং প্রতিটি জ্ঞান হল ঈশ্বরীয় ভাব বা আত্মভাব। প্রতি বস্তুর মধ্যেই ঈশ্বর আছেন। 'আপনারে লয়ে আপনার খেলা, তাই ঈশ্বরের আত্মলীলা[৩]।' 'নিজেরে নিজে করিতে আস্বাদন, জীবনরূপ তিনি করেন ধারণ।' নিজেকে নিজে যখন আস্বাদন করতে চান তখন সেই প্রাণচৈতন্য জীবনরূপ ধরে আসেন। প্রাণ হল বোধের কেন্দ্র, আবার বোধ হল প্রাণের কেন্দ্র। প্রাণ ও বোধ একই বস্তু[৪]।

প্রাণের বিচিত্র লীলাবিলাস

প্রাণেরই অভিব্যক্তির নাম বোধ বা চৈতন্য; আবার চৈতন্যের ব্যবহারকে প্রাণ বলা হয়। ব্যবহারের জন্য প্রাণ বহু ভাগে বিভক্ত। বিশ্বজুড়ে প্রাণচৈতন্যের খেলা। ঈশ্বরীয় বোধে প্রাণের ব্যবহার হলে তাঁর সর্বোত্তম মহিমা অবগত হওয়া যায়।

১। স্বানুভূতির দৃষ্টিতে পুরুষার্থের তাৎপর্য। ২। অভিনব ব্যাখ্যা। ৩। স্বানুভূতির দৃষ্টিতে। ৪। বিজ্ঞান দৃষ্টিতে।

নাম ও রূপ হল প্রাণচৈতন্যের বহিঃপ্রকাশ এবং ভাব ও বোধ হল তাঁর অন্তরের প্রকাশ।

ত্রিবিধ আকাশের পরিচয়

মানুষ ভূতাকাশ হতে চিত্তাকাশে বিচরণ করে আবার চিত্তাকাশ হতে চিদাকাশের সন্ধান পায়। চিদাকাশস্বরূপ ঈশ্বর প্রথমে নিজেকে অন্তরে চিত্তাকাশরূপে প্রকাশ করেন, তারপরে বাইরে ভূতাকাশরূপে ব্যক্ত করেন।

স্থূল ভূতাকাশ হতে চিত্তাকাশের পরিচয় অবগত হয়ে তারপরে সাধক চিদাকাশের পরিচয় অবগত হয়ে তাঁর মধ্যে একীভূত হয়ে যায়। এই হল ঈশ্বরের মূর্তামূর্ত ও ব্যক্তাব্যক্তের বিজ্ঞান[১]।

সত্যাভ্যাসের দ্বারাই সত্য লাভ হয়

দীর্ঘকাল মিথ্যাবোধে কোন জিনিস ব্যবহার করা হলে তাকে সহজে সত্যবোধে গ্রহণ করা যায় না। কিন্তু বিশ্বাস করে সত্যবোধে সব ব্যবহার করলে সত্যবোধের বিকাশ হয় এবং পরিণামে পূর্ণবোধে সত্যপ্রতিষ্ঠা হয়। তখন মিথ্যার প্রভাব থাকে না।

জড় ও বৈচিত্র্য হল মায়ার খেলা। এ সৎ-এর সন্ধিনী বা সৃজনীশক্তির বহিঃপ্রকাশ। অন্তরের চেতনা বা ভাব হল চিৎশক্তির অভিব্যক্তি। প্রকৃতপক্ষে জড় ও মায়ার অস্তিত্ব নেই। সবই চিদাত্মার লীলাবিলাস মাত্র[২]।

নিজ প্রাণবোধের মাধ্যমেই মা ও আত্মবোধের দর্শন হয়

মাকে খুঁজতে কোথাও যেতে হয় না। মন্দির, গির্জা, বন, পাহাড় কোথাও নয়। শাস্ত্রগ্রন্থেও নয়। শুধু নিজের প্রাণ ও বোধ দিয়ে তাঁর দর্শন মেলে। বোধ দিয়ে যা কিছু ব্যবহার করা হয় তা বোধময় হয়। আপনবোধে সবকিছু ব্যবহার করাকে আত্মবোধের বিজ্ঞান[৩] বলে। আত্মবোধের বিজ্ঞান অনুসরণ করলে অখণ্ড একাত্মানুভূতি লাভ হয়। অখণ্ড আত্মার মধ্যে বাস করে 'ইহা সত্য ও উহা মিথ্যা' অথবা 'উহা সত্য ও ইহা মিথ্যা' এবং 'ইহা আমার ও আমি' ও 'উহা আমার ও আমি নই' অথবা 'উহা আমার ও আমি' এবং 'এ আমার ও আমি নই' ইত্যাদি ব্যবহার যে করে সে অজ্ঞানবশত নিজেকে নিজে সংকুচিত করে ও পৃথক ভাবে। এটা ভেদজ্ঞানের লক্ষণ। কিন্তু সর্বেশ্বরবাদে সবই সত্য ও সবই ঈশ্বর এইরূপ বোধের ব্যবহার দ্বারা মানুষ সত্যময় এবং ঈশ্বরময় হয়।

বোধময়ী মায়ের দর্শন বিজ্ঞান

আপন প্রাণের সঙ্গে সর্বপ্রাণের উপাদানগত সাদৃশ্য সমতা ও একতা নিত্যসিদ্ধ।

প্রাণের সঙ্গে প্রাণের মিলন অর্থাৎ বোধের সঙ্গে বোধের মিলনকেই বোধের দর্শন[৪] বা মাতৃদর্শন বলে।

গুণকে আশ্রয় করেই চিন্ময়ী মা লীলা করে। এই বিশ্ব হল মায়ের বক্ষ বা কোল।

সত্যবোধেই সৎসঙ্গ সাধিত হয়

সত্যবোধে সবকিছু ব্যবহার করাই হল সৎসঙ্গ করা।

সৎসঙ্গই হল আস্তিক্য বা সালোক্যবোধ। একে সালোক্যযোগ বলে। আস্তিক্যবোধের পরে দ্বিতীয় স্তরে আশ্রিত-আশ্রয়বোধে হয় সামীপ্যযোগ। আশ্রিত-আশ্রয়বোধের পরে তৃতীয় স্তরে আত্মীয়বোধে হয়

১। স্বানুভূতিসাপেক্ষ তত্ত্বানুভূতি। ২। স্বানুভূতির দৃষ্টিতে। ৩। স্বানুভব বিজ্ঞান। ৪। স্বানুভূতির দৃষ্টিতে।

তাদাত্ম্য জ্ঞান। একে সারূপ্যযোগ বলে বা একাত্মবোধ বলে। চতুর্থ স্তরে হয় সাযুজ্যযোগ বা পরমাত্মজ্ঞান বা পরমাত্মস্থিতি[১]।

ব্রাহ্মণের পরিচয়

ব্রহ্মকে যিনি জেনেছেন এবং যিনি অপরকে বিশুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞান দিতে পারেন তিনিই হলেন ব্রাহ্মণ[২]।

ব্রাহ্মণ তিনিই যিনি ইষ্টতত্ত্ব ও আত্মজ্ঞান লাভ করে অপরকেও তা প্রদান করেন।

ভগবানকে জানতে গেলে মানা যায় না। জেনেশুনে ভালবাসা হয় না। ভালবাসলে জানা যায়। প্রেমের সম্পর্ক আপনবোধে হয়, যুক্তি-তর্ক-বিচারে হয় না। বিচার বা সংশয় এলেই মা সরে যান। বিচারের গৌণ অর্থ হল তর্ক কিন্তু মুখ্য অর্থ হল বিজ্ঞানে বাস করা; বিহার করা বা বিচরণ করা। বিজ্ঞান অর্থ এখানে আত্মজ্ঞান বা ঈশ্বরীয় জ্ঞান। তাঁর মধ্যে, তাঁর বোধে সন্তান বা যে-কোন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক পাতিয়ে চলতে হয়। তাঁকে সর্ব অবস্থায় মেনে নিতে হয় অর্থাৎ মানিয়ে চলতে হয়। মানিয়ে চলার অর্থ মাকে (মাধবকে, মহেশকে, মহৎকে) নিয়ে চলা। 'মেনে মানিয়ে চলার' অভ্যাসের পরিণামে জীবন অখণ্ড সত্যময় হয়।

হৃদয়ের তাৎপর্য

হৃদয় হল হ + ঋ + দ + য়। 'হ' মানে শিব, সত্তা, প্রজ্ঞানঘন আনন্দময় পুরুষ বা আত্মস্বরূপ, পূর্ণজ্ঞান, পূর্ণচৈতন্য বা সর্বাশ্রয়। এই 'হ' সর্বদাই 'ঋ' যুক্ত অর্থাৎ মহাশক্তি যুক্ত। এই মহাশক্তিই হল মহাপ্রাণচৈতন্য ও প্রকৃতি। বিশ্বপ্রাণ বা বিশ্বচৈতন্য শক্তি সত্তা শিববক্ষে নিত্য বিরাজমান। সেই 'হৃ' যখন নিজেকে আনন্দের আতিশয্যে বিস্তারিত করে ইচ্ছার দ্বারা এবং সংকুচিত করে সংহার দ্বারা তা-ই 'দ'। 'য়' হল নিয়ন্ত্রণকারী। নিয়ন্ত্রণ করা, গতি ও ক্রিয়া অর্থেও 'য়'-এর ব্যবহার আছে।

অ-মনের তাৎপর্য

মনের অ-মন অবস্থাকেই মাতৃতাদাত্ম্য, গুরুতাদাত্ম্য, আত্মতাদাত্ম্য, ঈশ্বরতাদাত্ম্য প্রভৃতি বলা হয়।

প্রেমস্বরূপের তাৎপর্য

ভগবান প্রেমস্বরূপ। প্রেম হল প্র + ইম্। 'প্র' হল প্রকৃষ্টরূপে। 'ইম্' হল এ-ই। এই বোধ স্বতঃস্ফূর্ত বলে একে প্রেম বলে। 'প্র'-ই পূর্ণপ্রাণ যা জীবমাত্রেরই একান্ত প্রিয় বস্তু। এই 'প্র'-ই মা। যা প্রিয় তাই মা। তাকে প্রেম বলে। প্রাণই প্রকৃষ্টরূপে সব দিতে পারে অর্থাৎ সব পূর্ণ করে দিতে পারে।

তাঁর সত্তায় সত্তাবান বর্তমানে 'আমার আমি' সাজে ভগবতী মাতা বা হরিই খেলছেন—এই ধারণা ও জ্ঞানই হল শুদ্ধাভক্তি ও জ্ঞানের লক্ষণ।

পরিচয় হল পরি + চয়। 'পরি' মানে মহৎ ও শ্রেষ্ঠকে বরণ করা অর্থাৎ মানার মাধ্যমে মহতের সঙ্গে মিলন ঘটে। মহতের সঙ্গে মিলন হলে মহত্তের প্রভাব অন্তরে প্রতিফলিত হয়। তখন মহৎ ভাবের অভিব্যক্তি হয়। মহৎ ভাব হল বিশুদ্ধ বোধ, আনন্দ, পূর্ণশক্তি ও প্রেম। পূর্ণবোধের সঙ্গে ব্যষ্টিবোধের মিলন হলে ব্যষ্টির মধ্যে পূর্ণবোধ খেলে। মনের মধ্যে শুদ্ধ নূতন অন্তরবোধের প্রকাশকেই পরিচয় বলে। শ্রেষ্ঠকে চয়ন করা অর্থে সত্যবোধকে বা আত্মবোধকে চয়ন করা বোঝায়। সত্যশ্রবণের মাধ্যমে হয় সত্যের চয়ন।

১। স্বানুভূতির দৃষ্টিতে তত্ত্বানুভূতি—অদ্বয় বোধের বৈশিষ্ট্য। ২। স্বানুভূতির দৃষ্টিতে অদ্বয় বোধের বৈশিষ্ট্য।

বহুরূপ হল আত্মবোধের সম্প্রসারণ। আত্মারূপী মায়ের বক্ষেই তাঁর প্রকাশসকল বিরাজ করে। আর তিনি যখন সংকোচনের মাধ্যমে প্রকাশসকলকে নিজের মধ্যে মিলিয়ে নেন তখন হয় প্রলয় বা সর্বনাশ। প্রলয়ে হয় বিশষণের ও বৈচিত্র্যের লয়। একেই বিনাশ বলা হয়।

ঈশ্বরের দিব্য মহিমা

ঈশ্বর হলেন অদ্বয়স্বরূপ। তিনি হলেন প্রজ্ঞানঘন আবার অজ্ঞানতম উভয়ই, পুরুষ-প্রকৃতি উভয়ই, সৎ-অসৎ উভয়ই। তিনি অদ্বৈত হয়েও দ্বৈত এবং দ্বৈত হয়েও অদ্বৈত। নির্গুণ-সগুণ এবং নির্গুণ-গুণী সবই তিনি।

নির্গুণ নির্বিশেষ বন্ম বা আত্মাই হল জ্ঞানীর লক্ষ্য। সগুণ সবিশেষ ঈশ্বর হল ভক্তের লক্ষ্য ও উপাস্য।

অন্তর পূজার তাৎপর্য

মন হল তুলসী, বুদ্ধি হল চন্দন। এই মনতুলসী ও বুদ্ধিচন্দন দিয়ে বোধস্বরূপ আত্মার সেবা ও পূজা করতে হয়। অহংকার অভিমানের ব্যবহার হল অশুদ্ধ চিত্তের লক্ষণ এবং ত্বংকার বোধের ব্যবহার হল শুদ্ধ চিত্তের লক্ষণ। অহংকারে ঈশ্বরের নাম সাধনা যথার্থ ভাবে হয় না, কিন্তু ত্বংকার বোধে অন্তরে স্বতঃস্ফূর্ত ঈশ্বরের নাম হয়। স্বতঃস্ফূর্ত নামকেই অজপা জপ বলে। শ্বাসে শ্বাসে নাম করা অভ্যাস করলে অজপা সিদ্ধ হয়।

[৪।৫।৬৮]

সর্বেন্দ্রিয় যোগে হয় অভেদ মিলন

অখণ্ড সত্যকে সর্ব ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ করলে তার সঙ্গে অভেদ মিলন হয়। এর প্রকাশকে সংবেদন[১] বলে। সত্যশ্রবণ, সত্যদর্শন, সত্যজ্ঞান এবং একান্ত সত্যময় হয়ে যাওয়া অর্থ হল পূর্ণ হয়ে যাওয়া।

মাতৃযোগে হয় মাতৃবোধের স্থিতি

বৈচিত্র্যময় নামরূপ বৃত্তির কারণ হল মন। সত্য মা নামে, সত্য মা রূপে, সত্য মা ভাবে, সত্য মা বোধে। সত্য মা দেহে, সত্য মা প্রাণে, সত্য মা মনে, সত্য মা বুদ্ধিবিজ্ঞানে। নামরূপের মধ্যেও সত্য মাকে মানলে বাকিগুলির সঙ্গে সহজেই মিলন হয়। সত্যময়ী মায়ের মধ্যেই সব। মাকে বাদ দিয়ে কিছু নেই।

সচ্চিদানন্দময়ী মায়ের পূর্ণ পরিচয়

জ্ঞান ও অজ্ঞান, সত্য ও মিথ্যা, নিত্য ও অনিত্য, নির্গুণ ও সগুণ, এক ও বহু হল সচ্চিদানন্দময়ী মায়েরই ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ। নিজেকে নিজের মধ্যে বহুভাবে প্রকাশ করে মা লীলা করেন। আবার প্রকাশগুলিকে নিজের মধ্যেই মিলিয়ে নেন। নিত্যরূপেও মা, লীলারূপেও মা। নিত্যরূপী মাকে নির্গুণ ব্রহ্ম বলে জেন এবং লীলারূপী মাকে সগুণ ব্রহ্ম বা সগুণ ঈশ্বর বলে জেন। নির্গুণ ব্রহ্মকেই পরমাত্মা বলে এবং সগুণ ব্রহ্মকে বিশ্বাত্মা ও জীবাত্মা বলে। নির্গুণ-গুণী রূপে মা-ই অবতার হয়ে আসেন। তাঁর নির্গুণ ও সগুণ ভাব অর্থাৎ নিত্য ও লীলার মধ্যে পরস্পর অভেদ সম্বন্ধ। একে অপরের পরিপূরক বা সম্পূরক। একে পরিণামবাদ ও বিবর্তবাদ নামে শাস্ত্রকারগণ ব্যক্ত করেছেন। এই দুই ভাবের সংযুক্ত রূপই হল তাঁর নিত্য অদ্বয়স্বরূপ। দুইকে নিয়ে তিনি খেলেন বলেই তাঁর আর এক নাম দুনিয়া।

১। নূতন সংজ্ঞা।

অদ্বৈতের দ্বৈত ব্যবহার

নির্গুণ-সগুণ, অব্যক্ত-ব্যক্ত, অমূর্ত-মূর্ত, নিরাকার-সাকার, নির্বিশেষ-সবিশেষ এক তত্ত্বেরই দ্বিবিধ পরিচয়। এই দ্বিবিধ ভাব আমি ও তুমি বোধের মাধ্যমে লীলায়িত হয়।

প্রথম পর্যায়ে আমিতে আমি বা আমির আমি। দ্বিতীয় পর্যায়ে হল আমির (আমার) তুমি। আমির কাছে আসে আমি তাকেই বলে তুমি। তৃতীয় পর্যায়ে তোমার আমি এবং চতুর্থ পর্যায়ে তুমি আমি একজন।

মায়ের মধ্যে আগে সত্যবোধ পরে প্রকাশ। সন্তানের কাছে আগে প্রকাশ পরে বোধ বা সত্য।

'শ্রব' হল ধারা, প্রাণের ধারা। প্রাণ হল বোধ। এই বোধের প্রত্যয় বা প্রবাহ একমুখী হলে তাকে শ্রব বলে। এই শ্রব বা প্রাণধারা বা বোধধারা আনন্দমূলক। সেইজন্য একে রসময় বলা হয়। 'রসঃ বৈ সঃ'। এই রসধারাই আনন্দধারা। আনন্দের প্রবাহ জগৎরূপ ধারণ করেছে। শ্রবের ইন্দ্রিয়কেই শ্রবণেন্দ্রিয় বলে। শ্রবণ দুই প্রকার। বহিঃশ্রবণ এবং অন্তরশ্রবণ। বহিঃশ্রবণ হল স্থূল শব্দগ্রহণ। এই স্থূল শব্দ হল শব্দ তন্মাত্রার স্থূল অভিব্যক্তি। এ হল স্থূল আকাশের গুণ।

নাদব্রহ্মের নিগূঢ় রহস্য

চিত্ত বা মনের ভিতরে যে চিন্তন বা বোধের স্পন্দন ওঠে সেই স্পন্দনের ধ্বনিকেই মানসবৃত্তি বলে। অস্ফুট মানস স্পন্দনের ধারাকেও অন্তরশ্রবণ বলা হয়। এ হল নাদের প্রতিধ্বনি বিশেষ। নাদ-ধ্বনিকেই প্রণব বা ওঁকার বলা হয়। এ সমগ্র শব্দের মূল রূপ, সৃষ্টির আদি বীজ বা কারণ।

অনুভূতি হল অন্তরবোধের সূক্ষ্মবেদন বা বোধের স্পন্দন। সত্তার বক্ষে বা হৃদয়ে বোধের স্পন্দনমাত্রই অনুভূতি। এই অনুভূতিই হল শব্দের সূক্ষ্মতম রূপ। এ-ই শুদ্ধ শ্রবণ। 'অন্তরশ্রবণ[১] হল প্রাণের সঙ্গে প্রাণের মিলন'। ইন্দ্রিয়ের বোধ হল বহিঃপ্রাণের সঙ্গে গৌণ প্রাণের মিলন।

ভাববোধের ব্যবহারিক লক্ষণ

গৌণপ্রাণ হল বহির্বিশ্ব, অধিভূত এবং অধিদৈব। মুখ্য প্রাণ হল অধ্যাত্ম ও অধিযজ্ঞ। বহির্বিশ্ব বা গৌণ প্রাণ হল দেহ ও মন এবং নাম ও রূপ। মুখ্য প্রাণ হল ভাব ও বোধ অথবা জ্ঞান ও বিজ্ঞান। বাইরে যা সম্ভূতি বা বিভূতি অন্তরে তা অসম্ভূতি বা অনুভূতি। অনুভূতিতে লয়ের নাম বিনাশ। এই বিনাশই হল রুদ্রের...কাজ...। রুদ্রের কাজ যখন শুরু হয় তখন অনুবেদন হয় অর্থাৎ বহুত্বের নাশ হয়। একেই বিশেষণের নাশ বলে। তখন ব্যষ্টিসত্তাকে সে রোদন করায় বলেই তাকে রুদ্র[২] বলা হয়। অন্তরশ্রবণ অর্থ মুখ্য এবং গৌণ প্রাণের মিলন। এরই নাম সত্য সংবেদন, সত্যবোধ বা মাতৃবোধ। প্রাণের সঙ্গে প্রাণের মিলন হল সমগ্র কার্য ও সমগ্র কারণের মহামিলন। একেই বোধের সঙ্গে বোধের মিলন বলা হয়। এরই নাম দর্শন।

অনুভূতির পরিণাম

অনুভূতির গভীরে বিশ্বধারণা লয় হয়। তখন অন্তর ও বার এক হয়ে যায়, কারণে কার্য লয় হয়ে যায় এবং প্রকাশকের মধ্যে প্রকাশ মিশে যায়। কার্য দ্বারা কার্য নাশ হয় না, কারণে গিয়ে কার্য নাশ হয়। বহির্বিশ্ব হল প্রকাশ বা কার্য। তার কারণ হল অন্তরপ্রাণ বা মুখ্য প্রাণ। বহির্বিশ্বে কারও কোন অনুভূতি হয় না। অনুভূতি হয় অন্তরে।

১। অভিনব সংজ্ঞা। ২। তত্ত্বের দৃষ্টিতে।

অন্তরই সবকিছু প্রকাশ করে। এই অন্তরক্ষেত্রে সবই অন্তর বা কারণ এবং বাইরের সবই কার্য। বহির্বিশ্ব হল অন্তরের সন্তান, প্রকাশ বা বিস্তার। সন্তানই মায়ের পরিচয় বহন করে। সেই সন্তান দ্বারাই মাতাপিতার পরিচয় পাওয়া যায়, যেমন ফল দ্বারা বৃক্ষের পরিচয় পাওয়া যায়। সেইরূপ প্রকাশ দ্বারা প্রকাশকের পরিচয় মেলে অর্থাৎ জগৎ দিয়েই জগদীশ্বরের পরিচয় মেলে।

স্রষ্টা ও সৃষ্টির অনুভূতি পরস্পর সাপেক্ষ

জগতের পূর্ণ বোধ বা পূর্ণ পরিচয় পেলেই জগদীশ্বরের অনুভূতি হয়। আবার জগদীশ্বরের অনুভূতি হলেই জগতের রহস্য অবগত হওয়া যায়। নির্গুণ ব্রহ্ম হল তত্ত্ব, সগুণ ব্রহ্ম হল ধর্ম। নির্গুণ হল প্রজ্ঞানময় এবং সগুণ হল বিজ্ঞানময়। প্রজ্ঞান হল জ্যোতি, বিজ্ঞান হল তাপ। প্রজ্ঞানের পরিচয় বিজ্ঞান দেয় এবং বিজ্ঞানের পরিচয় প্রজ্ঞান দেয়। প্রজ্ঞান হল মহাকারণ এবং বিজ্ঞান হল তার কার্য। কারণ হল বীজ, কার্য হল প্রকাশ। কারণ হল স্রষ্টা, কার্য হল সৃষ্টি। স্রষ্টা হল প্রকাশক, সৃষ্টি হল প্রকাশ। প্রকাশের মাধ্যমেই প্রকাশকের পরিচয় মেলে। ঈশ্বর হলেন স্রষ্টা ও প্রকাশক এবং জগৎ হল সৃষ্টি ও প্রকাশ। স্রষ্টা ও সৃষ্টি, কারণ ও কার্য, প্রকাশক ও প্রকাশ অভেদ। উভয় এক তত্ত্বেরই দ্বিবিধ পরিচয়। সুতরাং ব্রহ্মের পরিচয় জগৎ এবং জগতের পরিচয় হল ব্রহ্ম।

শ্রদ্ধার তাৎপর্য

সত্যকে ধারণ করা, বহন করা ও পরিবেশন করাকেই শ্রদ্ধা[১] বলে। শ্রদ্ধা হল সত্যকে পূর্ণরূপে মেনে নেওয়া অর্থাৎ অখণ্ড সত্যকে সত্যবোধে সর্বকালে সর্ব অবস্থায় মেনে নেওয়াই হল শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা, মানা ও বিশ্বাস তত্ত্বত এক অর্থবোধক। শ্রদ্ধাবান হওয়ার অর্থই হল মাতৃসঙ্গে মিলন।

চিন্ময়ী মায়ের লীলাবিলাসের মান

অধিভূত, অধিদৈব, অধ্যাত্ম ও অধিযজ্ঞ হল সচ্চিদানন্দময়ী মায়ের চতুর্বিধ পরিচয়। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুরূপে মা-ই হলেন অধিভূত। ইন্দ্রিয়াদি রূপে মা-ই অধিদৈব। অন্তঃকরণ রূপে মা-ই হলেন অধ্যাত্ম। হৃদয়ের অনুভূতি রূপে মা-ই বিজ্ঞানাত্মা। আবার কেন্দ্রসত্তা রূপে মা-ই প্রজ্ঞানাত্মা অধিযজ্ঞ।

মেনে নেওয়াই হল কৃতজ্ঞতা। কৃতজ্ঞতা মানে সজ্ঞানে স্বীকৃতি বা আপনবোধে গ্রহণ করা। জ্ঞানের পূর্ণতাই হল কৃতজ্ঞতা[২]।

দেহ ও দেহী সম্বন্ধ ভ্রান্তিমূলক

দেহ হল প্রাণের আধার। এ হল প্রাণেরই বিশেষ রূপ। দেহের মধ্যেই দেহী বাস করে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে দেহ ও দেহীর মধ্যে ভেদাভেদ সম্বন্ধ অর্থাৎ ভিন্ন হয়েও অভিন্ন বা একসঙ্গে যুক্ত আবার অভিন্ন বা যুক্ত থেকেও ভিন্ন। উভয়ই চিৎ উপাদানে গঠিত। জড় ও চেতন অর্থাৎ অচিৎ ও চিৎ স্থূল দৃষ্টিতে পৃথক হলেও সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে এক তত্ত্বেরই দ্বিবিধ অভিব্যক্তি। জড়তা, সসীমতা ও সংকীর্ণতা হল প্রাণচৈতন্যেরই বিশেষ ঘনীভূত ও সংকুচিত অবস্থা। জন্ম ও মৃত্যু চিদাত্মারূপী প্রাণতত্ত্বের দুটি বিশেষ অবস্থা মাত্র। মৃত্যুর সঙ্গে গাঢ় নিদ্রার সাদৃশ্য আছে। কিন্তু মৃত্যু হল দীর্ঘস্থায়ী এবং নিদ্রা হল স্বল্পস্থায়ী। মৃত্যুর পরে জাগরণ হয় নূতন দেহ ধারণ করে, কিন্তু নিদ্রা হতে জাগরণ এক দেহেতেই পুনঃপুনঃ হয়।

১। সংজ্ঞা। ২। অভিনব সংজ্ঞা।

নিত্য পূর্ণ আত্মার মহিমা

আত্মার জন্ম-মৃত্যুও নেই, জাগ্রত, স্বপ্ন সুষুপ্তিও নেই। তার স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণদেহও নেই। আত্মার প্রাপ্তব্যও কিছু নেই, অপ্রাপ্তব্যও কিছু নেই। সে স্বয়ংপূর্ণ স্বয়ংসিদ্ধ স্বয়ংপ্রকাশ অদ্বয় অব্যয় অখণ্ড সচ্চিদানন্দস্বরূপ। জন্ম-মৃত্যু হল প্রাণসাগরের দুটি বিন্দু। প্রাণচৈতন্যই হল অমর আত্মা। জন্ম-মৃত্যু তার অভিনয়। মৃত্যুকে স্বীকার করলে প্রাণকেও স্বীকার করতে হয়। মৃত্যু হল বোধের বৃত্তি। জন্ম-মৃত্যু হল টাকার এপিঠ এবং ওপিঠ।

পরিচয় অর্থ শ্রেষ্ঠতাকে ও পূর্ণতাকে চয়ন করা, অর্জন করা বা পাওয়া, অর্থাৎ আত্মজ্ঞান লাভ করা বা ঈশ্বরানুভূতি ও সত্যানুভূতি লাভ করা।

দেহ, মন, প্রাণ ও বোধ এই চারটিই সত্য। এই চতুষ্পদকে মাতৃবোধে ব্যবহার করলে তার অজ্ঞানতা, দুঃখ-কষ্ট, বিকার কিছুই থাকে না। প্রাণরূপী, চৈতন্যরূপী মা সকলের সঙ্গেই আছেন। [৫।৫।৬৮]

তত্ত্ব শব্দের নিগূঢ়ার্থ বা তাৎপর্য

তত্ত্ব হল তৎ+ত্ব। 'তৎ' মানে পুরুষ এবং 'ত্ব' মানে স্বরূপশক্তি। সত্তা ও তার অভিব্যক্তি সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের মধ্যে যে অভিনব গুপ্ত রহস্য বিদ্যমান তা অতিপ্রাকৃত ; অর্থাৎ তা প্রাকৃত ধর্মের অন্তর্ভুক্ত নয়। এই অতীন্দ্রিয় রাজ্যের বিষয়বস্তু ও ঘটনাবলীর উপলব্ধির জন্য ভগবৎকৃপা এবং তাঁর আশিস্ যেভাবে ভক্ত সন্তানের কাছে উত্তরোত্তর প্রকাশ পায় তাকেই তত্ত্ব' বলা হয়। তত্ত্ব মানে 'তৎ' অর্থাৎ সচ্চিদানন্দময় পুরুষ তাঁর পরমপ্রকৃতি বা স্বরূপশক্তি 'ত্ব'-এর সঙ্গে যখন লীলাবিহার করেন অর্থাৎ আনন্দের খেলা খেলেন তার অভিব্যক্তির ফলই হল বিশ্বলীলা (সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় এবং তদতিরিক্ত অতীন্দ্রিয় রাজ্যের ঘটনাবলী)।

তত্ত্বের আভ্যন্তরীণ বিজ্ঞানের তাৎপর্য

অদ্বয়তত্ত্বের অব্যয় বীজ হল বর্ণমালা সমষ্টি। তাদের মধ্যে স্বরবর্ণ ১৬টি ও ব্যঞ্জনবর্ণ ৩৫টি। স্বরবর্ণের মধ্যে প্রধান তিনটি (অ-ই-উ), অবশিষ্টগুলি স্বরবর্ণের সঙ্গে মিশ্রণে গঠিত। স্বরবর্ণগুলি স্বতঃই উচ্চারিত হতে পারে, কিন্তু ব্যঞ্জনবর্ণগুলি যথা—'ক' হতে 'ঁ' (চন্দ্রবিন্দু) পর্যন্ত—এসবই স্বরবর্ণের সাহায্য ছাড়া উচ্চারিত হতে পারে না। এই বর্ণমালা হল চৈতন্যের সূক্ষ্মতম স্ফুরণ, প্রকাশ অথবা বীজ (seed of consciousness)। এই বীজরূপ বর্ণমালা এককভাবে অথবা একাধিক বর্ণযুক্ত হয়ে পদ (word) সৃষ্ট হয়। এক অথবা একাধিক পদের যোগে বাক্য (sentence) তৈরি হয়। এই বাক্য হল অন্তরমনের ইচ্ছা আবেগ আশা-আকাঙ্ক্ষা চিন্তা ভাব উদ্বেগ সুখ-দুঃখ বেদনা ভ্রান্তি ভীতি আনন্দ অনুভূতি বেদনা প্রভৃতি পূর্ণ অর্থবোধক ভাবপ্রকাশের মাধ্যম। এক এবং একাধিক বাক্যের মাধ্যমে পরস্পরের মধ্যে জীবনের অত্যাবশ্যকীয় সবকিছু সত্য বিনিময় করা সম্ভব—তাই হল ভাষা। জীবনের ঐতিহ্য এবং মাধুর্য ভাষার মাধ্যমেই সম্প্রসারিত হয়। এই ভাষাই হল জীবনের নিত্য সাথী।

উপরোক্ত বিষয়বস্তুর বিজ্ঞান বিশ্লেষণ স্বানুভূতির জ্যোতিতে ব্যক্ত করা হচ্ছে। তত্ত্বের বিশ্লেষণ তত্ত্বানুভূতির মাধ্যমেই সম্ভব। আলোচ্য বিষয়টি তত্ত্বেরই প্রসঙ্গ। তার বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা নিম্নে সংক্ষেপে দেওয়া হল।

অ + অ = আ; অ + আ = আ; আ + অ = আ; আ + আ = আ।

(পূর্ণজ্ঞান হলেই পূর্ণ আনন্দ হয়।) (১)

অ + ই = এ অস্ফুট (২)

১। স্বানুভব বিজ্ঞান।

অ + এ = ঐ স্ফুট (৩)

অ + উ = ও (প্রণব) স্ফুটতর (৪)

অ + ও = ঔ স্ফুটতম (৫)

ঋ এবং ৯ বীজ নয়, নপুংসক।

'অ' হল চিৎ, পূর্ণজ্ঞান, আদ্যাবস্থা, চৈতন্যসত্তা, অনুত্তর, অদ্বয়, অব্যয়, অক্ষর, অহেতুকী, অজর, অমর।

'আ' হল আনন্দ, পূর্ণপ্রেম, পূর্ণরস, আশা, আকাঙ্ক্ষা, আবেগ, আয়তন আশ্রয়।

'ই' হল ইচ্ছা, ক্রিয়া, গতি, শক্তি, মতি ও রতি এবং ইতি ও স্থিতি।

'ঈ'—ই ব্যাপক ও পূর্ণ হয়ে দীর্ঘমাত্রায় হয় ঈ। 'ঈ' মানে ঈশ্বরত্ব, সমগ্র ঐশ্বর্য, সমগ্র বীর্য, সমগ্র পরাক্রম, সমগ্র যশ, সমগ্র শ্রী ও সৌন্দর্য, সমগ্র জ্ঞান ও বৈরাগ্য, সমগ্র বিদ্যা ও অবিদ্যা, উৎপত্তি ও বিনাশ, কার্য ও কারণ, আনন্দের ঈক্ষণ।

'উ' মানে উন্মেষ, প্রকাশ, জ্ঞান, জাগরণ, উদ্দীপন, উদ্বেল হওয়া, উদ্বোধন, উন্মীলন, উপায়, উদ্দেশ্য, উচিত, উদারতা, উভয়।

'ঊ'—উ পূর্ণ হয়ে ব্যাপ্ত হয়ে দীর্ঘমাত্রায় ঊষা, ঊর্ধ্বোদয়, ঊর্ধ্ব, ঊরুক্রম।

'এ' মানে এতি, এক, একতা, একতান, আশ্রয়, আধার, আকাশ, যন্ত্র, যোনি, অভিব্যক্তি, সগুণ প্রকৃতি, ভাব ও মাধ্যম, একান্ত।

'ঐ' মানে ঐশ্বর্য, ঐকান্তিকতা, ঐশ্বরিক, ঐতিহ্য, সমগ্র শক্তি, সমগ্র প্রকৃতি, যুগল, পুরুষপ্রকৃতি, সত্তাশক্তি, রাধাকৃষ্ণ, লক্ষ্মীনারায়ণ, সীতারাম, শিবশক্তি।

'ও' হল ওঁকার (অ + উ + ম), কেন্দ্র, কারণ, প্রকাশোন্মুখ, অভিব্যক্তি বা অভিপ্রকাশ, সংযুক্তি, মহামিলন, যোগারূঢ়, যোগস্থ, ব্রাহ্মীস্থিতি, প্রশান্ত, ব্যক্তের অব্যক্ত অবস্থা, অঙ্কুর বা বীজ।

'ঔ' মানে ক্রিয়া, গতি, নিয়ন্ত্রণ, সঙ্কোচন, সম্প্রসারণ, সংশোধন, সমাধান।

'ং'—অনুস্বর অর্থ হল স্বরের আদ্যাবস্থা বা ধ্বনির অঙ্কুর, যার প্রকাশ হল শব্দ। শব্দের বা স্বরের নিত্য অবস্থা বা অক্ষয় অব্যয় অবস্থা। এই বর্ণটি অং বা ম্ এই ভাবে আপনাকে প্রকাশ করে এবং অন্যান্য প্রকাশকে পূর্ণ করে। এ হল পূর্ণতার চিহ্ন বা প্রতীক।

ঃ (বিসর্গ)—এই বর্ণটি সৃষ্টির আদি মধ্যে ও অন্তে একই ভাবে আপনাকে প্রকাশ করে। আনন্দ ও প্রেম এর মাধ্যমে স্ফুরিত হয়। সত্তার বক্ষে শক্তির খেলা, নির্গুণতত্ত্বের সগুণ ক্রিয়া, একের বহু প্রকরণ অর্থাৎ সচ্চিদানন্দঘনের লীলাবিলাস একে ছাড়া সম্ভব হয় না। এ-ই সৃষ্টি স্থিতি ও ধ্বংসের এবং সমগ্র শক্তির ক্রীড়া বা ক্রিয়া প্রকরণ।

'কর্মসঙ্গীতম্'—সুখ ও প্রীতির প্রকাশ দ্বারা বিশ্বলীলার নিয়ন্ত্রণ। সমগ্র কর্ম মাত্রই এই বিসর্গ। যেখানে শক্তি সেখানেই গতি—কোথাও মৃদু, কোথাও তীব্র, কোথাও স্পষ্ট, কোথাও অস্পষ্ট, কোথাও হ্রস্ব, কোথাও দীর্ঘ। বহুতর মাত্রায় সত্তাশক্তির ইচ্ছাকে নামে, রূপে, ভাবে, বোধে—এককে বহুতে এবং বহুকে একেতে পরিণত করতে এ নিত্য সক্রিয়। কর্মমাত্রই যজ্ঞ এবং যজ্ঞমাত্রই ভগবৎ অভিব্যক্তি। তাকে প্রকাশ করে এই বিসর্গ।

একের দ্বৈতরূপ এবং তার প্রকাশ নির্দেশ করে এই বিসর্গ। 'ঃ' (বিসর্গ) মানে এক সত্তা দ্বিধাবিভক্ত। আধাসত্তা ও আধাশক্তি, পুরুষ ও প্রকৃতি, নির্গুণ ও সগুণ, শিব ও শক্তি (কালী, দুর্গা ইত্যাদি), বিষ্ণু ও বৈষ্ণবীশক্তি—(লক্ষ্মী, কমলা, শ্রী ইত্যাদি), ব্রহ্মা, ব্রহ্মানী (স্বরস্বতী, বিদ্যা, জ্ঞানেশ্বরী, মহেশ্বরী ইত্যাদি)। দুই যেখানে সমানভাবে বিদ্যমান তার রূপই হল বিসর্গ।

'ঁ' (চন্দ্রবিন্দু)—এ হল বর্ণমালা সমষ্টির সত্যমূর্তি। নির্গুণ নির্বিশেষ নিরাকার নিরঞ্জন নিত্য অচ্যুত স্বরূপ পরব্রহ্মের কোন মূর্তি বা আকার নেই, কিন্তু তার প্রকাশের অভাব কখনও হয় না। সত্তা ও তার প্রকাশ অবিনাভাবী, নিত্য অভেদ সম্বন্ধ। কিন্তু এই নির্বিশেষ পরমব্রহ্মের সবিশেষ অবস্থা এবং লীলাবিগ্রহের আদি প্রকাশ বা মূর্তি বোধ ইন্দ্রিয়ের সীমায় অনুভবগ্রাহ্য করার ইচ্ছায় অব্যক্তের ব্যক্তাভাস হল এই চন্দ্রবিন্দু—বীজ বা বর্ণের সত্যমূর্তি। এ হল আধ্যাত্মিক সাধনা ও অনুভূতি রাজ্যের অতীব গূঢ়তম ইঙ্গিত, নির্দেশ, চিহ্ন ও প্রতীক। কেবলমাত্র মুক্তপুরুষ এবং ভগবানের আত্যন্তিক অনুগ্রহ লাভে সমর্থ ও যোগ্য সাধক ও ভক্ত এ ইঙ্গিত উপলব্ধি করে। তাদের কাছে এ অতীব প্রিয় এবং এর তাৎপর্য ও মূল্য প্রাণতুল্য।

সমগ্র জ্ঞান আনন্দের সঙ্গে যুক্ত হয়, স্বরূপশক্তি বা ভগবতী ইচ্ছাশক্তির মাধ্যমে। জ্ঞান, ইচ্ছা আনন্দ = অ, ই, আ=অস্তি, প্রীতি, ভাতি=সৎ চিৎ আনন্দ)। অব্যক্ত ও ব্যক্তের প্রেমবিলাস, পুরুষ ও প্রকৃতির লীলা অভিনয়, সত্তা ও শক্তির আত্মক্রীড়া (শিব ও শক্তি-শিবানী, কালী, শ্যামা, বামা, ইত্যাদি; মহালক্ষ্মী, নারায়ণ, সীতারাম, রাধাশ্যাম এইরূপ যুগল ভগবৎ ও ভগবতী সত্তার প্রেম ও রতিবিলাস মূর্তি)।

উপরের বিন্দু ভগবান প্রেম আনন্দ রসসিন্ধু, নীচে এই ভগবতী শক্তি ঈশ্বরপ্রকৃতি। এই ঈশ্বরপ্রকৃতি হল মহদ্‌ব্রহ্ম বা যোনি, বিন্দু হল বীজ (seed of consciousness)। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগীতাতে এই প্রসঙ্গে বলেছেন—

মম যোনির্মহদ্‌ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত।।

Premordial matter—মম যোনি-মহদ্‌ব্রহ্ম-ভগবতী-প্রকৃতি-স্বরূপ শক্তি (It is the womb of all creations, I—the Supreme Person, the Supreme Purusha—put the seed of Consciousness and the result gives birth to all beings, animate and inanimate.)

এ কামকলাতত্ত্বের গুহ্য বিষয়। এর ব্যবহারিক সত্তা আধ্যাত্মিক অনুভূতির রাজ্যে এক অভিনব পরম সত্য। এ হল মহাসাধকদের নিকট প্রাণাধিক প্রিয়। সমস্ত সৃষ্টিতত্ত্বের মৌলিক জ্ঞান ও সত্য এ প্রকাশ করে। মহাভাব প্রেমতত্ত্বের পরিণাম মহাচৈতন্যের ও আনন্দের যুগলবিগ্রহ অমূর্তের মূর্ত ভাব। স্থূলেতে এর প্রকাশ সহজবোধ্য নয়। এ হল বর্ণমালার মধ্যে স্বরবর্ণের সর্বশেষ বর্ণ। এর পরেই বর্ণমালার ব্যঞ্জন বা মিশ্র প্রকাশ। এই ব্যঞ্জন বর্ণমালা 'ক' দিয়ে আরম্ভ হয়।

স্বরবর্ণের মধ্যে পাওয়া যায় 'অ' হতে চন্দ্রবিন্দু পর্য্যন্ত ১৬টি বর্ণ। এদের মধ্যে দীর্ঘ ঋ এবং দীর্ঘ ৯ অব্যক্ত থাকে। সুতরাং ১৪টি স্বরবর্ণ চতুর্দশ ভুবনকে নির্দেশ করে। চতুর্দশ ভুবন হল সপ্তস্বর্গ এবং সপ্তনরক। ঊর্ধ্বদিকে স্বর্গ এবং নিম্নদিকে নরক।

দীর্ঘ ঋ এবং দীর্ঘ ৯ বর্ণমালার অন্তর্ভুক্ত হলেও তার ব্যবহার অপ্রচলিত। সেই জন্য দেখা যায় বর্ণমালার সমষ্টি ৫১ হলেও ৪৯টির ব্যবহার প্রচলিত। এই ৫১ বর্ণমালাই মায়ের গলার মুণ্ডমালা বা সৃষ্টির বীজমালা। এই ৫১টি বর্ণমালার মধ্যে ৫০টি মুণ্ডমালারূপে মায়ের গলায় যুক্ত আছে এবং বিশেষ একটি মায়ের হাতে ধৃত আছে। এই ৫১টি বর্ণমালা হতেই ৫১টি শক্তিপীঠের উদ্ভব হয়েছে। বর্ণগুলি হল শক্তির বীজ। এই শক্তির বীজই সৃষ্টির বীজ। তন্ত্রশাস্ত্রে এর বিষদ বর্ণনা ও পরিচয় পাওয়া যায়। এর বৈজ্ঞানিক ব্যবহার অধুনা লুপ্তপ্রায়। শব্দতত্ত্ব নিয়ে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ অধুনা বহুলভাবে শুরু হয়েছে। শব্দতরঙ্গের সূক্ষ্ম মূর্ছনা বা বিভাগ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের মাধ্যমে বহুলাংশে ব্যবহারের আয়ত্বের মধ্যে এনে তা দ্বারা অনেক অসাধ্য সাধন করছে আধুনিক বিজ্ঞানীগণ। যেমন—রেডিও (Radio) কম্পুটার (Computer), ট্রানজিস্টার (Transistor), টেলিভিশন (Television), র‍্যাডার

(Radar) ইত্যাদি। শব্দ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রাদির মাধ্যমে মানুষ আকাশস্থিত সূক্ষ্ম শব্দতরঙ্গের অংশবিশেষকে দৈনন্দিন কাজে ব্যবহার করছে। এটা শব্দরাজ্যের বিশেষ স্তরের পরীক্ষা ও নিরীক্ষা মাত্র। এরও গভীরে ও গভীরতম অংশে অনুপ্রবেশ করতে করতে মূলে সেই নাদ বা ওঁকার তত্ত্বে পৌঁছুতে হলে যন্ত্রের সাহায্যে তা সম্ভব নয়। একমাত্র অন্তরের গভীরতম প্রদেশে হৃদয়গুহাতে ধ্যানের মাধ্যমে তার সন্ধান পাওয়া যায়। বাইরের শব্দ হল ওঁকারের স্থূলতম প্রতিধ্বনি।

ব্যঞ্জনবর্ণের প্রসঙ্গ

ব্যঞ্জনবর্ণগুলি হল 'ক' হতে 'হ' পর্যন্ত ৩৫টি বর্ণ। স্বরবর্ণগুলি 'অ' হতে 'অঃ' পর্য্যন্ত ১৬টি বর্ণ। স্বরবর্ণগুলি হল শুদ্ধ বীজ, ব্যঞ্জনবর্ণগুলি হল মিশ্র বীজ, নাস ও মন্ত্র। স্বরবর্ণের মধ্যে অবিমিশ্র প্রধান তিনটি হল অ ই উ। আ ঈ ঊ এ ঐ ও ঔ ঋ ৯ হল সংযুক্ত বা মিশ্র দীর্ঘস্বর। ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে প্রধান হল ক চ ট ত প য ষ বর্ণ। বাকিগুলি যথাক্রমে এদের অন্তর্ভুক্ত। পূর্বেই বলা হয়েছে যে স্বরবর্ণগুলি স্বতন্ত্রভাবে উচ্চারিত হয় কিন্তু ব্যঞ্জনবর্ণগুলি স্বরবর্ণের সাহায্য ছাড়া উচ্চারিত হতে পারে না। একাধিক বর্ণের সংযোগে পদ বা শব্দ তৈরি হয়। দুই বা ততোধিক শব্দের সংযোগে যখন অন্তরের ভাব, ইচ্ছা, সংকল্প প্রভৃতি প্রকাশ পায় তখন তাকে বাক্য বলে। বাক্যসমষ্টির মাধ্যমে অন্তরের ভাবসমষ্টির পূর্ণ বিকাশ হয় যখন তখন তাকে ভাষা বলে। স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের সংযুক্ত প্রকাশই হল সমগ্র নামরূপের সৃষ্টি। এই বর্ণমালা পরস্পর যুক্ত হয়ে বোধ বা জ্ঞানের প্রকাশ হয়। নাদ ও ধ্বনির স্পন্দন উত্তরোত্তর সংমিশ্রিত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন শব্দ আকারে প্রকাশ হতে হতে নামেরূপে রূপায়িত হয়।

প্রত্যেকটি বর্ণের মূলে যে বোধ বা প্রকাশ তরঙ্গায়িত বা লীলায়িত হয় তা নাদ ও ধ্বনির মাধ্যমে ধ্বন্যালোক অতিক্রম করে শব্দরাজ্যে পদার্পণ করে। তারপরে রূপের রাজ্যে আত্মপ্রকাশ করে। বোধসত্তা হতে তাঁর প্রকাশ ভাব ও নাম অতিক্রম করে রূপেতে পৌঁছায় বিলোমগতির মাধ্যমে। আবার অনুলোম গতির মাধ্যমে রূপ হতে পর্যায়ক্রমে নাম ও ভাব অতিক্রম করে বোধেতে পৌঁছায়। একেই চৈতন্যের অবতরণ ও আরোহণ বলা হয়।

ক হতে হ পর্য্যন্ত যে বর্ণমালা (ব্যঞ্জনমালা) সমষ্টি তা হৃদয়ের সবিশেষ এবং নির্বিশেষ গঠন এবং অভিব্যক্তির বীজ। বীজ মানে যার মধ্যে শক্তি সঞ্চিত থাকে। স্বরবর্ণ হল ব্যঞ্জনবর্ণের প্রাণ বা শক্তি। বীজ হল চৈতন্যের অণু। বীজমন্ত্র হল অঙ্কুরিত বীজ অর্থাৎ প্রকাশমুখী বীজ এবং নাম হল চৈতন্যের বৃক্ষ। ভাব হল ফুল এবং বোধ বা অনুভূতি হল ফল। রূপ হল স্থূলদেহ, নাম হল সূক্ষ্মপ্রাণ, ভাব হল সূক্ষ্মতর মন বা বুদ্ধি এবং বোধস্বরূপ হল সূক্ষ্মতম আত্মা। শক্তি রূপময়, জ্ঞান নামময়, আনন্দ ভাবময় এবং প্রেম হল বোধে বোধময়। কর্ম হল গুণাত্মক বা শক্তির কাজ। যোগ হল জ্ঞানাত্মক বা মিলনের প্রকাশ। জ্ঞান হল ভাবাত্মক বা আনন্দের প্রকাশ। ভক্তি হল মহাভাব বা স্বভাবাত্মক প্রেমের প্রকাশ।

স্বরবর্ণ সমষ্টির তত্ত্ব

অ—সংস্কৃত (দেবনাগরী) বর্ণমালার আদ্যবর্ণ বা আদি স্বরবর্ণ। এর উচ্চারণ স্থান কণ্ঠ। 'অ'-কার ১৮ প্রকার। হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত বোধে তিন প্রকার। ঐ তিন প্রকারের প্রত্যেকের উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত ভেদে তিন প্রকার এবং ঐ ৩×৩=৯ প্রকারের প্রত্যেকে অনুনাসিক ও অননুনাসিক ভেদে দুই প্রকার। এইভাবে 'অ'-কার ৩×৩×২=১৮ প্রকার। বাঙলায় এর উচ্চারণ প্রধানত তিন প্রকার। (১) বিবৃত বা স্পষ্ট (অপর), (২) 'ও'-কারের মত (অনুরোধ) এবং (৩) গ্রস্ত—যেমন পাঁচজন লোক—চ, ন ও ক-এর উচ্চারণ হল গ্রস্ত অর্থাৎ হসন্ত। নঞের প্রয়োগকালে 'অ'-এর ৬টি অর্থ হয়। যথা—(১) অভাব ঃ অবৃষ্টি—বৃষ্টির অভাব। (২) তদন্যত্ব ঃ অব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য

কোন জাতি। (৩) তদল্পতা ঃ অবোধ—অল্পবুদ্ধি। (৪) অপ্রাশস্ত্য ঃ অকার্য—অপ্রশস্ত কার্য। (৫) বিরোধ ঃ অশাস্ত্রীয়—শাস্ত্রবিরোধী, অধর্ম—ধর্মবিরোধী। (৬) তৎসাদৃশ্য ঃ অব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণ সদৃশ অন্য কোনও জাতি। খেদ অনুকম্পা ও সম্বোধনসূচক শব্দ হল 'অ'কার। এর দেবতা অচ্যুত বা বিষ্ণু, মতান্তরে ব্রহ্মা।

আ—দ্বিতীয় স্বরবর্ণ। এর উচ্চারণ স্থান হল কণ্ঠ। এর অর্থ হল নিশ্চয় জ্ঞান, স্মরণ, স্বীকার, সম্যক্, সীমা, ব্যাপ্তি, আনন্দ, আত্মা, এবং দেবতা হল শিব, ব্রহ্মা ও অনন্ত।

ই—তৃতীয় স্বরবর্ণ। এর উচ্চারণ স্থান তালু এবং অর্থ হল নিরাকরণ, নিন্দা, খেদ, কোপ, বিস্ময়, সম্বোধন, ইচ্ছা, শক্তি, ইতি। দক্ষিণ চক্ষু এবং এর দেবতা হল বামদেব।

ঈ—চতুর্থ স্বরবর্ণ। এর উচ্চারণ স্থান হল তালু এবং অর্থ হল বিষাদ, অনুকম্পা, দুঃখ প্রত্যক্ষ, নিকট। বামচক্ষু, এর অধিষ্ঠান দেবতা কন্দর্প এবং দেবী লক্ষ্মী ও কমলা।

উ—পঞ্চম স্বরবর্ণ। ওষ্ঠ হল এর উচ্চারণ স্থান এবং অর্থ হল উৎস, দয়া, বিস্ময়, নিয়োগ, পাদপূরণ, প্রশ্ন, অঙ্গীকার। চন্দ্রমণ্ডল, এর অধিষ্ঠান দেবতা শিব, মতান্তরে ব্রহ্মা এবং শক্তি বা দেবী হল উমা।

ঊ—ষষ্ঠ স্বরবর্ণ। এর উচ্চারণ স্থান ওষ্ঠ। এর অর্থ হল বাক্যারম্ভ, দয়া, রক্ষা ইত্যাদি। চন্দ্র, অধিষ্ঠান দেব হল শিব।

ঋ—সপ্তম স্বরবর্ণ। উচ্চারণ স্থান মূর্ধা এবং এর অর্থ হল নিন্দা, স্তুতিবাক্য, পরিহাস, পূজা। স্বর্গ, শক্তি বা দেবী হল বেদমাতা, দেবমাতা অদিতি।

ৠ—অষ্টম স্বরবর্ণ। মূর্ধা হল এর উচ্চারণ স্থান এবং এর অর্থ হল দৈত্য, দনু, গতি, স্মৃতি, ভয়, রক্ষা, বক্ষ, বাক্যারম্ভ। স্বর্গ, দেবতা হল শিব বা ভৈরব। দেবী বা শক্তি হল দেবমাতা অদিতি এবং দৈত্যমাতা দিতি।

ঌ—নবম স্বরবর্ণ। এর উচ্চারণ স্থান দন্ত এবং এর অর্থ হল পর্বত, ভূমি, পৃথিবী, বেদ, শক্তি, দেবমাতা অদিতি।

ৡ—দশম স্বরবর্ণ। উচ্চারণ স্থান দন্ত এবং শক্তি হল দেবনারী।

এ—একাদশ স্বরবর্ণ। এর উচ্চারণ স্থান কণ্ঠ ও তালু। এর অর্থ হল পৃথিবী, স্মৃতি, দয়া, অসুর, আহ্বান, আমন্ত্রণ, খেদ, ঘৃণা, নিন্দা, অসূয়া প্রভৃতি। এর দেবতা হল বিষ্ণু।

ঐ—দ্বাদশ স্বরবর্ণ। কণ্ঠ ও তালু হল এর উচ্চারণ স্থান এবং এর অর্থ হল সম্বোধন, আমন্ত্রণ, স্মরণ, সম্মুখবর্তী, সংযোগ, দেবতা হল শিব। অনুস্বর যোগে ঐং হল গুরুবীজ বা জ্ঞানবীজ।

ও—ত্রয়োদশ স্বরবর্ণ। এর উচ্চারণ স্থান হল কণ্ঠ ও ওষ্ঠ এবং এর অর্থ হল সম্বোধন, অভিপ্রায়, স্মরণ, দয়া, সম্ভাবনা। দেবতা হল ব্রহ্মা। 'ং' ও 'ঁ' (চন্দ্রবিন্দু) যোগে ওঁ হল মূলমন্ত্র সৃষ্টির উৎস প্রণব। ওং-এর মধ্যে তিনবর্ণ আছে, যথা—অ-উ-ম। 'অ'-তে ব্রহ্মা, 'উ'-তে বিষ্ণু, 'ম'-তে মহেশ্বর। মতান্তরে 'অ'-তে বিষ্ণু, 'উ'-তে মহেশ্বর, 'ম'-তে ব্রহ্মা। ওঁ হল নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্মের বাচক। ওঁ-এর অ হল সৎ ও বহিঃসত্তা, উ হল চিৎ ও অন্তরসত্তা এবং ম হল আনন্দ ও কেন্দ্রসত্তা। এই তিন সত্তা মিলেই হল তুরীয় সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরব্রহ্ম, পরমাত্মা, পরমেশ্বর।

ঔ—চতুর্দশ স্বরবর্ণ। এর উচ্চারণ স্থান ওষ্ঠ ও কণ্ঠ। এর অর্থ হল সম্বোধন, নির্ণয়, বিরোধ, পৃথিবী, অনন্ত। এর দেবতা হল অনন্ত। অনুস্বর যোগে ঔং হল শূদ্র জাতির প্রণব।

অং—পঞ্চদশ স্বরবর্ণ। এর উচ্চারণ স্থান হল কণ্ঠ। এর অর্থ হল বিন্দুরূপা, সূক্ষ্মরূপ বিশিষ্ট, নাদের বা ধ্বনির সূক্ষ্মতম অংশ, চিদানন্দের অণু বা বীজ, প্রাণের অণু। এর দেবতা হল সদাশিব। শক্তি বা দেবী হল ঈশানী। মতান্তরে এ পরব্রহ্মকে বোঝায় এবং এর দেবতা হল বিষ্ণু বা শ্রীকৃষ্ণ।

অঃ—এ হল ষোড়শ স্বরবর্ণ। কণ্ঠ হল এর উচ্চারণ স্থান এবং এর অর্থ হল অব্যক্ত, লয়, আকাশ, স্থিতি, নাদ ও বিন্দুর মিলন। দেবতা হল মহেশ এবং শক্তি হল মহেশ্বরী।

ব্যঞ্জনবর্ণসমূহের তত্ত্ব (অনুস্বর যুক্ত প্রতিটি ব্যঞ্জনবর্ণই এক একটি বীজ ও মন্ত্র)

ক—এ হল প্রথম ব্যঞ্জনবর্ণ। এর উচ্চারণ স্থান কণ্ঠ এবং অর্থ হল মস্তক, কেন্দ্র, মন, সুখ, জল, ধন, কাল, রাজা, দেহ, শব্দ, দীপ্তি, কেশ, রোগ ইত্যাদি। এর দেবতা হল আত্মা, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, কৃষ্ণ, ইন্দ্র, সূর্য, অগ্নি, বায়ু, যম, দক্ষ, কন্দর্প।

খ—দ্বিতীয় ব্যঞ্জনবর্ণ। এর উচ্চারণ স্থান কণ্ঠ। এর অর্থ হল আকাশ, শূন্য, স্বর্গ, সুখ, হর্ষ, ইন্দ্রিয়, পুর, নগর দেহ প্রভৃতি। এর দেবতা ব্রহ্ম বা পরশিব অথবা ইন্দ্র।

গ—তৃতীয় ব্যঞ্জনবর্ণ। কণ্ঠ হল এর উচ্চারণ স্থান এবং অর্থ হল হৃদয়, গগন, সর্বসিদ্ধি, স্মৃতি, প্রভা, বিদ্যা, গীতি। এর দেবতা হল গণেশ বা গন্ধর্ব এবং শক্তি হল দুর্গা, গৌরী, গঙ্গা, গোকুলেশ্বরী, ভগবতী প্রভৃতি।

ঘ—চতুর্থ ব্যঞ্জনবর্ণ। এর উচ্চারণ স্থান কণ্ঠ এবং এ ঘণ্টা, ঘুঙুর, ঘর্ঘর শব্দ, ঘট প্রভৃতিকে বোঝায়। এর দেবতা হল অধর্ম।

ঙ—পঞ্চম ব্যঞ্জনবর্ণ। এর উচ্চারণ স্থান কণ্ঠ। একে অনুনাসিক বর্ণ বলে। এর অর্থ হল সংসার, বিষয়-আশয়, আমার ইত্যাদি। এর দেবতা হল ভৈরব, চণ্ডা ও মদ, নীলকণ্ঠ, মহানন্দ, দুর্দ্ধর, চন্দ্রমা, অংশুক। এর শক্তি হল শঙ্খী, একরুদ্রা, দক্ষণখা, খর্পরা, কান্তি, মন্ত্রশক্তি, ধীরা, একনেত্রা, জ্যোতি, কামেশী, মায়া, জ্বালিনী, বিষয়স্পৃহা প্রভৃতি।

চ—ষষ্ঠ ব্যঞ্জনবর্ণ। উচ্চারণ স্থান তালু এবং অর্থ হল সমুচ্চয়, অবধারণ, পাদপূরণ, সমাহার। এর দেবতা হল চন্দ্র, চণ্ডেশ্বর ও কূর্ম।

ছ—সপ্তম ব্যঞ্জনবর্ণ। উচ্চারণ স্থান তালু। এর অর্থ হল নির্মল, তরল, ছেদক। এর দেবতা হল লক্ষ্মী।

জ—অষ্টম ব্যঞ্জনবর্ণ। এর উচ্চারণ স্থান হল তালু এবং এর অর্থ হল উৎপত্তি, সৃষ্টি, জয়, জনক। এর দেবতা শিব বা বিষ্ণু।

ঝ—নবম ব্যঞ্জনবর্ণ। এর উচ্চারণ স্থান তালু। এ দৈত্যরাজ, ঝঞ্ঝাবাত, ধ্বনিকে বুঝায়। এর দেবতা হল বৃহস্পতি।

ঞ—দশম ব্যঞ্জনবর্ণ। এর উচ্চারণ স্থান তালু। একে অনুনাসিক বর্ণ বলে। এর অর্থ ষাঁড়, ধর্মভ্রষ্ট, ক্রুদ্ধ ব্যক্তি। এর দেবতা হল দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য। তন্ত্রে এর নাম হল কুণ্ডলী, কৌমারী, স্তুতিকারী, চন্দনেশ্বরী, বাক্, বিশ্বা, বোধনী, বিরজা, বুদ্ধি, পুষ্পধন্বা, নাগ, বিজ্ঞানী প্রভৃতি। সঙ্গীতবিদ্যা বলতেও একে বোঝায়।

ট—একাদশ ব্যঞ্জনবর্ণ। এর উচ্চারণ স্থান মূর্ধা এবং অর্থ হল বিমাতা, পৃথিবী, পদ, ধনুকের টংকার। এর দেবতা হল শিব বা বামন।

ঠ—দ্বাদশ ব্যঞ্জনবর্ণ। এর উচ্চারণ স্থান মূর্ধা এবং এর অর্থ হল শূন্য, অন্তরীক্ষ, চন্দ্রের প্রতিরূপ, দীর্ঘস্বর, দৃশ্য প্রভৃতি। দেবতা হল শিব বা মহেশ্বর।

ড—ত্রয়োদশ ব্যঞ্জনবর্ণ। মূর্ধা হল এর উচ্চারণ স্থান এবং এর অর্থ হল ডমরু, শব্দ, বারবানল ইত্যাদি। এর অধিষ্ঠান দেবতা হল শিব বা শঙ্কর।

ঢ—চতুর্দশ ব্যঞ্জনবর্ণ। এর উচ্চারণ স্থান হল মূর্ধা এবং অর্থ হল জয়ঢাক, কুকুর, কুকুরের ল্যাজ, শব্দ ইত্যাদি। ডমরুপাণি হল এর অধিষ্ঠান দেবতা।

ণ—পঞ্চদশ ব্যঞ্জনবর্ণ। এর উচ্চারণ স্থান হল মূর্ধা এবং অর্থ হল নির্ণয়, জ্ঞান, ভূষণ, জলাশয়, দিব্যপ্রেম প্রভৃতি। তন্ত্রের ভাষায় এর অর্থ নির্গুণ, রতি, জ্ঞান, আসক্তি, পক্ষিবাহন প্রভৃতি। এর অধিষ্ঠান দেবতা হল নির্বিশেষ ব্রহ্ম।

ত—ষোড়শ ব্যঞ্জনবর্ণ। এর উচ্চারণ স্থান দন্ত। 'ত'-বর্গের পাঁচটি বর্ণকেই দন্ত্যবর্ণ বলে। এর অর্থ অমৃত, ক্রোড়, ত্বক, লাঙ্গুল, চৌর, ম্লেচ্ছ, তরণ, আগা, অনুমান, অনুরোধ ইত্যাদি। এর অধিষ্ঠান দেবতা হল হরি।

থ—সপ্তদশ ব্যঞ্জনবর্ণ। উচ্চারণ স্থান দন্ত এবং অর্থ হল সুমেরু পর্বত, রক্ষক, রোগ, স্থিতি, অচল, নিশ্চেষ্ট, হৃতভস্ব, বিধি, কূলকিনারা। অধিষ্ঠান দেবতা হল পরশিব।

দ—অষ্টাদশ ব্যঞ্জনবর্ণ। উচ্চারণ স্থান হল দন্ত। এর অর্থ হল পর্বত, দান, দাতা, দক্ষিণা, পবিত্রতা, অতল বিপদ, ঝঞ্ঝা, দয়া, দমন বা ইন্দ্রিয় সংযম। অধিষ্ঠান দেবতা হল যম।

ধ—ঊনবিংশতি ব্যঞ্জনবর্ণ। এর উচ্চারণ স্থান দন্ত এবং এর অর্থ হল ধন, ধর্ম, পৃথিবী, ধারণা। এর অধিষ্ঠান দেবতা হল বিধাতা বা ধনেশ্বর কুবের।

ন—বিংশতি ব্যঞ্জনবর্ণ। নাসিকা ও দন্ত সংযোগে এ উচ্চারিত হয়। এ 'ত'-বর্গের পঞ্চম বা শেষ বর্ণ। এর অর্থ চক্ষু, অনাদি, সাদৃশ্য, নিষেধ, অভাব, পার্থক্য, ক্ষুদ্রতা, সংকীর্ণতা, বিরোধিতা। দয়া, নূতন, নয়, বন্ধন, তরী প্রভৃতি অর্থেও এ ব্যবহৃত হয়। এর অধিষ্ঠান দেবতা শিব বা বামন। মতান্তরে গণেশ। বৌদ্ধ ও নির্বাণ অর্থেও এর ব্যবহার আছে।

প—একবিংশতি ব্যঞ্জনবর্ণ। এর উচ্চারণ স্থান ওষ্ঠ। 'প' বর্গের পাঁচটি বর্ণকেই ওষ্ঠ্যবর্ণ বলে। এর অর্থ বায়ু, রাজা, পত্র, ডিম্ব, পান করা প্রভৃতি। এর অধিষ্ঠান দেবতা ধনেশ্বর কুবের।

ফ—দ্বাবিংশতি ব্যঞ্জনবর্ণ। এর উচ্চারণ স্থান ওষ্ঠ। এর অর্থ যজ্ঞ, উৎসর্গ, স্ফীতি, ঝঞ্ঝা, কটূক্তি, বৃথাবাক্য প্রভৃতি। বাত ও কফজনিত বিকার ও ব্যাধি অর্থেও এর ব্যবহার হয়। অধিষ্ঠান দেবতা হল কালাগ্নি।

ব—ত্রয়োবিংশতি ব্যঞ্জনবর্ণ। এর উচ্চারণ স্থান ওষ্ঠ এবং এর অর্থ হল বক্ষ, বাহু, বাসস্থান, সাদৃশ্য। বং জলতত্ত্বের বীজ। স্বাধিষ্ঠান পদ্মের কর্ণিকা মধ্যে এর অবস্থান। এর অধিষ্ঠান দেবতা হল বরুণ এবং অধিষ্ঠাত্রী শক্তি হল রাকিনী।

ভ—চতুর্বিংশতি ব্যঞ্জনবর্ণ। এর উচ্চারণ স্থান ওষ্ঠ এবং অর্থ হল গ্রহ, নক্ষত্র, রাহু, সংখ্যা, ভ্রমর ও তার গুঞ্জন, ভ্রান্তি, ভীতি, মোহ, আসক্তি, প্রীতি, ভোগ, ভাব, ভাবনা, ভক্তি। এর অধিষ্ঠান দেবতা হল শুক্রাচার্য।

ম—পঞ্চবিংশতি ব্যঞ্জনবর্ণ। এর উচ্চারণ স্থান ওষ্ঠ এবং এর অর্থ হল চন্দ্র, কাল, মন্ত্র, মহৎ, পরিমাপ, গরল, হিংসাবৃত্তি। এর অধিষ্ঠান দেবতা হল ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও যম। শক্তি হল মাতা শিবানী।

য—ষড়বিংশতি ব্যঞ্জনবর্ণ। এর উচ্চারণ স্থান তালু। এর অর্থ যোগ, বায়ু, যশ, সংযম ইত্যাদি। যং বায়ুতত্ত্বের বীজ। অনাহত পদ্মের কর্ণিকা মধ্যে এ অবস্থিত। এর অধিষ্ঠান দেবতা হল বাসুদেব এবং অধিষ্ঠাত্রী শক্তি হল কাকিনী। এর কৃপাতেই মানুষ নাম যশ খ্যাতি লাভ করে।

র—সপ্তবিংশতি ব্যঞ্জনবর্ণ। এর উচ্চারণ স্থান হল মূর্ধা। এর অর্থ হল অগ্নি, কামনা, তাপ, স্বর্ণ, বর্ণ, জাতি, প্রেরণা, গতি, সূক্ষ্মতা, প্রতীক্ষা। রং তেজতত্ত্বের বীজ। এ মণিপুর চক্রের পদ্মের কর্ণিকা মধ্যে অবস্থিত। এর দেবতা কালাগ্নি। মতান্তরে রাম। এর শক্তি হল লাকিনী।

ল—অষ্টাবিংশতি ব্যঞ্জনবর্ণ। দন্ত হল এর উচ্চারণ স্থান এবং এর অর্থ হল গ্রহণ, লয়, দান, দিব্যজ্ঞান ইত্যাদি। লং পৃথ্বীতত্ত্বের বীজ। মূলাধার পদ্মের কর্ণিকা মধ্যে এ অবস্থিত। এর অধিষ্ঠান দেবতা হল স্বয়ম্ভু শিব। শক্তি হল ডাকিনী, মতান্তরে মহালক্ষ্মী অথবা গৌরী।

ব—ঊনত্রিংশৎ ব্যঞ্জনবর্ণ। এর উচ্চারণ স্থান ওষ্ঠ এবং এর অর্থ হল বুদ্ধি, বুদ্ধ, ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মজ্ঞ, ব্রহ্মর্ষি, ব্রজধাম, গরুড় (বিষ্ণুর বাহন)। এর অধিষ্ঠান দেবতা হল ব্রহ্ম ও ব্রহ্মা।

শ—ত্রিংশৎ ব্যঞ্জনবর্ণ। এর উচ্চারণ স্থান হল তালু। এর অর্থ হল শাসক, নিয়ন্তা, গুরু, সীমা, অস্ত্র, ধর্ম, কল্যাণ, নিদ্রা, শতক। এর দেবতা হল আনন্দময় শিব বা শঙ্কর।

ষ—একত্রিংশ ব্যঞ্জনবর্ণ। মূর্ধা হল উচ্চারণ স্থান এবং এর অর্থ হল শেষ, ধ্বংস, ক্ষতি, সুপ্তি, শিক্ষক, ধৈর্য, শ্রেষ্ঠ, শোভন, বোধন, বিজ্ঞ, স্বর্গ, মুক্তি। গুরু হল এর অধিষ্ঠান দেবতা।

স—দ্বাত্রিংশ ব্যঞ্জনবর্ণ। দন্ত হল এর উচ্চারণ স্থান। এর অর্থ হল সত্য, জীবাত্মা, বায়ু, প্রভা, দীপ্তি, সহিষ্ণুতা, সমতা, সৌন্দর্য, সংজ্ঞান, ভৃগু, চন্দ্র। এর অধিষ্ঠান দেবতা হল শিব বা বিষ্ণু।

হ—ত্রয়োত্রিংশ ব্যঞ্জনবর্ণ। এর উচ্চারণ স্থান হল কণ্ঠ এবং অর্থ হল সম্বোধন, নিন্দা, নিয়োগ, কোপ, নিগ্রহ, চিন্তন, মৃত্যু, উপদেশ, ধারণা, হরণ, হত্যা, রক্ত। হং ব্যোমতত্ত্বের বীজ। কণ্ঠস্থিত বিশুদ্ধ পদ্মমধ্যস্থ ত্রিকোণ বীজকোষে এ অবস্থিত। এর বিশেষ অর্থ হল চন্দ্র, শূন্য, আকাশ, স্বর্গ। এর দেবতা শিব (রুদ্র), বিষ্ণু, আত্মসত্তা। এর অধিষ্ঠাত্রী দেবী হল হাকিনী।

ক্ষ—চতুর্ত্রিংশ ব্যঞ্জনবর্ণ। কণ্ঠ এবং মূর্ধা হল এর উচ্চারণ স্থান। এর অর্থ হল নিবৃত্তি, নিঃসৃত, ক্ষমা প্রভৃতি। ক্ষং পরাশক্তি বীজ। এ ভ্রূমধ্যস্থ আজ্ঞাচক্রের বামদলে অবস্থিত। এর অধিষ্ঠাত্রী দেবী বা শক্তি হল সর্বব্যাপী ব্রহ্মশক্তি, আত্মশক্তি, গুরুশক্তি, সচ্চিদানন্দময়ী মহাশক্তি। আজ্ঞাচক্রের দক্ষিণদলে অবস্থিত হল হং বীজ। এ হল পুরুষ বীজ। একেই ব্রহ্ম, আত্মা অহং বীজ বলে। আজ্ঞাচক্র হল রুদ্রগ্রন্থি বা তম ও অজ্ঞানগ্রন্থি। এই গ্রন্থিভেদ হলেই জীবের দিব্যজ্ঞান লাভ হয় অর্থাৎ প্রজ্ঞানেত্র খুলে যায়। এই চক্রকে গুরুচক্র বলে। গুরুকৃপায়, আত্মকৃপায় জীব এই চক্রভেদে সমর্থ হয়। দিব্যজ্ঞান লাভ করে, এই চক্র ভেদ করে জীব (সাধক) ত্রিগুণের বন্ধন মুক্ত হয় এবং দ্বন্দ্ব ও মোহের অতীত অমৃতময় পরমতত্ত্বের অনুভূতি লাভ করে। অর্থাৎ তখন জীবত্বের বা ভেদজ্ঞানের অবসান হয়।

হংসঃ (অ+হং+সঃ) হল যুগল মন্ত্র। হং হল যুগল মন্ত্র। হং হল সত্তা, পুরুষ বা প্রজ্ঞান ও বোধি এবং সঃ হল শক্তি, প্রকৃতি বা মন ও বুদ্ধি। সত্তা-শক্তি বা পুরুষ-প্রকৃতির যুগল হল শিবকালী, লক্ষ্মীনারায়ণ, সীতারাম, রাধাকৃষ্ণ বা আমি তুমি। ক্লীং হল কামবীজ কীলক। হংসঃ মন্ত্রজপের মাধ্যমে কামবীজ নাশ হয় অর্থাৎ হৃদয়ের দ্বার খুলে যায়। তখন হংসঃস্বরূপ আত্মার উপলব্ধি হয়। অখণ্ড ভূমা আত্মার স্বরূপ অবগত হলেই জীব পরমহংস অবস্থা প্রাপ্ত হয়। হংসঃ মন্ত্র জপ ও ধ্যানের পদ্ধতি হল—

(১) হংসঃস্বরূপ পরমব্রহ্ম পরমাত্মা পরমেশ্বরের মধ্যে আমি এবং আমার মধ্যে পরমব্রহ্ম পরমাত্মা পরমেশ্বর। পুনঃপুনঃ এইরূপ ভাবনার ফলে সাধকের ব্যষ্টিভাব ও বোধসমষ্টি ঈশ্বরীয় ভাব ও বোধের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে যায়। অর্থাৎ হৃদয়ের গ্রন্থি ছিন্ন হয় এবং সর্বসংশয় বিদূরিত হয়। তখন অনির্বচনীয় ব্রহ্ম আত্মা ঈশ্বরানন্দে সাধক নিমগ্ন হয়।

(২) আমি শক্তি এবং তুমি সত্তা অথবা তুমি শক্তি এবং আমি সত্তা, উভয়ের সংযুক্ত অভেদ নিত্যরূপই হল হংসঃ রূপ। অখণ্ড সত্তার বক্ষে অখণ্ড শক্তির অথবা অনন্ত শক্তির সঙ্গে অখণ্ড সত্তার যে অভেদ লীলাবিলাস তা-ই হল প্রজ্ঞানের বিজ্ঞানময় অভিব্যক্তি। এই হংসঃস্বরূপই হল অমৃতময় আত্মা।

(৩) হংসঃ হল জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলিত রূপ। হং হল জীবাত্মা এবং সঃ হল পরমাত্মা। আমি এই হংসঃ-স্বরূপ নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত আত্মা এইরূপ ভাবনা দ্বারা সাধক সচ্চিদানন্দস্বরূপের অনুভূতি লাভ করে।

হংসঃ মন্ত্রের বিকল্প হল সোহং মন্ত্র। এই মন্ত্রকেই ব্রহ্ম মন্ত্র বলা হয়। সোহং-এর অর্থ আমি সেই সচ্চিদানন্দঘন পরমব্রহ্ম, পরমাত্মা, পরমেশ্বর। আমি নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত অজর অমর অপাপবিদ্ধ অনঙ্গ অসঙ্গ অভঙ্গ অখণ্ড। আমি দ্বন্দ্বাতীত ভেদাতীত ভাবাতীত শাশ্বত অচ্যুত নিত্য নির্বিকার অদ্বয় অব্যয় অমৃতময় আত্মা বা ব্রহ্মস্বরূপ।

বিচার পূর্বক সোহং মন্ত্রের জপ ও ধ্যান কালে সোহং-এর সহ অংশের বিলয় হয়। তখন থাকে শুধু ওঁ। এই ওঁ-এর সঙ্গে সাধকের তাদাত্ম্য হয়। তখন সাধকের ব্রহ্মানুভূতি লাভ হয়। এই অনুভূতি লাভ হলে সাধক পূর্ণ পরমহংস অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হয়। শিবোহং, ব্রহ্মাস্মি, প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম, অয়মাত্মা পরমব্রহ্ম প্রভৃতি মন্ত্রের তাৎপর্য সমান। ওঁ গুরু, ওঁ মা, ওঁ ব্রহ্ম আত্মা, ওঁ শিব, ওঁ রাম, ওঁ হরি, ওঁ নমঃ প্রভৃতি মন্ত্রের অর্থ সমান।

অদ্বয়তত্ত্ব বা বোধের পরিচয় এবং মন্ত্র হল সোহং। সত্তাশক্তি যুগলতত্ত্বের পরিচয় ও মন্ত্র হল হংসঃ। সোহং হল অখণ্ড বোধের বাচক এবং হংসঃ হল সমষ্টি প্রাণের বাচক। সোহং হল নির্গুণ কেন্দ্রসত্তা এবং হংসঃ হল সগুণ অন্তর ও বহিঃপ্রকৃতির অভেদ রূপ। মন ও প্রাণের সংযুক্ত রূপই হল হংসঃ রূপ এবং মন ও বিশুদ্ধবোধের সংযুক্ত রূপ হল সোহং রূপ।

প্রণব বা নাদব্রহ্মের বিজ্ঞান হল হংসঃ মন্ত্র। পরমব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং পরশিবের মন্ত্র হল সোহং বা শিবোহং বা ব্রহ্মাস্মি। সমগ্র চিৎসত্তা ও সমগ্র চিৎশক্তি অর্থাৎ জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি সংযুক্ত তত্ত্ব হল নির্গুণ ও সগুণের একক রূপ। তাঁকেই নির্গুণগুণী বলা হয়। নির্গুণগুণীর তত্ত্ব এবং মন্ত্রই হল সোহং হংসঃ বা হংসঃ সোহং।

বর্ণমালাগুলিকে অক্ষর বলা হয়। এ হল অমৃতময় চৈতন্য উপাদানের সূক্ষ্মতম ও সঙ্কুচিত স্পন্দন। এ অব্যয় অবিনাশী। এই স্পন্দনগুলি পরস্পর মিলিত হয়েই জীবজগৎ রূপ ধারণ করে, পরস্পর পরস্পরকে বরণ করে পূর্ণতা প্রকাশ করে বলেই এদেরকে বর্ণ বলে। প্রতি বর্ণই এক একটি মূল মন্ত্র। আবার সংযুক্ত বর্ণও এক একটি মন্ত্র।

মন্ত্রের রহস্য

বর্ণমালাগুলি হতেই বহুবিধ মন্ত্র উৎপন্ন হয়েছে। মন্ত্র তিন প্রকার, যথা—পুং মন্ত্র, স্ত্রীং মন্ত্র এবং নপুংসক। যে মন্ত্রের দেবতা পুরুষ অথবা জ্ঞানশক্তি তাকে পুং মন্ত্র বলে। হুং বা ফট্ যে-মন্ত্রের শেষে উচ্চারিত হয় তা-ই পুং মন্ত্র। যে-মন্ত্রের দেবতা হল প্রাণশক্তি বা ক্রিয়াশক্তি তাকে স্ত্রীং মন্ত্র বা শক্তি মন্ত্র বলে। শক্তি মন্ত্রের শেষে স্বাহা উচ্চারিত হয়। যে-মন্ত্রের শেষে নমঃ যুক্ত থাকে তা নপুংসক। তা ছাড়া আর সব মন্ত্র হল মহানাম ও মহামন্ত্র। পিতৃপুরুষের উদ্দেশে যে-সকল মন্ত্র ব্যবহৃত হয় তার সঙ্গে স্বধা যুক্ত থাকে। হুং মন্ত্র ব্রহ্মের বাচক আবার শক্তি বাচক, তারা বীজমন্ত্র রূপেও ব্যবহৃত হয়। ঐং হল গুরুমন্ত্র ও গুরুবীজ। হ্রীং হল দুর্গামন্ত্র ও দুর্গাবীজ বা রাধামন্ত্র ও রাধাবীজ। শ্রীং হল পরাশক্তি মন্ত্র। দুর্গা ও রাধার মন্ত্ররূপে অথবা হ্রীং মন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত করেও তা ব্যবহৃত হয়। ক্রীং মন্ত্র হল কালী মন্ত্র ও কালীবীজ। ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং ক্রীং একত্র করে হয় সমগ্র আদ্যাশক্তি মন্ত্র। ওঁ সৎ একব্রহ্ম সোহম অস্মি এই হল ব্রহ্মমন্ত্র বা পরমাত্ম মন্ত্র।

প্রত্যেক দেবদেবীর নিজস্ব মন্ত্র আছে। প্রতি মন্ত্রের মধ্যে তিনটি ভাগ আছে। প্রথম ভাগ হল মন্ত্রের রূপ অর্থাৎ দেবদেবীর রূপ, দ্বিতীয় ভাগ হল মন্ত্রের অন্তর্নিহিত শক্তি এবং তৃতীয় ভাগ হল মন্ত্রের বিশেষ ক্রিয়াপদ্ধতি। মন্ত্রের অন্তর্নিহিত সূক্ষ্ম শক্তির দ্বিবিধ ক্রিয়া, যথা—ধ্বন্যাত্মক ও ঋণাত্মক (positive and negative force)। একটি শক্তি হল স্থূল অর্থবোধক এবং অপরটি সূক্ষ্ম অর্থবোধক। প্রত্যেক মন্ত্রের মধ্যে বোধ ভাব সংজ্ঞা বা নাম ও রূপ নিহিত আছে। বর্ণমালা বা মন্ত্রশক্তি দ্বারা বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি লয় সাধিত হয়।

মন্ত্রশক্তির চতুর্বিধ অভিব্যক্তি হল সূক্ষ্মতম, সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্ম ও স্থূল। সূক্ষ্মতম রূপে এ-ই অধিযজ্ঞ এবং তুরীয় সত্তার স্বরূপ। সূক্ষ্মতর রূপে এ হল অধ্যাত্ম এবং কেন্দ্র সত্তার স্বরূপ। সূক্ষ্মরূপে এই অধিদৈব ও অন্তরশক্তির স্বরূপ এবং স্থূলরূপে অধিভূত বা বহিঃসত্তা। অর্থাৎ তুরীয়তে এর স্বরূপ হল প্রজ্ঞানাত্মা, কেন্দ্রসত্তারূপে এ সাক্ষী আত্মা, অন্তরসত্তায় অধ্যাত্ম বা বিজ্ঞানাত্মা, ইন্দ্রিয়শক্তি রূপে অধিদৈব এবং ইন্দ্রিয়ের বিষয় স্থূলভূত রূপে অধিভূত।

তুরীয়তে এ-ই পরমবোধি বা বোধস্বরূপ, কেন্দ্রে এ-ই মন ও বুদ্ধিস্বরূপ, অন্তরে প্রাণস্বরূপ এবং বাইরে স্থূল দেহ বা আধার।

মন্ত্রের অর্থভাবনাই হল মন্ত্রচৈতন্য। একেই মন্ত্রের জাগরণ বলে। মন্ত্রই হল মনের স্রষ্টা ও ত্রাতা উভয়ই। মন্ত্রজ্ঞ ও মন্ত্রবিদ্ হওয়ার অর্থ সমগ্র মন্ত্রের বোধের সঙ্গে তাদাত্ম্য লাভ করা। ভূতশক্তি ও ভূতভাবকে নিয়ন্ত্রণ করে কতগুলি মন্ত্র, দেবশক্তি ও দেবভাবকে নিয়ন্ত্রণ করে কতগুলি মন্ত্র এবং ঈশ্বরীয় শক্তি ও ভাবকে নিয়ন্ত্রণ করে কতগুলি মন্ত্র। মন্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব ও তার ব্যবহারবিজ্ঞান অনুভবসিদ্ধ সাধকদের কাছ থেকে জানা যায়। নিজের খুশিমত মন্ত্র ব্যবহার করে কোন ফল পাওয়া যায় না। বীজমন্ত্র ও নামের মধ্যে ব্যবহারিক ভেদ থাকলেও তত্ত্বত কোন ভেদ নেই। সদ্‌গুরু প্রদত্ত মন্ত্রবিদ্যা সাধনের দ্বারা খুব তাড়াতাড়ি মন্ত্রের ফল পাওয়া যায়।

মন্ত্রশক্তি

মন্ত্রের শুভ ও অশুভ দুই রকম শক্তি আছে। মন্ত্রের সিদ্ধি হল মন্ত্রের শক্তি লাভ। এই শক্তি দ্বারা সাধক অসাধ্য সাধন করতে পারে। প্রতি মন্ত্রের নিজস্ব রূপ, বর্ণ, জ্যোতি, শক্তি ও বিশেষ ক্রিয়াপদ্ধতি আছে। মন্ত্রের রূপকেই দেবদেবী বলা হয় এবং তার শক্তিকেই অধিদৈব বলা হয়। যার মাধ্যমে মন্ত্র সাধিত হয় তাকেই অধ্যাত্ম বলে। ব্যষ্টিমনকে সমষ্টিমন বা ঈশ্বর আত্মার সঙ্গে যুক্ত করে দেয় বলে মন্ত্রগুলির তাৎপর্য অতীব রহস্যপূর্ণ। ব্যষ্টিমনকে ত্রাণ করে বলেই একে মন্ত্র বলে। অর্থাৎ ব্যষ্টিমন ও বুদ্ধিকে পরমবোধি বা আত্মার সঙ্গে এ মিলিয়ে নেয়।

গুরুই মন্ত্রসিদ্ধির সহায়ক

সর্বমন্ত্রেরই পরিণাম হল ওঁকার। অনুমানের দ্বারা মন্ত্রের তাৎপর্য জানা যায় না। গুরু-নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে সাধন করলে মন্ত্রের স্বরূপ ও শক্তি অনুভবগম্য হয়। মন্ত্রের শক্তি দ্বিবিধ ফল দান করে—(১) কর্মজ সিদ্ধি অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ দ্বারা ব্যবহারিক জগতে উন্নতি। এ অস্থায়ী ও পরিণামী। (২) জ্ঞানজ সিদ্ধি অর্থাৎ পরমবোধের বিকাশের দ্বারা অখণ্ড ভূমা সচ্চিদানন্দস্বরূপের অনুভূতি ও তদ্‌বোধে প্রতিষ্ঠা। এ শাশ্বত নিত্য অপরিণামী।

তপস্যার তাৎপর্য

উভয়বিধ সিদ্ধি অভ্যাস সাপেক্ষ। লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রেখে নিষ্ঠা সহকারে পুনঃপুনঃ কোন কিছু সাধন করাকেই অভ্যাস বলে। অভ্যাস দৃঢ় হলেই তা তপস্যায় পরিণত হয়। তপস্যার ফলেই সিদ্ধিলাভ হয়। শাস্ত্রজ্ঞান বর্জিত অভ্যাস অপেক্ষা শাস্ত্রজ্ঞান শ্রেষ্ঠ। শাস্ত্রজ্ঞান অপেক্ষা ধ্যান শ্রেষ্ঠ। ধ্যান অপেক্ষা কর্মফল-ত্যাগ শ্রেষ্ঠ। ত্যাগেতেই পরাশান্তি প্রতিষ্ঠিত।

কর্মফলে অনাসক্ত কর্মই হল নিষ্কাম কর্ম[১]। নিষ্কাম কর্মের সাধনকেই কর্মযোগ বলে। কর্মযোগে চিত্ত শুদ্ধ হয় এবং ধ্যানযোগের উপযোগী হয়। শুদ্ধ চিত্তে ধ্যানযোগ সাধিত হলে মন অ-মন অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তখন মনের ঊর্ধ্বে যে বিশুদ্ধ আনন্দস্বরূপ অপরিণামী আত্মা আছে তাঁর দর্শন ও উপলব্ধি হয়। আত্মদর্শন ও আত্মজ্ঞান লাভে সর্বতত্ত্বের সাক্ষাৎ পরিচয় মেলে। ত্যাগে প্রতিষ্ঠিত হলে জ্ঞানসিদ্ধি হয় অর্থাৎ অমৃতময় নির্গুণব্রহ্মের সাক্ষাৎ হয়।

প্রেমভক্তির সাধনায় প্রথমে সগুণ ঈশ্বরের অনুভূতি হয়, পরে নির্গুণতত্ত্বের উপলব্ধি হয়। পরিশেষে নির্গুণ গুণী পুরুষোত্তমের সঙ্গে নিত্যযোগে প্রতিষ্ঠা হয়। পরাভক্তি ও পরাজ্ঞান সমান। প্রেমভক্তি ও জ্ঞানযোগ সর্বোত্তম অধিকারীর জন্য। ধ্যানযোগ হল মধ্যম অধিকারীর জন্য। কর্মযোগ ও মন্ত্রযোগ হল সাধারণ অধিকারীর জন্য।

১। তত্ত্ব সমাধান।

সাধনার উৎকর্ষের ফলে মন্ত্রের সাধক সমপর্যায়ে ধ্যানযোগ ও জ্ঞানযোগে সিদ্ধিলাভ করে এবং পরিণামে পরাভক্তি ও পরাজ্ঞান লাভ করে সর্বোত্তম পদ প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ অমৃতস্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়।

পরমসত্য নিত্য এক। এ সর্বব্যাপী এবং সর্বভূতে ওতপ্রোত আছে। এই পরমসত্যই পরমতত্ত্ব। ব্রহ্ম আত্মা ঈশ্বর মহান প্রভৃতি এর ভিন্ন ভিন্ন নাম মাত্র এবং কর্ম যোগ জ্ঞান ভক্তি প্রভৃতি এরই ভিন্ন ভিন্ন সাধন পদ্ধতি। সাধকের প্রকৃতি, রুচি ও সামর্থ্যের তারতম্য অনুসারে এক প্রজ্ঞানঘন পরমতত্ত্বই ভিন্ন ভিন্ন নামে গৃহীত হয় এবং তার অখণ্ড এক বিজ্ঞানই ভিন্ন ভিন্ন সাধন পদ্ধতি রূপে ব্যবহৃত হয়।

জ্ঞানীর লক্ষ্য পরমব্রহ্ম। তার সাধন পদ্ধতি হল জ্ঞানবিচার, নেতিমূলক যুক্তি ও প্রমাণ। এর সিদ্ধির লক্ষণ সমজ্ঞান ও সমদৃষ্টি। যোগীর লক্ষ্য পরমাত্মা। এর সাধন পদ্ধতি হল ধ্যান এবং সিদ্ধির লক্ষণ হল সমত্বজ্ঞান। নিষ্কাম কর্মীর সাধ্য মহৎ শান্তি। এর সাধন পদ্ধতি হল অসত্য বর্জন, সত্যের গ্রহণ, ধারণ ও পরিবেশন এবং সুখাসক্তি বর্জন। এর সিদ্ধির লক্ষণ হল চিত্তশুদ্ধি ও প্রজ্ঞাস্থিতি। ভক্তের আরাধ্য পরম প্রেমাস্পদ নির্গুণ গুণী ঈশ্বর। এর সাধন পদ্ধতি হল সেবানুশীলন ও আত্মসমর্পণ এবং এর সাধন সিদ্ধির লক্ষণ হল অখণ্ড প্রেমানন্দে প্রতিষ্ঠা। [৬।৫।৬৮]

নিত্য অদ্বৈতের বক্ষে চিতিমাতার দ্বৈতবিলাসের ক্রম

সচ্চিদানন্দময়ী মায়ের বক্ষে অর্থাৎ সমগ্র ব্রহ্ম আত্ম সত্তার বক্ষে চিতিমাতার সচ্চিদানন্দবিলাস নিরন্তর যে ভঙ্গিমায় সাধিত হয় তারই অংশবিশেষ বহির্জগৎ এই বৈচিত্র্যময় নামরূপের বিশ্ব। তার অন্তরে সূক্ষ্মতর বা কারণের স্তর, তারও উর্ধ্বে হল নিত্য তুরীয় স্তর পরম অব্যক্ত। এই পরম অব্যক্ত হল সমগ্র পরমতত্ত্বস্বরূপের তিন-চতুর্থাংশ। এখানে কোন বিকল্প বিকার বা গুণাদির ক্রিয়া সম্ভব নয়। এ হল কারণাতীত কারণ মহাকারণের স্তর। মহাকারণের কোন প্রতিপক্ষ বা বিকল্প নেই। মহাকারণের স্বরূপই হল পরমতত্ত্বস্বরূপ—পরমাত্মা, পরমব্রহ্ম পরমেশ্বরের স্বরূপ। এ হল গুণাতীত নির্গুণ নির্দ্বন্দ্ব ভাবাতীত ভেদাতীত নিত্যপূর্ণ অখণ্ড অদ্বৈত।

এই মহাকারণের কার্যরূপ হল সগুণ ঈশ্বর বা সগুণ ব্রহ্ম। তাঁর স্বভাবশক্তির নামই ত্রিগুণা প্রকৃতি। বেদান্তের ভাষায় এ-ই হল মায়া অবিদ্যা অজ্ঞান কল্পিত কল্পনা। এর অভিনব লীলাবিলাস বা বিস্তারই হল জগৎ সংসার। অদ্বয় ব্রহ্ম আত্মার বক্ষেই এই মায়াবিলাস অভিনব ভঙ্গিমায় প্রতিভাত হয়। এই সংসার মায়া; জ্ঞানীর ভাষায় ব্রহ্ম আত্মার বক্ষে কল্পিত কল্পনা ও অধ্যারোপ মাত্র। যেমন যথার্থ জ্ঞানের অভাবে স্বল্প আলোকে রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়, শুক্তিতে রজতভ্রম হয়, স্তম্ভ বা গাছের গুঁড়িতে লোক (চোর) ভ্রম হয়, এক বস্তুতে অন্য বস্তুর ভ্রম হয়, সেইরূপ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম আত্মস্বরূপের সত্যজ্ঞানের অভাবে তদ্‌বক্ষে জগৎভ্রম হয়। এই জগৎভ্রম হল মিথ্যা অধ্যারোপ।

রজ্জুজ্ঞানের উদয়ে সর্পভ্রমের নাশ হয় যেমন, সেইরূপ ব্রহ্ম আত্মজ্ঞানের উদয়ে জগৎভ্রমেরও নাশ হয়। অর্থাৎ অজ্ঞানে হয় জগৎভ্রান্তি, জ্ঞানে হয় তার অবসান। অজ্ঞানে হয় দেহবুদ্ধি অনাত্মজ্ঞান, জ্ঞানোদয়ে হয় তার অবসান। তখন আত্মজ্ঞানই স্বতঃস্ফূর্ত হয়, দেহাদি অনাত্মভাব মিথ্যা ও অসার প্রতিপন্ন হয়। যথার্থ আত্মজ্ঞানের অভাবে অনাত্ম জগৎ সংসার সত্য বলে প্রতিভাত হয় যার কাছে সেই হল অজ্ঞান আত্মা জীব। জীবভাবে জগৎ সত্য, দেহাদি অনাত্মভাব ক্রিয়াদি সত্য কিন্তু জ্ঞানোদয়ে অজ্ঞানের বিনাশে জীবই হল শিব নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত আত্মা (শুদ্ধচৈতন্য)।

জীবজগতে স্রষ্টা হল সগুণ ঈশ্বর, তিনি সমস্ত প্রকৃতির পতি এবং সমগ্র সৃষ্টির প্রভু, অধীশ্বর। জীব হল প্রকৃতির অধীন সুতরাং ঈশ্বরাধীন। ঈশ্বরের কৃপায় জীব প্রকৃতির প্রভাবমুক্ত হয়ে তার শুদ্ধ মুক্ত শিবস্বরূপে ফিরে আসে, অর্থাৎ আত্মবোধে প্রতিষ্ঠিত হয়।

পরব্রহ্ম পরমাত্মা হল মহাকারণ, ঈশ্বর হল তার কার্যরূপ, প্রকৃতি হল কারণ (আদ্যাশক্তি)। জীবজগৎ হল তার কার্য, জীব হল ভোক্তা, জগৎ হল তার ভোগ্য, ঈশ্বর হলেন তার নিয়ন্তা। কারণের মধ্যে কার্য নিহিত থাকে, সুপ্ত থাকে বীজ অবস্থায়। আবার কার্যের মধ্যে কারণ থাকে অব্যক্ত অবস্থায়। কারণ হল কেন্দ্রের স্তর, অন্তর হল জীবের স্তর, বার হল প্রকৃতির স্তর। অন্তরকে স্বভাবও বলা হয়। স্বভাব হল চেতন, প্রকৃতি হল অচেতন; জীব হল চেতন, তার ভোগ্যবস্তু প্রকৃতি হল অচেতন।

জীবের বহিঃসত্তা জগৎ, কেন্দ্রসত্তা ঈশ্বর এবং তুরীয়তে ব্রহ্ম আত্মা। প্রকৃতির, জগতের ভোক্তা জ্ঞাতা জীব। জীবজগতের জ্ঞাতা ও নিয়ন্তা হলেন ঈশ্বর এবং ঈশ্বরের ও জীবজগতের সাক্ষী হলেন ব্রহ্ম আত্মা। তত্ত্বজ্ঞানে অদ্বয়জ্ঞানে নির্গুণ ব্রহ্ম আত্মাই হল সত্য এবং জীবজগৎ হল মিথ্যা। কিন্তু দ্বৈতজ্ঞানে জীবজগৎ মিথ্যা নয়— ঈশ্বরের লীলামাধ্যম, ঈশ্বরের শক্তির অভিনব বিকাশ। অদ্বয়জ্ঞানে ঈশ্বর আত্মার নির্গুণ তত্ত্ব সিদ্ধ, কিন্তু দ্বৈতজ্ঞানে তাঁর সগুণ তত্ত্ব সিদ্ধ।

স্বানুভূতির দৃষ্টিতে ব্রহ্ম আত্মা চতুষ্পাদ অনুভবসিদ্ধ। এই চতুষ্পাদের পরিচয় হল প্রজ্ঞান ব্রহ্ম আত্মা বিজ্ঞান ঈশ্বর জ্ঞান ও জীব এবং অজ্ঞান হল জগৎ। প্রজ্ঞান হল বিশুদ্ধ জ্ঞান, প্রকৃষ্ট জ্ঞান সুতরাং গুণভাব বিবর্জিত। বিজ্ঞান হল শুদ্ধসত্ত্ব গুণ ও ভাবযুক্ত। জ্ঞান হল ত্রিগুণ ও ভাবযুক্ত অথবা জ্ঞানাভাস অর্থে এবং অজ্ঞান অর্থে ত্রিগুণ ও ভাব বিশেষত তমোরজোপ্রধান প্রকৃতিকে নির্দেশ করে।

ব্রহ্ম আত্মার চতুষ্পাদকে ভিন্ন ভিন্ন নামে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যক্ত করা হয়—যথা, তুরীয়তে অধিযজ্ঞ, কেন্দ্রে অধ্যাত্ম, অন্তরে অধিদৈব এবং বাইরে অধিভূত। প্রজ্ঞানে হল পরাচিৎ বা সম্বিৎ, বিজ্ঞানে হল চিৎ বা সম্বিৎ, জ্ঞানে হল চিদাচিৎ অথবা চিদাভাস এবং অজ্ঞানে হল অচিৎ। তুরীয়তে বোধস্বরূপ সূক্ষ্মতম নিত্যাদ্বৈত, কেন্দ্রে তা সূক্ষ্মতর, অন্তরে সূক্ষ্ম এবং বাইরে স্থূল। তুরীয় সত্তা ইন্দ্রিয়াতীত ও মরমীয়, কেন্দ্রসত্তা অতীন্দ্রিয় ও মরমীয়, অন্তরসত্তা সূক্ষ্ম ও দৈবিক, বহিঃসত্তা স্থূল ইন্দ্রিয়জ।

তুরীয়তে শুদ্ধবোধ, কেন্দ্রতে শুদ্ধভাব, অন্তরে শুদ্ধ বা দিব্য নাম, বাইরে স্থূল রূপ।

ব্রহ্ম আত্মজ্ঞান নিত্য অদ্বয়জ্ঞান, বিশুদ্ধবোধ বা সম্বিৎ মাত্র। তত্ত্বের দৃষ্টিতে একে বোধস্বরূপ, চিৎস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, সম্বিৎস্বরূপ এবং স্বসংবেদ্য স্বানুভূতি বলা হয়। স্বানুভবদেব বলতে অদ্বয় ব্রহ্ম আত্মস্বরূপকেই নির্দেশ করা হয়।

স্রষ্টা ঈশ্বর ও তাঁর সৃষ্ট জীবজগতের তত্ত্ব ও তার রহস্য দ্বৈত ভাববোধের মাধ্যমে অনুশাসিত হয় এবং অনুশীলিত ও অনুভূত হয়। অনুভূতির গভীরে তত্ত্ব ও তার রহস্য নিহিত। অনুভূতির স্বরূপই হল তত্ত্বস্বরূপ।

দ্বৈতবোধের বিজ্ঞান দ্বিবিধ ভাবে সিদ্ধ হতে পারে। দ্বিবিধ ক্রম হল অনুলোম ও প্রতিলোম—আরোহণ ও অবরোহণ। একটি হল তুরীয়কে ভিত্তি করে পর্যায়ক্রমে কেন্দ্র অন্তর ও বহিঃসত্তার জ্ঞানধারাকে অবলম্বন করে এবং অপরটি হল স্থূলকে ধরে সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতর সূক্ষ্মতমতে ক্রমপর্যায়ে এগিয়ে যাওয়া। পূর্বেরটি হল অবরোহণ গতি, পরেরটি হল আরোহণ গতি—অর্থাৎ অনুলোম ও প্রতিলোম।

চিতিমাতার চিদানন্দবিলাস হল বিশ্ববৈচিত্র্য। বিশ্বরচনা হল মায়ের স্বভাবমহিমা। সৃষ্টির প্রতি অণু-পরমাণুর মধ্যে অনুস্যূত হয়ে আছেন চিদানন্দময়ী মাতা। তাই বিশ্বভুবনমোহিনী মায়ের রূপ-নাম-ভাব-বোধের মহিমার অন্ত নেই। গানের ভাষায় বলা হয়েছে—

রূপে নামে ভাবে বোধে খেলছে মা আমার
মহিমা তাঁহার অনন্ত অপার—
বিশ্বভুবন জুড়ে বৈচিত্র্য সম্ভারে
পেতেছে মা যে নিজেই আপনার সংসার।।

জীবনস্বরূপে মা-ই যে স্বয়ং
নিজেকে নিজেই করে আস্বাদন (দরশন)
নির্গুণ সগুণ স্বভাব আপন
নিত্য নূতন ঢঙে করে ব্যবহার।।

... ...

সৃষ্টির বিজ্ঞানে মা-ই জমি, মা-ই স্বয়ং চাষী, মা-ই স্বয়ং চাষকর্ম ও বীজ, মা-ই চাষের ফসল এবং ফসলের কর্তা ভোক্তা জ্ঞাতা।

জীবননাট্যের নাট্যশালাও মা, নাটকও মা, পরিচালিকাও মা, অভিনেতা ও অভিনেত্রীও মা, অভিনয়ও মা, সম্পাদিকাও মা, দর্শকও মা এবং নাটকের রস আস্বাদনও মা এবং তার ভুলভ্রান্তি দোষত্রুটিও মা।

বিশ্বরচনার সঙ্কল্পও মা, তার বীজমন্ত্রও মা, তার কলাকুশল ও বৈচিত্র্যময় ভঙ্গিমাও মা। বর্ণমালারূপে নিজেকে প্রকাশ করে বর্ণে বর্ণে নিজের ঐশ্বর্য মাধুর্যকে ব্যক্ত করে পরস্পর বর্ণযোগে নিজেকেই নিজে বরণ করে নেন বলেই তাঁর বর্ণমালার এত মহিমা। বর্ণমালাই হল বিশ্ব সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ের বীজমন্ত্র ও বিজ্ঞান। প্রতি বর্ণের সঙ্গে প্রতি বর্ণের মিলন অভিনয়ের ফলে রূপ-নাম-ভাব-বোধের সম্প্রসারণ হয়। এভাবেই রূপে রূপে প্রতিরূপ, নামে নামে প্রতিনাম এবং বোধে বোধে প্রতিবোধের বিলাস হয়ে চলছে। স্বরবর্ণ ও ব্যাঞ্জনবর্ণ যোগে সৃষ্টির বিলাস অভিনবভাবে অনুভূত হয়। এই অনুভূতির বিজ্ঞানের পরিণামই আত্মানুসন্ধান, শুদ্ধাভক্তি ও শুদ্ধজ্ঞানরূপে অভিব্যক্ত হয়। তত্ত্ববিজ্ঞানের বিশ্লেষণ কালে প্রতি বর্ণের পরিচয় হতে ভাষা বিন্যাসের নিগূঢ় তাৎপর্যকেই স্থানবিশেষে সুচারুরূপে নির্দেশ করা হয়েছে তার মর্যাদাবোধের গাম্ভীর্যকে রক্ষা করে।

মাতৃ অঙ্গে বর্ণের বিন্যাস ও বিলাস

অ হতে হ পর্যন্ত অহ—অধিদৈব। সবই বহিঃশক্তির অভিব্যক্তি অর্থাৎ নামরূপের অভিব্যক্তি। তার মধ্যে অহংকার হল অধ্যাত্ম।

অহং হল অধ্যাত্ম বা অন্তর। 'অহ' অনুস্বর যুক্ত হয়ে অন্তরকে বোঝায়। শুধু 'অহ' বলতে বারকে বা ব্যক্ত অবস্থাকে অর্থাৎ বৈচিত্র্যকে বোঝায়। 'অহ' অর্থে দিনকেও বোঝায়।

অধিভূত অর্থ ক্ষরপুরুষ বা স্থূল রূপ বা দেহ। অধিভূত হল ভূতের বা প্রকাশের নিকটে, সম্মুখে এবং সাথে সংযুক্ত।

অধিদৈব অর্থ হল প্রকৃতির অন্তর্নিহিত শক্তি, ইন্দ্রিয়জ শক্তি, ইন্দ্রিয় বা করণ অর্থাৎ মাধ্যম। অধিদৈব হল অন্তরের বা ভিতরের প্রকাশের নিকটে, সম্মুখে এবং সাথে সংযুক্ত।

অধ্যাত্ম অর্থ চৈতন্যশক্তি বা স্বভাবাত্মা। অধ্যাত্ম হল অন্তর ও বাইরের নিয়ন্তা অন্তঃকরণ। স্বভাব হল ইন্দ্রিয় ও অতীন্দ্রিয়ের সংযুক্ত বোধ।

অধিযজ্ঞ অর্থ হল সাক্ষীচেতা আত্মা। অধিযজ্ঞ হল অন্তঃস্থ তথা কেন্দ্রস্থ মহাকরণাত্মক জ্ঞানসত্তা বিশেষ, দ্রষ্টা বা সাক্ষীচেতা, সর্বকর্মের প্রণেতা ও ফলদাতা।

পঞ্চেন্দ্রিয়ের স্ব স্ব অধিষ্ঠানচৈতন্যই হল অধিদৈব। অন্তরিন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠানচৈতন্য হল অধ্যাত্ম। স্বভাববোধকেই অধ্যাত্ম বলে। একেই আবার জীবাত্মা বা বিজ্ঞানাত্মা বলে। অধিদৈব ও অধ্যাত্ম এক চৈতন্যেরই দ্বিবিধ ব্যবহার। সুতরাং উভয়ের মূলে উপাদান সমান; কিন্তু ব্যবহারের মধ্যে তারতম্য আছে। অধিভূত, অধিদৈব ও অধ্যাত্ম মিলে হল বিজ্ঞানাত্মা। অধিযজ্ঞ হল প্রজ্ঞানাত্মা। প্রজ্ঞানাত্মার বক্ষে বিজ্ঞানাত্মা লীলা করে। সবই অখণ্ড নিত্য একতত্ত্ব

প্রজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। বোধ দিয়ে বোধের ব্যবহার হয় এবং বোধ দিয়েই বোধের অনুভূতি হয়। বোধের বৈচিত্র্য ও বোধের একত্ব—উভয়ের ব্যবহারই বোধের দ্বারা সিদ্ধ। বোধের বুকে বোধের লীলার বহিরাংশ বৈচিত্র্যপূর্ণ নানাত্ব বহুত্ব। অন্তরে দ্বৈত, কেন্দ্রে একত্ব বা সমত্ব, তুরীয়তে অদ্বৈত এবং তুরীয়াতীতে নিত্যাদ্বৈত। এ-ই সহজ যোগ[১]। বিচারের অর্থ এখানে স্ববোধে বা আপনবোধে বোধসত্তার বিচরণ করা। সবই অধিদৈব মানলে অধিভূতের প্রভাব থাকে না। অধ্যাত্ম বলে সব মানলে অধিদৈবের প্রাধান্য থাকে না। আবার অধিযজ্ঞরূপে সব মানলে অধ্যাত্মেরও প্রাধান্য থাকে না। তখন শুধু বোধে বোধময় সচ্চিদানন্দানুভূতি।

জগতের অর্থ

(১) জগৎ='জ' মানে আসা, 'গ' মানে থাকা, 'ত' মানে যাওয়া। সৃষ্টি স্থিতি লয়। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর। বাক্ মন প্রাণ। ঋক্ যজু সাম। স্থূল সূক্ষ্ম কারণ। সত্ত্ব রজঃ তমঃ।

(২) জগৎ='জ' মানে জাত বা প্রকাশ হওয়া, আসা বা উদয় হওয়া। নামরূপ মনোময় (সৎ)। ব্রহ্মা অধিষ্ঠান দেবতা। শক্তি হল সন্ধিনী। 'গ' মানে গতি এবং নিয়ন্ত্রণ। 'গ'—গমন, প্রাণ, স্থিতি, বিভক্তি, অনুভূতি, উপভোগ আস্বাদন। প্রাণময় (চিৎ)—অধিষ্ঠান দেবতা বিষ্ণু। শক্তি হল সম্বিৎ। 'ৎ'—ত মানে কারণ, লয়, জ্ঞান, আনন্দ। বোধময় (আনন্দ) অধিষ্ঠান দেবতা হল মহেশ্বর। শক্তি হল রুদ্রানী।

বাক্ই প্রথম বোধ। ঈশ্বর, ব্রহ্মা প্রথম অনুভব করেন। অনুভূতির পরে বোধ প্রকাশ পায়। বোধ করার পরে হয় বোধ হওয়া। বোধের ঘরে করা ও হওয়া সমার্থবোধক। প্রকাশকের মধ্যে আগে হওয়া, পরে করা, কিন্তু প্রকাশের মধ্যে আগে করা এবং পরে হওয়া। 'ভব'-র পরে অনুভব। ঈশ্বর আগে অনুভব করেন পরে ব্যক্ত হন। ব্যক্ত হয়ে তিনি তাঁর মধ্যে স্বয়ং আবার প্রবেশ করেন—স্বভাব বা নিজভাবকে আস্বাদন করার জন্য। ভব হল শিবসত্তা। আবার ভব হল ব্যক্ত হওয়া অর্থাৎ ভবসংসার—বিভূতি বা সম্ভূতি। অনুভব মানে অনুভবের সংসার[২]—বিনাশ বা অসম্ভূতি। স্বভাব সকলকে অনুভবের দিকে নিয়ে যায়। অনুভূতির বিকাশ ক্রমপর্যায়ে হয়। সকলের একসঙ্গে হয় না। কারও আগে এবং কারও পরে হয়।

হৃদয়ের অর্থ

হৃ+দ+য়—'হৃ' মানে আহরণ, গ্রহণ করা, হরণ করা।
'দ' মানে দান, দয়া, দমন।
'য়' মানে নিয়ন্ত্রণ, পরিচালন, আনন্দ।

সত্যের অর্থ

স+ত+য়—'স' মানে অস্তিত্ব, অস্তি।
'ত' মানে বৈচিত্র্য, অভিব্যক্তি, ঐশ্বর্য (বিষয় হতে আরম্ভ করে জ্ঞান পর্যন্ত সবই তদীয়তা)।
'য়' মানে করণ এবং তাকে ক্রিয়াশীল করে যে আনন্দ।

মূল বীজ পাঁচটি

পাঁচটি মূল বীজ হল—ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম। ক্ষিতির লং, অপের বং, তেজের রং, মরুতের (বায়ুর) যং, ব্যোমের বা আকাশের হং। বীজ মানে শক্তির ঘনীভূত অবস্থা। যেখানে শক্তি জড়ীভূত হয়ে থাকে

১। স্বানুভূতির দৃষ্টিতে যোগবিজ্ঞানের তত্ত্ব সমাধান। ২। অভিনব সংজ্ঞা।

তাকেই বীজ বা আধার বলে। আধারের একটি কেন্দ্র আছে। সেই কেন্দ্রের যে অভিমান—বীজ হল তারই একটা আধার। বহুকে, বৈচিত্র্যকে এক শব্দের মধ্যে ধরে রাখে বীজ। 'ঔম' হল শূদ্রের প্রণব এবং 'ওঁ' হল ব্রাহ্মণদের প্রণব। যাকে দিয়ে সব হয় বীজ' হল তার পরিচয়। সব বীজকেই মাতৃকাশক্তি বলে।

(১) আকাশতত্ত্বের বীজ হল হং, দেবতা হল শিব ও বিষ্ণু। স্থান হল বিশুদ্ধ চক্র, আপাদমস্তক ও সর্বব্যাপী।

(২) বায়ুতত্ত্বের বীজ হল যং এবং দেবতা হল বাসুদেব ও সূর্য। স্থান হল অনাহত চক্র, হৃদয় ও সর্বব্যাপী।

(৩) তেজতত্ত্বের বীজ হল রং এবং দেবতা হল অগ্নি ও সূর্য। স্থান হল মণিপুর চক্র, নাভিকেন্দ্র।

(৪) জলতত্ত্বের বীজ হল বং এবং দেবতা হল বরুণ ও গণেশ। স্থান হল স্বাধিষ্ঠান চক্র, লিঙ্গমূলে।

(৫) পৃথ্বীতত্ত্বের বীজ হল লং এবং দেবতা হল ব্রহ্মা বা স্বয়ম্ভূ শিব। স্থান হল মূলাধার চক্র, মেরুদণ্ডের সর্বনিম্নে।

প্রত্যেকেই পঞ্চতত্ত্ব দিয়ে তৈরি। অধিদৈব হল পঞ্চপ্রাণ এবং অধ্যাত্ম হল মন ও বুদ্ধি। অধিযজ্ঞ হল প্রজ্ঞানঘন বোধময় আত্মা।

অস্ত্র—যা দ্বারা সকল প্রকার প্রতিকূল অবস্থাকে বিদূরিত করে অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করা হয় তাকেই অস্ত্র[২] বলে। সাধকরা এইরূপ অর্থে অস্ত্র ব্যবহার করেন। দেবদেবীর হাতের অস্ত্রগুলি হল সত্ত্বগুণ ও বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের প্রতীক। ভিন্ন ভিন্ন অস্ত্রের অন্তর্নিহিত অর্থ, যথা—খড়্গ বা অসি হল অজ্ঞাননাশক, জ্ঞানের প্রতীক। ত্রিশূল হল কর্ম, যোগ, জ্ঞান অথবা তিনগুণ বা শক্তি, জ্ঞান, আনন্দের প্রতীক। তীরধনুক হল কেন্দ্রসত্তা বা আত্মজ্ঞানের প্রতীক। গদা হল বুদ্ধির প্রতীক। চক্র হল সমষ্টি মনের প্রতীক। অঙ্কুশ হল সংযত জ্ঞানের প্রতীক। এইরূপ অন্যান্য অস্ত্রও বোধের বিকার ও প্রতিকূলতানাশক শুদ্ধ গুণ বা বোধের বিশেষ বিশেষ প্রতীক মাত্র।

ব্যবহারদোষের কারণ

বোধের ব্যবহারের মধ্যে বোধের মল বা আবরণ সৃষ্ট হয়। একেই বোধের বিকার বলে। বোধের বিকারকে শুদ্ধ বোধ দ্বারাই শোধন করতে হয়। চৈতন্যের অংশবিশেষ শক্তিরূপে ক্রিয়া করে। এই শক্তি তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে ক্রিয়া করে। কেন্দ্রের ভাগকে চিৎশক্তি বা পরাশক্তি বলে, অন্তরের ভাগকে বিদ্যাশক্তি বলে এবং বাইরের ভাগকে অবিদ্যাশক্তি বা আধারশক্তি বলে। শক্তির অংশবিশেষকে গুণ বলে। এই শক্তিকেই ত্রিগুণা প্রকৃতি বলা হয়। তিন গুণের সাম্য অবস্থাই হল প্রকৃতির অব্যক্ত অবস্থা। গুণের স্ফুরণ বা বিষম অবস্থা হলেই সৃষ্টি আরম্ভ হয়। সৃষ্টির সঙ্গে স্থিতি ও ধ্বংস প্রকাশ পায়। সত্ত্বগুণের লক্ষণ হল প্রকাশ, জ্ঞান, স্থিতি, একতা, সমতা প্রভৃতি। রজোগুণের লক্ষণ হল প্রবৃত্তি, ক্রিয়া, বিকার, পরিবর্তন বা রূপান্তর প্রভৃতি। তমোগুণের লক্ষণ হল আবরণ, জড়তা, অলসতা, নিষ্ক্রিয়তা, নিদ্রা প্রভৃতি। এই ত্রিবিধ গুণের প্রভাবে বোধ বিকৃত হয়। তমোগুণের প্রভাবকে তামসিক ভাব বলে। রজোগুণের প্রভাবকে রাজসিক ভাব বলে এবং সত্ত্বগুণের প্রভাবকে সাত্ত্বিক ভাব বলে। ত্রিগুণ স্বরূপত অদৃশ্য, শুধু লক্ষণ দ্বারা এদের পরিচয় মেলে। তমোগুণের বিকার নাশ করার জন্য রজোগুণের প্রভাব দরকার হয়। আবার রজোগুণের প্রভাব নাশ করার জন্য সত্ত্বগুণের দরকার হয়। সত্ত্বগুণের প্রভাবমুক্ত হওয়ার জন্য শুদ্ধ সত্ত্বগুণের অর্থাৎ সমবোধের[৩] সাহায্য দরকার হয়। স্থূল অর্থাৎ বহিঃসত্তায় তমোগুণের প্রভাব বেশি। সূক্ষ্মে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়প্রাণে রজোগুণের প্রভাব বেশি এবং সূক্ষ্মতরে অর্থাৎ অন্তঃকরণ বা অন্তরসত্তায় সত্ত্বগুণের প্রভাব বেশি থাকে। সূক্ষ্মতমই হল শুদ্ধ সত্ত্বগুণ অর্থাৎ বিশুদ্ধ বোধস্বরূপ আত্মা বা ঈশ্বর।[৪]

১। অভিনব সংজ্ঞা। ২। অভিনব সংজ্ঞা। ৩। তত্ত্ব সমাধান। ৪। অভিনব সংজ্ঞা।

তত্ত্ব হল নিত্যসিদ্ধ। সৎ হল চিৎ। বোধ ও সত্য অভেদ। সত্য মানেই বোধ। নামরূপ মানে মন[১]। নামরূপই হল সত্যের প্রকাশ। ব্রহ্ম, আত্মা সবই সচ্চিদানন্দের নাম।

বোধ—অণু থেকে আরম্ভ করে মহান পর্যন্ত অখণ্ড বৃত্তি আকারা হল বোধের স্বরূপ[২]।

অন্তরে=অ+ন+ত+র+এ। 'অ' হল চিৎ, চৈতন্য, অনুত্তর। 'ন' হল নির্বাণ, আনন্দ, কারণ, নিষেধ, অভাব, বিরোধ, নূতন ও মিলনাত্মক সংযুক্তি, নব বা নয় প্রকার। 'ত' মানে ঐশ্বর্য, বিভূতি, বহিঃপ্রকাশ, শক্তির বিচিত্র লীলা, পরিবর্তন, রকমারী, তাৎপর্য। 'র' মানে শক্তি, জ্ঞান, প্রকৃতি, রীতি, রতি, গতি, মতি। 'এ' মানে আশ্রয়, আধার, যোনি, শক্তি।

এই পঞ্চবিভাগ পঞ্চতত্ত্বের (ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম) অন্তর্ভুক্ত। সৃষ্টি-স্থিতি-লয় ত্রিবিধ কার্যের বা প্রকাশের আশ্রয় হল এই পঞ্চতত্ত্ব। চার তত্ত্ব মুখ্য অংশ গ্রহণ করে এবং এক তত্ত্ব অবশিষ্ট থাকে। এই পঞ্চতত্ত্ব হল পঞ্চবীজ। বীজ হল চৈতন্যশক্তির সঙ্কুচিত ক্ষুদ্রাংশ বিশেষ, যা হতে চৈতন্যের অভ্যুদয় বা অভিব্যক্তি হয়। চারটি বীজ বা তত্ত্ব সৃষ্টির মধ্যে প্রকাশমান এবং অবশিষ্টটি মায়ের হাতে ধরা থাকে। এর নাম অভিনব বীজ। এর মাহাত্ম্য অচিন্তনীয়, অবর্ণনীয়, অব্যক্ত। এর ব্যবহার হল মায়ের বিশেষ সাধ বা ইচ্ছা।

পূজার তাৎপর্য

পূজা মানে পুরোভাগে বা আগে জাত বা জাগরণ বা জানা। পূর্ণভাবে জাত, জাগরণ বা জানা। পূর্ণরূপে পবিত্ররূপে জাত, জাগরণ বা জানা। সবকিছুর সঙ্গে আমিবোধ সমভাবে বদ্ধ তা উপলব্ধি করা।

ব্যষ্টিপ্রাণ ক্ষুদ্র হলেও তা স্বভাবেরই অংশ। প্রাণরূপী মায়ের আগে বোধ, পরে প্রকাশ। মানুষের আগে প্রকাশ, পরে বোধ।

বহিঃসত্তা হল অধিভূত। অধিভূতের অন্তরসত্তা অর্থাৎ আভ্যন্তরিক শক্তিই হল অধিদৈব। তার কেন্দ্রসত্তা হল অধ্যাত্ম এবং তুরীয় হল অধিযজ্ঞ। অধিভূত হল আধার বা স্থূলদেহ। অধিদৈব হল নাম, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়। অধ্যাত্ম হল ভাব বা মন ও বুদ্ধি এবং অধিযজ্ঞ হল বোধস্বরূপ আত্মা। অধিভূত ও অধিদৈবকে যা দ্বারা জানা যায় তাই অধ্যাত্ম। অধ্যাত্মের বিজ্ঞাতা হল অধিযজ্ঞ। অধিযজ্ঞের কোন বিজ্ঞাতা নেই, তা জ্ঞানস্বরূপ অদ্বয় অব্যয় অমৃতময় নিত্যপূর্ণ অখণ্ড আত্মা। অধিদৈব হল অহ। তার সঙ্গে অনুস্বর যুক্ত হলে হয় 'অহংকার'। এ-ই অধ্যাত্ম। কিন্তু অহংদেব হলেন অধিযজ্ঞ। অহংকার এই অহংদেবের সবিশেষ অংশমাত্র। অহংদেবের নামই ভগবান বিশুদ্ধ চৈতন্যঘন সত্তা।

পুষ্টি, তুষ্টি ও মুক্তির তাৎপর্য

পথ্য দ্বারা হয় পুষ্টি। তথ্য দ্বারা হয় তুষ্টি এবং তত্ত্বের দ্বারা হয় স্বানুভূতি বা মুক্তি ও শান্তি[৩]। তথ্য পূর্ণভাবে জানা হলে হয় তত্ত্ব। প্রতি প্রকাশের মধ্যে বোধস্বরূপ আত্মা বা আমির আবিষ্কার করাই হল আত্মানুভূতি[৪]। সমবোধের ব্যবহারই হল প্রেম। প্রেমেতে বিচার থাকে না, পথ্য ও তথ্যের বিকার হয় এবং পরিবর্তন হয়। কিন্তু তত্ত্ব হল নির্বিকার। লৌকিক দৃষ্টিতে বা তথ্যের দিকে হতে রাধাকৃষ্ণের প্রেমের মধ্যেও বিচ্ছেদ আছে কিন্তু তত্ত্বের দৃষ্টিতে কোন বিচ্ছেদ নেই। তা নিত্য অভেদ। ঈশ্বর বা আত্মার মধ্যে আগে বোধ এবং পরে ঘটনা, অর্থাৎ কারণ হতে কার্য। কিন্তু মানুষের মধ্যে আগে ঘটনা পরে বোধ অর্থাৎ কার্য হতে বোধ জাগে। প্রাণের অভিব্যক্তিই হল

১। বিজ্ঞান দৃষ্টিতে। ২। তত্ত্ব সমাধান। ৩। তত্ত্বের দৃষ্টিতে (তত্ত্ব সমাধান)। ৪। অভিনব সংজ্ঞা।

বৈচিত্র্য সৃষ্টি। শক্তি জ্ঞান আনন্দ তার মহিমা। প্রাণের পূর্ণতাই হল প্রাণের সমতা। একেই প্রেম বলে। প্রাণ যখন প্রাণেতে পূর্ণ হয় তখন তা উছলে পড়ে। পূর্ণ প্রাণই হল প্রেম। বিচার (তর্ক) প্রেমধর্মের পরিপন্থী।

পূর্ণ প্রাণই প্রেম[১]। মানা[২] ছাড়া প্রাণের পূর্ণতা আসে না। অধিদৈবের কাছে সকলে ঋণী। স্থূল জগৎ হল নামরূপময় মা। প্রাণই (হৃদয়) ধরে রেখেছে সেই নামরূপকে।

গুরুর কাজ

যে জ্ঞান, আনন্দ দেয় সে-ই গুরু[৩]। বোধের স্মৃতি দ্বারাই বোধের বোধন হয়। ধ্রুবাস্মৃতিকেই ঋতম্ভরী প্রজ্ঞা বা আত্মগুরু[৪] বলা হয়। অন্তরে বিশুদ্ধ বোধের জাগরণ হলেই আত্মগুরুর পরিচয় মেলে। আত্মাই হল সদ্‌গুরু। লোকগুরু তাঁর বাহ্যিক রূপ। বেদগুরু তাঁর শিক্ষাগুরু। বাইরে স্থূলগুরুই অন্তরের গুরুর পরিচয় করিয়ে দেন। অন্তরের সূক্ষ্মগুরু সকলকে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের বোধে প্রতিষ্ঠিত করে নিজে তার মধ্যে মিশে যায়। কৃতজ্ঞতাবোধ[৫] হলেই গুরুতত্ত্বের অনুভূতি হয়। সত্যশ্রবণের দ্বারা কিছু উপকার হয় এবং তার যথার্থ ব্যবহার হলে সত্যের পূর্ণানুভূতি হয়। সংসারে দুঃখকষ্ট থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে গুরুর সাহায্য একান্ত প্রয়োজন।

অহংকার ও ত্বংকারের বৈশিষ্ট্য

কাঁচা আমি হল অহংকার। পাকা আমি হল ত্বংকার বা অহংদেব। কাঁচা আমি হল ব্যষ্টিবোধ, পৃথক জ্ঞান বা ভেদজ্ঞান। পাকা আমি হল অখণ্ড তত্ত্বের আমি, প্রজ্ঞানের আমি। সমষ্টি আমিবোধের সঙ্গে তা নিত্যযুক্ত। বাইরে থেকে এর পরিচয় অবগত হওয়া যায় না। শুদ্ধ চিত্তে বা শুদ্ধ হৃদয়ে তত্ত্বের অনুভূতি খেলে। সমদৃষ্টি, সমভাব, সমজ্ঞান, সম্প্রীতি বা প্রেম হল এর একমাত্র লক্ষণ। এ ছাড়া অন্য কিছুর দ্বারা এর মহিমা অবগত হওয়া যায় না। সাধনার কালে আমি কিছু জানি না, বুঝি না—এই ভাব পোষণ করা ভাল। তাতে সাধনা দ্রুত এগিয়ে চলে এবং অন্তরের ভাব শুদ্ধ হতে থাকে। চিত্তশুদ্ধি বা ভাবশুদ্ধি হল অধ্যাত্মসাধনার মূল কথা। ভাবশুদ্ধি হলেই অন্তরে বিশুদ্ধজ্ঞানের বিকাশ হয়। একে গুরুকৃপা, আত্মকৃপা বা ঈশ্বরকৃপা বলা হয়। অন্তরের শক্তি জ্ঞান আনন্দ ও প্রীতির পূর্ণ অভিব্যক্তিকেই সত্যানুভূতি বলে।

জীবনের ব্যষ্টিভাবকে সমষ্টিভাবরূপী ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করতে হয়। তা হলেই ব্যষ্টিভাবের শোধন হয়, রূপান্তর হয় এবং সমষ্টিভাবের পূর্ণ অভিব্যক্তি হয়। আত্মসমর্পণের এ-ই হল তাৎপর্য। সমর্পণের ফলে ব্যষ্টিভাব হারায় না, তা পূর্ণ অখণ্ডরূপ প্রাপ্ত হয়।

পঞ্চপ্রাণের তাৎপর্য

উদান হল আকাশ, ব্যান হল বায়ু, সমান হল তেজ, প্রাণ হল জল এবং অপান হল পৃথিবী। পঞ্চপ্রাণের কেন্দ্র হল হৃদয়। এই হৃদয় অখণ্ড ব্যাপ্ত। হৃদয়কেন্দ্র হতে যে আকর্ষণ হয় তাই হল আত্মরূপী কৃষ্ণের আকর্ষণ। কেন্দ্রসত্তাকেই কৃষ্ণসত্তা বলা হয়। পঞ্চপ্রাণকে আকর্ষণ করে যে কেন্দ্র সেই কৃষ্ণ। পঞ্চপ্রাণের মিলিত শক্তির কেন্দ্রাভিমুখী বা উল্টাধারার নাম রাধা। রাধা করে কৃষ্ণকে আকর্ষণ এবং কৃষ্ণ করে রাধাকে আকর্ষণ, অর্থাৎ অন্তরের শক্তি করে কেন্দ্রসত্তাকে আকর্ষণ এবং কেন্দ্রসত্তা করে অন্তরের শক্তিকে আকর্ষণ। তার ফলে হয় সত্তাশক্তির অভেদ মিলন। একেই শিব-দুর্গা, লক্ষ্মী-নারায়ণ, সীতা-রাম, রাধা-শ্যাম প্রভৃতি যুগলতত্ত্বের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়। আকর্ষণের কারণ হল আনন্দ এবং আকর্ষণ শক্তির নাম হল জ্ঞান। জ্ঞান ও আনন্দের মিলন হল

১। অভিনব সংজ্ঞা। ২। তত্ত্ব সমাধান। ৩। অভিনব সংজ্ঞা। ৪। তত্ত্বের দৃষ্টিতে। ৫। বিজ্ঞান দৃষ্টিতে।

রাধাকৃষ্ণের মিলন। রাধা-আধা, কৃষ্ণ-আধা। এই যুগল হল তাদের সাধা। কৃষ্ণের হাতের বাঁশী হল মুখ্য প্রাণের প্রতীক, শঙ্খ হল গৌন প্রাণের প্রতীক এবং চক্র হল সমবোধ ও অখণ্ডবোধের প্রতীক (ভাগবতের মূল রহস্যানুভূতির চাবি, এর সাধনার বিজ্ঞানই হল অখণ্ড শরণাগতি)।

শরণাগতির বিজ্ঞান

শরণাগতি[১] মানে— (ক) দেহে প্রাণে বুদ্ধিতে ঈশ্বরকে স্বীকার করে নেওয়া, কারণ তিনিই সকলের আশ্রয় এবং তিনিই রক্ষাকর্তা। তিনি রক্ষা করবেনই এবং রক্ষা করেনও—এই দৃঢ় বিশ্বাস। (খ) প্রীতিকর সম্পর্ক—অন্তরের অনুরাগ। তখন অন্তরের গুরু ও বাইরের গুরু এক হয়ে যায়। অর্থাৎ অন্তর ও বোধের সঙ্গে হৃদয়বোধের অখণ্ড মিলন হয়। একেই প্রজ্ঞানবোধের অভিব্যক্তি বলে। এই বোধের লক্ষণ হল দিব্যজ্ঞান, দিব্যদৃষ্টি, দিব্য আচরণ ও দিব্যজীবন।

পরমাত্মলীলার বিজ্ঞান

অখণ্ড বোধস্বরূপ পরমাত্মার লীলাবিলাস চার পর্যায়ে সম্পাদিত হয়। (ক) বহুমানস অর্থাৎ বহুবেশে বহুর মধ্যে তিনি একক অর্থাৎ সর্বরূপী এক স্বয়ং। এ হল আত্মার শক্তি ও কর্মবিজ্ঞানের অধ্যায়। (খ) সর্বতত্ত্ব অর্থাৎ একের মধ্যে সব বা বহু অথবা সর্বাত্মক। এ-ই হল ঈশ্বর আত্মার জ্ঞান ও ধ্যানযোগ বিজ্ঞানের অধ্যায়। (গ) অমৃতত্ব অর্থাৎ একেতে এক বা সর্বশূন্য নির্বিকার নিরঞ্জন আত্মস্বরূপ। এই হল আত্মার পূর্ণ আনন্দ ও স্বরূপজ্ঞানের অধ্যায়। (ঘ) সর্বশক্তিমান অর্থাৎ সর্বেসবা বা সর্বগুণাকর নির্গুণগুণীর স্বরূপ। এই হল আত্মার প্রেমঘন ভক্তি-বিজ্ঞানের অধ্যায়। কর্মযোগ হল শক্তি ও মনের বিজ্ঞান। ধ্যানযোগ হল জ্ঞান ও অন্তরাত্মার বিজ্ঞান। জ্ঞানযোগ হল অমৃতস্বরূপ ব্রহ্ম বা নির্গুণতত্ত্বের বিজ্ঞান এবং প্রেমভক্তিযোগ হল ঈশ্বর অর্থাৎ সগুণ নির্গুণ উভয় তত্ত্বের সংযুক্ত বিজ্ঞান।

কর্মের দ্বিবিধ বিজ্ঞান

কর্ম প্রিয়বোধে হয় সকাম এবং শ্রেয়বোধে হয় নিষ্কাম। সকাম কর্মে চিত্তের বিকার বাড়ে এবং নিষ্কাম কর্মে চিত্তের বিকার শোধিত হয়। কর্মযোগ চরিত্রগঠনের সহায়ক। শুদ্ধচিত্ত ধ্যানযোগের উপযোগী। সুতরাং কর্মযোগের পরিণামই হল ধ্যানযোগ। ধ্যানযোগের মাধ্যমে সাক্ষী দ্রষ্টা আত্মার দর্শন মেলে। কিন্তু দ্বৈতজ্ঞান সূক্ষ্মভাবে থাকে। প্রজ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মার সঙ্গে একীভূত হওয়া যায় জ্ঞানযোগের মাধ্যমে। জ্ঞানযোগের ফল হল অদ্বৈতানুভূতি। সুতরাং জ্ঞানযোগ হল ধ্যানযোগের পরিণাম। নির্গুণ ঈশ্বর হল অদ্বয়তত্ত্ব। এতে পূজা উপাসনার কোন সুযোগ নেই। সগুণ ঈশ্বর হল প্রেমভক্তিযোগের সাধ্য। সগুণ ঈশ্বরের কৃপাতে প্রেমভক্তিযোগের উৎকর্ষে সাধক সগুণ নির্গুণ উভয় তত্ত্বের পরিচয় সম্যক্ অবগত হয়ে তাঁর সঙ্গে একীভূত হয়ে যায়। এ-ই হল পরমপুরুষার্থ।[২]

[৭।৫।৬৮]

আনন্দের মাহাত্ম্য

আনন্দ হল সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি। এ-ই রাধা। এই শক্তির মূল কেন্দ্রই হল কৃষ্ণ।

সর্বপ্রকার কর্মের মূলে আনন্দ এবং সর্ব আনন্দের মূলে হল আত্মস্বরূপ কৃষ্ণ।

১। তত্ত্ব সমাধান। ২। তত্ত্বের দৃষ্টিতে।

আনন্দের প্রতিদ্বন্দ্বী নেই, তবে এর অভিব্যক্তির তারতম্য আছে। ভাবকে অবলম্বন করেই তা প্রকাশ পায়। পরস্পর প্রকাশের মধ্যে ভাবের তারতম্য হেতু দ্বন্দ্ব, বিচ্ছেদ ও মিলন হয়। ভাবেরই প্রকারভেদ হল কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য ইত্যাদি। কামনা প্রতিহত হলেই হয় ক্রোধ। ক্রোধ বাধা পেলে হয় সম্মোহ, সম্মোহের দ্বারা শুদ্ধবোধের স্মৃতি আবৃত হয়, তারপরে বুদ্ধিবিভ্রম হয় এবং নানাবিধ অশান্তি ও দুঃখকষ্টের কারণ সৃষ্টি হয়। তখন তামসিকতা, জড়তা, অলসতা, শোক, মোহ প্রভৃতি প্রকাশ পায়। সেইরূপ ভাব যখন অসে তখন ভাবের গতিকে বাধা না দিয়ে একাগ্র চিত্তে লক্ষ্য করতে হয়। ভাব দ্বিবিধ। শুভ ও অশুভ। অশুভ ভাব বহির্মুখী হয়ে মনকে বিক্ষিপ্ত করে। শুভ ভাব মনকে অন্তর্মুখী করে স্থির করে দেয়। অন্তর্মুখী ভাবকেই সাত্ত্বিক ভাব বলে। সাত্ত্বিক ভাবই শুদ্ধাভক্তি ও শুদ্ধজ্ঞানের ধারক, বাহক ও পরিবেশক।

আত্মার স্বভাবই হল বিশুদ্ধজ্ঞান বা প্রেমভক্তি। এই বিশুদ্ধজ্ঞানের প্রকাশের নামই অনুভূতি।

আনন্দস্বরূপ ঈশ্বর বা আত্মা সর্বময়। সমগ্র বিশ্ব তাঁর পরিচয়। কিন্তু ইন্দ্রিয়ের দৃষ্টিতে অখণ্ড এক আনন্দস্বরূপকে পৃথক পৃথক মনে হয়। সত্যই শিব। সে-ই হরি, সে-ই কৃষ্ণ। 'স্ব'-এর আনন্দভাবকে হ্লাদিনী শক্তি বলে। এই শক্তি জ্ঞান, আনন্দ ও প্রেমের পরিপূরক। এরই ঘনীভূত মূর্তি হল রাধা।

প্রাণ অমর। দেহের পরিবর্তন হয়। দেহ হল প্রাণের পোশাক। দেহ পরিবর্তনের অর্থ হল পোশাক পরিবর্তন।

[৮।৫।৬৮]

গুরুর মহিমা

গুরু হলেন কেবল জ্ঞানমূর্তি। রূপ, নাম, ভাব ও বোধের মধ্যেই তিনি আছেন।

প্রাণকে উপেক্ষা করলে গুরুকেই অবহেলা করা হয়। গুরু থাকেন প্রাণের মধ্যে। সকলের একমাত্র আপন হল প্রাণ। অধিদৈবের সঙ্গে একতা বোধ হলে চিন্তামাত্র গুরুকে দেখতে পাওয়া যায়।

—মা মানে বোধসত্তা। নাম, রূপ যেখানে নেই তা অরূপ। আবার অরূপ হয়েও তিনি রূপময়।

—আজ যে পাপী সে-ই ভবিষ্যতে একদিন সাধু হবে এবং আজ যে সাধু সেও অতীতে অসাধু ছিল। সাধু হয়ে গেলে তখন বোঝা যায় যে পাপী কত কষ্ট পায়।

—দৈনন্দিন জীবনে প্রাণের গতি লক্ষ্য করে চলাই হল সহজ সাধনা।

—প্রাণের যথার্থ পরিচয় অবগত হলেই আমিতত্ত্বের তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম হয় এবং পূর্ণ আমির পরিচয় পেলেই আমিবোধের বিশুদ্ধ ব্যবহার করা সম্ভব হয়।

—অপরের কাছ থেকে যে ব্যবহার মানুষ আশা করে তদনুরূপ ব্যবহার ও আচরণ তার নিজের মধ্যেও থাকা প্রয়োজন।

—পরস্পর পরস্পরকে মানার মাধ্যমেই পূর্ণতা লাভ করতে পারে।

—ছোট হয়ে অপরের সঙ্গে মেশা যায় কিন্তু বড়র অভিমান নিয়ে সকলের সঙ্গে যুক্ত হওয়াও যায় না এবং মেশাও যায় না।

—ঋষি পাতঞ্জলের মতে চিত্ত পাঁচ প্রকার : মূঢ় চিত্ত, বিক্ষিপ্ত চিত্ত, ক্ষিপ্ত চিত্ত, দৃঢ় চিত্ত বা একাগ্র চিত্ত এবং সমাহিত চিত্ত।

—চতুষ্পাদ ব্রহ্ম হল পূর্ণ প্রেম, পূর্ণ আনন্দ, পূর্ণ জ্ঞান, পূর্ণ শক্তি।

—বহির্বিশ্ব শক্তির অভিব্যক্তি বা নামরূপের বৈচিত্র্যময় লীলাপ্রকরণ। এর অন্তরালে এর প্রাণশক্তি নামরূপের অণু-পরমাণুতে ওতপ্রোতভাবে অনুস্যূত হয়ে আছে। এ-ই সর্বজ্ঞান শক্তি। নামরূপের বাইরে থেকে একে দেখা যায় না। সমগ্র নামরূপকে এ পরিচালনা করে। একেই সগুণ ঈশ্বর বলে। এরও পিছনে আছেন সেই পরমেশ্বর।

—আনন্দই সর্ব প্রকাশ বা অভিব্যক্তির এবং লীলাবিলাসের মূল উপাদান বা কারণ। এই আনন্দ নিত্যশুদ্ধ মৌলিক উপাদান। এই আনন্দ যখন পূর্ণরূপে অভিব্যক্ত হয় অর্থাৎ শুধু আনন্দেতেই আনন্দ তখন তার নাম মহাপ্রেম বা প্রেমঘনরস।

—প্রেমঘন ঈশ্বর, ভগবান, আত্মা, ব্রহ্ম, পরমেশ্বর, পরম ইষ্ট, পরমগুরু, শাশ্বত শান্তি, অখণ্ড আনন্দ ও সুখ, বিশুদ্ধ অদ্বয় জ্ঞানস্বরূপ, সর্বাতীত, নির্বিকার, নির্বিকল্প, অচ্যুত, নিরঞ্জন, অমৃতময় কেবল—সত্তা সেই মা—মহাপ্রাণ। তিনি-ই আবার বিশ্বরূপে নানাত্ব বহুত্বের মূর্তবিগ্রহ।

—প্রকৃতির ক্ষেত্র হতে প্রেমের বোধ হওয়া সম্ভব নয়। ধারাবাহিক পরিণামের ফলস্বরূপ সর্বোত্তম অবস্থায় তা অনুভূত হয়। কিন্তু প্রেমক্ষেত্র হতে নিম্নের প্রতিটি প্রকাশ স্বচ্ছ, পরিষ্কার বোধানুগত অর্থাৎ আত্মগত স্বভাব মাত্র; যেমন সমুদ্র ও তার তরঙ্গ, লহরী, বুদ্বুদ্, ফেনা জলবক্ষে এক উপাদানেরই বিকারবিহীন পরিণাম মাত্র।
[১০।৫।৬৮]

শ্রবণের ফলশ্রুতি

সত্যশ্রবণের পরে শ্রবণ অনুরূপ মনন ও ব্যবহার হলে অন্তরে জাগে শুদ্ধ জ্ঞান। তারপরে সাধনভক্তি বা পরাভক্তি এবং এই পরাভক্তির পরে হয় মুক্তি। এই মুক্তির অর্থ হল মহামুক্তি[১] অর্থাৎ সমবোধে প্রেমানন্দে সচ্চিদানন্দসাগরে বিরাজ করা।

*** অশুভ কর্মের ফলে হয় পশুজীবন। এ-ই নরকভোগ। শুভ কর্মের ফলে হয় দেবজীবন। এ-ই স্বর্গভোগ এবং মিশ্র কর্মের ফল হল মনুষ্যজীবন। নিষ্কাম কর্মের ফলে হয় জীবন্মুক্তি।

*** শকুন্তলার 'শকুন' শব্দের এক অর্থ গৃধিনী, অন্য অর্থ প্রাণরস বা জ্ঞান। শকুন্তলা অর্থ হল জ্ঞানের মূলে। শকুন্তলা হল জ্ঞানের প্রতীক।

*** অন্তরভাবের অভিব্যক্তিকেই প্রকাশ বলে। শুদ্ধ ভাব হতে শুদ্ধ জীবন জাত হয় এবং অশুদ্ধ ভাব হতে অশুদ্ধ জীবনের প্রকাশ হয়। অন্তরের ভাবই সৃষ্টি স্থিতি ধ্বংসের কারণ। ভাবের নিম্নে হল অভাব, ঊর্ধ্বে হল স্বভাব।

চণ্ডী স্তবের তাৎপর্য

শ্রীশ্রীচণ্ডী স্তবের বিশেষ পাঁচটি মন্ত্র হল—(১) 'রূপং দেহি, (২) জয়ং দেহি, (৩) যশো দেহি, (৪) দ্বিষো জহি, (৫) ভার্যা মনোরমাং দেহি মে মনোবৃত্তি অনুসারিণীম্।' এদের আধ্যাত্মিক অর্থ হল, (১) সাধক ব্রহ্মময়ী মায়ের কাছে মায়ের অরূপের রূপ অর্থাৎ সচ্চিদানন্দস্বরূপকেই প্রার্থনা করে। (২) তাঁর অপরাজিত জয়ের রূপটি, (৩) অবিনাশী যশের রূপটি, (৪) নিত্য নির্বৈরী অদ্বয় রূপটি বিশেষভাবে প্রার্থনা করে। (৫) এক্ষেত্রে যে নিত্য সেবার দ্বারা মনকে আনন্দ দেয়, শক্তি জ্ঞান ও শান্তি দেয় তা হল বিশুদ্ধবোধ। মনের বৃত্তি অনুসারে বোধের বিকাশ হয়। যে-মন চিদানন্দময়ী মায়ের ভাবে, মায়ের সেবাতে রত থাকে ও তদ্ভাবে মগ্ন থাকে সেইরূপ সেবক মনকে অর্থাৎ সচ্চিদানন্দঘন আত্মবোধের উপযোগী বিশুদ্ধ মনকেই সাধক মায়ের কাছে প্রার্থনা করে। মনোরমার[২] অর্থ মনে রহ মা অথবা পরমাত্মার স্বভাবশক্তি। তা সর্বরকম প্রতিবন্ধক হতে মানুষকে মুক্ত করে দেয়। এ মানুষকে অসৎ থেকে সৎ-এ, অজ্ঞান থেকে জ্ঞানে, নানাত্ব বহুত্বরূপ বৈচিত্র্য থেকে সমত্বে, বিকার থেকে নির্বিকারে এবং মৃত্যু থেকে অমৃতে নিয়ে যায়। সেই জন্য এ নিঃশ্রেয়স্কর, অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ধর্ম। একে ধারণ করেই মানুষ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

১। অভিনব সংজ্ঞা। ২। স্বানুভূতির দৃষ্টিতে।

ধর্মের বহুমুখিতা

ধর্ম[১] অর্থ ধর মা (মাধব, মহেশ, মহৎ) অথবা জীবনরূপে মা—এই বোধ। ধর্মের বহুবিধ ব্যবহার আছে, যথা—সত্যধর্ম, অহিংসা ধর্ম, সেবাধর্ম, ক্ষমাধর্ম, প্রেমধর্ম ইত্যাদি। মানবতাকেও[২] ধর্ম বলা হয়। মানব—(ক) মনুর বংশধরকে মানব বলে, (খ) মনের ভিন্ন ভিন্ন ধারা বা প্রবাহকে পুষ্ট ও তুষ্ট করে অধিকতর সুন্দর ও পূর্ণতর করবার জন্য যে নিরন্তর চেষ্টা করে অর্থাৎ জীবনকে সত্য শিবময় করার জন্য যে মন নিরলস চেষ্টা করে সেই মনের অধিকারীকেও মানব[৩] বলে।

মানবের মর্মার্থ

(১) মা+নব, অর্থাৎ নিত্যনূতনভাবে নবগুণ (নয়গুণ) যার মধ্যে অভিব্যক্ত হয় তাকেই মানব বলে। (২) যা নিত্যনূতন তা মা-ই। যার মধ্যে তা প্রকাশ পায় তাকেই মানব বলে। (৩) মাকে নিয়ে চলে যে অর্থাৎ মায়ের অস্তিত্বে অস্তিত্ববান হয়ে মাতৃবোধে মায়ের মধ্যে আজীবন পরিক্রমা করে যে সে-ই হল মানব। (৪) যার মধ্যে মায়ের অভিনব অভিব্যক্তি বা লীলামাধুর্যের অভিনয় পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ পায় তাকেই মানব বলা হয়। (৫) দেহ মন প্রাণে আত্মারূপী মায়ের স্মৃতি বহন করে চলে যে সে-ই মানব। (৬) অথবা মানবের অর্থ হল মান+ব। 'মান' হল মর্যদা, স্বীকৃতি, শ্রেণী বা বিভাগ ইত্যাদি। 'ব' হল বুদ্ধি বা বোধ। সুতরাং মানব অর্থ হল যে বোধের মর্যাদা বুঝে তার মান দেয় তাকেই মানব বলে। মানব এবং মানুষ এক অর্থবোধক।

মানুষের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল—(১) মান+হুঁশ অর্থাৎ যার মধ্যে হুঁশ বা চৈতন্যের অভিব্যক্তির মান নিত্যনূতনভাবে অভিব্যক্ত হয় তাকেই মানুষ বলে। (২) হুঁশ বা চৈতন্যকে মেনে চলে যে তাকেই মানুষ বলে।

*** সদ্‌গুরু বিশুদ্ধ জ্ঞানের জীবন্ত বিগ্রহ। সদ্‌গুরু হলেন সর্বদেবময়। সমগ্র অধ্যাত্মবিদ্যা হল গুরুগতবিদ্যা।

*** প্রজ্ঞানের বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানের প্রজ্ঞানই হল পরমতত্ত্ব। অভেদজ্ঞান বা নিত্যাদ্বৈতজ্ঞান হল পরমতত্ত্ব বা অমৃতত্ব।

*** অদ্বৈত ও দ্বৈত উভয় ভাবই পরমাত্মার মহিমা। এক ও বহু, সংকোচন ও সম্প্রসারণ বিজ্ঞানাত্মার স্বভাবমহিমা।

*** শ্রেষ্ঠ জ্ঞান হল ঈশ্বর অনাদি অনন্ত। সমগ্র বিশ্ব তাঁর লীলানিকেতন। তিনি কালাতীত হয়েও সর্বকালে সমানভাবে বিরাজমান; অর্থাৎ বর্তমানে যেমন আছেন, অতীতেও তেমনই ছিলেন এবং ভবিষ্যতেও তেমনই থাকবেন।

*** গরিবের ঘরে জন্ম হলে দুঃখকষ্ট অভাব প্রভৃতি প্রতিকূল অবস্থার ঘাত প্রতিঘাতে সাধকের ধৈর্য, স্থৈর্য, সহিষ্ণুতা, তিতিক্ষা, সবকিছুর মর্যদাবোধ, নিষ্ঠা প্রভৃতি বাড়ে। এগুলিকে তারা সাধনার অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করে।

হৃদয় কেন্দ্রের বিশেষত্ব

হৃদয় গ্রন্থি খুলে গেলেই ধ্রুবাস্মৃতি জাগে। মন ও দেহের মধ্যে অভেদ সম্বন্ধ। চিত্ত হল সংস্কারের সুমষ্টি। এই সংস্কারের প্রভাবেই মন শরীররূপ ধারণ করে। দেহ হল আবরণ, ঘর বা নবদ্বারযুক্ত নগর, ইন্দ্রিয়সকল হল প্রজাবৃন্দ, মন হল মন্ত্রী, অহংকার হল কর্মকর্তা, চিত্ত হল কোষাধ্যক্ষ, পঞ্চপ্রাণ হল দেহরক্ষী এবং বুদ্ধি হল নিয়ন্তা বা নগরপাল। দেহনগরের পতন মানেই শরীরের বিনাশ। দেহবোধ হল নরকবাস। বুদ্ধি বা ভাব শুদ্ধ হলে হয়

১। অভিনব সংজ্ঞা। ২। বিজ্ঞান দৃষ্টিতে। ৩। অভিনব সংজ্ঞা।

স্বর্গবাস। সত্ত্বপ্রধান বুদ্ধিকেই শুদ্ধভাব বলে। আত্মবোধের জাগরণ হলে নরক ও স্বর্গ উভয়ই রূপান্তরিত হয়ে তুরীয়ভাবের সঙ্গে যুক্ত হয়। একেই মহাস্বর্গ বলে।

*** স্থূল ভৌতিক দেহই হল কর্মদেহ বা কুরুক্ষেত্র। এ-ই সংসারক্ষেত্র। এর অভ্যন্তরে সূক্ষ্ম তেজোময় লিঙ্গদেহ বা মানসদেহ। এ-ই হল ধর্মক্ষেত্র বা স্বর্গপুরী। তারও গভীরে কারণদেহ বা অব্যক্ত প্রকৃতির ঘর। বুদ্ধির ঊর্ধ্বে হল বিশুদ্ধ প্রজ্ঞাবোধ। এ-ই আত্মা বা স্বরূপের ঘর।

*** দিব্যজ্ঞানের বা আত্মজ্ঞানের জ্যোতিতে এই লিঙ্গদেহের নাশ হয় বা অবসান হয়। লিঙ্গদেহের নাশ হলেই স্বরূপের সাক্ষাৎ লাভ হয়। স্বরূপদেহের দর্শন পেলে আর লিঙ্গ বা ভৌতিক দেহ সৃষ্টির কারণ থাকে না। আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হলে জীব শুদ্ধ চিন্ময় দেহ প্রাপ্ত হয়। একেই দেহমুক্তি বলে।

*** পরমাত্মার ইচ্ছায় মুক্তাত্মা নির্মানচিত্ত বা সংকল্পের দ্বারা জগৎ কল্যাণার্থে লিঙ্গদেহ ও স্থূল ভৌতিক দেহ তৈরি করে জগতে লীলা করে যায়। সাধারণ মানুষের স্থূল ভৌতিক দেহ তৈরি হয় তার সূক্ষ্ম লিঙ্গদেহের সংস্কারের প্রভাবে কিন্তু মুক্তাত্মাগণের দেহধারণ প্রকৃতির সংস্কারের প্রভাবে হয় না, পরমাত্মার ইচ্ছায় হয়। অর্থাৎ মুক্তপুরুষগণ পরমাত্মা বা পরমেশ্বরের নিয়ন্ত্রণাধীনে চলে কিন্তু সাধারণ মানুষ সংস্কার অনুযায়ী প্রকৃতির ইচ্ছাধীনে চলে।

কর্মের বিশেষত্ব

শুভাশুভ ও মিশ্রিত কর্মফলের সংস্কার ত্রিবিধ, যথা—আগামী, সঞ্চিত ও প্রারব্ধ। সঞ্চিত কর্ম হল পূর্ব পূর্ব অসংখ্য জন্মজন্মান্তরের বাক্, মন ও দেহ সম্ভূত সূক্ষ্ম সংস্কারসমষ্টি। এরই অংশবিশেষ প্রারব্ধ সংস্কার রূপে বর্তমান ভোগায়তন দেহ ধারণ করে ফলবতী হয়। আগামী কর্মসংস্কার হল আত্মজ্ঞান লাভের পরেও যে সংস্কার প্রকাশ পায় অর্থাৎ ক্রিয়াশীল থাকে। প্রাক্তন সংস্কার অনুযায়ী যে ভোগায়তন স্থূলদেহ তৈরি হয় তাই হল প্রারব্ধ কর্মফল।

দেহ ধারণ করে, কর্মফল ভোগ করে অধ্যাত্মসাধনার মাধ্যমে সঞ্চিত আগামী কর্মের ফল নাশ করতে হয়। সুতরাং দেহধারণ করার একান্ত প্রয়োজন হয়। কর্মসংস্কারই জীবকে দেহধারণ করতে বাধ্য করে।

*** সৃজনীশক্তির বিকাশ, জীবনীশক্তির সংশোধন ও আত্মশক্তির জাগরণের জন্য শুদ্ধ পবিত্র ধার্মিকচিত্ত গরিবের ঘরে জন্ম হয় যাদের তারা ভাগ্যবান। প্রতিবন্ধক, বাধা ও প্রতিকূলতা না থাকলে আত্মশক্তির বিকাশ এবং জ্ঞানের উন্মেষ হয় না।

মাতৃমহিমা

মায়ের বা ঈশ্বরের ভীষণ উগ্র ধ্বংসের রূপকে যে বরণ করে নিতে পারে সে-ই পূর্ণ করে মাকে পায়। কিন্তু যারা প্রথম থেকেই জীবনের অনুকূল অবস্থা ও সুন্দর রূপ চায় তারা অপরের দোষ দর্শন করে, অপরকে নিন্দা করে শুধু বিরুদ্ধ অবস্থাই সৃষ্টি করে ও নিজেরা বিব্রত হয়। সর্বরকম বিরুদ্ধ অবস্থাকে আপনবোধে, সমবোধে বা ঈশ্বরজ্ঞানে মেনে মানিয়ে চললে বিরুদ্ধশক্তির প্রভাব বহুলাংশে কমে যায়। আত্মশক্তির পূর্ণ জাগরণ ও বিকাশ এবং একাত্মবোধের অনুভূতির জন্য সর্ববিধ বৈচিত্র্যের প্রয়োজন হয়।

মা সর্বাতীত আবার সর্বরূপা। তিনিই নির্গুণ এবং সগুণ তত্ত্ব স্বয়ং। সর্ববিধ বিকল্প ও নির্বিকল্পের মূল উপাদান সচ্চিদানন্দ ভূমাসাগর। 'মা' একটি নাম মাত্র। মাকে দিয়েই একমাত্র মায়ের পরিচয় নির্দিষ্ট হয়। ব্রহ্ম আত্মা ঈশ্বর পরব্রহ্ম পরমাত্মা পরমেশ্বর শিবরাম বিষ্ণু হরি নারায়ণ কৃষ্ণ গুরু সত্তাশক্তি পুরুষ প্রকৃতি দ্বৈতাদ্বৈত

প্রভৃতি যাঁর নাম বা সংজ্ঞা এবং এসবের দ্বারা যাঁকে নির্দেশ করা হয় মা তা-ই। নেতি ইতি সবই মায়ের ব্যবহার। ইতি মানে অস্তি সত্তা বা সগুণ এবং নেতি মানে নির্বিশেষ সত্তা। মাতৃবোধে ইতি ও নেতির অর্থ সমান।

সমগ্র শক্তি, জ্ঞান, আনন্দের পূর্ণস্বরূপ হল মা। সেইজন্য তাঁকে প্রেমস্বরূপ বলা হয়। 'মা' এবং প্রণব ওঁ সমান অর্থবোধক। এ হল নির্গুণ ও সগুণ উভয় ব্রহ্মেরই বাচক বা পরমাত্মার অমৃতময় দেহ। এই মা সর্ববিধ প্রকাশের উৎস। তিনি জাতি, বর্ণ, লিঙ্গের অতীত। আবার জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ রূপেও নিজেকে প্রকাশ করেন। এককথায় তিনি সর্বতত্ত্বের সার।

*** ঊর্ধ্ব সমষ্টি মনকেই বৃহৎ মন বলে। এই বৃহৎ মন হল বিশুদ্ধ মন। একে ব্রহ্মাণ বা আত্মন বলা হয়। বিশুদ্ধ মনকে অ-মনও বলা হয়। অ-মনের অর্থ বৃত্তিশূন্য অখণ্ড মন। বিশুদ্ধ বৃহৎ মনে বোধের সমভাব বা স্মৃতি থাকতে পারে।

*** কামময় পুরুষ হলেন ঈশ্বর। তিনি সমস্ত কামনার বীজ ও রূপ নিয়েই আবির্ভূত হন। বোধস্বরূপের পরিচয় বিশুদ্ধ বোধেই হয়। অশুদ্ধ মনে তাঁকে ধারণা বা অনুমান হয়। শুদ্ধ মন দ্বারা তাঁর অনুভূতি বা দর্শন হয়। বোধস্বরূপকেই মা, আত্মা, ব্রহ্ম, ঈশ্বর, আমি, তুমি নামে ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ বোধই তুমি আমি সব।

*** সমবোধ বা একবোধে আমির মধ্যে আমির খেলা বা লীলা হয়। আত্মার আমি, মায়ের আমি, তুমির আমি, আমির আমি সব মিলে সেই অখণ্ড ভূমা সমবোধের আমি।

*** আপনারে লয়ে আপনার খেলা তা-ই নিত্যলীলা। এ-ই নিত্য অদ্বৈত এবং ছিন্নমস্তার নিগূঢ় তত্ত্ব। শক্তির কেন্দ্রে যে শিবসত্তা তা হল জ্ঞানঘন। জ্ঞানের উৎকর্ষে হল আনন্দ এবং আনন্দের উৎকর্ষে হল প্রেম। জ্ঞানে হয় বিনাশ এবং প্রেমানন্দে হয় লীলাবিলাস। রাসলীলা এবং ঝুলনের তাৎপর্য এর সঙ্গেই যুক্ত। সৃষ্টির মধ্যে স্বয়ং মা-ই নিজেকে অবিরাম প্রকাশ করে চলেছেন। চৈতন্যসত্তায় বর্জনও নেই, ত্যাগও নেই।

ঋষির তাৎপর্য

মা যেমন ঋষি, মায়ের সন্তান আমিও ঋষি। 'ঋ' ও 'ষি' সংযুক্ত বর্ণই হল ঋষি। 'ঋ' হল পরমাশক্তি বা ঈশ্বরীয় শক্তি। এই শক্তি সবকিছুকে প্রকাশ করে। 'ষ' হল পুরুষ। তার সঙ্গে ইচ্ছা যুক্ত হয়ে 'ষি' হয়। এই 'ষি'-র অর্থ হল পূর্ণ প্রেম যা অভিব্যক্ত হয়ে আপনাকে পুরুষের কাছে নিবেদন করে। সেই পূর্ণপ্রেমের আত্ম-নিবেদনের নামই হল ঋষি[১]।

ভিন্ন ভিন্ন শব্দের তাৎপর্য

ঋষির বিপরীত ক্রম অর্থাৎ উল্টা উচ্চারণ হল ষিড়ি (সিঁড়ি)। সেইরূপ মনের উল্টা উচ্চারণ হল নম, ধারার উল্টা উচ্চারণ হল রাধা, নয়ত উল্টাভাবে উচ্চারণ করলে হয় তনয়, অর্থাৎ পুনঃপুনঃ উচ্চারণ করলে ঋষি—সিড়ি হয়, মন—নম হয়, ধারা—রাধা হয় এবং নয়ত—তনয় হয়। [১২।৫।৬৮]

ত্যাগ ও ভোগের বৈশিষ্ট্য

ত্যাগ ও ভোগ হল পরস্পর দুটি বিরুদ্ধ ভাব। ত্যাগের পথ হল নিবৃত্তির পথ এবং ভোগের পথ হল প্রবৃত্তির পথ। নিবৃত্তি মার্গী ত্যাগীগণ আত্মজ্ঞান লাভ করে জীবন্মুক্ত হবার জন্য সংসার ত্যাগ করেন এবং প্রবৃত্তি মার্গী ভোগীগণ সংসারে সুখলাভের আশায় সংসারে আসক্ত হয়।

১। অভিনব সংজ্ঞা।

ধর্ম প্রসঙ্গে নানা মুনির নানা মত

ধর্ম ও অধ্যাত্মসাধন সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। কেউ বলে সত্যই ধর্ম, কেউ বলে অহিংসা ধর্ম, কেউ বলে সেবা ধর্ম, কেউ বলে ত্যাগই ধর্ম, কেউ বলে নৈতিক জীবন যাপনই ধর্ম, আবার কেউ বলে অবস্থা বুঝে চলাই হল ধর্ম। কেউ পুরুষকারে বিশ্বাসী এবং কেউ বা দৈবে বিশ্বাসী, অর্থাৎ কারও মতে পুরুষকারই হল শ্রেষ্ঠ এবং কারও মতে দৈবই হল শ্রেষ্ঠ। আংশিকভাবে এরা সবাই সত্যসেবী। প্রত্যেক মতবাদেরই গুরুত্ব ও তাৎপর্য আছে। সর্ব মতপথের সার হল নিঃশ্রেয়স্কর মহাসত্য বা পরমসত্য। এই ধর্মলাভের উপায় বা পদ্ধতি সম্বন্ধেও নানা মুনির নানা মত। কেউ বলে প্রেমভক্তি শ্রেষ্ঠ, কেউ বলে আত্মজ্ঞান শ্রেষ্ঠ, কেউ বলে যোগধ্যান শ্রেষ্ঠ, কেউ বলে নিষ্কাম কর্ম শ্রেষ্ঠ, কেউ বলে আত্মচেষ্টাই শ্রেষ্ঠ, কেউ বলে আত্মসমর্পণই শ্রেষ্ঠ। কঠোরপন্থীগণ কঠোর তপশ্চর্যার উপরে প্রাধান্য দেয় বেশি, উদারপন্থীগণ উদারতার উপরে গুরুত্ব দেয় বেশি। মধ্যপন্থীগণ সব মেনে মানিয়ে চলার পক্ষপাতী। তাদের মতে ত্যাগীর কৃচ্ছ্রসাধনের কঠোরতা ও তীব্র বিরক্তি এবং ভোগীর ইন্দ্রিয়পরায়ণতা ও তীব্র ভোগাসক্তি উভয়ই ব্যাধিতুল্য ও বিকারগ্রস্ত। এরা কোন কিছুরই চরমভাবকে পোষণ করে না। সর্ববিষয়ে সামঞ্জস্য বজায় রাখাই হল এদের বৈশিষ্ট্য। এরা সমরস, সমবোধ, সমতা ও সমানত্বে বিশ্বাসী।

স্বভাবাত্মার বৈশিষ্ট্য

স্ব হল আত্মা। 'স্ব'-এর ভাবই হল স্বভাব। স্বভাবশক্তি হল এই প্রকৃতি। ঈশ্বরাত্মা স্বয়ং নিজের স্বভাবশক্তিকে প্রকাশ করেন এবং তার মধ্যে নিজেই অবস্থান করেন। তিনিই স্বয়ং সত্তাশক্তি, ভগবান ও ভক্ত, গুরুশিষ্য, পিতামাতা ও সন্তান প্রভৃতি। জ্ঞাতা-জ্ঞেয়-জ্ঞান রূপে তিনিই স্বয়ং লীলা করেন। তাঁর এই নিত্যলীলায় প্রকাশক রূপে তাঁর নিজের কোন পরিবর্তন নেই কিন্তু তাঁর শক্তি বা প্রকাশবৈচিত্র্যের বাহ্যিক রূপান্তর এবং পরস্পরের মধ্যে তারতম্য হয়। সমগ্র বিশ্ব হল ভগবানের আনন্দবিলাস ও লীলানিকেতন[১]।

*** অখণ্ড আনন্দ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বিষয়ভোগে পাওয়া যায় না। ভূমা আনন্দই হল অতীন্দ্রিয় আনন্দ।

*** ঈশ্বর আত্মা হলেন স্বয়ংপ্রকাশ। বিশেষ কোন সাধন পদ্ধতি তাঁকে লাভ করার প্রস্তুতি মাত্র।

*** কালের গতিচক্রে জগতের উত্থান পতন অর্থাৎ নিরন্তর পরিবর্তন হয়। এই পরিবর্তনের ধারা ধরেই যুগধর্ম প্রবর্তিত হয়। সত্যপ্রকাশের মান অনুযায়ী চারযুগের প্রবর্তন হয়েছে। চারযুগ হল যথাক্রমে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি। প্রতি যুগই চক্রাকারে ঘুরে আসে।

*** সত্যযুগে চতুষ্পাদই সত্য অর্থাৎ সবই সত্যময়। ত্রেতাযুগে চতুষ্পাদ সত্যের তিনপাদ মুক্ত ও একপাদ আবৃত। দ্বাপর যুগে চতুষ্পাদ সত্যের দ্বিপাদ মুক্ত ও দ্বিপাদ আবৃত। কলিযুগে চতুষ্পাদ সত্যের তিনপাদ আবৃত এবং একপাদ মাত্র মুক্ত।

*** ভগবানের প্রতি বিশুদ্ধ অনুরাগই হল বিশুদ্ধ প্রেম।

*** অখণ্ড পূর্ণসত্যকে (ঈশ্বর আত্মা ব্রহ্মকে) জীবনে আবিষ্কার করা ও তাঁর সঙ্গে একীভূত হয়ে যাওয়াই হল জীবনসাধনার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য।

সত্যের ত্রিবিধ রূপ

পৃথক জগৎ জ্ঞানে জগৎ অনিত্য ও মিথ্যা কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানে এ-ই ব্রহ্ম। জগৎ হল আত্মচৈতন্যের লীলায়িত সগুণ রূপ। এ পারমার্থিক সত্য নয় বটে কিন্তু ব্যবহারিক সত্য। এই ব্যবহারিক সত্যের মূলে আছে পারমার্থিক

১। স্বানুভূতির দৃষ্টিতে।

সত্য। ব্যবহারিক সত্যকে যথার্থ ব্যবহার করে পারমার্থিক সত্যের অনুভূতি লাভ হয়। সত্যের দ্বারাই সত্যের অনুভূতি লাভ হয়। মিথ্যার দ্বারা সত্যের অনুভূতি লাভ হয় না।

ব্রহ্মের ভাতিময় প্রকাশরূপ বা বিজ্ঞানরূপ হল জীবজগৎ এবং জীবজগতের মৌলিক সত্তা বা সত্যরূপ হল প্রজ্ঞানব্রহ্ম।

মিথ্যা হল সত্যের আভাস, অপূর্ণ অবস্থা বা পূর্ব অবস্থা। সত্যের[১] অর্থ হল যা সর্বকালে সর্বাবস্থায় সমানভাবে স্বয়ং বিদ্যমান থাকে এবং মিথ্যার অর্থ হল সত্যের বক্ষে সত্যের প্রকাশ অংশ।

সত্যবোধে সব মেনে নিলে সবই সত্যময় হয় এবং সত্যের পরিচয় যথার্থভাবে পাওয়া যায়। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সবকিছুই সত্যের অতি নগণ্য অংশ। এর প্রামাণ্য অংশ ইন্দ্রিয়াতীত। ব্রহ্মবোধে, আত্মবোধে, ঈশ্বরবোধে, সমবোধে বা একবোধে সবকিছুকে 'মেনে মানিয়ে চললে' অমৃতময় অখণ্ড সত্যে প্রতিষ্ঠা হয়। আপনি সত্য হলে জগৎ সত্য অনুভূত হয় এবং জগৎ সত্যবোধে আপন আত্মসত্তার অনুভূতি হয়; কিন্তু আপনাকে মিথ্যা বললে জগৎও মিথ্যা হয় এবং জগৎকে মিথ্যা বলে জেনে, সেই মিথ্যাতে বাস করে আপনাকেও মিথ্যা মনে হয়। একেই ভ্রান্তি বলা হয়। এক অখণ্ড আত্মবোধ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে পৃথক পৃথক বোধের বিষয়রূপে অনুভূত হয়। এই এক অখণ্ড বোধে পার্থক্য ও ভেদ প্রতীতি হল ভেদজ্ঞান, অজ্ঞান ও ভ্রান্তি।

জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, জ্ঞান এক অখণ্ড আত্মবোধেরই ত্রিবিধ প্রকরণ। এরা পরস্পর অভেদে যুক্ত। একটিকে বাদ দিয়ে অপর দুটি থাকে না। এই তিনভাবের অখণ্ড রূপ হল ব্রহ্ম আত্মা ঈশ্বর স্বয়ং। অখণ্ড সমবোধ বা একবোধে সবকিছুকে সত্য বলে মেনে নিলে নিজের মধ্যে সবকিছু এবং সবকিছুর মধ্যে নিজেকে সমানভাবে অনুভূত হয়। একেই আত্মজ্ঞান বলে।

অখণ্ড সত্যের বিজ্ঞান সবই সত্যময়, কারণ সত্য হতে যা জাত হয়, সত্যবোধে যা ব্যবহৃত হয়, সত্যের জন্য যা প্রয়োজন হয়, সত্য যা পরিবেশন করে বা প্রকাশ করে, সত্য যা জানে, আবার যা জানে না বা ব্যবহার করে না সবই এক সত্যের পরিচয়। জ্ঞাতাবোধে যা সত্য, জ্ঞেয় ও জ্ঞানরূপে সেই একই সত্য।

*** ব্রহ্মজ্ঞ ও আত্মজ্ঞ পুরুষের অখণ্ড সত্যানুভূতির কথা সাধকের কাছে প্রথমে দুর্বোধ্য থাকে, মধ্যে সাধ্য হয় এবং অন্তে সিদ্ধ হয়।

*** যা মহাপ্রাণরূপে সগুণ ঈশ্বর বা বিজ্ঞানাত্মা তা-ই সর্বভূতাত্মা ও বিশ্বাত্মা। এরই অখণ্ড পরিচয় হল পরব্রহ্ম, পরমাত্মা, পরমেশ্বর, পরমসত্য বা ভূমা অমৃতত্ব। মহাপ্রাণরূপী সগুণ ঈশ্বর বা বিজ্ঞানাত্মা স্বয়ং বৈচিত্র্যময় জীবজগতের উপাদান কারণ ও নিমিত্ত কারণ।

*** মহাপ্রাণই ভগবান। প্রাণেরই নাম গুরু ইষ্ট মা। প্রাণের ধর্ম নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত। প্রাণই নির্গুণ-সগুণ, ব্যক্ত-অব্যক্ত, বিদ্যা-অবিদ্যা।

*** মৃত্যু, সুখ, দুঃখ সবই বোধসত্তার এক একটি তরঙ্গ অর্থাৎ প্রাণেরই এক একটি বেদন। সবকিছুই মহাপ্রাণ বা বোধসত্তার বক্ষে ফুটে ওঠে আবার বোধের মধ্যেই লয় হয়ে যায়।

প্রাণ ও তার অধিষ্ঠান বোধের ক্রম

প্রাণ গতিশীল। বোধমাত্রই একটা শব্দ। শব্দ ছাড়া বোধ এবং বোধ ছাড়া শব্দ হতে পারে না। বোধই বিভক্ত

১। বিজ্ঞান দৃষ্টিতে সত্যের তিন রূপ—ব্যবহারিক, আভাসিক ও পারমার্থিক। ব্যবহারিক হচ্ছে জাগ্রত অবস্থা, আভাসিক হল স্বপ্ন ও ধ্যানাবস্থা এবং পারমার্থিক হল পূর্ণ সমাধি ও তদূর্ধ্বে নিত্যাদ্বৈত স্বানুভূতি।

হয়ে স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ, মহাকারণ; দেহ, মন, প্রাণ, বুদ্ধি, বিজ্ঞান; রূপ, নাম, ভাব, বোধ প্রভৃতি বৈচিত্র্যময় প্রকাশরূপে দৃশ্যমান[১] হয়।

গৌণপ্রাণ অর্থাৎ ব্যষ্টিপ্রাণ, মুখ্যপ্রাণ বা মহাপ্রাণের বক্ষেই ওঠে, ভাসে আবার লয় হয়। এইভাবেই হয় বৈচিত্র্যের সৃষ্টি।

চৈতন্য বা জ্ঞানের সাহায্য ছাড়া সৃষ্টি হয় না। আনন্দ হতে, আনন্দের দ্বারা, আনন্দের সৃষ্টি, আনন্দের মধ্যে স্থিতি, আবার আনন্দেই তার লয় হয়। সত্য ও জ্ঞান সম্বন্ধে এই একই নিয়ম। সত্য হতে, সত্যের দ্বারা, সত্যের সৃষ্টি, সত্যের মধ্যে স্থিতি, আবার সত্যেই তার লয় হয়। জ্ঞান হতে, জ্ঞানের দ্বারা, জ্ঞানের সৃষ্টি, জ্ঞানের মধ্যে স্থিতি, আবার জ্ঞানেই তার লয় হয়। একেই সচ্চিদানন্দ তত্ত্ব বলে।

দেহ আবরণ হল প্রাণের আশ্রয়। জগৎ হল ব্রহ্মের আশ্রয়, বিবর্ত। জগৎ না থাকলে ব্রহ্মেরও কোন তাৎপর্য থাকে না। ব্রহ্মকে জানতে হলে জগৎকে প্রয়োজন। জগতের আশ্রয় ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মের আশ্রয় হল জগৎ। এইভাবে আশ্রিত-আশ্রয়, আধার-আধেয়, আমি ও তুমি অবিচ্ছেদ্য—যেমন ফল ও বীজ।

প্রাণ হল জাগ্রত অবস্থা ও চৈতন্যময় অবস্থা। মৃত্তিকা হতে শুরু করে আকাশ, মহাকাশ, পরাকাশ, চিদাকাশ ও বোধাকাশ সবই মহাপ্রাণের অভিব্যক্তি। প্রাণ প্রাণের মধ্যেই জাত হয়, পুষ্ট হয়, আবার প্রাণেতেই লয় হয়।

প্রাণসাগর এক কিন্তু তরঙ্গ বহু। সমগ্র বিশ্ব হল আনন্দের মূর্তি। প্রাণ যখন আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে তখন হয় সৃষ্টি। সৃষ্টিই শেষ নয়। সৃষ্টিকে প্রাণ দিয়ে লালন, পালন ও পুষ্ট করে প্রাণচৈতন্যই আবার নিজের মধ্যেই ডেকে মিলিয়ে নেয়। মৃত্যুর অর্থ সাময়িক বিশ্রাম মাত্র। প্রাণ থেকে প্রাণ জাত হয়ে আবার প্রাণের বুকেই ঘুমিয়ে পড়ে।

যে-ব্যবহারের দ্বারা মানুষের মন সংকুচিত হয় তাই পাপ[২] এবং যে-ব্যবহার দ্বারা মন প্রসারিত হয় ও বিকশিত হয় তাই হল পুন্য[৩] বা সৎ।

প্রাণের বিশেষ একপ্রকার প্রকাশের নাম তেজ।

মহাপ্রাণেতেই সব জাত হয় বলে মহাপ্রাণকেই মা বলা হয়। মা বা প্রাণ অন্তরে বাইরে সমভাবে বিদ্যমান। বহির্জগতের কোন বস্তু জড় নয়, সবই প্রাণময় এবং চৈতন্যময়। জড়বস্তুকে আঘাত করলে প্রতিধ্বনি হয়। এই প্রতিধ্বনিই জানিয়ে দেয় প্রাণের অস্তিত্ব। কারণ, বোধ না থাকলে শব্দ হয় না। প্রাণের অস্তিত্ব জড়ের মধ্যে জড়ীভূত থাকে, রূপের মধ্যে তার বিশ্রাম।

নির্গুণ প্রশান্ত অবস্থাই চরম অবস্থা নয়। প্রশান্ত অবস্থাকে বোঝাবার জন্য একজন জ্ঞাতাও আছে।

নির্গুণগুণময়—এক যেথায় বহুরূপ হয়। সত্তায় এক, কিন্তু প্রকাশে বহু। প্রশান্ত অবস্থা বা নির্গুণ অবস্থা সত্তার মহিমা পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করে না। যেমন জড়ের মধ্যে প্রাণের অস্তিত্ব ও বিকাশ অনুভূত হয় না। জড় জড়কে জানে না। চৈতন্য সক্রিয় অবস্থায় জড়কেও জানে এবং চৈতন্যকেও জানে। প্রশান্ত অবস্থার ঊর্ধ্বে হল প্রশান্ত অবস্থার বোধ বা তার জ্ঞাতা, সাক্ষী। সুতরাং প্রশান্ত অবস্থারও অতীত অবস্থা আছে যা অব্যক্ত, অচিন্ত্যনীয় ও অবর্ণনীয়।

প্রাণের বাহ্যিক ব্যবহারের নাম সম্ভূতি বা বিভূতি এবং অন্তরে কেন্দ্রাভিমুখী ব্যবহারের নাম অসম্ভূতি বা অনুভূতি।

সন্ন্যাসের বৈশিষ্ট্য

বিশেষণের নাশই হল প্রকৃত বিনাশ এবং সন্ন্যাস। সত্যের বৈচিত্র্যময় প্রকাশকে অর্থাৎ পৃথক পৃথক বোধের

১। আত্মজ্ঞানের দৃষ্টিতে। ২। অভিনব সংজ্ঞা। ৩। অভিনব সংজ্ঞা।

বৃত্তি ও স্মৃতিকে সম্যক্‌রূপে ন্যাস করা অর্থাৎ অখণ্ড এক আপনবোধে সাজিয়ে নেওয়া এবং মানাই হল সন্ন্যাসের তাৎপর্য[১]। সন্ন্যাসে সর্ব বিশেষণের নাশ হয়ে একমাত্র বিশেষ্যই বর্তমান থাকে। সন্ন্যাস কোন উপায় নয়, এ হল পরিণাম। প্রকাশ ও বৈচিত্র্যই হল বিশেষণ অর্থাৎ এ হল গুণের খেলা।

অজ্ঞানমুক্ত জ্ঞানই হল সন্ন্যাস[২] সমবোধের অনুভূতিকেই সন্ন্যাস বলে। সর্বত্র যখন একবোধ হয় তখন হয় প্রকৃত সন্ন্যাস।

সন্ন্যাস মানেই হল পূর্ণতা। যার হৃদয় বিবেক, বৈরাগ্য, করুণা, মৈত্রী, ক্ষমা ও প্রেমে পরিপূর্ণ সেই হল সন্ন্যাসী।

*** সকলের দেহের মধ্যে প্রাণ যখন উপচে পড়ে তখনই হয় প্রেম।

*** ব্যবহারের সঙ্গে শ্রবণের মিলন হলে হয় দর্শন এবং দর্শন হলে হয় জ্ঞান।

*** দুঃখকষ্ট, আঘাত মানুষের অন্তরের সুপ্ত চেতনাকে জাগ্রত করে পূর্ণতার দিকে নিয়ে যায়। আঘাত এসে মানুষের চেতনার তরঙ্গকে বাড়িয়ে তোলে, জড়ত্বকে ভেঙে চৈতন্যময় করে এবং পরিণামে সমষ্টিচৈতন্যের তরঙ্গ মিলিয়ে মহাচৈতন্যসাগরে বা প্রাণসাগরে বিলীন করে। এইভাবে ব্যষ্টিসত্তা পূর্ণের সঙ্গে মিশে একীভূত হয়ে যায়।

*** সর্বরকম বিরুদ্ধ অবস্থা এবং প্রতিকূল অবস্থার প্রয়োজন হয় মানুষকে উদ্বেলিত ও উদ্বুদ্ধ করার জন্য এবং সকলের চেতনাকে জাগ্রত করার জন্য। ঘাত প্রতিঘাতে আসে সন্তাপ অর্থাৎ সম+তাপ। এতে তাপের সৃষ্টি হয়। এই তাপ মানুষকে নূতন বোধ এনে দেয় এবং পরিশেষে সে পূর্ণতা লাভ করে। [১৪।৫।৬৮]

আত্মানুভূতির বিজ্ঞান

ভগবানকে সর্বপ্রথম পাওয়া যায় অন্তরে, পরে স্থূলরূপে বাইরে এবং সর্বশেষে বোধতত্ত্বের সঙ্গে তাদাত্ম্য লাভ হয়। প্রথম ভগবানের কথা স্মরণ হয় অন্তরে অর্থাৎ তাঁকে পাওয়ার জন্য অন্তরে ইচ্ছা জাগে বা ইচ্ছারূপে তাঁর প্রকাশ হয়। পরে ব্যবহারের মাধ্যমে স্থূল বস্তু বা বিগ্রহকে অবলম্বন করে বাইরে তাঁর প্রকাশ হয়। আসল যোগাযোগ হয় বোধের মধ্যে। অর্থাৎ আপনবোধের মধ্যে বোধময় ঈশ্বরের পরিচয় মেলে। তখনই হয় বোধের সঙ্গে বোধের মিলন। একেই ব্রহ্মানুভূতি বা আত্মানুভূতি বা ঈশ্বরদর্শন বলা হয়।

বোধের সমতা বা পূর্ণতাই হল আত্মার স্বরূপ

ঈশ্বরলাভের বাসনা বা ইচ্ছা বা সংকল্প হল বোধের প্রথম অবস্থা, সাধনভজন ও ব্যবহারবিজ্ঞান হল বোধের মধ্যম অবস্থা এবং পরিণামে স্বানুভূতি হল বোধের উত্তম অবস্থা। এই ভাবেই সাধ্য, সাধন, সাধক ও সিদ্ধি চতুর্বিধ বোধের সমাধান[৩] হয়।

স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ অর্থাৎ অধিভূত, অধিদৈব ও অধ্যাত্ম এই ত্রিবিধ ধারণার মধ্যে সামঞ্জস্য হলে হয় সমবোধের অনুভূতি এবং সামঞ্জস্যের অভাবে হয় দ্বন্দ্ব, বিরোধ, দুঃখ, কষ্ট।

গুরুশক্তির সাহায্যেই শুধু এই তিনের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে এবং প্রীতিমধুর সম্বন্ধ স্থাপন করে ত্রিবিধ ব্যাধি হতে মুক্ত হওয়া যায়।

গুরুবোধের চতুর্বিধ স্তর

গুরুবোধের প্রথম আশ্রয় আধিভৌতিক, দ্বিতীয় আশ্রয় আধিদৈবিক, তৃতীয় আশ্রয় আধ্যাত্মিক এবং চতুর্থ

১। অভিনব সংজ্ঞা। ২। অভিনব সংজ্ঞা। ৩। স্বসংবেদ্য স্বানুভূতির পরিচয়।

আশ্রয় হল অধিযজ্ঞ (অখণ্ড ভূমাবোধসত্তা)। প্রথম তিনটি মিলে হয় পূর্ণতা অর্থাৎ পূর্ণজ্ঞান বা সমজ্ঞান। এই গুরুই সকলের হৃদয়ে আমিবোধের মধ্যে বসে আছেন। হৃদয়ে গুরুবোধের অনুভূতি হলে অধিযজ্ঞরূপে পরমাত্মগুরুর সন্ধান মেলে। এই পরমাত্মগুরুই সর্বব্যাপী অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম। এই গুরু সর্ব রূপ, নাম, ভাব ও বোধের সঙ্গে সমভাবে যুক্ত। এরই ঘনীভূত বিগ্রহ হল সদ্‌গুরু। গুরুকে যে-কোন নামে ব্যবহার করা চলে, যথা—মাতাপিতা, দেবতা, ইষ্ট ইত্যাদি, ইত্যাদি।

অধিভূতকে আশ্রয় অর্থ গুরুর স্থূল রূপকে আশ্রয় করা। স্থূল বস্তু মাত্রই অধিভূত। এ সর্বব্যাপী পরমাত্মগুরুর প্রতীক বা প্রথম বিগ্রহ।

অনন্ত অসীম বিশেষ রূপ যখন গ্রহণ করেন তাঁকেই বিগ্রহ[১] বলে। বিগ্রহ চতুর্বিধ, যেমন—রূপবিগ্রহ, নামবিগ্রহ, ভাববিগ্রহ এবং বোধবিগ্রহ।

ভাবচতুষ্টয় হল বোধস্বরূপের প্রকাশমাধ্যম

আসলে সবই বোধস্বরূপের ভাবঘন রূপ। রূপ, নাম, ভাব হল বোধস্বরূপের ভিন্ন ভিন্ন ভাবময় অভিব্যক্তি। ভাবের মাধ্যমেই তাদের ব্যবহার হয় ও অনুভূতি হয়। রূপ হল স্থূল ভাব, নাম হল সূক্ষ্ম ভাব; ভাবের নিজস্ব স্বরূপ হল সূক্ষ্মতর এবং বোধের স্বরূপ হল সূক্ষ্মতম। বোধের মধ্যে বোধের বিগ্রহ হল চতুর্থ। সবগুলি স্তরই হল বোধের ভিন্ন ভিন্ন তরঙ্গ।

ইষ্টতাদাত্ম্যের বিজ্ঞান

ইষ্টবোধের সঙ্গে অর্থাৎ ইষ্টের সঙ্গে মিলনের অর্থ হল বোধসত্তার সঙ্গে মনের মিলন[২]। এই মিলন স্থায়ী হলেই পূর্ণতা বা বোধের সমতা লাভ হয়। একেই ইষ্টতাদাত্ম্য বলা হয়। এই পূর্ণতালাভের জন্য যা প্রয়োজন তা চারভাবে বোধের কাছে আসে। এই চতুর্বিধ ভাবকেই চতুর্বিধ আহার বলে। এই চতুর্বিধ আহার স্থূল, সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতম ভেদে দেহের, প্রাণের, মনের ও বোধের আহার। স্থূলদেহের জন্য প্রয়োজন হল পাঞ্চভৌতিক আহার। একে আধিভৌতিক আশ্রয় বলা হয়। সূক্ষ্ম আহার হল ইন্দ্রিয়াদি ও অন্তঃপ্রাণের পুষ্টি। একে আধিদৈবিক আশ্রয় বলা হয়। সূক্ষ্মতর বা কারণ আহার হল সংস্কৃতিমূলক বোধবিজ্ঞানের ব্যবহার ও চর্চা। এই ত্রিবিধ আহার পুষ্ট হয়ে হয় বোধের বিজ্ঞান। বোধের বিজ্ঞান পরিশোধিত হলে হয় সূক্ষ্মতম আহার, সমবোধ বা একাত্মবোধ। এই চতুর্বিধ আহারই চতুর্বিধ বোধের আশ্রয়। এই বোধের অনুভূতির জন্য গুরুর দরকার হয়।

শিক্ষাগুরুর ত্রিবিধ ক্রম

শিক্ষাগুরু তিন প্রকার—তামসিক, রাজসিক ও সাত্ত্বিক। এই তিন প্রকার গুরুর কাছে পর্যায়ক্রমে অথবা একই সঙ্গে মানুষকে আশ্রয় ও শিক্ষা নিতে হয়। তাহলে পরে চতুর্থ স্তরের সূক্ষ্ম আহারের প্রয়োজনবোধ এবং তা প্রাপ্তির জন্য প্রচেষ্টা ও যোগাযোগ সহজেই এসে যায়। যার মাধ্যমে এই সুযোগ আসে তাকেই চতুর্থ আহার বলা হয়।

প্রথম গুরুমূর্তির কাছ থেকে জাগতিক পথ্যের সন্ধান মেলে। দ্বিতীয় স্তরের গুরুমূর্তির কাছ থেকে লৌকিক তথ্যের সন্ধান মেলে। তৃতীয় স্তরের গুরুমূর্তির কাছ থেকে আধ্যাত্মিক তথ্যের সন্ধান মেলে। চতুর্থ স্তরের গুরুমূর্তির কাছ থেকে তত্ত্বের সন্ধান ও অনুভূতি মেলে। চতুর্থ আহার অর্থাৎ সূক্ষ্মতম বোধকেই তত্ত্ব বলে।

১। অভিনব সংজ্ঞা। ২। ইষ্ট সাক্ষাতের তাৎপর্য।

তত্ত্বের পরিচয়

'তত্ত্ব' হল তৎ+ত্ব। 'তৎ' হল প্রজ্ঞানঘন ব্রহ্ম, আত্মা বা ঈশ্বর। 'ত্ব' হল তাঁর বিজ্ঞান, ঐশ্বর্য ও মাধুর্য। 'তত্ত্ব'[১] হল বিজ্ঞানযুক্ত প্রজ্ঞান অর্থাৎ অখণ্ড ভূমাস্বরূপ।

লঘু, ক্ষুদ্র, ছোট প্রভৃতি সকলেরই নিত্য আশ্রয় হল গুরু। সকলেই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে এই গুরুর আশ্রয়েই বাস করে।

মাতৃগুরুর মাহাত্ম্য

আত্মগুরুরূপী মা-ই তাঁর সন্তানরূপী সকল জীবের সর্বসত্তা ও শক্তি স্বয়ং। অর্থাৎ জীবের বহিঃসত্তা, অন্তঃসত্তা ও কেন্দ্রসত্তা সর্বত্রই তাঁর অধিষ্ঠান।

নানাবিধ প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে, অভাব দুঃখকষ্ট ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে জন্মজন্মান্তর দেহ হতে দেহান্তরে এই মাতৃগুরু সন্তানকে বহন করে নিয়ে যান পূর্ণতার দিকে।

চতুর্বিধ গুরুর কার্যক্রম

বহিঃসত্তা ও অন্তঃসত্তার দ্বন্দ্ব ও বিবোধের কারণগুলি এবং প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টিরহস্য তৃতীয় ও চতুর্থ গুরুমূর্তির কাছ থেকে জানা যায়। তৃতীয় গুরুমূর্তি কারণের সঙ্গে যোগাযোগ করে দেন এবং চতুর্থ গুরুমূর্তি কারণের সঙ্গে তাদাত্ম্য বা একবোধে প্রতিষ্ঠা করে দেন। বহির্জগতের স্থূল বিষয় অধিভূতের অন্তর্ভুক্ত কারণ সমষ্টির সম্বন্ধে এবং অধিদৈবের অন্তর্ভুক্ত বিকারের কারণ সমষ্টির সম্বন্ধে সচেতন করে দেন যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় গুরুমূর্তি। অধ্যাত্ম সত্তার বিকারের কারণ সম্বন্ধে সচেতন করে দেন তৃতীয় গুরুমূর্তি। অধ্যাত্ম সত্তার বিকারের কারণ অবগত হলে তা শোধনের জন্য বিজ্ঞানগুরুর (তৃতীয় গুরুমূর্তির) সাহায্য দরকার হয়। বিজ্ঞানগুরুর কৃপাতে আত্মজ্ঞান লাভ হয়, তারপর চতুর্থ স্তরের প্রজ্ঞানগুরুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হয়; অর্থাৎ আত্মজ্ঞানের দ্বারা পরমাত্মার সঙ্গে অভেদ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়[২]।

প্রজ্ঞানঘন পরমাত্মগুরু সর্বস্থানে সবকিছুর মধ্যেই নিত্যবিদ্যমান। অপর তিন গুরুমূর্তি তাঁরই ত্রিবিধ বিশেষ অভিব্যক্তি। এই ত্রিগুরুমূর্তি যথাক্রমে বিজ্ঞানময়, জ্ঞানময় ও অজ্ঞানময় সাজে জীবনের কেন্দ্রসত্তা, অন্তঃসত্তা ও বহিঃসত্তা রূপে বিদ্যমান। বিজ্ঞানগুরু হলেন ভাবময় অর্থাৎ সূক্ষ্মতর বোধের স্বরূপ। এঁকে বুদ্ধিসত্তা বলে। বিজ্ঞানগুরু সূক্ষ্মতর সর্ববিধ ব্যষ্টি ও সমষ্টি ভাবের আশ্রয় বা কেন্দ্র। জ্ঞানগুরু হলেন নামময় অর্থাৎ সূক্ষ্ম বোধের স্বরূপ। জ্ঞান হল মনের ধর্ম। জ্ঞানগুরু সূক্ষ্ম সর্ববিধ ব্যষ্টি ও সমষ্টি নামের আশ্রয় বা কেন্দ্র। অজ্ঞানগুরু হলেন রূপময় অর্থাৎ স্থূল বোধের স্বরূপ। একে বিষয় জ্ঞান বা ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান বলে। অজ্ঞানগুরু স্থূল সর্ববিধ ব্যষ্টি ও সমষ্টিরূপের আশ্রয় বা কেন্দ্র।

প্রজ্ঞানগুরু, বিজ্ঞানগুরু, জ্ঞানগুরু ও অজ্ঞানগুরু হলেন পরমাত্মার স্বরূপ মায়েরই চতুর্বিধ পরিচয়।

পরমাত্মারূপী মাতৃগুরুর ক্রিয়াবৈশিষ্ট্য

সন্তানের স্বভাবের সম্প্রসারণ ও আত্মবোধের জাগরণের জন্য দুঃখবেদন আঘাতের মধ্য দিয়ে প্রতিনিয়ত তিনি তাঁর সকরুণ দৃষ্টি দ্বারা নিজেই সন্তানকে পালন করেন ও রক্ষা করেন। শৈশব হতে যত আঘাত, বেদনা,

১। স্বসংবেদ্য স্বানুভূতি। ২। স্বানুভবসিদ্ধ তত্ত্ব সমাধান।

দুঃখ, কষ্ট মানুষ পায় জীবনের এক বিশেষ মুহূর্তে তার মূল্যবোধ অন্তরে জেগে ওঠে। মাতৃগুরুর কৃপাতেই তা সম্ভব হয়। আঘাত বা বেদনা যত অধিক হয় ততই অন্তরচেতনার উন্মেষ হয় এবং ততই মাতৃকৃপা বা গুরুকৃপা অধিক পরিমাণে বর্ষিত হয়। প্রথম প্রথম তা মেনে নেবার মত সামর্থ্য অনেকেরই থাকে না। কিন্তু যথাকালে এর তাৎপর্য অনুভবগম্য হয় এবং স্ববোধে এটা পরিস্ফুট হয় যে ব্যথা বেদনা আঘাত প্রতিকূলতা প্রভৃতি জীবনকে গড়ে তোলার পক্ষে বিশেষভাবে সাহায্য করে। অজ্ঞান ও জড়ত্বকে অপসারিত করার জন্য, সুপ্ত চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য ও অন্তরের শুদ্ধ বোধকে জাগ্রত করার জন্য মাতৃগুরুর স্নেহপরশ আঘাতরূপে সকলের কাছে আসে। সন্তানকে নাশ করার জন্য নয় বরং তার অন্তরসত্তার জন্য এবং মাতৃগুরুর মহিমা উপলব্ধি করে তার মধ্যে মিশে একীভূত হয়ে যাবার জন্য স্ববিরুদ্ধ রূপ, নাম, ভাবের মাধ্যমে মাতৃগুরুই স্বয়ং সন্তানের কাছে উপস্থিত হন।

সত্যবোধ, অস্তিত্ববোধ এবং চৈতন্যের প্রকাশ যার উপর নির্ভর করে সেই একান্ত প্রয়োজনীয় মাতৃকৃপা বা গুরুকৃপা প্রথমে মানুষের কাছে আসে বেদনারূপে। এই বেদনাই অন্তরে তাপ সৃষ্টি করে ভাবশুদ্ধির সহায়ক হয়। বেদনা পরিমার্জিত হয়ে বেদন, জ্ঞান বা বোধরূপে পরিণত হয়।

বেদনার ক্রমবিকাশ বা পরিণাম হল বেদ

বেদনের পরিণাম হল বেদ বা আপ্তবাক্য। বেদনার বিশুদ্ধ অবস্থাই হল বেদস্বরূপ আত্মজ্ঞান। সুতরাং জড়ত্বকে ভাঙ্গতে, স্থূলকে পরিচালিত করতে, অন্ধকার বা মৃত্যুকে নাশ করতে, সুপ্ত চেতনাকে জাগাতে, লঘুকে গুরু বানাতে, অহংকারকে ত্বংকারে রূপায়িত করতে, অভিমানকে সমবোধে পরিণত করতে মাতৃগুরুর যে প্রকাশমূর্তি সন্তানের নিকট ভিন্ন ভিন্ন বেশে বিভিন্ন সময়ে আবির্ভূত হয় তাই হল বেদনা[১]।

বেদনার রূপ অনন্ত। বেদনারূপী মাতৃগুরু জীবনের বহিঃসত্তায় বৈচিত্র্যরূপে নিজেকে প্রকাশ করে। এই বৈচিত্র্যময় বহিঃসত্তা পুনঃপুনঃ বিকৃত ও রূপায়িত হয়। এই বিকারই হল বেদনার কারণ। জন্মমাত্রই মানুষ বিকারের সঙ্গে প্রথম যুক্ত হয়। এই বিকারের বেদনা আত্মজ্ঞান লাভের পূর্ব পর্যন্ত থাকে, কিন্তু আত্মজ্ঞান লাভ হলে আর থাকে না। এ বিকার জীবকে স্থূল হতে সূক্ষ্মে এবং সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতরে বহন করে নিয়ে যায় এবং পরিশেষে সূক্ষ্মতম প্রজ্ঞানস্বরূপে সকলকে লীন করে দেয় এবং নিজেও তার মধ্যে মিলিয়ে যায়।

বেদনা পরিমার্জিত হতে হতে পরিণামে বেদরূপে বা শুদ্ধসত্ত্বরূপে যখন আত্মপ্রকাশ করে তখন বেদনার স্মৃতি বেদস্বরূপ আত্মজ্ঞানের কাছে কৃপার বিষয় হয়। অন্তর্বেদনের মাধ্যমে বেদনা যখন বেদরূপে অভিব্যক্ত হয় তখনই সত্তাবোধ বা আত্মবোধের পূর্ণতা উপলব্ধি হয়। এ জীবনের মাধ্যমে প্রকাশিত হয় বলে একে আপ্তবাক্য বা জীবনবেদ[২] বলা হয়।

প্রথম গুরুমূর্তির কর্মপদ্ধতি

স্থূলবোধের ঘনীভূত রূপ প্রথম গুরুমূর্তি জীবনকে পরিপূর্ণ করার জন্য মানুষের সামনে এসে উপস্থিত হয় সর্বপ্রথম। তার সঙ্গে সকলের যে নিত্য সম্বন্ধ তা সে পর্যায়ক্রমে প্রকাশ করে। তার এই প্রকাশের ধারা অভাব বা অজ্ঞানরূপে প্রথম অনুভূত হয়। অভাব বা অজ্ঞান হল অষ্টবিধ ধাতু। অষ্টপ্রকৃতি হল ভূমি, জল অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহংকার। ধাতু অষ্টক হল ত্বক, স্নায়ু, মাংস, রক্ত, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র।

১। অভিনব সংজ্ঞা, স্বানুভবসিদ্ধ। ২। অভিনব সংজ্ঞা, বিজ্ঞান দৃষ্টিতে।

দ্বিতীয় গুরুমূর্তির কর্মপদ্ধতি

সূক্ষ্মবোধের ঘনীভূত রূপ দ্বিতীয় গুরুমূর্তি প্রথম গুরুর অসমাপ্ত কাজকে পরিপূর্ণ বা সমাপ্ত করার জন্য পঞ্চবিধ দুঃখ, ঐশ্বর্যাষ্টক ও দেবতাষ্টকরূপে মানুষের কাছে আবির্ভূত হয়ে জীবনকে পূর্ণতর ও উন্নততর হতে সাহায্য করে।

তৃতীয় গুরুমূর্তির কর্মপদ্ধতি

পঞ্চবিধ দুঃখ হল গর্ভবাস, জন্ম, জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু। ঐশ্বর্যাষ্টক হল অণিমা, লঘিমা, ব্যাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিত্ব, বশিত্ব ও কামবসায়িতা। দেবতাষ্টক হল ব্রহ্মা, প্রজাপতি, ইন্দ্র, গন্ধর্ব, যক্ষ, রাক্ষস, পিতৃগণ ও পিশাচ। সূক্ষ্মতর বোধের ঘনীভূত রূপ তৃতীয় গুরুমূর্তি দ্বিতীয় গুরুর অসমাপ্ত কাজকে পূর্ণ করার জন্য এবং জীবনকে স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য পঞ্চবিধ ক্লেশ, ভাবাষ্টক ও গুণাষ্টক[১] রূপে মানুষের কাছে আবির্ভূত হন। তৃতীয় গুরু আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত করে দেন। এই তৃতীয় গুরুই হলেন স্বয়ং কেন্দ্রবোধ এবং সমভাবের ঘনীভূত মূর্তি। তারপরে চতুর্থ স্তরের গুরুর সঙ্গে প্রথম সম্বন্ধ হয় এবং পরে তাঁর সঙ্গে তাদাত্ম্য লাভ হয়।

বেদনার তাৎপর্য

সর্ববিধ দ্বৈত প্রতীতি ও ভেদজ্ঞান অপসারিত হয়ে গেলে প্রথমেই আসে বেদনা। বেদনা শব্দের মর্মার্থ— (১) বেদ+না, (২) বে+দনা, (৩) বেদন+আ।

বেদন বা জ্ঞান আনন্দযুক্ত হলে পূর্ণ হয়, অথবা যখন তা পূর্ণ হয় তখন তা আনন্দে প্রতিষ্ঠিত হয় বা আনন্দস্বরূপ প্রাপ্ত হয়। জ্ঞান ও আনন্দের যুগল মিলনের ফলে প্রেমের অভিষেক হয়। প্রথমে বেদনা, মধ্যে বেদন এবং অন্তে বেদস্বরূপ।

বেদনার আঘাতে জীবন যখন প্রপীড়িত হয় তখন সে তার কারণ অবগত হতে চায় এবং যার মাধ্যমে তা অবগত হয় সে-ই হল প্রথম গুরু। এ হল জীবনের প্রথম অধ্যায়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে দ্বিতীয় গুরুমূর্তি সংবেদন রূপে অন্তরে জেগে ওঠে। জীবনের তৃতীয় অধ্যায়ে সংবেদনের পরিণাম বেদমূর্তিরূপে অভিব্যক্ত হয়, অর্থাৎ জ্ঞান পরিপক্ক হয়।

তমাদি তিন গুণের পরিণামে জীবনের ত্রিবিধ অধ্যায়

জীবনের প্রথম অধ্যায়ে তমোগুণের প্রাধান্য অধিক থাকে। এই তমোগুণকেই অজ্ঞান মায়াশক্তি বলা হয়। অজ্ঞান মায়াশক্তি হল বেদনা। দ্বিতীয় অধ্যায়ে রজোগুণের প্রাধান্য বেশি। রজোগুণকেই জ্ঞান বা মহামায়াশক্তি বলে। এই জ্ঞানের অর্থ প্রকৃত জ্ঞান। জীবনের তৃতীয় অধ্যায়ে সত্ত্বগুণের আধিক্য বেশি। সত্ত্বগুণই হল বিজ্ঞান ও যোগমায়া শক্তি।

প্রথম অধ্যায়ে ব্যক্তিগত স্বার্থে কর্ম হয়, দ্বিতীয় অধ্যায়ে সমষ্টির স্বার্থে কর্তব্যবোধে কর্ম হয়, তৃতীয় অধ্যায়ে নিষ্কাম কর্ম হয়। প্রথম অধ্যায়ে জ্ঞান হল অপূর্ণ। এ হল ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান। একে বস্তু জ্ঞান বা তামসিক জ্ঞান বলা হয়। এ-ই হল অভাব অজ্ঞান। দ্বিতীয় অধ্যায়ের জ্ঞান হল কর্মজ জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা এবং মানসিক ধারণা বা পুঁথিগত জ্ঞানের ধারণা। একে রাজসিক জ্ঞান বলে। তৃতীয় অধ্যায়ের জ্ঞান হল অভিজ্ঞতার জ্ঞান। একেই সাত্ত্বিক জ্ঞান বলে। সাত্ত্বিক জ্ঞানই হল শুদ্ধজ্ঞান এবং শুদ্ধজ্ঞানকেই আত্মজ্ঞান বলে।

১। দয়া, ক্ষমা, অনসূয়া, শৌর্য, অনায়াস, মঙ্গল, অকার্পণ্য ও অস্পৃহা।

অন্তরে বেদের পূর্ণ অভিব্যক্তি হলেই আত্মজ্ঞান লাভ হয়

জ্ঞান পরিপক্ক অবস্থায় এলে, অর্থাৎ অন্তরে বেদের অভিব্যক্তি হলে, বিজ্ঞানরূপী মাতৃগুরুর সঙ্গে সাযুজ্য লাভ হয়, অর্থাৎ আত্মজ্ঞান লাভ হয়।

গুরুর মহিমা

গুরুর কাজ লঘুকে গুরুবোধে পরিণত করা, স্বল্পকে ভূমাতে পরিণত করা, সসীমকে অসীমে পরিণত করা, অজ্ঞানকে জ্ঞানে পরিণত করা, বৈচিত্র্যবোধকে এক অখণ্ডবোধে পরিণত করা এবং মৃত্যুকে অমৃতময় করে দেওয়া। এই হল মাতৃগুরুর স্বভাব। প্রতি প্রাণের অভিব্যক্তি স্বভাবের বিচিত্র ধারায় মাতৃগুরুকে আশ্রয় করে আছে। এই গুরুর দ্বারাই পুষ্ট ও তুষ্ট হয়ে তারা পরিণামে গুরুর সঙ্গে মিশে একীভূত হয়ে যায়।

সমগ্র বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তরপ্রকৃতির মহামিলনের ফলে হয় দিব্যজীবন[১]। সমগ্র ব্যষ্টিসত্তাকে পূর্ণতা দান করা ও জড় কণাকে চিন্ময় করা হল মাতৃগুরুর কাজ। মানুষ নিজের প্রয়োজনবোধ সম্বন্ধে যতটুকু সচেতন তদপেক্ষা অধিক সচেতন হলেন অন্তরাত্মারূপী বিজ্ঞানগুরু। কারণ সকলেই তাঁর অংশ, সন্তান বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গরূপে নিত্য তাঁর সঙ্গেই যুক্ত।

যা হতে জাত হয়ে, যার মধ্যে থেকে বর্ধিত হয়ে, যার মধ্যে পরিপূর্ণতা লাভ করে স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠা হয় সে-ই পরম বা শ্রেষ্ঠ আশ্রয়, সকলেরই একান্ত আপন বা সর্বাধিক প্রিয়। এই আশ্রয় হল আত্মশক্তি বা বিজ্ঞানময় মাতৃগুরু। যাঁকে পরিমাণ করা যায় না, যাঁর সীমা খুঁজে পাওয়া যায় না এবং ক্ষমাগুণ যাঁর সর্বোত্তম স্বভাব তাঁকেই বলে মা, তাঁকেই বলে ভূমা[২]। সমতা, পূর্ণতা, একতা, নিত্যতা এবং প্রেমানন্দ হল তাঁর সত্য স্বরূপ। এই ভূমাই হল আত্যন্তিক সুখ, জ্ঞানানন্দ ও পরম শান্তিস্বরূপ। তাঁকেই বলে ব্রহ্ম, আত্মা, ঈশ্বর, পরব্রহ্ম, পরমাত্মা, পরমেশ্বর।

চতুর্বিধ গুরুমূর্তির মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ

প্রথম গুরুমূর্তি সমগ্র স্থূল বোধের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। দ্বিতীয় গুরুমূর্তি সমগ্র সূক্ষ্ম বোধের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়, তৃতীয় গুরুমূর্তি সমগ্র সূক্ষ্মতর বোধের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয় এবং চতুর্থ গুরুমূর্তি অখণ্ড ভূমা বোধসত্তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। চতুর্থ গুরুমূর্তির কৃপা ও অনুগ্রহে ব্যষ্টিজীবন পরমতত্ত্বের সঙ্গে তাদাত্ম্যলাভ করে। তখন সব মিলে এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দসাগরের অনুভূতি স্বতঃস্ফূর্ত হয়। তৃতীয় গুরুমূর্তির কৃপায় অন্তরে বাইরে এক অখণ্ড চৈতন্যের লীলাই অনুভূত হয়। তখন সবই সত্যময়, বোধময় ও প্রাণবন্ত অনুভূত হয়। চতুর্থ গুরুমূর্তির কৃপাতে সবই আনন্দময় প্রেমময় অর্থাৎ সচ্চিদানন্দঘন সত্যমূর্তি রূপে অনুভূত হয়। এই সচ্চিদানন্দ মূর্তিই হল সচ্চিদানন্দময়ী মা স্বয়ং।

সমবোধের বিজ্ঞানের তাৎপর্য

সমবোধের[৩] বিজ্ঞানকেই আত্মবিজ্ঞান বা প্রজ্ঞানের বিজ্ঞান বলে। এর যথার্থ শ্রবণ প্রথমে দরকার, তারপরে শ্রবণ অনুরূপ মনন ও দর্শন এবং তৃতীয় অবস্থায় মননের ফলে নিদিধ্যাসন বা বোধের সমত্বে স্থিতিলাভ হয়।

নাড়ির প্রসঙ্গ

মানুষের দেহের নাড়ির সংখ্যা হল বাহাত্তর কোটি বাহাত্তর লক্ষ দশ হাজার দু'শ এক[৪]। মনুষ্য জীবনের অন্তরে বাইরে যতরকম বৈচিত্র্য অনুভূত হয় সেই সবের কারণ নিহিত আছে এই নাড়িগুলির মধ্যে প্রবাহিত

১। অভিনব সংজ্ঞা। ২। অভিনব সংজ্ঞা। ৩। স্বসংবেদ্য স্বানুভূতির দৃষ্টিতে। ৪। স্বসংবেদ্য স্বানুভূতির বিজ্ঞান দৃষ্টিতে।

চৈতন্যযুক্ত প্রাণধারায়। তন্ত্রী বা নাড়িগুলিকে পর্যায়ক্রমে সমসুরে বা একসুরে বেঁধে নিতে একান্তভাবে সহায়তা করে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ গুরুমূর্তি সকলেই। অর্থাৎ বেদনা হতে বেদন এবং তা থেকে প্রতি বোধ অনুযায়ী অখণ্ড বোধসত্তায় পরিণত হওয়া পর্যন্ত সকল বোধের স্তর।

অভী মন্ত্রের তাৎপর্য

সৎ-এর প্রভাবে ও বোধের স্থিতি হলে মানুষ অভী হয়। গুরুকৃপার লক্ষণই হল এই অভী হয়ে যাওয়া।

[১৬।৫।৬৮]

মনের মাহাত্ম্য

সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার সবই মানসিক ব্যাপার। মনের উর্ধ্বে হল প্রশান্ত স্থির চৈতন্যস্বরূপ আত্মা, ব্রহ্ম ও ঈশ্বর। আত্মা, ব্রহ্ম ও ঈশ্বর অমৃতস্বরূপ। তাঁর বন্ধনও নেই, মুক্তিও নেই।

মনই বন্ধন ও মুক্তির কল্পনা করে এবং তদনুরূপ আচরণ করে।

যা দ্বারা ঈশ্বর নিজেকে ব্যক্ত করেন তা-ই হল তাঁর স্বভাবশক্তি ও প্রকৃতি। সমগ্র বিশ্বই হল ঈশ্বরের প্রকাশরূপ বা লীলারূপ। ঈশ্বরের স্বভাবপ্রকৃতি হল সমগ্র মন এবং এই মনই হল লীলার কারণ[১]।

স্বভাবলীলার তাৎপর্য

নিজের পূর্ণতা উপলব্ধি যখন একঘেয়ে হয়ে যায় তখন আবার স্বভাবের বিলাস আরম্ভ হয়। একঘেয়েমি ঈশ্বরের স্বভাববিরুদ্ধ। অখণ্ড প্রশান্তি (Infinite peace—Silence in Silence) হল তাঁর নিত্য স্বভাব। নিরন্তর এই প্রশান্ত অবস্থায় তিনি থাকতে চান না। এই প্রশান্ত ভাব (Silence in Silence) যখন একঘেয়ে হয় তখন তা সক্রিয় হয় অর্থাৎ (Silence in action) হয়। তখনই সৃষ্টি আরম্ভ হয়।

নির্গুণ ও সগুণস্বরূপের পরিচয়

নির্গুণস্বরূপই হল নির্বিকার প্রশান্ত নিষ্ক্রিয় নির্বিশেষ অমৃতময় পরমতত্ত্ব। এই নির্গুণস্বরূপই স্বেচ্ছায় স্বভাববিলাসে সগুণ হয়। তাঁর সগুণ ভাবের বৈচিত্র্যময় প্রকাশরূপই হল জীবজগৎ।

সগুণের ভাব লীলা নিমিত্ত সৃষ্টির মানসে ছড়িয়ে পড়ে। এই ছড়ানো ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি বা আবর্তগুলি হল অনন্ত জীবন। এরা দীর্ঘকাল গতিশীল চক্রের মধ্যে পুনঃপুনঃ লীলায়িত হতে থাকে। সৃষ্টি স্থিতি সংহার হল এই লীলার ত্রিবিধ ভঙ্গিমা। অনন্ত ব্যষ্টিজীবনের মাধ্যমে ঈশ্বরের এই লীলা অভিনয় অবিরাম ধারায় চলে। জীব যখন এই গতিচক্রের প্রভাবমুক্ত হয়ে Silence আস্বাদন করতে চায় তখনই জীবনের গতি কেন্দ্রসত্তার স্থিতির দিকে বা স্বভাবের স্থিতির দিকে এগিয়ে চলে। তখনই হয় action in Silence। তার পরিণামে আবার সে Silence in Silence-এ ফিরে আসে অর্থাৎ তার নিত্য শাশ্বত অদ্বয় অব্যয় অমৃতময় প্রশান্ত স্বরূপে ফিরে আসে। প্রশান্ত চিত্তই হল অ-মন। অ-মনই হল আত্মার[২] স্বরূপ।

জ্ঞানযোগের মাধ্যমে নির্গুণ ব্রহ্মের উপলব্ধি হয় এবং ধ্যানযোগের মাধ্যমে পরমাত্মানুভূতি হয়। ত্যাগবৈরাগ্য ও জ্ঞানবিচারের মাধ্যমে প্রকৃতির সর্ববিধ ক্রিয়াকে অনিত্য ও মিথ্যা জেনে তাকে সর্বতোভাবে পরিহার করাই হল জ্ঞানযোগের সাধনা। একেই নেতিবাদ বলে।

১। আত্মবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে। ২। অভিনব সংজ্ঞা।

ইন্দ্রিয়বৃত্তির সংযম করে ধ্যানের মাধ্যমে মনকে কেন্দ্রীভূত করে হৃদয়ে এক বিন্দুতে সন্নিবেশিত করাকে আত্মধ্যান বলে।

ভগবৎ অনুভূতির বৈশিষ্ট্য

প্রেম ও ভক্তিযোগের মাধ্যমে ঈশ্বর বা ভগবানের অনুভূতি হয়। এই ভগবান বা ঈশ্বর হল নির্গুণের সগুণ বিগ্রহ অর্থাৎ নির্গুণগুণী। সে-ই স্বয়ং সর্বেন্দ্রিয় যুক্ত হয়েও অতিপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়াতীত বোধে প্রতিষ্ঠিত দিব্যমানব। প্রেম ও অনুরাগের মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে মনের যে যোগাযোগ হয় তাকেই ভক্তিযোগ বলে। একবোধে, সমবোধে বা আপনবোধে সবকিছু মেনে মানিয়ে চলাই হল ভক্তিযোগের সাধনা। একেই 'ইতিবাদ' বলে। জ্ঞানীর ত্যাগবৈরাগ্য এবং যোগীর সংযম ও ধ্যানের যুগপৎ ব্যবহারই হল ভক্তিযোগের বিশেষত্ব। জ্ঞানী বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্বকে অবলম্বন করে সেই একেতেই প্রতিষ্ঠিত থাকে। যোগী সর্বত্র সমত্বের সাধনা করে সমত্বে প্রতিষ্ঠিত থাকে। ভক্ত একের সগুণবিলাস বা বৈচিত্র্য ব্যবহারে প্রতিষ্ঠিত থাকে। ব্রহ্মবাদীরা ব্রহ্মকে খোঁজে নিজের আমির মাঝে। এই আমি হল এক অখণ্ড বোধময় জ্ঞানময় নিত্যসত্তা। ব্রহ্মতত্ত্বের সঙ্গে নিজের তাদাত্ম্য উপলব্ধিই হল জ্ঞানীর লক্ষ্য। 'ব্রহ্মাস্মি' তার মূলমন্ত্র। যোগী আত্মাকে খোঁজে আপন হৃদয়ে অনুভূতির কেন্দ্রে, প্রাণের কেন্দ্রে ও মনের কেন্দ্রে। পরমাত্মতত্ত্বের সঙ্গে সাযুজ্য লাভই হল যোগীর লক্ষ্য। আত্মধ্যানই তার সাধন। 'হংসঃ সোহম' ও 'শিবোহং' তার মূলমন্ত্র। প্রেমিক ভক্ত তার প্রিয়তম ইষ্ট ও ভগবানকে খোঁজে অন্তরের বাইরে অতিপ্রাকৃত জীবনবোধের মধ্যে। প্রেম, ভালবাসা, অনুরাগ সবই হল তার সাধন। যেমন জ্ঞানীর ব্রহ্মই সত্য, ব্রহ্মই নিত্য এবং যোগীর পরমাত্মা সর্বভূতাত্মা, সেইরূপ ভক্তের ভগবান সর্বরূপেই বিদ্যমান। সর্বনামই তাঁর পরিচয়। সর্বভাবই হল তাঁর অনুভূতি। সে এক অদ্বয় অব্যয় প্রেমঘন আনন্দ ও রসময় নির্গুণ-সগুণস্বরূপ।

অবতারের বৈশিষ্ট্য

অবতার হল মানবের মাঝে অতিমানব বা দিব্যমানবের আত্মবিকাশ। অবতারই ভগবান স্বয়ং। তিনি সচ্চিদানন্দঘন প্রেমময় ও সর্বশক্তিমান এবং শক্তি ও মাধুর্য উভয় ভাবের সর্বশ্রেষ্ঠ জীবন্ত উদাহরণ।

মাধুর্য হল প্রেমানন্দের পূর্ণ অভিব্যক্তি বা পূর্ণ প্রকাশ।

ভগবৎস্বরূপের চতুর্বিধ পরিচয়

শক্তির পরিণাম জ্ঞান, জ্ঞানের পরিণাম আনন্দ এবং পূর্ণানন্দই হল পূর্ণ প্রেম। এই ভগবানের নিত্যলীলায় আনন্দই কারণ, আনন্দই কার্য এবং আনন্দই পরিণাম বা ফল। সবকিছু আনন্দ হতেই জাত হয়ে আনন্দে বাস করে আবার আনন্দতেই মিশে যায়। এই নিত্যানন্দের প্রকাশরূপও সত্য। নিত্যসত্যই হল অস্তিত্ব, বিদ্যমানতা, থাকা বা অবস্থান করা অর্থাৎ যা-কিছু আছে এ তারই প্রমাণ। জগতে বস্তুরূপে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যা, তাও আনন্দের কার্য। ইন্দ্রিয়ধর্ম, প্রাণধর্ম এবং বুদ্ধির ধর্ম সবই আনন্দের ভিন্ন ভিন্ন কার্য মাত্র। ইন্দ্রিয়গণ নিরন্তর প্রীতিকর বস্তুকেই আহরণ করে বা গ্রহণ করে এবং সেই সব সংগৃহীত বস্তু হতে মন প্রীতি ও আনন্দকেই আস্বাদন করে।

বিসর্গের তাৎপর্য

যা সহজে দেওয়া হয় বা পরিত্যাগ করা হয় তা দ্বারা নূতন নূতন সৃষ্টি ও পুষ্টি সাধিত হয়। এই স্বতঃস্ফূর্ত

ত্যাগরূপ কর্মকেই পণ্ডিতগণ বিসর্গ বলেন। সহজ ত্যাগ হল প্রীতিপূর্বক ত্যাগ। আনন্দাতিশয্যে এই স্বাভাবিক ত্যাগকেই যজ্ঞকর্ম বলে (যজ্ঞার্থে কর্ম)।

সর্বজীবই আপন আপন প্রয়োজনীয় অংশ গ্রহণ করে বাকি অংশ পরিত্যাগ করে। এই ধারা সমগ্র সৃষ্টির মধ্যেই পরিলক্ষিত হয়। এ হল ভগবানের মাধুর্যরূপের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

লীলাময় পুরুষের মহিমা

বিশ্বপ্রকৃতি বিশ্বপুরুষের লীলামাধ্যম। কার্য-কারণ হল প্রকৃতির বিজ্ঞান। স্থূল হল কার্য এবং সূক্ষ্ম হল কারণ। দ্রষ্টাপুরুষের কাছে এগুলি দৃশ্যমাত্র। আদ্যাশক্তি অব্যক্ত প্রকৃতি হল তিন গুণের সাম্য অবস্থা বা নিষ্ক্রিয় অবস্থা। পুরুষের প্রীত্যর্থে তা সক্রিয় হয়ে লীলায়িত হয়।

ব্যষ্টি ও সমষ্টির দেহের সম্বন্ধ

স্থূলদেহ তৈরি হয় সূক্ষ্ম পঞ্চভূতের পঞ্চীকরণের দ্বারা। পঞ্চভূতের পঞ্চীকরণই হল পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব। সূক্ষ্মদেহ তৈরি হয় সপ্তদশ তত্ত্ব দ্বারা। সমষ্টি সূক্ষ্মদেহ হতে ব্যষ্টি সূক্ষ্মদেহ তৈরি হয় এবং উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ অভিন্ন এবং উভয়েই সমধর্মী।

আহার প্রসঙ্গ

যোগ্যতা, সামর্থ্য ও গুণ অনুসারে অত্যাবশ্যকীয় বলে যা সকলে গ্রহণ করে বা আহরণ করে তা-ই আহার[১]। এই আহার বা অন্ন মূলত তিন প্রকার—স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ বা সূক্ষ্মতর (অতি সূক্ষ্ম)। এই সব মিলে হয় চতুর্থ আহার। চতুর্থ আহার হল সূক্ষ্মতম।

পঞ্চভূতের পরস্পরের বৈশিষ্ট্য

পঞ্চভূতের মধ্যে আকাশ ও বায়ু হল অদৃশ্য এবং অগ্নি, জল ও পৃথিবী হল দৃশ্য অর্থাৎ পূর্বাপেক্ষা পরবর্তীটি স্থূল, স্থূলতর ও সসীম। আকাশের আকার নেই, ক্রিয়া বা গতিও নেই, কিন্তু ব্যাপ্তি ও স্থিতি আছে। বায়ুর আকার নেই, স্থিতি নেই, কিন্তু ক্রিয়া, গতি ও ব্যাপ্তি আছে। অগ্নি ও জলের আকার ও ক্রিয়া আছে কিন্তু স্থিতি ও ব্যাপ্তি নেই। পৃথিবীর আকার ও স্থিতি আছে কিন্তু গতি নেই। পঞ্চভূতের মধ্যে একমাত্র অগ্নি বা তেজই হল প্রকাশাত্মক। এর ক্রিয়া ও গতি আছে। এই তিনটি সমভাবে ধারণ, বহন ও পরিবেশন করতে পারে। অগ্নির স্বভাব বা ধর্ম হল প্রকাশ। এই অগ্নিই সমগ্র স্থূল সৃষ্টির একমাত্র কর্তা। এর গতি সর্বত্র। এ সর্বাধিক ক্রিয়াশীল, সর্বগামী ও সর্বজ্ঞ। পঞ্চভূতের অধিষ্ঠানচৈতন্যকে পঞ্চদেবতা বলা হয়।

অগ্নি তেজোময় ও বাক্‌ময়। তেজই হল শক্তি সুতরাং গতিময়। তেজ বাক্‌রূপে প্রকাশিত হয়। তেজ সর্বগামী বলে বাকের গতিও সর্বত্র। যেখানে গতি নেই, সেখানে বাক্ নেই এবং যেখানে বাক্ নেই সেখানে গতিও নেই। স্থূল বস্তুর সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার অগ্নি দ্বারাই সম্পাদিত হয়। এই অগ্নি সর্বরূপকে প্রকাশ করে। অগ্নির প্রকাশ তিন বর্ণ—শুক্ল, লোহিত ও কৃষ্ণ (সাদা, লাল ও কালো)। এই বর্ণ হতে তৈরি হয় রূপ। রূপ হতে আসে স্থূল আকার। রূপ চতুর্বিধ, যথা সূক্ষ্মতম, সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্ম ও স্থূল।

তেজরূপী অগ্নির অপর নাম প্রাণ। প্রাণের বিশুদ্ধ রূপই হল প্রজ্ঞা। এই প্রজ্ঞাই হল চৈতন্য বা বোধ। প্রাণই

১। অভিনব সংজ্ঞা।

প্রজ্ঞা, প্রজ্ঞাই প্রাণ। প্রজ্ঞাই চৈতন্য, চৈতন্যই প্রজ্ঞা। সুতরাং প্রাণই চৈতন্য এবং চৈতন্যই প্রাণ[১]। তেজরূপী প্রাণের গতি সর্বত্র এবং যা কিছু প্রকাশ তা-ও এই তেজরূপী প্রাণেরই প্রকাশ। সবকিছু আহরণ, গ্রহণ, ভরণ ও পোষণ এই তেজরূপী প্রাণেরই কার্য। সেই জন্য অগ্নির অপর নাম হুতাশন।

হুত বস্তুকে অগ্নি ভক্ষণ করে। সর্ববস্তুই অগ্নি দ্বারা একরূপ প্রাপ্ত হয়। সর্বরূপকে অগ্নি গ্রাস করে আপনার মধ্যে লয় করে নেয়। সর্বরূপের প্রকাশক অগ্নি হল সর্বরূপের কারণ এবং সর্বরূপ হল তার কার্য। কার্য কারণ হতে জাত হয়ে কারণের দ্বারা বিধৃত হয়ে আবার পরিণামে কারণেই লীন হয়। অগ্নি স্বয়ং স্থূল ও সূক্ষ্মের প্রকাশক ও প্রকাশ উভয়ই। অগ্নি সবকিছুকে গ্রাস করে সর্বরূপকে নাশ করে নেয় বলে তার অপর নাম সর্বগ্রাসী ও সর্বনাশী।

সত্যাদি ত্রিবিধ প্রতিষ্ঠা হল প্রাণপূজার ফলশ্রুতি

প্রাণের দ্বারা প্রাণের ব্যবহার করাকেই প্রাণের পূজা বলে। দেবতা হয়ে দেবতার পূজা বা ভাবনা করতে হয়। তাহলেই দেবভাবের প্রতিষ্ঠা হয়। আত্মপূজা ও আত্মধ্যান হল প্রাণের ত্রিবিধ প্রতিষ্ঠা, যথা সত্যপ্রতিষ্ঠা, প্রাণপ্রতিষ্ঠা ও আনন্দপ্রতিষ্ঠা। এ সবের পরিণামে হয় অখণ্ড প্রজ্ঞানময় বোধস্বরূপে প্রতিষ্ঠা।

অগ্নিরূপী তৃতীয় গুরুমূর্তির মাহাত্ম্য

অগ্নি, প্রাণ, প্রজ্ঞা, মধু ও আত্মা এক তত্ত্বেরই ভিন্ন ভিন্ন নাম মাত্র।

অগ্নিকে যে আহুতি দেওয়া হয় অগ্নি তা গ্রহণ করে বহন করে নিয়ে যায় দেবতাদের কাছে। সেই জন্য অগ্নিকে হোতা বলা হয়। অগ্নি হল দেবতাদের মুখ এবং হুত বস্তুকে প্রথম গ্রহণ করে বলে তাকে জাতবেদা বলা হয়।

মানুষের নিবেদিত বা সমর্পিত বস্তু তৎ তৎ দেবতার কাছে অগ্নিই বহন করে নিয়ে যায়। সেই জন্য দেবতাদের মধ্যে অগ্নিই হল প্রমুখ।

অগ্নির অপর নাম বহ্নি, অনল ও আগুন। এ ত্রিবিধ, য়থা ভৌম, দিব্য ও জাঠর।

অগ্নির দশ অবয়ব বা দশ কলা হল—ধূম্রার্চিঃ, উষ্মা, জ্বলিনী, জ্বালিনী, বিস্ফুলিঙ্গিনী, সুশ্রী, সুরূপা, কপিলা, হব্যবহা ও কব্যবহা। তা ছাড়া অগ্নির সপ্ত শিখা বা জিহ্বা হল—কালী, করালী, মনোজবা, সুলোহিতা, সুধূম্রবর্ণা, উগ্রা ও প্রদীপ্তা (স্ফুলিঙ্গিনী ও দেবী বিশ্বরুচি)।

অগ্নির ত্রিরূপ—গার্হপত্য, আহবনীয় ও দক্ষিণাগ্নি। গৃহস্বামীর সঙ্গে নিত্যসম্বন্ধ যে অগ্নির তাকে গার্হপত্য অগ্নি বলে। এই গার্হপত্য হতে উদ্ধৃত করে হোমের জন্য যা সংস্কার করা হয় তাকে আহবনীয় অগ্নি বলে। দক্ষিণ দিকের (যজ্ঞের দক্ষিণ দিকে প্রতিষ্ঠিত) অগ্নিকে দক্ষিণাগ্নি বলা হয়। এই অগ্নিত্রয়কেই পিতা, মাতা ও আচার্য বলা হয়। এই অগ্নিই হলেন আত্মগুরু। ঈশোপনিষদের মন্ত্রে আছে :

অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্
বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।
যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো
ভূয়িষ্ঠাং তে নম-উক্তিং বিধেম।।

অর্থাৎ—হে অগ্নি, মহার্ঘ বস্তুলাভের জন্য আপনি আমাদের সুপথে নিয়ে যান; হে দেব, সর্বপ্রাণীর কর্ম ও

১। এ প্রাণ হল মুখ্য প্রাণ, গৌণ প্রাণ এরই বিভূতি।

চিত্তবৃত্তি আপনার জ্ঞাত আছে—আপনি আমাদের কাছ থেকে কুটিল পাপ বিদূরিত করুন, আপনার প্রতি বহু নমস্কারবচন উচ্চারণ করছি।

এক অগ্নিরই অবস্থান ও কার্যভেদে ভিন্ন ভিন্ন পরিচয়—ভূতের মধ্যে ভূতাগ্নি, সৌরমণ্ডলে সূর্য (অধিদৈব), জীবদেহে প্রাণাগ্নি, জঠরে জঠরাগ্নি (অধিদৈব), মন ও বুদ্ধিতে আভাসাগ্নি (অধ্যাত্ম), এবং হৃদয় গুহায় জ্ঞানাগ্নি বা আত্মা (অধিযজ্ঞ)। ঋষিদৃষ্টির মাধ্যমে এক অদ্বয় অমৃতময় অব্যয় অবিনাশী পরমাত্মদেবতাই স্বাত্মমায়ার স্বভাবশক্তিযোগে আপন বক্ষে আপনি স্বয়ং অনন্ত অনন্ত ভঙ্গিমায় অভিব্যক্ত হয়ে আপনার অনন্ত দিব্য স্বভাবমহিমাকে স্বয়ংই দর্শন করেন, আস্বাদন করেন এবং পরিণামে স্ববোধে স্বপ্রকাশকে বরণ করে নেন। তাঁর এই আপনবোধের অভিনব লীলামাধুর্য সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করা ও না-করা উভয়ই তাঁর স্বমহিমার অন্তর্গত। তাঁর আত্মলীলার তাৎপর্য ও মাধুর্য উভয় ক্ষেত্রেই জীবনের আদি ও মধ্যে যেভাবে জীবহৃদয়ে অভিব্যক্ত হয় তা সাধারণত দুর্বোধ্য হলেও তাঁর ইচ্ছা, অশিস্, করুণা ও অনুগ্রহের মাধ্যমেই আধার বিশেষে সুবোধ্য হয়ে প্রকাশিত হয় যখন তখনি তার সম্যক্ জ্ঞান ও অনুভূতি সেই আধারে পূর্ণভাবে প্রকাশ পায়। এই হচ্ছে তাঁর আত্মলীলার নিগূঢ় তত্ত্ব। সবই বোধের খেলা, তথাপি বোধের মাত্রাগত তারতম্য যদবধি অবশিষ্ট থাকে তদবধি সম্যক্ জ্ঞান তথা আপনবোধে পূর্ণতার অভাব থাকে। এই অভাব যখন চলে যায় ভেদজ্ঞানও তখন চলে যায়। তখন পূর্ণ সমবোধ অদ্বয়বোধ আপনবোধে স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্ত হয়। মন বুদ্ধির আর তখন পৃথক কার্য থাকে না। এ অতীব দুর্লভ অবস্থা। এই অবস্থাই হল স্বতঃসিদ্ধ স্বানুভূতি। দিব্যজীবনের পরাকাষ্ঠাই এই স্বানুভূতি।

অগ্নির গতি সর্বত্র। এ সর্বজ্ঞ কারণ এ সবকিছুকেই প্রকাশ করে ও সবকিছুতেই অবস্থান করে। অগ্নির যা ধর্ম প্রাণেরও সেই ধর্ম এবং অধিদৈব সূর্যেরও সেই ধর্ম। সেই জন্য সূর্যকে প্রজাপতি বা সর্ব বিশ্বের প্রাণকেন্দ্র বলা হয়। সমগ্র বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ও ধ্বংসের কারণ সূর্যের মধ্যেই নিহিত আছে। সূর্যকেই হিরণ্যগর্ভ বা মহাপ্রাণও বলা হয়। এই মহাপ্রাণের ত্রিবিধ অভিন্ন রূপ হল বায়ু, অগ্নি ও জল। এরা পরস্পর অবিচ্ছেদ্যভাবে ক্রিয়া করে। প্রাণের তেজোময় বা জ্যোতির্ময় রূপ হল অগ্নি বা সূর্য। এর সক্রিয় রূপ হল বায়ু। এর স্থিতিশীল রূপ হল জল ও চন্দ্র।

জীবের মধ্যে এক প্রাণের ত্রিবিধ রূপ জল, অগ্নি ও বায়ু ক্রিয়া করে।

অন্তরের চিন্তার বহির্রূপায়ণ নামরূপের অভিব্যক্তি হল অগ্নিরূপী প্রাণেরই মহান কীর্তি।

প্রাণশক্তি বস্তুর মধ্যে আধিভৌতিক শক্তিরূপে, প্রাকৃতশক্তি ও ইন্দ্রিয়াদি করণের মধ্যে আধিদৈবিক শক্তিরূপে এবং মন ও বুদ্ধির মধ্যে অধ্যাত্ম শক্তিরূপে প্রকাশমান। এই ত্রিবিধ শক্তি তাদের সর্ববিধ ক্রিয়া মূল প্রাণের কাছে আহুতি প্রদান করে। এই ত্রিবিধ আহুতির ক্রিয়াকেই সাধনা বা তপস্যা[১] বলা হয়।

প্রাণ নিজেকেই নিজে বহুরূপে প্রকাশ করে। রূপ ও অরূপের মাঝে আবার স্বয়ং নিজেই অবস্থান করে। একবার সে আপনাকে নামরূপে প্রকাশ করে আবার নামরূপকে গ্রাস করে নিজের অব্যক্ত অরূপ সত্তার স্বরূপকে প্রকাশ করে। এই প্রাণচৈতন্য যখন শান্ত স্থির নিষ্ক্রিয় তখন তার নাম নির্গুণ নির্বিশেষ নিরাকার নিত্য অচ্যুত নিরঞ্জন ব্রহ্ম। যখন সে গতিশীল ও সক্রিয় তখন সে সগুণ সবিশেষ ঈশ্বর।

সর্ব সাধনার মূল উদ্দেশ্য হল অন্তরে বাইরে সর্বব্যাপী প্রাণের সঙ্গে প্রাণের অভেদ সম্বন্ধ উপলব্ধি করা।

প্রাণের সগুণ রূপকেই জীবন[২] বলা হয়।

১। অভিনব সংজ্ঞা। ২। অভিনব সংজ্ঞা।

সত্তাভেদে প্রাণের ভিন্ন ভিন্ন পরিচয়

প্রাণচৈতন্যের ত্রিবিধ ধর্ম ও ত্রিবিধ শক্তি যথাক্রমে কেন্দ্রসত্তায় যোগমায়া বা আত্মশক্তি, অন্তরসত্তায় মহামায়া বা বিদ্যাশক্তি এবং বহিঃসত্তায় মায়া বা অবিদ্যাশক্তি।

যা মনন করে ও মনকে ত্রাণ করে তাকেই মন্ত্র বলে।

নিয়ন্ত্রণকারীকে যম বলে। যম হল কাল বা মৃত্যু। এই যম বা কাল যার মাধ্যমে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে ও ত্রাণ করে তাকেই যন্ত্র বলে।

তন্ত্রের তাৎপর্য

যা দেহ তৈরি করে, দেহকে পোষণ করে আবার দেহকে ধ্বংস করে দেহাতীতে নিয়ে যায় তাকেই তন্ত্র বলে।

সৃষ্টি স্থিতি সংহার এই ত্রিবিধ ক্রিয়াই হল প্রাণের। তন্ত্র অর্থে এই ত্রিবিধ ক্রিয়াকেই বোঝায়। তেজরূপী প্রাণ বা বাক্‌ই হল দ্বিতীয় গুরুমূর্তি। দ্বিতীয় গুরুমূর্তি হল প্রাণময়। তৃতীয় গুরুমূর্তি হল বিজ্ঞানময় ও ভাবময় এবং চতুর্থ গুরুমূর্তি হল বোধে বোধময়।

পরমাত্মদেবতা চতুর্বিধ গুরুমূর্তির মাধ্যমে লীলায়িত হন

রূপের প্রাণ হল নাম, নামের প্রাণ হল ভাব এবং ভাবের প্রাণ হল বোধ। প্রাণচৈতন্য একবার অরূপের থেকে ভাব ও নামের মাধ্যমে রূপে নেমে আসে, আবার বিপরীত ক্রমে রূপের থেকে নাম ও ভাবের মাধ্যমে অরূপে আরোহণ করে বা মিশে যায়।

অগ্নিরূপী প্রাণচৈতন্যই ভূতের মধ্যে ভূতাগ্নি, জীবের মধ্যে জঠরাগ্নি, দেবতাদের মধ্যে দেবাগ্নি এবং ঈশ্বরের মধ্যে জ্ঞানাগ্নি। এ-ই হল প্রজ্ঞাস্বরূপ প্রাণচৈতন্যের সামগ্রিক পরিচয়। এর চতুর্বিধ স্তর হল জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয়।

শব্দ ও নামের সামান্য রূপ হল বাক্। যার দ্বারা হয় সৃষ্টি, তার দ্বারাই হয় ধ্বংস। শব্দতত্ত্বের মূলে বাক্ এবং বাকের মূলে হল প্রাণচৈতন্য। শব্দ হল নামময়, নাম হল প্রাণময় এবং প্রাণ হল ভাবময় ও বোধময়। এই সবই আত্মারূপী মাতৃগুরুর পরিচয়। [১৭।৫।৬৮]

ঈশ্বরদর্শনের সহজ সাধন

স্ববোধের মধ্যে অর্থাৎ নিজের হৃদয়েই ঈশ্বর আছেন। সৎসঙ্গের মাধ্যমে এই বিশ্বাস দৃঢ় হয় এবং ভক্তি-ভাব বাড়ে। সকলের সুখদুঃখের মধ্যে ঈশ্বরের ইচ্ছা মিশে আছে। মানুষের কাছে ভগবান মানুষ বেশেই আসেন।

নররূপী ঈশ্বরকে ভজন করাই শ্রেয়। তাহলে আপন হৃদয়েও তাঁর সন্ধান পাওয়া যায়। সগুণের কেন্দ্রে নির্গুণ আছে। এই নির্গুণের পরিচয় স্ববোধের কেন্দ্রেই মেলে। নিজবোধের এক ভাব হল সগুণ অপর ভাব হল নির্গুণ। অন্তর হল সগুণ এবং কেন্দ্রসত্তা হল নির্গুণ।

গুণের উৎকর্ষ লাভ হলেই সত্যানুভূতি লাভ হয়। গুণের উৎকর্ষই হল শুদ্ধসত্ত্ব গুণ। শুদ্ধসত্ত্ব গুণের মাধ্যমেই প্রথমে সগুণ ঈশ্বরের উপলব্ধি হয়, তারপরে গুণাতীতের পরিচয় অবগত হওয়া যায়।

সত্যের গুণই হল শুদ্ধসত্ত্ব গুণ। সৎ-ই হল অস্তি, অস্তি-ই হল ভাতি এবং ভাতি-ই হল প্রীতি। এই অস্তি-ভাতি-প্রীতি অখণ্ড সচ্চিদানন্দস্বরূপের পরিচয়। এ নিত্য স্বয়ংপ্রকাশমান।

যা সর্বকালে সর্বাবস্থায় সমভাবে বিদ্যমান ও প্রকাশমান তাই সৎ। সৎকেই নিত্য অখণ্ড পূর্ণ অস্তিত্বসত্তা বলা হয়। এর স্বয়ংপূর্ণ ও স্বয়ংপ্রকাশ রূপই হল চিৎ, অর্থাৎ চৈতন্য বা বোধ। চিৎই হল অনুভূতি।

এই অনুভূতি নিত্যবস্তু, অদ্বয়, অব্যয় ও অমৃতময়। এর অখণ্ড রূপকেই অমৃতত্ব বলা হয়। বিশুদ্ধ চৈতন্যকেই পরমতত্ত্ব বলে। এ সবকিছুকেই প্রকাশ করে নিজের স্বরূপকে ব্যক্ত করে। প্রকাশ ধর্মই হল এর বৈশিষ্ট্য। বৈচিত্র্য ও একের প্রকাশকই হল চিৎ বা চৈতন্য। সগুণ ও নির্গুণের প্রকাশকও এই চৈতন্য। এর অতিরিক্ত কিছু নেই। বোধচৈতন্যই স্বয়ং অনুভূতি বা চৈতন্যের পরিচয়।

অস্তিত্বসত্তার দ্বারাই সর্ববিধ বৈচিত্র্য সত্তাবান হয়ে চৈতন্যের দ্বারা প্রকাশমান হয়। এই চৈতন্যই হল সারতত্ত্ব। একে সত্তার ভাতিরূপ বা জ্যোতিরূপ বলা হয়। এই ভাতিরূপ জ্যোতিই হল সর্বপ্রকাশের অন্তর্নিহিত প্রাণচৈতন্য। অস্তি ও ভাতির মধ্যে নিত্য অভেদ ও পূর্ণ অখণ্ড সম্বন্ধই হল প্রীতি বা আনন্দ[১]। স্ববোধের প্রকাশকেই আত্মবোধ বলে। এ-ই চৈতন্যের স্বরূপ। অস্তি ও ভাতির সঙ্গে প্রীতির নিত্য সম্বন্ধ হল সচ্চিদানন্দানুভূতি[২]। ঈশ্বর হলেন স্বয়ং সচ্চিদানন্দস্বরূপ। সর্বজীবন হল তাঁর প্রকাশমাধ্যম বা লীলামাধ্যম। সত্যই হল নিত্যবস্তু। জীবনরূপ হল তার উদাহরণ। চৈতন্য হল তার অনুভূতি বা প্রাণ। আনন্দ হল উভয়ের মধ্যে নিত্য অভেদমিলন সম্বন্ধ। নিত্য সত্যের এই ত্রিবিধ ভাব সর্ব জীবনেই নিহিত আছে। জীবমাত্রই এবং বিষয়মাত্রই সৎ-এর প্রমাণ, প্রাণমাত্রই চিৎ-এর প্রমাণ এবং কাম, আসক্তি, ভোগ ও প্রীতিমাত্রই আনন্দের প্রমাণ।

যাঁর মধ্যে পূর্ণ সত্যের অভিব্যক্তি হয় তাঁকেই নররূপী ঈশ্বর বা অবতার বলা হয়। তাঁকে ভজন করাই হল ঈশ্বরোপলব্ধির সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়।

নিজের প্রাণস্বরূপকেই পরম ইষ্ট বলে। সংযত চিত্তে এক নিষ্ঠা সহকারে নিজ মন দ্বারা নিজ প্রাণের সেবা বা পূজা ও উপাসনা করলে পরম ইষ্টরূপী স্ববোধ আত্মার অনুভূতি লাভ হয়। একেই ঈশ্বরানুভূতি বলে।

অপরের মধ্যে নিজেকে আবিষ্কার করা এবং নিজের মধ্যে অপরকে আবিষ্কার করা হল স্ববোধ আত্মানুভূতির বিশেষত্ব।

ঈশ্বর উপলব্ধি অর্থ হল পরস্পরের মধ্যে সমবোধের বা একবোধের আস্বাদন।

সমবোধ বা একবোধই হল পরম ইষ্টরূপী প্রাণচৈতন্যের স্বরূপ।

চিদাত্মা বা ঈশ্বরকে অচ্যুত বলা হয়। অনন্ত ভূমা-ই হল এর পরিচয়। প্রত্যক্ষ অনুভূতি হল সমগ্র বোধের প্রকাশলক্ষণ। এর ব্যষ্টিভাবের অনুভূতিকে আত্মানুভূতি বলে এবং সমষ্টিভাবের অনুভূতিকে পরমাত্মানুভূতি বলে।

আত্মানুভূতির অর্থ ব্যক্তিবিশেষের অনুভূতি নয়। এর অর্থ ব্যক্তির সামগ্রিক সত্তার অনুভূতি।

অজ্ঞান ও জ্ঞানের পার্থক্য

ভেদ বা পার্থক্যজ্ঞান বোধরূপী চৈতন্যের প্রকাশধারার একটা খণ্ড অংশ মাত্র। এর পূর্বাপর সম্বন্ধের সঙ্গে মন যুক্ত না-হওয়া পর্যন্ত একে অজ্ঞান বলা হয়। কিন্তু এর পূর্বাপর বোধধারার সঙ্গে মন যুক্ত হলে এ অখণ্ড একাকার বা নিরবচ্ছিন্ন প্রকাশধারায় মিশে যায়। একেই বিশুদ্ধ অখণ্ড জ্ঞান বা প্রজ্ঞান বলে।

ভেদ ব্যবহারের কারণ

মানুষের মন যখন খণ্ড ভাবে পৃথক করে নিজের পছন্দমত কিছু পেতে চায় তখন বিশেষের ব্যবহার হয়। এই বিশেষের ব্যবহারই হল অখণ্ডকে ভাগ ভাগ করে তার প্রতি ভাগের পৃথক পৃথক ব্যবহার। এইরূপ খণ্ড

১। অভিনব সংজ্ঞা। ২। স্বসংবেদ্য স্বানুভূতির বিজ্ঞান দৃষ্টিতে।

ব্যবহার দ্বারা অখণ্ডের সমগ্র ভাতি ও প্রীতিধারার অর্থাৎ চিদানন্দস্বরূপের খণ্ড ও স্বল্পাংশের অনুভূতি হয়। একেই সত্যের বিকৃতানুভূতি বলে। এইরূপ বিকৃতানুভূতি হল ভেদজ্ঞান, অজ্ঞান ও অভিমানের লক্ষণ। পৃথক বোধ বা খণ্ডের বোধ দ্বারা সত্যানুভূতি হয় না। অখণ্ড এক বোধ বা সমবোধই হল ঈশ্বর, আত্মা ও সত্যের পরিচয়। খণ্ড বোধকেই ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান বা বিষয় জ্ঞান বলে। আত্মজ্ঞান হল অতীন্দ্রিয়। এ মনোবিজ্ঞানের ঊর্ধ্বে।

সাত্ত্বিকাদি ত্রিবিধ জ্ঞানের লক্ষণ

বিষয় জ্ঞানকে তামসিক জ্ঞান বলে। স্বার্থপরতা হল রাজসিক জ্ঞান। এর লক্ষণ অহংকার, অভিমান, দম্ভ, দর্প প্রভৃতি। নিঃস্বার্থপরতাই হল সাত্ত্বিক জ্ঞানের লক্ষণ। সাত্ত্বিক জ্ঞানকেই বিদ্যাশক্তি বলে।

পরমানন্দই হল ঈশ্বরানুভূতি

প্রাণ ও মনের অভেদ অনুভূতিই হল পরম সুখ ও পরমানন্দ। অখণ্ড প্রাণের স্বরূপই হল ঈশ্বর। পৃথিবীতে প্রতি সৃষ্টজীবের মধ্যে প্রাণরূপে ঈশ্বর বর্তমান।

সমবোধ বা একবোধের অনুভূতিকেই অদ্বৈতানুভূতি বলে। অদ্বৈতানুভূতি হল একাত্মানুভূতি। এ-ই ভেদাতীত, দ্বন্দ্বাতীত পরমতত্ত্ব বা অমৃতত্ব। এর সাধনা যাঁরা করেন তাঁদেরই সাধু, সন্ন্যাসী বলা হয় এবং এর যথার্থ অনুভূতি যাঁদের হয় তাঁরাই প্রকৃত সাধু, সন্ন্যাসী বা মুক্ত পুরুষ[১]।

প্রাণচৈতন্যের অভিনব লীলা

প্রাণচৈতন্যই জীবরূপ ধারণ করে নানা ভঙ্গিমায় খেলে। প্রাণের মধ্যেই প্রাণের প্রকাশ, প্রাণের খেলা ও লীলা এবং প্রাণের মধ্যেই তার লয়।

ঈশ্বরের দ্বিবিধ পরিচয়—মূর্ত ও অমূর্ত। মূর্ত হল সগুণ এবং অমূর্ত হল নির্গুণ। তাঁর গুণের বিকারকেই মৃত্যু বলে এবং নির্গুণে স্থিতিকেই অমৃতত্ব বলে।

প্রকাশ ভেদে অজ্ঞান জ্ঞানাদির পরিচয়

ঈশ্বরের স্থূল প্রকাশকে অজ্ঞান বলে, সূক্ষ্ম প্রকাশকে জ্ঞান এবং সূক্ষ্মতর প্রকাশকে বিজ্ঞান বলে। সূক্ষ্মতম স্বরূপ প্রজ্ঞানঘন ও আনন্দঘন।

স্ববোধের তাৎপর্য

ঈশ্বরের মহিমা শ্রবণ করে শ্রবণ অনুরূপ ব্যবহার করলে নিজের মধ্যে তাঁকে পূর্ণভাবে অনুভব করা যায়। আপন সত্তাকে পূর্ণভাবে উপলব্ধি করার জন্য যা প্রয়োজন তা নিজের মধ্যেই আছে। স্ববোধই হল সর্ববোধের অধিষ্ঠান। আপন সত্তার দ্বারাই সর্বসত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। অর্থাৎ আপনাকে যথার্থভাবে অবগত হতে পারলে সকলকেই জানা যায়। আপনবোধ দ্বারাই অন্তরাত্মা শিবের অনুভূতি হয়। একে ঈশ্বরানুভূতি বলে। আপনবোধের অর্থ ব্যষ্টিবোধ নয়, অখণ্ড বোধসত্তা[২]।

১। অদ্বয়বোধ, আপনবোধ, সমবোধ ও পূর্ণ অখণ্ড নিত্যবোধের তাৎপর্যার্থে। ২। স্বানুভূতির দৃষ্টিতে আপনবোধের তাৎপর্য, আত্মবোধের নিগূঢ়ার্থ।

দুঃখকষ্টের মূল কারণ

প্রকৃতির অবদানকে প্রকৃতির কাছে সকৃতজ্ঞ চিত্তে ফিরিয়ে দিতে হয় অর্থাৎ সমর্পণ করতে হয়। তাহলে প্রকৃতির বিকার হতে মুক্ত থাকা যায়। প্রকৃতির দানকে কৃতজ্ঞ চিত্তে স্বীকার না করলে এবং পুনরায় তাকে সমর্পণ না করলে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায়। তার ফলে প্রকৃতি জোর করে সব কেড়ে নেয়। তখনই হয় বিকার। এই বিকারই হল সামগ্রিক দুঃখকষ্টের কারণ। দানের পরে প্রতিদান হলে দানের রহস্য অনুভূত হয়। গ্রহণ ও প্রত্যর্পণ বা সমর্পণ হল এক নীতির অন্তর্ভুক্ত।

প্রাণের দানকে গ্রহণ করে প্রতিদানে তা ফিরিয়ে দেওয়া হলে তখনই হয় প্রাণের সঙ্গে প্রাণের মধুমিলন। মধুমিলনের সম্বন্ধকেই প্রীতির সম্বন্ধ বা প্রেমের সম্বন্ধ বলে। প্রেম ও ভালবাসা হল প্রাণের সর্বোত্তম ধর্ম।

ত্রিবিধ প্রকৃতির পরিচয়

প্রাণের স্বরূপ ও ধর্ম প্রাণ প্রকাশ করে প্রথমে প্রেম ভালবাসা ও মানার মাধ্যমে। তার দ্বিতীয় অবস্থায় হল জানাজানি, জ্ঞানবিচার এবং তৃতীয় অবস্থায় হল দ্বন্দ্ব, বিরোধ, ভেদ সৃষ্টি এবং শক্তি প্রয়োগ। প্রাণের এই ত্রিবিধ ধর্মই হল ত্রিবিধ প্রকৃতি। প্রথম হল কেন্দ্রপ্রকৃতি, দ্বিতীয় হল অন্তরপ্রকৃতি এবং তৃতীয় হল বহিঃপ্রকৃতি।

অন্তরের দ্বিবিধ ধর্ম

শ্বাস ও প্রশ্বাস হল প্রাণের দ্বিবিধ ধর্ম। শ্বাসের দ্বারা অন্তরকে নির্দেশ করে এবং প্রশ্বাসের দ্বারা বারকে নির্দেশ করে। অন্তর ও বাইরে প্রাণের সম্বন্ধ সমান। অন্তরসত্তা ও বহিঃসত্তার সঙ্গে সমানভাবে যুক্ত আছে বলেই সমগ্র প্রাণের প্রকাশকে দুনিয়া বলে।

দুইয়ের মধ্যেই মিশে আছে এক বা সমতা। একেই সত্যস্বরূপ বলে। আমির সঙ্গে তুমি যুক্ত এবং তুমির সঙ্গে আমি যুক্ত। এই আমি তুমি মিলেই হল পুরুষোত্তম, পরমাত্মা ও পরমেশ্বর। তাঁর নামই ব্রহ্ম আত্মা ঈশ্বর গুরু আল্লা হরি রাম শিব পিতা মাতা প্রভৃতি। নাম হল সংজ্ঞা বা প্রকাশের নির্দেশক।

ভেদের মূলে অভেদই নিত্যসত্য

বৈচিত্র্যময় সৃষ্টির মূল উপাদানই হল সচ্চিদানন্দ অমৃতময় এক ঈশ্বর ব্রহ্ম বা আত্মা। সমুদ্রবক্ষে এক জলেরই যেমন ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ হল তরঙ্গ, লহরী, বুদ্বুদ, ফেনা, প্রভৃতি সেইরূপ সমগ্র বৈচিত্র্যের মূলে আছে এক মন এবং মনের পশ্চাতে আছে বোধময় অখণ্ড নিত্যসত্তা। মনই হল উপাদান কারণ ও নিমিত্ত কারণ এবং বোধসত্তা হল সবকিছুর ঊর্ধ্বে মহাকারণ বা কারণাতীত কারণ[১]। আত্মা স্বয়ং বোধস্বরূপ, জীব হল মনোময় অন্তরসত্তা ও নিমিত্ত কারণ অর্থাৎ কর্তা ও ভোক্তা এবং নামরূপ বিষয়াদি বহিঃসত্তা হল পরিণামী প্রকৃতি ও উপাদান কারণ। বোধস্বরূপ ঈশ্বরের স্বভাবই হল জীব। স্বভাবের ক্রিয়াশক্তি হল প্রকৃতি। ঈশ্বর ও তাঁর স্বভাবপ্রকৃতি অভেদ, স্রষ্টা ও সৃষ্টি অভেদ, দ্রষ্টা ও দৃশ্য অভেদ, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় অভেদ।

ঈশ্বরের স্বভাবমহিমা

ঈশ্বর মহতোমহীয়ান হয়েও আবার অণোরণীয়ান। ছোট বড় সব কিছুকে প্রকাশ করে আপন বক্ষে ধারণ করে তিনি আপন মহিমা আস্বাদন করেন। জ্ঞানী সেজে ঈশ্বর আপনার মহতোমহীয়ান ভাবকে স্বয়ং উপলব্ধি

১। সবাতীত স্বরূপস্থিতি, সর্ব কারণ-কার্য ও কার্য-কারণ ভাবনিরপেক্ষ।

করেন। ভক্ত সেজে তিনিই আবার নিজের অণোরণীয়ান ভাবকে উপলব্ধি করেন; যোগী সেজে নিজেই নিজের সমত্ব ভাবকে উপলব্ধি করেন; নিষ্কাম কর্মী সেজে তিনি প্রতিক্রিয়াশূন্য দিব্যকর্মের মহিমা আস্বাদন করেন এবং সকামভাবে নিজেই নিজের কর্মফল ভোগ করে কর্মবন্ধন অনুভব করেন। তিনি নিজেই ভোগাসক্ত হয়ে স্বকীয় কর্মের ফল ভোগ করেন এবং জন্ম ও মৃত্যুর গতিচক্রে আবদ্ধ হয়ে কিছুকাল কাটান। তারপর কর্মবন্ধন হতে মুক্ত হওয়ার জন্য তিনি মহতের আশ্রয় নেন। মহতের কৃপায় তিনি বন্ধনমুক্তির সাধনায় ব্রতী হন এবং পরিণামে কামনামুক্ত হয়ে আপন মুক্ত স্বরূপ অর্থাৎ ঈশ্বরের স্বরূপ উপলব্ধি করে তার মধ্যে মিশে যান।

ঈশ্বরের ধর্ম

যে কর্মপ্রবাহ নিয়ত বিশ্বগতিচক্রকে পরিচালিত করে তা হতে নিজেকে পৃথক করলে বিশ্বশক্তির সাহায্য পাওয়া যায় না। সেইজন্য সকাম ভোগীচিত্ত সহজেই দুর্বল হয়ে পড়ে। চলমান বিশ্বশক্তি থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে অন্তরের পূর্ণতা শান্তি বা আনন্দ অনুভব করা যায় না। পূর্ণতা, শান্তি ও আনন্দ নির্ভর করে অখণ্ড ভূমা, সমবোধ, একবোধ বা আপনবোধের উপরে। সমত্ব, একত্ব ও অখণ্ড হল অমৃতত্ব। এ-ই হল ঈশ্বরের ধর্ম।

ঈশ্বরদর্শন ও অনুভূতির বিজ্ঞান

খণ্ডের মধ্যে, বৈচিত্র্যের মধ্যে, বিকারের মধ্যে যে নিত্য অখণ্ড একত্ব সমত্ব ও নির্বিকার অপরিণামী অমৃতস্বরূপ নিত্য বিদ্যমান তা-ই হল ঈশ্বর এবং তাকে উপলব্ধি করাই হল ঈশ্বরোপলব্ধি।

সত্য নিত্য এক। বহু সাজে সেজেও সত্যের এই একরূপতা অক্ষুণ্ণ থাকে। তা দেশ-কাল, কার্য-কারণের দ্বারা কখনো বাধিত ও বিকৃত হয় না। পূর্ণতাই হল সত্যের স্বরূপ। পূর্ণতার উপলব্ধি হল সত্যের উপলব্ধি।

নিত্যসত্য অখণ্ড ও পূর্ণ

এই পূর্ণ স্বরূপই হল অখণ্ড, ভূমা সচ্চিদানন্দসাগর। বিশ্বপ্রাণ হল তার প্রকাশরূপ। এই বিশ্বপ্রাণকেই মহাপ্রাণ বলা হয়। এর নাশ নেই, ক্ষয় বৃদ্ধিও নেই; কেবল বাহ্যিক রূপের পরিবর্তন হয়।

অমৃত-আত্মার স্বরূপমহিমা

দেহের রূপান্তর হলেও জীবাত্মার মৃত্যু হয় না। পুরানো জামাকাপড় বদলের মত সে দেহরূপ পালটায়। আসলে সে যায়ও না, আসেও না। তার বক্ষে প্রাণের বৃত্তি দেহ আধাররূপ ধারণ করে আবার আপনিই বিলীন হয়ে যায়। সর্বব্যাপী অখণ্ড এক আত্মার পক্ষে তার কোথাও কখনও কোনওভাবে আসাযাওয়া ওঠাবসা প্রভৃতি ব্যবহারিক ক্রিয়া সম্ভব নয়। তবুও এই ব্যবহারিক ক্রিয়া যা প্রকাশ পায়, তা আত্মার স্বভাববিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। একেই বিজ্ঞানাত্মা বলা হয়। প্রজ্ঞানাত্মা অখণ্ড এক কিন্তু বিজ্ঞানাত্মা অসংখ্য। এদের প্রত্যেককে ব্যষ্টি আত্মা বলা হয় এবং তাদের সমষ্টিকে বিশ্বাত্মা বলা হয়। বিশ্বাত্মার অন্তর্ভুক্ত হল ব্যষ্টি আত্মা এবং পরমাত্মার অন্তর্ভুক্ত হল বিশ্বাত্মা। সকলের মধ্যেই পরমাত্মা নিহিত আছেন। জন্ম ও মৃত্যু হল প্রাণচৈতন্যের দু'টি বিশেষ অবস্থা ও বৃত্তি মাত্র।

আত্মার কোন ভোগ নেই এবং কোন বিকারও নেই। আত্মার স্বভাবশক্তি প্রাণ, চিত্ত, কর্তৃত্ব, অহংকার রূপে লীলা করে। ক্ষুৎপিপাসা হল প্রাণের ধর্ম। শোক, মোহ, ভাবাদি বিকার হল চিত্ত বা মনের ধর্ম। কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব ও বন্ধনদশা হল অহংকারের ধর্ম। প্রভুত্ব, আধিপত্য, গুরুত্ব, লঘুত্ব, বিচার, সিদ্ধান্ত, মোক্ষ, যুক্তি ও সুখাদির স্পৃহা হল বুদ্ধির ধর্ম ও বিশিষ্ট লক্ষণ। আত্মা এই সবের দ্রষ্টা ও সাক্ষী মাত্র।

ব্রহ্ম জগৎ থেকে আলাদা নয়, জগৎও ব্রহ্ম থেকে আলাদা নয়। জগৎ হল ব্রহ্মের প্রকাশরূপ, ব্রহ্ম হল জগতের প্রকাশক সত্তা বা অধিষ্ঠান। ব্রহ্ম ও জগতের সম্বন্ধ অভেদ, যেমন আগুন ও তার দাহিকা শক্তি এবং আলো বা জ্যোতি; এবং সূর্য ও তার তাপ ও জোতি অভেদ। একটিকে অপরটির থেকে আলাদা করা যায় না।

প্রাণের অহংকার প্রাণের বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে

অহংকারের জন্য দেহের প্রয়োজন হয়। অহংকারকে সক্রিয় হবার জন্য কামনার প্রয়োজন হয়। কামনাসিদ্ধির জন্য কর্মের প্রয়োজন হয়। সুতরাং কাম, কর্ম ও কর্তৃত্ব এই ত্রিবিধ ভাবই হল ঈশ্বরের বৈচিত্র্যময় স্বভাবলীলার মৌলিক উপকরণ।

আনন্দরস আস্বাদনের জন্য আশ্রয় দরকার হয়। বিশ্বলীলা হল আনন্দরস আস্বাদনের লীলা। সর্বপ্রকাশের সঙ্গে সর্বপ্রকাশের মৌলিক অভেদ সম্বন্ধ অনুভব করাই হল বিশ্ব আনন্দলীলার উদ্দেশ্য[১]। এই উদ্দেশ্য ব্যাহত হলেই হয় নিরানন্দ। পরস্পরের মধ্যে সামঞ্জস্যের অভাব হলেই এই উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়।

দিব্য ও আসুরিক ব্যবহারের পার্থক্য

যে-ব্যবহার দ্বারা বিকার সৃষ্টি হয় তাকেই আসুরিক ব্যবহার বলে। আবার যে-ব্যবহার দ্বারা বিকার সংশোধিত হয় এবং সবকিছুর মধ্যে সামঞ্জস্য তৈরি হয় তাকেই দিব্য ব্যবহার[২] বলে।

জ্ঞানপথের বৈশিষ্ট্য

সোহংবাদ জ্ঞানের পথ। এ পথ সবার জন্য নয়। বিষয়ভোগে অনাশক্তি, অন্তরে ত্যাগ-বৈরাগ্য, উপযুক্ত গুরুর সঙ্গ ও তাঁর কাছে বেদান্তপাঠ নিয়ে সোহং মন্ত্রের সাধনা করতে হয়। তা না-হলে সোহং তত্ত্বের অনুভূতি হয় না বরং বিপরীত ফল হয়। সংসারীদের পক্ষে সোহং তত্ত্বের সাধন প্রশস্ত নয়। এ সাধন সংসারত্যাগীদের জন্যই উপদিষ্ট হয়। 'সোহং'-এর তত্ত্ব হল চরমতম অনুভূতি বা সর্বোত্তম জ্ঞান। সংসারীদের জন্য ভক্তিপথই প্রশস্ত। সোহং মন্ত্রের বিকল্প মন্ত্র হল হংসঃ মন্ত্র। 'হংসদাসোহং' মন্ত্র সংসারীগণ সাধন করতে পারে। যে মন্ত্রের যেমন বিজ্ঞান সেই মন্ত্রের তেমন সাধন। জ্ঞানের পথ হল মুক্তির পথ। ভক্তির পথ হল লীলা আস্বাদনের পথ।

শ্রেয় পথ হল জ্ঞানের পথ এবং প্রেয় পথ হল ভক্তির পথ। জ্ঞানী নির্গুণ তত্ত্বের সাধন করে তাঁর সঙ্গে আপনবোধে আপনার একাত্মানুভূতি লাভ করে। ভক্ত সগুণতত্ত্বের সাধন করে সগুণ সাকার ঈশ্বরের নিত্যদাস, সেবক, সাথী ও প্রকৃতিবোধে থাকতে চায়।

এই জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম বা আত্মাই আমি—অথবা আমিই বোধস্বরূপ ব্রহ্ম বা আত্মা—এ-ই হল সোহং মন্ত্রের তাৎপর্য।

হংসঃ হল সগুণ ঈশ্বরের স্বরূপ। হংসদাসোহং মন্ত্র সাধন করে ভক্ত ভগবানের নিত্যদাস হয়ে থাকতে চায় এবং সেই অনুভূতি লাভ করে ভগবানের সঙ্গেই আনন্দে অবস্থান করে।

যে-জ্ঞান দ্বারা জগতের সঙ্গে প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপিত হয় তা জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি।

ধর্মতত্ত্বের রহস্য

ধর্মলাভের অর্থ শুদ্ধজ্ঞান বা শুদ্ধাভক্তির বিকাশ[৩]।

১। সত্যার্থ প্রকাশ। ২। আত্মবিজ্ঞানের সূত্র অনুসারে। ৩। সত্যানুভূতির দৃষ্টিতে।

যা সমগ্র ভাবকে ধারণ করে আছে তাই হল সনাতন ধর্ম। ধর্ম মানুষকে শ্রেষ্ঠ ও মহান করে এবং অনন্ত অসীম ভূমা আত্মস্বরূপে অথবা স্বভাবের পূর্ণতায় প্রতিষ্ঠিত করে দেয়। প্রাণের ধর্ম অপরকে ত্যাগ করা নয়। প্রাণের মহিমা প্রাণকে বর্জন করা নয়, প্রাণকে গ্রহণ করা বা প্রাণের সমতা বিধান করা। গ্রহণ করা বা আহরণ করা আনন্দ বা প্রীতি ছাড়া সম্ভবপর নয়। শ্রেষ্ঠ আনন্দ[১] হল অনন্ত অসীম অখণ্ড ভূমার সঙ্গে মিশে যাওয়া।

নিঃশ্রেয়স্কর বা শ্রেষ্ঠ আনন্দ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অনুভব করা যায় না। এ ইন্দ্রিয়াতীত ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ হৃদয়কেন্দ্রে বিশুদ্ধ একবোধ, সমবোধ বা আপনবোধে প্রতিষ্ঠিত।

নিঃশ্রেয়স্কর বা শ্রেষ্ঠ বস্তুই হল ঈশ্বর স্বয়ং। জীবনের পথে কেউ অজ্ঞাতসারে, কেউ আবার জ্ঞাতসারে এই নিঃশ্রেয়স্কর বা শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ অখণ্ড ভূমার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। অজ্ঞাতসারে যারা যায় তারা বহু পথ অতিক্রম করে একসময়ে সচেতন হয়ে জ্ঞাতসারে সাধন করে। জ্ঞাতসারে যারা এগিয়ে চলে তাদেরই সাধক বলে।

জীবনের সর্বকর্মই সাধনার পর্যায়ভুক্ত। প্রাণের পুষ্টির জন্য যা কিছু করা হয় তা-ই সাধনা। প্রাণের সর্বাঙ্গীন পুষ্টি ও পূর্ণতালাভের জন্য যে চেষ্টা তা-ই ধর্ম ও বিদ্যালাভের সহায়ক। ব্রহ্মবিদ্যা বা আত্মবিদ্যা হল একবোধ বা সমবোধের বিদ্যা।

শুদ্ধজ্ঞানলাভের ফলেই প্রেমের বিকাশ হয়। প্রেমের ধর্ম নিত্যসমানে প্রতিষ্ঠিত। এ বিচার নিরপেক্ষ এবং যাপন করে নেওয়া, যুক্ত করে দেওয়া ও মিলন ঘটানোই হল এর বিশেষত্ব।

ঈশ্বরবাদী ও ব্রহ্মবাদীদের অনুভূতির বৈশিষ্ট্য

ঈশ্বরীয় বোধে ভেদজ্ঞান থাকে না। সমবোধে, একবোধে বা আপনবোধে মানা বা গ্রহণ করাই হল ঈশ্বরীয় বোধের বিশেষত্ব এবং সর্ববিষয়ে উদাসীন, নিরপেক্ষ ও নির্লিপ্ত থাকাই হল ব্রহ্মজ্ঞানীদের বিশেষত্ব। অন্তরে প্রেমের উদয় হলে বাইরে তা প্রকাশ পায়। গ্রহণ করে জীবন প্রথম পুষ্ট ও তুষ্ট হয়ে পূর্ণতা লাভ করে, পরে আপনাকে সমর্পণ করে দাতা ও গ্রহীতা ভাবের সমন্বয় সাধন করে।

পরদোষ দর্শনই হল আত্মবোধের অন্তরায়

নিজেকে তৈরি না করে অর্থাৎ নিজের অন্তরকে দোষমুক্ত না করে সংসারে অপরের দোষ দেখে উভয়েরই কোন সমাধান করা যায় না। নিজের অন্তরে দোষ না থাকলে অপরের দোষ শোধন করা যায় এবং অপরের দোষে নিজেরও কোন প্রতিক্রিয়া হয় না।

যার বহন করার শক্তি আছে, সহ্য করার শক্তি আছে, এবং দেবার শক্তি আছে, সে-ই হল দেবতা ও মহৎ বা শ্রেষ্ঠ।

শক্তিমান জ্ঞানী ও প্রেমিক ভক্তের বিশেষ লক্ষণ

ধৈর্য, স্থৈর্য ও সহিষ্ণুতাই হল শক্তিমানের লক্ষণ। একতা, উদারতা, নিরপেক্ষতা ও সমতাবোধ হল জ্ঞানীর লক্ষণ। সরলতা, কৃতজ্ঞতা, একনিষ্ঠতা, পরমতসহিষ্ণুতা, আত্মীয়তা, পরদুঃখকাতরতা, নম্রতা, মমতা, সেবা, দয়া, অনলসতা, সক্রিয়তা, সদাপ্রসন্নচিত্ততা, নিঃস্বার্থপরতা, প্রেম, ভালবাসা প্রভৃতি হল যথার্থ প্রেমিক ভক্তের লক্ষণ।

জ্ঞান সংশয় সন্দেহ দূর করে অন্তরের বিশ্বাসকে পূর্ণ করে এবং ভক্তিকে দৃঢ় করে দেয়। ভক্তি অন্তরের নিস্তেজ নিষ্ক্রিয় ও নীরস ভাবকে সতেজ, সক্রিয় ও সরস করে দেয়। ব্যবহারের উৎকর্ষই হল সাধনসিদ্ধি।

১। স্বানুভূতির দৃষ্টিতে।

বর্তমানের কর্ম ও কর্মফলের কারণ হল অতীতের কর্ম ও কর্মফল এবং বর্তমান আবার ভবিষ্যতের জননী। সাধুসঙ্গ ও সৎসঙ্গ হল জীবনের হাল এবং শ্রেষ্ঠ মূলধন। গুরু ছাড়া শিষ্য এবং শিষ্য ছাড়া গুরু হয় না। সন্তান না থাকলে মাতাপিতার শান্তি নেই, মাতাপিতা না থাকলে সন্তানেরও সুখ নেই। প্রত্যেকে প্রত্যেকের পরিপূরক ও সম্পূরক।

সবকিছুর সমান মূল্যবোধ জাগলেই জীবনের পূর্ণতা অনুভূত হয়।

অখণ্ড সমবোধে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আপনবোধে যে সবকিছু ব্যবহার করে তাকেই পরমহংস বলে।

মূল শব্দের নাম নাদ। এই শব্দকে ব্যবহারের উপযোগী করে প্রত্যেকে জীবনের কাজ চালায়। এই শব্দগুলির সম্মিলিত রূপই হল প্রণব। প্রণবের প্রকাশই হল জীবজগৎ। এই সবগুলির সম্মিলিত বোধের নামই হল 'আমি'[১]।

'আমি'-র সত্য পরিচয়

'আমি'-র এক অংশ স্থির নিষ্ক্রিয় এবং অপর অংশ সক্রিয়। সক্রিয় অংশে আমির আবার অনেকগুলি ভাগ আছে। প্রতি ভাগকে ব্যষ্টি আমি বা জীব বলে। প্রতি জীবের পৃথক পৃথক দেহ বা আধার আছে। সমগ্র ব্যষ্টিদেহ বা আধার আমিবোধের অণুপরমাণু এবং কতগুলি বৃত্তি দিয়ে তৈরি। সমগ্র ব্যষ্টিদেহ মিলেই হল বিশ্বদেহ। সবই 'আমার বোধের' ভিন্ন ভিন্ন তরঙ্গ ও স্পন্দন মাত্র। এই বোধস্বরূপ আমির বিশেষত্ব হল এ অদ্বিতীয় স্বয়ংপূর্ণ এবং স্বয়ংপ্রকাশ। এর মধ্যে যা কিছু প্রকাশ পায় তা-ও বোধ এবং এর দ্বারা যা কিছু প্রকাশ পায় তা-ও বোধ। বোধ প্রকাশক ও প্রকাশ উভয়ই, সত্তা-শক্তি উভয়ই, অস্তি-নাস্তি উভয়ই, ইতি-নেতি উভয়ই, ব্যক্ত-অব্যক্ত উভয়ই এবং তদতিরিক্ত স্বয়ংপ্রকাশ বোধস্বরূপ নিত্য আমি।

শক্তির ভিন্ন ভিন্ন রূপের পরিচয়

বোধের গতিই হল বোধের শক্তি। বোধের শক্তির মূলে বা কেন্দ্রে হল আনন্দশক্তি বা প্রেমশক্তি। একেই অন্তরঙ্গ শক্তি বা পরাশক্তি বলে। মধ্যে বা অন্তরে অন্তরসত্তা হল তটস্থ শক্তি বা চিৎশক্তি। একে মাধ্যমিক শক্তি বলে। বহিঃসত্তায় হল ক্রিয়াশক্তি বা প্রকৃতিশক্তি। সমত্বে বা একত্বে স্থিতি হল কেন্দ্রবোধশক্তির ধর্ম। দ্বৈতভাব হল অন্তরশক্তির ধর্ম। নানাত্ব-বহুত্ব ভাবই হল বোধের বহিঃশক্তির ধর্ম। এই তিন শক্তিকে যথাক্রমে কেন্দ্রে যোগমায়া, অন্তরে মহামায়া ও বাইরে মায়াশক্তিও বলা হয়।

প্রকাশাদির পূর্বাপর সম্বন্ধের বৈশিষ্ট্য

অন্তরশক্তির বাইরের দিকে হল বহিঃপ্রকৃতি এবং কেন্দ্রের দিকে হল কেন্দ্রশক্তি। উভয় শক্তির সঙ্গে যুক্ত থেকে অন্তরশক্তি দোদুল্যমান ভাবে চলে। কখনও সে বহিঃপ্রকৃতির প্রভাবাধীনে চলে এবং কখনও সে কেন্দ্রশক্তির প্রভাবাধীনে চলে। এই উভয় শক্তির প্রভাবে অন্তরশক্তির মধ্যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। একে সু ও কু, সদসৎ এবং দেবাসুরের লড়াই বলে। বহিঃশক্তির প্রভাবে জীব বিষয়াসক্ত হয়, বিষয়বোধে চলে এবং বিষয়ভোগে লিপ্ত থাকে। তার ফলে জন্মমৃত্যুর চক্রে তাকে পুনঃপুনঃ ঘুরতে হয়। কেন্দ্রশক্তির প্রভাবে জীবের বিষয়ভোগে অনাসক্তি, ধর্মে মতি ও আত্মজ্ঞান লাভ হয় এবং প্রেমভক্তির মাধ্যমে ঈশ্বরানুভূতি হয়।

নাম ছাড়া রূপ হয় না, ভাব ছাড়া নাম হয় না, এবং বোধ ছাড়া ভাব হয় না। সত্তা ছাড়া বোধ নেই, আমি

১। তত্ত্বানুভূতির দৃষ্টিতে।

ছাড়া সত্তা নেই এবং সত্তা ছাড়াও আমি নেই। উত্তর ছাড়া জিজ্ঞাসা হয় না এবং জিজ্ঞাসা ছাড়াও উত্তর হয় না। যার মাধ্যমে আমি প্রকাশ পায় তাকেই জীবন[১] বলে।

স্বল্প জ্ঞানই অজ্ঞান। জ্ঞানবক্ষেই অজ্ঞান অবস্থান করে। মৃত্যুর আশ্রয়ও অমৃতের বক্ষে।

সত্যানুশীলনের তাৎপর্য

প্রত্যেকের অন্তরে যে আদ্যাশক্তি বিরাজ করে সত্যসেবার দ্বারা তা জাগ্রত হয়। সত্ত্বগুণের মাধ্যমেই অন্তরের শক্তির দিব্যরূপায়ণ হয়। সত্যই সত্যের ধর্ম। সত্যই সত্যের শক্তি। দেবতাজ্ঞানে সবকর্মই সত্যময় হয় এবং সত্যের শক্তিও জাগ্রত হয়। প্রাণের সাধনা সত্যবোধেই পূর্ণ হয়। সত্যবোধে আদ্যাশক্তির প্রকাশ হয়। সাধুসেবার ফলে সাধুগুণ ও ভাব সেবকের মধ্যে প্রতিফলিত হয়।

সচ্চিদানন্দময়ী মায়ের সম্যক্ পরিচয়

সচ্চিদানন্দময়ী মা-ই এক আধারে গর্ভধারিণী মাতা, কন্যা, পত্নী, ভগ্নী প্রভৃতি রূপে নিজেকে প্রকাশ করে; সে-ই আবার অপর ভাবে পিতা, স্বামী, পুত্র, ভ্রাতা প্রভৃতি রূপে নিজেকে প্রকাশ করে। উভয়ের সংযুক্ত রূপকেই বামা বলে। বামার মধ্যে বাবার 'বা' এবং মায়ের 'মা' সংযুক্ত আছে। একের মধ্যে দুই মিশে আছে। দুই-এর মাধ্যমেই একের ব্যবহার হয়। 'মা' নাম সন্তানের কাছে বড় মধুর। মা সর্বংসহা, সে সব কিছু প্রকাশ করে ও পালন করে নিজের বক্ষে ধারণ করে রাখে। একাত্মপ্রেম ও প্রিয়বোধই হল তার বৈশিষ্ট্য। [১৮।৫।৬৮]

সদ্গুরুর স্বরূপ ও তাঁর সঙ্গে তাদাত্ম্য লাভের বিজ্ঞান

সর্ববিধ দুঃখকষ্টের মূল হল কামনা। কামনা হতে মনকে ও নিজেকে মুক্ত করার কৌশল ও বিদ্যা যিনি জানেন তিনিই হলেন সদ্গুরু[২]।

গুরু হলেন সত্য, জ্ঞান, আনন্দ ও প্রেমের জীবন্ত বিগ্রহ। সদ্গুরুর স্থূলমূর্তি বা রূপই হল পূজা বা উপাসনার শ্রেষ্ঠ অবলম্বন, তাঁর বাক্য ও নামই হল শ্রেষ্ঠ মন্ত্র; এঁকে ভজম করাই হল শ্রেষ্ঠ জপ। গুরুভাবই হল শ্রেষ্ঠ ধ্যেয় বস্তু। গুরুবোধ হল পূর্ণ উপলব্ধি। সদ্গুরু স্বয়ং সর্বদেবদেবীর অধিষ্ঠান এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের একক মূর্তি। তিনিই আবার পরব্রহ্ম পরমাত্মা স্বয়ং। সকলেই তাঁর আশ্রিত। গুরুতত্ত্বই সর্বতত্ত্ব সার। গুরুতত্ত্ব সমগ্র শক্তি ও সত্তার পূর্ণ স্বরূপ। সর্বজীবনের মূল বা উৎসই হল শ্রীগুরু স্বয়ং।

গুরুর দেহকে নিজের দেহের মধ্যে এবং নিজের দেহকে গুরুর দেহের মধ্যে পুনঃপুনঃ ভাবনা করতে হয়। গুরুর প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে নিজের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে চিন্তা বা ন্যাস করতে হয়। এ-ই হল শ্রেষ্ঠ অঙ্গন্যাস। গুরুর কথা ও নামকে প্রতিটি প্রাণের বৃত্তির মধ্যে ন্যাস করতে হয় বা চিন্তা করতে হয়। গুরুর ভাবকে মনের প্রতি বৃত্তি বা চিন্তার সঙ্গে যুক্ত করে ধ্যান করতে হয়। তাহলে সহজেই গুরুভাবে সমগ্র অন্তর বা বহিঃসত্তা পূর্ণ হয়।

প্রতি ব্যষ্টি মূর্তি বা রূপ কতগুলি বোধের বৃত্তি বা তরঙ্গসমষ্টি মাত্র।

গুরুর মধ্যে আমি এবং আমার গুরু সতত এই ভাবনা করাই হল শ্রেষ্ঠ সাধনা। এ হল 'মেনে মানিয়ে চলা' বিজ্ঞানের বিশেষ কৌশল।

১। স্বাত্মবোধের দৃষ্টিতে। ২। তত্ত্বের দৃষ্টিতে।

বহিঃপ্রকৃতি সূর্য চন্দ্র নক্ষত্র আকাশ বাতাস অগ্নি জল পৃথিবী সব কিছুর মধ্যেই চৈতন্যশক্তিরূপে গুরু আছেন। এই গুরু হতেই সকলের প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। জীবদেহের জীবনীশক্তি, পঞ্চ অন্তঃকরণ, পঞ্চপ্রাণ, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান বিজ্ঞানাত্মা ও তার কেন্দ্রে হৃদয়ে ঈশ্বরাত্মারূপে শিবগুরুই আছেন।

অখণ্ড ভূমা চৈতন্যসাগরের চতুর্বিধ স্তর হল যথাক্রমে রূপময়, নামময়, ভাবময় ও বোধময়।

সর্বরূপই অখণ্ড একরূপের অন্তর্ভুক্ত, সর্বনামই অখণ্ড একনামের অন্তর্ভুক্ত, সর্বভাব অখণ্ড একভাবের অন্তর্ভুক্ত এবং সর্ববোধ অখণ্ড একবোধের অন্তর্ভুক্ত।

সর্বরূপের কেন্দ্র হল সূর্য। সর্বনামের উৎস হল প্রণব। সর্বভাবের উৎস হল স্বভাবাত্মা। সর্ববোধের মূল হল আত্মা স্বয়ং।

সর্ব রূপ-নাম-ভাব-বোধের একক রূপই হল পরমাত্মারূপী গুরু। তাঁর বক্ষেই সর্ববিজ্ঞানাত্মা বা ব্যষ্টি আত্মা আছে এবং প্রত্যেক ব্যষ্টি আত্মারূপেও তিনি আছেন।

রূপময় ব্রহ্মগুরু আবার নামময়। নামময় ব্রহ্ম হল বাক্‌ময়, বাক্‌ শব্দময়, শব্দ প্রাণময়, প্রাণ মনোময়, মন ভাবময় এবং ভাব হল বোধময়। এইভাবে গুরুতত্ত্বের পরিচয় অনুভবগম্য হয়। সর্বস্তরের অন্তর্নিহিত মৌলিক উপাদানই হল চৈতন্য।

অনুভূতিশূন্য কোন বোধ বা বোধশূন্য কোন অনুভূতি কখনওই সম্ভব নয়। সর্বরূপে যা প্রতীত হয় তা শুদ্ধ একবোধের বৈচিত্র্যময় স্পন্দন মাত্র। সর্বের উৎস হল নিত্য একবোধ। যেহেতু বোধস্বরূপ নিত্য অখণ্ড ও পরম সত্য তার অন্তর্ভুক্ত সর্বপ্রকার অভিব্যক্তি বা প্রকাশ এবং কার্য-কারণ যুক্ত তার শক্তির সর্ববিধ লীলা যথা সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, সমষ্টি জীবন ও ব্যষ্টি জীবন, সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতি এবং তার অন্তর্নিহিত বৈচিত্র্যসমষ্টি, দেশকাল ও ঘটনাবলী প্রভৃতি সবই সত্য। অর্থাৎ প্রকাশক যেমন সত্য, প্রকাশও সত্য; স্রষ্টা যেমন সত্য, সৃষ্টিও সত্য; নির্গুণ যেমন সত্য, সগুণও সত্য; সমষ্টি যেমন সত্য, ব্যষ্টিও সত্য; সেইরূপ প্রকাশের অন্তর্ভুক্ত সর্ববিধ অভিব্যক্তিও সমষ্টি ও ব্যষ্টি ভেদে সমান সত্য।

বোধের বহুবৃত্তি বোধস্বরূপের কার্য। বোধস্বরূপ হল স্বয়ং মহাকারণ, তাঁর শক্তিই হল সর্ববিধ কারণ ও কার্যের উৎস।

রূপময় ব্রহ্মের কারণ হল নামময় ব্রহ্ম, নামময় ব্রহ্মের কারণ ভাবময় ব্রহ্ম এবং ভাবময় ব্রহ্মের কারণ বোধময় ব্রহ্ম। বোধময় ব্রহ্মই হল সর্বকারণের কারণ, মহাকারণ।

কারণ ও কার্য সম্বন্ধ ধরে গুরুতত্ত্বের বিজ্ঞান

রূপ ও নামের মধ্যে রূপ হল কার্য, নাম হল কারণ; নাম ও ভাবের মধ্যে নাম হল কার্য, ভাব হল কারণ; এবং ভাব ও বোধের মধ্যে ভাব হল কার্য, বোধ হল কারণ। রূপ নাম ভাব একদিকে কার্য, একদিকে কারণ উভয়ই। কিন্তু বোধস্বরূপ নিত্য নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, অচল, অটল। তাঁর আদি শক্তিই হল আনন্দময় ও ভাবময়, মধ্যশক্তি হল জ্ঞানময় ও নামময় এবং বহিঃশক্তি রূপময় অর্থাৎ বৈচিত্র্যময়। স্বরূপশক্তিকেই হ্লাদিনীশক্তি, কেন্দ্রশক্তি, অন্তরঙ্গশক্তি, যোগমায়াশক্তি, পরাশক্তি ও আত্মশক্তি বলা হয়। অন্তরশক্তিকে সম্বিৎশক্তি, চিৎশক্তি বা জ্ঞানশক্তি, তটস্থশক্তি, অধ্যাত্মশক্তি, মহামায়াশক্তি, জীবশক্তি ও বিদ্যাশক্তি বলে। বহিঃশক্তিকে সন্ধিনীশক্তি, বহিরঙ্গশক্তি, প্রকৃতিশক্তি বা গুণশক্তি, ক্রিয়াশক্তি, মায়াশক্তি, অবিদ্যাশক্তি, অপরাশক্তি ও আধারশক্তি বলা হয়।

শ্রদ্ধাই হল শুদ্ধ ভাবের লক্ষণ। সত্যকে সত্যবোধে ধারণ করার নাম শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধার সঙ্গে ভক্তি ও বিশ্বাসের নিত্য অভেদ সম্বন্ধ।

গুরু শব্দ অন্যতম শ্রেষ্ঠ মন্ত্র। গুরু হল অজ্ঞান বিনাশক, জ্ঞানদাতা ও মুক্তিদাতা। সংকীর্ণতাই হল অজ্ঞানতা। অজ্ঞানতাই হল মৃত্যু।

জন্ম মৃত্যু জীবনবোধের দুটি বিশেষ অবস্থা মাত্র। জন্ম মৃত্যু হল আলো ও ছায়ার মত। সামনে আলো থাকলে ছায়া পিছনে পড়ে, আবার পিছনে আলো থাকলে ছায়া সামনে পড়ে। সেইরূপ মৃত্যুকে সামনের দিকে রাখলে ভগবান থাকেন পিছনে, আবার ভগবানকে সামনে রাখলে মৃত্যু যায় পিছনে। বোধস্বরূপের পরিচয় হল গুরু বা আত্মা। বোধস্বরূপের সঙ্গে নিজের অভেদ সম্বন্ধকে আত্মজ্ঞান বা আত্মোপলব্ধি বলে। [১৯।৫।৬৮]

সর্ব আমির মধ্যে মায়ের আমির পরিচয়

প্রত্যেকের মধ্যেই মায়ের নিত্য আমির তিন অংশ বর্তমান আছে। কেন্দ্রের আমির প্রভাবে অন্তরের আমি চলে এবং অন্তরের আমির প্রভাবে বাইরের আমি চলে। কেন্দ্রের আমির টানে অন্তরের আমি কেন্দ্রের সঙ্গে একীভূত হয়ে যায়, আবার অন্তরের আমির টানে বাইরের আমি সংযত হয়। জাগ্রত অবস্থা হল বাইরের আমির কাজ, স্বপ্ন হল অন্তরের আমির কাজ এবং গাঢ় নিদ্রায় কেন্দ্রের নিষ্ক্রিয়, নিরপেক্ষ ও অমূর্ত আমির পরিচয় মেলে। এই তিন আমির সম্মিলিত রূপই হল পরমেশ্বরী মায়ের পূর্ণ পরিচয়। এই মা স্বয়ংপূর্ণা, স্বয়ংপ্রকাশ, অদ্বয়, অব্যয়, অমৃতময়। পূর্ণমায়ের যে আমি তাই হল অখণ্ডভূমার আমি। একেই নির্গুণগুণী বলা হয়। কেন্দ্রের আমি নির্গুণ নির্বিকার নির্বিশেষ নিষ্ক্রিয় অমূর্ত এবং অদ্বৈত। অন্তরের আমি সগুণ সবিশেষ সক্রিয় ও মূর্ত। বাইরের আমি হল ত্রিগুণাপ্রকৃতির আমি। এই আমিই পরিবর্তনশীল, বিকারী ও বৈচিত্র্যময়। নির্গুণ ও সগুণের আমি মিলেই হল নির্গুণগুণী। নির্গুণের আমি অদ্বয় অব্যয়। সগুণের আমিও অদ্বয় অব্যয়; কিন্তু এর দুইটি রূপ। একটি হল সমষ্টির একক মূর্তি এবং অপরটি হল অসংখ্য ব্যষ্টি মূর্তি। ব্যষ্টির আমি হল জীব, সমষ্টির আমি হল জীবেশ্বর বা বিধাতা। এরই অপর নাম হিরণ্যগর্ভ। বাইরের প্রকৃতির আমিরও দ্বিবিধ রূপ আছে। একটি হল অন্তরের সমষ্টি আমি জীবেশ্বরের সঙ্গে যুক্ত, অপরটি অন্তরের ব্যষ্টি আমি জীবের সঙ্গে যুক্ত।

জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে 'অভেদাভেদ' সম্বন্ধ

জীবেশ্বরকেই বিশ্বদেব বলা হয় এবং তাঁর প্রকৃতিকেই বিশ্বপ্রকৃতি বলা হয়। ব্যষ্টি জীব অসংখ্য এবং তাদের স্বরূপ অণু পরিমাণ হতে অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ পর্যন্ত নানা আকৃতি বিশিষ্ট। তাদের প্রকৃতিকেই জীব প্রকৃতি বলে।

জীব স্বরূপত মুক্ত ও অমৃতময়।। কিন্তু বহিঃপ্রকৃতির প্রভাবে নিজেকে বদ্ধ এবং মৃত্যুর অধীন মনে করে। জীবেশ্বরের কৃপায় জীব আপন মুক্ত ও অমৃতস্বরূপ অনুভব করে এবং জীবেশ্বরের সঙ্গে একীভূত হয়েও থাকতে পারে, আবার পৃথক হয়েও থাকতে পারে। একেই জীবন্মুক্তি বলে। তারপর নির্গুণতত্ত্বের সাধনার দ্বারা আপনার কেন্দ্রের আমির সঙ্গে একীভূত হয়ে থাকতে পারে অথবা প্রেমভক্তির উৎকর্ষ হলে তার মাধ্যমে নির্গুণগুণী পরমেশ্বরের সাধনা দ্বারা তাঁর নিত্যলীলার নিত্যসাথী হতে পারে।

প্রকৃতির আমির প্রভাবে জীবের আমির যে বিকার হয় তাকেই 'অহংকার[১] বলে'। অহংকারের অন্তরে থাকে অভিমান। তা-ই অখণ্ড অভেদের মধ্যে খণ্ড ও ভেদ কল্পনা করে। এই ভেদ কল্পনাকেই 'স্বার্থজ্ঞান[২] বলে'। স্বার্থজ্ঞানই হল মায়া[৩] অর্থাৎ বহিঃপ্রকৃতির আমির পরিচয় এবং সমবোধ আপনবোধ ও একবোধ হল 'মায়ের[৪] পরিচয়'। অহংকার ভুল করে এবং অভিমান ভুলকে সমর্থন করে। এই ভুল সংশোধনের উপায় হল জীবেশ্বরের

১। তত্ত্বের দৃষ্টিতে। ২। তত্ত্বের দৃষ্টিতে। ৩। তত্ত্বের দৃষ্টিতে। ৪। তত্ত্বের দৃষ্টিতে।

শরণাপন্ন হওয়া অর্থাৎ গুরু ইষ্ট মাতৃজ্ঞানে প্রতি ব্যষ্টি জীবকে ও প্রকৃতিকে ব্যবহার করা। অহংকার অভিমান স্বল্পকে নিয়ে মেতে থাকে বলে বিরাটকে হারায়। অপরকে মান দিলে অর্থাৎ ইষ্টজ্ঞানে 'মেনে মানিয়ে চললে' অহংকার অভিমান আর থাকে না। তখন ঈশ্বরের সঙ্গে সহজেই আপনবোধের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়।

আনন্দের আতিশয্যই হল বোধের প্রকাশ ক্রিয়া।

ভোগের তাৎপর্য

আহার রূপে যা কিছু গ্রহণ করা হয় তাকেই ভোগ বলে। অর্থাৎ বাইরে থেকে অন্তর যা কিছু গ্রহণ করে তা-ই ভোগ[১]। অন্তরচৈতন্যের সক্রিয় অংশ ও ইন্দ্রিয়াদি করণবর্গের অধিষ্ঠানচৈতন্যকেই দেবদেবী বলা হয়।

অন্তর নিবেদনের তাৎপর্য

বস্তু সামগ্রী হল বহিঃ প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত। মন ও বুদ্ধির বৃত্তিসকল অন্তরপ্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত। বহির্বস্তুকে যেমন দেবতার কাছে নিবেদন করা হয় এবং তার ফলে বস্তুর প্রতিক্রিয়া শোধন হয়, সেইরূপ অন্তরের ভাবকেও কেন্দ্রের কাছে সমর্পণ করতে হয়। তাহলেই অন্তরের ভাবশুদ্ধি হয় অর্থাৎ মন ও বুদ্ধি সাত্ত্বিক ও দিব্যভাবে রূপান্তরিত হয়। তখনই সমগ্র অন্তরসত্তাকে কেন্দ্রসত্তার কাছে পূর্ণভাবে সমর্পণ করা সম্ভব হয়। এই সমর্পণের পূর্ব অবস্থা হল বাইরের আমিকে অন্তরের আমির কাছে সমর্পণ করা এবং পরবর্তী অবস্থায় অন্তরের আমিকে কেন্দ্রের আমির কাছে সমর্পণ করা।

জীবনের কর্তা প্রভু ও নিয়ন্তা জীবের আমি নয়, 'মা স্বয়ং'[২]।

সব নামের উৎস বা মূলকেন্দ্র হল প্রণব বা ওঁ। এ-ই সমগ্র প্রাণচৈতন্যের বা ঈশ্বরের বাচক বা সত্য নাম ও পরিচয়। এ-ই হল ব্যষ্টি জীবের ইষ্ট।

ব্যষ্টি আমির সঙ্গে সমষ্টি আমির যেমন অভেদ সম্বন্ধ আছে, সেইরূপ সমষ্টি আমির সঙ্গেও অখণ্ড ভূমা আমির নিত্য অভেদ সম্বন্ধ আছে। বিশ্বপ্রাণ চৈতন্যসাগরে ব্যষ্টিপ্রাণ যেন এক একটি বুদ্বুদের মত চরে বেড়ায়। তার ভিতরেও বিশ্ব বাইরেও বিশ্ব।

বোধের দৃষ্টিতে মানার তাৎপর্য

নিত্য মায়ের অনুভূতি লাভের সহজতম বিধান হল সবকিছুর মধ্যে বোধ দিয়ে মাকে মানা। অর্থাৎ যা কিছু প্রকাশমান তা নিজবোধেরই বিস্তার মাত্র। একে এইভাবে ভাবতে হয়—'মায়ের[৩] বুকে আমি এবং আমার বুকে মা, মায়ের অন্তরে আমি এবং আমার অন্তরে মা, মায়ের কেন্দ্রে আমি এবং আমার কেন্দ্রে মা, বোধের মধ্যে আমি এবং আমির মধ্যে বোধ; তাহলে এসব ভেদজ্ঞান, দ্বৈতপ্রতীতি ও অজ্ঞানের অবসান হয় এবং থাকে শুধু অখণ্ড অভেদ একবোধ, সমবোধ বা আপনবোধ।

সচ্চিদানন্দময়ী মায়ের প্রকাশসন্তান সমগ্র ব্যষ্টি জীবন মায়ের দানেই পুষ্ট, তুষ্ট ও পূর্ণ হয়। মায়ের নিরন্তর আত্মদানের ফলেই তা সম্ভব হয়। নিরন্তর আত্মদানই হল মায়ের স্বভাব। মায়ের প্রকাশসন্তানের অন্তরে ও বাইরে মায়ের আত্মদানের নীতি হল 'সর্বনীতির জননী'[৪]। অর্থাৎ ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনের মধ্যে যে গ্রহণ ও প্রতিদানের ধর্ম পরিলক্ষিত হয় তার মূলে আছে পরস্পরের প্রতি আত্মদানের নীতি।

১। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে। ২। তত্ত্বের দৃষ্টিতে, স্বানুভূতির ফলশ্রুতি। ৩। স্বানুভূতির বিজ্ঞান দৃষ্টিতে। ৪। তত্ত্বের দৃষ্টিতে।

দৈব ও পুরুষকাররূপে চিন্ময়ী মা-ই স্বয়ং

সর্বজীবের মধ্যে দৈব ও পুরুষকাররূপে মা-ই স্বয়ং দৈবরূপে অন্তরে মা কারণ এবং পুরুষকাররূপে মা-ই হলেন প্রচেষ্টা, সক্রিয়তা বা কার্য।

প্রকৃতির মাহাত্ম্য

প্রকৃতি শব্দের অর্থ যে পূর্ণতার স্বরূপকে, ধর্মকে ও পুরুষকে যথার্থরূপে প্রকাশ করে। তার প্রকাশক্রিয়া তার নিজের জন্য নয়, তার কেন্দ্রসত্তা পরমপুরুষের জন্য এবং পরার্থের জন্য। এই কারণেই তার সমগ্র কার্য হল অখণ্ড এক সমর্পণ বা পূর্ণ আত্মদান। [২০।৫।৬৮]

মালার তাৎপর্য

মালার[১] অর্থ ভগবতী মাতার অনুভূতি লাভ ; অর্থাৎ মাতৃজ্ঞানে মাতৃবোধে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। অথবা মাধব মহৎ ও মহেশের অনুভূতিলাভের লক্ষণ হল মালা। দশমহাবিদ্যার তত্ত্বলাভ হলে মালার তাৎপর্য অনুভবগম্য হয়। ঈশ্বরীয় ভাবের বা বোধের আবির্ভাব বা প্রকাশকেও 'মালা[২] বলা হয়'।

মালার এক নাম হল আম্নার। আম্নার অর্থ মাতৃকণ্ঠের হার বা মালা। তা মুণ্ডমালাকেই নির্দেশ করে। এই মুণ্ডের অর্থ অক্ষর বা বীজ। এই বীজ হল সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের বীজ। এই বীজ থেকেই জীবজগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় হয়।

পরমেশ্বরী মা তাঁর ভক্তসন্তানের যোগ্যতা বুঝে অর্থাৎ আত্মসমর্পণের যোগ্য অধিকারীকে নিজেই নিজের এই কণ্ঠমালা দিয়ে বরণ করে নেন। বরণ মানে আপনার মধ্যে মিলিয়ে নেওয়া বা গ্রহণ করা। তার ফলে আত্মজ্ঞান লাভ ও পরমাত্মবোধে স্থিতি হয়।

মালা=মা+ল+আ। 'মা' হল মাধব, মা, মহেশ ও মহৎ। 'ল' হল লয় এবং 'আ' হল আনন্দ ও আকর্ষণ শক্তি। 'মা'-তে পূর্ণভাবে লয় করে দেয় বা নেয় যে শক্তি, জ্ঞান, আনন্দ ও প্রেম—তাই মালা।

মালার প্রতি লোভ থাকলে হয় ঐশ্বর্যের সাধনা। ঐশ্বর্যের সাধনায় মাধুর্যের সন্ধান মেলে না অর্থাৎ মায়েতে লয় হওয়া যায় না। পৃথক আমিবোধ থেকেই হয় ঐশ্বর্যের সাধনা। অভিমানে সে অনেক কিছু চায়, কিন্তু অখণ্ড ভূমা এককে চায় না। অভিমান মরে গেলে অন্য কিছুরই দরকার থাকে না। অভিমান মরে গেলে আমিতে নিত্যবাস হয়। মরে যাওয়া মানে মা-তে থাকা। মৃত্যুকে মাতৃবোধে গ্রহণ করলে মৃত্যুভয় থাকে না। তখন মরেও মরে না, তখন মরে হয় অমর। 'মর' হল ম-তে রহ। তাহলেই অমর। মৃত্যুকে মাতৃবোধে গ্রহণ করলেই অমৃতরূপী মাকে পাওয়া যায়। মায়ের সাথে সাথে চলা মানেই হল 'মেনে মানিয়ে চলা'। মানিয়ে চলা হল মাতৃবোধে চলা। বোধ দিয়ে অন্তরে ও বাইরে সবকিছুর ব্যবহার করাই হল 'মেনে মানিয়ে চলার' মর্মার্থ। 'মায়েতে আমি এবং আমাতে মা' অর্থাৎ বোধের মধ্যে আমি এবং আমার মধ্যে বোধ। আমি ছাড়া মা থাকেন না, মা ছাড়া আমি থাকে না; অর্থাৎ বোধ ছাড়া অনুভূতি এবং অনুভূতি ছাড়া বোধ কখনওই সম্ভব নয়। সন্তানহীন মা হতে পারে না এবং মাতৃহীন সন্তানও হতে পারে না। অর্থাৎ প্রকাশশূন্য প্রকাশক এবং প্রকাশকশূন্য প্রকাশ হয় না। অস্তিশূন্য ভাতি এবং ভাতিশূন্য অস্তি, আবার অস্তি-ভাতিশূন্য প্রীতি এবং প্রীতিশূন্য অস্তি-ভাতি কখনওই সম্ভব নয়।

১। তন্ত্রের দৃষ্টিতে। ২। তন্ত্রের দৃষ্টিতে।

প্রজ্ঞান ও বিজ্ঞানের অভেদ সম্বন্ধ

প্রজ্ঞানের বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানের প্রজ্ঞান নিত্য অভেদ, নিত্যপূর্ণ, শাশ্বত সত্য। আমির প্রকাশ আমি, আমির প্রকাশকও আমি। উভয় আমির উপাদানই হল চৈতন্য বা বোধ। এই চৈতন্যই হল নিত্য শাশ্বত অমৃতময় সত্তা। মায়ের আমি ও সন্তানের আমি উভয়েরই পরিচয় হল চৈতন্য। মায়ের ধর্ম ও স্বভাব সন্তান পায়। সচ্চিদানন্দময়ী মায়ের সন্তানও সচ্চিদানন্দময়।

ব্যক্ত ও অব্যক্ত অভিন্ন তত্ত্ব

জীব ও ব্রহ্ম অভেদ এবং অভিন্ন, সেইরূপ মা ও সন্তান, ভগবান ও ভক্ত অভেদ ও অভিন্ন। মা যেমন অজর অমর নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত, মাতৃভক্ত সন্তান আমিও অজর অমর নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত।

সচ্চিদানন্দময়ী মায়ের আমি হল পুরুষোত্তমের আমি। তাঁর চতুর্বিধ পরিচয়—(১) নেতি, (২) ইতি, (৩) নেতি ও ইতি এবং ইতি ও নেতি, (৪) যা-তাই।

শক্তিস্বরূপে চাওয়া পাওয়া, জ্ঞানস্বরূপে জানাজানি, আনন্দস্বরূপে মেলামেশা এবং প্রেমে হল নিত্যলীলা। শক্তির হল আসক্তি, জ্ঞানের হল ভাললাগা, আনন্দের হল ভালবাসা এবং প্রেমের হল রুদ্ররাগ ও পূর্ণস্থিতি, পূর্ণানুভূতি বা স্বানুভূতি। ভালবাসা জানার অপেক্ষা রাখে না। আবার জানাজানিতে ভালবাসার অপেক্ষা থাকে না।

অজ্ঞান-জ্ঞান, মৃত্যু-অমৃত, ব্যক্ত-অব্যক্ত, মূর্ত-অমূর্ত, বহু ও এক, সগুণ ও নির্গুণ সবই যাঁর মহিমা তিনি হলেন অখণ্ড ভূমা মা।

জ্ঞান ও আনন্দের মিলন মাধুর্যই হল প্রেম। এর সর্বোত্তম লক্ষণ হল আপনবোধ।

অহংকার ও ত্বংকারের বৈশিষ্ট্য

ব্রহ্মময়ী মাকে জ্ঞানের বিষয়রূপে চাওয়া ও পাওয়ার ইচ্ছা হল অহংকার এবং অভিমানাত্মক জ্ঞানের ধর্ম। এ অশুদ্ধ, অপূর্ণ ও ভ্রান্তিমূলক। ভ্রান্তি হয় অহংকারে এবং শান্তি হয় ত্বংকারে। ত্বংকার হয় অহংকার মরলে অর্থাৎ মায়েতে থাকলে। শান্তি পেতে হলে সব কিছুতে সদা মাকে মেনে মাতৃবোধে থাকতে হয়। অহংকারে শান্তি হয় না। অহংকারের আসল অর্থ 'অহং' কার? 'অহং' হল মায়ের। মায়ের মধ্যে সবই মা।

স্ববোধ আত্মারূপী মায়ের প্রকাশ অনুভূতির মধ্যেও কোন প্রকারভেদ বা পার্থক্য নেই। প্রকাশের মধ্যে পূর্বাপর সম্বন্ধ ধরে ভেদ বা পার্থক্য প্রতীয়মান হয়। ভেদজ্ঞানই হল অজ্ঞান। এ হল জ্ঞানের বিকল্প ব্যবহার।

যোগীর গাথা, জ্ঞানীর আধা, ভক্তের সাধা এবং প্রেমিকের মাথা। ...প্রেমিক সর্বদা মায়েতে বা মাধবে থাকে অর্থাৎ মাতৃবোধে বা মাধববোধে বিভোর থাকে। জ্ঞানীর কাছে ব্রহ্মই সত্য আর সবই মিথ্যা অর্থাৎ শব। ...প্রেমিকের কাছে দেহ সব নয় কারণ শিবহীন অর্থাৎ প্রাণচৈতন্যবিহীন দেহ হয় না। তার মধ্যে বাস করে মাতা সর্বাণী বা মাতা শিবানী। প্রাণ থেকে প্রাণ জাত হয়, প্রাণের মধ্যেই প্রাণ বাস করে আবার প্রাণের মধ্যেই প্রাণ বিশ্রাম করে। মায়ের প্রকাশসন্তানের সঙ্গে মায়ের যথার্থ ভেদ নেই। মায়ের সর্ব ধর্মই সন্তানের মধ্যে নিহিত থাকে। মা-ও পূর্ণ সন্তানও পূর্ণ। পূর্ণের মধ্যে যা কিছু প্রকাশ সবই পূর্ণ। পূর্ণের বাইরে কিছু যেতে পারে না। প্রেমিক থাকে মজায়। সন্তান থাকে মজায়। মজার 'ম' মানে মহেশ, মহৎ, মাধব ও মা। 'জা' মানে জাত হওয়া বা জাগ্রত থাকা। মজার অর্থ মায়েতে জাত হওয়া এবং জাগ্রত থাকা। প্রেমিক সন্তানের কাছে মা (মাধব) আগে, আর সবকিছু পরে। অর্থাৎ তার মা (মাধব) বোধে মনেপ্রাণে ইন্দ্রিয়ে দেহে, এককথায় বোধে ভাবে নামে রূপে।

তার মা (মাধব) মাটিতে জলে, অগ্নিতে, বায়ুতে, আকাশে, সর্বপ্রকাশের অণু পরমাণুতে, অন্তরে বাইরে একাকার। এই বোধে সে বিচরণ করে। এইরূপ বিচরণ করার নামই প্রেমিকের কাছে বিচার। তার কাছে মা-ই (মাধব) সব। বিচারের অর্থ প্রেমিকের কাছে একরকম, জ্ঞানীর কাছে আর একরকম। জ্ঞানী করে আচার। কর্মের ফল হল অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান। এই জ্ঞান যার আছে সেও জ্ঞানী। এই জ্ঞানীরই হল আচার। কিন্তু জ্ঞানের যে জ্ঞান তার অধিকারীও জ্ঞানী। এই দ্বিতীয় পর্যায়ের জ্ঞানীই হল যথার্থ জ্ঞানী। এইরূপ জ্ঞানী ও প্রেমিক একই পর্যায়ভুক্ত। জ্ঞানের জ্ঞান হয় অদ্বয় সত্য, অদ্বয়বোধ বা একবোধ বা সমবোধ বা আপনবোধ। এই একবোধ বা সমবোধে থাকার নামই হল বিচার বা বিচরণ[১]।

বিচার শব্দের বিভিন্ন মানে— (১) বিচার = চারশূন্য অর্থাৎ ভেদশূন্য, (২) বিশেষরূপে চার। এই চার মানে হল আহার, আগ্রহ ও ব্যাকুলতা। আবার 'চার' মানে হল চতুর্থ সংখ্যা। বিচার মানে হল বিশেষ আহার, বিশেষ আগ্রহ ও বিশেষ ব্যাকুলতা। বিশেষ চার বা চারের বিশেষত্ব—যথা চতুষ্পদ, চতুরঙ্গ, চতুর্ভাগ, চতুর্বেদ, চতুর্যুগ, চতুর্বর্ণ, চতুরাশ্রম প্রভৃতি।

বর্তমানে বৈদিক অনুষ্ঠানে তন্ত্রের প্রাধান্য বেশি

বর্তমানে দেবদেবীর অর্চনায় বৈদিক প্রভাব অপেক্ষা তন্ত্রের প্রাধান্যই বেশি। বৈদিক পূজা আরাধনার পদ্ধতিতে পুরুষ দেবতার প্রাধান্য অধিক। তান্ত্রিক পদ্ধতিতে দেবী বা শক্তির প্রাধান্য অধিক। তন্ত্রোক্ত পূজা পদ্ধতির মধ্যে প্রাণচৈতন্যকে দিয়েই প্রাণচৈতন্যের পূজা করতে হয়। অর্থাৎ মাতৃবোধে মাতৃভাবে মাতৃনামে মায়ের পূজাই হল জীবনসাধনা।

ওঁ বা প্রণব হল নির্গুণ ও সগুণ উভয় তত্ত্বের বাচক অর্থাৎ ঈশ্বরের শব্দময় রূপ।

চারটি স্ফুট বা অভিব্যক্তি হল যথাক্রমে অস্ফুট, স্ফুট, স্ফুটতর ও স্ফুটতম। ...স্ফুটতম হল বহিঃসত্তা, স্ফুটতর হল অন্তরসত্তা, স্ফুট হল কেন্দ্রসত্তা এবং অস্ফুট হল অব্যক্ত বা তুরীয়সত্তা।

মায়ের অনন্ত প্রকাশধারাই হল এই বিশ্বরূপ। বিশ্বরূপী মাকে অনুভব করার জন্য মায়ের নবভাবকে নবদুর্গা[২] বা নবপত্রিকারূপে আরাধনা করা হয়। ...নবদুর্গা হল মহাপ্রাণচৈতন্যের নয়টি বিশেষ রূপ। মহাপ্রাণচৈতন্যের আদি রূপই হল প্রণব। এ হল সমগ্র জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারের কারণ বা মূল।

চৈতন্যসত্তার চতুর্বিধ অভিব্যক্তি

চৈতন্যসাগরের প্রথম অভিব্যক্তি হল সমষ্টি ভাব, দ্বিতীয় অভিব্যক্তি হল সমষ্টি নাম এবং তৃতীয় অভিব্যক্তি হল সমষ্টি রূপ। কেন্দ্রসত্তায় হল প্রেমানন্দশক্তি। একেই হ্লাদিনীশক্তি বা যোগমায়াশক্তি বলে। অন্তরসত্তায় হল জ্ঞান-বিজ্ঞানশক্তি। একে সম্বিৎশক্তি বা চিৎশক্তি এবং মহামায়াশক্তি বলে। বহিঃসত্তায় হল ক্রিয়াশক্তি বা সন্ধিনীশক্তি। এরই অপর নাম মায়াশক্তি। বহিঃশক্তিকে অপরাপ্রকৃতি বা অবিদ্যামায়া বলে, অন্তরশক্তিকে পরাপ্রকৃতি বলে, বিদ্যাশক্তি বলে এবং কেন্দ্রশক্তিকে পরমাপ্রকৃতি বা স্বরূপশক্তি বলে। এই তিন শক্তির একক রূপই হল ভগবতী মাতা। এই এক শক্তিকেই ব্রহ্মশক্তি, পরমাত্মশক্তি বা পরমেশ্বরী শক্তি বলে। শক্তি ও সত্তা, প্রকৃতি ও পুরুষ নিত্য অভেদ। সমগ্র জীবজগৎ হল এই শক্তির অভিব্যক্তি বা বহিঃপ্রকাশ। সত্তার বক্ষে, পুরুষের বক্ষে শক্তি বা প্রকৃতির নিত্যলীলা অভিনয় হল অনন্ত জীবনের পরিচয়।

১। অভিনব সংজ্ঞা। ২। কলা, কচু, ধান, হলুদ, ডালিম, বেল, অশোক, জয়ন্তী ও মানকচু।

সর্ববিধ সাধনা ও ভজনার মূলে এক পরমতত্ত্বই নিহিত

পরমতত্ত্ব ও সারবস্তু নিত্য অখণ্ড এক। একেই সকলে বহুনামে বহুভাবে ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে আপন সামর্থ্য, যোগ্যতা ও রুচি অনুযায়ী ভজন করে।

নানা মতপথের রহস্য

স্বভাবপ্রকৃতি ও অনুভূতি অনুসারে মানুষ যুগে যুগে যা ব্যক্ত করেছে তা হতেই নানা মত ও নানা পথের হয়েছে। সব মতপথই সত্য; কারণ পরমসত্য হতে যা জাত হয় তা সত্যেরই অংশ এবং সত্যনির্ণয় ও অনুভূতির জন্য সহায়ক বলে তা-ও সত্য। সব মিলে হল পরমসত্য।

অবতারের রহস্য

ভক্তের ভগবান নরবেশে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। এই নরবেশী ভগবান যুগে যুগে জগতের প্রয়োজনে ভক্তের টানে মানুষের মধ্যে আবির্ভূত হন।

মা নিজে এক হয়েও দ্বৈত ও বহু সাজেন, আবার বহু থেকে দ্বৈতবোধে এসে ভক্ত-ভগবান রূপে খেলে অবশেষে উভয়ে মিলে আপনার অদ্বয়স্বরূপ প্রকাশ করেন।

মনুষ্য জন্মের বৈশিষ্ট্য

অখণ্ড সচ্চিদানন্দসাগরের বক্ষে তার অনন্ত প্রকাশ অনন্ত ব্যষ্টি জীবনের মধ্যে মনুষ্যরূপই হল শ্রেষ্ঠ। মানুষের হৃদয়েই সচ্চিদানন্দের অনুভূতি পূর্ণভাবে অভিব্যক্ত হয়। মনুষ্য হৃদয় ছাড়া ঈশ্বরের সর্বোত্তম অভিব্যক্তি অন্য কোন জীবনে সম্ভব নয়। ঈশ্বরের শক্তি জ্ঞান আনন্দ ও প্রেমের পূর্ণতা ঈশ্বর আস্বাদন করেন মনুষ্য জীবনের মাধ্যমে। অন্যান্য জীবন হল তার প্রস্তুতি। পূর্ণানুভূতি যখন কারও মধ্যে হয় তখন তাকে দিব্যমানব বলা হয়। চৈতন্য বা অনুভূতির লক্ষণ হল আমি, তুমি, সে। চরমতম অনুভূতি যখন হয় তখন আমিই সব, সবই আমি বা তুমিই সব, সবই তুমি বা সে-ই সব, সবই সে এইভাব প্রকাশ পায়। সচ্চিদানন্দময়ী মায়ের সঙ্গে যখন তাঁর ভক্তসন্তানের তাদাত্ম্যলাভ হয় তখন সে বলে, মায়ের বুকে আমি অথবা আমার বুকে মা, মা-ই আমি অথবা আমি-ই মা। তবে এই আমি কিন্তু জীবের আমি নয়। এই আমি সরসতম ও মধুরতম আমি।

মুক্তপুরুষের বৈশিষ্ট্য

উদার হৃদয়, পরমতসহিষ্ণুতা অর্থাৎ সর্ব মতপথকে সমান মূল্য দেওয়া, ভিন্ন মতাবলম্বী সাধকদের আপনবোধে বা সমবোধে গ্রহণ করা এবং নিত্য এক সত্য ভগবানের অংশ বা সন্তান বলে তাদের গ্রহণ করা হল মুক্তপুরুষ বা মহাপুরুষের লক্ষণ। মহাপুরুষদের কোন পক্ষপাত দোষ থাকে না এবং মতপথের গোঁড়ামিও থাকে না। তাঁরা বলেন সবই সত্য অর্থাৎ সবই ঈশ্বরময়, আত্মময়, ব্রহ্মময়, গুরুময় ও মাতৃময়। জগৎ ও ব্রহ্ম দুটি ভিন্ন বস্তু নয়। ব্রহ্মের প্রকাশরূপ হল জগৎ এবং জগতের সত্তা হল ব্রহ্ম। ব্রহ্মকে বাদ দিয়ে জগতের কোন কিছুরই অনুভূতি বা ব্যবহার সম্ভবপর নয় এবং জগৎকে বাদ দিয়ে ব্রহ্মানুভূতি লাভ করাও সম্ভবপর নয়। ব্রহ্ম শব্দও জগতের অন্তর্গত এবং জগৎ শব্দও ব্রহ্মের মধ্যে জাত। ব্রহ্মানুভূতির চারটি বিশেষ ভঙ্গিমা হল (১) সর্বমহম্, (২) সর্বাত্মকোহম্, (৩) সর্বশূন্যঅহম্, (৪) সর্বাতীতোহম্। (অহং-এর জায়গায় ত্বং, তৎ, অয়ম প্রভৃতি শব্দের ব্যবহারও সিদ্ধ) অর্থাৎ (১) ইতিবাচক ব্রহ্ম, (২) ইতি ও নেতিসংযুক্ত ব্রহ্ম, (৩) নেতিবাচক ব্রহ্ম এবং (৪) অব্যক্ত ব্রহ্ম।

ব্যক্তির মধ্যেই ঈশ্বরের অভিব্যক্তির তাৎপর্য

ব্যক্তিগতভাবে নিজের মধ্যে যা কিছু হয় তার পরিণামে হয় শোক। ব্যক্তিগত আরাম ও সুখের পরিণাম হল দুর্ভোগ। ব্যক্তিগত কার্য যা দ্বারা নিষ্পন্ন হয় তা হল গুণ। ব্যক্তিত্বের অপমান বা অবসানই হল মৃত্যু। মায়ের জন্য নিজের মধ্যে যে ক্রিয়া হয় তা শক্তি। মায়ের জন্য নিজের মধ্যে যে ভাব হয় তা ভক্তি। মায়ের জন্য নিজের মধ্যে যে স্থিতি তার পূর্ণতাই হল শান্তি। মাতৃবোধে যে ব্যক্তিত্বের স্বতঃস্ফূর্ত অভিপ্রকাশ হয় তাই হল অমৃতস্বরূপ।

আত্মারূপী মা অথবা মাতৃরূপী আত্মা হল নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত নির্বিকার অমৃতস্বরূপ। এ-ই প্রতিজীবনের সত্য পরিচয় ও সত্যানুভূতি। এ হল সৎবস্তু অর্থাৎ সর্বকালে সর্বাবস্থায় সমভাবে বিদ্যমান। এ নিত্যসমান। কাল একে নাশ করতে পারে না। কার্য একে বিকৃত করতে পারে না। মৃত্যু এর ছায়া মাত্র। এ নিত্যসমানে প্রতিষ্ঠিত বলেই একে অচ্যুত ও ভূমা বলা হয়।

চৈতন্যের বৈশিষ্ট্য

বোধচৈতন্যই সর্বপ্রকাশের মূল উপাদান। অঙ্গ ও অঙ্গীরূপে যা কিছু প্রকাশ পায় তা চৈতন্যেরই দ্বিবিধ অভিব্যক্তি। অঙ্গের মধ্যে অঙ্গী বাস করে এবং অঙ্গীর সঙ্গে আছে অঙ্গের নিত্য অভেদ সম্বন্ধ। প্রাণকে, বোধকে অঙ্গীরস বলা হয়। এই প্রাণচৈতন্যই দেহকে সজীব রাখে, সরস রাখে ও সচেতন রাখে। এ নিত্য অব্যয় অদ্বয় পূর্ণসত্তা বলে অমৃতময়। দেবতা, ঈশ্বর, আত্মা, ব্রহ্ম এরই পরিচয় এবং ভিন্ন ভিন্ন নাম মাত্র। প্রাণ বা চিৎ উপাদানে গড়া অঙ্গের সঙ্গে অঙ্গের এবং অঙ্গীর মিলনকে অঙ্গীকার[১] বলে। অর্থাৎ বোধের সঙ্গে বোধের মিলনই হল অঙ্গীকার বা স্বীকার। প্রাণই হল প্রজ্ঞা, প্রজ্ঞাই হল প্রাণ। প্রজ্ঞাই হল জ্ঞান ও চৈতন্য ও চৈতন্যই হল প্রাণ। ব্যবহার অনুসারে এক চৈতন্যের ত্রিবিধ নাম হল প্রাণ, জ্ঞান ও চৈতন্য অথবা সচ্চিদানন্দ এবং অস্তি, ভাতি, প্রীতি।

জীবনের আদি-মধ্য-অন্তে চৈতন্যের ব্যবহার

বোধের দ্বিবিধ রূপ হল অহংকার ও ত্বংকার। জীবনের আদিপর্বে অহংকার ও মধ্যপর্বে ত্বংকার এবং শেষ পর্বে একাকার বা সমান। অহংকারে হয় চাতুর্য, ত্বংকারে হয় ঐশ্বর্য এবং একাকার বা সমাকারে হয় মাধুর্য। অহং-এ শক্তি, ত্বং-এ জ্ঞান, উভয়ের মিলনে আনন্দ, বিরহে বেদনা, ঐক্য বা তাদাত্ম্যতে পরম শান্তি ও প্রেম।

[২১।৫।৬৮]

তথ্য ও তত্ত্বের তাৎপর্য

যুগের সর্বাঙ্গীন ইতিহাস, সংস্কৃতি এবং জীবনালেখ্য বা ছবিগুলিকে ধরে না রাখলে মানুষের অবনতি বা উন্নতির কোন প্রমাণ থাকে না। এইগুলির মাধ্যমে যুগের সর্বাঙ্গীন পরিচয় পাওয়া যায় বলেই এইগুলিকে তথ্য বলে। এই তথ্যের গভীরেই তত্ত্ব নিহিত আছে। তৎ+ত্ব=তত্ত্ব। 'তৎ' মানে অনন্ত, অসীম, পূর্ণসত্তা, সত্যবোধ, অমৃত ও অখণ্ড আনন্দ। 'ত্ব' হল 'তৎ'-এর শক্তি, প্রকাশ, অভিব্যক্তি ও মহিমা। তত্ত্বের স্বরূপকে ব্রহ্ম আত্মা ঈশ্বর ভগবান বলা হয়। 'তৎ'-এর প্রকাশরূপই হল বিশ্ব। বিশ্বকে এবং তার ব্যবহারকে আশ্রয় করে 'তৎ' প্রকাশ হয়। সেইজন্য প্রকাশক ও প্রকাশ অভিন্ন। 'তৎ'-এর আশ্রয়, প্রকাশ এই বিশ্ব, আবার বিশ্বের আশ্রয় 'তৎ'। এই 'তৎ' হল স্বয়ংপ্রকাশ। সেইজন্য একে তত্ত্ব বলে। অর্থাৎ 'তৎ' যাতে প্রকাশক রূপে থাকে তাই তত্ত্ব। যা 'তৎ'-কে ধরে

১। এ বিজ্ঞান দৃষ্টির ফলশ্রুতি।

রাখবার, 'তৎ'-কে বোঝাবার সাহায্য করে, জানবার সাহায্য করে এবং তার মধ্যে মিশে যাবার সাহায্য করে তাই তত্ত্ব। কাজেই তত্ত্ব হল সত্যময় অর্থাৎ অপরোক্ষ জ্ঞান এবং তথ্য হল পরোক্ষ জ্ঞান।

কালত্রয়ের মধ্যে বর্তমানের ভূমিকা

অতীতকে না মেনে বর্তমানের যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায় না। বর্তমানকে মানলে অতীতকেও মানা হল এবং ভবিষ্যৎকেও মানা হয়। অতীতের পরিচয় বর্তমানের মাধ্যমেই এবং ভবিষ্যতের ধারণাও বর্তমানের মাধ্যমেই পেতে হয়। সেজন্য বর্তমান জীবনের গুরুত্ব সর্বাধিক। বর্তমানের কারণ হল অতীত এবং ভবিষ্যতের কারণ হল বর্তমান। এইভাবে তিন কালের সঙ্গে কার্য-কারণ এবং কারণ-কার্য সম্বন্ধ সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকেই চলে আসছে।

জীবনের যা কিছু গৌরব অতীতই তা সকলকে দেয়। যা কিছু সৌরভ তা বর্তমান প্রত্যেককে দেয়। এই অতীত বর্তমানের অমর্যাদার জন্য ভবিষ্যৎ কৌরব, রৌরব বা নরকের অর্থাৎ দুঃখের কারণ হয়। বর্তমানের ব্যবহার সম্বন্ধে অতীতের সংস্কারই সকলকে সাহায্য করে। পিতৃপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের রীতি হতেই শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াকলাপ এবং স্মৃতিমূলক পূজার প্রথা বর্তমানে প্রচলিত আছে। তা পৌরাণিক যুগের ভাবধারাকে বহন করে বর্তমানের উপযোগী করে মানুষ মেনে চলেছে। এই সকল ক্রিয়াকলাপ ও প্রথা অতীতের সঙ্গে বর্তমানের মিলনসেতু বা যোগসূত্রকে রক্ষা করে চলেছে। এই সকল প্রথা লুপ্ত হলে অতীতের স্মৃতিও বিলুপ্ত হয়। পূজা ও উপাসনার মাধ্যমে যে মর্যাদাবোধ সকলের মধ্যে জাগ্রত হয় তার দ্বারা প্রাণেতে প্রাণের অভিষেক হয়। প্রাণের অভিষেক দ্বারা প্রাণের বিস্তার বা সম্প্রসারণ হয়।

সত্যপ্রকাশের বিশেষ অংশকে ও নিয়মকেই কাল আখ্যা দেওয়া হয়। কাল কার্য ও কর্মফল নিয়ন্ত্রণ করে এবং সে আপনার মাঝে উভয়কে লয় করে নেয়। সেইজন্য কালকে নিয়ন্ত্রণকারী ও লয়কারী বলা হয়। সর্বগ্রাসী এই কালেরই অপর নাম যম বা মৃত্যু। যে-প্রাণ সত্যের সত্তা তা কালকেও প্রকাশ করে। কাল হল তার সন্তান। কাজেই কাল সকলের মিত্র, শত্রু নয়। কালই সকল ঘটনাকে বিন্যাস করে সাজিয়ে পূর্বাপর ধারা ও ক্রম অনুসারে রক্ষা করে।

কালের জনক অতীত, বর্তমান মাতা (জননী) এবং ভবিষ্যৎ সন্তান।

পুরাণ—পূরণ করে বলেই পুরাণ। যে জাতির পুরাণ নেই বা অতীত নেই, তার বর্তমান কখনওই পুষ্ট হতে পারে না। গৌরব না থাকলে সৌরভ হতে পারে না। কারণরূপ বীজের মধ্যে সমস্ত গৌরব লুকানো থাকে, যা থেকে কার্যরূপ ফুল-ফলে তার প্রকাশ হয়। এই প্রকাশকেই সৌরভ বলে।

গুরু বা মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি ভালবাসার আধিক্যে যে মনোভাবের সৃষ্টি হয় তা-ই প্রকৃত গৌরব। তা-ই সকলের কাম্য। এ ছাড়া পৃথিবীতে আর যে-সকল গর্বের বিষয় আছে তা রৌরব অর্থাৎ নরক বা দুঃখকষ্টের কারণ হয়।

বর্তমানই মাতা। কারণ মাতা বর্তমান হতেই সকলে সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয় বস্তু পেয়ে থাকে। অতীতকে পিতা বলার কারণ অতীত হতে সকলে বর্তমানে ব্যবহারের উপাদান ও বিষয়বস্তু লাভ করে। অর্থাৎ বর্তমান আসে অতীতের অধিকার নিয়ে। সকলের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে বর্তমানের যথার্থ ব্যবহারের উপরে। বর্তমান বলিষ্ঠ হলে ভবিষ্যৎও বলিষ্ঠ হওয়া সম্ভব। অতীত ও বর্তমানের উপযুক্ত সদ্ব্যবহারের ফলে সুন্দর ভবিষ্যৎই সৃষ্টি হয়; যেমন বর্তমানে ব্যাঙ্কে রক্ষিত টাকার অঙ্ক অনুসারে তার সুদ পাওয়া যায়।

জীবাত্মা তত্ত্বত ব্রহ্ম

প্রতি জীবের যথার্থ স্বরূপ সসীম হয়েও অসীম, অণু হয়েও মহান, স্বয়ংপূর্ণ, স্বয়ংপ্রকাশ, শুদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্ত। কারণ অমৃতময় সত্যজ্ঞানই হল তাদের উপাদান সত্তা।

ব্রহ্ম বলতে শক্তি সমন্বিত ব্রহ্ম এবং শক্তি বলতে ব্রহ্মযুক্ত শক্তিকেই বোঝায়। ব্রহ্মশূন্য শক্তি এবং শক্তিশূন্য ব্রহ্ম কখনওই সম্ভব নয়। সুতরাং ব্রহ্মানুভূতি এবং শক্তির অনুভূতি কখনওই পৃথক নয়।

ব্যক্ত ও অব্যক্তের মহিমা

কারণসত্তা সর্বব্যাপী এবং নিত্যস্থায়ী নির্বিকার নিষ্ক্রিয় অচল অটল। আর শক্তি সত্তার বক্ষে যখন লীন থাকে তখনই তাকে অব্যক্ত বা মূল প্রকৃতি বলা হয়, আবার সে যখন সক্রিয় হয় তখন সে দুইভাগে বিভক্ত হয়ে কাজ করে। এই দুই ভাগই হল অন্তরশক্তি ও বহিঃশক্তি। অন্তরশক্তিকেই পরাশক্তি, বিদ্যাশক্তি প্রভৃতি বলা হয় এবং বহিঃশক্তিকেই অপরাশক্তি, অবিদ্যাশক্তি প্রভৃতি বলা হয়।

কেন্দ্রাদি সত্তা ভেদে শক্তিবিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য

কেন্দ্রসত্তার সঙ্গে যুক্ত হল পরমাপ্রকৃতি বা যোগমায়া শক্তি। এই শক্তির জন্যই ঈশ্বরের অদ্বয়তত্ত্ব ও নিত্যপূর্ণতা, সমতা ও স্বতন্ত্রতা সম্ভব হয়। কেন্দ্রসত্তার শক্তি সমতা, ঐক্য ও পূর্ণতা-বিধানকারী। অন্তরসত্তার শক্তি হল জীবশক্তি। এ বিষয়-বিষয়ী ভাব যুক্ত হয়ে অসংখ্যরূপে প্রকাশমান। বহিঃশক্তি হল ত্রিগুণাপ্রকৃতি। একেই গুণশক্তি বলা হয়। এ-ই বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে পরস্পর বিরোধী ভাবের প্রকাশক। সৃষ্টি স্থিতি কার্য এর দ্বারাই সম্পন্ন হয়। কেন্দ্রসত্তা পিতা, অন্তরসত্তা মাতা এবং বহিঃসত্তা সন্তান। ঊর্ধ্বে পিতা, মধ্যে মাতা, নিম্নে সন্তান।

বিশ্বরূপে গুরুর মহিমা

গুরুর সঙ্গে প্রত্যেকেরই যোগ আছে। শিক্ষাগুরু সবারই আছে। বিশ্বের কাছ থেকে প্রতিনিয়ত প্রত্যেকেই পায় শিক্ষা। চারদিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে সমগ্র বহিঃপ্রকৃতি অর্থাৎ আকাশ, বাতাস, তেজ, জল, পৃথিবী এবং গ্রহ নক্ষত্রাদি সকলের কাছ থেকেই জীব উপকার পায়। সকলের পুষ্টি তুষ্টি ও পূর্ণতার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ যাঁর মাধ্যমে পাওয়া যায় তাঁকেই মহৎ ও গুরু বলা হয়। মহান গুরুর কাজ হল অপরকে মহান ও পূর্ণ করা। প্রথমে শিক্ষার মাধ্যমে ও পরে দীক্ষার মাধ্যমে তিনি পূর্ণতা বিধান করেন।

সমগ্র প্রকৃতির কাছে মানুষ তাদের জীবনের শুভাশুভ ও কল্যাণকর সবকিছুর জন্য সর্বতোভাবে নিত্যকালের জন্য ঋণী। মানুষের জীবন এই প্রকৃতির পাঠশালায় জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত শুধু শিক্ষালাভই করে যায়। এই শিক্ষা সর্বতোমুখী পুষ্টি ও পরিণামে পূর্ণতা এনে দেয়। সেইজন্য প্রকৃতির এই ভিন্ন ভিন্ন শক্তি পৃথক ভাবে সকলের শিক্ষাগুরুস্থানীয় ও সামগ্রিকভাবে পরমগুরুস্থানীয়।

শ্রদ্ধার তাৎপর্য

কৃতজ্ঞতাবোধই হল শ্রদ্ধাবানের লক্ষণ। শ্রদ্ধা হতেই গুরুবোধ জাগে।

প্রকৃতির অন্তর্নিহিত সত্তার যথার্থ মর্যাদাবোধ জাগ্রত করার জন্য লোকগুরু ও সদ্‌গুরুগণই মানুষকে যথার্থভাবে সাহায্য করেন। গুরুর সাহায্য ব্যতীত শিক্ষা ও জ্ঞান লাভ হয় না। সকলে যার মধ্যে বাস করে, যা দিয়ে জীবন ধারণ করে, যাতে পুষ্ট ও তুষ্ট হয়, এককথায় যার দ্বারা পূর্ণতা লাভ হয় তা-ই গুরুমূর্তি এবং তা-ই গর্বের বস্তু, পরম আদরের বস্তু, পরম প্রীতিকর, প্রিয় ও আনন্দময়। এইজন্য মাতাপিতাকে মহাগুরু বলা হয়।

গুরুকে প্রাকৃতবোধে না নিয়ে দেববোধে মানতে হয়। তাহলেই অন্তরে গুরুভাব ও গুরুবোধ সহজে জাগ্রত হয়। না মানলে কোন বিষয়ে গর্ব করা যায় না। মানার অভাবে জ্ঞানের অভাব থাকে। জ্ঞানের অভাবে গুরুবোধের উপলব্ধি হয় না।

গুরুবোধ জাগলেই মানুষ শ্রদ্ধাবান হয় এবং শ্রদ্ধাবানেরই গুরুবোধ জাগে। গুরুই যে একমাত্র রক্ষাকর্তা এই বিশ্বাস শ্রদ্ধার উপরেই নির্ভর করে।

বিশ্বাসের গুরুত্ব

দ্বিধাহীনভাবে সংশয়রহিত হয়ে বিরোধিতা না করে, নিজের স্বার্থবোধের দ্বারা সত্যকে দূষিত না করে পরম নির্ভরতার সঙ্গে গ্রহণ করা ও ব্যবহার করাকেই মেনে নেওয়া বলে। এইরূপ মেনে নেওয়াকেই বলে বিশ্বাস[১]।

ক্ষাত্রাদি ধর্মের বৈশিষ্ট্য

আপনাকে রক্ষা করা এবং আপনবোধে অপরকে রক্ষা করা ক্ষাত্রধর্মের লক্ষণ। এ-ই পুষ্ট হয়ে হয় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম। এর আসল রূপ দীক্ষা; অর্থাৎ দিয়ে দেওয়া। ক্ষত্রিয়ের যা ধর্ম—শৌর্য, বীর্য ও তেজ—তা বৈশ্যধর্মের পরিণতি। সর্ববস্তুর সঙ্গে যুক্ত না হলে শক্তিলাভ হয় না। সকলের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে না পারলে শক্তি অর্জন সম্ভব হয় না এবং শক্তি অর্জন করা সম্ভব হলেও তা অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব হয় না। সেইজন্য বৈশ্যকে আদান-প্রদান ব্যাপারে সকলের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে হয়। আপন প্রয়োজনেই সকলকে সর্বস্তরের সঙ্গে যুক্ত থাকতে হয়। আবার সবার সঙ্গে মিলিত হবার ফলে শক্তি আহৃত হয়, পরিণামে ক্ষত্রিয়ধর্ম লাভ হয়। সকলের সঙ্গে মিলিত হবার যোগ্যতা হয় শুধু সেবার দ্বারা। শূদ্র হল জীবনের ভিত্তি, সমাজের বেদী; বেদী অর্থ যার উপর সমাজ প্রতিষ্ঠিত।

জীবনাদর্শ ও ধর্মের লক্ষ্য

সর্বাঙ্গীন পুষ্টি ও তুষ্টির অন্তরায় যে-কোন বস্তু আপাত মনোরম ও রুচিকর হলেও তা সর্বতোভাবেই পরিত্যাজ্য। যার পরিণাম বিকারধর্মী ও দুঃখময় এবং যা সত্য ও পূর্ণতা উপলব্ধির অন্তরায় তা নিন্দনীয় ও বর্জনীয়। যে-সৌন্দর্য, যে-সম্পদ, যে-ব্যবহার অল্পকালের জন্য জীবনকে নাচিয়ে তোলে, মনকে রঙিন করে ও প্রলুব্ধ করে তা কোনমতেই সমর্থনযোগ্য নয়। সর্বাঙ্গীন পুষ্টি, তুষ্টি ও পূর্ণতার দিকে লক্ষ্য রেখে জীবনের ব্যবহার করাই হল ধর্মের লক্ষ্য[২]।

বিধি ও নিষেধের তাৎপর্য

বিধি হল আপনার উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য এবং অপরের কল্যাণের জন্য যা ঐকান্তিক ও দ্বিধাহীনভাবে অবশ্য পালনীয়। বিধি পালন না করাই হল অন্যায়। এই অন্যায় কার্যের জন্য নিজের উন্নতি ব্যাহত হয়, ঈপ্সিত বস্তু লাভ হয় না, দুঃখ ও বিকারের কারণ সৃষ্টি হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে অপরেরও ক্ষতি হয়, অসুবিধা হয় এবং অসন্তুষ্টির কারণ সৃষ্টি হয়।

নিষেধ হল আপনার সর্বাঙ্গীন উন্নতি ও অগ্রগতি এবং অন্য সকলের মঙ্গল ও কল্যাণের জন্য যা ঐকান্তিক ও দ্বিধাহীনভাবে অবশ্য বর্জনীয় বা পরিত্যাজ্য। তা যথার্থভাবে পালন না-করা বা না-মানাই হল অন্যায়। এইরূপ

১। অভিনব সংজ্ঞা। ২। তত্ত্ববিজ্ঞানের দৃষ্টিতে।

অন্যায় কার্যের ফলে নিজের উন্নতি ব্যাহত হয়, ঈপ্সিত বস্তু লাভ হয় না, দুঃখ ও বিকারের কারণ সৃষ্টি হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে অপরেরও ক্ষতি হয়, অসুবিধা হয় এবং অসন্তুষ্টির কারণ সৃষ্টি হয়।

দৈনন্দিন জীবনের চিন্তা ও কার্যাবলীর সঙ্গে বিধিনিষেধগুলি যথার্থ পালন করা হল ধর্মসাধনা[১]।

অভিজ্ঞতার উৎকর্ষই হল অনুভূতি এবং সর্বাঙ্গীন অনুভূতি হল অধ্যাত্মজ্ঞান বা অনুভূতি। একে শুদ্ধজ্ঞান বা অবিমিশ্র জ্ঞান বলে।

বিশ্বাস ও মানার গুরুত্ব

বিশ্বাস ও মানার মধ্যে তত্ত্বত ভেদ না থাকলেও ব্যবহারিক পার্থক্য আছে। বিশ্বাস খণ্ডভাবে ব্যবহৃত হতে পারে কিন্তু মানা সবসময়ই সমগ্রতা ও অখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হয়। খণ্ড মানা বিশ্বাসের পর্যায়ে পড়ে। অখণ্ড বিশ্বাস ও মানা সমার্থবোধক। [২২।৫।৬৮]

অদ্বয়তত্ত্বের স্বরূপ লক্ষণ

চৈতন্য হল সর্ববস্তুর অন্তর্নিহিত সত্তা ও সত্য। শুদ্ধবোধ হল অখণ্ড সত্য ও অখণ্ড আনন্দ। অনুভূতি হল চৈতন্যের প্রকাশ বা ভাতি। সত্য হল অখণ্ড নিত্য শাশ্বত। এ চিদ্‌ঘন ও আনন্দঘন। সেইজন্য একে সচ্চিদানন্দ বলা হয়। এই সচ্চিদানন্দকে আবার অস্তি ভাতি প্রিয়ম্ বলা হয়। অস্তি ভাতি প্রীতি অভেদে যুক্ত। যে-কোন একটির সঙ্গে অপর দুটি সবসময়ই যুক্ত থাকে। সৎ হল অস্তি বা সত্তা, চিৎ হল ভাতি বা প্রকাশ এবং আনন্দ হল প্রীতি প্রেম বা রস। ভাতিময় বা প্রকাশময় সবকিছুরই মূলসত্তা এক; অর্থাৎ সবকিছুই চৈতন্যময়। মানুষের মন চৈতন্যের একটি করণ বা যন্ত্র মাত্র। এর স্বভাব সাধারণত পরিবর্তনশীল। সেইজন্য সর্বপ্রকাশের অন্তর্নিহিত চৈতন্যসত্তাকে এ সবসময় দেখতে বা জানতে পারে না।

প্রকাশবৈচিত্র্যের মূল উপাদানই হল চৈতন্য। অখণ্ড চৈতন্যসত্তার বক্ষে চৈতন্য ছাড়া দ্বিতীয় কোন বস্তুর অস্তিত্ব নেই। চৈতন্যের পরিচয় চৈতন্যের মাধ্যমেই হয়। একেই অনুভূতি বলে।

চৈতন্যের প্রকাশধারা হল ত্রিবিধ, যথা—পরাচিৎ, চিৎ ও অচিৎ। পরাচিৎ হল কেন্দ্রবোধসত্তা, চিৎ হল অন্তর্বোধসত্তা এবং অচিৎ হল বহির্বোধসত্তা। চিৎ ও অচিৎ-এর খেলাই হল জীবজগৎ। এ হল চৈতন্যের সৃষ্টিলীলা। আবার চিৎ ও পরাচিৎ-এর মধ্যে হল চৈতন্যের নিত্যলীলা। পরাচিৎ হল ঈশ্বর স্বয়ং, চিৎ হল জীব এবং অচিৎ হল বস্তুজগৎ।

চিৎ ও অচিৎ-এর মধ্যে বিরহ মিলন অর্থাৎ সংযোগ ও বিয়োগ কার্য-কারণ সম্বন্ধ ধরে হয়। কিন্তু পরাচিৎ ও চিৎ-এর মধ্যে বিরহ বা বিচ্ছেদ কখনওই হয় না। সেখানে বোধের সঙ্গে বোধের নিত্য সম্বন্ধ। বোধের বিকারবিহীন পরিণাম নিত্যলীলারূপে প্রকাশ পায়। এর অনুভূতিকেই স্বানুভূতি বলে। স্বানুভূতি হল সচ্চিদানন্দের অনুভূতি বা পরিচয়।

জীবচৈতন্য তার পূর্ণতালাভের জন্য অচিৎরূপী বিগ্রহগুলির ব্যবহারকালে শ্রদ্ধা ভক্তি বিশ্বাসের সাহায্য নেয়। জীবজগতে একমাত্র মানুষের মধ্যেই শ্রদ্ধা বিশ্বাস ভক্তি ক্রমপর্যায়ে অভিব্যক্ত হয়। অন্তরের ভাব অনুসারে মানুষ তা ব্যবহার করে। সাধকের অন্তরের ভাব শ্রদ্ধা ভক্তি বিশ্বাসের আতিশয্যে শুদ্ধ হয়। এই ভাবশুদ্ধির ফলে সাধকের অন্তরচৈতন্য অর্থাৎ চিৎ সম্প্রসারিত হয়। বিগ্রহকে কেন্দ্র করে তার এই শুদ্ধভাব অর্থাৎ চৈতন্য যখন ছড়ায় বা সম্প্রসারিত হয় তখন অচিৎ বিগ্রহ চিন্ময় হয় এবং সাধকের সঙ্গে তখন তার জীবন্ত ব্যবহার হয়।

১। আত্মবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে।

অচিৎ-এর মধ্যে চিৎ-এর জাগরণ কেবলমাত্র শুদ্ধচিত্তের পক্ষেই সম্ভব, অপরের পক্ষে নয়। সেইজন্য দেখা যায় ভাবভক্তির চরমতম অবস্থায় সাধকের সঙ্গে বিগ্রহের জীবন্ত সম্বন্ধ স্বাভাবিকভাবেই প্রকাশ পায়। অশুদ্ধচিত্তের কাছে তা অতীব দুর্বোধ্য বিষয়। তবে, যার ভাবশুদ্ধি হয় সে এটা প্রত্যক্ষ করতে পারে।

জীবাত্মা স্বরূপত নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত অজর অমর অপাপবিদ্ধ। এ বিশুদ্ধ চিন্ময়স্বরূপ এবং পরাচিৎ-এর অবিচ্ছেদ্য অংশ। কিন্তু অচিৎ-এর সংস্পর্শে ও প্রভাবে অধিক কাল থাকার ফলে এই চিদাত্মার উপরে মলিনতার আবরণ পড়ে।

শুদ্ধচিত্ত শুদ্ধভাবের মাধ্যমে অচিৎ-এর প্রভাবমুক্ত হয় এবং পরাচিৎ-এর সঙ্গে পুনর্মিলিত হয়। জীবাত্মা স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকলে অচিৎ-এর প্রভাব আর থাকে না। তখন সে অমৃতস্বরূপ মুক্ত আত্মা। জীবন সাধনার উদ্দেশ্য ও পরিণাম হল অমৃতস্বরূপ আত্মজ্ঞান লাভ এবং আত্মজ্ঞান দিয়ে পরমাত্মার সঙ্গে নিত্যলীলায় যুক্ত থাকা।

যে-সকল মুক্ত আত্মা পরমাত্মা পরমেশ্বরের নিত্যলীলায় যোগদান করে তারাই কেবল পূর্ণ সচ্চিদানন্দস্বরূপে সমরস নিত্য আস্বাদন করে। এই সমরসই হল প্রেমানন্দ।

অদ্বয়তত্ত্বকেই পরব্রহ্ম পরমাত্মা বলে। এর সাধনা হল জ্ঞানসাপেক্ষ, বস্তুসাপেক্ষ নয়।

জ্ঞানী ও যোগীর সাধনা বাহ্যবস্তু নিরপেক্ষ।

ভক্তির সাধনা দ্বৈতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। দ্বৈতভাব হল, যথা—উপাস্য-উপাসক, সাধ্য-সাধক, ঈশ্বর বা ভগবান ও ভক্ত। অন্তরের ভাবশুদ্ধির জন্য অবলম্বনস্বরূপ বাহ্যবস্তুর প্রয়োজন হয়। দেবদেবীর মূর্তি ও ঘটপট প্রভৃতি হল বাহ্যিক অবলম্বন। এইগুলি অন্তরের ভাবশুদ্ধির সহায়ক। সর্ববিধ পূজা উপাসনার উদ্দেশ্য ও পরিণাম হল ভাবশুদ্ধি বা চিত্তশুদ্ধি। বিগ্রহাদি পূজা অর্চনার মাধ্যমে বৈধীভক্তির সাধন হয়। তা বিশেষভাবে চিত্তশুদ্ধি, ইষ্টনিষ্ঠা বা ভাবভক্তি বিকাশের সাহায্য করে। অন্তরের ভাব শুদ্ধ হয় ক্রমপর্যায়ে। প্রথমে হয় শ্রদ্ধার উদ্রেক। শ্রদ্ধা হতে হয় রুচি, রুচি হতে নিষ্ঠা, নিষ্ঠা হতে ভক্তি, ভক্তি হতে ভাব ও অনুরাগ, ভাব হতে মহাভাব এবং মহাভাব হতে স্বভাব ও প্রেম হয়।

সেবা ও পূজাদির মাধ্যমে বিগ্রহের সঙ্গে ভক্তের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি হয়। এই ঘনিষ্ঠতা হল আপনবোধের সম্পর্ক। এ-ই ভাবশুদ্ধির পরিণাম। ভাবের উৎকর্ষে বিগ্রহের সঙ্গে এই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দৃঢ় হয়। তার ফলে শুদ্ধ স্বভাব ও প্রেমের অভিব্যক্তি হয়। স্বভাবের উৎকর্ষে বিগ্রহের সঙ্গে স্বভাবাত্মার মৌলিক সম্বন্ধ বা যোগ স্থাপিত হয়। অর্থাৎ আপনবোধে স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের ফলে শুদ্ধ স্বভাববোধের সঙ্গে বিগ্রহ বা মূর্তি একীভূত হয়ে যায়। সেইজন্য ভক্তের অন্তরের ব্যাকুলতা, ঐকান্তিক ভক্তি ও তীব্র ইচ্ছার সংযুক্ত প্রভাব বিগ্রহের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। একেই লক্ষণভেদে প্রাণসঞ্চার, শক্তিসঞ্চার, ভাবসঞ্চার ও বোধসঞ্চার বলা হয়।

বৈধীভক্তির উৎকর্ষে রাগানুগাভক্তি হয় অর্থাৎ প্রেমভক্তি হয়। প্রেমভক্তির আতিশয্যে কোন বিধিনিয়মের প্রয়োজন থাকে না। তখন বিগ্রহ ভক্তের স্বভাব অনুরূপ ভক্তের সঙ্গে জীবন্ত হয়ে লীলাখেলা করেন। এ একমাত্র প্রেমভক্তির মাধ্যমে অর্থাৎ রাগানুগাভক্তির মাধ্যমেই সম্ভব হয়। এইরূপ রাগানুগাভক্তির অধিকারী সাধক অতীব দুর্লভ।

দ্বিবিধ ভক্তির মধ্যে বৈধীভক্তি হল বিধিনিয়মের অনুগত, অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াপ্রধান এবং উপাদান ও উপকরণযুক্ত। এরই পরিণতি হল রাগানুগাভক্তি। এই রাগানুগাভক্তিতে অন্তরের স্নেহ প্রীতি ও ভালবাসার মাধ্যমে গুরু ইষ্টের সঙ্গে আত্মীয়বোধে সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এতে কোন প্রকার বিধিনিয়ম পালনের প্রয়োজন হয় না। অন্তরের প্রীতি ও ভালবাসার মাধ্যমেই এর ব্যবহার প্রকাশ পায়। এরই পরিণতি হল প্রেমভক্তি।

পূজার অর্থ হল অন্তরের পবিত্র ভাবকে পূর্ণরূপে জাগ্রত করা ও জানা এবং পবিত্রঘন পূর্ণতাকে জ্ঞাত হওয়া।

পূর্ণতা হল অখণ্ড ও অদ্বয়স্বরূপ। ...এই অখণ্ড অদ্বয়স্বরূপের সঙ্গে মিশে একীভূত হয়ে যাওয়াই হল পূজার মূল উদ্দেশ্য। ব্যবহারিক বিজ্ঞান পারমার্থিক জ্ঞানে রূপান্তরিত হওয়াই হল পরিণতি।

অদ্বয়তত্ত্ব বা অখণ্ড সত্য বিজ্ঞানময় হয়ে যে ব্যবহারিকরূপ নেয় এবং যে বিশেষরূপে আত্মপ্রকাশ করে তাকেই বিগ্রহ বলে। সকলের বোধগম্য হওয়ার জন্য বিশেষরূপে তিনি প্রকাশিত হন। সমগ্র জীবন ও সমস্ত স্থূল বস্তুই হল তাঁর বিগ্রহমূর্তি। একেই বিশ্বরূপ বলা হয়। বিশ্বরূপের অংশবিশেষ হল ব্যষ্টিজীবন ও ব্যষ্টিরূপ।

ধর্মমতগুলির মধ্যে পরস্পর মিল না থাকলেও সকলের মধ্যেই কমবেশি উচ্চ ও মহান আদর্শ নিহিত আছে। শুধু একটা মাত্র পাতা ও শাখা প্রশাখা যেমন বিরাট বৃক্ষের সমগ্র পরিচয় দিতে পারে না, সেইরূপ পৃথক পৃথক ধর্ম সম্প্রদায়ও অখণ্ড সনাতন ধর্মের স্বরূপের পরিচয় প্রকাশে অসমর্থ।

হিন্দুধর্ম সনাতন ধর্মের যথার্থ প্রতিনিধি অথবা সনাতন ধর্মের নামান্তর মাত্র। এর মধ্যে আছে শাশ্বত সনাতন অখণ্ড পূর্ণ অদ্বয় অব্যয় নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত অচ্যুত অমৃত একক সত্যের পরিচয়, যার আদি মধ্য অন্ত নাই। প্রাচীন ঋষিগণ কর্তৃক প্রবর্তিত এই সনাতন ধর্মের দৃষ্টিভঙ্গি যেরূপ উদার, মহান, ব্যাপক ও সর্বগ্রাহী সেইরূপ দৃষ্টিভঙ্গি সম্প্রদায়গত পৃথক পৃথক ধর্মমতগুলির মধ্যে পরিলক্ষিত হয় না।

সনাতন হিন্দুধর্মের মধ্যে সর্ববিধ মতবাদের মূলসূত্র পাওয়া যায়। পরমত সমন্ধে এ সর্বতোভাবে উদার ও সহিষ্ণুভাব পোষণ করে; সর্বপ্রকার সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামিকে হীনতাবোধে বর্জন করে। সংকীর্ণতা, গোঁড়ামি, পরমত-অসহিষ্ণুতা, পরদোষদর্শন এবং বিদ্যা ও পাণ্ডিত্যের অভিমানকে সবসময়ই হীন ও বৃহত্তম দোষ বলে এ ঘোষণা করে। এই হীনতাই হল জীবনলক্ষ্যে পৌঁছাবার পরিপন্থী। এই হীনতাকে দোষজ্ঞানে বর্জন করাই হল হিন্দু শব্দের বিশেষত্ব। এইরূপ হীনতাকে যে বর্জন করে সে-ই হিন্দু। হিন্দু ধর্ম কোন ব্যক্তি বিশেষের ধর্ম নয়—ধর্মবিজ্ঞানের সর্বোচ্চ স্তরের নির্দেশক মাত্র।

হিন্দুধর্মের তাৎপর্য

নিজেকে বিশ্বের মধ্যে এবং বিশ্বকে নিজের মধ্যে উপলব্ধি করার যে বিজ্ঞান তা হিন্দুধর্মের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। হিন্দুধর্ম বেদ বিশ্বাসী। বেদ হল অনন্ত জ্ঞানসাগর। ঈশ্বরের মুখনিঃসৃত সত্যের বাণী ও বিজ্ঞান। বৈদিক সাহিত্য সনাতন ধর্মের সর্বোত্তম আদর্শ ও বিশুদ্ধ জ্ঞান বিজ্ঞানের ধারক ও বাহক। এর মধ্যে পারমার্থিক জ্ঞান ও জাগতিক জ্ঞানের যথার্থ পরিচয়, পরমেশ্বর ও জীবের মধ্যে সম্বন্ধ, ঈশ্বর ও জগতের মধ্যে সম্বন্ধ, জীব ও জগতের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ, কার্য-কারণ, দেশ ও কালের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ, সৃষ্টিতত্ত্ব, পরিণামবাদ, জন্মমৃত্যু রহস্য, বন্ধন ও জীবন্মুক্তির রহস্য, প্রকৃতিবিজ্ঞান, ঈশ্বরীয় বিজ্ঞান ও পরমাত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়ে বিশদ ব্যাখ্যা ও অনুব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

জগৎ ও বিশ্বের নানাত্ব ও বহুত্বের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে প্রাচীন ঋষিগণ সর্বপ্রকাশের মধ্যেই অখণ্ড প্রজ্ঞানঘন মৌলিক এক সত্যের পরিচয় অপরোক্ষ অনুভূতির দ্বারা পূর্ণভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। এই পরম সত্যকে তাঁরা পরব্রহ্ম, পরমাত্মা, পরমেশ্বর, ভগবান নামে অভিহিত করেছেন। এর বিজ্ঞানময় রূপই হল বৈচিত্র্যময় জগৎ। এর শক্তি ও প্রকৃতি হল জগতের নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ। এই প্রকৃতিই সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার কার্য সম্পাদন করেন। এই এক ব্রহ্ম বা আত্মাই বহু হয়েছে; এক সত্যই বহু হয়েছে এবং বহুর মধ্যে এক আত্মাই বিদ্যমান। নানাত্ব ও বহুত্বের ব্যবহার তার লীলাবিলাস মাত্র।

ব্রহ্ম বা আত্মার স্বরূপ দ্বিবিধ—মূর্ত ও অমূর্ত অথবা সগুণ ও নির্গুণ। উভয়েরই ঘনীভূত রূপ হল পরমেশ্বর।

চতুর্বিধ গুরুমূর্তি

চতুর্বিধ গুরুমূর্তি হলেন—(১) শক্তিস্বরূপ, (২) জ্ঞানস্বরূপ, (৩) আনন্দস্বরূপ, (৪) প্রেমস্বরূপ।

একের সঙ্গে লীন হয়ে যাওয়াই হল স্বভাবের পরিণতি। জীবনের সম্প্রসারণ ও পরিণাম বা সংকোচন এই চারটি স্তরের মাধ্যমেই পর্যায়ক্রমে অভিব্যক্ত হয়।

ব্যবহারিক জীবনে প্রথম স্থূল গুরু ও সূক্ষ্ম গুরু অর্থাৎ রূপময় গুরু ও নামময় গুরুর একান্ত প্রয়োজন। তৃতীয় ও চতুর্থ গুরুমূর্তির প্রভাব বা সাহায্য আরও সূক্ষ্ম ও অব্যক্ত অবস্থায় কার্যকরী হয়। ...উন্নততর অবস্থায় গুরুকে অন্তরে নিজের মধ্যে এবং বাইরে সর্বত্র সব কিছুর মধ্যেই সমভাবে পাওয়া যায়। এই হল সচ্চিদানন্দ গুরুর বিশেষত্ব।

আত্মার সঙ্গে যুক্ত আছে বলে গুরু লঘুর আত্মীয়। আত্মীয়বোধে গুরুর সঙ্গে সম্বন্ধ হল আশ্রিত, আশ্রয় ও আনন্দঘন। ...প্রথম গুরুমূর্তির সঙ্গে থাকে বিজাতীয় ভেদ, দ্বিতীয় গুরুমূর্তিতে স্বজাতীয় ভেদ, তৃতীয় গুরুমূর্তিতে স্বগত ভেদ থাকে। কিন্তু চতুর্থ গুরুমূর্তিতে বিজাতীয়, স্বজাতীয় ও স্বগত ভেদ থাকে না। এর প্রকাশলক্ষণ হল স্বভাব বা স্বানুভব, অর্থাৎ অখণ্ড সমবোধ বা আপনবোধ।

স্তরভেদে গুরুর লক্ষণ ও তাঁর কাজের বৈশিষ্ট্য

বিপদ আশঙ্কায় কচ্ছপ যেমন হস্তপদ ভিতরের দিকে গুটিয়ে নেয় সেইরূপ দ্বিতীয় গুরুমূর্তির ব্যবহারজ্ঞানও বহির্জগৎ হতে মনকে অন্তর্মুখী করে নেয়। অর্থাৎ দ্বিতীয় গুরুমূর্তি ভোগাসক্ত জীবকে অন্তর্মুখী হতে সাহায্য করে। প্রথম ও দ্বিতীয় গুরুর উৎকর্ষ তৃতীয় গুরুর মধ্যে পাওয়া যায়। ...তৃতীয় গুরুমূর্তির ব্যবহার হয় আত্মীয়বোধে। ...তৃতীয় গুরুমূর্তিতে তাদাত্ম্যভাব হয়। গুরু শিষ্যের মধ্যে প্রবেশ করে অথবা শিষ্য গুরুর মধ্যে প্রবেশ করে। ...গুরুকে গুরুভাবে নিলে গুরুবোধ হয় এবং তখন ভক্ত গুরুময় হয়ে গুরুর রূপ ধারণ করে। তৃতীয় গুরুমূর্তি হল আনন্দঘন। ...তৃতীয় গুরু শিষ্যসন্তানকে তাঁর আকর্ষণ শক্তি দ্বারা অন্তর্মুখী করে অবশেষে নিজের মধ্যে লয় করে নেন।

চতুর্থ গুরুমূর্তি আত্মময় প্রেমময় সহজ সরল সমান স্বভাব নিয়ে সকলের সঙ্গে সমবোধের ব্যবহার করেন। এঁরা সহজ সাধক। এঁদের শক্তি সামর্থ্য জ্ঞানের পরিচয় বাইরে থেকে জানা যায় না। সর্ববস্তুর মধ্যে থেকেও যিনি সর্ববস্তুর ঊর্ধ্বে তিনিই প্রকৃত সন্ন্যাসী। অর্থাৎ নামরূপের প্রভাবমুক্ত। এ-ই হল চতুর্থ গুরুমূর্তির লক্ষণ।

তন্ত্রের বিজ্ঞানে চতুর্বিধ গুরুর পরিচয়

সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা হলেন প্রথম গুরুমূর্তি। জগৎ পালয়িতা বিষ্ণু হলেন দ্বিতীয় গুরুমূর্তি। তৃতীয় গুরুমূর্তি হলেন শিব বা মহেশ্বর। কারণ তিনিই হলেন জ্ঞানানন্দঘন ত্যাগ-বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা। এই ত্রিবিধ গুরুমূর্তির সম্মিলিত একক রূপ হল চতুর্থ গুরুমূর্তি পরমব্রহ্ম।

গুণের মাধ্যম, শক্তির লীলা

মহাসরস্বতীয় কাজ হল নামরূপকে নিয়ে অর্থাৎ স্থূল সূক্ষ্মকে নিয়ে গড়াভাঙ্গা ও সাজানো। একে রক্ষা করা, পালন করা, আস্বাদন করা বা পাওয়া হল মহালক্ষ্মীর কাজ। ...সম্ভূতি হল বিভূতির প্রকাশ অর্থাৎ প্রাণের বিভিন্ন অভিব্যক্তি। অসম্ভূতি হল ধ্বংস বা নাশ অর্থাৎ সব কিছুকে একীভূত করে স্বরূপে স্থিতি।

হওয়া ও জানার এবং করা ও জানার বিজ্ঞান হল অব্যক্ত হতে ব্যক্ত হওয়া আবার ব্যক্ত হতে অব্যক্তে লীন

হওয়া। ...অনুলোম ও প্রতিলোম পরিণাম হল এর দ্বিবিধ গতি। অনুলোম গতিতে অব্যক্ত হতে ব্যক্ত হয়ে এ বৈচিত্র্যের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। এই অভিব্যক্তি হল সূক্ষ্ম হতে স্থূলের অভিব্যক্তি। প্রতিলোম গতি হল ব্যক্ত হতে অব্যক্তে অর্থাৎ স্থূল হতে সূক্ষ্মে গতি এবং সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতমে আরোহণ। প্রথমোক্ত গতিকে অবরোহণ গতি বলে এবং দ্বিতীয় গতিকে আরোহণ গতি বলে। অবরোহণ গতিতে প্রকৃতির রাজ্যে জীব এবং স্রষ্টা ঈশ্বর ত্রিগুণের ভাববৈচিত্র্যের সঙ্গে যুক্ত থাকে। আরোহণ গতির মাধ্যমে জীবচৈতন্যের মহাজাগরণ হয়। অর্থাৎ আত্মজ্ঞান লাভ করার ও ঈশ্বরোপলব্ধির সাধনা আরম্ভ হয় এবং সাধন অনুরূপ সিদ্ধিলাভ করে প্রকৃতির গুণমুক্ত হয় এবং ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হয়।

জানা মানে অতীত এবং করা ও পাওয়া মানে বর্তমান এবং হওয়া মানে ভবিষ্যৎ। এই তিন মিলেই হল পূর্ণ একক।

জানার মধ্যে পাওয়া যায় ছয় অঙ্গ। অনন্ত জ্ঞানই হল বেদ। ছয় বেদাঙ্গ—(১) শিক্ষা, (২) কল্প, (৩) নিরুক্ত, (৪) ব্যাকরণ, (৫) ছন্দ, (৬) জ্যোতিষ।

বহির্জগৎ হল শব্দ, নাম ও প্রাণ এবং অন্তর্জগৎ হল প্রাণ, মহাপ্রাণ, শব্দবিজ্ঞান ও নামবিজ্ঞান। পৃথক পৃথক ব্যষ্টির সমন্বয়ে হয় সমষ্টি এবং সমষ্টির সমন্বয়ে হল বিশ্বপুরুষ।

প্রাণের দ্বারা প্রাণের মাধ্যমে প্রাণের পূজা হয়। এই প্রাণ হল জীবচৈতন্য। সকলের অন্তরে ও বাইরে এই প্রাণই বিদ্যমান। অন্তর-বাইরের এই প্রাণই মহাপ্রাণ, মহাচৈতন্য ও জ্ঞানস্বরূপ। এই জ্ঞান অদ্বয় অব্যয় নিত্য শাশ্বত শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ অনন্ত অসীম অমৃতত্ব শান্তিময় অখণ্ড সত্তা। এই সত্তার বুকে সত্তা বা জ্ঞানসমুদ্রের তরঙ্গ আপনিই ওঠে, ভাসে আবার লয় হয়। জ্ঞানসমুদ্রের তরঙ্গ বিশেষই জগতাকারে প্রকাশমান। এই জগতের নানাত্ব বহুত্ব নামরূপময় প্রকাশসমূহ সেই বিশেষ তরঙ্গলহরীর অংশ বিশেষ।

প্রতিটি প্রকাশ সত্তার সঙ্গে যুক্ত বলেই সত্য।

সকলেই বিরাটের মধ্যে আছে বলে সেই বিরাটের প্রকাশ ধর্মের অনুগত।

এই বিরাটের সঙ্গে মিশে গিয়ে সে হয় মুক্ত। ব্যষ্টিসত্তার পৃথক ব্যক্তিত্বলোপই হল মুক্তি। সমষ্টির সঙ্গে আপনবোধে ব্যষ্টি তার প্রকাশকালে পুনঃপুনঃ যুক্ত হয়ে আবার বিচ্ছিন্ন হয়। তরঙ্গলহরীর এই প্রবল আবর্তের মধ্যে তার প্রকৃতির নিয়মের ধারা অনুযায়ী বহুবার তার উত্থান পতন হয়। এই উত্থান পতনই নামরূপের আবির্ভাব ও তিরোভাব।

প্রকাশ হওয়া অর্থ জন্ম হওয়া। ...প্রকাশের সম্যক্ লয়ের নামই হল মৃত্যুকে জয় করা অর্থাৎ ব্যষ্টিসত্তার স্বরূপে অবস্থান। এই হল অমৃতত্ব[১] লাভ।

অদ্বয়তত্ত্বই হল কারণের কারণ ব্রহ্ম-আত্মা-ঈশ্বর। এই অদ্বয়তত্ত্বই সাধকদের মধ্যে নানারকম ভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে; যথা—সুগণ-নিগুর্ণ, সবিশেষ-নির্বিশেষ, সোপাধিক-নিরুপাধিক ও বহুর মাঝে এক ও একের মাঝে বহু।

তত্ত্ব হল সত্যের পরিচয় ও জ্ঞান। এরই অপর নাম ব্রহ্মোপলব্ধি, আত্মোপলব্ধি ও ঈশ্বরোপলব্ধি।

শাস্ত্রকৃপা, গুরুকৃপা, আত্মকৃপা ও ঈশ্বরকৃপা—এই চতুর্বিধ কৃপা না হলে কারও সত্যানুভূতি হয় না।

জ্ঞানীদের উপাসনা হল ব্রহ্মবিচার, অর্থাৎ এক ব্রহ্মই সত্য, দ্বিতীয় কিছু নেই।

যোগী ও ভক্তের সাধনকার্যও প্রকাশকে অবলম্বন করেই আরম্ভ হয়।

ভক্ত ও যোগীর সাধনা হল ইতিবাদ অর্থাৎ শক্তিকে অবলম্বন করে। কিন্তু জ্ঞানীর সাধনা বিশুদ্ধ বোধসত্তাকে অবলম্বন করে হয়। অনুভূতির চরমে উভয়েই এক লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছায়। কারণ ভগবান বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ স্বয়ং

১। তত্ত্বসিদ্ধান্ত।

নির্বিশেষ ব্রহ্ম কিন্তু প্রেমানন্দের আতিশয্যে তিনিই স্বয়ং সবিশেষরূপ ধারণ করেন। সবিশেষরূপেই তিনি নিত্যলীলা আস্বাদন করেন। তাঁর এই সবিশেষের মধ্যে নির্গুণ ও সগুণ উভয় ভাবেরই সমান সম্বন্ধ থাকে।

সেবাকর্ম ধ্যানধারণা প্রভৃতি হল উপাসনার অঙ্গ। এদের মাধ্যমে চিত্ত শোধন হয় ও প্রাণমনের সমতা বা সমাধি লাভ হয়। সমাধির ফলে আত্মদর্শন ও আত্মজ্ঞান লাভ হয়। সমাধিলব্ধ জ্ঞানই হল বিশুদ্ধজ্ঞান।

সত্যযুগ হল মহাকারণের যুগ, ত্রেতাযুগ কারণের যুগ, দ্বাপর সূক্ষ্মের যুগ এবং কলি স্থূলের যুগ (বস্তুতান্ত্রিক)। কলিযুগের শেষ হলে আবার সত্যযুগের আর্বিভাব হবে। কলিযুগে স্থূলের প্রাধান্য অত্যধিক। স্থূলের মধ্যে সত্যকে আবিষ্কার দ্বারাই সত্যযুগ আরম্ভ হবে। সত্যযুগে জ্ঞানের প্রাধান্য, ত্রেতাতে ভাবের প্রাধান্য, দ্বাপরে নামের প্রাধান্য এবং কলিতে স্থূলরূপ ও দেহের প্রাধান্য।

স্থূল রূপসকলও সত্য। এই সত্য সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করলে পরবর্তী সত্যের স্তরগুলি সহজেই অনুভবগম্য হয়। সত্যই সত্যের পরিচয় ও অনুভূতির সহায়ক। জীবনের সর্বস্তরে এই সত্য মা বা গুরুকে মেনে নেওয়াই হল এ যুগের সহজতম সাধনা।

সত্যবোধে সব 'মেনে মানিয়ে চলার' ফলে পূর্ণ আত্মসমর্পণ হয়।

ধর্মের মূল উদ্দেশ্য হল নিত্য এক পরমের সঙ্গে সংযুক্ত করে দেওয়া ও তার বিজ্ঞানকে প্রকাশ করা। এই একই হল অদ্বয়তত্ত্ব বা অদ্বয়বোধ। ঐক্য ও মিলন হল এই যুগের বিশেষ ধর্ম। [২৩।৫।৬৮]

সচ্চিদানন্দস্বরূপে শক্তির লীলায়িত বিজ্ঞান

সচ্চিদানন্দস্বরূপের প্রকাশভঙ্গি অস্তি, ভাতি, প্রীতি, নাম, রূপের মাধ্যমে আপনাকে প্রকাশ করে সঞ্চারিত করে, বিস্তারিত করে আপনার মাঝে আবার মিশে যায়।

সচ্চিদানন্দস্বরূপের স্বতঃস্ফূর্ত ভাতিরূপকেই শক্তি বলে। চিৎ, সম্বিৎ বা জ্ঞান ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয় যার মাধ্যমে তাকেই বলা হয় শক্তি। এই শক্তিই হল প্রেমানন্দ। প্রেমানন্দ সবসময়ই চিৎ বা জ্ঞানযুক্ত। সৎ এবং চিৎ অভেদ ও অবিনাভাবী। সৎ বা চিৎ-এর মধ্যে আনন্দ অব্যক্ত থাকতে পারে। কিন্তু পূর্ণ আনন্দের মধ্যে সৎ ও চিৎ কখনও অব্যক্ত ও অপূর্ণ থাকে না, বরং ব্যক্ত ও পূর্ণ থাকে। আনন্দের মধ্যে প্রেমের অভিব্যক্তি অব্যক্ত বা অপূর্ণ থাকতে পারে, কিন্তু পূর্ণ প্রেম পূর্ণ আনন্দে প্রতিষ্ঠিত বলে তার মধ্যে সচ্চিদানন্দ পূর্ণভাবে অভিব্যক্ত থাকে। সুতরাং পূর্ণপ্রেমই হল সচ্চিদানন্দস্বরূপের সারমর্ম অর্থাৎ সচ্চিদানন্দস্বরূপের যথার্থ পরিচয়। জ্ঞানঘন বা চিদ্‌ঘন সত্তা (পুরুষ) প্রেমানন্দের আবেশেই নিয়ত প্রকাশমান।

নানাত্ব বহুত্বরূপ বৈচিত্র্যময় প্রকাশের মধ্যে এক নিত্য অদ্বয় সত্যই বিদ্যমান। এই অদ্বয় সত্যই পরব্রহ্ম পরমাত্মা পরমেশ্বর। শুধু তত্ত্বস্বরূপে তিনি পরব্রহ্ম, বিশ্বলীলায় তিনি পরমাত্মা, নিত্যলীলায় তিনি পরমেশ্বর এবং লীলায় তিনি অবতার।

প্রেমানন্দশক্তির এই প্রকাশ অভিনয় শুধু পরমপুরুষের আস্বাদনের জন্য। সত্তা বা পরমপুরুষের আনন্দ নিমিত্ত তাঁর শক্তি পরমেশ্বরী তাঁর অন্তর্নিহিত সমগ্র ঐশ্বর্য শক্তি ও মাধুর্যকে অভিনবভাবে প্রকাশ করে আবার তা তাঁকেই নিবেদন করে দেয়। এই শক্তির মাধ্যমেই পরমেশ্বর আপন ঐশ্বর্য ও মাধুর্য নানাভাবে আস্বাদন করেন। শক্তির অচিন্তনীয় লীলাভিনয় পরমেশ্বরের অনন্ত মহিমাকে অব্যক্ত হতে ব্যক্ত করে আবার অব্যক্তের মধ্যে মিলিয়ে দেয়। তাঁর এই ব্যক্তরূপই হল বিশ্বজগৎ। এই জগতের অন্তরসত্তায় আছে সেই অব্যক্ত চৈতন্যময় পুরুষ। সেইজন্য বলা হয় ঈশ্বর অব্যক্ত হয়েও ব্যক্ত এবং ব্যক্ত হয়েও অব্যক্ত; অর্থাৎ নির্গুণ হয়েও সগুণ এবং সগুণ হয়েও নির্গুণ।

দিব্যমানব অবতারের পরিচয়

অব্যক্ত পরব্রহ্ম সচ্চিদানন্দের প্রত্যক্ষরূপ হল জীবজগৎ। সৃষ্টির মধ্যে মানব হল শ্রেষ্ঠ। মানবাত্মার মধ্যে ব্রহ্ম আত্মা ভগবান বা ঈশ্বরের স্বরূপ পূর্ণমাত্রায় নিহিত আছে। তার অভিব্যক্তি ক্রমপর্যায়ে হয়। যাঁর মধ্যে তাঁর পূর্ণ প্রকাশ হয় তাঁকেই দিব্যমানব বলে। দিব্যমানবই হল ঈশ্বরের জীবন্তরূপ। এইরূপ ঈশ্বরীয় জীবনকেই অবতার বলা হয়।

অদ্বয় ব্রহ্মশক্তির অভিব্যক্তির ক্রমের মান ও পরিচয়

অনন্ত অসীম পূর্ণসত্তা পরব্রহ্ম পরমাত্মা পরমেশ্বর ভগবান আত্মপ্রকাশের সুবিধার জন্য আপন শক্তির সাহায্য নেন। নিজ শক্তিকে মাধ্যম করে তিনি অভিব্যক্ত হন। অভিব্যক্তি কালে তাঁর অনন্তশক্তি তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে কাজ করে। প্রথম ভাগ তুরীয়সত্তা ও কেন্দ্রসত্তার সঙ্গে যুক্ত থাকে। একে স্বরূপশক্তি বা যোগমায়াশক্তি বলে। এই যোগমায়াশক্তির বহুবিধ নাম আছে। শক্তির দ্বিতীয় ভাগ অন্তরসত্তার সঙ্গে যুক্ত থাকে। একে তটস্থশক্তি, জীবশক্তি বা মহামায়াশক্তি বলে। এই মহামায়াশক্তিরও বহু নাম আছে। শক্তির তৃতীয় ভাগ বহিঃসত্তার সঙ্গে যুক্ত থাকে। একে ত্রিগুণা প্রকৃতি বা মায়াশক্তি বলে। এরও আরও অনেক নাম আছে। স্বরূপশক্তি হল পরাচিৎ বা প্রেমানন্দস্বরূপ। জীবশক্তি হল চিৎ বা বিজ্ঞানস্বরূপ। বহিঃশক্তি হল অচিৎ বা অজ্ঞানস্বরূপ। চিৎশক্তি হল বিদ্যাশক্তি এবং অচিৎশক্তি হল অবিদ্যাশক্তি। একই শক্তি ব্রহ্মের মায়াশক্তি, পরমাত্মার যোগমায়াশক্তি এবং ঈশ্বর বা ভগবানের মহামায়াশক্তি। মতান্তরে ব্রহ্মের মধ্যে মায়াশক্তি, পরমাত্মার মধ্যে মহামায়াশক্তি এবং পরমেশ্বরের মধ্যে যোগমায়াশক্তি।

উপবীত বা ন'গুণের তাৎপর্য

জীবের মধ্যে এই শক্তি বিদ্যা ও অবিদ্যারূপে ক্রিয়া করে। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ হল অবিদ্যা বা ত্রিগুণাপ্রকৃতি। জীববোধ হল বিদ্যাশক্তি। মানবের বুদ্ধি এই ত্রিগুণা পরমাপ্রকৃতি ৩×৩ গুণে গুণান্বিত হয়ে নয়টি গুণে অভিব্যক্ত হয়। এই নয়গুণের অনুভূতি হলে গুণাতীত অবস্থা বা মুক্তিলাভ হয়। এই অনুভূতির জন্য নয়গুণকে ধারণ করতে হয়। এরই প্রতীক হল উপবীত বা ন'গুণ। ন'গুণধারী ও ন'গুণের সাধনা যে করে সে হল দ্বিজ। এই সাধনার উন্নত অবস্থা হল বিপ্র এবং পরমসিদ্ধ অবস্থা হল ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ হল ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন মানব।

নয়টি গুণের প্রতীক ধারণই হল ন'গুণ বা উপবীত ধারণ।

নয়গুণের একনাম প্রণব বা মা। এই মা বা প্রণবই হল গুরু। গুরু বা মা নববেশে মা-নব। মা হল ব্রহ্মের ন'গুণ। ন'গুণের দুইটি প্রকাশ নির্গুণ ও সগুণ। নব হল সেই ব্রহ্ম। নয়টি গুণ ধারণ করে সে হয় মানব।

প্রতিটি মানুষই শব্দধারী, শব্দ আহারী ও শব্দচারী। শব্দধারী মানে যে শব্দকে ধারণ করে। সর্ব ইন্দ্রিয় দ্বারা মানুষ বহির্জগৎ হতে স্থূল সূক্ষ্ম কারণ ত্রিবিধ প্রকার ভেদে যা-কিছু গ্রহণ করে তা বোধেরই নাম বা শব্দেরই আহরণ। এ-ই হল শব্দকে আহার করা। রূপময় বিশ্ব হল নাম বা শব্দের অর্থাৎ বোধের বৈচিত্র্যময় সম্ভার। তার মধ্যে মানব বিচরণ করে। অর্থাৎ শব্দকে আহার করে এবং শব্দের মধ্যে বিচরণ করে। এই বিশ্ব হল নাম বা শব্দের বহিঃস্ফুরণ বা অভিব্যক্তি। সমষ্টি নামের কেন্দ্রই হল নাদব্রহ্ম। নাদব্রহ্মের ধারক, বাহক বা পরিবেষক হল জীবশ্রেষ্ঠ এই মানব। মানবাত্মাই (জীবাত্মা) হল অক্ষর ব্রহ্ম।

বর্ণাশ্রম তত্ত্বের পরিচয়

প্রথম অবস্থায় তিনগুণের মধ্যে তমোগুণের প্রাধান্য অধিক থাকে বলে তাকে শূদ্র বলে। জাত মাত্র সকলেই

শূদ্র। দ্বিতীয় অবস্থায় শিক্ষা সংস্কারের মাধ্যমে এই তিনগুণের বিকাশ লাভ হয়; তখন সে হয় দ্বিজ। শিক্ষার দ্বারাই সংস্কৃত হয়। সংস্কারের অর্থ হল ব্যবহারের শোধন। তৃতীয় অবস্থায় গুণের উৎকর্ষ হলে আরও তিনটি গুণের প্রকাশ হয়। সে তখন হয় বিপ্র। বোধের বিশেষ প্রকাশের সঙ্গে বা বিজ্ঞানময় প্রকাশের সঙ্গে যুক্ত হলেই বিপ্র হয়। বেদ অধ্যয়ন বা স্বাধ্যায়ের ফলে হয় বিপ্র।

বহ্মের বহিঃপ্রকাশ এই বিশ্ব। এই বহিঃপ্রকাশকে যে জানে সে-ই বিপ্র। বহিঃপ্রকাশকে অবলম্বন করে তার অন্তর্নিহিত তত্ত্বের সঙ্গে যুক্ত হলেই বিপ্র হয়। তখন অন্তরের আরও তিনটি গুণের সম্যক্ প্রকাশ হয়। তখন সে হয় ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ হল সে-ই, যার অন্তরে বাইরে সমবোধ এই নয়গুণের সমন্বয়ে ধ্বনিত হয়, উদ্বেলিত হয়, উদগীত হয় ও অভিব্যক্ত হয়। তার ফলে ব্রহ্ম আত্মস্বরূপে হয় তার তাদাত্ম্যলাভ। তত্ত্বরূপ ব্রহ্ম-আত্মাকে যিনি আপনবোধে জানেন তিনিই ব্রাহ্মণ, তিনিই স্বানুভবসিদ্ধ।

শৈশবাদির মত বোধের চতুর্বিধ অবস্থা

মানুষের যেমন শৈশব, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব ও বার্ধক্য এই চারটি অবস্থা আছে সেইরূপ বোধের চারটি অবস্থা হল—শূদ্রত্ব, দ্বিজত্ব, বিপ্রত্ব ও ব্রাহ্মণত্ব। শৈশব হল শূদ্রত্ব; কৈশোর ও যৌবন মিলে হল দ্বিজত্ব; প্রৌঢ়ত্ব হল বিপ্রত্ব এবং বার্দ্ধক্য হল ব্রাহ্মণত্ব। শৈশব হল শূদ্র অবস্থা। এটাই মানবের প্রথম অবস্থা। দ্বিজত্ব লাভ না করা পর্যন্ত এই অবস্থা চলে, অর্থাৎ শিক্ষা দ্বারা মার্জিত ও সংস্কৃত হলে হয় দ্বিজ। এ মানবের দ্বিতীয় অবস্থা। দ্বিতীয় অবস্থায় অর্জিত বিদ্যা সম্প্রসারিত হয়ে পূর্ব অবস্থাকে সংস্কৃত ও মার্জিত করে জীবন তৃতীয় অবস্থায় পৌঁছায়। তখন সংসার জীবনে যোগ্যতা ও জ্ঞানলাভ করে সে হয় বিপ্র। এই তৃতীয় স্তরের জীবনও তার শেষ অবস্থা নয়। বহু পরিশ্রমের দ্বারা তৃতীয় স্তরকে অতিক্রম করে চতুর্থ স্তরে যেতে হয়। অর্থাৎ বহির্বিশ্বের সমস্ত কিছুর সঙ্গে মিলিত হয়ে বিশ্বের অন্তরে স্বভাবের কেন্দ্রে ব্রহ্মবোধে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই হল ব্রাহ্মণত্ব। প্রথম স্তর হল পশুত্ব বা জীবত্বের স্তর। দ্বিতীয় স্তর হল দেবত্বের স্তর। তৃতীয় স্তর হল ঈশ্বরের স্তর এবং চতুর্থ স্তর হল পরমেশ্বর, পরব্রহ্ম এবং পরমাত্মাবোধের স্তর।

মানবের প্রথম স্তর হল পশুত্ব বা শূদ্রত্ব; অজ্ঞানই হল শূদ্রের লক্ষণ। দ্বিতীয় স্তর হল দ্বিজত্ব বা দেবত্ব; জ্ঞান (জ্ঞানাভাস) হল এর লক্ষণ। তৃতীয় স্তর বিপ্রত্ব বা ঈশ্বরত্ব; বিজ্ঞান হল এর লক্ষণ। তৃতীয় স্তর অতিক্রম করে চতুর্থ স্তরে ব্রাহ্মণত্ব লাভ হয় অর্থাৎ ব্রহ্মে লীন হয়; প্রজ্ঞান হল এর লক্ষণ। এই ব্রহ্মবোধও শেষ অবস্থা নয়। এর পরে পরব্রহ্ম ও পরাৎপরব্রহ্ম নামে আরও দুইটি অবস্থা আছে; তা সবার জন্য নয়। ভগবান সর্বভূতে বিরাজমান। সবই তাঁর প্রকাশলক্ষণ। তাঁর মধ্যেই সব এবং সবের মধ্যেই তিনি, অর্থাৎ সবই তিনি। এ-ই তাঁর সত্য পরিচয়। ভগবান স্থূলের মধ্যে যেমন আছেন, সূক্ষ্মের মধ্যেও তেমন আছেন; সূক্ষ্মতরের মধ্যেও আছেন এবং সূক্ষ্মতমের মধ্যেও আছেন। শূদ্ররূপেও তিনি, দ্বিজরূপেও তিনি, বিপ্ররূপেও তিনি এবং ব্রাহ্মণরূপেও তিনি। স্থূলবস্তুও হেয় নয়, শূদ্রও হেয় নয়; আবার সূক্ষ্ম ও দ্বিজ শূদ্র অপেক্ষা মূলত শ্রেয়ও নয় এবং বিপ্র অপেক্ষা হেয়ও নয়। সেইরূপ বিপ্র শূদ্র ও দ্বিজ অপেক্ষা মূলত শ্রেয়ও নয় এবং ব্রাহ্মণ অপেক্ষা হেয়ও নয়। আবার ব্রাহ্মণ পূর্ব তিনবর্ণ অপেক্ষা বস্তুত শ্রেয়ও নয়, পৃথকও নয়। এই সবই পরমাত্মা পরমেশ্বরের লীলাভিনয় ও তাঁর পরিচয়। এইগুলি তাঁর বিজ্ঞানময় অভিব্যক্তি এবং এগুলির যথার্থ পরিচয় হল প্রজ্ঞানস্বরূপ স্বয়ং তিনি।

ব্রহ্মের স্থূল অভিব্যক্তি হল বহির্জগৎ। এটাই তাঁর পদ। এই পদই হল শূদ্র। সেইজন্য স্থূলকে আগে ধরতে হয়। বৃহৎ-এর পদতলে বসতে হয়। বৃহৎ অর্থে ব্রহ্ম বা ব্রহ্মণ অর্থাৎ বড় মা বা বড় মন। মা যখন পূর্ণ তখন সে ব্রহ্ম। ব্রহ্ম যখন ক্রিয়াশীল, গতিশীল ও প্রকাশমান তখনই সে 'গম্যতে, পদ্যতে, সম্পদ্যতে'।

সমগ্র বিশ্বরূপে ব্রহ্মই স্বয়ং। তিনি ছাড়া দ্বিতীয় আর কেউ নেই। এই ব্রহ্মই হল বিশুদ্ধ বোধস্বরূপ। এই বোধস্বরূপই হল স্বয়ং সত্তা-শক্তি এবং প্রকাশক ও প্রকাশ। সে এক হয়েও বহু এবং বহু হয়েও এক। নির্গুণ হয়েও সগুণ এবং সগুণ হয়েও নির্গুণ। সে পূর্ণ সত্যস্বরূপ। সত্যের মধ্যে যা জাত হয় এবং যা জাত হয় না সবই সত্য। এই সত্যের মহিমা অনন্ত। 'এ নয়' অর্থাৎ নেতি নেতিও যেমন এর পরিচয়জ্ঞাপক, 'এও' অর্থাৎ ইতি ইতিও সেইরূপ এর পরিচয়জ্ঞাপক। সম মানে সমান, পূর্ণতা। পূর্ণরূপে তিনিই স্বয়ং ক্রিয়াশীল। ব্রহ্মময়ী মা হল অনন্ত অসীম। তাঁর পদযুগল না ধরতে পারলে তাঁর অনুভূতি লাভ করা যায় না। পদ শব্দের মানে যার দ্বারা তিনি স্বেচ্ছায় স্বপ্রীত্যর্থে কর্ম করেন, নিজেকে পরিচালনা করেন, এবং নিজের স্বরূপ ও মহিমা প্রকাশ করেন। মায়ের যে-অংশ মানুষের সর্বাপেক্ষা নিকটে তা হল মায়ের পদ; অর্থাৎ বিশ্বের স্থূল রূপ ও বোধ।

গুণ ও অবস্থা যোগে ব্রহ্ম-আত্মবোধের বৈশিষ্ট্য

শূদ্রের ব্রহ্ম এই স্থূল বিশ্ব। সেইজন্য স্থূলকে যে সেবা করে সে-ই শূদ্র। সূক্ষ্মের যে সেবা করে সে দ্বিজ। রূপের অন্তরে যে নাম তা-ই হল স্থূলের পরিচয়। নাম হল স্থূলের পরিচয়, বস্তুর পরিচয় এবং ব্যক্তির পরিচয়। এটা যে জানে সে দ্বিজ। অর্থাৎ দ্বিজ থাকে নামে। নামের পরিচয় জানা যায় ভাবের মাধ্যমে; কারণ নাম অপেক্ষা ভাব সূক্ষ্ম। ভাবের মাধ্যমে নামতত্ত্ব জেনে যে তার যথার্থ ব্যবহার করতে পারে সে হয় বিপ্র। অর্থাৎ ব্রহ্মের তৃতীয় পাদ সে লাভ করে। ভাবের যথার্থ পরিচয় জানা যায় শুদ্ধবোধের দ্বারা। ভাব অপক্ষো সূক্ষ্ম হল বোধ। বোধস্বরূপ থেকেই প্রথম ভাবের উদয় হয়। বোধের অনুভূতি হলে ভাব শুদ্ধবোধে পরিণত হয়। শুদ্ধভাবের নাম মহাভাব ও স্বভাব। বোধের মাধ্যমে ভাবের ব্যবহার শুদ্ধ হলে ভাবাতীত অবস্থা অর্থাৎ শুদ্ধবোধে প্রতিষ্ঠা হয়। এই শুদ্ধবোধই হল অখণ্ড ভূমাবোধ বা ব্রহ্মবোধ। একেই অদ্বয়বোধ বা অমৃতবোধ বলে। এ সর্বতোভাবে তুরীয়। ভাবশুদ্ধির পর প্রথমে স্বভাবে প্রতিষ্ঠা হয় মহাভাবের মাধ্যমে। স্বভাবের যথার্থ ব্যবহার শুদ্ধবোধের মাধ্যমে হয়। শুদ্ধবোধে প্রতিষ্ঠিত হলেই জীব ব্রাহ্মণত্ব লাভ করে। ব্রহ্মজ্ঞানীই হল যথার্থ ব্রাহ্মণ।

শূদ্র সংস্কৃত হয়ে দ্বিজ হয়। দ্বিজ উৎকর্ষ লাভ করে বিপ্র হয় এবং বিপ্র পূর্ণতা লাভ করে ব্রাহ্মণ হয়।

জীব মায়ের সন্তান, মায়ের অভেদ অংশ অর্থাৎ ব্রহ্মের সগুণ অভিব্যক্তি। নিজের সঙ্গে নিজের খেলাকেই স্বভাবের লীলা বলে। এই স্বভাবলীলা তাঁর বৈশিষ্ট্য। এই লীলাখেলাই হল তাঁর ইচ্ছা ও সাধ। লীলার জন্য নিজ শক্তির মাধ্যমে নিজেকে তিনি আবৃত করেন। ঢাকা ও আ-ঢাকার মধ্যে খেলা। চোখ ঢেকে দিলে দেখা যায় না। চোখ খুলে দিলেই আবার সব পরিষ্কার দেখা যায়। বোধের নয়নই মায়ের চোখ। একেই মায়ের ত্রিনয়ন বলে।

মায়াকে মা না-বললে মাকে ধরা যায় না। জগতকে মা না-বললে জগতের অন্তর্নিহিত সেই চিন্ময়ী মাকে ধরা যায় না। অজ্ঞান হল জ্ঞানের সঙ্কুচিত, আবৃত প্রকাশ, কিন্তু পূর্ণ জ্ঞান নয়। যেমন, বৃক্ষের সঙ্কুচিত অবস্থা বীজ। অবিদ্যার অন্তরে জ্ঞান বা বিদ্যা না থাকলে বিদ্যা বা জ্ঞানের প্রকাশ হতে পারে না। অবিদ্যা হল বিদ্যার আশ্রয় এবং মিথ্যা হল সত্যের আশ্রয়। অবিদ্যার বিপরীত হল বিদ্যা। মিথ্যার বিপরীত হল সত্য।

পূর্ণতা লাভের অন্যতম উপায় হল শুদ্ধবোধের কথা শুনে শ্রবণ অনুরূপ তার ব্যবহার করা।

বোধের অনুভূতি না-হওয়া পর্যন্ত অজ্ঞানের প্রভাব হতে রেহাই পাওয়া যায় না। অজ্ঞানের প্রভাবে কর্মফলের আশায় জীবকে কর্মবন্ধন বা ভোগপাশে আবদ্ধ হতে হয়। তার ফলে পুনঃপুনঃ দেহধারণ করে অপূর্ণ আশা ও ভোগ মেটাতে হয়। বোধের প্রভাবে জীব অজ্ঞানবন্ধন ও কর্মপাশ মুক্ত হয়। তখন সে শিব হয়। শিবই জীব এবং জীবই শিব। বদ্ধ অবস্থায় শিবই হল জীব এবং মুক্ত অবস্থায় জীবই হল শিব।

সগুণ নির্গুণ উভয়ই ঈশ্বরের পরিচয়। তিনি এক ও বহু উভয়ই, বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়ই, জ্ঞান ও অজ্ঞান

উভয়ই, মৃত্যু ও অমৃত উভয়ই। তিনিই আলো-আঁধার, সত্য-মিথ্যা, নিত্য-অনিত্য সব। অনন্ত তাঁর মহিমা। তাঁর অনুভূতিও অনন্ত। এই দুই নিয়েই তাঁর একক পরিচয়। সেইজন্যই বিশ্বের আর এক নাম দুনিয়া।

ব্রহ্মের পরিচয়—কেন্দ্রে নির্গুণ, অন্তরে সগুণ এবং বাইরে ত্রিগুণাপ্রকৃতি। তিনি পরমাত্মা, তিনি জীবাত্মা, তিনি ঈশ্বর, তিনি ঈশ্বরপ্রকৃতি, তিনি ভগবান, তিনি ভক্তসন্তান, তিনি পিতামাতা, তিনি সন্তান, তিনি পুরুষ বা সত্তা, তিনি শক্তি বা প্রকৃতি। সর্বপ্রকাশের সঙ্গে তিনি নিত্যযুক্ত এবং সমভাবে বদ্ধ। সবার সঙ্গে তাঁর অভেদ সম্বন্ধ।

দুঃখকষ্ট অভাব অভিযোগ হল শূদ্র স্তরের। শূদ্র স্তরকে অতিক্রম করার জন্য এগুলির একান্ত প্রয়োজন। এই শূদ্র শব্দের অর্থ—শুধু রোদন করে যে। তার রোদনের কারণ হল অপূর্ণতা বা পূর্ণতার অভাব।

অপূর্ণতা ও অভাব পূরণের জন্য শূদ্র স্তরে বহু চাহিদা থাকে। শিক্ষা, সংস্কার ও পুষ্টির জন্য সে অর্থ, অন্ন, বস্ত্র প্রভৃতি চায়। এ সবগুলি মিলেই হয় পথ্য। দ্বিতীয় স্তরে দ্বিজ অবস্থায় পথ্যের সুব্যবস্থা করার জন্য সে কর্মক্ষেত্রে কৌশল বা অভিজ্ঞতা অর্জন করতে চায়। শিক্ষা ও কর্মের অভিজ্ঞতা দ্বারা মার্জিত হয়ে সে দক্ষ ও নিপুণ হয়। এই দক্ষতা ও নিপুণতা লাভ করেও সে তৃপ্ত হয় না। সে আরও বেশি চায়। তৃতীয় স্তরে বিপ্র অবস্থায় এসে মন ও বুদ্ধির ব্যাপক সম্প্রসারণ হয়। তার ফলে শিল্পকলা সঙ্গীত সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞান প্রভৃতির বিকাশ হয় তার মধ্যে। এগুলি সবই উন্নত মন ও বুদ্ধির সৃষ্টি। চিন্তা ও মনোরাজ্যে প্রবেশ করে সে তাঁর অনন্ত অসীম মহিমার সঙ্গে পরিচিত হয়। কিন্তু তৃতীয় স্তরে কৃষ্টি ও সংস্কৃতি দ্বারাও তার মন পূর্ণ তৃপ্ত হয় না। সে এই অপূর্ণতা দূর করার জন্য আরও গভীরে অন্বেষণ করে সাধনার নূতন পর্যায়ে প্রবেশ করে। এটাই চতুর্থ স্তর বা ব্রাহ্মণের স্তর।

শূদ্রের সাধনা হল দেহেন্দ্রিয় স্তরে। দ্বিজের সাধনা হল প্রাণের স্তরে। বিপ্রের সাধনা মনের স্তরে এবং ব্রাহ্মণের সাধনা হল বুদ্ধির স্তরে। [২৫।৫।৬৮]

দ্বিতীয় অধ্যায়

বোধময় সত্তার বিবিধ পরিচয়

অখণ্ড মহাপ্রাণ সমুদ্র—তার অনন্ত তরঙ্গ। এই তরঙ্গগুলি ঘাত প্রতিঘাতে ভেঙ্গে ভেঙ্গে বুদ্বুদের আকারে ছড়িয়ে পড়ে, অবার মিশে যায়। এই মহাপ্রাণের তরঙ্গগুলি যখন শান্ত স্থির হয়ে যায় তখন তাকেই ঋষিগণ নির্গুণ ব্রহ্ম নামে অভিহিত করেছেন। আবার যখন একটু একটু করে তরঙ্গায়িত হয় তখন তাঁকে সগুণ ব্রহ্ম, ঈশ্বর, ভগবান প্রভৃতি বহু নামে অভিহিত করেছেন। এই সব ভিন্ন ভিন্ন নাম বা শব্দগুলিও তরঙ্গের সঙ্গে তরঙ্গের মিলনের ফলেই সৃষ্ট হয়েছে।

শব্দ এবং শব্দের অর্থ বা ভাব সবকিছুর মধ্যে আছে এক প্রাণই। এই মহাপ্রাণেরই আর এক নাম চৈতন্য বা বোধ। বোধ শব্দশূন্য হয় না এবং শব্দও বোধশূন্য হয় না। সেইজন্য শব্দমাত্রই বোধ এবং বোধমাত্রই শব্দকে প্রকাশ করে।

আদি শব্দ বা নাদ হল অস্ফুট। বাইরে তার অভিব্যক্তি ফুটে ওঠে না। ক্রমপর্যায়ে তার বহিরভিব্যক্তি হয়। এই অভিব্যক্তির ধারা ক্রমশ যখন বৃহত্তর রূপ নেয় তখন অস্ফুট হতে স্ফুট হয়। আরও বৃহদাকার রূপ নিলে স্ফুট হতে স্ফুটতর হয় এবং পরিণামে স্ফুটতম হয়।

ঘনীভূত, জড়ীভূত রূপের মধ্যেও প্রাণ আছে, যেমন জল বরফ হলে বরফের মধ্যে তা বিশেষ রূপে থাকে। প্রাণের ঘনীভূত এক একটি রূপ আকারপ্রাপ্ত হয়ে এই বহির্বিশ্বরূপে আত্মপ্রকাশ করে। এই প্রাণের অনন্ত ছন্দ ও প্রতিচ্ছন্দ। তার প্রকাশ কোথাও মৃদু, কোথাও মৃদুতর আবার কোথাও মৃদুতম। আবার কোথাও তা তীব্র, কোথাও তীব্রতর ও কোথাও তীব্রতম।

অণুর মাহাত্ম্য

প্রাণের অণুতম প্রকাশেরও অধিষ্ঠান হল মহান প্রাণসত্তা। অণুর সাধারণ অর্থ ক্ষুদ্রতম প্রকাশ। কিন্তু অণুর অন্তর্নিহিত অর্থ হল অ+ণ+উ। অণু=মহতের প্রকাশ অংশ। অনু = পশ্চাৎ। অণু = Atom = At + OM = প্রণবে বা ওঁকারে। সৃষ্টির কেন্দ্র বা মূল এই প্রণব = OM।

অণুতম তথা অণুদেব হিসাবে আত্মা সর্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম ও দেহেন্দ্রিয় বাক্যমনাতীত। এই হল জীবাত্মার স্বরূপ। অনন্ত অণু হল অনন্ত জীবাত্মা। সর্বব্যাপী অখণ্ড আত্মার মহান ভাব হল ভূমা। পরমাত্মার অণু ও ভূমার তত্ত্বগত অর্থ সমান।

'অ' হল অণুত্তর যার পরিণাম প্রকাশের মাধ্যমে ক্রিয়াযুক্ত হয়ে নন্দিত হয় বা আনন্দিত হয়। অণুর 'অ' সেই অখণ্ড অনন্ত অসীমের সঙ্গে যুক্ত হয়। 'ণ'— আনন্দ, সর্বক্রিয়ার পরিণাম রূপে জ্ঞান প্রকাশ করে আনন্দেতে ফিরে আসে। প্রাণের বৈচিত্র্যময় প্রকাশসমূহের মৌলিক উপাদান হল চিৎ। সমগ্র কর্মের পরিণাম হল বোধ। তাই 'ণ'-এর সঙ্গে 'উ' যুক্ত হয়ে তাকে উন্মেষিত করে, উদ্দীপ্ত করে, উদ্ভাসিত করে, উদ্বেলিত করে এবং উদ্ভ্রান্ত করে। চৈতন্যকে পূর্ণমাত্রায় উদ্ভাসিত করে তার অন্তর্নিহিত আনন্দস্বরূপকে প্রকাশ করে। এই হল চিদণুর মহিমা।

চিদণুই হল বৈচিত্র্যময় জগতের কারণ ও নিত্যবস্তু। জগৎ সৃষ্টির মূলে এই অণু, জ্ঞান ও অনুভূতির মূলেও

এই অণু এবং কর্মের মূলেও এই চিদণু বিদ্যমান। প্রেমের মূলে এই চিদণু মহীয়ান অর্থাৎ অখণ্ড ভূমা রূপে নিত্য বর্তমান। এই অণুই হল মৌলিক উপাদান, যা দ্বারা গঠিত এই বিশ্বপ্রাণ। এ হল বিশ্বের সহজতম প্রকাশ— সেইজন্য ভগবানের আর এক নাম হল অণুদেব[১]।

অণুই হল প্রাণের প্রাণ। হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে এই অণু বিরাজমান। তাঁরই নাম ভগবান আত্মা পরমাত্মা, তাঁরই নাম ইষ্ট গুরু বা ব্রহ্ম, তাঁকেই বলে মাতা। অণু যেমন সৃষ্টি করে তেমন পরিবেষণও করে জগৎকে। পরিবেষণের মানে দেওয়া, অর্থাৎ প্রীতিযুক্ত হয়ে পরিণামে শ্রেষ্ঠ হওয়া।

শ্রেষ্ঠের পরিচয় অবগত হওয়া যায় সেবা দ্বারা। ভগবান নিচু হতেও নিচু অর্থাৎ সহজতম হতেও সরলতম। তিনি বিরাট ও অনন্ত হয়েও অণুর মাধ্যমে, অণুরূপে সব কিছুর মধ্যে মিশে আছেন। অণু সমষ্টিযুক্ত হয়েই বিরাটকে প্রকাশ করে। এই অণুশক্তির সম্মিলিত নাম হল দুর্গা[২]। বিরাটেরও বিকার হয় কিন্তু অণুর রূপান্তর হয় না। সেই জন্য সে অবিনাশী, অপরিণামী, অবিকৃত এবং অচ্যুত। বিরাটের পরিণাম হল অণু এবং অণুর পরিণামই হল বিরাট।

চৈতন্যশক্তির সম্প্রসারিত রূপের পরাকাষ্ঠা হল নাদ এবং তার সংকুচিত রূপের পরাকাষ্ঠা হল বিন্দু বা অণু। এই নাদবিন্দুর অন্তর্ভুক্ত অংশ ছন্দ, তাল বিশেষণাদিকে কলা বলে। বর্ণমালাসমষ্টি হল অণুর কলা। ভাষা হল নাদের কলা। এই উভয় কলা মিলিত হয়ে হয় ভাবের কলা। ভাবস্বরূপে নাদ ও বিন্দুর অর্থাৎ মন ও জীবাত্মার (মহান ও অণুর) মহামিলন হয়। এই মহামিলনের ফলে পূর্ণ জ্ঞানের উদয় হয়। তখনই পূর্ণানন্দ ও প্রেম আত্মপ্রকাশ করে।

অচ্যুতের সাধনা যারা করে তারাই হয় শান্ত।.অণোরণীয়ান হল ভগবান। ভক্ত তাঁকে বানায় মহতোমহীয়ান। যেমন অণু বানায় পাহাড়কে। পাহাড় অণুর মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না, কিন্তু অণু পাহাড়ের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে। অণু বানায় সাগরকে। এই সাগরই হল শক্তি, জ্ঞান, ভাব, আনন্দ ও প্রেমের সাগর। শক্তির অণুর সমষ্টি হল শক্তির সাগর, জ্ঞানের অণুতে জ্ঞানসাগর, ভাবের অণুতে ভাবসাগর, আনন্দের অণুতে আনন্দসাগর এবং প্রেমের অণুতে প্রেমসাগর।

প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত স্থূল ও জড়ীভূত পদার্থসমূহের মধ্যে তার অণুকণাগুলি একবার সংশ্লিষ্ট হয়ে আবার বিশ্লিষ্ট হয় এবং পদার্থসমূহের গঠন, সংরক্ষণ ও সংহরণ ক্রিয়া সম্পাদন করে। সেই জন্য বিজ্ঞানীরা বলেন সমগ্র বিশ্ব হল অণুশক্তির সংগঠিত রূপ এবং এর বিভাজনের ফল হয় ধ্বংস।

ঈশ্বর সকলকে ধরা দিতে সর্বদা ব্যস্ত, কারণ সবকিছুর মধ্যে তিনি মিশে আছেন। ঈশ্বরের অণুর নিজস্ব কোন রূপ নেই, তিনি রূপ সৃষ্টি করেন। তিনি জানেন, তিনি জানান। তিনি দেখেন, তিনি দেখান। তিনি শোনেন, তিনি শোনান। তিনি আনন্দ করেন, তিনি আনন্দ দেন। তিনি প্রেম, তিনি পূর্ণ। এই অণু-আত্মার সন্ধান না পেলে পূর্ণতা লাভ হয় না এবং জীবন মুক্ত হয় না। অণু-আত্মাই হলেন পূর্ণতাবিধানকারী ও মুক্তির কারণ। অণু-আত্মার সন্ধান পেলেই জীব বা মানব শান্ত হয়, আত্মস্থ হয়, কূটস্থ হয় এবং অক্ষর ব্রহ্মের সঙ্গে যুক্ত হয়।

যত ধর্মমত, যত জ্ঞান-বিজ্ঞান, যত সাধনা সবই সেই অসীমের দিকে যাবার জন্য। সবই হল অণু-আত্মার সাধনা। অণু-আত্মাকে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে দেখা যায় না। সেই জন্য ভগবানকেও ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে দেখা যায় না। এ সর্বতোভাবেই অতীন্দ্রিয় দর্শন অর্থাৎ বিশুদ্ধ চিত্ত বা বিশুদ্ধ বুদ্ধির দ্বারাই অনুভূত হয়।

নিরহংকার ও নিরভিমান বিশুদ্ধ চিত্ত, সুসংযত ও সুসমঞ্জস, সামর্থ্য প্রভৃতি হল সত্য ও ধর্ম প্রতিষ্ঠার লক্ষণ। সত্যধর্মে প্রতিষ্ঠিত হলেই বিশুদ্ধ জ্ঞান ও অনুভূতির অধিকারী হওয়া যায়। বিশুদ্ধ বোধের প্রকাশই হল আনন্দ ও প্রেমভক্তি।

১। অভিনব সংজ্ঞা। ২। তত্ত্ব দৃষ্টিতে।

অণুদেবকে পাওয়া যায় না। তাই বলা হয় অনুভব (অণু+ভব)=তুমি অণু হও। তাহলেই অনুভূতি হবে।

ভগবানের আসল রূপ হল অণু। ভক্ত তাঁকে বানায় মহান। মহাপুরুষগণ অণু হয়ে থাকেন। তাঁরা সবাইকে মান দেন কিন্তু নিজেরা মান চান না। যা কিছু আছে সবই যে তাঁর (ঈশ্বরের)।

অনুভূতিই হল পূর্ণতা। ইন্দ্রিয়গুলি শান্ত হলেই তৃপ্ত হওয়া যায়। প্রাণের ভিন্ন ভিন্ন অভিব্যক্তি একবার শান্ত হয় আবার অশান্ত হয়। সসীমে নিবদ্ধ থাকলে এ অশান্ত হয় এবং অনন্ত অসীম ও সমতার সঙ্গে যুক্ত থাকলে এ শান্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

মহাপুরুষগণ সবাইকে আপনবোধে গ্রহণ করে ভালবাসতে পারেন একমাত্র অণুবোধের সাহায্যে। অণুবোধের ধারাকেই অনুভূতি বলে। অনুভূতি হল বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্বের, অসমানের মধ্যে সমানের, বহুর মধ্যে একের এমন কি জড়ত্ব ও মৃত্যুর মধ্যেও চিদাত্মা ও অমৃতত্বের সন্ধান মেলে।

পূর্ণজ্ঞানের পরে আবার হয় অজ্ঞান। সেই জন্য মহাত্মাগণ হন বালকবৎ। এই অজ্ঞান হল আদি জ্ঞান। অখণ্ড জ্ঞান[১]।

অণুর সমান হতে কেউ চায় না কারণ অণুই তাকে বাধা দেয়। তারা অণুর সঙ্গে মানকে প্রাধান্য দেয়, শুধু অণুকে ধরে না। তার ফলে হয় অনুমান। অণুধ্যান সত্য, অণুজ্ঞান সত্য কিন্তু অনুমান সত্য নয়। সেই জন্য বলা হয় অণুকে স্মরণ কর। অণু মনন অর্থাৎ অণু চিন্তন কর। তবেই অণুর প্রীতি আসবে, অনুভূতি আসবে। অণুই সব হয়েছে।

বাঘ এত হিংস্র হয়েও অনুভবসিদ্ধ সাধকের অনুগত বা বাধ্য হয়। অনুভূতি হলে অনুভবের অণু হিংস্রতার অণুকে রোধ করতে পারে। এই অণুই হল প্রেম—অণুই হল প্রাণের প্রাণ, যা সবাইকে পরিচালিত করে ও জীবিত রাখে।

ব্রহ্মাণু ব্যতীত জীবজগতের অস্তিত্ব সম্ভব নয়। একটা বড় বাড়ি—তা অণুশক্তির সমষ্টি মাত্র। এই মাটি অণুশক্তিরই বিশেষ রূপ। অণুই সকলকে আশ্রয় দেয়।

যা কিছু মানুষ ব্যবহার করে, যা কিছু দেখে, সবার মধ্যেই ব্রহ্মাণু বিদ্যমান এবং সর্ব প্রকাশ ও ক্রিয়া হল চিদণুরই অভিব্যক্তি। অণুই কারণ, অণুই কার্য, এ সমষ্টি ব্যষ্টি সর্ব সমন্বয়ে পূর্ণ। দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি চিদণুর দ্বারাই গঠিত এবং চিদণুর দ্বারাই পরিচালিত। দেহের মধ্যে প্রাণচৈতন্য আছে। এই প্রাণচৈতন্যই হল চিদণুর সমষ্টি। দেহেন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, বুদ্ধির মধ্যে চিদণু বর্তমান আছে বলেই অনুভূতি হয়। চিদণুই হল একমাত্র মৌলিক উপাদান যার দ্বারা সব কিছুর সৃষ্টি সম্ভব হয়। প্রাণ গঠিত হয় অণু দিয়ে। বিশ্বের প্রতিটি প্রকাশে এই অণু অনুস্যূত হয়ে আছে, ওতপ্রোত হয়ে আছে। এই অণু যা দিয়ে গড়া তা-ই ঈশ্বর। অণুর মধ্যে অণুর কেন্দ্রকেই বলে পরমাণু। অণুই পরমাণু।

অণুর কথা শ্রবণ করলে অণু স্মরণ হয়। অণু স্মরণ করলে অন্বেষণ। শ্রবণ অনুযায়ী অণুর ধ্যান করলে অণু ব্যবহার করা হয়।

প্রাণের অণু-অভিমুখী বা কেন্দ্রাভিমুখী গতি বা ধারার নাম রাধা। বহির্মুখী প্রাণধারার উজান গতি বা উল্টো গতি হল কেন্দ্রাভিমুখী গতি। প্রাণধারার কেন্দ্রাভিমুখী গতিকেই রাধা বলে। সুতরাং প্রাণের আর এক নাম অণু-রাধা—অনুরাধা।

গুরু, ইষ্ট, অণুকে ধরলে বিশ্বের সকল গুরুর স্নেহাশিসে কৃতার্থ হয়ে অনুভূতি লাভ করা যায়। ভক্ত ছাড়া

১। অভিনব সংজ্ঞা।

ভগবানের মহিমা অপূর্ণ এবং ভগবানকে না পেলে ভক্তও অপূর্ণ থাকে; যেমন সন্তানশূন্য পিতামাতা এবং পিতামাতাশূন্য সন্তান উভয়ই অসিদ্ধ ও অপূর্ণ।

অণুকে ভালবাসার নাম হল অনুরাগ। অণুকে লাভ করতে হলে অনুরাগ চাই। গুরুকে, ইষ্টকে প্রীত ও তুষ্ট করতে হলে তৎপ্রতি অনুরাগ থাকা চাই। গুরুই অণুকে ধরিয়ে দেন। অণুই হল ইষ্ট, আত্মা এবং পরমাত্মা। ব্রহ্ম এত সূক্ষ্ম যে তাঁকে ধরা যায় না। গুরুকৃপায় অণুর কথা মনে হলেই অনুরাগ হতে থাকে। এই অণুই মাতা, অণুই গুরু, অণুই পিতা, অণুই ইষ্ট ভগবান ঈশ্বর, অণুই আত্মা, ব্রহ্ম, প্রাণের প্রাণ মহাপ্রাণ। [১।৬।৬৯]

নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্মের পরিচয়

সচ্চিদানন্দঘন ঈশ্বর স্বরূপত অদ্বয়, অব্যয়, গুণাতীত, কালাতীত, ভাবাতীত, দ্বন্দ্বাতীত। এ তাঁর নির্গুণস্বরূপের পরিচয়। তিনিই আবার সর্বগুণাকর, সর্বভাবময়, বৈচিত্র্যময় বহুত্বের লীলাবিলাসে তাঁর অচিন্ত্যনীয় শক্তির মাধ্যমে নিজেকে নানাভাবে বিশ্বরূপে ব্যক্ত করেন। এ তাঁর স্বগুণের পরিচয়। তাঁর এই বিশ্বরূপে আত্মপ্রকাশ হল তাঁর শক্তির ঐশ্বর্য, জ্ঞানানন্দের বিলাস ও মাধুর্যের লীলা। এই স্বভাবলীলায় তিনি স্বয়ং নিত্য নূতন ভাবে বিশ্বজীবনের মাধ্যমে স্ববৈশিষ্ট্য বজায় রেখে আপনাকে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে প্রকাশ বা ব্যক্ত করে চলেছেন। এইভাবে সগুণ ও নির্গুণত্বের অতিরিক্ত উভয় তত্ত্বের এক অভিনব স্বরূপ নির্গুণ-গুণী রূপে ঈশ্বরীয় অভিব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

সমগ্র সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে স্রষ্টা ঈশ্বর স্বয়ং বিদ্যমান; কারণ স্রষ্টা ও সৃষ্টি অভেদ। সর্ববিধ অভিব্যক্তি বা প্রকাশের মাঝে তিনি নিজেই বিরাজ করেন। প্রতিটি প্রকাশ বা সন্তান তাঁর সঙ্গে নিত্যযুক্ত হয়ে তাঁরই অমৃতময় বক্ষে নিত্য অবস্থান করে। ঈশ্বর হলেন বিশ্বপিতা বা মাতা এবং বৈচিত্র্যময় প্রকাশসকল হল তাঁর সন্তান।

বিশ্বমাতার এই সন্তানসকল বিশ্বমাতার সংকল্পজাত বা মানসিক বিস্তার। মায়ের সঙ্গে সন্তানের যেমন অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ সেইরূপ বিশ্বমাতার সঙ্গেও তাঁর সর্ব প্রকাশসন্তানের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। মা যেমন সন্তানকে ধরে থাকে এবং সন্তানও মাকে ধরে থাকে সেইরকম বিশ্বমাতাও তাঁর সকল প্রকাশরূপ সন্তানকে সৃষ্টি করে আপন বক্ষে ধারণ করে রেখেছেন এবং তাঁর প্রকাশরূপ সন্তানও বিশ্বরূপ মাতৃবক্ষে বিচরণ করে এবং পুষ্ট হয়ে পূর্ণতা লাভ করে। এই বিশ্বমাতারই আর এক নাম ব্রহ্ম। নির্গুণতত্ত্বে এ উপাধিশূন্য নির্গুণ ব্রহ্ম এবং সগুণতত্ত্বে উপাধিযুক্ত হয়ে এ সগুণ ব্রহ্ম।

ব্রহ্ম উপাধিযুক্ত হয়ে অর্থাৎ আপন স্বভাবশক্তির সঙ্গে যখন লীলাবিলাসে রত হন তখন তিনি সগুণ ব্রহ্ম নামে অভিহিত হন।

অন্তরে ব্রহ্ম এবং বাইরে বিশ্ব অর্থাৎ ব্রহ্মের প্রকাশ বা সন্তান। এই হল নির্গুণতত্ত্বের সগুণ অভিব্যক্তি অর্থাৎ শান্তের গতিশীল ক্রিয়মান লীলাপ্রকরণ। কেন্দ্রে ও অন্তরে যা পূর্ণ ও শান্ত, বাইরে তা-ই অপূর্ণ ও অশান্তরূপে প্রকৃতি বা স্বভাবের গুণ ও পরিণামের বৈচিত্র্যে পরিদৃশ্যমান অর্থাৎ পরিণামময় কার্য-কারণের বিজ্ঞানময় প্রকাশ।

বিশ্বমাতা জগদ্ধাত্রী। তাঁরই সন্তান মন। মনকে পূর্ণ করতে মা যা দেন তাই সত্যবোধ। মনের বিশেষ রূপ হল মানুষ। সেইজন্য মানুষ মনোজাত এবং মনোময়। মায়ের স্বভাবসন্তান হল মন। মনই (মানস) মানবরূপে নাম রূপ ধারণ করে বাইরে প্রকাশ পায়। বহির্মুখী স্বভাব যখন তখন মন, যখন স্বভাব অন্তর্মুখী তখন নমঃ, অর্থাৎ নাও মা।

আত্মসমর্পণ অর্থ হল সমান করে অর্পণ। সমান করে অর্পণ হলেই সমত্ব লাভ হয়। অর্পণ সম্পূর্ণ হলে সমান হয়।

নমস্কার করার সঙ্গে সঙ্গে পুলক ও শিহরণ হওয়া চাই, তাহলে অন্তরে বোধন হয়। বোধন হলেই হয় বোধের জাগরণ। একেই বলে মন্ত্রচৈতন্য।

মাতৃনাম হল অন্যতম শ্রেষ্ঠ বীজ ও শ্রেষ্ঠ নাম। তিনি ব্রহ্মেরও মাতা। কারণ নিষ্ক্রিয়, নিরবয়ব, নির্গুণ ব্রহ্মের স্বরূপকে তিনিই প্রকাশ করেন। যার মধ্যে প্রকাশ হয় এবং যার দ্বারা প্রকাশ হয় সবই মা।

এক সচ্চিদানন্দময়ী মা নির্গুণ ও স্বগুণ উভয় ব্রহ্মের স্বরূপকে যথার্থভাবে প্রকাশ করেন। প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্ম এবং তাঁর শক্তি নিত্য অভেদ। শক্তিশূন্য ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মশূন্য শক্তি উভয়ই অচিন্তনীয় ও অর্থহীন। আগুন ও তার দাহিকাশক্তি নিত্য অভেদ ও এক। সেইরূপ ব্রহ্ম এবং শক্তি তত্ত্বত এক। এ-ই নিত্যাদ্বৈত পরমতত্ত্ব। সবকিছু নিয়ে যা পূর্ণ তাকেও প্রকাশ করেন মা। বিশ্ব হলেন ব্রহ্মের আশ্রয় বা আলয়; আবার ব্রহ্ম হলেন বিশ্বের আশ্রয়, আলয় বা মাতা এবং সগুণ ব্রহ্মের বা ভগবানেরও মাতা। আবার তিনি নিজেই নিজের প্রকাশসন্তান।

'শিবমাতা চ শিবানী, ব্রহ্মমাতা চ ব্রহ্মাণী।' শিব অর্থ মঙ্গলময়, কল্যাণময়, শুদ্ধ বোধময়, বিশুদ্ধ পরমতত্ত্ব বা পরব্রহ্ম। শিব অর্থ হল আত্মা। আবার শিব হলেন ত্রি-দেবতার একজন, সংহর্তা রুদ্র। তাঁরই অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি এবং শিবের শক্তি বা পত্নীরূপে তিনিই আবার শিবানী, সবর্ণী প্রভৃতি। সুতরাং মাতা ও পত্নী হল এক শক্তিরই দ্বিবিধ ভাব। এই অর্থে বলা হয়েছে—যে মাতা সে-ই পত্নী আবার সে-ই দুহিতা এবং যে দুহিতা সে-ই মাতা ও সে-ই পত্নী।

পরমব্রহ্ম শক্তিই হলেন সগুণ ব্রহ্মের কারণ। সগুণ ব্রহ্মের অন্তর্ভুক্ত হল সমগ্র দেবদেবীতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব ও সৃষ্টিতত্ত্ব। এই শক্তি নিজেকে অভিনবভাবে ব্যক্ত করেন এবং সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে নিজেই তা নিয়ন্ত্রণ করেন।

বৈচিত্র্যময় বিশ্বসৃষ্টির মূলে এক ব্রহ্মশক্তিই বিদ্যমান। এই শক্তিই সমগ্র দিব্যভাব, অধ্যাত্মভাব, অধিদৈবভাব এবং অধিভূতভাব ও রূপের নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ; আবার তিনিই সমগ্র কার্য ও তার ফল। তিনিই হলেন স্বয়ং মহানিয়তি—সমগ্র সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রী।

ব্যক্ত-অব্যক্ত, মূর্ত-অমূর্ত, দ্বৈত-অদ্বৈত, নির্গুণ-সগুণ এই সব ভাবকে অবলম্বন করেই তিনি নূতন ভঙ্গিমায় লীলায়িত হন এবং স্বয়ং এই লীলাকে বরণ করে নেন অর্থাৎ আস্বাদন করে নিজের মধ্যে মিলিয়ে নেন। এ-ই তাঁর খেয়াল স্বভাব বা ইচ্ছা। এ-ই তাঁর স্বরূপ। মাতা-পিতা, পুত্র-কন্যা, ভ্রাতা-ভগ্নী, বন্ধু-বান্ধব, শত্রু-মিত্র, পতি-পত্নী প্রভৃতি বেশে সেই ব্রহ্মশক্তিই (আদ্যাশক্তি) স্বয়ং লীলা করেন এই সংসারে।

যাকে মাপা যায় না তাই মাতা। অথবা যিনি মাফ করে দেন, ক্ষমা করে দেন, তিনিই মাতা। যিনি সবকিছুকে প্রকাশ করে তা আবার নিজের মধ্যে ধারণ করে পালন করেন ও পূরণ করেন তাঁকেই মাতা বলে। সৃষ্টির মন্ত্ররূপে তিনিই পিতা, তন্ত্ররূপে মাতা এবং যন্ত্ররূপে পত্নী। মন্ত্র, তন্ত্র ও যন্ত্র এই তিনের সম্মিলিত রূপই হল ব্রহ্ম, আত্মা, ঈশ্বর অথবা ব্রহ্মশক্তি, আত্মশক্তি ও ঈশ্বরশক্তি।

এক ভাবে যিনি পত্নী অপর ভাবে তিনিই মাতা। কারণার্থে তিনি মাতা, সূক্ষ্মার্থে পত্নী এবং স্থূলার্থে কন্যা ও ভগ্নী প্রভৃতি। সর্ব শক্তি, জ্ঞান ও আনন্দের সমষ্টিই হল ব্রহ্মের শক্তি। এ ব্রহ্মের সঙ্গে নিত্যযুক্ত। শক্তি বিনা পূর্ণতা লাভ হয় না।

মা ও গুরুর গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য

মায়ের অন্য এক ভাব ও মূর্তির নাম হল গুরু। মায়ের মত সন্তানের মঙ্গল কামনা গুরু ছাড়া আর কেউ করতে পারে না। সন্তানের অভাব মা যেমন জানেন গুরুও ঠিক সেইরকম জানেন।

সমর্পণের তাৎপর্য

আহুতি দান হল আত্মার স্বভাবধর্ম। বিশ্বের সর্বত্রই তা পরিলক্ষিত হয়। সমর্পণের মাধ্যমেই সবকিছু পরিণতি লাভ করে। সমর্পণের মাধ্যমে অব্যক্ত নির্গুণ হতে সগুণের বৈচিত্র্যময় অভিব্যক্তি হয়। আবার সগুণের মাধ্যমেই অভিব্যক্তি সকল অব্যক্তে ফিরে যায়। বিশ্ব সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার সমর্পণরূপ যজ্ঞের মাধ্যমেই অনুষ্ঠিত হয়। এই সমর্পণ নীতি হল বিশ্বদেবের ধর্ম, সুতরাং সর্ব প্রকৃতিরই ধর্ম।

সৃষ্টিবিজ্ঞানের অনুলোম ও বিলোম গতি

বিলয়কালে বা প্রলয়কালে বিলোমক্রমে সপ্তম স্তর স্থূল পঞ্চভূত ও ইন্দ্রিয়ের বিষয় ষষ্ঠ স্তরে অর্থাৎ বহিরিন্দ্রিয়ে বিলীন হয়, ষষ্ঠ স্তর বহিরিন্দ্রিয় পঞ্চম স্তর অন্তরিন্দ্রিয়ে বিলীন হয়, অন্তরিন্দ্রিয় চতুর্থ স্তর পঞ্চ তন্মাত্রায় ও পঞ্চ সূক্ষ্মমহাভূতে বিলীন হয়, পঞ্চ তন্মাত্রা ও পঞ্চ সূক্ষ্মমহাভূত তৃতীয় স্তর অহংকার তত্ত্বে বিলীন হয়, অহংকার তত্ত্ব দ্বিতীয় স্তরে মহত্তত্ত্বে (আত্মায়) বিলীন হয় এবং অবশেষে মহত্তত্ত্ব অব্যক্তে বিলীন হয়। অব্যক্ত পরমপুরুষ ও পরমব্রহ্মের সঙ্গে নিত্যযুক্ত থাকে।

মহাকারণ থেকে অনুলোমক্রমে সূক্ষ্মতর রূপে সর্ব কার্য ও কারণ নেমে আসে। সূক্ষতর আবার কার্য ও কারণ রূপে সূক্ষ্মে নেমে আসে। সূক্ষ্ম কার্য-কারণ রূপে স্থূলে নেমে আসে। বিপরীত ক্রমে বা বিলোম ক্রমে ক্ষুদ্র ও স্থূল, সূক্ষ্ম বা বৃহতের মধ্যে, সূক্ষ্ম কারণ বা বৃহত্তরের মধ্যে, কারণ আবার মহাকারণ বা বৃহত্তমের মধ্যে বিলীন হয়ে যায়। ক্ষুদ্র সান্ত ও সসীম থেকে মহান অনন্ত ও অসীমের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে মিশে এক হয়ে যাবার বিজ্ঞান নমস্কারের মধ্যে নিহিত আছে। সেইজন্য নমস্কারের চারটি স্তর—'নমস্তস্মৈ, নমস্তস্মৈ, নমস্তস্মৈ নমো নমঃ।' এই হল প্রণামের রহস্য ও তাৎপর্য।

স্থূল দেহবোধই হল ইন্দ্রিয়বোধ। এ-ই ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে সবকিছু মনের কাছে সঁপে দেয়। মন দেয় বুদ্ধির কাছে, বুদ্ধি দেয় মহাপ্রাণরূপী সমষ্টিবুদ্ধি বা আত্মার কাছে। মহাপ্রাণের সঙ্গে মিলিত হয়ে সমগ্র সমর্পিত বস্তু মহাপ্রাণময় তথা বোধময় হয়ে অখণ্ড আত্মময় হয়ে যায়। মহাপ্রাণ দেয় অব্যক্তের কাছে সঁপে, অব্যক্ত পরমাত্মা পরব্রহ্মের কাছে নিজকে সঁপে দিয়ে পরম অব্যক্তে লীন হয়, অর্থাৎ তখন শুধু ব্রহ্মই স্বয়ং প্রকাশমান থাকেন।

তৃতীয় গুরুমূর্তি হল মহাপ্রাণ বিশ্বপ্রাণ বা আত্মা।

কেবল জ্ঞানমূর্তির সঙ্গে একীভূত না হওয়া পর্যন্ত কোন ব্যষ্টিসত্তার পূর্ণতা লাভ হয় না।

নমস্কারের তাৎপর্য

নমস্কারের তাৎপর্য হল পরিণত হওয়া। পরিণত অর্থ হল পরি+নত। 'পরি' হল শ্রেষ্ঠ এবং 'নত' হল শ্রেষ্ঠকে আত্মদান বা সমর্পণের মাধ্যমে বরণ করা বা গ্রহণ করা। তার ফলে গ্রহীতা বা সমর্পিতের মধ্যে শ্রেষ্ঠের পূর্ণ অভিব্যক্তি হয়। একে পরিণতি বা পরিণাম বলা হয়।

মাতৃতত্ত্বের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

সর্ব রূপ, নাম, ভাব ও বোধে মা নিজেই স্বয়ং প্রকাশিত। শব্দরূপেই মা নিজেকে প্রথম প্রকাশ করেন। এ-ই হল প্রণব বা ওঁকার। এই প্রণব ওঁকারই হল সমগ্র বিশ্বসৃষ্টির কেন্দ্র ও কারণ। এর থেকে সব সৃষ্টির অভিব্যক্তি, এর দ্বারাই সব সৃষ্টি বিধৃত এবং এর মধ্যেই আবার তাদের লয় হয়।

প্রণব বা ওঁকারই হল সমস্ত শব্দের কেন্দ্র। শব্দই হল সৃষ্টির জননী। শব্দ হতেই সবকিছুর সৃষ্টি হয়েছে। সর্বনামের মূলে কেন্দ্রে ওঁ মা, সর্বরূপের মূলে ওঁ মা, সর্বগতির মূলে ওঁ মা এবং সর্ববোধের মূলে ওঁ মা।

আপনবোধের বৈশিষ্ট্য

সর্ব প্রকাশবিভূতি ও মহিমার অভিব্যক্তির সঙ্গে আপনবোধের সম্বন্ধ বা অনুভূতি না হওয়া পর্যন্ত জীবনের চাওয়া শেষ হয় না এবং 'আমি'-ও তুষ্ট হয় না। স্থূল বস্তুর থেকে চাওয়া আরম্ভ হয়। সপ্তম ভূমিতে গিয়ে তার পরিসমাপ্তি হয়। বোধের সপ্তম ভূমিতে পূর্ণানুভূতি ও পূর্ণতা লাভ হয়। পূর্ণতা লাভ না-হওয়া পর্যন্ত চাওয়া কোন না কোন প্রকারে চলতেই থাকে। সপ্তম ভূমিতে পূর্ণতা লাভ করার পরে অষ্টম ভূমিতে জীব হয় ভগবানস্বরূপ, ঈশ্বরস্বরূপ সদ্‌গুরু। তখন সে-ই হয় আত্মা, পরমাত্মা, ব্রহ্ম, পরব্রহ্ম।

সপ্তভূমির তাৎপর্য

সপ্তভূমিকেই বলা হয় সপ্তসত্য। বিশ্বমাতা তাঁর সন্তানকে সপ্তরাজ্য প্রদান করেন। দেহের অভ্যন্তরে এই সপ্তরাজ্য স্থূলদেহ, মাংস, রক্ত, অস্থি, মজ্জা, মন ও বোধ। এই সবগুলির সার হল 'ওজঃ'। ওজঃই হল ওঁ। ওঁকারে এসে প্রাণের পূর্ণ জাগরণ হয়।

সপ্তভূমির মধ্যে স্বয়ং চিদানন্দময়ী মা ক্রিয়াশীল রূপে স্বমহিমায় নিত্যবিদ্যমান। তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত সক্রিয় লীলাই এই সপ্তব্যাহৃতি[১] রূপে সতত প্রকাশমান। সপ্তভূমির ঊর্ধ্বে হল অষ্টম ভূমি অর্থাৎ নিত্য অব্যক্ত অমৃতময় অদ্বয় সত্তা। মহাপ্রাণ অষ্টম ভূমিতেও সমভাবে বিদ্যমান্। সেইজন্য বলা হয় এ সর্বব্যাপী, সর্বধারী, সর্বত্রগো, মহান।

সকলের ভিতরে বোধরূপে, প্রাণরূপে মা-ই আছেন এবং মা-ই সর্বকর্ম সম্পাদন করেন।

তুরীয়তে প্রকৃতি অব্যক্ত, লীলাতে আমি প্রকৃতির সাথী। প্রকৃতির অষ্টশক্তি আমিরূপ আত্মা বা কৃষ্ণকে কেন্দ্র করে আটটি বৃত্তাকারে প্রকাশ পায়। এই আটটি প্রকৃতিশক্তির পরিচয় রাসমণ্ডলের বর্ণনায় বিশেষভাবে পাওয়া যায়। এখানে আমির কোন কর্তৃত্ব নেই, মা-ই একমাত্র কর্তা, ভোক্তা ও জ্ঞাতা। মায়ের সর্বময় কর্তৃত্বের মধ্যে অহংকার দ্বারা নিজে পৃথক কর্তা সাজতে গিয়েই সকলে যত দুঃখকষ্ট ভোগ করে। প্রকৃতির কর্তৃত্ব পুরুষে আরোপিত হলে পুরুষ কর্মফলের বন্ধনে পড়ে। কর্তাবোধে হয় বন্ধন এবং অকর্তাবোধে হয় মুক্তি। পুরুষ বা আমি হল আত্মা। এ নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত। প্রকৃতি হল শক্তি। এ ক্রিয়াশীল ও নিত্য পরিবর্তনশীল। ত্রিগুণের সাম্য অবস্থাই হল অব্যক্ত প্রকৃতি। একেই আদি কারণ বলা হয়। গুণের বৈষম্যই হল সৃষ্টির কারণ। গুণের আসক্তি হল বন্ধন, অর্থাৎ গুণসঙ্গই হল বন্ধন এবং গুণের বিচ্ছেদ হল মুক্তি। বন্ধন ও মুক্তি হল প্রকৃতির বিশেষ ধর্ম। আত্মার কোন বন্ধন ও মুক্তি নেই। প্রকৃতি অনন্ত ও স্বাধীন বটে কিন্তু পুরুষকে বাদ দিয়ে সে লীলা করতে পারে না।

কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, জ্ঞাতৃত্ব সবই প্রকৃতির, পুরুষের নয়। কিন্তু পুরুষ যদি কর্তৃত্বের অভিমান করে তবে সেখানে বিকার উপস্থিত হয়। এই কর্তৃত্বাদি ভাব প্রকৃতিকে সমর্পণ করে দিলে অথবা প্রকৃতি স্বেচ্ছায় পুরুষকে মুক্ত করে দিলে পুরুষ প্রকৃতির বন্ধন হতে মুক্ত হতে পারে। প্রকৃতির সাহায্যেই সর্ববিধ বিকার শোধন করতে হয়। প্রকৃতির সাহায্য ছাড়া কোনপ্রকার সাধনভজন সম্ভব হয় না। প্রকৃতির কৃপা ব্যতীত সাধনার সিদ্ধিও হয় না। প্রকৃতি সাধনার শক্তি যুগিয়ে দেয় এবং সাধনার ফলও হাতে তুলে দেয়।

১। ভূঃ, ভুবঃ, স্বরঃ, মহঃ, জন, তপঃ, সত্য— এই সপ্তস্বর্গ। সপ্ত নরক হল—তল, অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল। সব মিলেই চতুর্দশ ভুবন।

তত্ত্বত পুরুষের বন্ধনও নেই এবং মুক্তিও নেই। সে নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত অজর অমর অপাপবিদ্ধ। বন্ধনমুক্তি হল প্রকৃতির লীলা, মানস কল্পিত অর্থাৎ মনের সৃষ্টি।

আত্মতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্বের মধ্যে ভেদাভেদ

বিশুদ্ধ বোধস্বরূপ আত্মা নিত্য গুণাতীত, ভাবাতীত ও ভেদাতীত। তাঁর স্বভাবশক্তি মন কল্পনার মাধ্যমে বন্ধন মুক্তি সৃষ্টি করে খেলা করে। আত্মা ও তাঁর প্রকৃতির মধ্যে এইরূপ পার্থক্য বা বিবেকখ্যাতিকেই যথার্থ তত্ত্বজ্ঞান বলে। এই তত্ত্বজ্ঞানের জ্যোতিতে বন্ধন ও মুক্তিরূপ মনোকল্পিত সৃষ্টি মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়। সমগ্র সৃষ্টি স্বপ্নবৎ মিথ্যা। একমাত্র ব্রহ্মাত্মৈক্য জ্ঞানই সত্য। এ-ই হচ্ছে জ্ঞানী ও যোগীর লক্ষ্য। জ্ঞানী হল অদ্বৈতবাদী। ভক্ত ও যোগী প্রধানত দ্বৈতবাদী। তারা প্রকৃতি বা শক্তির খেলাকে মিথ্যা না বলে ভগবানের লীলা অভিনয় বলে গ্রহণ করে এবং তদনুরূপ অনুভূতি লাভের চেষ্টা করে। ভক্ত করে আস্বাদন এবং জ্ঞানী করে স্বরূপে অবস্থান।

কর্তৃত্ব অহংকারই হল যত দুঃখকষ্টের মূল কারণ; আবার এরই সাহায্যে সম্যক্ ব্যবহারের দ্বারা জীব গুণমুক্ত হয়ে অমৃতময় দিব্যজীবনের অধিকারী হয়। গুণমুক্ত হবার জন্য সকল কর্তৃত্বভার পরমাপ্রকৃতি মাতাকেই সমর্পণ করে দিতে হয়।

অখণ্ড এক আমিবোধে প্রতিষ্ঠিত হতে হলে সব কিছু আমির মধ্যে মিলিয়ে নিতে হয়। সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ, পাপ-পুণ্য প্রভৃতি যেখানে যা কিছু আছে সবকিছুর অধিষ্ঠান রূপে আমিকে মানতে হয় ও জানতে হয়।

মাতৃবোধে ঈশ্বরের কাছে সব সঁপে দেওয়া বা সমবোধে গ্রহণ করা হল 'দিব্যজীবন লাভের অন্যতম সহজ বিধান'[১]। সমর্পণকালে সচেতনভাবে ঈশ্বর বা মাকে নিবেদন করে বলতে হয়—'মাগো, তোমার সাধনা তুমি কর। তোমাকে তুমি গ্রহণ কর, তোমাকে তুমি জান। তুমিই তুমিময় হয়ে যাও। তোমাকে জানব এই অহংকার তুমি দিও না'। এইভাবে জানা বোঝার চেষ্টা বিসর্জন দিয়ে পরিপূর্ণভাবে মাকে সবকিছু সমর্পণ করে দিতে হয়। বেদনাহত মনে প্রার্থনা করতে হয়—'হে গুরু, হে মাতা! তুমিই আমার উপায় এবং তুমিই আমার উপেয়, তুমি সাধনা, তুমি সাধক এবং তুমিই সিদ্ধি বা সাধনার ফল। জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, জ্ঞান সব তুমিই স্বয়ং।'

'প্রাণাৎ হি প্রাণম্, প্রাণেন প্রাণম্, প্রাণায় হি প্রাণম্, প্রাণস্য প্রাণম্, প্রাণে প্রাণে প্রাণময়ম্।' এই হল মহাপ্রাণের তত্ত্ব। এই মহামন্ত্র হল প্রাণের যথার্থ পরিচয়।

যে দেয়, সে-ই নেয়। আবার যে নেয়, সে-ই দেয়। সবকিছু এক প্রাণচৈতন্যেরই ধর্ম।

অন্তরে প্রাণরূপে বসে সে একবার শ্বাস গ্রহণ করে আবার প্রশ্বাস রূপে বাইরে তা ত্যাগ করে বা ঢেলে দেয়। অর্থাৎ বাইরে থেকে প্রাণকে সে অন্তরে গ্রহণ করে আবার অন্তর থেকে প্রাণকে সে বাইরে ছড়িয়ে দেয়। এইরূপ দ্বিবিধ প্রাণের ক্রিয়াকে 'হংস' ক্রিয়া বলে। এই হংস ক্রিয়াই হল অজপা জপের লক্ষণ। হংসরূপী প্রাণ নারায়ণ হল নাদাত্মা। এই নাদাত্মাকেই বিজ্ঞানাত্মা বলা হয়। বিজ্ঞানাত্মার দ্বিবিধ রূপ হল বিশ্বাত্মা ও জীবাত্মা। ক্রিয়াশীল প্রাণই হল নাদাত্মা। ব্যষ্টি নাদের কেন্দ্র হল বিন্দু বা জ্যোতি এবং পরিধি হল ধ্বনি ও শক্তি। এই নাদের বিস্তার অর্থাৎ শক্তির বিস্তার বিশ্বসংসার এবং তার কেন্দ্র হল বিন্দু বা আত্মা। জীবের হৃদয়কেন্দ্রে হল জীবাত্মা। এ বিন্দুরূপে বিরাজিত এবং জীবভাব হল শক্তি বা প্রাণনাদের বিস্তার বা প্রকৃতি। সমগ্র বিশ্বের কেন্দ্রে অবস্থিত হল বিশ্বাত্মা বা বোধসিন্ধু। বিশ্বপ্রকৃতি হল নাদ বা প্রাণের সর্বোত্তম বিস্তার।

সর্ব সমর্পণের ফলে ভেদজ্ঞানের অবসান হয়। তখন সমষ্টি প্রাণের সঙ্গে সমর্পিত ব্যষ্টি প্রাণের অখণ্ড মিলন হয়। এইভাবেই ব্যষ্টি প্রাণ বা জীব অখণ্ড সত্যস্বরূপে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। [৩।৬।৬৮]

১। তত্ত্বানুভূতির দৃষ্টিতে।

আত্মবিস্মৃতির কারণ

মহাপ্রাণের বাইরে গেলেই মৃত্যু, মাকে ছাড়লেই মৃত্যু। মাকে ছাড়িয়ে দেয় কামনা, বাসনা, খ্যাতি, যশ, মান, বিদ্যা, বুদ্ধি, অহংকার প্রভৃতি। তার ফলে জীবনে আরম্ভ হয় বিপরীত গতি। তখন মাকে সে অবহেলা করে এবং প্রাণের মর্যাদা হারায়। যে-ছেলের মতিগতি থাকে বাইরের দিকে সে-ছেলে ঘরে এসে যেমন মা-বাবার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করতে পারে না সেই রূপ বহির্মুখী বা দেহগত মনও প্রাণের মর্যাদা দিতে পারে না। আবেগের আতিশয্যে সে প্রাণের অবহেলা করে।

প্রাণকে ধরে রাখা বা প্রাণের মর্যাদা দেওয়াই হল আসল ধর্ম। জগতের একমাত্র সত্যবস্তু, অদ্বয়, অব্যয়, নিত্যবস্তু হল অখণ্ড মহাপ্রাণসত্তা বা চৈতন্যসত্তা।

মাতৃরূপের প্রকারভেদ

এই স্থুল জগতের মাতাই হল সূক্ষ্মে জগদ্ধাত্রী মাতা বা জগৎজননী। এই মায়ের আর এক রূপ দেশমাতৃকা। মায়ের তৃতীয় মূর্তি হল মহাপ্রাণ বা বিশ্বাত্মা এবং চতুর্থ মূর্তি হল অখণ্ড প্রজ্ঞান বা পরমাত্মা, পরব্রহ্ম বা পরমেশ্বর। বিশ্বমাতা হল সচ্চিদানন্দের বিজ্ঞানময় রূপ এবং পরমাত্মা হল সচ্চিদানন্দের প্রজ্ঞানময় রূপ।

শ্রবণের মাহাত্ম্য

শ্রবণের মাধ্যমে শুরু হয় শিক্ষা ও দীক্ষা। যথার্থ শ্রবণ না হলে দীক্ষা হয় না। অনুভবসিদ্ধ মহাত্মা, মহাপুরুষ বা সদ্‌গুরুর মুখে প্রাণের মহিমা শুনতে হয়।

ভগবানের সঙ্গে জীবের সম্বন্ধ, ভক্তি ও ভালবাসার মাধ্যমে সহজে অনুভূত হয়। সর্বব্যাপক ঈশ্বর সর্বত্র বিরাজমান। সর্ব প্রকাশরূপেই ঈশ্বর স্বয়ং বিদ্যমান।

শান্তি ও সুখ নিরপেক্ষ আত্মধর্ম

বহির্জগৎ পরিবর্তনশীল বলে তা থেকে অখণ্ড সুখশান্তি কোনদিনই পাওয়া সম্ভব নয়। অনাবিল সুখ ও শান্তি, বস্তুসাপেক্ষ নয়। আপন হৃদয়ে তা পূর্ণমাত্রায় নিহিত আছে। সুসংযত অন্তরমুখী মনের দ্বারা প্রাণচৈতন্যের সঙ্গে অখণ্ড মিলন হলে আপন হৃদয়ে ভূমা সুখশান্তির সন্ধান মেলে।

একাত্ম দৃষ্টিতে বহুরূপী মায়ের পরিচয়

ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন ও বুদ্ধি মহাপ্রাণরূপী চিদাত্মারই প্রকাশমাধ্যম বা কারণ। এগুলির মধ্যে প্রাণচৈতন্যই খেলা করে। সুতরাং এগুলি চিতিমাতারই বিশেষ অভিব্যক্তি মাত্র। চৈতন্যময় মহাপ্রাণের বক্ষে যা কিছু জাত হয় এবং প্রকাশিত হয় তার মধ্যে প্রাণমাতাই স্বয়ং বিরাজ করে। স্ববোধের দৃষ্টিতে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই হল অখণ্ড মহাপ্রাণ সচ্চিদানন্দময়ী মা। সুতরাং সমগ্র বিশ্বের কেন্দ্রে অন্তরে ও বাইরে বৈচিত্র্যময় যত রকম প্রকাশ আছে তা আত্মচৈতন্য প্রাণমাতারই বিশেষ অভিব্যক্তি মাত্র। সমগ্র পঞ্চভূত তথা মাটি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ—সবই মায়ের প্রকাশরূপ। আবার চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, প্রাকৃতিক শক্তিরূপে মা স্বয়ং। অন্তরের ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, বুদ্ধি ও বিজ্ঞানাত্মারূপে হৃদয়ে যা অনুভূত হয় সবই আত্মারূপী মায়ের পরিচয়। স্থূলরূপেও মা, সূক্ষ্মরূপেও মা, সূক্ষ্মতর কারণরূপেও মা, আবার সূক্ষ্মতম মহাকারণরূপেও মা। সব মিলেই হল সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মা। এই চৈতন্যময় আত্মাই হল মায়ের পরিচয়। স্থূলরূপে যা কিছু প্রতীয়মান হয় তাও মাতা; কারণ এ থেকেই সকলে

পুষ্টি ও তুষ্টি লাভ করে। পুষ্টি ও তুষ্টি মায়ের দুই নাম। প্রাণেতেই পুষ্টি এবং প্রাণেতেই তুষ্টি। এই মাকে ভুলে গেলে অন্বেষণ করতে হয়।

ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম—সব মায়েরই রূপ। সর্ব রূপ, নাম, ভাব, বোধে স্বয়ং মাতাই বিরাজিতা। সর্বত্র বিরাজিতা এই সচ্চিদানন্দময়ী মাকে না মেনে যথার্থ আমির পরিচয় পাওয়া যায় না।

অহংদেব আত্মারই পরিচয়

বিশুদ্ধ বোধময় আত্মার স্বরূপই হল আমি বা অহংদেব। তা অখণ্ড অনন্ত নিত্যপূর্ণ সর্বাধিষ্ঠান। সর্ববোধের কেন্দ্রে অবস্থিত সর্ব অনুভূতির সাক্ষী এই আমি। চিতিমাতা ও আমি এক তত্ত্ব। এই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত বোধই হল শিববোধ, ব্রহ্মবোধ, আত্মবোধ, গুরুবোধ বা ঈশ্বরবোধ। খণ্ডবোধে খণ্ড আমি হল জীবভাব। জীবভাবের কর্তা আমি নয়—অহংকার। অকর্তাবোধে অহংকারের প্রভাব থাকে না, তখন অহংদেবের অর্থাৎ বিশুদ্ধ আত্মার আমি বা শিবের আমি অথবা মায়ের আমি বা গুরুর আমি স্বতঃস্ফূর্ত সমবোধের মাধ্যমে অভিব্যক্ত হয়।

'আমি'-র আমি পরিচয়

অহংকারই হল মানবের আসল শত্রু। অহংকারই ভুলিয়ে দেয় মাকে, গুরুকে, আত্মাকে বা ব্রহ্মকে। অহংকার নাশের জন্যই ত্বংকারের দরকার। অহংকারের আমি বন্ধনের কারণ, কিন্তু ত্বংকারের আমি হল মুক্তির কারণ। মায়ের আমি, আত্মার আমি, ঈশ্বরের আমি, গুরুর আমি বা ব্রহ্মের আমিই হল আমির আমি। একেই ত্বংকারের আমি বলা হয়। ত্বংকারের আমি হল অখণ্ড, পূর্ণ, সচ্চিদানন্দস্বরূপ এবং অহংকারের আমি হল বুদ্বুদের মত সসীম, বিকারী ও অস্থায়ী।

পরমাত্মার আমি মাতাপিতা, বন্ধুবান্ধব, পরাবিদ্যা ও সর্বনিয়ন্তা। সর্বজীবন তাঁর প্রকাশসন্তান বা অংশ এবং তাঁরই (আমিরই) বক্ষে আজীবন বাস করে।

সত্য মায়ের সত্য পরিচয়

মা স্বয়ং জ্ঞান ও ভক্তি উভয়ই। মা-ই হলেন সকলের আশ্রয়, সকলের উপায় ও উপেয় স্বয়ং। মা-ই হলেন পরমাগতি, শরণাগতি, প্রগতি, প্রজ্ঞাস্থিতি, মুক্তি, শান্তি ও স্বানুভূতি।

জগন্মাতার আশ্রয়ই হল সকলের পক্ষে নিরাপদ ও শান্তিময়। মা না-হলে সন্তানের মর্যাদা নেই, আবার সন্তান না-থাকলে মায়েরও মর্যাদা নেই। জাত মাত্রই সকলে সন্তান; নির্ভর করা ছাড়া তার উপায় নেই। জন্মমাত্রই সকলে সমর্পিত হয়ে আছে মায়ের কাছে। মায়ের নামই হল মায়ের আশ্রয়। ঈশ্বরের নামই হল ঈশ্বরের রূপ এবং ঈশ্বরের রূপই হল ঈশ্বরের নাম। তাঁর নামই হল প্রাণ, প্রাণই তাঁর নাম। প্রাণই হল প্রজ্ঞা, প্রজ্ঞাই হল প্রাণ। তার নামই হল ভাব এবং ভাবই হল নাম। তাহলে নামই হল প্রজ্ঞা এবং প্রজ্ঞাই হল নাম। অর্থাৎ ভাবই হল প্রজ্ঞা এবং প্রজ্ঞাই হল ভাব। প্রজ্ঞাই হল বোধ এবং বোধই হল প্রজ্ঞাচৈতন্য। সুতরাং ভাবই হল বোধ এবং বোধই হল ভাব। প্রজ্ঞাই হল আত্মা অর্থাৎ বোধই হল আত্মা। সুতরাং সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমাত্মার রূপ, নাম, ভাব, বোধ সমার্থবোধক ও অমৃতময়। নিত্যবস্তুই হল অমৃতময়। যা অমৃতময় তা-ই পরম সত্য। পরম সত্যের রূপ, নাম, ভাব, বোধও পরম সত্য। এইভাবে পরমাত্মবক্ষে পরমাত্মার অনুভূতি স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশমান।

যজ্ঞের তাৎপর্য

প্রাণচৈতন্যের বক্ষে প্রাণের ক্রিয়াই হল নাম। এই নামই হল যজ্ঞ। এই যজ্ঞ দুই ভাগে বিভক্ত। অন্তরে হল ভাবময় যজ্ঞ এবং বাইরে হল কর্মময় যজ্ঞ। এক অখণ্ড সত্যই রূপে, নামে, ভাবে, বোধে সর্বত্র প্রকাশমান।

শ্রদ্ধার তাৎপর্য

শ্রদ্ধা হল মাতা। শ্রদ্ধারূপ মাতৃসঙ্গ হলে তবেই মায়ের আর একটি রূপ, জ্ঞান বা বোধ লাভ হয়। জ্ঞান বা বোধ লাভ হলে সত্য লাভ হয়, অর্থাৎ মায়ের সঙ্গে যুক্ত হয়। যথার্থ জ্ঞান হল অখণ্ড মাতৃস্মৃতি, অখণ্ড গুরুস্মৃতি, অখণ্ড আত্মস্মৃতি। একেই অদ্বয়জ্ঞান বলা হয়। অদ্বয়জ্ঞানের অর্থ হল অভেদ অখণ্ড বোধের স্মৃতি।

ঋষি শব্দের গূঢ়ার্থ

ঋষি শব্দকে উল্টা করলে বা পুনঃপুনঃ ঋষি উচ্চারণ করলে হয় সিঁড়ি অর্থাৎ ধাপ। ঋষ্ ধাতুর অর্থ সর্বগতি ও সর্বজ্ঞান। সর্বত্র গতি ও সর্বজ্ঞান যাঁর হয় তাঁকেই ঋষি বলে। ঋষি অনুভূতি দ্বারা সর্বত্র গমন করতে পারেন ও সব কিছু দেখতে পারেন বলে তাঁকে দ্রষ্টা বলা হয়।

শ্রবণ-মননাদির মর্মার্থ

শ্রবণই হল সকলের প্রথম আহার। দ্বিতীয় আহার হল বিচরণ করা অর্থাৎ শ্রুত বিষয়ের মধ্যে বিহার করা। বিচরণ করা অর্থ হল বিশেষরূপে চরে বেড়ানো। সত্যের প্রসঙ্গ বা ঈশ্বর প্রসঙ্গ বা আত্মবিজ্ঞান অথবা ব্রহ্মবিদ্যা সদ্গুরু-আচার্য মুখে নিয়মিত শ্রবণ করাকে সত্যের আহার (আহরণ) বলে। এই সত্যের আহারই হল সত্যকে একনিষ্ঠ মনে গ্রহণ করা। তারপরে সেই বিষয়ে যথাশ্রুত মনন করা। প্রথমে শ্রবণের মাধ্যমে সত্যকে মনে গ্রহণ করা ও ধারণ করা তারপরে নিয়মিত ভাবে শ্রুত সত্যের স্মৃতিকে মন্থন করা বা তার জাবর কাটা অর্থাৎ তার মধ্যে পুনরায় মনোনিবেশ করা। তাহলেই সত্য বিহার করা হয়। একেই সত্যের মনন বলে। এই মনন বা বিহার নিয়মিতভাবে অভ্যাসের ফলে যখন দীর্ঘকাল ধরে নিরবচ্ছিন্ন ধারায় সেই স্মৃতি প্রবাহিত হতে থাকে তাকে যথার্থ ধ্যান বা নিদিধ্যাসন বলে। এইরূপ ধ্যানে মন ধ্যেয় বস্তুর সঙ্গে মিশে তাদাত্ম্য লাভ করে। তখন অন্য চিন্তা বা ভাব সেই মনে প্রবেশ করতে পারে না। প্রগাঢ় ধ্যানই হল নিদিধ্যাসন। তার ফল হল সমাধি বা সমজ্ঞান। এই সমজ্ঞানই হল গুরুমুখে সৎপ্রসঙ্গের প্রতিপাদ্য বিষয়। এই হচ্ছে সত্যের স্বরূপ, ঈশ্বর আত্মা ও ব্রহ্মের স্বরূপ। এ নিত্য অমৃতময় অখণ্ড পূর্ণ আনন্দ মুক্তি শান্তির স্বরূপ। তৃতীয় আহার হল আহার্য বস্তুর সঙ্গে এক হয়ে মিশে যাওয়া অর্থাৎ শ্রুতবস্তুর সঙ্গে এক হয়ে তাদাত্ম্য লাভ করা। যেমন সিন্ধুর মধ্যে জলবিন্দু এক হয়ে যায়।

ঋষিদৃষ্টিতে বিচারের তাৎপর্য

স্থূলবস্তু হতে শুরু করে চৈতন্য পর্যন্ত সব কিছুর মধ্যে ঋষি মন বিচরণ করে। এই হল যথার্থ বিচার। তর্ক করা বিচারের আসল অর্থ নয়।

লীলাময়ী মায়ের নৃত্যের ছন্দই হল কর্ম[১]

কর্ম হল প্রাণরূপী মায়ের নৃত্য। প্রাণের মধ্যে লীলাময়ী মা ছন্দে ছন্দে, তালে তালে, ধাপে ধাপে, সিঁড়ি তৈরি করে নেমে আসেন অর্থাৎ অভিব্যক্ত হন। সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টারূপে মা-ই ব্রহ্মা, স্থিতির মধ্যে পাতারূপে মা-ই বিষ্ণু এবং সংহারের মধ্যে সংহর্তারূপে মা-ই রুদ্র। সৃষ্টি-স্থিতির মধ্যে যেমন আনন্দ আছে ধ্বংসের মধ্যেও তেমন আনন্দ আছে। আনন্দ ছাড়া সৃষ্টি-স্থিতি-ধ্বংস কখনওই সম্ভব হয় না। কোন কর্ম বা প্রকাশ আনন্দ বাদ দিয়ে হতে পারে না। আনন্দই সর্ব কর্ম ও প্রকাশের মূল কারণ। সৃষ্টি ও ধ্বংস পরস্পরের বিরোধী নয় বরং পরস্পর পরস্পরের সম্পূরক ও পরিপূরক। উভয়কে ধারণ করে রাখে স্থিতি। স্থিতির একদিকে সৃষ্টি ও অপরদিকে ধ্বংস।

১। অভিনব সংজ্ঞা।

এই দুই দিক একত্র করলে সৃষ্টি ও ধ্বংস পরস্পরসাপেক্ষ ও সমান অর্থবোধক। শক্তির কেন্দ্র হল স্থিতি, দুই প্রান্ত হল সৃষ্টি ও ধ্বংস। এই তিন মিলে পূর্ণ শক্তিতত্ত্ব।

প্রাণের বক্ষে প্রাণের অভিনব লীলামাধুর্য

প্রাণ হতে প্রাণের দ্বারাই প্রাণ সৃষ্ট হয়, প্রাণের দ্বারা প্রাণ বর্ধিত হয়, আবার প্রাণের মধ্যেই প্রাণ লীন হয়। সৃষ্টি, স্থিতি ও ধ্বংস হল প্রাণস্বরূপের ত্রিবিধ অভিব্যক্তি মাত্র। প্রাণের উপরই প্রাণ প্রতিষ্ঠিত। নিম্ন পর্যায়ের প্রাণ হল উন্নত পর্যায়ের প্রাণের আহার। সুতরাং ক্ষুদ্র প্রাণ ও বৃহৎ প্রাণের রূপের মধ্যে সম্বন্ধ হল খাদ্য-খাদক সম্বন্ধ। প্রাণের আত্মদানের ফলেই প্রাণের সম্প্রসারণ হয়। আত্মদানের দ্বিবিধ রূপ, যথা—সৃষ্টি ও ধ্বংস। এক প্রাণের রূপ অপর প্রাণের রূপকে বিনাশ না করে জীবন ধারণ করতে পারে না। এক মহাপ্রাণেরই বিস্তার বা সম্প্রসারণ হল সমষ্টি ব্যষ্টি প্রাণ। মহাপ্রাণের সম্প্রসারণ বা বিস্তারই হল মহাপ্রাণের আত্মদান। আবার ব্যষ্টি প্রাণের বিনাশ হল ব্যষ্টি প্রাণের আত্মদান সমষ্টি প্রাণের কাছে, বৃহৎ-এর কাছে। বিস্তার কালে মহাপ্রাণ হল স্রষ্টা এবং আহার কালে সে-ই হল আবার রুদ্র। প্রতি জীবনের মধ্যেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্রের কাজ পরম্পরাক্রমে যুক্ত। খাদ্য প্রস্তুত কালে প্রত্যেকেই স্রষ্টা, ভোজনকালে প্রত্যেকেই রুদ্র এবং সুস্থতা, স্থিতি ও আরামকালে প্রত্যেকেই বিষ্ণুভাবাপন্ন। স্থিতি ভঙ্গ করে বা ধ্বংস করে সৃষ্টি আরম্ভ হয়। আবার সৃষ্টিকে ধ্বংস করে স্থিতি তৈরি করা হয়। সুতরাং সৃষ্টি ও ধ্বংস হল সংহারের দ্বিবিধ রূপ। এই অর্থে সৃষ্টি ও ধ্বংস সমান। আবার অন্যভাবে ধ্বংস ও সৃষ্টি সমান অর্থবোধক। সৃষ্টি, স্থিতি, ধ্বংসের সঙ্গে প্রতি মুহূর্তে সকলেই যুক্ত আছে। এইভাবে নিত্যকাল মাতৃসন্তান মাতৃবক্ষে যুক্ত আছে।

আত্মসমর্পণের বৈশিষ্ট্য

সবই তুমিময়, আমি নয়। এই ভাবই হল আত্মসমর্পণের মূলমন্ত্র। তাহলেই কাঁচা আমি অর্থাৎ অহংকার পরিশোধিত হয়ে পাকা আমি অর্থাৎ ত্বংকারের আমি বা ঈশ্বরের আমিতে পরিণত হয়। যে সর্ব রূপ, নাম, ভাব ও বোধের মধ্যে চিন্ময়ী মাকে গ্রহণ করতে পারে সে-ই হল ঈশ্বরভক্ত সন্তান।

ভক্তিলাভের সহজ উপায়

দোষদৃষ্টি থাকলে ভক্তির বিকাশ হয় না। জীবনের সুখদুঃখ প্রভৃতিকে ভগবানের দান বা আশীর্বাদ বলে ভক্ত গ্রহণ করে। তার ফলে তার মধ্যে সে ঈশ্বরের স্পর্শ বা উপস্থিতি অনুভব করে।

মায়ের অণু হয়ে মাকে অনুভব করতে হয়। অণু হল সন্তান। মাতা কখনও সন্তানকে ত্যাগ করে না, প্রাণ কখনও মহাপ্রাণের বাইরে যেতে পারে না।

'মেনে মানিয়ে চলা'-র তাৎপর্য

সহজসাধ্য সাধনা হল আপনবোধে সব 'মেনে মানিয়ে চলা'। এ হল ভক্তি ও মাধুর্যের সাধনা।

সাধনা শব্দের তাৎপর্য

সাধনার প্রথম কথা আগে ঘর তারপরে বার। অর্থাৎ আগে অন্তরে মানা, তারপর বাইরে জানা। বাইরের জানা দিয়ে মাধুর্যের সাধনা হয় না, কোন বিকার বা ভেদজ্ঞানও যায় না। অন্তরে মানা অভ্যাস করলে বাইরের সঙ্গে সম সম্বন্ধ সহজেই তৈরি হয়।

যত বেশি মানা হবে তত বেশি জানা হবে। মানার অভ্যাস করলে জানার সুদও বাড়তে থাকে। আপনবোধে মানার ফলে প্রাণের মধ্যে প্রাণ মিশে প্রাণকে জাগায়।

সাধনা আরম্ভ করার প্রথমেই প্রয়োজন হয় শ্রবণের। প্রাণের মহিমা শ্রবণ করে অন্তর মন পূর্ণ করতে হয়। তাহলে চিত্তে পুরানো সংস্কারের প্রভাব ধীরে ধীরে কমে যায় এবং শ্রুত প্রসঙ্গের প্রভাব বৃদ্ধি পায়।

আগে স্থূল বস্তুকে অবলম্বন করেই সাধনা শুরু করতে হয়। অন্ন দ্বারাই দেহ-প্রাণ পুষ্ট হয়। সুতরাং অন্নই প্রাণমাতা, অন্নই আত্মগুরু ব্রহ্ম। মাটিতে বাস করে মাটিকে অবহেলা করা চলে না। মাটিই সকলকে ধারণ করে আছে। জগৎকে ধারণ করে আছে বলেই সে জগদ্ধাত্রী মাতা। সকলে এই জগদ্ধাত্রী মাতার সন্তান অর্থাৎ জগদ্ধাত্রী মাতা স্বয়ং। সূর্যের আলো হতে আরম্ভ করে মাটি পর্যন্ত সমগ্র প্রকৃতিশক্তিরূপে মহাপ্রাণমাতাই সর্বজীবনের নিয়ন্ত্রী, পুষ্টি, তুষ্টি, প্রীতি ও পূর্ণতা দাত্রী। ভগবানকে খুঁজবার জন্য বেশি দূরে যেতে হয় না। সকলে তাঁর কোলে প্রতিষ্ঠিত। সকলের অন্নময় স্থূলদেহকে মৃত্তিকারূপে কঠিন ও জড়ীভূত করে জগদ্ধাত্রী মাতাই ধারণ করে আছেন। মাটি হল সমগ্র ভূতশক্তির ঘনীভূত রূপ, যা অন্তরশক্তির ধারক ও বাহক। মাটি ছাড়া গতি নেই। Soil হল soul of all।

বিশ্বমাতার কোলই হল তাঁর সন্তানদের নিরাপদ আশ্রয়

বিশ্ব হল মাতৃমূর্তি। সর্বান্তঃকরণে মানতে পারলে আত্মদর্শন সহজ হয়। সৃষ্টি-স্থিতি বিনাশিনী মহাপ্রাণরূপী মাতার ক্ষুদ্র সংস্করণই ব্যষ্টি জীবদেহ। এই ব্যষ্টিদেহের মধ্যে প্রাণের গতি হল সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের গতির অনুরূপ। সকলেই আছে at Om–at Home। এই হল সকলের নিরাপদ আশ্রয়, মাতৃবক্ষ বা শাশ্বত পদ।

ব্যবহার শব্দের তাৎপর্য

ব্যবহারের[১] অর্থ হল যে-ক্রিয়ার মাধ্যমে হৃদয়ের ভাব নিষ্পন্ন হয়। এই ব্যবহার হল দ্বিবিধ, যথা—(ক) হৃদয়ের সর্বভাবকে বাইরে প্রকাশ করা, (খ) বহুভাবকে হৃদয়ে সংবরণ করা বা কেন্দ্রীভূত করা। প্রথমটি হল দ্বৈত বিজ্ঞান ও দ্বিতীয়টি হল অদ্বৈত বিজ্ঞান। ব্যবহার জানার নামই হল বিজ্ঞান। দ্বৈত বিজ্ঞান হল প্রকৃতি বিজ্ঞান বা শক্তির বিজ্ঞান এবং অদ্বৈত বিজ্ঞান হল পুরুষ বা সত্তার বিজ্ঞান। প্রকৃতির বিজ্ঞান অশুদ্ধ এবং পুরুষের বিজ্ঞান হল শুদ্ধ। অশুদ্ধ বিজ্ঞানের পরিণাম ভোগ ও বন্ধন এবং শুদ্ধ বিজ্ঞানের পরিণাম হল ত্যাগ ও মুক্তি। অশুদ্ধ বিজ্ঞানে যুক্ত হল অশুদ্ধ আত্মা এবং শুদ্ধ বিজ্ঞানে যুক্ত হল শুদ্ধ আত্মা। [৪।৬।৬৮]

ভিন্ন ভিন্ন সাধনার তাৎপর্য

সাধনার দুইটি ধারা—আমি ধরে জ্ঞানের সাধনা এবং তুমি ধরে ভক্তির সাধনা।

বিশ্বাসের পথ হল অন্যতম শ্রেষ্ঠ পথ। তার ফলে আসে নির্ভরতা। ঈশ্বরের উপর নির্ভর করলে তিনি তার ভার গ্রহণ করেন।

গুরুর সাধনাই সর্ব সাধনার সার

ঈশ্বর বা গুরুকে সর্বময় কর্তা মানা হলে নিজের কর্তৃত্ব থাকে না। কর্তৃত্ব ভাব নিয়ে আধ্যাত্মিক সাধনা ফলবতী হয় না। বিশ্বাস করে গুরুর উপর নির্ভর করাই হল সাধনসিদ্ধির শ্রেষ্ঠ উপায়।

১। অভিনব সংজ্ঞা।

কোন বিশেষ মতবাদ দ্বারা বা যুক্তিতর্ক দ্বারা, মেধা দ্বারা বা শাস্ত্র অধ্যয়ন দ্বারা সত্য বা গুরুতত্ত্ব উপলব্ধি করা যায় না। গুরু হলেন ঈশ্বরের মূর্তরূপ। তাঁর কৃপা ছাড়া তাঁকে লাভ করা যায় না।

গুরুভক্তি হল আত্মা ও ঈশ্বরোপলব্ধির সহজতম উপায়। যথার্থ গুরুভক্ত, গুরু-অনুগত, গুরুসেবাপরায়ণ ব্যক্তি শাস্ত্র অধ্যয়ন না করেও গুরুকৃপায় জ্ঞান ও ভক্তির উৎকর্ষ লাভ করতে পারে।

গুরুতত্ত্ব ও গুরুকৃপার মাহাত্ম্য

নির্ভরতার 'নির' মানে প্রাণ। প্রাণকে পূর্ণ করে নিতে হয়, তাকে ভরে নিতে হয়। বহির্জগতের প্রভাব হতে মুক্ত হওয়ার জন্য এবং অন্তর্জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য মনকে প্রজ্ঞারূপী চৈতন্যের শরণাপন্ন হতে হয়। এই প্রজ্ঞারূপী মহাপ্রাণচৈতন্যের স্বরূপই হল শ্রীগুরু স্বয়ং। গুরুর স্মরণ ও দর্শন দ্বারা মনকে গুরুমুখী করতে হয়। তাহলে গুরুর কৃপায় অন্তরে শুদ্ধভাব সত্ত্বগুণের অভিব্যক্তি সহজ হয়। গুরু শুধু ব্যক্তি রূপে সীমাবদ্ধ নন। তিনি হলেন সর্বোত্তম আদর্শ ও অনুভূতির ঘনীভূত ব্যক্তিত্ব রূপ। সমগ্র মহৎ চিন্তা ও মহৎ ভাবধারার সমষ্টি হল গুরুবোধ, অর্থাৎ best of the thoughts and best of the ideas। এক মুহূর্তের জন্যও যথার্থভাবে সদ্‌গুরুর সঙ্গ করা জীবনব্যাপী রাজ্যভোগ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। একদিনও যদি কেউ গুরুসঙ্গ করে থাকে তবে সেই স্মৃতিই তাকে যথাকালে সর্বোত্তম আদর্শের দিকে পরিচালিত করে।

সমর্পণের বিজ্ঞান, ত্যাগ-বৈরাগ্য ও ভক্তির যুগপৎ বিজ্ঞান

ভক্তিপথে বিশ্বময় অখণ্ড প্রাণের মূর্তিকে 'তুমিবোধে' গ্রহণ করে তারই আশ্রয় বা শরণ নিলে তার সঙ্গে একান্ত সম্বন্ধ হয়। যারা ত্যাগ-বৈরাগ্যবিহীন তাদের জন্য শরণাগতির পথই হল শ্রেয়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্রই পরিলক্ষিত হয় যে সর্বপ্রকাশগুলি স্বতন্ত্র নয়, পরস্পর সাপেক্ষ অর্থাৎ পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক ও সম্পূরক। প্রতিটি পূর্ববর্তী অবস্থা পরবর্তী অবস্থার কাছে নিজেকে সমর্পণ করে এগিয়ে চলে। এইরূপ সমর্পণ ক্রিয়ার মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বচক্র নিয়ন্ত্রিত হয়। এই সমর্পণ ক্রিয়ার সঙ্গে প্রত্যেকের সম্বন্ধ হল আপনবোধের সম্বন্ধ, অর্থাৎ নিজবোধের সম্বন্ধ অবগত হতে পারলেই অখণ্ডবোধের ধ্রুবাস্মৃতি হয়। তার ফলে বোধের তাদাত্ম্য লাভ হয়। একমাত্র বিশ্বচক্রের সঙ্গে নিজের তাদাত্ম্য লাভ হলেই তার বৈচিত্র্যময় প্রভাব হতে মুক্ত হওয়া যায়।

সচেতন হয়ে শ্রদ্ধা সহকারে এই গতির মধ্যে নিজেকে সমর্পণ করে দেওয়াই হল সত্যলাভের অন্যতম উপায়।

ঈক্ষণের তাৎপর্য

স্বরূপশক্তির মাধ্যমে পরমপুরুষ পরমাত্মা স্বভাব আনন্দের আতিশয্যে আপন স্বরূপশক্তির সঙ্গে প্রেমানন্দলীলায় মেতে ওঠেন যখন তখন তাঁর বক্ষে ঈক্ষণ জেগে ওঠে। এই ঈক্ষণের পূর্ণ রূপ মহাপ্রাণরূপে অবির্ভূত হয়। মহাপ্রাণের প্রথম প্রকাশ অবস্থা হল শ্রদ্ধা। এই শ্রদ্ধা হতেই যথাক্রমে আকাশ, বায়ু, তেজ, জল, পৃথিবী, ইন্দ্রিয়, মন, অন্ন, বীর্য, কর্ম, তাপ, বাক্, মন্ত্র, জ্যোতি, লোক ও নাম এই ষোলকলার প্রকাশ হয়। এই ষোলকলা নিয়েই হল মহাপ্রাণরূপী মায়ের পূর্ণ পরিচয়। এই কলার অভিব্যক্তি হতে জগতের সর্বাধিক প্রকাশ ও তার মহিমা ব্যক্ত হয়। সেইজন্য মহাপ্রাণকে ষোড়শী মাতা বা ষোলকলা পুরুষ উভয়ই বলা হয়।

বায়ুর মত অগ্নিও প্রাণেরই এক বিশেষ রূপ। অগ্নির সাত জিহ্বা বা শিখা হল যথাক্রমে কালী, করালী, মনোজবা, সুলোহিতা, সুধূম্রবর্ণা, স্ফুলিঙ্গিনী ও বিশ্বরুচি। অগ্নির এই সাতটি জিহ্বা বা শিখা হল প্রাণের সাতটি

মান, আবর্ত বা পরিচয়। অগ্নির এই সপ্তজিহ্বা বা শিখাকেই বিভিন্ন অর্থে সূর্যের সাতটি অশ্ব বা রশ্মি[১] (বর্ণ), সপ্তস্বর[২], সপ্তস্বর্গ[৩], সূক্ষ্ম দেহের সপ্তচক্র[৪], সপ্তজ্ঞানভূমি[৫], সপ্তর্ষিলোক[৬] প্রভৃতি বলা হয়।

সপ্তস্বর্গের প্রতিস্বর্গই দুই ভাগে বিভক্ত, যথা ঊর্ধ্ব ও অধঃ। ঊর্ধ্ব ভাগকে স্বর্গ বলা হয় এবং নিম্ন ভাগকে নরক বলা হয়। ঊর্ধ্ব সপ্তভাগের নাম নিম্ন হতে যথাক্রমে ভুঃ ভুবঃ স্বঃ মহঃ জন তপঃ সত্য এবং সপ্তনরকের নাম যথাক্রমে তল অতল বিতল সুতল তলাতল মহাতল রসাতল। এই সপ্তস্বর্গ ও সপ্তনরক একত্র করে হয় চতুর্দশ ভুবন।

ভূলোক হতে ঊর্ধ্বদিকে ক্রমপর্যায়ে যে সাতটি স্তর বা সিঁড়ি আছে তার প্রত্যেকটির সঙ্গে যুক্ত হলেই মহৎ স্তর বা গুরুর স্তরের সঙ্গে যুক্ত হওয়া যায়। সাতটি স্তরের বা সিঁড়ির পূর্ণ পরিচয় পেলে তবেই ঋষিত্ব লাভ হয়।

চতুর্দশ ভুবনের সঙ্গে মূল প্রকৃতিশক্তি ও পরমপুরুষ বা সত্তা যুক্ত করেই হয় ষোলকলা পুরুষ। এই ষোলকলা পুরুষকে বৃহৎ ও মহৎ অর্থে ব্রহ্ম ও আত্মা বলা হয়। গুরু অর্থে তাঁকেই গুরু বলা হয়। আবার অপরিমেয় অর্থে অর্থাৎ যা মাপা যায় না, যা পরিমাণের অতীত, যা সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ, সর্বকারণের কারণ মহাকারণ, সব কিছুর উৎস তাকেই মা বলা হয়।

চতুর্দশ ভুবনের সব প্রকাশ একত্র করে নিয়েই হল বিশ্বপ্রকৃতি। তার সঙ্গে মূলপ্রকৃতি ও মূলসত্তা যুক্ত করে হয় মহাপ্রাণচৈতন্যরূপী মায়ের পূর্ণ পরিচয়। এই হল গুরুমূর্তি। প্রাণের সাধক গুরুর মধ্যে মাকে এবং মায়ের মধ্যে গুরুকে উপলব্ধি করে অভেদজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়। গুরু হলেন স্নেহময়। তিনি প্রজ্ঞানঘন, পূর্ণ আনন্দঘন, প্রেমময় এবং রসময়। তিনি নৈর্ব্যক্তিক ও ব্যক্তি উভয়ই; অর্থাৎ নির্গুণ-সগুণ ও নিরাকার-সাকার উভয়ই তাঁর পরিচয়, তিনি আবার নির্গুণগুণীও বটে। নিষ্ক্রিয় অবস্থায় তাঁকেই পুরুষ বলা হয় এবং সক্রিয় অবস্থায় তাঁকে শক্তি ও প্রকৃতি বলা হয়।

শুদ্ধজ্ঞান, শুদ্ধাভক্তি ও শুদ্ধপ্রেমের পরাকাষ্ঠাই হল অদ্বয়জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম আত্মা ঈশ্বর।

প্রাণের লীলা হয় প্রাণের অণুর সঙ্গে অর্থাৎ প্রাণের প্রকাশের সঙ্গে। প্রশান্ত অবস্থায় (all Silence) লীলা সম্ভব নয়।

প্রজ্ঞানঘন অখণ্ড সত্তার সঙ্গে সকলেই মূলত যুক্ত আছে। ব্যবহারদোষে জীবের মন মলিন হয়। তার ফলে মোহ, ভ্রান্তি ও বিকার সৃষ্টি হয়। ভ্রান্তিবশত জ্ঞানের খণ্ড ব্যবহার হয়। একেই অজ্ঞান বলে।

অনন্ত অসীম পূর্ণ অমৃতময় অখণ্ড ভূমার বক্ষে তদ্‌বোধে বিচরণ করে মুক্ত ও দিব্যজীবন। তদ্‌বোধের অভাবে সংসারবোধে চলে বদ্ধজীবগণ।

১। বেগুনী, নীল, আসমানী, সবুজ, হলুদ, কমলা ও লাল—সংক্ষেপে 'বেনীআসহকলা'।
২। সপ্তস্বর হল ষড়জ (সা), ঋষভ (রে), গান্ধার (গা), মধ্যম (মা), পঞ্চম (পা), ধৈবত (ধা), নিষাদ (নি)।
৩। সপ্তস্বর্গের প্রতি স্বর্গই দুই ভাগে বিভক্ত, যথা—ঊর্ধ্ব ও অধঃ। ঊর্ধ্ব ভাগকে স্বর্গ বলা হয় এবং নিম্নভাগকে নরক বলা হয়। এই ঊর্ধ্ব সপ্তভাগের নাম নিম্ন হতে যথাক্রমে ভুঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য। সপ্তনরকের নাম যথাক্রমে তল (পাতাল), অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল ও রসাতল। এই সপ্তস্বর্গ ও সপ্তনরক একত্র করে হয় চতুর্দশ ভুবন।
৪। সপ্তচক্রের নাম যথাক্রমে মেরুদণ্ডের নিম্নপ্রান্ত হতে মূলাধার, লিঙ্গমূলে স্বাধিষ্ঠান, নাভিমূলে মণিপুর, বক্ষে অনাহত, কণ্ঠে বিশুদ্ধাক্ষ, ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে আজ্ঞা এবং শিরোপরি সহস্রার।
৫। সপ্তজ্ঞানভূমি হল শুভসংকল্প, বিচারণা, তনুমনসা, সত্ত্বাপত্তি, অসংসক্তি, পদার্থভাবনা ও তুরীয়।
৬। সপ্তর্ষির নাম হল মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ।

মাতৃভক্তই অদ্বয় আত্মজ্ঞানের অধিকারী

মা ও সন্তানের মধ্যে যে সম্বন্ধ তা স্বভাবত মাধুর্যপূর্ণ। এই উপলব্ধি হয় আত্মজ্ঞানের মাধ্যমে। আত্মজ্ঞান হল অভেদ জ্ঞান। দ্বৈতভাবে প্রকাশিত হলেও তা নিত্যাদ্বৈত। এই জ্ঞানের সাধনমন্ত্রই হল 'হংসঃ সোহম্'। হৃদয়কেন্দ্রে এই মন্ত্র অজপাজপ রূপে নিত্য সাধিত হয়। নিরন্তর এই মন্ত্রের সাধন দ্বারা আত্মজ্ঞানের স্ফুরণ হয়। তখন জীবভাব থাকে না, শিবভাবের প্রতিষ্ঠা হয়। জীব স্বরূপত শিব। কর্মফলে আবদ্ধ আত্মাকেই জীব বলে। কর্মফলই হল পাশ বা বন্ধন। পাশবদ্ধ হল জীব এবং পাশমুক্ত হল শিব। কর্মপাশমুক্ত জীবই হল শিব। আত্মবোধই হল শিববোধ। আত্মাই হল শিব। এই আত্মা ও ব্রহ্ম অভেদ। এই আত্মা নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত অজর অমর অপাপবিদ্ধ।

সকাম কর্মের অবগুণ (দোষত্রুটি)

সকাম কর্ম হল 'আমার বোধ' বা সংসারবোধ। একে পশুভাব বা অজ্ঞান বলা হয়। এই পশুভাবই হল দেহাত্মবুদ্ধি। এই দেহবুদ্ধিরূপ পাশ হল কর্মফলের সংস্কার সমষ্টি। দেহ হল কর্মফলের ভোগায়তন ক্ষেত্র। দেহগত জীবই হল পশু এবং আত্মরূপী শিবই হলেন পশুপতি। শিবজ্ঞানে জীবের দেহপাশ বিনষ্ট হয়। তখন শুধু আত্মজ্ঞানই স্বমহিমায় স্বতঃস্ফূর্তধারায় প্রকাশিত হয়। আত্মজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞান এক অর্থবোধক।

'হংসঃ' মন্ত্রের তাৎপর্য

'হংসঃ' মন্ত্রের তাৎপর্য হল আত্মবোধ বা অদ্বৈতবোধ। 'হ' মানে সত্তাশিব বা পূর্ণ আমি। 'ং' মানে সন্তান অর্থাৎ পূর্ণের অন্তর্গত ব্যষ্টিপ্রকাশ। 'সঃ' মানে পরাশক্তি (পরাপ্রকৃতি) বা মহাপ্রাণ। এই তিনের অখণ্ড একক মূর্তিই হল 'হংসঃ'। এই হল অদ্বয় সৎ অর্থাৎ পরমসচ্চিদানন্দ। পিতা 'হ', মধ্যে 'ং' সন্তান এবং নিম্নে মাতা 'সঃ'।

'পরমহংস' অর্থ হল পরম+অহং+সঃ। অর্থাৎ পিতা মাতা ও সন্তানের ঘনীভূত পরমতত্ত্ব বা অখণ্ড অদ্বয় সত্যরূপ বিশেষ কোন জীবাধারের (নরদেহে) মধ্যে যখন অভিব্যক্ত হয় বা প্রকাশ পায় তখন তাঁকে পরমহংস আখ্যা দেওয়া হয়।

আত্মজ্ঞানের সর্বোত্তম বিজ্ঞান

আত্মদানই হল আত্মজ্ঞান লাভের শ্রেষ্ঠ উপায়। আত্মদানের মাধ্যমেই ভূমা সুখ ও শান্তি আস্বাদন হয়। ত্যাগ ব্যতীত যে ভোগ তাকেই দুর্ভোগ বলে। ত্যাগের ফলভোগেই হল অখণ্ড সুখ ও শান্তি। ভোগে হয় দুর্গতি, ত্যাগে হয় শান্তি। ভোগ হল বন্ধনের কারণ, ত্যাগ হল মুক্তির কারণ। ভোগীর কর্ম হল সকাম কর্ম; তার ফল পরিণামী ও বিকারধর্মী, সুতরাং দুঃখ ও জন্মমৃত্যুর কারণ। কিন্তু ত্যাগীর কর্ম হল নিষ্কাম কর্ম; তার ফল হল নির্বিকার ও নিত্যস্থায়ী। সুতরাং এর ফল অমৃতময় ভূমা সুখ ও শান্তিস্বরূপ।

ত্যাগের তাৎপর্য

ত্যাগ করা অর্থ হল হৃষ্টচিত্তে, সজ্ঞানে মায়ের দেওয়া জিনিস মাকেই ফিরিয়ে দেওয়া অথবা ঈশ্বরের দেওয়া জিনিস ঈশ্বরকে ফিরিয়ে দেওয়া। এর অর্থ ঈশ্বর বা আপনবোধে (আত্মবোধে) অন্তরে বাইরে সবকিছু 'মেনে মানিয়ে চলা'। সর্বত্যাগের অর্থ সর্বসমর্পণ অর্থাৎ সবকিছু ব্রহ্মবোধে ব্রহ্মে অর্পণ করা।

মাধুর্য শব্দের তাৎপর্য

গুরু সর্বভাবের ও সর্বজ্ঞানের ঘনীভূত রূপ। মাতাপিতার সঙ্গে সন্তানের যেমন মাধুর্যের সম্বন্ধ, গুরুর সঙ্গে শিষ্যেরও সেইরূপ মাধুর্যভাবের সম্বন্ধ বিশেষভাবে অভিব্যক্ত হয়। 'মধুর' শব্দ হতেই মাধুর্যের উৎপত্তি। এই 'মধু' শব্দের অর্থ হল প্রজ্ঞাচৈতন্য বা বিশুদ্ধ জ্ঞান, ব্রহ্ম, আত্মা বা মহাপ্রাণ, ইষ্ট, গুরু, মাতা ও ভগবান। মহাপ্রাণের মধ্যে ব্যষ্টিপ্রাণের মিশে যাওয়ার গতিকেই মধু বলা হয়।

ভিন্ন ভিন্ন সাধনার লক্ষ্য এক

সোহহং হল অদ্বৈতবাদের শ্রেষ্ঠ ঘোষণা। সোহহং তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য 'হংস সোহহং' মন্ত্র সাধনার বিধান আছে। শ্রেষ্ঠ ভক্ত, শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ও শ্রেষ্ঠ যোগী এক তত্ত্বেরই উপাসনা করে আপন আপন ভাব অনুযায়ী। লক্ষ্য সকলেরই এক, কিন্তু সাধন পদ্ধতি পৃথক।

ব্রহ্মোপলব্ধির ক্রম (সোপান)

নির্গুণ ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়, নিরাকার, নির্বিশেষ, নিত্যাদ্বৈত, শাশ্বত, অচ্যুত, স্থানুরচল, সনাতন; সুতরাং বাক্যমনাতীত, কেবল সচ্চিদানন্দস্বরূপ। ব্রহ্মের এ-ই শেষ পরিচয় নয়। পরব্রহ্ম, পরাৎপরব্রহ্ম প্রভৃতির কথাও শাস্ত্রে আছে। ঈশ্বরীয় মহিমার শেষ নাই। ব্রহ্মোপলব্ধির পরিচয় যা পাওয়া যায় তাই শেষ কথা নয়। এ পরিচয় ব্রহ্ম-আত্মা-ঈশ্বরজ্ঞানের নির্দেশক মাত্র। ব্রহ্মবোধে প্রতিষ্ঠিত হলে তারপরে মানুষ পরব্রহ্ম ও পরাৎপরব্রহ্মকে উপলব্ধি করার যোগ্যতা লাভ করে। যে ব্রহ্মকে ব্রহ্মবলে প্রকাশ করে সে-ই আবার পরব্রহ্ম পরাৎপরব্রহ্মকে প্রকাশ করে।

অনন্ত অসীম সচ্চিদানন্দময়ী মায়ের বক্ষে কারও মৃত্যু বা শেষ নাই। জীবনের নাশও নাই, বিকারও নাই; কিন্তু পরিণাম আছে। এই 'বিকারহীন পরিণামের'[১] সঙ্গে মানুষ ব্যাপক ভাবে পরিচিত হয় নাই। এই পরিণাম মাধুর্যতমের পরাকাষ্ঠায় পৌঁছে দেয়।

সমগ্র সৃষ্টি হল ব্রহ্মের অণু ও পরমাণুর খেলা। অণোরণীয়ান হল ব্রহ্মের পরমাণুরূপ এবং মহতো মহীয়ান হল ব্রহ্মের অখণ্ড রূপ। চিন্ময়ী মা অণুকে অর্থাৎ তাঁর সন্তানকে অজ্ঞাত ও অনাস্বাদিত সেই চরম অবস্থায় পৌঁছে দেন।

যুগপুরুষের মাধ্যমেই যুগোপযোগী সমাধান মেলে

অতীতের জীবনসমস্যা ও বর্তমানের জীবনসমস্যার মধ্যে পার্থক্য অনেক। অতীত যুগের সমস্যার সমাধান দ্বারা বর্তমানের সমস্যার সমাধান হওয়া পূর্ণভাবে সম্ভব নয়। বর্তমান সমস্যার সমাধান কেবলমাত্র বর্তমানে উপলব্ধ সত্যের মাধ্যমেই হতে পারে। যুগপুরুষদের মাধ্যমেই যুগে যুগে সমস্যার সমাধান মেলে। যুগপুরুষদের বিশেষত্ব হল মৌলিকতা। তাঁদের মধ্যে পূর্ব পূর্ব যুগের ধর্মপ্রবর্তকদের ও অতিমানবদের প্রবর্তিত নীতি ও ধর্মজ্ঞান পূর্ণমাত্রায়ই থাকে এবং তার সঙ্গে নূতনত্বই অধিক থাকে। ঈশ্বর অবতারদের আবির্ভাবের ফলে ধর্মের ও জীবননীতির মূল আদর্শগুলি রূপান্তরিত ও সংশোধিত হয়ে নূতনভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁদের মাধ্যমেই যুগোপযোগী শাস্ত্র তৈরি হয়, অর্থাৎ তাঁদের আচরিত জীবনাদর্শ ও কথিত সত্যের বাণীই শাস্ত্ররূপ ধারণ করে ও পরে তা ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়। শাস্ত্রের প্রবর্তক এবং ধর্মাদর্শের প্রতিভূরূপে ভগবানই স্বয়ং জগতে নবরূপে আগমন করেন।

১। তন্ত্রের দৃষ্টিতে।

জ্ঞানবাদ ও ভক্তিবাদ সাধনার বৈশিষ্ট্য

জ্ঞানবাদের সাধনা ও প্রতিষ্ঠা হয় আমিতত্ত্ব বা 'অহং'-এর বিস্তার দ্বারা; কিন্তু ভক্তিবাদের সাধনা ও প্রতিষ্ঠা হয় তুমিতত্ত্ব ও ত্বংকারের সম্প্রসারণ দ্বারা। জ্ঞানীর তত্ত্ব হল সর্বমহম্, সর্বাত্মকোহম্, সর্বশূন্যোহম্, সর্বাতীতোহম্। অর্থাৎ সর্বগত অমৃতস্বরূপ অদ্বয় ব্রহ্মস্বরূপ আমিই পরমাত্মা পরমেশ্বর। আমা হতে সব, আমা দ্বারা সব, আমার জন্য সব, আমার সব, সবেতে আমি এবং আমিই সব; আবার আমিই নিত্য একক। আমাতে আমা অতিরিক্ত দ্বিতীয় কেউ নেই। এই হল জ্ঞানসিদ্ধির পরাকাষ্ঠা। অপর পক্ষে ভক্ত বলে—আমি তোমার এবং তোমার আমি। অর্থাৎ সর্বং ত্বম্, সর্বাত্মকস্ত্বম্, সর্বশূন্যস্ত্বম্, সর্বাতীতস্ত্বম্। এর অর্থ সর্বগত সচ্চিদানন্দস্বরূপ তোমা হতে সব, তোমা দ্বারা সব, তোমার জন্য সব, তোমার সব, সবেতে তুমি এবং তুমিই সব। পরমজ্ঞানীর বাস্তব জগতের সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকে না, কারণ জ্ঞানের দৃষ্টিতে জগৎ অনিত্য, অস্থায়ী সুতরাং মিথ্যা।

বর্তমানের ব্যবহারের গুরুত্ব

অতীতের স্মৃতিকে যারা ধ্যান করে বর্তমানে, তারা বর্তমানকে হারায়। সচেতনভাবে বর্তমানের ব্যবহার না হলে বর্তমানের ফল শুভ হয় না, ভবিষ্যতের ফলও শুভ হয় না। নূতনকে, বর্তমানকে, প্রত্যক্ষ সত্যকে, চারপাশের জীবন্ত প্রাণের বৈচিত্র্যময় প্রকাশকে, অভিনব সত্য প্রাণের অস্তিত্বকে অবহেলা করে প্রাণের অতীত প্রকাশ ও তার বৈশিষ্ট্যকে অধিক মূল্য দিয়ে হারানো স্মৃতিরই পূজা করে যারা, তারা নূতনের মর্যাদা হারায়। অর্থাৎ নূতনের মর্যাদা দিতে পারে না[১]।

'মানব' শব্দের নিগূঢ় তাৎপর্য

'মানব' শব্দটি খুব তাৎপর্যপূর্ণ। সৃষ্টির অন্তর্গত জীবদের মধ্যে কেবলমাত্র মানবের পক্ষেই ব্রহ্ম, আত্মা, ঈশ্বর উপলব্ধি সম্ভব। মানব হল মা+নব; অর্থাৎ নব বেশে মা। 'নব' শব্দের অর্থ—নূতন, নয় এবং না। এই 'নব' শব্দের ব্যবহার আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানে নানাভাবে ব্যক্ত করা আছে, যেমন—নবরস, নবভাব, নবভক্তি, নবগ্রহ, নবগুণ প্রভৃতি। নবগুণ হল ব্রাহ্মণের বিশেষ লক্ষণ। এই নবগুণ উপবীত আকারে ব্রাহ্মণ গলায় ধারণ করে।

কারও মতে ব্রহ্মানুভূতিই শেষ কথা। আবার কারও মতে ব্রহ্মবোধ থেকে সাধনা আরম্ভ হবার কথা। এই উভয় মতের তাৎপর্য ও সমাধান নির্দেশ করে সর্বোত্তম অনুভূতির স্বরূপকে।

বর্তমান যুগের সাধনা কী?

সর্বব্যাপক ব্রহ্মকে ব্রহ্মবোধে সবকিছুর মধ্যে আবিষ্কার করা বা 'মেনে মানিয়ে চলাই' হল এ যুগের সাধনা।

সত্যই হল নিত্যবস্তু। নিত্যবস্তুই হল ব্রহ্ম। নিত্যবস্তুই হল অনন্ত, অখণ্ড, ভূমা। ভূমাই হল আনন্দ। আনন্দই হল আত্মস্বরূপ বা ব্রহ্মের স্বরূপ। এ স্বয়ংপ্রকাশ, স্বতঃসিদ্ধ, সুতরাং প্রজ্ঞানঘন। সব মিলে ব্রহ্মের পরিচয় হল সচ্চিদানন্দঘন।

আনন্দব্রহ্মের মহিমা

আপনবোধে সকলকে ভালবাসাই হল আত্মধর্ম। আত্মা আনন্দস্বরূপ ও প্রেমস্বরূপ। আনন্দের জন্যই আনন্দ এবং প্রেমের জন্যই প্রেম। কেউই নিরানন্দ বা দুঃখ ঘৃণা চায় না। সকলেই আনন্দ প্রেম শান্তি চায়। এ আত্মারই

১। অভিনব বিশ্লেষণ।

ধর্ম। সর্ব সৃষ্ট বস্তুর আদি মধ্যে বা অন্তে সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্ম বা মা-ই আছে। আনন্দই হল কার্য, আনন্দই হল কারণ এবং আনন্দই হল মিলনধর্মী। প্রকাশ ও প্রকাশকের মধ্যে আনন্দধারা নিরবচ্ছিন্ন ভাবে বর্তমান। নিরানন্দ দুঃখ ও অভাব হল অস্থায়ী ছায়াসম ভ্রান্তি ও অজ্ঞান।

খণ্ড জ্ঞানে স্বল্প সুখ ও স্বল্পানন্দ। এ-ই দুঃখের কারণ। অখণ্ড জ্ঞান ভূমানন্দ ও ভূমাসুখ। এ অমৃতের স্বরূপ।

আত্মজ্ঞানের অভাবে হয় জীবদশা বা বন্ধনদশা। আবার আত্মজ্ঞান লাভ হলে জীবের বন্ধনদশা মুক্ত হয়, সে শিবত্ব লাভ করে।

সত্যযুগ প্রকাশের বৈশিষ্ট্য

শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও সত্যবোধে প্রতিষ্ঠিত হলেই সত্যযুগের প্রকাশ হয়। সত্যযুগে স্বয়ং গুরু লঘুর কাছে লঘু হয়ে এসে লঘুকে গুরু বানিয়ে দেন।

গুরুই সকলের দায়িত্বভার নেন। সাধনকালে তা বোঝা না গেলেও পরে সম্যক্‌রূপে অনুভূত হয়। গুরু প্রয়োজনবোধে দেহ নূতন করে তৈরি করে তাঁর আনন্দখেলার উপযোগী করে নেন। [৬।৬।৬৮]

নির্গুণ ও সগুণের তাৎপর্য

নির্গুণ ও সগুণ পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক ও সম্পূরক। উভয়ের মধ্যে নিত্যসম্বন্ধ ও নিত্য 'জন্য' সম্বন্ধ বর্তমান। ঈশ্বর এক হয়েও বহু এবং বহু হয়েও এক। এ তাঁর অভিনব মহিমা। নির্গুণ সগুণ ভিন্ন তত্ত্ব নয়, এক তত্ত্বেরই দ্বিবিধ পরিচয়। নির্গুণ হল নিত্য লীলাশূন্য কিন্তু স্বগুণ হল নিত্য লীলাময়। লীলা হয় আপনবোধের সঙ্গে আপনভাবের ও নামরূপের মধ্যে। স্ববোধ হল নিত্য নির্গুণ, স্বভাব হল নিত্য সগুণ। স্ববোধে ঈশ্বর, ব্রহ্ম, আত্মা এক অদ্বৈত। স্বভাবে সে দ্বৈত ও বহু। বহুর জন্য এক এবং একের জন্য বহু; অর্থাৎ বহুর মধ্যে এক ও একের মধ্যে বহু। একত্বকে নির্ণয়ের জন্য বহুর একান্ত প্রয়োজন, আবার বহুত্ব নির্ণয়ের জন্য একের প্রয়োজন। এক উভয় অবস্থার মধ্যেই নিত্য বর্তমান। এককে বাদ দিয়ে এক বা বহু, নির্গুণ বা সগুণ কিছুই সম্ভব নয়। এই একই হল স্ব অর্থাৎ বিশুদ্ধ বোধস্বরূপ ঈশ্বর, আত্মা, ব্রহ্ম।

পূর্বেই বলা হয়েছে নির্গুণ ও সগুণ পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক ও সম্পূরক। পরস্পরের মধ্যে নিত্য সম্বন্ধ বিদ্যমান। ঈশ্বর এক এবং বহু উভয়ই সত্য। এক বললে বহুর অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় এবং বহু বললেও একের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়। এই ভাবে নির্গুণ প্রমাণের জন্য সগুণের প্রয়োজন হয় এবং সগুণের জন্য নির্গুণ প্রয়োজন হয়। নির্গুণ হল সর্বোত্তম কারণ ও সত্তা, সগুণের উৎস। সগুণ হল নির্গুণের সর্বোত্তম অভিব্যক্তি। এক তত্ত্বেরই সগুণ স্বরূপ হল ঈশ্বর এবং নির্গুণ স্বরূপ হল ব্রহ্ম। অনন্ত ও অসীমের প্রকাশের জন্য সান্ত ও সসীমের প্রয়োজন হয়, আবার সান্ত সসীমের জন্য অনন্ত অসীমের প্রয়োজন হয়। সত্তার জন্য শক্তি এবং শক্তির জন্য সত্তা; পুরুষের জন্য প্রকৃতি এবং প্রকৃতির জন্য পুরুষ; আমির জন্য তুমি এবং তুমির জন্য আমির প্রয়োজন হয়। সন্তানের জন্য পিতামাতা এবং পিতামাতার জন্য সন্তান, ভক্তের জন্য ভগবান, এবং ভগবানের জন্য ভক্ত; আবার শিষ্যের জন্য গুরু, গুরুর জন্য শিষ্য—উভয়ের সম্বন্ধই সত্য। সেইরূপ লঘু ও গুরু, সত্য ও মিথ্যা, জ্ঞান ও অজ্ঞান, সুখ ও দুঃখ, পাপ ও পুণ্য, ধর্ম ও অধর্ম, ইষ্ট ও অনিষ্ট, আঁধার ও আলো, জন্ম ও মৃত্যু এই স্বভাববিরুদ্ধ দ্বৈত ভাবগুলি নিত্য অভেদ সম্বন্ধযুক্ত। আশ্রিত ও আশ্রয়, খাদ্য ও খাদক, দ্রষ্টা ও দৃশ্য, কর্তা ও কর্ম, জ্ঞাতা ও জ্ঞান, ভোক্তা ও ভোজ্য এইগুলির মধ্যে নিত্য অভেদ সম্বন্ধ। এদের সমষ্টিরূপই হল বিশ্বরূপ। বিশ্বের সমগ্র

প্রকাশের মধ্যে যুগল সম্বন্ধ বিদ্যমান। বিপরীত অর্থবোধক শব্দগুলি পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক ও সম্পূরক। সেইরূপ ঈশ্বরের (ব্রহ্মের) জন্য জগৎ ও জগতের জন্য ঈশ্বর। উভয়ের মধ্যে এক অবিচ্ছেদ্য নিত্য সম্বন্ধ বিদ্যমান। ব্রহ্ম আত্মা ঈশ্বর হলেন বিশুদ্ধ বোধস্বরূপ। প্রকাশক ও প্রকাশ উভয়ই স্বয়ং তিনি। প্রকাশক ব্যতীত প্রকাশ এবং প্রকাশ ব্যতীত প্রকাশক হয় না। নির্গুণস্বরূপ (সত্তা) হল প্রজ্ঞানঘন বিশুদ্ধচৈতন্য এবং সগুণস্বরূপ হল বিজ্ঞানময়। সত্তা বা জ্ঞানঘন চৈতন্যের সঙ্গে তার বিজ্ঞান বা ব্যবহারের নিত্য অভেদ সম্বন্ধ। এই ব্যবহারের নামই প্রকৃতি, স্বভাব, প্রধান শক্তি, মায়া, অবিদ্যা প্রভৃতি। সুতরাং সত্তাশক্তির মিলনের ফলেই হয় বৈচিত্র্যময় নানাত্ব বহুত্বের প্রকাশ। এই যুগল সম্বন্ধ হতেই উত্তরোত্তর শতদল, সহস্রদল, লক্ষ ও কোটি দলে সৃষ্টির অভি-ব্যক্তি হয়।

অদ্বয়তত্ত্বের লীলাবিলাস

এক হতে দুই, দুই হতে বহু এবং আবার বহুর পরিণাম হল দুই হয়ে অবশেষে এক। এইভাবেই বিশ্বময় নিরন্তর একতত্ত্বের নিত্যলীলা স্বতঃস্ফূর্ত ধারায় প্রকাশমান। এক থাকলে বহু অবশ্যম্ভাবী। বহুর কারণ হল আবার এক।

একের মধ্যে কোন বিজ্ঞান নেই, ব্যবহার নেই, প্রকৃতির খেলা নেই, কোন রকম জানাজানি, হওয়া বা বোঝার ব্যবহার নেই। একেতে কোন উপলব্ধি নেই, কোন অনুভব নেই এবং কোন ক্রিয়াও নেই। সুতরাং ধর্ম-অধর্ম, দ্বন্দ্ব-বিরোধ, সত্য-মিথ্যা এবং আমি বা তুমিরও কোন ব্যবহার নেই। অদ্বয়বোধের এ-ই বৈশিষ্ট্য ও তাৎপর্য।

আমি ও তুমি বোধের সংযোগের ফল বা পরিণামই হল যৌগিক লীলাবিলাস।

জীবনমাত্রই সচ্চিদানন্দের অভিব্যক্তি। কিন্তু আপন সচ্চিদানন্দস্বরূপের পরিচয় তারা বিস্মৃত।

এক যখন বহুর মধ্যে নিজেকে ছড়িয়ে দেন লীলাবিলাসের নিমিত্ত, তখন ষোলটি বিভাগ বা ষোলকলা নিয়ে তাঁর আশ্রয় বা দেহ তৈরি হয়। এই ষোলকলা হল—(১) মহাপ্রাণ বা চৈতন্য, (২) শ্রদ্ধা, (৩) আকাশ, (৪) বায়ু, (৫) তেজ বা অগ্নি, (৬) জল বা রস, (৭) পৃথিবী, (৮) ইন্দ্রিয়, (৯) মন, (১০) অন্ন, (১১) বীর্য, (১২) তপঃ বা তাপ, (১৩) মন্ত্র, (১৪) লোক বা ভুবন, (১৫) কর্ম, (১৬) নাম।

ষোলকলার সঙ্গে পূর্ণভাবে পরিচয় হলেই আত্মা বা স্বরূপের যথার্থ অনুভূতি হয়। এই ষোলকলা হল স্থিতি, গতি বা ক্রিয়া এবং প্রকাশ বা বোধবিজ্ঞানের পূর্ণ পরিচয়। এই সব মিলেই হল ষোড়শীমাতা। সেইজন্য ষোড়শ উপচার দিয়ে মাকে পূজা করতে হয়।

ষোড়শ উপচার মাকে দেবার মানে চতুর্থ গুরুমূর্তির সেবা করা অর্থাৎ সর্বেন্দ্রিয়ের সমর্পণ। 'দেহ' শব্দের 'দে' মানে দেওয়া এবং 'হ' অর্থ সত্য শিব সুন্দর শুভ পূর্ণ-জ্ঞানঘন আনন্দ। পূর্ণতা ও সমষ্টির মধ্যে ব্যষ্টির এবং একের মধ্যে বহুর সমর্পণই হল দেহ শব্দের তাৎপর্য। স্রষ্টাকে তাঁর জিনিস ফিরিয়ে দেওয়াই হল ব্যষ্টির ধর্ম। এই ফিরিয়ে-দেওয়ারূপ বৃত্তিই হল যজ্ঞ বা আহুতি।

ভোগার্থে কর্ম হলেই কর্মফলে বন্ধন হয় ; কিন্তু যজ্ঞার্থে কর্ম হলে বন্ধন কেটে যায়। জীবন তখন মুক্ত হয়।

ষোড়শ উপচারকে ফিরিয়ে দেওয়াই হল আত্মসমর্পণ। আত্মসমর্পণের ফলে শিবশক্তির অভেদ মিলন হয়। এই অভেদ মিলনই হল জীবের সর্বোত্তম পরিণাম।

সমর্পণের অর্থ হল সমবোধ দ্বারা সবকিছু গ্রহণ করা ও ব্যবহার করা।

স্থূলদেহ হল অন্নময় কোষে গঠিত, সূক্ষ্মদেহ হল প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষে গঠিত এবং কারণ দেহ হল আনন্দময় কোষে গঠিত। তিন পুরের অধীশ্বরী হলেন প্রাণরূপী নাম। প্রাণরূপী মাতাই হলেন নামী। সেই জন্য তাঁকে ত্রিপুরেশ্বরী বলা হয়।

প্রকাশবিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য

প্রকাশ মাত্রেরই স্থিতি, গতি ও ক্রিয়া এবং প্রকাশ থাকে। স্থিতি হল দেহ, গতি হল প্রাণ এবং স্বপ্রকাশ হল বোধবিজ্ঞান। এই তিন পুরে মা ত্রিপুরেশ্বরী স্বয়ং বিরাজিতা। তিনি নিজেকেই সম্প্রসারণের মাধ্যমে বিশ্বরূপে প্রকাশ করেন ও তিনপুর ধারণ করে তার মধ্যে বাস করেন। আবার নিজেকেই আপন পুরুষস্বরূপের কাছে সমর্পণ করে স্ববোধসাগরে ফিরে আসেন অর্থাৎ স্বস্থ হন। প্রকৃতি পুরুষের প্রীতির নিমিত্ত স্বতন্ত্রভাবে কাজ করে পুরুষের সঙ্গে মিলিত হতে চায়। প্রকৃতির স্বতন্ত্র ক্রিয়াপদ্ধতি হল তার অভিসার। তার অভিসারই হল এই সংসার।

অজ্ঞান ও সংকুচিত জ্ঞানরূপ প্রতিবন্ধককে রোধ করে দেওয়াই হল গুরুর কাজ। [৭।৬।৬৮]

সমবোধই পূর্ণ আমির স্বরূপ

মায়ের আমি, পূর্ণের আমি, ভূমার আমি, আমির আমি সর্বদা সমবোধে প্রতিষ্ঠিত থাকে। তরঙ্গের পর তরঙ্গ, লহরীর পর লহরী সৃষ্টি করে পরমানন্দময়ী মা নিজেকেই বহুর মধ্যে ছড়িয়ে দেন। তখন তাঁর অনন্ত অসীম অখণ্ড ভূমাস্বরূপের অংশবিশেষে বৈচিত্র্যের অভিব্যক্তি হয়। তাঁর এই প্রকাশ বা সন্তানরূপই হল ব্যষ্টি জীবন যা চৈতন্যের অণুপরমাণু দ্বারা গঠিত। চৈতন্য হল নিত্যবস্তু—আমির পরিচয়। মায়ের যেমন ক্ষয়-বৃদ্ধি নেই, তাঁর প্রকাশসন্তান পরমাণুরও ক্ষয়-বৃদ্ধি নেই। এই সন্তানের মধ্যেও সত্যবোধ নিহিত আছে। এক সত্যই সন্তানরূপে পরমাণুরূপে অণোরণীয়ান এবং মাতারূপে মহতো মহীয়ান মহাবিশ্ব।

নিত্যলীলায় মায়ের আমির তাৎপর্যপূর্ণ পরিচয়

মায়ের নিত্যলীলার তাৎপর্য হল মা অন্তরে বসে সর্ব আমিরূপে নিজেকে প্রকাশ করেন এবং অলক্ষ্যে থেকে তাদের মধ্যে নিজেই খেলেন; কিন্তু বাইরে থেকে মনে হয় কে যেন অলক্ষ্যে চালায়। অন্তর্যামীরূপে চিতি মাতা হলেন তুমি এবং জীবরূপী আমি হল তাঁর সন্তান। 'মাতৃরূপ তুমির' বক্ষে পরমাণুরূপ 'সন্তান আমি' বিরাজ করে। মা আমাকে বক্ষে ধারণ করে পালন করে ও পুষ্ট করে অমৃতময় করেন এবং আবার নিজের বক্ষে মিলিয়ে এক করে নেন। তখন তুমি ও আমি অর্থাৎ মা ও সন্তানের পরিচয় এক অদ্বয় আমিবোধে হয়। 'মায়ের আমি' হল সন্তানের কাছে তুমি। 'মায়ের আমি' হল মহৎ আমি বা এক আমি যা স্বেচ্ছায় বহু আমিরূপে অর্থাৎ সন্তানের আমিরূপে নিজেকে প্রকাশ করে। 'সন্তান আমি' ও 'মায়ের আমি' বা অদ্বয় আমির মধ্যে পার্থক্য হল—সন্তান আমি হল কাঁচা আমি ও মায়ের আমি হল পাকা আমি।

স্বয়ং মা নিজেই 'সবার আমি' বলে সব আমিই হল মায়ের আমি বা এক আমির পরিচয়। এক আমি—আমি সত্য আমি মিথ্যা, আমি জন্ম আমি মৃত্যু, আমি পাপ আমি পুণ্য, আমি ধর্ম ও অধর্ম, আমিই কার্য ও কারণ, আমিই নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ, আমি সত্তা ও শক্তি, আমি পুরুষ ও প্রকৃতি, আমি প্রকাশক ও প্রকাশ, আমি এক ও বহু, আমি বিদ্যা ও অবিদ্যা, আমি নিত্য ও লীলা, আমি তুমি ও আমি উভয়ই। এই অনুভূতি মায়ের আমি বা পূর্ণ আমির পরিচয়। এই অনুভূতিকেই পরমতত্ত্ব[১] বলে।

১। অভিনব সংজ্ঞা।

অন্তরে প্রত্যেকেই হল নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত আত্মা; কিন্তু বাইরে প্রত্যেকের প্রকৃতির প্রাধান্য বেশি। প্রকৃতির প্রভাব বিষয়াসক্ত ও দেহাত্মবুদ্ধিযুক্ত সন্তানের অপূর্ণ 'আমার আমি' আপন 'আত্মার আমিকে' ধরতে পারে না। অপূর্ণ 'আমার আমি' অর্থাৎ ব্যষ্টি জীবন স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। বেঁচে থাকার জন্য ও পুষ্টিলাভের জন্য যা-কিছু তার প্রয়োজন তা মহৎ আমির কাছ থেকে সে পায়। স্থূলরূপে যা-কিছু প্রকাশমান সবই তার পুষ্টিলাভের সহায়ক ও বেঁচে থাকার সহায়ক। এই অধিভূতরূপ শক্তির অন্তরে অধিদৈব শক্তিরূপে বা প্রাণশক্তিরূপে এবং তারও অভ্যন্তরে অধ্যাত্ম শক্তিরূপে মহৎরূপী মায়ের শক্তি ক্রিয়া করে। এই শক্তি দিয়েই তিনি সন্তানকে ধারণ করে, পালন করে, ও পূরণ করে তার মধ্যে মহৎ আমি, ব্রহ্ম আমি, আত্মা আমি, অদ্বয় আমি বা পাকা আমির বোধ জাগিয়ে দেন। ব্রহ্মাস্মি বোধও যিনি জাগ্রত করে দেন তিনি ব্রহ্মাস্মি বোধ হতেও বড়। কাজেই স্থূলরূপে অভিব্যক্ত সমগ্র বৈচিত্র্যময় প্রকাশের মধ্যেও মাকেই মানতে হয়।

মহৎ আত্মা বা মায়ের আমি স্বভাব আনন্দে সমগ্র অধিভূত, অধিদৈব, অধ্যাত্ম ও অধিযজ্ঞরূপে নিজেকে ব্যক্ত করেন। সবই তাঁর আনন্দের অভিব্যক্তি। তাঁর আনন্দই বিশ্বভুবনে ছড়িয়ে আছে। আনন্দরূপেই তাঁকে সবকিছুর মধ্যে পাওয়া যায়। তাই আনন্দের অনুভূতিতে ধরা পড়ে মাটি আনন্দ, জল আনন্দ, অগ্নি আনন্দ, বায়ু আনন্দ, আকাশ আনন্দ। চন্দ্র সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র আনন্দ। নদনদী, পাহাড়-পর্বত আনন্দ। বন-প্রান্তর, নগর আনন্দ। পশুপাখি, জীবজন্তু আনন্দ, সর্বজীবন আনন্দ। দেহ ইন্দ্রিয়, প্রাণমন, বুদ্ধি আনন্দ। আনন্দ রূপে, আনন্দ নামে, আনন্দ ভাবে, আনন্দ বোধে। আনন্দ অজ্ঞান, আনন্দ জ্ঞান, আনন্দ বিজ্ঞান, আনন্দ প্রজ্ঞান। সর্ব আনন্দ, আমি আনন্দ, তুমি আনন্দ, আনন্দ আনন্দ, আনন্দ পরমানন্দে। পরমানন্দই হল ব্রহ্মের স্বরূপ, আত্মার স্বরূপ, ঈশ্বরের স্বরূপ। সর্বব্যাপী এই আনন্দই নিত্যবিদ্যমান। এই আনন্দের অপর নাম হল মধু বা রস। মধুময় বিশ্ব, রসময় বিশ্ব। মধুময় রসময় ব্রহ্ম আত্মা সর্বতত্ত্ব। তুমি আমি মধুময় রসময় নিত্যসত্য। এই হল পূর্ণ আমির পরিচয়।

প্রাণের নাম অঙ্গিরস

সর্ব অঙ্গের রস হল প্রাণ। প্রাণ না থাকলে কে আর অনুভূতির জন্য চেষ্টা করে? প্রাণহীন জগতে ব্রহ্ম বা আত্মার অনুভব নেই। প্রাণই হল চৈতন্য। চৈতন্যই হল ব্রহ্ম। সুতরাং প্রাণই হল সত্য। প্রাণ সকলের অন্তরে আছে বলে সকলে প্রাণের মহিমা নানাভাবে অনুভব করে। এই প্রাণ হল হৃদয়ে প্রজ্ঞারূপে, বোধিরূপে মুখ্যপ্রাণ এবং দেহেন্দ্রিয়ে গৌণপ্রাণ। উভয় প্রাণের সত্যরূপই হল আত্মা।

মাতৃমহিমার নাই তুলনা

সচ্চিদানন্দময়ী মহাপ্রাণরূপী মা অণু রূপে জীব এবং মহান রূপে ঈশ্বর। জীব স্বরূপত অমর। এই অণুর ক্ষয় নেই। অণুর সঙ্গে যোগ হলে অনুভব হয়। ঈশ্বরের সঙ্গে জীবের পার্থক্য হল গুণগত। ঈশ্বরের আমি শুদ্ধসত্ত্বগুণান্বিত এবং জীবের আমি মলিন সত্ত্ব অর্থাৎ রজঃ-তমোগুণান্বিত। গুণের শোধন হলে জীবের চিত্তশুদ্ধি হয়, তখন ঈশ্বরের আমির সঙ্গে তার মিলন হয়। গুণমুক্ত জীবই হল ঈশ্বর[১]। ঈশ্বর মায়াধীশ, জীব হল মায়াধীন এবং নির্গুণ ব্রহ্ম হল মায়াতীত। জীব স্বরূপত ব্রহ্ম কিন্তু প্রকৃতির গুণে আবদ্ধ হয় অজ্ঞান প্রভাবে। এই অজ্ঞান মুক্ত হলে জীব ব্রহ্মস্বরূপে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। কর্মের দ্বারা চিত্তের শোধন হয় কিন্তু অজ্ঞান মুক্ত হওয়া যায় না; অর্থাৎ গুণাতীত অবস্থায় যাওয়া যায় না। শুদ্ধচিত্তে মহাবাক্য বিচারের দ্বারা জীব আত্মজ্ঞান লাভ করে। অশুদ্ধচিত্তে মহাবাক্যের বিচার ফলবতী হয়

১। স্বানুভূতির দৃষ্টিতে।

না। সাধনক্রিয়ার মাধ্যমে চিত্তকে প্রথমে শোধন করতে হয়, তারপরে মহাবাক্যের বিচার দ্বারা প্রথমে ব্রহ্মাকারা বৃত্তি তৈরি করতে হয় এবং তা দ্বারা অজ্ঞানকে নাশ করে বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপে পরে স্থিতি লাভ হয়। বিশুদ্ধ জ্ঞানে গুণভেদ বা অজ্ঞানের কোন প্রভাব থাকে না। বিশুদ্ধ বোধই হল আত্মা বা ব্রহ্ম। এর সর্বোত্তম প্রকাশলক্ষণ হল অদ্বয় আমিবোধ বা নিত্যসাক্ষী আমিবোধ। মহৎ মাতার সন্তানই হল অণু। এই অণুতে চিত্ত নিবেশ করলে বোধের স্মৃতি[১] আসে। বোধের স্মৃতি হলে হয় বোধের তাদাত্ম্য। বোধস্বরূপই হল নিত্যপূর্ণ অমৃতস্বরূপ। অণুপ্রীতি হল বোধপ্রীতি। সেজন্য অণুপ্রীতি হল সর্বসাধনার শ্রেষ্ঠ রহস্য[২]।

আত্মবোধ (জ্ঞান) ও আত্মজ্ঞানীর স্বরূপ

আমি ব্রহ্ম, আমি অনন্ত অখণ্ড নিত্যশুদ্ধ প্রকাশ আত্মা। 'আমি বোধ মাত্র।' আমি অজর অমর অপাপবিদ্ধ নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্থানু অচল সনাতন। ভগবান অণু হতে চান এবং মানুষ মহান হতে চায়। আনন্দস্বরূপ স্বয়ং মা আপন ইচ্ছা দ্বারা আপনাকে যখন প্রকাশ করেন তাই আমি[৩]।

মা ও ওঁ শব্দের একই অর্থ। 'আমি' হল তাঁর প্রকাশরূপ সন্তান। সকলে আমিকে ভুলে আমার আমার বলে। আমার উপর নির্ভর করে বেশি। আমি ও আমার ভাব মা-ই প্রকাশ করেন। 'আমি'-কে বাদ দিয়ে 'আমার' হয় না কিন্তু 'আমার'-কে বাদ দিয়ে 'আমি' হয়। আমার বোধই হল অহংকার। এই অহংকারই হল কাঁচা আমি বা অপূর্ণ আমি বা অংশ আমি। এই আমি ও আমার নিত্যসম্বন্ধযুক্ত। 'আমির' স্বরূপ ভুলে গেলে 'আমার' প্রভাব বাড়ে অথবা 'আমার' প্রভাবে 'আমির' স্বরূপ আবৃত হয় যখন তখনই আ-মার জীবভাব হয়। আমার বোধে জীব হল সন্তান এবং আমিবোধে প্রতিষ্ঠিত জীব হল চিদানন্দময়ী মাতা। যতদিন 'আমার বোধ' থাকে ততদিন ভোগ চলে। ত্যাগ-বৈরাগ্য ও ভক্তি আরম্ভ হলে ভোগ আর থাকে না। 'আমার বোধ' হতে শুদ্ধ আমিবোধে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্যই ত্যাগ-বৈরাগ্য ও ভক্তির প্রয়োজন হয়। ত্যাগ-বৈরাগ্য ও ভক্তির মাধ্যমেই আত্মার আমি বা মাতৃবোধের সঙ্গে পরিচয় হয়। এই অবস্থায় সাধক বলে মায়ের আমি বা তোমার আমি। তারপরে ভক্তি লাভ হলে বলে 'আমার আমি'। একে বলে স্বগত ভেদ অর্থাৎ একই অঙ্গের প্রত্যঙ্গ বিশেষ। সর্বোত্তম অবস্থায় হয় 'আমিত্বের আমি'। এ হল আমিতত্ত্ব[৪]।

শ্রেষ্ঠত্ব লাভের রহস্য

'আমার' অপেক্ষা আমি বা মায়ের উপর বেশি নির্ভর করে যে মানবসমাজ ও মানবজাতি তারাই শ্রেষ্ঠ হয়। নির্ভর=নির+ভর। 'নির' অর্থ প্রাণ, জল বা রস এবং 'ভর' অর্থ পূর্ণ কর, ভর্তি কর বা গ্রহণ কর। প্রাণই হল নাম ও ভাব। 'নির্ভর' মানে ভর্তি কর, পূর্ণ কর অন্তরকে নামের দ্বারা, প্রাণের দ্বারা, ভাব ও বোধের দ্বারা। প্রাণরসে আপনাকে নিমগ্ন করতে হয়। প্রাণরসই হল মা। এই প্রাণরূপী মায়ের মূর্ত ও ঘনীভূত প্রকাশই হল এই বিশ্বভুবন। বিশ্বের প্রতি প্রকাশের মধ্যে প্রাণরূপী মা-ই বিরাজ করেন। অন্তরপ্রাণ দিয়ে অর্থাৎ আমি বা আপনবোধ দিয়ে বাইরে অনন্ত প্রাণরূপী মাকে 'মেনে মানিয়ে চলাই' হল নির্ভরতার তাৎপর্য[৫]। প্রতি প্রকাশকে আমি বা মাতৃবোধে গ্রহণ করলে নির্ভরতা সাধিত হয়।

প্রকাশের বিজ্ঞান

প্রকাশের নামই হল প্রাণ, সংজ্ঞান বা বোধ। প্রকাশকে ব্যবহার করতে হলে নাম দিয়েই করতে হয়। সেইজন্য নামের দ্বারা অর্থাৎ প্রাণরসের দ্বারা আমিকে পূর্ণ করতে হয়। সকলেই প্রাণমাতার সন্তান বা প্রকাশ। সকলের মধ্যেই

১। স্বানুভূতির দৃষ্টিতে। ২। বিজ্ঞান দৃষ্টিতে। ৩। অভিনব সংজ্ঞা। ৪। স্বানুভূতির দৃষ্টিতে। ৫। অভিনব সংজ্ঞা।

প্রাণ বিদ্যমান। অনন্ত নাম শুনতে শুনতে সহসা কোন এক বিশেষ ক্ষণে নামের মধ্যে ডুবে নামের মধ্যে মিশে একীভূত হওয়া যায়। তখনই হয় পূর্ণতা লাভ। অখণ্ড নামপ্রবাহের মধ্যে যুক্ত হয়ে গেলে অভাববোধ আর থাকে না। একেই বলে ভাবরাজ্য। মন যদি চকিতে একবার প্রাণের আবর্তের মধ্যে প্রবেশ করে তখন মনের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য প্রাণচৈতন্যের প্রভাবে ভাবমুখী গতি প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ভাবস্থ অবস্থায় চলতে থাকে। ভাবের ঘনীভূত অবস্থা হল মহাভাব এবং পূর্ণ অবস্থা হল স্বভাব। স্বভাববোধই হল আত্মবোধ। এই স্বভাববোধ দ্বারাই সর্বভূতে ঈশ্বরের অনুভূতি হয়।

ব্রহ্মাস্মি বোধে প্রতিষ্ঠিত হয়েও একভাবে অধিক কাল থাকা যায় না।

অখণ্ড সত্যের ব্যবহার বিজ্ঞান

অখণ্ড সত্যের মধ্যে নাম রূপ বা দেহকে বাদ দিয়ে সত্যকে গ্রহণ করা যায় না। সোনা দিয়ে কোন ডিজাইন-প্যাটার্নের অলঙ্কার তৈরি হওয়ার পূর্বে ও পরে এবং ডিজাইন-প্যাটার্ন বা নাম-রূপের বিনাশ হলে অর্থাৎ কারণের মধ্যে কার্যের অবসান হলে সর্ব অবস্থায় এক সোনাই থেকে যায়। সেইরূপ নিত্যবস্তুও পূর্বাপর একই থাকে। দেহকে বাদ দিয়ে পূর্ণভাবে সত্যানুভূতি হয় না। দেহও চৈতন্য বা বোধ দিয়েই তৈরি। রূপ নাম ভাব ও বোধ এই চতুর্বিধ অবস্থা অখণ্ড বোধময় সত্তার অভিব্যক্তি মাত্র। এই সত্যই হল অদ্বয়তত্ত্ব। সত্যের মধ্যে সত্য ছাড়া আর কিছু নেই। সত্যের ব্যবহার যেখানে যে-ভাবেই হোক, সত্যই নিমিত্তকারণ, উপাদানকারণ ও কার্য।

পূর্ণবোধে বর্জনের স্থান নেই।

প্রাণরূপী মায়ের লীলারহস্য

প্রাণরূপী মা তাঁর প্রকাশসন্তান নামরূপ প্রাণকে প্রাণ দিয়ে প্রাণময় করে ধারণ করেন। অখণ্ড প্রাণের লীলা-খেলায় প্রাণ হতে প্রাণ, প্রাণের দ্বারা প্রাণ, প্রাণের জন্য প্রাণ, প্রাণেতে প্রাণ, প্রাণকে প্রাণ করে প্রাণ দান। এইরূপ প্রাণের দেওয়া-নেওয়ারূপ অভিনব খেলার মাধ্যমেই প্রাণের পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাণের থেকে প্রাণের বিচ্ছেদ অসম্ভব।

অখণ্ড প্রাণসত্তাই হল অস্তিত্ব সত্তা। এর অভাব কখনও হয় না। প্রাণ কখনও দুর্বার স্রোতে অনন্ত প্রবাহে তরঙ্গায়িত হয়ে চলে। এ হল প্রাণের বিজ্ঞানময় সগুণ অবস্থা। আবার কখনও শান্ত হয়ে আপনার মধ্যেই সে মিশে থাকে। এ হল তার প্রজ্ঞানময় নির্গুণ শান্ত অবস্থা। এই হল নির্গুণ ব্রহ্মের পরিচয়। এর অনুভূতি সগুণ ও নির্গুণভাবেও যেমন হয়, পরব্রহ্ম, পরাৎপরব্রহ্মরূপেও তেমন হয়।

শিব ও শক্তির তাৎপর্য

শিব হলেন পরমসত্য পরমকল্যাণ মঙ্গলময় জ্ঞানময় পরমানন্দস্বরূপ ব্রহ্মস্বরূপ স্বয়ংপ্রকাশ। এ হল পরমতত্ত্বের পরিচয়। এই শিব আবার যখন সগুণভাবে সাকার রূপ ধারণ করেন তখন তাঁর আপন শক্তিই হয় তার কারণ। সেই শিবকেও যিনি প্রকাশ করেন তিনি হলেন শিবমাতা। আবার তাঁর হৃদিবিলাসিনীরূপে তিনিই শিবানী। 'শিবানী চ শিবমাতা, ব্রহ্মাণী চ ব্রহ্মমাতা।' ব্রহ্মহৃদিবিলাসিনী হয়েও তিনিই আবার ব্রহ্মপ্রসবিনী। ব্রহ্মের স্বরূপ যিনি প্রকাশ করেন ব্রহ্মের হৃদয়ে থেকে তিনিই ব্রহ্মের মাতা। ব্রহ্ম হল তাঁর প্রকাশসন্তান। এখানে মাতা ও সন্তানের তাৎপর্য হল সমগ্র প্রজ্ঞানের বিজ্ঞান শক্তি ও তার অভিনব অভিব্যক্তি অর্থাৎ সচ্চিদানন্দশক্তি ও তার প্রকাশ অভিব্যক্তি। প্রকাশক ও প্রকাশ অভেদ। সত্তা ও শক্তি অভেদ। ব্রহ্ম ও তার শক্তি, শিব ও তার শক্তি অভেদ।

প্রাণের মহিমায় জন্মমৃত্যু হল ক্ষুদ্র তরঙ্গ বিশেষ এবং সুখদুঃখ হল বুদ্বুদ মাত্র, এই আছে এই নেই। 'মা' বলার সঙ্গে সঙ্গে সকলের অন্তরে মাতৃবোধ ফোটে। এই মাতৃবোধই হল অনন্ত অসীম বোধসত্তা বা চৈতন্যসত্তা বা মহাপ্রাণসত্তা। এ-ই অমৃতময় আনন্দের আতিশয্যে আমিবোধে ফুটে ওঠে।

মায়ের আনন্দলীলার তাৎপর্য

সচ্চিদানন্দ প্রেমময়ী মা অন্তরের অফুরন্ত আনন্দের অভিব্যক্তি প্রকাশ করতে গিয়ে লীলামানসে প্রকাশ করেন আমিরূপে নিজেকে। আত্মারূপী মায়ের বক্ষে তাঁর প্রথম অভিব্যক্তি বা সন্তান হল আমিবোধ[১]। এই আমির সঙ্গে তাঁর অভেদ সম্বন্ধ। লীলামানসে এই আমিবোধকে আবার অনন্ত আমিবোধে প্রকাশ করে তিনি সকলের সঙ্গেই তাঁর বোধের খেলা[২] খেলেন।

মায়ের এই আনন্দলীলায় সন্তান যখন বড় হতে থাকে তখন মায়ের আনন্দও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। এই আনন্দ আস্বাদনের জন্যই তিনি নিজেকে নিজেই বিভক্ত করেন সন্তানরূপে; অর্থাৎ ব্যষ্টি আমিরূপে প্রকাশ করেন। আনন্দ হতেই আনন্দের সৃষ্টি, আনন্দ দ্বারা আনন্দ পরিপুষ্ট হয়, আবার আনন্দের মধ্যেই লয় হয়। আনন্দই হল ভূমানন্দময়ী মায়ের সত্যরূপ। তাঁর এই ভূমানন্দ স্বরূপ প্রকাশ করাই হল তাঁর স্বভাব এবং এর উদ্দেশ্য হল তাঁর শ্রেষ্ঠ মহিমা প্রেমের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশলীলা। আনন্দের আতিশয্যেই ভূমানন্দস্বরূপের মধ্যে এই প্রেমের উদয় হয়। আপন আনন্দ আস্বাদন করার জন্য, মিলনের মাধ্যমে স্বভাবমহিমা অনুভব করার জন্য, আনন্দ এবং লীলার স্বরূপ প্রকাশ করার জন্যই তাঁর এই প্রেমের অভিব্যক্তি। আপনার সঙ্গে আপনার খেলাই হল তাঁর আত্মলীলা। শুদ্ধবোধস্বরূপ হল আত্মা। শুদ্ধবোধই হল আবার আনন্দস্বরূপ। পূর্ণানন্দই হল প্রেমের স্বরূপ। আত্মলীলা হল আত্মবিলাস অর্থাৎ সচ্চিদানন্দের বক্ষে সচ্চিদানন্দের নৃত্য। কারণ সচ্চিদানন্দ, উদ্দেশ্য সচ্চিদানন্দ এবং বিধেয়ও সচ্চিদানন্দ। সচ্চিদানন্দ ঈশ্বর আত্মা ব্রহ্মময়ী মায়ের মধ্যে কেবল সচ্চিদানন্দ স্ফূর্তির অভিব্যক্তি ও বিলাস স্বতঃসিদ্ধ।

পূর্ণপ্রেমের বৈশিষ্ট্য ও মহিমা

পূর্ণানন্দের স্বরূপই হল প্রেম। প্রেম হল স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং আনন্দের মৌলিক উপাদান। ঈশ্বর ও প্রেমতত্ত্ব অভিন্ন। প্রাণচৈতন্যের পূর্ণ অবস্থায় এ আপনিই উছলে পড়ে। প্রেমের উদ্দেশ্য হল প্রেম। আনন্দের অভিব্যক্তির সঙ্গে এ নিত্য যুক্ত বলে সমতা, একতা ও পূর্ণতাই হল এর বিশেষ লক্ষণ। আনন্দলীলায় তার সৃষ্টি, বৃদ্ধি ও পরিণতির কারণরূপে আনন্দই নিহিত থাকে। আনন্দের জন্যই আনন্দলীলা। প্রেম ও আনন্দের মধ্যেও কোন ভেদ নেই। সৎ-চিৎ-আনন্দ এক তত্ত্বেরই তিন নাম। সুতরাং সত্য, বিশুদ্ধ বোধ বা চৈতন্য, অখণ্ড আনন্দ ও বিশুদ্ধ প্রেম, নিত্যপূর্ণ অখণ্ড এক বা সমার্থবোধক।

প্রেমময়ী মাতার প্রথম প্রকাশ নাদ, নাম, সন্তান হল 'আমি'। 'আমিকে' নিয়ে প্রেমময়ী মায়ের আনন্দলীলা হল অনাদি অনন্ত। আমি মায়ের সন্তান, আমিও নিত্য অনন্ত অসীম। তাকে নিয়েই অসীমা মায়ের নিত্যলীলা।

অনন্ত অসীম মা নিজের সত্তাশক্তি ও আনন্দ দিয়ে, নিজের প্রাণ মন বুদ্ধি দিয়ে, স্নেহ ভালবাসা ও প্রেম দিয়ে আমিরূপ সন্তানকে গড়ে তোলেন। তাকে বড় করে, মহান করে, পূর্ণ করে আবার নিজের মধ্যে সংহার করে নেন। এই তাঁর মাধুর্যলীলার তাৎপর্য। তাঁর অদ্বয় অব্যয় অমৃতময় বক্ষে পূর্ণ প্রাণচৈতন্যের লীলামাধুর্যই হল নিত্যের মহিমা। এ-ই নিত্যের নিত্যলীলা। এ-ই সচ্চিদানন্দস্বরূপের নিত্য শাশ্বত স্বভাবধর্ম। অব্যক্ত সত্তায় অর্থাৎ

১। তত্ত্ব সন্দেশ। ২। তত্ত্বের দৃষ্টিতে আমিবোধে হয় আত্মার খেলা এবং আমারবোধে হয় মনের খেলা। আত্মবিজ্ঞান হল বোধের বিজ্ঞান এবং মনের বিজ্ঞান হল নাম-রূপের বিজ্ঞান, বৈচিত্র্যের বিজ্ঞান।

প্রজ্ঞান সত্তায় তিনি-ই মহাকালী, ব্যক্ত অন্তরসত্তায় বা বিজ্ঞানসত্তায় তিনি-ই মহালক্ষ্মী এবং ব্যক্ত বিরাট সত্তায় তিনি-ই মহাসরস্বতী। অর্থাৎ নিজেই বাইরে স্থূল, অন্তরে সূক্ষ্ম ও কারণ এবং তুরীয়তে মহাকারণরূপে এক অদ্বয়তত্ত্ব। প্রেমলীলা তাঁর পূর্ণ অদ্বয়তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার খেলায় তাঁর একাংশে আপন স্বভাব বা বিজ্ঞানের বিলাস মাত্র।

ভূমা আমির পরিচয়

যে আমি, সে-ই তুমি এবং সে-ই তিনি। সেই জন্য অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এই তিনকাল নিয়েই জগৎ। এই তিনকাল নিয়েই মহাকাল। জগৎমূর্তি কালীতারা। অতীত পিতা, বর্তমান মাতা এবং ভবিষ্যৎ সন্তান। এই তিনের মধ্যে নিত্য মায়ের অধিষ্ঠান। আমি ছিলাম, আমি আছি এবং আমি থাকব।

সেই পূর্ণ সচ্চিদানন্দস্বরূপ আমিই প্রকাশক এবং আমিই প্রকাশ। উভয় আমি এক অখণ্ড ভূমা আমির পরিচয়। এটা যে-বোধের মাধ্যমে হয় তাই বিশ্বাস।

বিশ্বাসের তত্ত্ব

নির্গুণ গুণময়ী কালীমাতা নিত্যসত্য আনন্দরূপে নিত্যবর্তমান। স্বানুভূতিরূপে তা যখন অভিব্যক্ত হয় তখনই হয় বিশ্বাস।

ব্যষ্টি প্রকাশের গতি যেখানে মিলে যায় অর্থাৎ যেখান হতে অহংকার ওঠে, যার মধ্যে অহংকার বাস করে এবং যার মধ্যে অহংকার মিলে যায় তার নাম বিশ্বাস। বিধিগত বিশ্বাস হল বিশ্বাস, অর্থাৎ প্রাণ ও মনের মিলনস্থিতি হল বিশ্বাস। সত্তা ও শক্তির অভেদ অনুভূতিই হল বিশ্বাস। প্রজ্ঞানের বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানের প্রজ্ঞান স্থিতি হল বিশ্বাস।

অস্তিত্বের তত্ত্ব

ত্রিগুণময়ী পরমাপ্রকৃতি ব্রহ্মবিদ্যা, ব্রহ্মশক্তি বা আদ্যাশক্তিই হল সচ্চিদানন্দময়ী মাতা। বিশ্ব হল তাঁর কার্য-কারণের বহিঃপ্রকাশ অর্থাৎ মহাপ্রাণরূপী মাতার বহিরংগ বা অখণ্ড মহাপ্রাণের ঘনীভূত প্রকাশ ও মহাপ্রাণের আশ্রয়। এর মধ্যেই মহাপ্রাণরূপী মাতা বা ভগবান তাঁর অনন্ত অসীম বিরাট সর্বশক্তি-জ্ঞান-আনন্দ ও প্রেমের কারণাতীত ও কারণরূপ, নির্গুণ ও সগুণরূপ, নিত্যলীলাময়স্বরূপের ও তাঁর পরমাত্মস্বরূপের স্বভাবমহিমা নিয়ত প্রকাশ করেন। 'অস্' মানে অস্তি বা সৎ। এ-ই অস্তিত্ব, বর্তমানতা ও বিদ্যমানতার প্রমাণ। এ নিত্যসত্য। সর্বকালে সবকিছুকে প্রকাশ করেও স্বরূপত যা নির্বিকার ও সমান থাকে তাই সত্য[১]। এ কালাতীত হলেও সর্বকাল এর মধ্যে অবস্থান করে। একে আশ্রয় করে এর দ্বারাই সব প্রকাশিত হয়। এই 'সৎ' সর্ববস্তু, সর্বপ্রকাশ ও সর্বক্রিয়ার আশ্রয় ও আশ্রয়ী স্বয়ং। সত্য স্বয়ংপ্রকাশ, কিন্তু এগুলির মাধ্যমে তার মহিমা প্রকাশ পায়। এই সত্যের প্রকাশরূপই হল বিশ্ব এবং এই প্রকাশক্রিয়াকে বলা হয় শক্তি। সৎ-এর এই শক্তিই হল সন্ধিনী। তার অপর নাম ব্রহ্মাণী, সরস্বতী, সবিতা বা সাবিত্রী। সত্যের ক্রিয়া বা প্রকাশধর্ম হল চিৎ বা জ্ঞান। এর শক্তি হল সম্বিৎ। এই চিৎ বা জ্ঞানের ক্রিয়া বা প্রকাশধর্ম হল প্রীতি ও আনন্দ। এর শক্তি হল হ্লাদিনী। এই তিনের সম্মিলিত রূপই হলেন তিনি অর্থাৎ সৎ-চিৎ-আনন্দ বা অস্তি-ভাতি-প্রীতি এবং প্রখ্যা-প্রবৃত্তি-ঘোর। (সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ) সুতরাং 'বিশ্বাস' শব্দের মধ্যে সচ্চিদানন্দস্বরূপের তাৎপর্য ও মহিমা নিহিত আছে।

পূর্ণ বিশ্বাস ও ঈশ্বর বা ভগবান অভেদ। বিশ্বাসই ঈশ্বর এবং ঈশ্বরই হল বিশ্বাস। বিশ্বাস বিনা ঈশ্বর হয় না,

১। তত্ত্বভিত্তিক সংজ্ঞা।

ঈশ্বরের প্রকাশ হয় না, ঈশ্বরের উপলব্ধি হয় না এবং ঈশ্বরময় হয়ে এক ঈশ্বর হওয়া যায় না।

তোমার ও আমার এবং তুমি ও আমিবোধের পূর্ণ মিলনের প্রকাশ হল বিশ্বাস[১] ; অর্থাৎ পূর্ণতার সঙ্গে মিশে একীভূত হয়ে থাকা বা যুক্ত হয়ে থাকার নাম বিশ্বাস। সত্যই বিশ্বাস ও অস্তিত্ব।

আনন্দই সব কিছুর মূল। প্রেমের আতিশয্যেই এই আনন্দের প্রকাশ। অখণ্ড প্রাণচৈতন্য যখন পূর্ণপ্রেমে মেতে ওঠে, তখন আনন্দের অভিব্যক্তি হয়। এই আনন্দ দিয়েই তিনি তাঁর অনন্ত মহিমাকে প্রকাশ করেন আবার নিজেই তা ধারণ করেন। প্রেমানন্দে তিনি প্রকাশের ইচ্ছা করেন। আনন্দস্বরূপিনী মায়ের আনন্দ প্রকাশের ইচ্ছার পূর্ণরূপই হল সন্তান আমি।

পূর্ণপ্রাণের মধ্যে সব কিছুই পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। সকল চাওয়া-পাওয়ার সমাধান হয় এই পূর্ণপ্রাণের সঙ্গে মিলন হলে। অখণ্ড ভাবে সত্যকে মেনে মানিয়ে চললে হয় পূর্ণপ্রাণের সঙ্গে মিলন।

মায়ের অভিনব পরিচয়

যিনি শোনেন ও শোনান, যিনি দেখেন ও দেখান, যিনি জানেন ও জানান, যিনি হন ও হওয়ান তিনি-ই মা। যেখানে অহংকার অভিমানের অর্থাৎ পৃথক আমির প্রাধান্য নেই সেখানে শুধু তুমি মা সত্য। এই হল সন্ন্যাসের অভিনব অর্থ।

পূর্ণ প্রাণচৈতন্যরূপী মা বা বিশুদ্ধচৈতন্যময় আত্মস্বরূপকে স্মরণ করাই হল শরণাগতি। শরণাগতি এসে গেলেই রোগ শোক দুঃখকষ্ট অভাব অজ্ঞান নিরানন্দ ও মৃত্যু বাধিত হয় এবং জীব পরমশান্তির আশ্রয় পায়। সুতরাং ঈশ্বরের শরণাগতিই হল শান্তিলাভের অন্যতম প্রধান উপায়। স্ব-স্বরূপকে স্মরণ করতে পারলে ঋষিত্ব[২] লাভ হয়।

আত্মস্মৃতির লক্ষণ হল সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্ম, আত্মা, মা অথবা আমির বক্ষে আমি আছি। আমি নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্ত। সেই মাতৃভক্ত আমি মা ছাড়া আর কিছু জানে না; অর্থাৎ চিদানন্দ আত্মা বা আমি ছাড়া কিছু জানে না।

মায়ের সঙ্গে সন্তানের নিত্য অভেদ সম্বন্ধ। মা ও সন্তান এই দুই নিয়েই দুনিয়া। এই উভয়ের যোগে হয় পূর্ণসত্য, পূর্ণজ্ঞান অদ্বয়তত্ত্ব। প্রকাশের সঙ্গে প্রকাশকের খেলাই হল নিত্যলীলা। অনাদি অনন্ত এই লীলা। সন্তান ছাড়া মা অসিদ্ধ, কারণ প্রকাশক ছাড়া প্রকাশ অসিদ্ধ ও অসম্ভব। আবার মাতৃহীন সন্তানও হতে পারে না কারণ প্রকাশক না থাকলে প্রকাশ থাকতে পারে না। এ অসিদ্ধ ও অসম্ভব। মায়ের একমাত্র পরিচয় সন্তানকে দিয়ে। মায়ের একান্ত প্রিয় আপনজন তার সন্তান। আবার সন্তানের একান্ত প্রিয় আপনজন হল সচ্চিদানন্দময়ী মা। উভয়ের মধ্যে নিত্য অভেদ মধুর সম্পর্ক। এই হল মাধুর্য ভাবের অপূর্ব অভিব্যক্তি। মা সন্তানকে কখনও নাশ করতে পারে না, হাত ধরে রাখে। তার মুণ্ড ধরে রাখে যেন বিপথে না যায়। এই জন্য মায়ের গলায় মুণ্ডমালা এবং মায়ের হাতে একটি মুণ্ড ধরা আছে। বিশ্বের অনন্ত রূপ নিয়েই মা। সেজন্যই তিনি বিশ্বমাতা। এই বিশ্বমাতার পূর্ণরূপ পাওয়া যায় মা কালীর রূপের মধ্যে। তাঁর অতি আদরের প্রিয় সন্তানকে তিনি বক্ষে ধারণ করে রেখেছেন এবং হাতেও তাকে ধরে রেখেছেন। মুণ্ডগুলি তাঁর স্বভাবসন্তান বা সৃষ্টির বীজ। বিশ্ব হল মা কালী, মুণ্ডমালা হল তাঁর সৃষ্টি বা সন্তান। স্রষ্টা হলেন মা। মায়ের মধ্যে সন্তানের উদয় ও লয় হয়। পূর্ণপ্রাণের মধ্যে সে নিত্যযুক্ত হয়ে মিশে আছে।

জন্ম-মৃত্যু মাতৃবক্ষে দুটি ভাব মাত্র। জন্ম-মৃত্যু হল যেন পোশাক পরিবর্তন, পট পরিবর্তন এবং অবস্থা ও কর্মের পরিবর্তন। এক দপ্তর থেকে আর এক দপ্তরে, এক ঘর থেকে আর এক ঘরে, এক স্থান থেকে আর এক স্থানে, এক পরিবার থেকে আর এক পরিবারে, এক দল থেকে আর এক দলে, রূপ হতে রূপান্তরে, দেহ হতে

১। অভিনব সংজ্ঞা। ২। তত্ত্বের বিজ্ঞানে।

দেহান্তরে, নাম হতে নামান্তরে ভাব হতে ভাবান্তরে ও বোধ হতে বোধান্তরে গমনাগমনই হল জন্ম-মৃত্যুর তাৎপর্য। কিন্তু চিদানন্দময়ী মায়ের বক্ষ থেকে অর্থাৎ সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্ম বা আত্মসত্তা থেকে কেউ কখনও বিচ্ছিন্ন হয় না। 'আমির' বিশেষণ বা গুণ ও অবস্থার অর্থাৎ 'আমার বোধের' পরিবর্তন হয় মাত্র। 'আমি' মায়ের বুকে যেমন ছিলাম, তেমনই আছি এবং তেমনই থাকব। এই সকল বিশেষণ বা বৈচিত্র্য হল প্রাণের তরঙ্গ। এগুলি আসে আর যায়, ওঠে ভাসে আবার লীন হয়ে যায়। 'আমি' সর্ব অবস্থায় সাক্ষীরূপে বর্তমান থাকে।

প্রাণ স্থির হলে মন স্থির হয়। বৈচিত্র্য হল মানস বৃত্তি। বিশেষ্য থাকলে বিশেষণও থাকে এবং বিশেষণ থাকলে তার একটা বিশেষ্যও থাকে। যে-আমি শৈশবে ছিল, সে-আমি বর্তমানেও আছে এবং সে-আমি ভবিষ্যতেও থাকবে। এই আমি হল আত্মা। সর্বপ্রকাশের নিত্য নির্বিকার সাক্ষী। এই হল অখণ্ড সত্য। মায়ের আমি ও সন্তানের আমি হল পরমাত্মার ও জীবাত্মার আমি। পরমাত্মার বক্ষে জীবাত্মা নিত্য বিরাজ করে। জীবাত্মা হল পরমাত্মারই ব্যষ্টিরূপ এবং পরমাত্মা হলেন জীবাত্মার পূর্ণরূপ। 'মা' শব্দের লক্ষ্যার্থ হল পরমাত্মা এবং বাচ্যার্থ হল জননী[১]।

আপনবোধের স্বরূপ ও তাৎপর্য

অস্তি ও নাস্তি উভয় ভাব আত্মচৈতন্যেরই অভিব্যক্তি। অস্তি নাস্তির কেন্দ্র হল আপনবোধ বা নিজবোধ বা আত্মা। এই আপনবোধ বা আত্মা ও ঈশ্বর হল অভেদ। আপনাকে কোন অবস্থাতেই বাদ দেওয়া বা অস্বীকার করা যায় না। আপনাকে মানলে ঈশ্বরকে অস্বীকার করা যায় না। আত্মা হল প্রত্যেকের ভিতরে সাক্ষী আমি বা সাক্ষী বোধ, যা সর্ব অবস্থাতেই সমান থাকে। আত্মা সর্ববোধের অধিষ্ঠান। এর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই, বিকল্প নেই। এ স্বয়ংপূর্ণ, স্বয়ংপ্রকাশ। এই আত্মাই হল অনুভবসিদ্ধ ভূমা বস্তু বা ভূমাতত্ত্ব। আত্মার মধ্যে, ঈশ্বরের মধ্যে থেকে আত্মা ও ঈশ্বরকে যেমন অস্বীকার করা যায় না সেইরূপ বিশ্বের মধ্যে থেকেও বিশ্বকে বাদ দেওয়া যায় না। সত্য হল অখণ্ড নিত্য নির্বিকার বিশুদ্ধ বোধস্বরূপ। ব্রহ্ম আত্মা ঈশ্বরই হল সত্যস্বরূপ। সত্যের মধ্যে সত্য অতিরিক্ত কিছু নেই। সত্য স্বতঃসিদ্ধ স্বয়ংপ্রমাণ। ভ্রান্তি ও মিথ্যা হল সত্যের ছায়া। এ অনিত্য ও অস্থায়ী। সাময়িকভাবে এর ক্রিয়া সত্যের অংশমাত্র আবৃত করে সত্যের বক্ষে সত্যেরই আলোযুক্ত হয়ে আলোছায়ার খেলা খেলে। সত্য কিন্তু নির্বিকারই থাকে।

সত্য এবং মিথ্যার স্বরূপ ও তাৎপর্য

মিথ্যা 'হাঁ'-কে 'না' রূপে প্রকাশ করে এবং 'না'-কে 'হাঁ' রূপে প্রকাশ করে। কিন্তু সত্য 'না'-কে 'না' রূপে এবং 'হাঁ'-কে 'হাঁ' রূপেই প্রকাশ করে। সত্য নিজে কিন্তু 'হাঁ' ও 'না'-র অতীত। সত্যই হল জ্ঞানস্বরূপ। মিথ্যা হল অজ্ঞান। সত্যের আলোতে মিথ্যা থাকে না এবং জ্ঞানের আলোতে অজ্ঞান থাকে না। বিচারই হল জ্ঞানের আলো। বিবেক তার লক্ষণ। ত্যাগ-বৈরাগ্য তার ব্যবহার। মুক্তি ও শান্তি হল তার স্বরূপ। স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ তার ধর্ম। নির্বিকার সমতাই হল তার মর্ম।

মানা ও না-মানার লক্ষণ

যা অনিত্য অস্থায়ী তা-ই বিকারধর্মী, তা-ই মিথ্যা। অজ্ঞান তার কারণ। না-মানা হল অজ্ঞানের কাজ এবং মানা হল জ্ঞানের কাজ। না মানলে জানা যায় না। মানার ফলে 'না' হাঁ হয়। মিথ্যা নাশে সত্যের প্রকাশ হয় এবং অজ্ঞান

১। স্বানুভব সিদ্ধির ফলশ্রুতি।

দূর হয়ে জ্ঞানের প্রকাশ হয়। ছোট ছোট জ্ঞানের বৃত্তি ও খণ্ড সত্যগুলি মিলিত হয়ে সত্য ও জ্ঞানের অভিজ্ঞতা বাড়িয়ে দেয়। অজ্ঞান থেকেই জ্ঞান হয়। জ্ঞানবৃত্তি মিলে অভিজ্ঞতা এবং অভিজ্ঞতার পূর্ণমানই অনুভূতি। এই অনুভূতির পূর্ণমাত্রাই হল সত্যবোধ। প্রাণচৈতন্যই হল সর্ব বৈচিত্র্যের কারণ। চৈতন্যই হল সত্তা এবং চৈতন্যই হল শক্তি। চৈতন্যের অভিব্যক্তিই হল জীবসমষ্টি। চৈতন্যের মধ্যেই সকলে বাস করে। এই সত্তাই সত্য, চৈতন্যময় প্রাণই সত্য। প্রাণের বক্ষে প্রাণ এবং সত্যের বক্ষে সত্য একই কথা। প্রাণের দ্বারা প্রাণকে ধারণ করা ও ব্যবহার করার নামই প্রাণময় হওয়া বা প্রাণবান হওয়া। সেইরূপ সত্য দ্বারা সত্যকে ধারণ করা ও ব্যবহার করার নামই শ্রদ্ধাবান হওয়া বা শ্রদ্ধাময় হওয়া। শ্রদ্ধাবান হওয়া, শ্রদ্ধাময় হওয়া এবং মাকে ধরা এক কথাই। একে বলা হয় 'মেনে মানিয়ে চলা'[১]।

প্রকাশক ও প্রকাশের অভেদ সম্বন্ধ

শ্রদ্ধাময় হওয়া মানে সত্যস্বরূপে যুক্ত হওয়া এবং মাকে 'মেনে মানিয়ে চলা' মানে মাতৃময় হয়ে যাওয়া। শ্রদ্ধা হল সত্যধারণ। সত্য হল বাক্‌ময়। বাক্‌ই সত্য। বাক্ দিয়েই সত্যকে ধরতে হয়। প্রকাশচৈতন্যের মাধ্যমেই প্রকাশকচৈতন্যের পরিচয় মেলে। মহাপ্রাণরূপী মা হল আত্মচৈতন্য। প্রকাশক যেমন চৈতন্যময় প্রাণ তাঁর বৈচিত্র্যময় প্রকাশগুলিও প্রাণচৈতন্য। প্রাণের দ্বারাই প্রাণের পরিচয় মেলে। বিশ্বপ্রাণই হল মহাপ্রাণ। ব্যষ্টিপ্রাণ তাঁর সন্তান। সন্তানরূপ প্রাণ সর্বপ্রকাশরূপ প্রাণকে ধরেই প্রকাশক মাতৃবক্ষে পূর্ণভাবে মিশে যেতে পারে। প্রাণেরই অপর নাম প্রজ্ঞা, চেতনা বা বোধ।

সত্য ও শ্রদ্ধার অভিন্ন সম্বন্ধ

প্রকৃতি হল চৈতন্যময় প্রাণশক্তির সম্যক্‌রূপ। প্রকৃতিকে ব্যবহার করে তার কাছ থেকে উপকার পেয়ে ও পুষ্টি লাভ করে তাকে না-মানা হল অকৃতজ্ঞতা। অজ্ঞানের মূলেই আছে জ্ঞানভূমি প্রজ্ঞানাত্মা। অজ্ঞানের আবরণ সরে গেলেই জ্ঞানের প্রকাশ হয়। অজ্ঞান ও জ্ঞান হল জ্ঞানস্বরূপের দ্বিবিধ অভিব্যক্তি। সত্যকে জানা মানে সত্যপ্রাণকে জানা। এর বিজ্ঞান হল শ্রদ্ধা। প্রাণ শ্রদ্ধার মাধ্যমেই প্রাণকে জানে।

প্রজ্ঞান আত্মা ও বিজ্ঞান আত্মার তাৎপর্য

বিশেষণশূন্য সত্তা হল প্রজ্ঞানস্বরূপ আত্মা। বিশেষণযুক্ত সত্তা হল বিজ্ঞানস্বরূপ আত্মা। এক পরমাত্মারই দ্বিবিধ ভাব। বিজ্ঞান আত্মা হল প্রকাশক এবং বৈচিত্র্যাদি হল তাঁর প্রকাশসমূহ। সর্বপ্রকাশই বিজ্ঞানাত্মার বক্ষে স্থিত। বিজ্ঞানাত্মা সর্বপ্রকাশের সঙ্গেই যুক্ত। সবকিছু তাঁর বিশেষণ। বিশেষণ বরণ করে ও গ্রহণ করেই প্রজ্ঞানাত্মা বিজ্ঞানাত্মা হয়। বিশেষণের মাধ্যমে বিশেষ রূপ গ্রহণ করে বলেই তাঁকে বিগ্রহ[২] বলে। বিগ্রহ অর্থ বিশেষ রূপ গ্রহণ। সর্বকে যে গ্রহণ করে সে-ই হয় সর্বাণী মাতার প্রিয়। 'সর্ব' মানে প্রকাশপ্রাণ এবং সর্বাণী হল মহাপ্রাণ। সর্বকে যে বাদ দেয় সে হয় শব। এই প্রাণকে বাদ দিলে হয় মৃত্যু[৩], কিন্তু প্রাণকে গ্রহণ ও বরণ করলে হয় অমৃত[৪]। প্রাণকে যখন সর্বরূপে গ্রহণ করা হয় তখন হয় শ্রদ্ধা ও পূর্ণতা।

মহাপ্রাণের অনুভূতি হল বিশ্বাত্মা, বিজ্ঞানাত্মা, ঈশ্বর বা সগুণ ব্রহ্মের অনুভূতি।

১। স্বানুভূতির দৃষ্টিতে। ২। অভিনব সংজ্ঞা। ৩। অভিনব সংজ্ঞা। ৪। অভিনব সংজ্ঞা।

মাধুর্যের স্বরূপলক্ষণ

মাধুর্যবোধই হল সত্যের চরমতম অনুভূতি। মাধুর্য অর্থ হল প্রেম, যা আনন্দের আতিশয্যে স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্ত হয় এবং সমধারায় ছড়িয়ে পড়ে। সবকিছুকে মধুময় করে নেয় বলে প্রেমকে মাধুর্য বলা হয়। মধুবোধ মধু সম্বন্ধীয় প্রাণচৈতন্যের একতানগতিই হল প্রীতি, আনন্দ ও মাধুর্য[১]।

যা থেকে সব পাওয়া যায়, যে সব দেয় ও সব নেয়, যা দ্বারা পূর্ণতা লাভ হয় এবং যা নিত্যশুদ্ধ নিত্যবুদ্ধ নিত্যপূর্ণ ও নিত্যমুক্ত তাকেই আত্মা বলে। যা তমঃ প্রভৃতি গুণাতীত তাই আত্মা। জীবভাব তাঁর মানসকল্পিত স্বভাবজাত স্বপ্নতুল্য অভিনয় মাত্র। এই অভিনয় হল মা ও সন্তানের অভিনয়; অর্থাৎ ব্যক্তাব্যক্তের অভিনয়। একবার অব্যক্ত থেকে ব্যক্ত হয় আবার ব্যক্ত থেকে অব্যক্ত হয়। ব্যক্ত ডাকে অব্যক্তকে, 'আয়, আয়, আয়'। আবার অব্যক্ত ডাকে ব্যক্তকে, 'আয়, আয়, আয়'। সন্তান ডাকে মাতাকে, আয় তো মা আয় এবং মা ডাকেন সন্তানকে— 'আয় তোরা আমার বুকে আয়'। আসলে ডাকে কিন্তু একজন নিজেকেই বা আপনাকেই। সেই ডাক ছড়িয়ে পড়ে আপন বক্ষে। এই ডাকের ধ্বনিই হল মহাবাক্য মহাবাণী প্রণব ওঁকার হংসধ্বনি—হংসঃ সোহং ওঁ ওঁ ওঁ, মা মা মা।

মাতৃলীলার নিগূঢ় তাৎপর্য

পূর্ণতা লাভের জন্য মাকে সন্তানের একান্ত প্রয়োজন, কাজেই জীবাত্মারূপী সন্তান পরমাত্মারূপী মাকেই ডাকে। আপনার আনন্দের জন্য স্বভাবজাত জীবরূপী সন্তানকেও আত্মারূপী মায়ের একান্ত দরকার। সন্তানের পূর্ণতার জন্য মা আপনাকে নানাবেশে নানা ভাবে, রূপে, নামে প্রকাশ করেন। আত্মারূপী মা-ই বহুবেশে আসেন সেবা করতে (মা+আয়া) জীবরূপী সন্তানের কাছে। সেইজন্য মাকে মায়া বলা হয়। মাতা-পিতা স্বামী-স্ত্রী পুত্র-কন্যা ভাই-বোন বন্ধু-বান্ধব সখা-সখী আত্মীয়-স্বজন শত্রু-মিত্র প্রভৃতি নানাবেশে বিজ্ঞানাত্মা লীলা করে। চিদানন্দময়ী মা পিতারূপে জন্ম দেন, মাতারূপে করেন লালন-পালন। পতিরূপে সংসারে করেন কর্তৃত্ব আবার পত্নীরূপে তিনিই আসেন সেবা করার জন্য। পুত্ররূপে আসেন মাতাপিতার স্নেহ আদর ও প্রেমের অংশ গ্রহণ করতে। এগুলি গ্রহণ করে আবার নিজেই পিতাতে পরিণত হন। কন্যারূপে এসে মাতাপিতার স্নেহ ভালবাসা ও প্রেম গ্রহণ করে আবার স্বয়ং মাতা হন। সর্ববেশে সর্বভাবের মাধ্যমেই আত্মচৈতন্যের স্বভাবলীলা এইভাবে সাধিত হয়। পরমাত্মা এক কিন্তু জীবাত্মা বহু।

সন্তান[২] মানে সম্যক্‌রূপে বিস্তারিত হওয়া, সঞ্চারিত হওয়া বা প্রকাশিত হওয়া।

আমি হল মায়ের বুকে মায়ের প্রকাশ বা বিস্তার। চৈতন্যের প্রবাহ ও তরঙ্গ চৈতন্যের বক্ষেই বিচরণ করে। মা হলেন চৈতন্যসাগর এবং সন্তান হল তাঁর তরঙ্গলহরী, বুদ্বুদ প্রভৃতি।

আপনাকে আপনি আস্বাদন করেন স্থূলে সূক্ষ্মে কারণে ও মহাকারণে। পিতা হল আমিত্ব, মাতা হল আমার এবং সন্তান হল আমি। একেই বলা হয় তিনি তুমি আমি।

সত্যের বুকে সত্যরূপে সত্য নিত্য অবস্থান করে। সত্য মাতা, সত্য পিতা, সত্য সন্তান। এই তিনের মিলনে হয় সত্য জীবনের পরিচয় ও সত্যের প্রমাণ।

"বেদ বেদান্তের বিষয় হল পরোক্ষ জ্ঞান। অপরোক্ষ জ্ঞান হল হৃদয়ের অনুভূতি, আত্মজ্ঞান বা আত্মা স্বয়ং"[৩]।

প্রতিটি প্রাণই তাঁর সন্তান। এই সন্তানরূপী প্রাণ নিত্যকাল তাঁর বক্ষেই অবস্থান করে। তাঁকে দেখে শুনে জেনে তাঁর সঙ্গে মিশে এক হয়ে যাওয়াই হল জীবনের লক্ষ্য। জানার 'জা'-র অর্থ হল জাগরিত হওয়া, উদ্বুদ্ধ হওয়া,

১। অভিনব সংজ্ঞা। ২। সম+তান, অভিনব সংজ্ঞা। ৩। স্বাত্মবোধের দৃষ্টিতে।

সঞ্চারিত হওয়া। 'না'-র অর্থ হল নানাত্ব-বহুত্বরূপ বিশেষণ। সুতরাং জানার অর্থ হল আপনাকে বিষয় করে বিষয়ী আত্মার বিজ্ঞান ও ব্যবহার।

একের মধ্যে বহুত্বের তাৎপর্য

বৈচিত্র্য হল সত্যময়ী চিতিমাতার বা আত্মার বিশেষণ। বৈচিত্র্যের সমষ্টিই হল সংসার। এ হল চিতিমাতারই ব্যক্ত রূপ। এই বৈচিত্র্যের মধ্যে কর্তা ভোক্তা জ্ঞাতা ও সাক্ষীচেতারূপে আত্মরূপী মা নিত্যবর্তমান।

বহুত্বের মধ্যে একের তাৎপর্য

আপনাকে বহুরূপে প্রকাশ করার ইচ্ছাই হল ক্রিয়া বা সৃষ্টি ইচ্ছা। বহুরূপী আপনাকে পালন করাই হল বল বা আস্বাদনের ইচ্ছা। আবার বহুরূপে নিজেকে নিজের একরূপে মিলিয়ে নেওয়াই হল জ্ঞান বা সংহার ইচ্ছা। এই ত্রিবিধ ইচ্ছা মিলেই হল পরমাত্মার স্বভাব বা স্বেচ্ছা। এই স্বভাবরূপী মাতাই হলেন বিজ্ঞানাত্মা বা জীবাত্মা বা আমি। এই আমি আনন্দ নিমিত্ত সৃষ্টি করে, ভোগ করে আবার ভোগান্তে জ্ঞানসঙ্গে মিলিত হয়ে আপন স্বরূপ প্রাপ্ত হয়।

সংসার লীলায় আমির ভূমিকা

স্ববোধের সংসার হল সম সার[১] (সম+সার) অর্থাৎ অখণ্ড এক সচ্চিদানন্দঘন সাগর নিত্য অদ্বৈতবোধে স্বয়ংপূর্ণ স্বয়ংপ্রকাশ। সংসারের কোন পৃথক অস্তিত্ব নেই, ছিল না, থাকবেও না। 'নিজবোধরূপ সচ্চিদানন্দবিগ্রহই হল সংসার, অর্থাৎ সারাৎসার পরাৎপর স্ববোধের স্বভাবের স্বনামের ও স্বরূপের সমাহার হল সংসার'[২]। আপনবোধে আলোর ব্যবহার হল সংসার[৩]। এই সংসারে সম হল সার এবং সার হল সম। এখানে সং বা মিথ্যার কোন অস্তিত্ব নেই। মিথ্যা ও সত্যের নিত্যসাক্ষী সত্যমিথ্যার অতীত অখণ্ড পরমার্থ সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্ম আত্মা গুরু মা বা আমি নিত্য বর্তমান। সচ্চিদানন্দস্বরূপ আমির বক্ষে আমি প্রকাশক এবং আমি প্রকাশ অভেদাভেদ নিত্যযোগে বা মধুযোগে প্রতিষ্ঠিত। অজাত অবর্ণ অলিঙ্গ আমিতে আমি জাত, আমি বর্ণ আমি লিঙ্গ; অব্যক্ত আমিতে আমি ব্যক্ত; প্রজ্ঞান আমিতে বিজ্ঞান আমি; নির্গুণ আমিতে সগুণ আমি; নির্বিশেষ আমিতে সবিশেষ আমি; নিত্যের আমিতে লীলাময় আমি অর্থাৎ পরমাত্মা বা পরম আমির বোধে পূর্ণ আমির পরিচয় আমিবোধে অনুভূত হয়। আমির বক্ষে আমির জন্য আমি হতে আমি, আমিকে আমি দ্বারা আমিবোধে প্রকাশ করে আমির সঙ্গে আমি নিত্যযোগে বিহার করি। এই বিহার কালে আমি আপনাকে তুমি বলে সম্বোধন করি। প্রতি তুমির মধ্যে প্রতি আমি আছি। আবার প্রতি আমিকে তুমিবোধে ব্যবহার করে আমির আমি ও তুমির আমি অভেদ সম্বন্ধ একতা ও সমতা সাক্ষী আমিবোধে অনুভব করি। অখণ্ড এক আমি আপনাকে আপনি চার ভাগে প্রকাশ করি। বাইরে আমি প্রকাশবৈচিত্র্যে বহু রূপ ধরি। অন্তরে আমি অন্তর্যামী রূপে বাইরের বহু আমিকে নিয়ন্ত্রণ করি এবং অন্তর ও বার দ্বৈতভাবে পোষণ করি। কেন্দ্রের আমি হল অব্যক্তের আমি। বাইরের বহু আমি ও অন্তরের অন্তর্যামী আমির মহামিলনভূমি হল কেন্দ্রের আমি। কেন্দ্রের আমি হল অদ্বৈত। এই আমিতে বাইরের ও অন্তরের আমি প্রসুপ্ত। চতুর্থ তুরীয়তে আমি কেন্দ্রের আমির নিত্য অধিষ্ঠান। এই আমি সর্ব আমির আমি। এই হল পরাৎপরম আমির পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞান।

ভোগ করে, আনন্দ করে, পরমাত্মাকে জেনে, বিকশিত হয়ে, পূর্ণ হয়ে, মায়ের সঙ্গে মিশে একীভূত হয়ে যাওয়া হল বোধের শ্রেষ্ঠ পরিণতি।

মায়ের সঙ্গে আমি বা আমির সঙ্গে আমি মিশে এক হয়ে যাবার উপায় হল সর্বভূতে মাকে মানা এবং মায়ের

১। অভিনব সংজ্ঞা। ২। তত্ত্বানুভূতির দৃষ্টিতে। ৩। আত্মবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে।

উপর নির্ভর করা; অর্থাৎ সব কিছুর মধ্যে আমিকে মানা বা আমির উপর নির্ভর করা। মানার অর্থ হল বাইরে, অন্তরে, দেহ-প্রাণ-মন ও বোধে মাকে, আত্মাকে বা আমিকে, অর্থাৎ আপনবোধে আপনাকে গ্রহণ করা বা বরণ করা।

বর্তমান যুগ হল সমর্পণের যুগ। সমর্পণ অর্থ হল সম রূপে অর্পণ, সমান থেকে অর্পণ, সমান গুনে অর্পণ ও সমবোধে অর্পণ। 'স'-কে অর্থাৎ সত্যকে ও তার সর্বপ্রকাশকে জানা ও মানাই হল সমানের বিশেষত্ব।

আত্মাতিরিক্ত আত্মবক্ষে বা আত্মসত্তায় কিছু থাকতে পারে না। সত্যের প্রকাশকে সত্যবোধে না-মানাই হল মিথ্যা, মায়া[১]। সত্যবোধে, মা-বোধে গুরুবোধে, ঈশ্বরবোধে, ব্রহ্মাত্মৈক্যবোধে, সমবোধে, আপনবোধে অখণ্ড তুমিবোধে বা অখণ্ড আমিবোধে মানাকেই সমজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান[২] বলে।

অখণ্ডের তাৎপর্য

অখণ্ড সত্যবোধে কোন কিছুই বর্জন করা চলে না। কিছু বর্জন করলে আবার তাকে গ্রহণ না-করা পর্যন্ত অপেক্ষা বা প্রতীক্ষা করতে হয়। সম্পূর্ণ গ্রহণ না-করা পর্যন্ত ব্যষ্টি আমি বা আত্মার পূর্ণতা হয় না।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু এবং অতীন্দ্রিয় সবকিছু সত্যময়ী মায়ের বক্ষেই আছে; অর্থাৎ আমি বা আত্মার বক্ষেই আছে। তাকে সত্যবোধে ও আপনবোধে গ্রহণ করা ও বরণ করাই হল মানা[৩]।

সবকিছু গ্রহণ করা হলে অহংকার ত্বংকারের সঙ্গে মিশে যায়, ব্যষ্টিপ্রকাশ বা কার্য সমষ্টিপ্রাণের কার্য ও কারণের সঙ্গে মিশে এক হয়ে যায়। এর নাম 'মহামিলন, মহাসাযুজ্যযোগ, মহাসম্মিলন ও মহামুক্তি'[৪]।

জীবের আমি মিথ্যা নয়, কিন্তু জীবভাব মিথ্যা। আমি হল আত্মা। শৈশবেও যে-আমি, কৈশোরেও সেই আমি, যৌবনেও সেই আমি এবং বার্ধক্যেও সেই এক আমিই বিদ্যমান থাকে। যে-'আমি' কালও ছিল, সে আজও আছে এবং আগামীকালও থাকবে। অতীতের আমিই বর্তমানে আছে এবং সেই আমিই আবার ভবিষ্যতেও থাকে। 'আমি' সত্য অখণ্ড নিত্যবর্তমান। তিন কাল আমির বুকেই খেলা করে অর্থাৎ তিন কালের নিত্যসাক্ষী আমি। অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ এই তিন কাল হল ইচ্ছাময়ী মায়ের তিনটি ইচ্ছার তরঙ্গ।

"আমি তুমি বোধে আত্মার খেলাই হল তাঁর স্বভাবলীলা (জীবলীলা)"[৫]। বিজ্ঞানাত্মাতেই আমি তুমির ব্যবহার হয়; কিন্তু প্রজ্ঞানাত্মা বা পরমাত্মাতে এইরূপ ব্যবহার নেই।

তুমি অজ্ঞানেরও মাতা এবং জ্ঞানেরও মাতা। অজ্ঞান হল জ্ঞানের পূর্ব অবস্থা এবং জ্ঞান হল পরবর্তী অবস্থা।

মা সন্তানকে রজোশক্তির সাহায্যে নিজের অন্তর থেকে আনন্দের আতিশয্যে বার করে নিয়ে আসেন অর্থাৎ প্রকাশ করেন বা নিজেই তদ্‌রূপ ধারণ করেন। আপন প্রকাশকে আনন্দ দ্বারাই আপন বক্ষে রেখে তাকে ধারণ করে, লালন-পালন করে পুষ্টিদান করে তার সঙ্গে খেলা করেন আবার নিজের বুকেই মিলিয়ে নেন।

সচ্চিদানন্দময়ী মাতা নিজের মহিমা নিজেই নব নব ভাবে প্রকাশ করেন। শ্রদ্ধা ভক্তি বিশ্বাস ও মানার মাধ্যমেই তাঁর পূর্ণ অভিব্যক্তি হয়। আপন প্রকাশের মধ্যে আপনি আপন মহিমা ব্যক্ত করেন, আস্বাদন করেন, নিজের প্রকাশকে নিজেই রক্ষা করেন এবং নিজেই তার ভাগ নেন। সেইজন্য বলা হয় সন্তানরূপ প্রকাশের মাধ্যমে মা-ই সাধনা করেন। তাদের মধ্যে মানারূপ বিজ্ঞানের ব্যবহার দ্বারা নিজেকে পূর্ণরূপে অনুভব করেন। সন্তানের জন্ম ও মৃত্যু হল নিদ্রা ও জাগরণ। সর্ব রূপ নাম ভাব ও বোধে তিনিই স্বয়ং। এই হল বিজ্ঞানাত্মার লীলাবিলাস।

মা-ই সন্তানরূপে নেমে আসেন এবং গতিশীল হয়ে চলতে থাকেন পৃথক বোধে। পুনরায় পূর্ণতার মধ্যে এক হয়ে মিশে যান বা লয় হন। 'ইহাই শাশ্বত অখণ্ড পূর্ণ সত্যের নিত্যাদ্বৈত লীলাভিনয়'[৬]। [৮।৬।৬৮]

১। বিজ্ঞান দৃষ্টিতে। ২। অভিনব সংজ্ঞা। ৩। অভিনব সংজ্ঞা। ৪। অভিনব সংজ্ঞা, তত্ত্বানুভূতির দৃষ্টিতে। ৫। অভিনব সংজ্ঞা। ৬। অভিনব সংজ্ঞা, স্বাত্মানুভূতির দৃষ্টিতে।

নাম ও নামী অভেদ

বোধই নাম এবং নাম মাত্রই বোধ। রূপ হারায় কিন্তু নাম হারায় না। রূপকেই সত্য বলে ধরতে গেলে অসুবিধা হয়, কারণ রূপের পরিবর্তন হয়। কিন্তু নামের পরিবর্তন নেই। রাম ও শিবের বাহ্যিক রূপ পৃথক, বিকারী ও অস্থায়ী কিন্তু তাঁদের নাম সত্য, স্থায়ী ও সমধর্মী। অনুভূতির কেন্দ্রে তাঁরা অভেদ। রাম, কৃষ্ণ ও শিব প্রভৃতি এক সত্যের ভিন্ন ভিন্ন অভিব্যক্তি। 'সত্যনামই সত্যপ্রাণ এবং সত্যপ্রাণই সত্যনারায়ণ ভগবান।' বোধ বা প্রাণের দ্বিবিধ অবস্থা, যথা—শান্ত, স্থির এবং গতিশীল ও অস্থির অবস্থা। নামকে অবলম্বন করে প্রাণের কেন্দ্রে প্রশান্ত ও স্থিরত্বে পৌঁছান সম্ভবপর হয়।

যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তা বাহ্য, বিকারধর্মী ও অসত্য। ইন্দ্রিয়বৃত্তিও অসত্য। এদের বিজ্ঞাতা ও সাক্ষীরূপে যে প্রাণচৈতন্য নিত্যবর্তমান তাই অন্তরাত্মা, অন্তর্যামী, বাসুদেব, নারায়ণ। সর্বজীবের হৃদয়ে এই সত্যনারায়ণ বাস করেন বলে তাঁকে বাসুদেব বলে। এই বাসুদেবই হলেন ভগবান। সত্যনামই হল সত্যপ্রাণ। এই সত্যপ্রাণ সর্বজীবের অধিষ্ঠান। এর স্বরূপ অখণ্ড ও অনন্ত বোধে বোধময়। এই অখণ্ড প্রাণচৈতন্যের দ্বিবিধ স্বরূপ হল নির্গুণ ও সগুণ। তাঁর নির্গুণ স্বরূপ হল নিরাকার, নির্বিকার, নির্বিশেষ এবং সগুণ স্বরূপ হল সাকার, গতিশীল, ক্রিয়াশীল ও সবিশেষ। সত্যনাম উভয় রূপের সঙ্গে যুক্ত।

প্রত্যেকের উপাদান সত্তা হল এক প্রাণচৈতন্য। অখণ্ড চৈতন্যের সগুণ সবিশেষ রূপকেই মহাপ্রাণ বলে। ব্যষ্টি জীবনমাত্রই তাঁর অভিব্যক্তি। সকলের মধ্যে এক প্রাণই বিদ্যমান। প্রাণের পরিচয় নামের মাধ্যমে হয়। প্রাণের অভিব্যক্তি একবার মহান হতে অণুতে নেমে আসে, আবার অণু হতে মহানে মিশে যায়। এই সত্যপ্রাণের সত্য পরিচয় সত্যনামের মাধ্যমে হয়। তখন স্থূল নাম-রূপের প্রভাব আর থাকে না। সত্যপ্রাণ নিত্য। এই সত্যপ্রাণেরই পরিচয় হল আমি বা তুমি এবং তার অন্তর্গত ক্ষুদ্র তরঙ্গ ও বুদ্বুদ হল বৈচিত্র্যময় নাম-রূপের অভিব্যক্তি বা প্রকাশ। মহাপ্রাণসত্তার বুকে নিরন্তর তাঁর প্রকাশবৈচিত্র্য ওঠে, ভাসে ও ডোবে। এই মহাপ্রাণের পরিচয়ই হল সগুণ ঈশ্বর বা বিশ্বাত্মা, হিরণ্যগর্ভ নারায়ণ। এই নারায়ণের আমি হল সমগ্র ব্যষ্টি আমির কেন্দ্র। আমি তুমি হল বিজ্ঞানাত্মার পরিচয়। ব্যষ্টিবোধে ব্যষ্টি আমি বা তুমি এবং সমষ্টিবোধে সমষ্টি আমি বা তুমি। অনন্ত ব্যষ্টি আমি এক আমিরই ব্যষ্টি প্রকাশ।

অনন্ত রূপ ও অনন্ত নাম 'আমির' (আত্মা) আশ্রয়েই আছে। এই 'আমির' নাশ নাই বা মৃত্যু নাই। জড় হল চৈতন্যের সংকুচিত ও সীমাবদ্ধ অবস্থা; অখণ্ড চৈতন্যসাগরে ভাবের ঘনীভূত অবস্থা ব্যষ্টি প্রাণচৈতন্যরূপে অভিব্যক্ত হয়।

প্রাণচৈতন্য বা বোধসত্তার বৈচিত্র্যময় অভিব্যক্তির সত্য পরিচয়

দেহ হল প্রাণের জড়ীভূত বা বিকৃত অবস্থা। আমি এবং তুমি এক প্রাণচৈতন্যেরই দৃষ্টান্ত। কিন্তু পৃথক পৃথক ব্যবহারের জন্যই শুধু উভয়ের মধ্যে পার্থক্য বা তারতম্য প্রতীয়মান হয়।

সকলেই মহাপ্রাণ বা ব্রহ্মেরই প্রকাশ এবং তাঁর বক্ষেই ভেসে চলে বা বিরাজ করে। প্রাণচৈতন্য অন্তরে বাইরে সমানভাবে বিদ্যমান। তাই বলা হয় 'ঘট ঘটমে হরি, রাম'। সুখ-দুঃখ, ধর্ম-অধর্ম, বিরুদ্ধ অবস্থা প্রাণের বা বোধের ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশমাত্র।

ইন্দ্রিয়বৃত্তিই হল বৈচিত্র্যের বোধ, মনের বৃত্তি হল দ্বৈতবোধ, বুদ্ধির বৃত্তি হল একদেশদর্শিতা, আত্মবোধ হল সমদৃষ্টি, সর্বভূতে সমবোধ। ইন্দ্রিয়বৃত্তি হল বাহ্যবোধ, মানসবৃত্তি হল অন্তরবোধ বা বিজ্ঞান এবং আত্মবোধ হল কেন্দ্রবোধ, প্রজ্ঞান বা সমজ্ঞান।

জগৎ হল জগন্মাতার লীলানিকেতন। ভিন্ন ভিন্ন রূপ-নাম-ভাব-বোধে এক আমি বা মা-ই লীলামানসে আসে ও যায়।

পরমাত্মসত্তার মাধুর্যবিলাস

রামনামের সত্যার্থ হল অমৃতময় আনন্দস্বরূপ, সত্তাশক্তির যুগলতত্ত্ব, আত্মা। রাধার 'রা' ও মদনের 'ম' যুক্ত হয়ে হয় রাম[১]। রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তির নাম রাম। সত্তাশক্তির যুগলই হল রাধাকৃষ্ণ, সীতারাম, লক্ষ্মীনারায়ণ, শিবকালী (দুর্গা)। আবার পরমপুরুষ কৃষ্ণ সত্তাশক্তির একক মূর্তি। রাম সত্তাশক্তির একক মূর্তি। নারায়ণ বা বিষ্ণু সত্তাশক্তির একক মূর্তি। শিব সত্তাশক্তির একক মূর্তি। এঁরা অমৃতময় ব্রহ্ম বা আত্মস্বরূপের ঈশ্বরীয় রূপ। সত্তার মধ্যে সত্তা ও শক্তি অভেদে যুক্ত। সত্তার বক্ষেই শক্তি এবং শক্তির বক্ষেই সত্তা বিরাজ করে। কৃষ্ণ হল কর্ষণশক্তি, আনন্দশক্তি ও কেন্দ্রের শক্তির সত্তা। রাধা হল লয়শক্তি, আরাধনাশক্তি ও হ্লাদিনীশক্তি।

হরিবোধে যার প্রাণ কাঁদে তার সঙ্গে হরির মিলন হয়। যে-আনন্দঘন চৈতন্য প্রাণকে ধাক্কা দিয়ে সংকুচিত অবস্থার থেকে প্রসারিত করে দেয় তাকেই গুরু[২] বলে।

ভিন্ন ভিন্ন গুরুমূর্তির মাধ্যমে অভিন্নভাবে পরমাত্মগুরুর অভিনব লীলা

কেন্দ্রসত্তার আকর্ষণশক্তি গুরুশক্তিরূপে প্রত্যেককে কেন্দ্রের দিকে টেনে নিয়ে যায়। গুরুর কাজ হল লঘুকে গুরু বানানো। স্থূল ও সূক্ষ্মে সর্বত্রই গুরু সমভাবে বিদ্যমান। অধিভূত, অধিদৈব, অধ্যাত্ম ও অধিযজ্ঞ সবই গুরুমূর্তি। অধিভূতরূপে গুরুর কাজ হল পাঞ্চভৌতিক, বাহ্যিক। অধিদৈবরূপে গুরুর কাজ নৈসর্গিক ও ইন্দ্রিয়াত্মক। অধ্যাত্মরূপী গুরুর কাজ হল আভ্যন্তরীণ, বিজ্ঞানাত্মক এবং অধিযজ্ঞরূপে গুরুর কাজ হল প্রজ্ঞানাত্মাস্বরূপে সাক্ষী ও দ্রষ্টাবোধে স্থিতি। প্রজ্ঞানগুরুই হলেন পরমাত্মা পরব্রহ্ম সনাতন। এই গুরু নিত্যাদ্বৈত নির্গুণগুণী। সকলের অন্তরে বাইরে সর্বত্র নিত্য এক গুরুই আছেন।

মহাপ্রাণচৈতন্যের অভিনব লীলাচাতুর্য

প্রাণের সঙ্গে প্রাণের মিলন হলেই হয় সত্য সুন্দর মাধুর্যের প্রকাশ। ব্যষ্টিজীবনের উদ্দেশ্য হল মহাপ্রাণ বা মহাচৈতন্যের সঙ্গে মিলিত হওয়া। এক মহাপ্রাণরূপী মাতাই তাঁর ইচ্ছানুযায়ী দশমহাবিদ্যার রূপ নেন। এক প্রাণই বহুরূপে প্রকাশিত হয়ে আবার একরূপ ধারণ করে। পরমাত্মার শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি হল বিশ্বাত্মা বা বিজ্ঞানাত্মা। বিজ্ঞানাত্মার অনন্ত অভিব্যক্তি হল ব্যষ্টি আত্মা। পরমাত্মার বক্ষে তাঁর এই সকল অভিব্যক্তি পুনঃপুনঃ ওঠে, ভাসে ও ডোবে। একেই আত্মার স্বভাবলীলা বলে। আত্মা নিজেই নিজের সঙ্গে খেলে অর্থাৎ আমি আমির সঙ্গে খেলে। নিজের সঙ্গে নিজের খেলাকেই আত্মলীলা[৩] বলে। আত্মলীলা নিজেই বিষয়ী এবং নিজেই বিষয়। নিজেই দ্রষ্টা এবং নিজেই নিজের দৃশ্য। জ্ঞাতা জ্ঞেয় নিজেই স্বয়ং।

আত্মলীলার তাৎপর্য

জগৎলীলায় জন্ম-মৃত্যু হল মিথ্যা বা ভান মাত্র। জীবাত্মার মৃত্যু নাই, বিনাশ নাই। তাদের দেহ-পোশাকের রূপান্তর বা পরিবর্তন হয় মাত্র। নব নব বেশে জীবাত্মা নব নব চালে লীলা অভিনয় করে। এই হল আত্মলীলার তাৎপর্য।

প্রাণের বিশেষ অবস্থাই হল রূপ।

১। অভিনব সংজ্ঞা। ২। অভিনব সংজ্ঞা। ৩। অভিনব সংজ্ঞা।

আত্মলীলায় স্বাত্মমহিমা

আত্মা হল বোধস্বরূপ অখণ্ড। আত্মা হতেই আত্মার প্রকাশ হয়, আত্মার মধ্যেই আত্মার প্রকাশ বাস করে, আত্মাই আপন প্রকাশকে দেখে শোনে জানে ও বোঝে। আত্মার প্রকাশ আত্মার সঙ্গে মিশে আত্মময় হয়েই আছে। একাত্মার বক্ষে আত্মাতিরিক্ত কিছু নেই। এই আত্মাই হল 'আমি'। আমি হল সর্ববোধের অধিষ্ঠান। সর্বব্যাপী এক আমির বক্ষেই অনন্ত আমিরূপে অনন্ত প্রকাশ ওঠে ভাসে খেলে। আমিই সকলের কর্তা ভোক্তা জ্ঞাতা এবং আমিই স্বয়ং সাক্ষীস্বরূপ। আমিই আমির দ্রষ্টা, আমিই আমির দৃশ্য। এই আমি অখণ্ড ভূমা সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্ম। এই ব্রহ্মস্বরূপ আমির বক্ষে আমি অতিরিক্ত আর কেউ নাই। এই হল সত্যস্বরূপ আমির মহিমা।

ভূমা আমি হল অখণ্ড সচ্চিদানন্দসাগর; অর্থাৎ সত্যজ্ঞানানন্দসাগর, ব্যষ্টি আমি হল তার বুদ্বুদ। সমগ্র বিশ্ব ভূমা আমিসাগরে জাত হয়ে তার মধ্যেই লীন হয়ে যায়। আমি ছাড়া আমি হয় না। আমিকে বাদ দিয়ে আমিকে দেখা, শোনা, জানাও যায় না। এই এক আমি সর্ব আমির অধিষ্ঠান।

দুই বা বহু হল মিথ্যা, মায়া ও অজ্ঞান। এককে বাদ দিয়ে দুই বা বহুর অস্তিত্ব নেই। কিন্তু নিত্যাদ্বৈত স্বমহিমায় নিত্যবর্তমান। এই নিত্যাদ্বৈতই হল ভগবান। ভগবান শব্দের অর্থ হল সব নিয়ে একজন। অর্থাৎ সবকিছুর সমাধান[১]।

ইন্দ্রিয়ের দৃষ্টিতে পরস্পরের মধ্যে ভেদ প্রতীয়মান হয়, মানস দৃষ্টিতে দ্বৈত প্রতীয়মান হয় কিন্তু আত্মদৃষ্টিতে অখণ্ড সমান নিত্যাদ্বৈত। এই হল জীবন সমাধান-সমাপত্তি। [১১।৬।৬৮]

বৈচিত্র্য সৃষ্টির মধ্যে সত্তার অধিষ্ঠান নিত্যবর্তমান

অখণ্ড চৈতন্যসত্তা ও তাঁর শক্তির প্রকাশসন্তান বা অংশবিশেষের সঙ্গে পূর্ণসংযোগ বা মিলন হয় সর্বসমর্পণের মাধ্যমে। মানুষের স্বভাব প্রকৃতি হল মন ও বুদ্ধি। এর একদিকে বৈচিত্র্যপূর্ণ বহিঃসত্তা, অপর দিকে নিত্যনির্বিকার প্রশান্ত স্থির প্রজ্ঞানঘন সাক্ষীস্বরূপ কেন্দ্রসত্তা বা আত্মা। সুতরাং এই মন এবং বুদ্ধির গতিকে বৃহৎ বা অনন্ত অসীম কেন্দ্রের দিকে নিয়ন্ত্রণ করা ও তদ্‌গত হওয়াই হল পূর্ণতা লাভের প্রথম সাধন[২]। কেন্দ্রসত্তার কাছে সমর্পিত মন ও বুদ্ধি কেন্দ্রসত্তার প্রভাবে চলে, বহিঃসত্তার প্রভাবে কখনও চলে না। সমর্পিত মন ও বুদ্ধিকেই শুদ্ধচিত্ত বলে। শুদ্ধচিত্ত হল নিষ্কামচিত্ত এবং অশুদ্ধ মলিনচিত্ত হল সকামচিত্ত।

সত্তার বোধে পূর্ণতা

ঈশ্বর সর্বতোভাবে পূর্ণ, সুতরাং তাঁর কথা স্মৃতিতে সর্বদা ধরে রাখতে পারলে মানুষও পূর্ণতা উপলব্ধি করতে পারে। বিষয়ের মধ্যেও ঈশ্বরীয় সত্তা আছে তা সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করে মেনে মানিয়ে চলতে পারলে পূর্ণ হওয়ার অন্তরায় বা প্রতিকূলতা থাকে না। তখন সবকিছু অনুকূলে আসে এবং অনায়াসেই অখণ্ড সত্যবোধের ধারাতে চলা সম্ভব হয়। বিষয় হল বিষ্ণুর অন্তর্গত, বিষ্ণুর বিভূতি বা ঐশ্বর্য অথবা তাঁরই অঙ্গ। পূর্ণাঙ্গ মানবের অঙ্গের যে কোন অংশকে ধরলে যেমন মানবকেই ধরা হয় সেইরূপ সর্বব্যাপী অখণ্ড চৈতন্যসত্তার যে কোন প্রকাশের মাধ্যমে চৈতন্যসত্তাকেই ধরা হয়। অখণ্ড দিব্যজীবনের লীলাভূমি বা লীলানিকেতন হল বৈচিত্র্যময় বিশ্ব। অথবা বিশ্ব হল তাঁর বহিরঙ্গ। সত্যের অঙ্গ বলে বিশ্বমূর্তিও সত্য। এ চৈতন্যসত্তার বিশেষ অভিব্যক্তি। একেই বিরাট বলা হয়। এই

১। অভিনব সংজ্ঞা। ২। বিজ্ঞান দৃষ্টিতে।

বিরাটই হল সত্যনারায়ণ, বিষ্ণু, আত্মা, ব্রহ্ম, মহাপ্রাণ বা চিতিমাতার বিজ্ঞানময় রূপ। এদের ব্যবহার ও অর্থ পৃথক পৃথক ভাবে শাস্ত্রে বর্ণিত হলেও এরা এক তত্ত্বেরই বাচক।

পার্থক্য ও ভেদজ্ঞান হল অহংকার অভিমানের বিশেষত্ব। 'কর্তাবোধে হয় কর্ম এবং অকর্তাবোধে হয় জ্ঞান'[১]।

সমর্পণের তাৎপর্য

'আমির আমিতে' যে বাস করে এবং যে সর্বকামশূন্য সে-ই হল মহাজ্ঞানী। আমিকে অখণ্ড আমির কাছে বা অখণ্ড তুমির কাছে পূর্ণভাবে যে সমর্পণ করে দিতে পারে সে হল মহাজ্ঞানী[২]। খণ্ড আমিকে বা কাঁচা আমিকে অর্থাৎ অহংকারের আমিকে যে অখণ্ড পূর্ণ পাকা আমিতে ত্বংকার বোধে সমর্পণ করে সে-ই পাকা আমির মধ্যে প্রবেশ করে মহাজ্ঞানী হয়, অর্থাৎ অমৃতময় জ্ঞান স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। সমর্পণ করার অর্থ হল মন বুদ্ধি সঁপে দেওয়া, অর্থাৎ একবোধে সবকিছুকে ব্যবহার করা। নিরন্তর ঈশ্বরীয় স্মৃতিকে ব্যবহার করার নামই হল মন-বুদ্ধি সমর্পণ[৩] করা। নিরন্তর ঈশ্বরের স্মরণ-মননের ফলে মন-বুদ্ধি ঈশ্বরে সমর্পিত হয়।

আমির আমি বোধ হল শুদ্ধবোধসত্তা। এ নির্বিকার ও নির্বিকল্প এবং সর্ববিধ দ্বৈতভাব বর্জিত।

ধ্যানসিদ্ধি ও জ্ঞানসিদ্ধির তাৎপর্য

সর্বপ্রকার মানসিক বৃত্তিকে এক কেন্দ্রে নিবদ্ধ করাই হল ধারণা। ধারণার দীর্ঘমাত্রা হল ধ্যান। ধ্যানের পরিপূর্ণ অবস্থা হল সমাধি। সমাধি হল শুদ্ধ জ্ঞানের স্থিতি বা আত্মস্থিতি। এই শুদ্ধজ্ঞান বা আত্মজ্ঞানই হল ব্রহ্মজ্ঞান। অনাসক্তি, ত্যাগ, বৈরাগ্য ও মহাবাক্য বিচারের মাধ্যমে ব্রহ্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠা হয়। এই হল জ্ঞানযোগ। বৈরাগ্য হল এর সাধনা।

জ্ঞানযোগের সাধনায় একান্ত প্রয়োজন হল (১) ব্যবহারিক জীবনে বহিরঙ্গ বা জগতের প্রতি অনাসক্ত ভাব, (২) অন্তর্মুখী একাগ্র মন ও আত্মধ্যান, (৩) বিবেকযুক্ত বিচারশীল মন, ত্যাগ ও বৈরাগ্য, (৪) নিত্যানিত্য বস্তু নির্ণয়ের যোগ্যতা ও মুমুক্ষা। এই হল সাধন চতুষ্টয়ের মূল কথা। সাধন চতুষ্টয়—নিত্যানিত্য বিবেক, ইহামূত্রফলভোগবিরাগ, ষট্‌সম্পত্তি ও মুমুক্ষা। ষট্‌সম্পত্তি হল শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান ও শ্রদ্ধা।[৪]

ভক্তিসিদ্ধির তাৎপর্য

ভগবৎ মহিমা গুণকীর্তনের মাধ্যমে ও ভগবৎসত্তা স্মরণ-মননের মাধ্যমে অনুরাগবশত তৎপ্রতি আসক্ত হয়ে তাঁর প্রীতির জন্য তাঁকে কেন্দ্র করে যে-সেবা ও পূজা বা ব্যবহার ও আচরণ প্রকাশ পায় তা-ই হল শুদ্ধাভক্তি।

স্বভাবপ্রকৃতির মধ্যে বিরুদ্ধভাব বা কর্মের বৃত্তি ও মন বা বোধের বৃত্তি উপস্থিত হলেও আত্মসমর্পণযোগের সাধক তা নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার না করে আত্মা বা ইষ্টকে সমর্পণ করে দেয় অথবা ঐ বৃত্তিগুলিকে ইষ্টের মূর্তিরূপে দর্শন করে। কোন কিছুর প্রতি ব্যক্তিগত আসক্তি না থাকাতে সর্ব অবস্থাতেই তারা সমান প্রীতিকর ভাবের মধ্যে অবস্থান করে।

সর্ব অধ্যাত্মসাধনার লক্ষ্য ও পরিণাম এক

ভক্তিবাদ সরস বলে জ্ঞানবাদ অপেক্ষা সহজসাধ্য। কিন্তু পরিণামে জ্ঞানী বা ভক্ত উভয়ে একই অবস্থা প্রাপ্ত হয়। আবার যোগী বা জ্ঞানী যে লক্ষ্যে পৌঁছায় নিষ্কাম কর্মীও পরিণামে তা-ই প্রাপ্ত হয়।

১। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে। ২। সত্যবোধের দৃষ্টিতে। ৩। তত্ত্বের দৃষ্টিতে।

ঈশ্বরের জীবলীলার তাৎপর্য

জানা এবং জ্ঞাত এক বোধের দুইটি ভাব। 'আমি বোধই' হল 'আমার বোধের' কারণ, পরমাত্মাই জীবাত্মার কারণ এবং ভগবানই ভক্তের কারণ। ভক্ত ভগবান ছাড়া নয়, আবার ভগবানও ভক্ত ছাড়া নন। পিতামাতার সঙ্গে সন্তানের যেরূপ অভেদ আপন সম্বন্ধ, ঈশ্বরের সঙ্গে ভক্তেরও সেইরূপ সম্বন্ধ। সকলের মধ্যেই ভগবান আছেন। প্রাণচৈতন্য রূপে সকলের হৃদয়ে তিনিই আছেন । শক্তিমান বুদ্ধিমান বিদ্বান সঙ্গীতজ্ঞ শিল্পী কবি বিজ্ঞানী দার্শনিক জ্ঞানী সাধু যোগী ত্যাগী সন্ন্যাসী কর্মী ভক্ত প্রেমিক প্রভৃতি ভগবানেরই বিভিন্ন অভিব্যক্তি মাত্র। আবার এর বিরুদ্ধ অবস্থাগুলিও তাঁর অভিব্যক্তি। বিরুদ্ধ অবস্থাগুলি প্রথমে প্রকাশ পায়, তারপরে পরবর্তী অবস্থাগুলি ভিন্ন ভিন্ন ভাব ও পরিবেশের মাধ্যমে জীবনের মধ্যে উত্তরোত্তর অভিব্যক্ত হয়। এই হল লীলাময়ীর লীলাখেলা বা প্রাণহরির প্রেমলীলার এক অংশ।

শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের তাৎপর্য

ত্রিবিধ শ্রদ্ধা ও ত্রিবিধ বিশ্বাস নিয়েই সকলের জীবন এবং এই শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস অনুযায়ী হয় তার ব্যবহার ও কর্ম। মানুষের মধ্যে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস নিহিত আছে। গুণ ও প্রকৃতি ভেদে তার প্রকাশ ও ব্যবহারের তারতম্য হয়। বিশ্বাস দ্বারা অর্থাৎ সত্য ব্যবহারের কতগুলি ভাব বা অভিজ্ঞতার দ্বারা সকলের জীবন গড়া। কাজেই মানুষমাত্রই সত্যের আংশিক প্রকাশ। পূর্বাপর কর্ম ও ব্যবহারের যোগ্যতার মানের উপর ভিত্তি করে প্রকাশের তারতম্য জীবনে অভিব্যক্ত হয়। এই মানের তারতম্য অনুযায়ী মানুষের স্বভাব ত্রিবিধ হয়, যথা—তামসিক, রাজসিক এবং সাত্ত্বিক। স্বল্প পরিমাণ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের অধিকারীকে তামসিক, মধ্যম মানের বিশ্বাস ও সত্য ব্যবহারের অধিকারীকে রাজসিক ও ব্যাপক পরিমাণে উন্নত ও উদার প্রকৃতিযুক্ত এবং শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও সত্যের উত্তম অধিকারীকে সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক বলা হয়। প্রত্যেকের শ্রদ্ধাবিশ্বাস সত্তানুরূপ। সুতরাং পূর্বাধিকারীর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস পরবর্তী অধিকারী না মেনে নিলে ও গ্রহণ না করলে তার পক্ষে সুষ্ঠুভাবে কোন উন্নতি বা বিকাশ লাভ করা সম্ভবপর হয় না। উপযুক্ত শ্রদ্ধাবিশ্বাসের অভাবে অপরের অগ্রগতির প্রতিবন্ধক সৃষ্টি হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজের জীবনেও অগ্রগতির অন্তরায় সৃষ্টি হয়। তার ফলে নিজের ও অপরের ব্যবহারবিজ্ঞান নাশ হয়। এর নাম বিনাশ বা প্রতিবন্ধক। বিনাশের অন্যান্য অর্থ হল বিশেষরূপে নাশ, বিকার ও বিরোধের নাশ, বিশেষণের নাশ, বিষয়ের নাশ, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

আমিবোধের ব্যবহারবিজ্ঞান

আত্মা বা আমিবোধের চারটি স্তর—(১) আমি আমার বা দেহাত্মবোধযুক্ত আমি, (২) আমার আমি, (৩) আমির আমি, (৪) আমিত্বের আমি। অখণ্ড চৈতন্যসত্তা বা আমির (আত্মার) এই চতুর্বিধ অবস্থা পূর্ণমাত্রায় অভিব্যক্ত হয় যার মধ্যে সে কেবল বোধে বোধময় অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত থাকে।

চৈতন্যসত্তার চতুর্বিধ গুরুমূর্তির তাৎপর্য

অখণ্ড শুদ্ধ চৈতন্যসত্তার চতুর্বিধ প্রকাশের ব্যবহারিক নাম হল—(১) মহাগুরু (স্থূলগুরু), (২) পরমগুরু (সূক্ষ্মগুরু), (৩) পরাপরম গুরু (সূক্ষ্মতর অথবা কারণ গুরু, (৪) পরাৎপরমগুরু (সূক্ষ্মতম মহাকারণ গুরু)।

মহাপ্রাণের নিম্ন হতে উর্ধ্ব দিকে তৃতীয় স্তর বা অবস্থাই হল প্রণব, অক্ষর ব্রহ্ম বা কূটস্থ চৈতন্য। একেই আমির আমি অর্থাৎ পরাপরমগুরু বা তৃতীয় গুরুমূর্তি বলা হয়। তৃতীয় গুরুমূর্তির স্তর ও চতুর্থ গুরুমূর্তির স্তরের মধ্যে অর্থাৎ আমির আমি এবং আমিত্বের আমির মধ্যে পার্থক্য এত সূক্ষ্ম যে তা খুব কম সাধকের মধ্যেই ধরা পড়ে।

প্রথম ও দ্বিতীয় গুরুমূর্তি যা প্রকাশ করে তৃতীয় গুরুমূর্তি তা দর্শন করে ও সমর্থন করে ও পরিচালনা করে।

শুধুমাত্র দৃষ্টির দ্বারাই এই সমর্থন সম্ভবপর হয়। মন পরিপূর্ণভাবে শান্ত ও স্থির না হওয়া পর্যন্ত তৃতীয় গুরুর সঙ্গ করা যায় না এবং সঙ্গ পেলেও তার প্রভাব ও প্রকাশও অনুভবগম্য হয় না। স্থিরত্বে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই হল তৃতীয় গুরুমূর্তির সাক্ষাৎ, দর্শন বা সঙ্গ করা অথবা তাঁর আজ্ঞা, নির্দেশ ও প্রভাব অনুসরণ করা, পালন করা এবং তাঁর সঙ্গে নিত্যযুক্ত থাকা। তৃতীয় গুরুমূর্তির সঙ্গে যুক্ত না হওয়া পর্যন্ত স্বরূপ উপলব্ধি, আত্মোপলব্ধি ও সত্যোপলব্ধি হয় না। ফলে মুক্তির স্বরূপ অবগত হওয়া যায় না এবং অমৃতত্ব, ভূমাসুখ ও অখণ্ড শান্তিলাভ হয় না। চতুর্থ গুরুমূর্তির মধ্যে কোন ক্রিয়ার অভিব্যক্তি নেই।

তৃতীয় গুরু হল কেন্দ্রের আমি। আমিবোধে সবার হৃদয়ে তাঁর অধিষ্ঠান। সেইজন্য ভক্ত বলে আমার মধ্যে 'আমি'-রূপে তুমিই বসে আছ। ভক্ত 'আমার আমিকে' দিয়ে আমিত্বের সেবা করে। তৃতীয় গুরুমূর্তিতে এই আমিকে পাওয়া যায়। তৃতীয় গুরুর সঙ্গে তাদাত্ম্য লাভ হলেই চতুর্থ গুরুমূর্তির পরিচয় পাওয়া যায়। চতুর্থ গুরু হল ব্রহ্মানন্দস্বরূপ কেবল জ্ঞানমূর্তি।

গুরুর কর্মপদ্ধতি

গুরুর কাজ হল শিষ্যকে উত্তরোত্তর উন্নত বোধে প্রতিষ্ঠিত করা। আমির মধ্যে যে গুরু তিনি-ই আবার আমিত্বে নিয়ে পৌঁছে দেন। চতুর্বিধ গুরুমূর্তি সকলের সঙ্গেই যুক্ত। প্রথম গুরু হল দেহেন্দ্রিয় প্রাণ, দ্বিতীয় গুরু হল মন ও বুদ্ধি, তৃতীয় গুরু হল প্রজ্ঞাচৈতন্য এবং চতুর্থ গুরু হল বিশুদ্ধ বোধস্বরূপ (সচ্চিদানন্দ)। অভিজ্ঞতার পূর্ণ মান হল জ্ঞান, জ্ঞানই হল গুরু এবং কর্মের ফলই হল অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান।

জ্ঞানের মত পবিত্র বস্তু আর কিছু নেই। ধন, ঐশ্বর্য ও তপস্যা দ্বারা যে শক্তি সঞ্চয় হয় তা চরম শক্তি নয়। সহ্যশক্তি তার চেয়েও উন্নত।

গুরুর কৃপাতেই শিষ্য গুরুতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়

পরস্পরের মধ্যে শুভেচ্ছা ও বোধের আদান-প্রদান দ্বারাই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায়। কৃতজ্ঞতাশূন্য মানুষই হল অধার্মিক এবং কৃতজ্ঞতাবোধই ধার্মিকের লক্ষণ।

গুরুর ঋণ শোধ করা যায় না। শুধু পূর্ণ আত্মসমর্পণের মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে মিশে যাওয়া যায়। গুরুর সান্নিধ্যে, গুরুর সঙ্গ দ্বারা, গুরুর নির্দেশ, আদেশ ও আজ্ঞা পালন করে লঘু শিষ্য বা সন্তান গুরুবোধ গ্রহণ করে। মানার মাধ্যমেই লঘু গুরুবোধে পরিণত হয়। এই হল গুরুর সঙ্গে পূর্ণমিলন—তাদাত্ম্য, তদ্গত এবং তৎস্বরূপ প্রাপ্ত হয়ে গুরুময় হয়ে যাওয়া, অর্থাৎ বোধে বোধময় হয়ে যাওয়া।

ঋণ স্বীকার করাই হল কৃতজ্ঞতাবোধ। যে-গুরু নিরন্তর সকলকে বোধের আলো দিয়ে যান তাঁর ঋণ শোধ করা যায় শুধু নিরন্তর তাঁর নাম স্মরণের দ্বারা এবং তাঁর কাছে আত্মসমর্পণের দ্বারা। এর তাৎপর্য হল গুরুনামে ও গুরুবোধে অন্তরে বাইরে সব কিছু গ্রহণ করা বা 'মেনে মানিয়ে চলা'।

নাদ, নাম ও শব্দের তাৎপর্য

নাম[১] ও শব্দ উভয়ই নাদের অংশ। এই নাদই হল প্রণব কিন্তু নাম হল চৈতন্যশক্তির সঙ্গে যুক্ত, শব্দ হল ক্রিয়াশক্তির সঙ্গে যুক্ত। নামকে সূক্ষ্মতর শব্দ বলা চলে। এ প্রাণময় ও বোধময়, প্রাণের দ্বারা প্রাণ হতে উদগীত

১। শ্রীনাম ঈশ্বরের নাম, বস্তুর নাম নয়। বস্তুর নাম স্থূল শব্দের অন্তর্ভুক্ত, সূক্ষ্ম শব্দ সূক্ষ্ম নাম অপেক্ষা সসীম ও জড়। এ সূক্ষ্মতর হয়ে যখন শ্রীনামের সঙ্গে যুক্ত হয় তখন নাদের সঙ্গে মিশে যাবার সুযোগ পায়। এ শুধু সাধনসাপেক্ষ নয়, সদ্গুরুর কৃপাসাপেক্ষ।

হয় এবং প্রাণের দ্বারাই ব্যবহৃত হয়। স্থূল ও সূক্ষ্ম শব্দকে প্রাকৃত শব্দ বলা হয়। এর সঙ্গে পরনাদ প্রণবের দূর সম্বন্ধ, নিকট সম্বন্ধ নয়। সুতরাং একতা বা সমতার প্রশ্নই ওঠে না। প্রণবের সঙ্গে সূক্ষ্মতর ও সূক্ষতম শব্দ অর্থাৎ শ্রীনামের সম্বন্ধ নিকটতম। সেইজন্য নাম ও নামী অর্থাৎ নাম ও বোধস্বরূপকে অভেদ বলা হয়। নামের মাধ্যমে বোধস্বরূপের পরিচয় অবগত হলে স্থূল সূক্ষ্ম প্রভৃতি শব্দের ভেদ ও পার্থক্য থাকে না। সব তখন মহানাদে লীন হয়। কারণ সকল শব্দ ও নামের কেন্দ্র হল পরনাদ ওঁকার বা প্রণব। এই প্রণবই হল ব্রহ্ম ও ঈশ্বরবাচক। (নাদব্রহ্মের অন্তর্ভুক্ত বিষয় যথাস্থানে বিশদভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।)

সূক্ষ্মতর শব্দই প্রাণচৈতন্য বা বোধ। শ্রীনামের শরণ নেওয়া মানেই মহাপ্রাণের শরণ নেওয়া অর্থাৎ বোধের ব্যবহার করা। সব নামই চৈতন্যের স্পন্দন বিশেষ। সমগ্র বিশ্ব হল নামময়। অর্থাৎ আত্মচৈতন্যের বিস্তার বা অভিব্যক্তি। স্থূল ও সূক্ষ্মরূপের যেমন পৃথক পৃথক নাম বা সংজ্ঞা আছে, সেরূপ নামেরও বিশেষ রূপ আছে। 'হরি হরি' বললে অন্তরে বোধের স্পন্দন ওঠে। 'হরি' নাম শুনলে মনে তাঁর স্মৃতি জাগে। বলা শোনা ভাবা সবই অন্তর্বোধের ব্যবহার। অন্তরের বোধ দ্বারা হরিনামের ব্যবহার হলে হরিবোধের জাগরণ হয় হৃদয়ে।

শুদ্ধচিত্তই[১] শ্রীনামের লীলাভূমি

প্রশান্ত স্থিরচিত্তকেই শুদ্ধচিত্ত বলে। ভক্ত ও ভাবুক চিত্ত অন্তরে শুদ্ধ ভাবের দ্বারা ভগবানের বিশেষ রূপ ও নামের সাধনা করে। এইরূপ ভক্তচিত্তকে একনিষ্ঠ ভক্ত বলা হয়। একনিষ্ঠ ভক্তির দ্বারাই ঈশ্বরের ভাবময় রূপের দর্শন স্পর্শন ও তাঁর সঙ্গে মধুর ভাবের জীবন্ত সম্বন্ধ হয়। এইরূপ ভক্তের কাছে ভগবানের বিজ্ঞানময় রূপ বিশেষভাবে অনুভূত হয়। এরও উন্নত অবস্থায় ভাবের পরিপক্কতায় শুদ্ধভাব বিগলিত হয়ে বোধের সঙ্গে মিশে যায়। তখন ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে অভেদ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। এখানেই অদ্বৈতানুভূতির দর্শন আরম্ভ হয়।

বিশুদ্ধ চৈতন্যসত্তা গুণাতীত ও ইন্দ্রিয়াতীত। একেই প্রজ্ঞানঘন নির্গুণ ব্রহ্ম বা পরমাত্মা বলা হয়। এর মধ্যে কোন গুণ বা শক্তির ক্রিয়া বিশেষভাবে নেই। এ সর্বতোভাবে নির্বিশেষ ও অদ্বৈত। বিজ্ঞানময় সগুণ ঈশ্বর এরই বিশেষ রূপ বা অভিব্যক্তি। সগুণ ঈশ্বরের সংকল্পজাত হল সমগ্র বিশ্ব বা জীবজগৎ। ঈশ্বরের এই সংকল্পশক্তিই হল জ্ঞানীর ভাষায় মায়া, যা ভ্রমাত্মক জগৎ সৃষ্টির কারণ। কিন্তু ভক্তের ভাষায় এই শক্তি জগতের জননী ঈশ্বরের সংকল্প অনুবিধায়িনী ঈশ্বরীয় শক্তি বা পরমাপ্রকৃতি। এঁরই কৃপায় জীব ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুবর্গ লাভ করে। জগতের সৃষ্টি স্থিতি সংহার এঁর কর্তৃত্বাধীনে হয়। এঁর কৃপা ও করুণা ব্যতীত কেউ জীবনধারণ করতে পারে না এবং সাধন-ভজন ও সাধনসিদ্ধি লাভও করতে পারে না। এই ব্রহ্মশক্তি কর্ম ও কর্মজসিদ্ধির কারণ এবং জ্ঞান ও জ্ঞানজসিদ্ধির কারণ। এই পরমেশ্বরী শক্তিই ভক্তি মুক্তিদায়িনী শক্তি জ্ঞান আনন্দ ও প্রেমের আকর। সেইজন্য এঁকে সচ্চিদানন্দময়ী বলা হয়। সমগ্র জীবজগৎ এঁরই আত্মবিস্তার মাত্র। বাইরে এঁ-ই বহিঃপ্রকৃতি। সমগ্র অধিভূত এঁর সৃষ্টি। অন্তরে এঁ-ই অন্তঃপ্রাণরূপে অন্তঃপ্রকৃতি, ইন্দ্রিয়শক্তি রূপে অধিদৈব, মন বুদ্ধি প্রভৃতি অধ্যাত্ম এবং হৃদয় কেন্দ্রে জীবচৈতন্য আত্মা বা অধিযজ্ঞ বা সাক্ষীপুরুষ পুরুষোত্তম। সেইজন্য এঁকে বাসুদেব নারায়ণ বলা হয়।

অনুভূতির বিজ্ঞান

অভিজ্ঞতার সর্বোত্তম পরাকাষ্ঠাকেই অনুভূতি বলে। কোন কিছু জানার ও শেখার আগে সেই বিষয় সম্বন্ধে যথার্থভাবে শুনতে হয়, তারপরে দেখতে হয় ও শ্রবণ অনুরূপ ব্যবহার করতে হয়। শ্রবণ অনুরূপ ব্যবহার বা দেখা

১। তমঃ-রজঃ মলশূন্য শুদ্ধসত্ত্বের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত যে সাত্ত্বিক চিত্ত। সাত্ত্বিক চিত্ত স্বভাবতই ধীর, স্থির, শান্ত, একাগ্র। তার মধ্যে শুদ্ধ বোধস্বরূপ আত্মচৈতন্য সহজেই স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্ত হয় এবং তদনুরূপ তার অনুভূতি স্বতঃসিদ্ধ হয়।

হলে হয় জ্ঞান বা জানা। এই জ্ঞানের বিকাশ হওয়ার পরে যে দর্শন বা দেখা তাই হল পূর্ব দেখার সত্য স্বরূপ। সেইজন্য একে অভিজ্ঞতা বলে। অভিজ্ঞতার পরে সেই সত্যরূপের সঙ্গে মিশে এক হয়ে গেলে হয় অনুভূতি।

বিশ্বকে নামময় ও শব্দময় বলা হয়। নাম বা শব্দ বোধময়। এই জন্য বোধময় সত্তার ঘনীভূতরূপ হল এই বিশ্বজগৎ।

স্মৃতির মাধ্যমে শিষ্য-সন্তানের মধ্যে শক্তি ও গতি প্রেরণারূপে অনুপ্রাণিত করে গুরু তার সমগ্র জীবনকে পরিচালিত করেন ও উদ্বুদ্ধ করেন। নানাভাবে তিনি শিষ্যের জীবনে সত্ত্বগুণের প্রভাব বিস্তার করেন এবং তার অজ্ঞানের আবরণ উন্মুক্ত করে সকল প্রকার ময়লা ও কালিমা ধীরে ধীরে অপসারিত করে তার লঘুভাবকে গুরুভাবে অর্থাৎ বিশুদ্ধ বোধে পরিণত করেন। গুরু জীবনের সমগ্র গতি অন্তর্মুখী করে একতানগতির রূপ দিয়ে ভূমা শান্তিস্বরূপ স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করে দেন। এই হল আধ্যাত্মিক ভাষায় সংহার[১], অর্থাৎ সমত্বে প্রতিষ্ঠা। সমত্বে প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত গুরু আপনবোধের বিস্তার দ্বারা শিষ্যের অন্তরকে উদ্বুদ্ধ করতে সাহায্য করেন। গুরুর কাজ লঘুকে গুরুতে পরিণত করা। বাবা-মায়ের সঙ্গ করলে যেমন সন্তান তাদের গুণগুলি পায়, সেইরূপ গুরুসঙ্গের দ্বারা শিষ্যের ভিতরেও গুরুর ঈশ্বরীয় বা দৈবীগুণগুলি প্রকাশ পায়। [১২।৬।৬৮]

নিত্য অদ্বয় বোধস্বরূপ ব্রহ্ম আত্মাই সত্য—বৈচিত্র্যই হল অজ্ঞান মায়া ভ্রান্তি ও মিথ্যা

সকলকে মান দেওয়াই হল বৈষ্ণবের ধর্ম। শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব সকলকে হরিবোধে মানে ও জানে। একথা যথার্থ শৈব ও শাক্ত প্রভৃতি সকলের পক্ষেই প্রযোজ্য।

সব মতপথের মূল এবং লক্ষ্যও এক। একের ব্যবহার পদ্ধতি পৃথক হলেও এই নিত্য একের কখনও ভেদ বা অভাব হয় না। আদি-অন্তশূন্য এক বিশুদ্ধ চৈতন্য বা জ্ঞানই হল নিত্য এক সত্যবস্তু। এ ছাড়া দ্বিতীয় কোন সত্যবস্তু নেই। এই চিন্ময় সত্যবস্তুকেই পরব্রহ্ম পরমাত্মা বলে। এরই বিজ্ঞানময় রূপ হল শিব রাম হরি প্রভৃতি। এরই সংকল্পজাত হল জীবজগৎ। এই সংকল্পই হল জ্ঞানীর ভাষায় মায়া। সুতরাং মায়ার সৃষ্টিই হল বৈচিত্র্যময় জীবজগৎ। এই মায়া ভ্রমাত্মক। এর সত্য অস্তিত্ব নেই। ভ্রান্তি ও মিথ্যাই হল এর স্বরূপ। সুতরাং জগৎরূপে যা কিছু সবই মিথ্যা সৃষ্টি বা ভ্রান্তি মাত্র। আসলে চিন্মাত্র ব্রহ্মই ছিল, আছে ও থাকবে। ভ্রান্তি হল ভেদজ্ঞান ও বিপরীতজ্ঞান। ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে এ প্রতীত হয়। দেহেন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি অবিদ্যা মায়াজাত ; সুতরাং এদের অস্তিত্ব ও ব্যবহার ভ্রান্তিমূলক, অনিত্য ও মিথ্যা। এককথায় বৈচিত্র্যমাত্রই ভ্রান্তি ও মিথ্যা। এটা স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর মত ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে প্রতীত হয়।

জ্ঞানীর দৃষ্টিতে জগৎ স্বপ্নবৎ মিথ্যা

জগৎবোধও ভ্রান্তি বা মিথ্যা অনুভূত হয়। জগৎ হল রজ্জুসর্প বা শুক্তিরজতের ন্যায় মিথ্যা। ব্রহ্মজ্ঞান এবং আত্মজ্ঞানই হল নিত্য সত্যবস্তু। এইরূপ অনুভূতির বিজ্ঞান হল সর্বোত্তম অধিকারীর জন্য। মধ্যম অধিকারীর জন্য যোগ ও ভক্তির বিজ্ঞান এবং সাধারণ অধিকারীর জন্য হল পূজাপার্বন, সেবা, জপ, ও নামকীর্তন এবং নিত্য কর্মানুষ্ঠান বা ধর্মানুষ্ঠান।

ভক্তের দৃষ্টিতে জগৎ ঈশ্বরের মহিমা ও লীলা

ভক্তের কাছে জগৎ হল আত্মচৈতন্য বা ঈশ্বরের লীলাবিলাস। এখানে চৈতন্য চিৎ ও অচিৎরূপে, বিষয়ী ও বিষয়রূপে, মহান ও অণুরূপে, স্রষ্টা ও সৃষ্টিরূপে, কারণ ও কার্যরূপে, স্থিতি ও গতিরূপে, পুরুষ ও প্রকৃতিরূপে,

---

১। অভিনব সংজ্ঞা।

বোধি ও বুদ্ধি বা মনরূপে অভেদে যুক্ত হয়ে লীলা করে। ঈশ্বরই সর্বময় কর্তা। এই ঈশ্বরই হলেন সর্বপ্রকাশের কেন্দ্র, জগতের প্রভু নিয়ন্তা বিধাতা। আপন শক্তি ও প্রকৃতির মাধ্যমে তিনি এই বিশ্বলীলা সম্পাদন করেন। সর্বজীব তাঁরই অভেদ অংশ, তাঁরই লীলামাধ্যম। এই ঈশ্বরই হলেন বিশ্বপ্রাণচৈতন্য। ক্ষুদ্র বৃহৎ সর্বপ্রাণীই বিশ্বপ্রাণের বক্ষে জাত হয়ে বিশ্বপ্রাণের দ্বারাই পরিচালিত হয়। জীবনের সর্ববিধ ব্যবহার এই প্রাণচৈতন্যেরই ক্রিয়া। "পরস্পর জীবনের দেওয়া-নেওয়ার ব্যবহার হল আত্মচৈতন্যের লীলা। একবার অন্তর দেয় বাহির নেয়, আবার বাহির দেয় অন্তর নেয়। অন্তর হতে বাইরে দেওয়া হল সৃষ্টি এবং বাইরে নেওয়া হল গতি। বাইরে থেকে অন্তরে দেওয়া হল পুষ্টি এবং নেওয়া হল তুষ্টি। অন্তর বাইরে উভয়ের মধ্যে স্থিতি সমতাই হল শান্তি। শান্তির উদ্দেশ্যে দেওয়াই হল ভক্তি এবং নেওয়া হল প্রীতি। অর্থাৎ আপনবোধে দেওয়া হল ভক্তি এবং নেওয়া হল প্রীতি। অখণ্ড সমবোধের ব্যবহার হল জ্ঞান ও মুক্তি"[১]।

ঈশ্বর আত্মা ব্রহ্মের পুর হৃদয়ের তাৎপর্য

চৈতন্যের আত্মদানেই হল চৈতন্যের বিজ্ঞান। স্বকীয় অবস্থা পরকীয় অবস্থায় নিত্য অবস্থান করে। হৃদয় হল সর্ববিদ্যা বোধ ও চৈতন্যের কেন্দ্রভূমি। হৃদয়ই হল পরাক্ষেত্র, ঈশ্বর আত্মা আনন্দ ব্রহ্মের অধিষ্ঠান, নিত্য বাসস্থান ও লীলাভূমি। বিবেক বিচারের মাধ্যমে সকাম ও অভিমানের অবসান ঘটে। তার ফলে প্রবৃত্তির বদলে নিবৃত্তির উদয় হয় বৈরাগ্যের উৎকর্ষে, সেই সঙ্গে অন্তরের সকাম ভাববৃত্তির অবসান ঘটে, ফলে নিষ্কাম ভাবের উদয় ও সম্প্রসারণ হয়। এই নিষ্কামের সঙ্গে সকামের আর কোন সম্বন্ধ থাকে না। নিষ্কাম হলেই ভেদজ্ঞান বা ব্যষ্টিভাব থাকে না। তখন সর্ববোধের সঙ্গে হয় মিলন। হৃদয়ই হল সেই মিলনভূমি যেখানে নিত্য পূর্ণতা সমতা একবোধ সমবোধ পূর্ণ আনন্দ ও প্রেমে স্বতঃসিদ্ধ অভিব্যক্তি স্ফূর্ত হতে থাকে। এ-হৃদয়ের কোন বিকল্প নেই। এ-হৃদয় নিত্য অদ্বয়ভূমি।

জীবনে সর্বপ্রকাশের কেন্দ্র হল হৃদয়। হৃদয় হতেই সর্বপ্রকার প্রকাশ ও বিকাশ বাইরে ছড়িয়ে পড়ে এবং তা থেকে নূতন সৃষ্টি রূপ নেয়। এই হৃদয়ই সবকিছুকে পরিচালিত করে, যুক্ত করে, অবশেষে আবার একের মধ্যে মিলিয়ে নেয়।

হৃদয়গুহাতে বা হৃদয়কেন্দ্রে হৃদয় স্বরূপ হয়ে যে স্বয়ংপূর্ণ স্বয়ংপ্রকাশ সত্তা নিত্যবিদ্যমান তাঁকেই ব্রহ্ম আত্মা ঈশ্বর বা ভগবান বলা হয়। তাঁর বিরাটরূপের অভিনয়ক্ষেত্র বা রঙ্গমঞ্চ অর্থাৎ অনন্ত অসীমের লীলানিকেতন হল এই বিশ্বভুবন।

ভূমি বা মাটির তাৎপর্য

সমগ্র প্রকাশের স্থূল ভিত্তি বা ভূমি অর্থাৎ জগতের স্থূল কেন্দ্র হল মাটি। এই মাটির মধ্যেই সঞ্চিত আছে সমগ্র প্রকাশের বীজ। বীজের অন্তরে নিহিত আছে জীবচৈতন্য। জীবের হৃদয়গুহায় নিহিত আছে সংবিদা বা চিতিমাতা অর্থাৎ ঈশ্বর আত্মচৈতন্য ব্রহ্ম সনাতন।

মাটিরূপে সমগ্র জগৎকে ধারণ করে আছেন বলেই তাঁকে জগদ্ধাত্রী বলা হয়। সৃষ্টির মূলে প্রথমে মাটি, মধ্যেও মাটি এবং অন্তেও মাটি। তাই বলা হয় মাটি তন্ত্র, মাটি যন্ত্র এবং মাটি মন্ত্র। এই মাটিই হল সেই 'মাটি' (চিতিমাতা)।

১। সৃষ্টি গতি পুষ্টি তুষ্টি স্থিতি শান্তি ভক্তি প্রীতি জ্ঞান ও মুক্তি স্বানুভবসিদ্ধ অভিনব সংজ্ঞা।

প্রাণীজগতের আবাসস্থল হল এই মাটি। জগৎকে ধারণ করে, পালন করে ও পোষণ করে বলে মাটির নামই জগদ্ধাত্রী, ধরিত্রী ও সর্বংসহা পৃথ্বী। পৃথিবী হল ভূমাতা; এই অর্থে একে ভূমা বলা চলে। "The soil is the soul of all and the soul of all appears as the soil Infinite."

প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের পরিপূরক ও সম্পূরক সম্বন্ধ। পরস্পরের সহযোগিতার উপরই পরস্পরের উন্নতি শ্রীবৃদ্ধি ও পূর্ণতা নির্ভর করে। পরস্পরের মিলিত শক্তিই হল দৈবশক্তি এবং পৃথক পৃথক শক্তি হল আসুরিক[১] শক্তি। পরস্পরের সম্মিলিত জ্ঞানই হল দিব্যজ্ঞান এবং পৃথক পৃথক জ্ঞান হল আসুরিক জ্ঞান ও অজ্ঞান। পরস্পর সংযুক্ত একভাবকেই মহাভাব বলে। এই মহাভাবের উৎকর্ষই হল স্বভাব বা আত্মভাব। পৃথক পৃথক ভাবই হল অভাব। সমষ্টিযোগে এক হল বিশ্বাত্মা ঈশ্বর এবং ব্যষ্টি এক হল জীব। ঈশ্বরীয় এককে পাওয়া বা পূর্ণ এক হওয়া নির্ভর করে আপনবোধে মানার উপরে। আপনবোধে সব মানাই হল আত্মপ্রেমের লক্ষণ। আত্মপ্রেমে পৃথকভাব ও জ্ঞান বা ভেদজ্ঞান থাকে না। আত্মপ্রেমের বিকাশ হয় আত্মদানে[২]।

প্রকাশবৈচিত্র্যের বর্হিভাবকে অধিভূত বলা হয়। অন্তর্ভাব হল অধিদৈব, কেন্দ্রভাব হল অধ্যাত্ম এবং সমগ্র ভাবের উৎস হল অধিযজ্ঞ।

পৃথক করে আপনার স্থিতি ও পুষ্টি রক্ষা করাই হল অহংকার। নিজেকে অপর সকল হতে পৃথক করে যে পুষ্ট হতে চায় সে-ই স্বার্থপর। নিজেকে সকলের স্বার্থে বিলিয়ে দেওয়াই হল স্বার্থত্যাগ[৩]।

তত্ত্ববিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত বিষয়বস্তুসকলের তাৎপর্যপূর্ণ অভিনব সংজ্ঞা ও বিশ্লেষণ

অহংকারবোধই হল সংকীর্ণতা। ত্বংকারবোধে আসে পূর্ণতা। অহংকারবোধে জীবনে হয় সংকোচন এবং ত্বংকারবোধে হয় সম্প্রসারণ। দেওয়া আর নেওয়া নিয়েই দুনিয়া। অদ্বৈতস্বরূপ ঈশ্বর বা ভগবান দ্বৈতভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই দ্বৈতভাবই হল প্রকাশক ও প্রকাশ।

যা নিঃশ্রেয়স্কর এবং যা দ্বারা জীবনে উত্তরোত্তর পূর্ণতা লাভ হয় তা-ই ধর্ম। অহংকার হল বন্ধন। স্বার্থপরতা, সংকীর্ণতা, বৈরিতা, হীনতা, নিষ্ঠুরতা, প্রভৃতি হল অধর্ম ও পাপ। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য, লজ্জা, ভয়—এই আটটি হল আত্মশত্রু[৪]।

অসত্য সংকোচন ও ভয়ই হল মৃত্যু। সত্য সম্প্রসারণ ও অভয় হল মুক্তি। সত্য হল বিজ্ঞানসাপেক্ষ। বিজ্ঞান হল যথার্থ ব্যবহার, অর্থাৎ সমবোধের বা আপনবোধের ব্যবহার। বিজ্ঞান শ্রদ্ধাসাপেক্ষ। শ্রদ্ধা নিষ্ঠাসাপেক্ষ। নিষ্ঠা ভক্তিসাপেক্ষ। ভক্তি প্রীতি ও সুখসাপেক্ষ। সত্যপ্রীতি হল ভূমাসাপেক্ষ। এই ভূমাই হল মুক্তি, অমৃত, সুখ ও শান্তি। এই ভূমাই হল আত্মা। এ আত্মা নিত্যাদ্বৈত স্বয়ংপূর্ণ স্বয়ংপ্রকাশ সর্বাতীত নিত্য স্বয়ং বর্তমান। এই আত্মাই হল সচ্চিদানন্দস্বরূপ।

বিজ্ঞান চতুর্বিধ, যথা—শক্তির বিজ্ঞান, জ্ঞানের বিঁজ্ঞান, আনন্দের বিজ্ঞান ও প্রেমের বিজ্ঞান। শক্তি জ্ঞানসাপেক্ষ, জ্ঞান আনন্দসাপেক্ষ, এবং আনন্দ প্রেমসাপেক্ষ। অর্থাৎ শক্তির যথার্থ ব্যবহারবিজ্ঞান হয় জ্ঞানের দ্বারা, জ্ঞানের বিজ্ঞান হয় আনন্দের দ্বারা এবং আনন্দের বিজ্ঞান হয় প্রেমের দ্বারা।

একের দ্বিবিধ গতি, যথা—বর্হিমুখী ও অন্তর্মুখী। এই দ্বিবিধ গতির ব্যবহারই হল জগৎসংসার। বর্হিমুখী গতিবিজ্ঞানের বিশেষত্ব হল এতে কার্যের প্রকাশ অধিক, কারণ থাকে অব্যক্ত। অর্থাৎ কারণ থাকে পিছনে এবং কার্য থাকে সামনে। কিন্তু অন্তর্মুখী গতিবিজ্ঞানে কারণ আসে সামনে ও কার্য যায় পিছনে। ত্রিগুণের সাম্য অবস্থা হল প্রকৃতি।

১। বিজ্ঞান দৃষ্টিতে। ২। স্বাত্মবোধের দৃষ্টিতে। ৩। বিজ্ঞান দৃষ্টিতে। ৪। তত্ত্ববোধের দৃষ্টিতে।

ত্রিগুণের বিস্তার এবং কার্যই হল সৃষ্টি স্থিতি সংহার

গুণের বিস্তারই হল বৈচিত্র্যের সৃষ্টি। প্রতিটি গুণই হল শক্তির বিশেষ একক মূর্তি। এরা স্বরূপত অদৃশ্য কিন্তু এদের প্রকাশ হল দৃশ্য ও গ্রাহ্য। গুণের প্রকাশবৈচিত্র্যগুলি সূক্ষ্মতম অবস্থা থেকে ক্রমশ স্থূলতম অবস্থা প্রাপ্ত হয়। রূপ নাম ভাব অবস্থার পরিণাম বা বিকার পরস্পর গুণের প্রভাবে সম্পাদিত হয়। গুণের মাত্রাভেদে সর্বরকম প্রকারভেদ হয়। প্রতিনিয়ত এই ত্রিবিধ গুণের সংমিশ্রণের ফলে জগতের রূপান্তর বা পরিণাম সাধিত হয়। সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার এই ত্রিগুণেরই ব্যবহার। সেই জন্যই একে প্রকৃতির খেলা বলা হয়। প্রকৃতির অপর নাম হল স্বভাব। এই স্বভাবপ্রকৃতি হল বিকারী কিন্তু আত্মসত্তা হল নিত্যনির্বিকার ও অপরিণামী।

ত্রিগুণা প্রকৃতির অধিষ্ঠানচৈতন্যই হল ঈশ্বর আত্মা ব্রহ্ম

আত্মার কোন গতাগতি নেই, উৎপত্তি লয় নেই, ক্ষয়বৃদ্ধি নেই, জন্মমৃত্যু নেই। এগুলি সব আত্মবক্ষে স্বভাব-প্রকৃতির সাময়িক বিলাস মাত্র। যা কিছু গতিশীল তা-ই বিকারী এবং তা ত্রিগুণের ব্যবহার। ত্রিগুণের ব্যবহার এই জগৎসংসার জাদুবিদ্যার মত মায়া বা মিথ্যা। কিন্তু যার বক্ষে এই জাদুবিদ্যা হয়, অর্থাৎ যাঁর সত্তায় অস্তিত্ববান হয়ে এই জাদুবিদ্যা বা এই ত্রিগুণের খেলা প্রতিভাত হয় তাঁকেই জাদুকর ঈশ্বর বলা হয়।

প্রকৃতপক্ষে আত্মা নিষ্কল নিষ্ক্রিয় শান্ত নিরবদ্য ও নিরঞ্জন। গুণের দৃষ্টিতে গুণাতীত আত্মার অনুভূতি হয় না। গুণের খেলাকে উদাসীন দৃষ্টি দ্বারাই গুণাতীত আত্মার পরিচয় পাওয়া যায়। আত্মা হল নিষ্ক্রিয় নিত্যবিশুদ্ধ সাক্ষীচৈতন্য সর্বভাব ও জ্ঞানের অধিষ্ঠান কিন্তু নিত্য নিরপেক্ষ। আত্মা ও ব্রহ্ম অভেদ। আত্মজ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞান এবং ব্রহ্মজ্ঞানই আত্মজ্ঞান। এই জ্ঞান অবিমিশ্র অখণ্ড এক বা ভূমা। এই ভূমা অতিরিক্ত আত্মার মধ্যে দ্বিতীয় কোন বস্তু নেই। আত্মা ঊর্ধ্বে, আত্মা নিম্নে, আত্মা সামনে, আত্মা পিছনে, আত্মা ডাইনে আত্মা বায়ে, আত্মা অন্তরে, আত্মা বাইরে, আত্মায় আত্মা নিত্য প্রতিষ্ঠিত।

অব্যক্ত প্রকৃতির ব্যক্ত অবস্থাই হল কার্য-কারণ ও কারণ-কার্য সম্বন্ধ

সূক্ষ্মভূত ইন্দ্রিয়াতীত ও অদৃশ্য, স্থূলভূত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। সূক্ষ্ম পঞ্চভূত পঞ্চীকৃত হয়ে স্থূল পঞ্চভূত হয় এবং তা দ্বারাই বহির্বিশ্ব সৃষ্ট হয়। স্থূলভূত বিকৃত হয়ে সূক্ষ্মভূতে লয় হয় যখন, তখন স্থূলজগৎও সূক্ষ্মে লীন হয়। স্থূলভূত বিকারী পরিণামী অস্থায়ী বলে স্থূলজগৎও বিকারী পরিণামী ও অস্থায়ী। স্থূল পঞ্চভূত ও তা হতে জাত স্থূল জগৎ যেমন সূক্ষ্ম পঞ্চভূতের পরিণাম সেইরূপ আবার সূক্ষ্ম পঞ্চভূত হল ত্রিগুণাপ্রকৃতির পরিণাম। ত্রিগুণের সাম্য অবস্থা হল প্রকৃতির অব্যক্ত অবস্থা। এই অবস্থায় সূক্ষ্ম পঞ্চভূত লীন হয়ে যায় অর্থাৎ সূক্ষ্ম জগৎও লয় হয়। স্থূলের কারণ সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মের কারণ হল অব্যক্ত প্রকৃতি। অব্যক্তের কারণ হল নিত্যনির্বিকার মহাকারণ পরমব্রহ্ম পরমাত্মা। ত্রিগুণাপ্রকৃতির তিন ভাব হল কারণ, সূক্ষ্ম ও স্থূল। স্থূল ও সূক্ষ্মের মধ্যে সম্বন্ধ এই—স্থূল হল কার্য, সূক্ষ্ম হল কারণ। আবার সূক্ষ্ম ও কারণের মধ্যে সম্বন্ধ এই—সূক্ষ্ম হল কার্য, কারণ হল আদি মূল বা অব্যক্ত। কারণ হতে যে কার্য সৃষ্টি হয় তা কারণে এসে আবার লীন হয়। কারণ ও কার্যের সম্বন্ধ ধরে ত্রিগুণের বিকার বা জগৎ সৃষ্টি হয়। আবার কার্য ও কারণের সম্বন্ধ ধরে জগতের বিকার বা বিনাশ হয়, অর্থাৎ কারণে লয় হয়।

তপস্যার তাৎপর্য

তপস্যা দ্বারা তাপের আধিক্য হলে তার আসক্তি কেটে যায় এবং মোহাবরণ ছিন্ন হয়। তখন তার বহির্মুখী মন অন্তর্মুখী হয় এবং ক্রমশ সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর হয়ে সূক্ষ্মতম বোধসত্তার সঙ্গে মিলে মিশে একীভূত হয়ে যায়। এই হল মানব জীবনের মুক্ত অবস্থা। তপস্যা হল তাপ সৃষ্টি করা।

সত্ত্বগুণের আধিক্যে সত্য নির্মলভাবে প্রকাশ পায়। সত্ত্বগুণের প্রভাবে অহংকার পরিশোধিত হয় অর্থাৎ অহংকার বিগলিত হয়। তখনই হয় মুক্তি, আত্মোপলব্ধি বা স্বরূপোপলব্ধি।

কর্ম-যোগ-জ্ঞান-ভক্তিতত্ত্বের রহস্য ব্রহ্ম-আত্মা-ঈশ্বর ঐক্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। ঈশ্বরই দিব্য মুক্ত মানবের বেশে এসে অমৃতত্ব যুগোপযোগী করে ব্যক্ত করে দিয়ে যান এবং তা হতেই অধিকারী পরম্পরায় এই বিজ্ঞান প্রচারিত হয়। কালক্রমে ব্যবহার দোষে আবৃত হয়ে তা লুপ্ত হয়ে যায়। তখন নববেশে ঈশ্বরের দিব্যরূপায়ণ হয় এবং যুগোপযোগী করে তা আবার অভিব্যক্ত হয় ও প্রচারিত হয়।

আত্মাই হল অখণ্ড সত্য অদ্বয় অব্যয় অমৃতময় নিত্যবস্তু। এই অখণ্ড আত্মা হতেই সকলে জাত, তাঁর মধ্যেই অবস্থিত এবং অনুভূতির উৎকর্ষে তাঁর সঙ্গে একীভূত হয়ে তৎস্বরূপ প্রাপ্ত হয়। এই আত্মানুভূতি লাভ করা বা আপন সত্যস্বরূপের আবিষ্কার করা ও উপলব্ধি করাই হল সমগ্র জীবনের মূল উদ্দেশ্য। এ-ই প্রধান কর্তব্য, অন্যান্য কর্ম ও উদ্দেশ্য হল নগণ্য।

তত্ত্বানুভূতির ভিত্তিতে হিন্দু ও হিন্দুত্বের তাৎপর্য

হিন্দুর হিন্দুত্ব হল অখণ্ড অনুভূতির অবস্থাবিশেষ[১]। হিন্দু হল শ্রেণীবিশেষ। জীবনের পরম ও চরম বস্তুকে লাভ করার জন্য যার আন্তরিক চাহিদা বা আর্তি ও শরণাগতি আসে সে-ই হিন্দু[২]। পূর্ণতালাভের বা অখণ্ড সত্যানুভূতি, আত্মতত্ত্ব বা অমৃতত্ব উপলব্ধির অন্তরায় ও প্রতিবন্ধকরূপে যা-কিছু সম্মুখে উপস্থিত হয় এবং যে-সকল অবস্থা গুণ, বস্তু, ব্যক্তি, কর্ম ও বোধের প্রতিকূল অবস্থার কারণ হয় তা হীনবোধে উপেক্ষা করে যারা পূর্ণতার দিকে এগিয়ে যায় তারাই হিন্দু।

ভেদজ্ঞানই হল অজ্ঞান এবং অভেদদর্শন হল জ্ঞান। এই অভেদদর্শনের উপরই প্রতিষ্ঠিত হিন্দুর জীবনাদর্শ। হিন্দুর ধর্ম, কর্মের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল এই অভেদদর্শন। ভেদজ্ঞানরূপ মনোমল ত্যাগই হল তার পবিত্রতা ও অভিষেক এবং ইন্দ্রিয়সংযম হল তার ভিত্তি ও বোধন। শুদ্ধবোধের সেবা ও ব্যবহার তার ধর্ম। শুদ্ধবোধের নীতি মেনে চলাই তার ধর্ম। শুদ্ধবোধের অনুশীলন, তৎপ্রতি নিষ্ঠা এবং তাতে প্রতিষ্ঠিত থাকার অভ্যাসই হল তার সাধনা ও উপাসনা। সত্যবোধের ধারণাই তার শ্রদ্ধা। ভূমাবোধের আসক্তি ও প্রীতি তার ভক্তি। বিশুদ্ধ একবোধে বা সমবোধে স্থিতিই হল তার শান্তি। ভূমাবোধের অনুভূতিই তার মুক্তি। এই সকল আদর্শের সঙ্গে যুক্ত থেকে ঐকান্তিকভাবে তার সাধনায় জীবনভর যে যুক্ত থাকে সে-ই হিন্দুত্বের মর্ম অনুভব করে তার সর্বোত্তম অধিকারী হয়। এ ছাড়া বংশ জাতি ও বর্ণগত হিন্দুর কথা এখানে বলা হয়নি। অমৃতত্ব ও সত্যসাধনবিহীন জীবন হিন্দু হয়েও হিন্দু নয়। কিন্তু অ-হিন্দু হয়েও যে সত্যবোধ, সমবোধ বা বিশুদ্ধবোধের সাধন করে সে-ই যথার্থ হিন্দু পদবাচ্য। সমষ্টির প্রতিকূলে যাওয়া পাপ ও মৃত্যুর কারণ।

সত্যই ধর্ম এবং ধর্মই সত্য। সত্যই অমৃত এবং অমৃতই সত্য। আত্মা অমৃত এবং অমৃতই হল আত্মা। ভূমাই অমৃত এবং অমৃতই ভূমা। ভূমা অখণ্ড ও অনন্ত বোধস্বরূপ। অদ্বয়জ্ঞানই হল অমৃত আত্মা। অহিংসা অদ্বৈতমূলক এবং হিংসা দ্বৈতমূলক। সত্য ও ধর্ম অভেদ ও অদ্বৈত বলে অহিংসাকেও ধর্ম বলা হয়। সুতরাং ধর্ম সনাতন নিত্য এক এবং সত্যও সনাতন নিত্য এক ও অদ্বৈত। পূর্ণ ক্ষমার উপর তা প্রতিষ্ঠিত। যা সকলকে ধারণ করে নিঃশ্রেয়স্কর পরম ও চরম পরিণতির দিকে নিয়ে যায় তা-ই ধর্ম।

বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্ব ও সমত্বের দর্শনই হল আত্মদর্শন

মানব জীবনের উদ্দেশ্য ও প্রধান কর্তব্য হল নানাত্ব বহুত্বের মধ্যে থেকে তার বৈচিত্র্যের প্রতি দৃষ্টি না দিয়ে

১। তত্ত্বানুভূতির ফলশ্রুতি। ২। স্বাত্মানুভূতির দৃষ্টিতে।

প্রতি প্রকাশের অন্তর্নিহিত বোধস্বরূপের দিকে লক্ষ্য স্থির রেখে একরস সমরস সমবোধ বা আপনবোধে পুষ্টি তুষ্টি ও স্থিতি লাভ করা। একরস, বোধ, বা মধু হল একত্ব লাভের মাধ্যম। মধু যেমন ফুলের প্রাণরস, বোধ সেরূপ সর্বজীবনের প্রাণরস। মধু সংগ্রহের অর্থ হল প্রতি প্রাণের মিলন বা প্রতি বোধের মিলন।

জগতের সবকিছু অনিত্য বা পরিবর্তনশীল বলে তা মূল উপাদানসত্তার সঙ্গেই যুক্ত। আলোর কিরণ বা প্রকাশকে অবলম্বন করে যেমন আলোর মূল বা কেন্দ্রের পরিচয় পাওয়া যায়, সেইরূপ সত্যবোধের প্রকাশ জগৎকে অবলম্বন করে জগদাতীত সত্যের সন্ধান মেলে।

সত্যবোধে সবাইকে গ্রহণ করাই হল সত্যবোধে সবাইকে মান দেওয়া। কৃতজ্ঞতাবোধ ছাড়া সত্যবোধ এবং সত্যবোধ ছাড়া কৃতজ্ঞতাবোধ হয় না। সত্যবোধ বা কৃতজ্ঞতাবোধ আপনবোধ বা আত্মবোধেরই ব্যবহার।

একবোধে সমবোধে বা আপনবোধে মানাই হল বৈষ্ণব ধর্ম এবং বৈষ্ণব ধর্মই হল আত্মধর্ম[১]। বিষ্ণু অর্থ সর্বব্যাপী অখণ্ড এক আত্মা, যা সবকিছুতে ব্যাপ্ত হয়ে আছে এবং সবকিছু ধারণ করে আছে। সমগ্র সত্তা, সমগ্র শক্তি, সমগ্র জ্ঞান, আনন্দ, প্রেম ও শান্তির পূর্ণস্বরূপ হল ভূমা আত্মা। বিষ্ণু হল তাঁর নাম ও পরিচয়।

মায়ার লক্ষণ ও কার্য

নিত্য পূর্ণতাই হল অমৃতত্বের বিশেষত্ব। অবিদ্যা অজ্ঞানই হল অমৃতত্বের প্রতিবন্ধক। এরই প্রভাবে ভেদজ্ঞান ও ভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। ভ্রান্তি হল অজ্ঞান ও অবিদ্যার স্বরূপ। এই ভ্রান্তিকেই মায়া বলে।

প্রেমের লক্ষণ

নির্বিচারে দেওয়াই হল প্রেমের লক্ষণ। প্রেমের সাধনাই হল বৈষ্ণব সাধনা। প্রেমিক বৈষ্ণব শুধু নামেতে নয়, সত্য আচরণের মাধ্যমে হয়। তার কাছে সবই প্রিয়, সবই শ্রেয়, সবই বড়, সবই সমান। সদা বিনম্র ব্যবহার হল বৈষ্ণবের লক্ষণ। সকলের দাসানুদাস, তস্য দাস এই ভাব অবলম্বন করে তিনি সকলকে মান দেন, নিজে মান নেন না। সবার কাছে নত হলে অর্থাৎ সবাইকে মানতে পারলে শুদ্ধাভক্তির অধিকারী হওয়া যায়। শুদ্ধাভক্তি হলেই শুদ্ধজ্ঞানের উদয় হয়। তখন সর্ববোধের বা প্রেমের আচরণ প্রকাশ পায়। "ভক্তি বাড়ে মেনে, আর জ্ঞান বাড়ে জেনে"[২]।

নত হওয়া যায় শুধুমাত্র ঋণবোধের দ্বারা। ভগবান সর্ববস্তুর মধ্যে বিচরণ করেন বলেই তিনি বিচার করতে পারেন।

নিষ্কাম হলেই অভিমান অহংকার মুক্ত হওয়া যায়। ঈশ্বরই কর্তা, দ্বিতীয় আর কোন কর্তা নেই, এই হল অকর্তা বোধ।

সত্যবোধের অনুশাসন

মহৎবোধে সকলের সেবা করাই হল ভক্তি লাভের সহজ উপায়। অণু বোধে মন গলে। বিগলিত চিত্ত হল শুদ্ধচিত্তের লক্ষণ। অভেদদর্শন অর্থাৎ সর্ববস্তুতে সমত্বদর্শন বা সমদৃষ্টি হল প্রকৃত জ্ঞান[৩]।

তুমি বড় হও, মহৎ হও, মুক্ত হও—তারপর অপরকে বড় কর, মহৎ কর, ও মুক্ত কর। এই হল ধর্মাদর্শের নির্দেশ। ছোট থেকে বড় হয়ে আবার ছোটকে বড় করার চেষ্টা হল স্বভাবের ধর্ম।

স্থিরতা ও শান্তি হল পূর্ণতার লক্ষণ। পূর্ণতা লাভের পূর্ব পর্যন্ত কাজ হল নেওয়া। পূর্ণতা লাভের পরের কাজ হল দেওয়া। অর্থাৎ ছোটর কাজ নেওয়া, বড়র কাজ দেওয়া।

১। অভিনব সংজ্ঞা।   ২। তত্ত্ববোধের দৃষ্টিতে।   ৩। অভিনব সংজ্ঞা।

যেখানে গুণ ও শক্তির প্রকাশ সেখানে ঈশ্বর আত্মাকে মানতে হয়। সর্ববস্তুর মধ্যে ঈশ্বরকে দেখাই হল জ্ঞানের উদ্দেশ্য। জানি, পারি, বুঝি—এটা জ্ঞানের লক্ষণ নয়। প্রকাশ করাই হল জ্ঞানের ধর্ম।

সবকিছুর যথার্থ পরিচয় যে প্রকাশ করে সে-ই হল ঈশ্বর আত্মা।

বহুর থেকে একের দিকে এবং অশান্ত থেকে শান্তের দিকে নেওয়াই হল মহাপুরুষদের কাজ। সর্ব বিষয়ের মধ্যে একবোধ বা সমবোধই হল ঈশ্বরীয়বোধ বা আত্মবোধ। "সত্যংজ্ঞানমনন্তম্"-ই হল ব্রহ্ম আত্মা ঈশ্বরের স্বরূপ। অজ্ঞানই হল মৃত্যু। শব্দই সৃষ্টি করে নাম এবং নামই ধরে রাখে সবকিছু। নাম হল বোধের ব্যবহার এবং বোধ হল নামের লক্ষ্য। [১৩।৬।৬৮]

সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মসত্তা ও সচ্চিদানন্দময়ী মাতার জীবনলীলার নিগূঢ় তাৎপর্য

অখণ্ড সচ্চিদানন্দস্বরূপ হল পরব্রহ্ম পরমাত্মা। এই ব্রহ্ম হৃদিবিলাসিনী ব্রহ্মের বা আত্মার স্বরূপশক্তি হল সচ্চিদানন্দময়ী মা। তাঁর প্রকাশ বা সন্তান তাঁর অতি আপন, অতি প্রিয়। অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মত এই প্রকাশসন্তানসকল তাঁর সঙ্গে নিত্যযুক্ত। তিনি পরমানন্দে নিজেকে সন্তানরূপে ও ভক্তরূপে প্রকাশ করে নিজের বক্ষেই খেলেন। তাঁর সর্বপ্রকাশের অন্তঃসত্তাই হল ব্রহ্মসত্তা। কোন প্রকাশই সত্তাকে বাদ দিয়ে সম্ভব হয় না। কিন্তু প্রকাশবৈচিত্র্যের মাধ্যমে অখণ্ড ব্রহ্মসত্তার পরিচয় আবৃত থাকে।

মানুষের মধ্যেই তাঁর প্রকাশ সর্বাধিক। সেইজন্য বলা হয় সবার উপরে মানুষ সত্য। মানব জীবনের মাধ্যমেই ঈশ্বরীয় অনুভূতি, পরব্রহ্ম পরমাত্মার অনুভূতি লাভ করা, শক্তি জ্ঞান ও বিজ্ঞানের যথার্থ পরিচয় অবগত হওয়া এবং দিব্যপ্রেমের আস্বাদন করা সম্ভবপর হয়।

ঈশ্বরের অনন্ত মহিমা সর্বজীবের মাধ্যমে অভিব্যক্ত হলেও মানুষের মধ্যে তাঁর প্রকাশভঙ্গিমার বিশেষত্ব আছে। কেবলমাত্র মানুষই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মের সর্বোত্তম অধিকারী। এই সর্বোত্তম ধর্মলাভের জন্য সুস্থ সবল দেহ, সুষ্ঠু ইন্দ্রিয়বৃত্তির প্রয়োজন। দেহেন্দ্রিয় প্রাণ-মনের একতানগতি, শরণাগতি এবং নিরন্তর স্মরণ বা অনুধ্যানের মাধ্যমে ধ্রুবাস্মৃতির জাগরণ হয় এবং তার ফলে মানুষ আপন স্বরূপের পরিচয় লাভ করে অমৃতত্বের অধিকারী হয়।

যে বোধবৃত্তি সমগ্র অন্তরিন্দ্রিয়ের সঙ্গে বৈচিত্র্যময় বহির্বিশ্বের সর্বপ্রকাশের সঙ্গে সর্বতোভাবে একতানগতি এনে দেয় এবং যা নিরন্তর নানাত্ব বহুত্বকে তাদের স্বকীয় স্বভাব দিয়ে প্রকাশ করে, সেই সত্যের সন্ধান আপন হৃদয়েই মানুষ পূর্ণভাবে অনুভব করতে পারে। এই অনুভূতিই হল মানবাত্মার মহাজাগরণ। এই মহাজাগরণের জন্যই জীবনের সকল কর্ম চেষ্টা উদ্যম উৎসাহ ও প্রেরণা। সর্বপ্রকাশের বোধের সঙ্গে মিলিত হওয়ার ফলেই বোধের ঐকতান সৃষ্টি হয়। যতদিন পর্যন্ত মানুষ এই ঐকতানে অংশগ্রহণ করতে না পারে ততদিন তার পূর্ণতার স্বরূপ জাগে না। তার প্রতি তন্ত্রীতে সমসুরের ধ্বনি বাজে না। অন্তঃপ্রাণের বৃত্তিগুলির মধ্যে স্ববোধ আত্মার ঐকতান সঙ্গীত শোনা যায় না। মুখ্যপ্রাণের সঙ্গে গৌণপ্রাণের মিলন হয় না। বৈচিত্র্যের মধ্যে সমতা বা একতা এবং গতির মধ্যে স্থিতির সন্ধান সে পায় না। তার ফলে জীবনের গতি অন্তরে ও বাইরে পরস্পরবিরোধী বৈচিত্র্যময় ভাব, প্রকৃতি, গুণ, অবস্থা ও কর্মের ভিন্ন ভিন্ন গতিপথে বেসুরো ও বেতালে স্বেচ্ছায়, অনিচ্ছায় ও পরেচ্ছায় যন্ত্রবৎ পরিচালিত হয়। এইরূপ অবস্থায় সুখদুঃখ, জয়পরাজয়, ধর্মাধর্ম, সদসৎ, পাপপুণ্য, ভালমন্দ, আপনপর, লাভক্ষতি, জন্মমৃত্যু প্রভৃতি দ্বন্দ্ব ও মিলনের বশবর্তী হয়ে এবং কার্যকারণের পূর্বাপর সম্বন্ধ ধরে মানুষ অগ্রসর হতে থাকে। আত্মবোধে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ শান্তিতে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত জীবনপথে সর্ববিধ প্রতিকূলতা বাধাবিঘ্ন দুঃখকষ্টের সঙ্গে প্রতিনিয়ত সকলকে সংগ্রাম করেই চলতে হয়।

মায়ের পুষ্টিতেই সন্তানের পুষ্টি, মায়ের তুষ্টিতেই সন্তানের তুষ্টি, মায়ের অনুভব শক্তিতেই সন্তানের অনুভব, মায়ের পূর্ণতাতেই সন্তানের পূর্ণতা।

অদ্বৈত দৃষ্টিভঙ্গিতে একের মাঝে একের ব্যবহার

বিশ্বের যত ক্ষুদ্র বৃহৎ সান্ত ও অনন্ত ব্যষ্টি প্রাণ বা প্রকাশ সকলেই অমৃতময়ী মায়ের সন্তান। মহাসাগরতুল্য সেই মাতৃবক্ষ। এই মাতৃবক্ষ হতে সব জাত হয়ে তার মাঝে খেলা করে, পুষ্ট হয়ে তুষ্ট হয়ে তন্ময় হয়ে ও তদগত হয়ে, আবার তাঁরই সঙ্গে মিশে একীভূত হয়ে যায়। এই পূর্ণতার স্বভাবের সঙ্গে মিলিত হয়ে আবার সে সত্যময় ব্রহ্মময় অমৃতময় আনন্দময় ও প্রেমময় হয়। এই প্রেমেই হয় মানবজীবনের সমাপ্তি।

প্রেমই হল পূর্ণতার ও সমগ্রতার একক মূর্তি। প্রেমস্বরূপই হল সকলের যথার্থ পরিচয়। প্রেমময় না হওয়া পর্যন্ত প্রাণের ছুটি হয় না, কারও গতি শেষ হয় না। একমাত্র আনন্দই পারে মানুষকে পূর্ণতায় অর্থাৎ পূর্ণপ্রেমে প্রতিষ্ঠিত করতে।

শক্তির মাত্রা পূর্ণ হলে জ্ঞানের বিকাশ হয়। জ্ঞানের পূর্ণমাত্রায় হয় আনন্দের বিকাশ এবং আনন্দের পূর্ণমাত্রায় হয় প্রেমের বিকাশ[১]। এই প্রেমই হল প্রাণচৈতন্যের পূর্ণরূপ। প্রাণশক্তির সর্বোত্তম পরিণতি হল প্রেম। এই প্রেম আনন্দের প্রাণ বা কারণ। শক্তির কারণ বা প্রাণ হল জ্ঞান, জ্ঞানের কারণ বা প্রাণ হল আনন্দ। এই আনন্দের মধ্যেই প্রেম অধিষ্ঠিত বা আনন্দের মধ্যেই প্রেমের প্রতিষ্ঠা। আনন্দের ভাবকে মাধ্যম করেই প্রেমের অভিব্যক্তি হয়। প্রেমের মধ্যে আনন্দ, জ্ঞান ও শক্তি সবই পূর্ণমাত্রায় থাকে। অর্থাৎ শক্তি জ্ঞান আনন্দের পূর্ণ সমাধান হল প্রেম। প্রেমকে বাদ দিয়ে এরা কেউ-ই পৃথকভাবে বা স্বতন্ত্রভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। এদের প্রকাশধারার মধ্যে পরস্পরের প্রাধান্য নিম্ন হতে ঊর্ধ্বমাত্রায় ব্যাপক হয়ে পূর্ণমাত্রায় (পরাকাষ্ঠায়) একতা ও সমতা প্রাপ্ত হয়। নিত্য সমতা ও একতা হল প্রেমের বিশেষত্ব। প্রেম হল প্র+ইম। অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপে ইচ্ছার প্রতি প্রকাশ স্থূল-সূক্ষ্ম-কার্য-কারণ, রূপ-নাম-ভাব-বোধ, দেহ-প্রাণ-মন-বুদ্ধি সবকিছুর মধ্যে প্রকাশক ও প্রকাশরূপে সত্তা-শক্তি পুরুষ-প্রকৃতি নির্গুণ-সগুণ রূপে 'ম' (মাধব, মহেশ মহৎ) অর্থাৎ মা-ই বিরাজিতা। এই বোধই প্রেমের জননী বা প্রেমস্বরূপা।

প্রেমের অভাবেই জীবন অতৃপ্ত থাকে। কোন কিছুতেই মন ভরে না। কারণ পূর্ণতা লাভ না করা পর্যন্ত, মহাপ্রাণের সঙ্গে মিলন না হওয়া পর্যন্ত অভাববোধ থেকেই যায়। এই অভাববোধই হল পূর্ণতার অভাব। এই অভাব নানাভাবে নানাবিধ অবস্থার মধ্য দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন চাওয়া রূপে ব্যক্ত হয়।

আত্মচেতনা চৈতন্য ব্রহ্ম আত্মা ভগবান ঈশ্বর ইষ্ট গুরু মাতা পিতা বা আমি তুমি প্রভৃতি সেই মহাপ্রাণ প্রজ্ঞাস্বরূপের ভিন্ন ভিন্ন নাম মাত্র। তাঁকে মাতা বলা হয় কারণ প্রাণরূপে তিনি সকলকে মাতিয়ে রাখেন। সকলে প্রাণের জন্য প্রাণের মধ্যেই মেতে আছে। প্রাণকে বাদ দিয়ে কোন কিছুরই অস্তিত্ব অনুভব করা যায় না।

মহাপ্রাণের সঙ্গে বা সমষ্টি প্রাণের সঙ্গে পূর্ণ মিলনের পূর্ব পর্যন্ত ব্যষ্টিপ্রাণ অপূর্ণ থাকে। দেহের মধ্যে যেমন প্রাণ আছে সেইরূপ প্রাণের মধ্যে আবার প্রাণ আছে। প্রাণ অর্থে চৈতন্যকেই বোঝায়। দেহীরূপে প্রাণই এইসব ব্যবহার করে। প্রাণের পূর্ণতা যখন আসে তখন প্রাণ নিজেকে প্রসারিত করে ছড়িয়ে দেয়, মেলে দেয় এবং তার বৈভবসকল প্রকাশ করে দেয়। জ্ঞান বিজ্ঞান দর্শন শিল্প সাহিত্য কলা সঙ্গীত নাম যশ খ্যাতি এমন কি সত্যোপলব্ধি, ঈশ্বরোপলব্ধি, ব্রহ্ম বা আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি, অমৃতত্ব বা পরমশান্তি লাভ প্রভৃতিও অখণ্ড প্রাণসত্তা বা চৈতন্যসত্তার বুকে তাঁরই অভিব্যক্তি বিশেষ। এই সকল প্রকাশ ও অভিব্যক্তির পরিণতি অসমাপ্ত থাকে যদি পূর্ণতার অভাবে স্বভাবের মধ্যে সামান্যতম চাওয়া ও পাওয়ার লেশ থাকে।

স্বভাবের বিস্তারই হল আত্মলীলার রহস্য

ব্রহ্ম বা আত্মা সর্ববস্তুতে অনুস্যূত হয়ে আছেন। মহাপ্রাণ সর্ববস্তুকে ধারণ করে আছেন। সর্বরূপ তাঁরই

১। স্বানুভূতির দৃষ্টিতে।

আত্মবিস্তার মাত্র। সকলের মধ্যে তিনি এবং তাঁর মধ্যে সকলে তা অবগত হয়েই সবসময় সকলকে তিনি সবকিছু নিজবোধে দেন। দেওয়া, নেওয়া এবং দাতা ও গ্রহীতা সকলের মধ্যে বর্তমান থেকে তিনি নিজেই নিজেকে দেন এবং নিজের কাছ থেকে নিজেই নিজেকে পান। এই হল তাঁর সত্যস্বরূপ ও সত্যমহিমা। এই দেওয়া-নেওয়ার খেলায় তিনি যেন দিয়ে পূর্ণ এবং গ্রহণ করে হন অপূর্ণ। যখন চাওয়া-পাওয়া, তখন হয় বিকারের কারণ। যখন শুধু দেওয়া, তখনই হন তিনি পূর্ণ। পূর্ণ না হলে দেওয়া যায় না। পূর্ণ অবস্থায় তিনি দেন এবং অপূর্ণ অবস্থায় তিনি নেন। পূর্ণভাবে দেওয়াই হল দীক্ষা এবং পূর্ণভাবে নেওয়া বা গ্রহণ করা হল শিক্ষা। পূর্ণবোধে তিনি দীক্ষা দেন এবং অপূর্ণবোধে তিনি দীক্ষা নেন অর্থাৎ শিক্ষা নেন। জন্মের পর হতেই সকলের শিক্ষা নিতে হয়। শিক্ষা পূর্ণ হলে দীক্ষা আরম্ভ হয়, অর্থাৎ দেবার কাজ আরম্ভ হয়। এই নেওয়া ও দেওয়া নিয়েই জীবন মহাপ্রাণের মধ্যে ওঠে ভাসে আবার লীন হয়।

শিক্ষা ও দীক্ষার নিগূঢ় তাৎপর্য

পূর্ণভাবে গ্রহণ না করলে পূর্ণভাবে দেওয়া সম্ভব হয় না। পূর্ণভাবে গ্রহণ করাই হল পূর্ণভাবে শিক্ষা। শিক্ষা পূর্ণ না হলে পূর্ণ দীক্ষা দেওয়া যায় না। পূর্ণতাবোধের মধ্যে পূর্ণতার অভাব বা তারতম্য কখনও হয় না। শিক্ষা হল অন্তরের অভাব পূরণের জন্য বাইরে থেকে বস্তুভাব ও বোধ গ্রহণ করা এবং দীক্ষা হল শিক্ষা লাভের পরিণামে পূর্ণতায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে পূর্ণতার ভাব আদর্শ ও অনুভূতিকে বাইরে অপরকে দান করা বা বিলিয়ে দেওয়া। দীক্ষার জন্যই শিক্ষা এবং শিক্ষার জন্যই দীক্ষা। পূর্ণ দীক্ষার জন্য যেমন পূর্ণ শিক্ষার প্রয়োজন সেইরূপ পূর্ণ শিক্ষার জন্যও পূর্ণ দীক্ষার প্রয়োজন। পূর্ণ দীক্ষার উদ্দেশ্যে যে চাওয়া-পাওয়া ও প্রস্তুতি তার মাধ্যমেই শিক্ষার পূর্ণতা আসে। পূর্ণ শিক্ষার উদ্দেশ্যে যে একনিষ্ঠ চেষ্টা ও প্রস্তুতি তার মাধ্যমে দীক্ষার যোগ্যতা বেড়ে পূর্ণতা আসে। তখন প্রাণের উল্টাগতি ও উজানগতি শুরু হয়। তখন হয় শুধু দেওয়া।

আত্মচৈতন্যের স্বভাবমহিমার তাৎপর্য

চৈতন্যময় প্রাণ দিয়েই প্রাণের ও মহাপ্রাণের পরিচয় মেলে। আত্মচৈতন্যের ভিন্ন ভিন্ন অভিব্যক্তি হল শক্তি জ্ঞান বিজ্ঞান চৈতন্য মহাচৈতন্য মহাপ্রাণ প্রভৃতি। তাঁর স্বরূপই হল সচ্চিদানন্দ ও প্রেম।

প্রাণের অভাবে সব শূন্য; কোন কিছুরই মূল্য থাকে না। চৈতন্যময় প্রাণের স্বরূপকে প্রাণই প্রকাশ করে। অর্থাৎ আত্মাই আত্মাকে প্রকাশ করে।

প্রাণের চাওয়ার পরিণাম

যতদিন দেবার অধিকার না হয় ততদিন সন্তান শুধু গ্রহণ করে যায়। মায়ের কাছে সে চাওয়ার পর চাওয়া নিয়ে উপস্থিত হয়। পরমাশক্তির কাছে সে চায় শক্তি বল জ্ঞান বিজ্ঞান আনন্দ প্রেম সুখ শান্তি। সেইজন্য মাতৃতন্ত্রে দেখা যায় মায়ের বুকে থেকে সন্তান মায়ের কাছে চায়—'ধনং দেহি, যশং দেহি, জয়ং দেহি, দ্বিষো জহি'। আরও ব্যাপকভাবে সে চায় 'ভার্যাং মনোরমাং দেহি মনোবৃত্তি অনুসারিণীম্'। মনোরমা ভার্যা মানে যে স্ত্রী মনকে রঞ্জিত করে প্রীতি ও আনন্দ দিতে পারে। জ্ঞানের অভাবে মোহবশত ভ্রান্তি আসে, বিবেক আবৃত থাকে। তাই ভুল করে সে আনন্দদায়িনী মাকে ভার্যারূপে চায় পাশে ভোগের জন্য। তারপরে এই ভোগ শেষ হয়ে আসে ভক্তি। ভক্তি আসে ত্যাগের মাধ্যমে। ভোগ থাকে বলেই সকলের ত্যাগ হয় না। যতক্ষণ ভোগ থাকে ততক্ষণ ভক্তির প্রকাশ হয় না। ভক্তির প্রকাশ হলে ভোগের প্রভাব আর থাকে না।

ভক্তি কেউ দিতে পারে না। প্রাণ যখন পূর্ণ হয় তখন ত্যাগ আপনিই আরম্ভ হয়। ধীরে ধীরে তখন ভক্তির

প্রকাশ হতে থাকে। ত্যাগই হল ভক্তির ভক্তি[১]। ভোগ বৈরাগ্য ও ত্যাগের মাধ্যমে পরিশোধিত হয়ে ভক্তিতে পরিণত হয়, অজ্ঞান জ্ঞানে পরিণত হয়, দুঃখ অনন্দে পরিণত হয় এবং কাম প্রেমে পরিণত হয়।

পরিণামের তাৎপর্য

প্রতি জলবিন্দুর মত, অণু পরমাণুর মত প্রাণের বৃত্তিগুলি একত্র হয়ে এগিয়ে চলে মহাপ্রাণসাগরের বুকে অর্থাৎ চৈতন্যসাগরে। প্রতিটি প্রাণ মহৎ বা বৃহৎ হওয়ার ইচ্ছায়, অর্থাৎ মহৎ বা বৃহতের সঙ্গে একীভূত হওয়ার জন্য নিরন্তর ছুটে চলে। একীভূত হওয়ার অর্থ সবার সঙ্গে মিলে একরূপ একনাম একভাব ও একবোধ প্রাপ্ত হওয়া। বোধের দৃষ্টিতে সকলকে সমানবোধে ও আপনবোধে গ্রহণ করা ও ব্যবহার করা হল এর তাৎপর্য। এই একীভূত হওয়ার অর্থ হল সমগ্রতার সঙ্গে মহামিলন। এই মহামিলনের ফলে মনুষ্যজীবনে সর্বোত্তম শক্তি জ্ঞান আনন্দের অনুভূতি লাভ করা সম্ভব হয়।

প্রেমের স্বভাব

'দান' অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্ম। 'দান' মানে ত্যাগের দীক্ষা। এই হল প্রেমের ব্যবহার। জীবন যখন বোধের পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় তখন সে আত্মবোধে প্রতিষ্ঠিত হয়।

একান্তবোধ থেকে আসে ত্যাগের দীক্ষা ও প্রেমের ব্যবহার। প্রাণচৈতন্যের পূর্ণতা সমতা ও একতাই হল প্রেম। আত্মপ্রেম কোন প্রতিদান চায় না। জীবন জীবনকে যা দেয় তা প্রাণচৈতন্যেরই প্রকারভেদ মাত্র। চৈতন্য চৈতন্যকে অনুভূতি বা চৈতন্যই দেয়, আর কিছু দেয় না। প্রাণই প্রাণকে গ্রহণ করে এবং প্রাণই প্রাণকে দেয়। প্রাণের দেওয়া-নেওয়ার খেলাই হল জীবন[২]।

প্রাণচৈতন্য বা আত্মচৈতন্যই দেহ; দেহের মধ্যে গৌন প্রাণ, মন ও বুদ্ধি এই সব নিয়ে ব্যষ্টি আমির রূপে সমষ্টি আমি বা সেই মহাপ্রাণের বুকে ভেসে ওঠে, খেলা করে আবার তাঁর মধ্যে মিশে এক হয়ে যায়।

প্রাণচৈতন্যের দেহরূপ ধারণের তাৎপর্য

জীবন যাকে আশ্রয় করে পূর্ণতা লাভ করে তার নাম জড়, আশ্রয়, নীড়, দেহ, বিষয় বা প্রকৃতি। এই জড়দেহ প্রাণচৈতন্যের বিশেষ প্রকাশ। প্রাণের নিষ্ক্রিয় বা নিদ্রিত অবস্থাই হল জড় অচৈতন্য কঠিন ও স্থূলভাব। নিজেকে আবৃত করার ইচ্ছা যখন হয় তখন সে প্রাণের বা চৈতন্যের কিছু অংশ সংকুচিত করে তাকে আশ্রয় করে ব্যবহার করে। এই হল প্রাণের দেহরূপ ধারণের তাৎপর্য। এই দেহরূপ আধারকে নিজের মধ্য থেকে সৃষ্টি করে সে তাকে ব্যবহার করে, ব্যবহার শেষে তাকে আবার নিজের মধ্যেই মিলিয়ে নেয়। চৈতন্যের এই দ্বিবিধ ব্যবহারকেই বলা হয় ব্যক্ত ও অব্যক্ত ভাব।

উপাধিযোগে এবং উপাধি ছাড়া চৈতন্যের কোন বিকার হয় না

মহাপ্রাণচৈতন্য অর্থাৎ আত্মা বা ব্রহ্মের, ঈশ্বর বা ভগবানের আত্মবিলাস তাঁর প্রকাশের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ নিত্য অভেদ। অর্থাৎ সকলে তাঁরই মধ্যে (আশ্রয়ে) জাত, স্থিত এবং উপসংহৃত। প্রাণের মধ্যে, চৈতন্যের মধ্যে সবটাই প্রাণ, সবটাই চৈতন্য। কর্তা-কর্ম-করণ, জ্ঞাতা-জ্ঞেয়-জ্ঞান, দ্রষ্টা-দৃষ্টি-দর্শন প্রভৃতি ত্রিবিধ সম্বন্ধ এক প্রাণচৈতন্যেরই ব্যবহার বা বিজ্ঞান বিশেষ। এই ব্যবহারগুলি হল উপাধি। উপাধিযুক্ত চৈতন্য এবং উপাধিশূন্য চৈতন্যের মধ্যে চৈতন্য-ভাগই হল সার বস্তু। এই হল সত্য ব্রহ্ম আত্মা ও ঈশ্বরের স্বরূপ।

১। অভিনব সংজ্ঞা। ২। অভিনব সংজ্ঞা।

ভূমা চৈতন্যসাগরে গুণ-উপাধিযোগে হয় জগৎলীলা

একমাত্র ব্রহ্ম আত্মা ঈশ্বরই আছে—তদতিরিক্ত কিছু নেই। জড় রূপে যা প্রতীত হয় তা ভ্রান্তি মাত্র। এক প্রাণচৈতন্যের তরঙ্গলহরী বুদ্বুদ্ ও অন্যান্য প্রকাশসমূহ একত্রে সেই অনন্ত অসীম মহাপ্রাণসমুদ্রের অখণ্ড রূপ। এই ভূমা চৈতন্যস্বরূপই হল পরব্রহ্ম পরমাত্মা। প্রাণ হল চৈতন্যের ব্যবহারিক নাম। চৈতন্য ও প্রাণ মূলত সমান কিন্তু প্রকাশের দিক থেকে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে।

প্রাণের সঙ্গে প্রাণতরঙ্গের মিলনের অভিব্যক্তিই হল প্রকাশ বা সৃষ্টি। অর্থাৎ গুণ-উপাধিযোগে চৈতন্যের সঙ্গে চৈতন্যের মিলনের ফলেই হয় সৃষ্টি। ক্ষুদ্র বৃহৎ সর্ব সৃষ্টি চৈতন্যের বক্ষে চৈতন্যের অভিব্যক্তি।

চৈতন্যের বহুমুখী লীলায় চৈতন্যের তাৎপর্য

চৈতন্যের আঘাত চৈতন্যকে জাগায়। চৈতন্যের ঘনীভূত বিশেষ রূপ হল জড়ত্ব। আঘাতের ফলে তার মধ্যেও চেতনার সাড়া জাগে। সেখানেও সে বলে, আমি আছি। তার বোধ ও অস্তিত্বকে প্রতিধ্বনিই জানিয়ে দেয়। চৈতন্যই চৈতন্যময় হয়ে ফুটে ওঠে। চৈতন্যই জানায়, চৈতন্যই জানে। চৈতন্যই দেখায়, চৈতন্যই দেখে। চৈতন্যই শোনায়, চৈতন্যই শোনে। চৈতন্যই বোঝায়, চৈতন্যই বোঝে। চৈতন্যই করায়, চৈতন্যই করে। চৈতন্যই বানায়, চৈতন্যই হয়। চৈতন্যই চায়, চৈতন্যই দেয়। চৈতন্যই টানে চৈতন্যকে, তাই পরস্পরের মধ্যে মিলন হয়। চৈতন্য একবার বহু হয় আবার সব এক করে নিজের মধ্যে মিলিয়ে নেয়। প্রাণই প্রাণকে প্রীত করে, সেইজন্যই তা সম্ভব হয়। তাই দেখা যায় 'প্রাণের রূপ ধরে চৈতন্যই ছড়িয়ে আছে বিশ্বময়'। বিশ্বরূপ চৈতন্যেরই অভিব্যক্তি বা বহিঃপ্রকাশ।

অখণ্ড চৈতন্যস্বরূপের পরিচয়

ব্রহ্ম আত্মা ঈশ্বর হল অখণ্ড চৈতন্যস্বরূপের সংজ্ঞা বা পরিচয়। চৈতন্যশূন্য কোন প্রকাশ নেই। চৈতন্যের স্বভাবধর্ম হল চৈতন্যকে ভালবাসা। এই চৈতন্যস্বরূপ সগুণ ও নির্গুণ উভয়ভাবেই নিজেকে প্রকাশ করে।

কোন প্রকাশই চৈতন্যশূন্য নয়, এবং চৈতন্য ছাড়া তা অনুভূতও হয় না। অনুভূতি হল চৈতন্যের প্রমাণ এবং চৈতন্যই হল অনুভূতির কারণ। প্রকাশক ও প্রকাশভাব, বিষয়ী ও বিষয়ভাব, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ভাব, দ্রষ্টা ও দৃশ্যভাব চৈতন্যের দ্বারাই অনুভূত হয়। এই ত্রিবিধ ভাব ধারণ করে চৈতন্য লীলায়িত হলেও স্বরূপত চৈতন্য নির্মল, বিশুদ্ধ, ভাবাতীত ও দ্বন্দ্বাতীত।

চৈতন্যের লীলাবৈশিষ্ট্য

চৈতন্যলীলা অর্থাৎ চৈতন্যের সগুণভাবের খেলা হল চৈতন্যের স্বপ্নবিলাস। এতে সর্ববিধ বিরুদ্ধভাব, কারণ ও কার্য সম্বন্ধ যুক্ত করে চৈতন্য লীলা করে। চৈতন্যই অভিনেতা সেজে বিকারের অভিনয় করে, দ্বন্দ্ব-বিরোধের ভান করে এবং স্ববিরুদ্ধ আচরণ করে। আবার পরিণামে আপন একাত্মস্বভাব প্রকাশ করে। চৈতন্যই চৈতন্যকে অভিনয় ছলে ঘৃণা করে, আঘাত করে, ক্ষতি করে, শত্রুতা করে ও বিনাশ করে। আবার চৈতন্যই বিপরীত ভূমিকায় স্নেহ করে, আদর করে, ভালবাসে, মৈত্রী কৃপা করুণা শুভেচ্ছা প্রভৃতি ভাব প্রকাশ করে চৈতন্যের উপকার করে, তার সেবা করে তাকে লালন পালন করে, তার মঙ্গল ও কল্যাণ বিধান করে, তার পূর্ণস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করার সাহায্য করে ও প্রতিষ্ঠিত করে দেয়।

চৈতন্য দিয়ে অন্তরে বাইরে চৈতন্যের ব্যবহার করাই হল চৈতন্যের বিজ্ঞান। এইরূপ ব্যবহার দ্বারা চৈতন্যের অনুভূতি সিদ্ধ হয়। যে প্রাণের অভাবে মৃত্যু হয়, সেই প্রাণের শরণাগত হলে তার আশ্রয়ে অমৃত লাভ হয়।

চৈতন্যের বিকার হয় ভাব-উপাধিযোগে

রোগ হল প্রাণের বিকার বা চৈতন্যের বিকার। এই বিকার শোধনের জন্য যা প্রয়োজন অর্থাৎ ঔষধ-পথ্যাদি প্রাণচৈতন্যেরই বিশেষ রূপ। চৈতন্যকে দেখাতে শোনাতে বোঝাতে ও জানাতে হয় না। চৈতন্যই দেখে. শোনে, বোঝে ও জানে। এ তার স্বভাবধর্ম। সে শুধু প্রসারিত ও বিস্তৃত হয়ে ছড়িয়ে পড়তে চায়। তার সংকুচিত স্বল্প রূপই হল বস্তুপ্রাণ বা নামরূপময় অবস্থা। সকলের মধ্যে সুখদুঃখ জন্মমৃত্যু রোগশোক ব্যাধি অজ্ঞান অভাব প্রভৃতি যে-সকল ভাব প্রকাশ পায় তা অন্তরচৈতন্যের ভিন্ন ভিন্ন স্পন্দন মাত্র। অনন্ত মহাপ্রাণ চৈতন্যের বক্ষে অসংখ্য ব্যষ্টি প্রাণচৈতন্য নিত্য বিরাজ করে।

চৈতন্যের বক্ষে চৈতন্যের অভাব কখনওই সম্ভব নয়

চেতনাবিহীন, প্রাণহীন, বোধশূন্য ও সংজ্ঞাশূন্য দেহকে মৃত বলা হয়, কিন্তু তার মধ্যে প্রাণক্রিয়া সূক্ষ্মভাবে থাকে। এ সম্যক্ ব্যবহারোপযোগী নয় বলেই মৃতদেহ বিকৃত হয়। বিকৃত দেহের মধ্যে পচনক্রিয়া হয় এবং তার মধ্যে অবস্থিত দেবদত্ত নামক প্রাণাংশ হতে বহুবিধ কীটানুকীট পোকা অনুরূপ দেহ ধারণ করে বেরিয়ে আসে। মৃতদেহে প্রাণের একান্ত অভাব হয় না বলেই এ সম্ভব হয়। প্রাণচৈতন্য যে সর্বব্যাপী অখণ্ড এ তার লক্ষণ ও প্রমাণ।

মৃত্যুর রহস্য

প্রাণের বিশ্রামের প্রয়োজন হয়। মৃত্যু হল বিশ্রাম। মৃত্যুকে যদি বিশ্রাম বলে ধরা হয় তবে মৃত্যু সম্বন্ধে ভয় বা ঘৃণা থাকে না। জড়বস্তুর মধ্যেও প্রাণ আছে। প্রাণকে বাদ দিয়ে মৃত্যুকেও পাওয়া যায় না। জড়ত্ব ও মৃত্যু হল প্রাণচৈতন্যের মধ্যে প্রাণের সুপ্ত অবস্থা বিশেষ। বৃক্ষলতাদি হল স্বপ্নাবস্থা, পশুস্তর হল তন্দ্রাবস্থা, মনুষ্যস্তর হল জাগ্রত অবস্থা, দিব্যস্তর হল অধিজাগরণ অবস্থা এবং ঈশ্বরীয় অবস্থা হল মহাজাগরণ অবস্থা অর্থাৎ বিশুদ্ধ চৈতন্যময় অবস্থা। মৃত্যু যে প্রাণের নিদ্রিত বা সুপ্ত অবস্থা একথা জানা থাকলে মৃত্যুর সঙ্গে প্রাণের নিত্যসম্বন্ধ সুস্পষ্ট হয়। তখন মৃত্যু ভয়ের বিষয় থাকে না। তাকে আপন বা আত্মীয়বোধে সহজেই গ্রহণ করা যায়।

চৈতন্যের স্বভাব আনন্দময়, প্রেমময় ও একাত্মবোধ। অস্তি ভাতি প্রীতি হল তার লক্ষণ। জন্মমৃত্যু হল চৈতন্যবক্ষে চৈতন্যের দুটি স্পন্দন মাত্র।

প্রাণরূপী মাতার মাহাত্ম্য

প্রাণকে মাতা বলা হয়। মাতার কাছে সন্তান প্রিয়, সন্তানের কাছেও মাতা ততোধিক প্রিয় এবং একান্ত নির্ভর ও আশ্রয়। সেইজন্য প্রাণের জন্যই প্রাণের প্রাণ প্রাণের প্রিয়। প্রাণের কাছে প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় আর কোন বস্তু নেই। এই আত্মপ্রাণই সর্বাপেক্ষা প্রিয় বস্তু। কারণ আত্মার মধ্যে আত্মাতিরিক্ত দ্বিতীয় বস্তু নেই। আত্মার সমানও কেউ নেই, আত্মা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠও কেউ নেই। যার অস্তিত্বে সবাই অস্তিত্ববান, যার অভাব কখনও হয় না, যা নিত্যপূর্ণ স্বয়ংপ্রকাশ স্বতঃপ্রকাশ স্বতন্ত্র সিদ্ধ তা-ই প্রিয়তম আত্মা বা বিশুদ্ধ প্রাণচৈতন্য।

পূর্ণ করে দেওয়া ও ভালবেসে উজাড় করে দেওয়াই হল মায়ের স্বভাব। জন্ম থেকে জীবন্মুক্ত হওয়া বা অমৃতত্ব লাভ করা পর্যন্ত সকলের সর্ববিধ চাহিদা ভগবতী মাতাই পূরণ করেন। এই মায়ের একান্ত অভাব কখনওই সম্ভব হয় না। সন্তান মাকে সর্বদাই চায়। তাঁকে সে যতক্ষণ পূর্ণ করে না পায় ততক্ষণ সে তাঁকে অন্বেষণ করে। প্রথমে সে তাঁর সন্ধান রূপে বা দেহেতে পায়। তারপর পর্যায়ক্রমে প্রাণে মনে বুদ্ধিতে (জ্ঞানবিজ্ঞানে) এবং

পরিশেষে বোধস্বরূপে পূর্ণ করে পায়। রূপ বা দেহেতে মায়ের প্রকাশ সসীম ও অস্থায়ী। এ-ই স্থূল ইন্দ্রিয়জ দর্শন। এ হল মায়ের আধিভৌতিক বা বিরাট রূপ।

মাতৃস্বরূপের অনুভূতির ক্রম

সাধনার মাধ্যমে সাধক প্রথমে মায়ের আধিভৌতিক, পরে আধিদৈবিক রূপের পরিচয় পায়। তারপর পায় অধ্যাত্মরূপের পরিচয়। অধ্যত্মরূপও নিত্য স্থায়ী নয় বলে এ-ও পূর্ণতার অভাব পূর্ণ করতে পারে না অর্থাৎ অমৃতত্বে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না। যদিও এ মায়ের সগুণ সবিশেষ রূপের পরাকাষ্ঠা। মায়ের নিত্যপূর্ণ সর্বোত্তম রূপ হল পরমবোধি বা তুরীয়বোধের স্বরূপ। এ-ই ভূমা সচ্চিদানন্দস্বরূপ। এখানে এসেই সন্তান মাতার সঙ্গে, জীবাত্মা পরমাত্মার সঙ্গে একীভূত হয়ে যায়। এই স্তরই হল অধিযজ্ঞের পূর্ণস্বরূপ। এখানে সর্ব মতপথের সমাধান, সর্বপ্রকার সাধনবিজ্ঞানের সমাধান হয়। সেইজন্যই একে ভূমা বলা হয়। এ বাক্যমনের অতীত সুতরাং নিত্যাদ্বৈত।

শব্দের মাধ্যমেই প্রাণময়ী মাতার প্রকাশক্রিয়া হয়। প্রাণ বা বোধের ক্রিয়াই হল নাদ বা ধ্বনি বা শব্দ। বোধের সঙ্গে শব্দের সম্বন্ধ অভিন্ন। বোধশূন্য নাদ বা শব্দ এবং নাদশূন্য বোধ হল আগুন ছাড়া তাপ এবং তাপ ছাড়া আগুন এবং গতি ছাড়া শক্তি এবং শক্তি ছাড়া গতির মত অসম্ভব সিদ্ধান্ত। প্রাণ বোধ নাদ ধ্বনি শব্দ প্রভৃতি সবকিছু জুড়েই চিতিমাতা বর্তমান। চৈতন্যময় প্রাণের বৃত্তির মত নাদ বা শব্দেরও নানাবিধ বৃত্তি আছে। নাদাত্মাই হল শব্দের প্রাণ। প্রাণচৈতন্যের আদিরূপ বলে একে সৃষ্টির জননী বলা হয়। প্রাণশক্তিই হল ভগবতী মাতা। শব্দ শক্তি ও প্রাণশক্তি অভেদ বলে শব্দশক্তিও ভগবতী মাতা। প্রাণময় শব্দের রূপ হল নাম। সুতরাং নাম ও প্রাণচৈতন্য অভেদ। এই নামের শক্তি অনন্ত। সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারের শক্তি নামের মধ্যে বীজাকারে নিহিত আছে।

শ্রীনাম ও মন্ত্রের তাৎপর্য

শ্রীনাম অশুদ্ধ মলিন ও বিকৃত মনকে ত্রাণ করতে পারে। সেজন্য নাম ও মন্ত্র অভিন্ন। চৈতন্যশক্তির বীজ হল মন্ত্র ও নাম। নাম ও নামী অভেদ। নামী হল মহাপ্রাণচৈতন্য বা ভগবতী মাতা। চৈতন্যের নাম বা মন্ত্রের যথার্থ ব্যবহার দ্বারা নামীর অনুগ্রহ লাভ করা যায়। নাম ও নামীর সাহায্যেই জীবন অপূর্ণ থেকে পূর্ণ হওয়ার সুযোগ পায়। জীবনে যত প্রয়োজন আত্মপ্রাণ থেকে ফুটে ওঠে তা প্রাণের দ্বারাই পূরণ হয়। প্রাণরূপী নামই প্রাণের অভাব মেটাতে পারে। এই প্রাণরূপী নামকেই সেজন্য মাতা বলা হয়। 'মা' শব্দের সঙ্গে সকলেরই ব্যবহারিক পরিচয় আছে কিন্তু আত্মিক পরিচয় অর্থাৎ বোধের অখণ্ড সত্য পরিচয় যতক্ষণ না হয় ততক্ষণ প্রাণরূপী মা ও নামরূপী মা শব্দ নাম তথা প্রাণ ও বোধ দিয়ে তা পূরণ করে চলেন।

মা মন্ত্র হল স্বয়ংব্রহ্ম ও নিত্যচৈতন্যময়। মা মন্ত্র উচ্চারণের ফলে অন্তরে তাঁর স্মৃতি ফুটে ওঠে এবং অনন্ত মহিমা প্রকাশ করে। মা নামের অন্তর্নিহিত মাধুর্য প্রত্যেকের হৃদয়ে স্তরে স্তরে সঞ্চিত আছে। কখনও কখনও তা অন্য বিষয়ের স্মৃতি দ্বারা আবৃত হয়ে যায় কিন্তু একেবারে লুপ্ত হয় না। সুযোগ পেলে সময়মত তা আবার জেগে ওঠে এবং অন্যান্য স্মৃতিগুলিকে অভিভূত করে দেয়।

মাতৃবোধ বা আত্মবোধের মাহাত্ম্য

চিদানন্দময়ী মা-ই সন্তানকে (ব্যষ্টিজীবনকে) এই পূর্ণতা দান করেন। মাকে বাদ দিয়ে অর্থাৎ মাতৃস্মৃতি ভুলে গেলে সন্তান অভাব-অজ্ঞানে বাস করে। মাতৃস্মৃতি হল আত্মবোধের স্মৃতি, অখণ্ড ভূমা নিজবোধ বা আপনবোধের স্মৃতি। এই আত্মবোধের স্মৃতি জাগ্রত হলে সকলের জীবভাব চলে যায়, পূর্ণ শিববোধে প্রতিষ্ঠা হয়। আত্মবোধের স্মৃতি আত্মভাবনার মাধ্যমে আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত করে দেয়।

সমগ্র বিশ্ব হল আত্মচৈতন্যের বহিরঙ্গ। নামরূপময় সর্বপ্রকাশের আশ্রয় হল চৈতন্যময় আত্মা। প্রকাশক থাকে প্রকাশের অন্তরসত্তায়। সেইজন্য প্রকাশককে প্রকাশ জানে না। কার্য যেমন কারণকে জানে না কিন্তু কারণকে নির্দেশ করে সেইরূপ প্রকাশও প্রকাশককে জানে না কিন্তু নির্দেশ করে। প্রকাশক আত্মা কারণের কারণ মহাকারণ বলে সে কার্য কারণ উভয়েরই বিজ্ঞাতা। কিন্তু তাঁর কোন বিজ্ঞাতা নেই। সে স্বয়ং স্বরাট স্বমহিমায় নিত্যবিদ্যমান।

বোধস্বরূপের বৈশিষ্ট্য

বোধস্বরূপ সকলকে ধরে রাখে, সকলকে জানে সমানভাবে কিন্তু তাঁকে কেউ ধরতেও পারে না, জানতেও পারে না। তাঁর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই, তিনি নিত্যাদ্বৈত। সেইজন্য কোন কিছুর মাধ্যম দ্বারা তাঁকে জানা যায় না। তিনি স্বয়ং অনুভবসিদ্ধ বা বোধস্বরূপ। চৈতন্য আছে সবার মাঝে আর সবাই আছে চৈতন্যের মাঝে অর্থাৎ চৈতন্যের মাঝে চৈতন্যই আছে। বিশুদ্ধচৈতন্যই হল আত্মা বা ব্রহ্মের স্বরূপ। সুতরাং ব্রহ্মের মধ্যে ব্রহ্ম বা আত্মার মধ্যে আত্মাই আছে, অন্য কেউ নেই। এ-ই হল চৈতন্যস্বরূপের পরিচয়।

জীবনের অন্তরে বাইরে এক আত্মচৈতন্যই বিদ্যমান। আত্মজ্ঞানীগণ একাত্মার সন্ধান জেনে তার অনুভূতির বিজ্ঞান নানাভাবে ব্যক্ত করেছেন। পূজা-অর্চনা জপতপ ধ্যানধারণা হল এই বিজ্ঞানের ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়।

আত্মজ্ঞান দিব্যজ্ঞান সকলেরই প্রয়োজন। পরমাত্মার সঙ্গে মিলন না হওয়া পর্যন্ত জাগতিক সবকিছু পেয়েও অভাব মেটে না এবং আত্যন্তিক সুখ আনন্দ এবং শান্তি হয় না।

প্রাণের ঐশ্বর্য হল গুণ ও শক্তি। অখণ্ড মহাপ্রাণচৈতন্যের এক বিশেষ পর্যায়ের বিগ্রহ হল দেবদেবীগণ এবং অন্য পর্যায়ের বিগ্রহ হল ইষ্ট গুরু সাধু মহাপুরুষ মুক্তপুরুষ প্রভৃতি। অবতারগণ স্বতন্ত্র পর্যায়ের বিগ্রহ।

মানুষের মধ্যে চৈতন্যের অভিব্যক্তি যখন ব্যাপকভাবে হয় তখন তার প্রকাশমানের তারতম্য অনুসারে যোগী ভক্ত প্রেমিক সিদ্ধপুরুষ বলা হয় তাকে। চৈতন্যের বিশেষ মানের অধিকারীকে মহাপুরুষ বলে। বিকারমুক্ত চিত্তই হল মহাপুরুষ এবং সর্বোত্তম বিকাশ যার মধ্যে হয় তাঁকে অবতারপুরুষ বলে।

প্রাণচৈতন্যের বিকার বা ভেদ হল আপেক্ষিক

মহাপ্রাণেরই বিশেষরূপ হল সমস্ত দেবদেবী, বিশেষরূপ ব্রহ্মা, বিশেষরূপ বিষ্ণু, বিশেষরূপ মহেশ্বর এবং বিশেষ বিশেষরূপ হল কালী দুর্গা হরি রাম কৃষ্ণ প্রভৃতি। এঁরা সকলেই এই অখণ্ড মহাপ্রাণসমুদ্রে অর্থাৎ চৈতন্যসাগরে তাঁর ভাবঘন মূর্তরূপ।

নিজের মধ্যেই সব আছে। অন্তরের প্রাণ বিশ্বপ্রাণের সঙ্গে মিলিত হয়ে পূর্ণপ্রাণের রূপে ফুটে ওঠে, অখণ্ড প্রাণের রূপে ফুটে ওঠে। সেইজন্য কোন কিছুকে অবহেলা করে বাদ দেওয়া চলে না। কোন কিছুকে ঘৃণা করে বা তুচ্ছ জ্ঞান করে দূরে সরিয়ে দেওয়া চলে না। পৃথকবোধে অনাত্মীয়বোধে কোন কিছুকে বর্জন করা যায় না কারণ সবকিছুর মধ্যেই এক অখণ্ড মহাপ্রাণই বিদ্যমান।

অভেদ প্রাণের অনুভূতির উদয়

পূর্ণতা চাইলে, সর্বপ্রকার অভাব পূরণ করতে চাইলে অখণ্ড প্রাণকে অখণ্ডবোধে 'মেনে মানিয়ে চলাই' হল সহজতম উপায়।

নিজেকে সকলের মধ্যে এবং সকলকে নিজের মধ্যে আবিষ্কার করাই হল সত্য সাধনের লক্ষণ। এ-ই হল অনুভূতির মূল কথা।

জীবনের পূর্ণতার জন্য, পুষ্টি ও তুষ্টির জন্য বিশ্বের ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল প্রাণই পরস্পর পরস্পরকে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সাহায্য করে। পরস্পরের প্রাণশক্তি সাধ্যমত পরস্পরের সেবায় সতত নিরত থাকে। পরস্পরের প্রাণদানেই পরস্পরের সর্বাধিক অভাব পূরণ হয়। শৈশব হতে নানাপ্রকারেই মানুষ অপরের প্রাণশক্তির দানে পুষ্ট ও তুষ্ট হয়ে ক্রমশ তাদেরই মাঝে পূর্ণতর হয়ে ওঠে। কারও প্রতি অকৃতজ্ঞতাবোধ থাকলে পূর্ণতা লাভের বিঘ্ন হয়। অকৃতজ্ঞতাবোধ পূর্ণতা লাভের পরিপন্থী, কৃতজ্ঞতাবোধ হল পূর্ণতা লাভের সহায়ক। ঘৃণা অবহেলা হিংসা ও হীনতা প্রভৃতি ভাবের দ্বারা অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায়। সকলের কাছ থেকে যেমন কিছু নেবার আছে, তেমনি প্রতিদানে দেবারও কিছু আছে।

কৃতজ্ঞতাবোধে হয় সমবোধের পূজা

সর্বতোমুখী উন্নতির জন্য পরোক্ষভাবে বা অপরোক্ষভাবে সকলের অবদানকেই স্বীকার করতে হয়। এইরূপ স্বীকৃতিকেই কৃতজ্ঞতাবোধ বলে। ব্যক্তিগত জীবনে উন্নতি, সিদ্ধি ও পূর্ণতার জন্য কৃতজ্ঞতাবোধ হল সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন। কৃতজ্ঞতাবোধ জাগাবার জন্য সকলের কাছেই ঋণী-বোধে চলতে হয়। সকলের ঋণ স্বীকার করলে কৃতজ্ঞতাবোধ তাড়াতাড়ি বাড়ে। এবং কৃতজ্ঞতাবোধের মাধ্যমেই অপরের ঋণ পরিশোধিত হয়। কৃতজ্ঞতাবোধ হল দেবীগুণ বা সত্ত্বগুণ। অকৃতজ্ঞতাবোধ হল আসুরিক গুণ অর্থাৎ রাজসিক ও তামসিক ভাবপ্রধান। মৃত্তিকা হতে আকাশ পর্যন্ত, কীট পতঙ্গ হতে আরম্ভ করে ঈশ্বর পর্যন্ত সবার কাছেই সকলে ঋণী।

জীবনের সামনে প্রাণের যত বিরুদ্ধ ভাবের প্রকাশ, প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি, অবাঞ্ছিত ঘটনা, অপ্রীতিকর কথা, আচরণ ও ব্যবহার, অনিচ্ছাকৃত কর্ম, অভাব, অশান্তিকর ফলাফল প্রভৃতি উপস্থিত হলেও এগুলির মাধ্যমে দেহ প্রাণ ও মনে একটা নূতন চেতনাবোধ, অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি জাগায়। দুঃখকষ্ট আঘাতের মাধ্যমে অন্তরে যে বিকার সৃষ্টি হয় তা বোধেরই বৃত্তি বিশেষ। এই বোধকে জাগাবার জন্য, উদ্বুদ্ধ করার জন্য, সচেতন রাখার জন্য প্রাণের অন্যান্য প্রকাশগুলি নিয়ত সক্রিয় থাকে। এরা চৈতন্যস্বরূপের প্রেম ভালবাসার বিশেষ দান।

সবার মধ্যে সর্বপ্রকাশের সঙ্গে এক আত্মীয় সম্বন্ধ নিত্যযুক্ত। পরস্পর হতে সমূলে কারও বিচ্ছেদ হয় না।

প্রাণীজগতে পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের পরিপূরক ও সম্পূরক সম্বন্ধ। ক্ষুদ্র প্রাণীর কাছে বৃহৎ প্রাণী হল আদর্শ এবং বৃহৎ প্রাণীর কাছে ক্ষুদ্রপ্রাণী হল খাদ্য ও কৃপার পাত্র। ক্ষুদ্রের দানে বৃহৎ পুষ্ট হয় আবার বৃহতের দানে ও কৃপায় ক্ষুদ্র বৃহৎ হয়।

প্রাণের প্রতি প্রকাশের মধ্যেই নিহিত আছে পূর্ণ সংবেদন বা বোধ। এই বোধ সবাইকে জাগ্রত করে বোধময় করে দিয়ে যায়।

সমষ্টি প্রাণচৈতন্যের সঙ্গে পূর্ণভাবে যুক্ত হলেই ব্যষ্টি প্রাণ ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হয় এবং পরিণামে ব্রহ্মবোধে পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হয়। ঈশ্বরের কোন বিশেষ রূপ নেই। তিনি মহাপ্রাণ মহাচৈতন্য, অখণ্ড বোধ, অখণ্ড জ্ঞান। অরূপের মধ্যে দ্বিতীয় কোন রূপের কল্পনা করে মানুষ সাময়িক বিলাস লাভ করে মাত্র।

যার মধ্যে সত্য অনন্ত আনন্দের অনুভূতি হয় তাকে দিব্যমানব বলে। প্রাণ ও চৈতন্যের প্রকাশের সঙ্গে মিশে এক হয়ে গেলে হয় দর্শন। একেই বলে প্রাণে প্রাণময় হওয়া, বোধে বোধময় হওয়া[১]।

প্রাণের ক্রম অভিব্যক্তির পরিচয়

রূপ হল প্রাণের নিদ্রিত অবস্থা, নাম হল স্পন্দিত বা স্বপ্নাবস্থা, ভাব হল জাগরণ বা বিজ্ঞান এবং বোধ হল

১। তত্ত্বের দৃষ্টিতে।

মহাজাগরণ বা প্রজ্ঞান। ভাবের মাধ্যমে চৈতন্যের জাগরণ হয় ও সম্প্রসারণ হয় এবং ক্রমশ প্রসারিত হয়ে পরিণামে মহাচৈতন্যে পরিণত হয় বা মহাপ্রাণে পরিণত হয়।

দ্বৈতভাবের মাধ্যমে নিত্যাদ্বৈত নির্গুণ ব্রহ্মের সগুণ ঈশ্বরলীলা

ব্যষ্টিজীব চৈতন্যসাগরে বুদ্বুদের মত ওঠে ভাসে আবার লীন হয়ে যায়। প্রতি জীবনের উদ্দেশ্যই হল চৈতন্যের বক্ষে চৈতন্যের অনন্ত মহিমা আস্বাদন করা। তার জন্য প্রয়োজনমত গ্রহণ ও বর্জন উভয়ই দরকার হয়। গ্রহণশূন্য বর্জন এবং বর্জনশূন্য গ্রহণ কোনমতেই সম্ভব নয়। সত্য ও মিথ্যা কল্পনামাত্র। এক চৈতন্যেরই দ্বিবিধ ভাব। সত্য মিথ্যার অতীত হল পরম তত্ত্ব। স্বভাবপ্রকৃতিতে সত্যকে ধারণ করে রাখে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে ধারণ করে রাখে সত্য। আশ্রিত-আশ্রয়, আধেয়-আধার, এক ও বহু, অমৃত ও মৃত্যু, ভূমা ও স্বল্প, তুমি ও আমি, অন্ন ও প্রাণ, প্রভৃতি যুগলভাব বা দ্বৈতভাবের মাধ্যমেই ঈশ্বরের খেলা। 'তোমার মাঝে আমি, আমার মাঝে তুমি'—উভয়ের মিলনের ফল সর্বজীবন। তাকে বলা হয় 'তিনি'। এই 'তিনি' হল তিনপুরুষের অর্থাৎ বহিঃসত্তা, অন্তরসত্তা ও কেন্দ্রসত্তার পূর্ণাঙ্গ রূপ। এই 'তিনি' তুরীয়তে নিত্য প্রতিষ্ঠিত। তিনপুরুষের সমাহার হল 'তিনি'। সত্যস্বরূপ নারায়ণ সচ্চিদানন্দ ভগবান পরমব্রহ্ম পরমাত্মা প্রজ্ঞানঘন মহাপ্রাণ পুরুষোত্তম প্রভৃতি নামে তিনি পরিচিত। সমগ্র সত্তাশক্তি জ্ঞান ও প্রেমের অখণ্ড ঘনীভূত মূর্তিই হল 'তিনি'। তিনি নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত অজর অমর অপাপবিদ্ধ অনঙ্গ অসঙ্গ অভঙ্গ ও অখণ্ড। তিনি সর্বব্যাপী সর্বধারী সর্বজ্ঞ সর্ববিদ্ অমৃতময় সর্বভাবের অদ্বয় অধিষ্ঠান। নির্গুণ গুণময় নিত্যলীলাময়, প্রাণে প্রাণময়, বোধে বোধময়। নিত্য অদ্বৈত হল তাঁর যথার্থ স্বরূপ। তাঁর সত্তাতেই সকলে সত্তাবান, তাঁর শক্তিতেই সকলে প্রকাশমান। ব্যষ্টি ও সমষ্টিজীবনের তিনিই হলেন গতি ভর্তা সাক্ষী নিবাস শরণ ও সুহৃদ। তিনি সকলের মধ্যে উপদ্রষ্টা অনুমন্তা ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বর ও পরমাত্মা।

জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে ভেদ হল উপাধিগত, তত্ত্বত নয়

ব্যষ্টিচৈতন্য অর্থ হল জীবচৈতন্য এবং সমষ্টিচৈতন্য অর্থ হল ঈশ্বরচৈতন্য। জীবচৈতন্য বা জীবাত্মার তিনটি অবস্থা হল বহিঃসত্তা বা স্থূলদেহে বিশ্ব, ইন্দ্রিয়জ ও জাগ্রতচৈতন্য। অন্তঃসত্তা বা সূক্ষ্মদেহে তৈজসপ্রাণ ও স্বপ্নাবস্থা। কেন্দ্রসত্তা বা কারণদেহে প্রাজ্ঞ ও সুষুপ্তি অবস্থা। ঈশ্বরের বহিঃসত্তা হল বিরাট ও বৈশ্বানর। অন্তঃসত্তায় সূত্রাত্মা ও হিরণ্যগর্ভ এবং কেন্দ্রসত্তায় ঈশ্বর। জীবের বহিঃসত্তা হল রজোপ্রধান, অন্তঃসত্তা হল সত্ত্বপ্রধান এবং কেন্দ্রসত্তা হল তমোপ্রধান। ঈশ্বরের বহিঃসত্তা হল সত্ত্বপ্রধান তম, অন্তঃসত্তা হল সত্ত্বপ্রধান রজ এবং কেন্দ্রসত্তা হল সত্ত্বপ্রধান সত্ত্ব। ঈশ্বরের প্রকৃতি হল শুদ্ধসত্ত্বপ্রধান এবং রজ ও তম অভিভূত। জীবের প্রকৃতি হল মলিন সত্ত্ব এবং রজ ও তমোগুণপ্রধান। চৈতন্যের চতুর্থ স্তর হল তুরীয় অর্থাৎ নিত্য শুদ্ধ বিশুদ্ধস্বরূপ। এ গুণাতীত দ্বন্দ্বাতীত, ভাবাতীত ও ভেদাতীত স্বতঃসিদ্ধ স্বয়ংপূর্ণ স্বয়ংপ্রকাশ স্বয়ংপ্রমান।

অদ্বৈতে যিনি নির্গুণ, দ্বৈতে তিনি সগুণ

অখণ্ড বিশুদ্ধচৈতন্যই ব্রহ্ম আত্মা ঈশ্বরের স্বরূপ। এ নিত্যাদ্বৈত। এ স্বয়ংপ্রকাশ বলে সব কিছুরই প্রকাশক। স্বতঃসিদ্ধ স্বয়ংপূর্ণ বলে এ অদ্বৈত ভূমা আনন্দস্বরূপ এবং স্বয়ংপ্রমাণ বলে দ্বৈতভাবশূন্য অর্থাৎ অদ্বৈত। অদ্বৈত বলে এ অমৃতত্ব। নির্বিকার ও অপরিণামী বলে এ নিত্য শাশ্বত অচ্যুত। চৈতন্যস্বরূপ স্বয়ং বিজ্ঞাতার বিজ্ঞাতা, দ্রষ্টার দ্রষ্টা, সাক্ষীচেতা। আপন স্বভাবশক্তি বা স্বরূপশক্তির সঙ্গে যুক্ত হয়ে চৈতন্য বিজ্ঞানাত্মারূপে অর্থাৎ নির্গুণ হতে সগুণে আত্মপ্রকাশ করে। সেইজন্য নির্গুণ, সগুণ উভয় ভাবেই তাঁর পরিচয় অনুভূত হয়। বিজ্ঞানাত্মারূপে সে সগুণ ঈশ্বর এবং প্রজ্ঞানাত্মারূপে সে নির্গুণ ঈশ্বর।

দ্বৈত ও অদ্বৈত এবং বন্ধন ও মুক্তির রহস্য

ব্রহ্ম আত্মা ঈশ্বর ও জীব এক চৈতন্যস্বরূপেরই চতুর্বিধ পরিচয়। স্বভাবপ্রকৃতির গুণ ও উপাধিযোগে বিশুদ্ধ ব্রহ্ম চৈতন্য বা পরমাত্মচৈতন্য ঈশ্বর আত্মা জীবাত্মারূপে প্রতিভাত হয়। উপাধি যোগে যেমন পরস্পরের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি হয়, উপাধি ত্যাগে ভেদ দূরীভূত হয়। গুণের শোধন হলেই উপাধি ত্যাগ হয়। আসক্তির ফলে গুণবন্ধন এবং অনাসক্তির ফল হল গুণবর্জন। গুণ বরণ করে হয় চৈতন্যের বন্ধন এবং গুণ ত্যাগে হয় চৈতন্যের মুক্তি বা স্বরূপ অবস্থান।

ত্রিগুণের বৈশিষ্ট্য

দ্বৈতবোধ ও বৈচিত্র্যবোধ হল ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান। এই জ্ঞান গুণ বা উপাধির প্রভাবে প্রতিভাত হয়। একে অজ্ঞান বলা হয়। এই অজ্ঞানের দ্বিবিধ শক্তি হল বিদ্যাশক্তি ও অবিদ্যাশক্তি। বিদ্যাশক্তি হল জ্ঞানপ্রধান আর অবিদ্যাশক্তি হল অজ্ঞানপ্রধান। অবিদ্যাশক্তি আবার দ্বিবিধ, যথা—আবরণশক্তি ও বিক্ষেপশক্তি। আবরণশক্তি হল তামসিক ও বিক্ষেপশক্তি হল রাজসিক। বিদ্যাশক্তি হল সাত্ত্বিক। সত্ত্বগুণের সঙ্গে চৈতন্যের নিকটতম সম্বন্ধ থাকার জন্য সত্ত্বগুণ প্রকাশধর্মী অর্থাৎ সত্ত্বগুণের প্রকাশশক্তি হল তার বিশেষত্ব। কিন্তু রজোগুণ ও তমোগুণ চৈতন্য হতে বহুদূরে অবস্থিত বলে তাদের প্রকাশশক্তি নেই।

আত্মলীলায় আমি-তুমি বোধের গুরুত্ব

আত্মলীলা হল আমিবোধ ও তুমিবোধের খেলা। এই দুই বোধই প্রতি জীবনের সঙ্গে যুক্ত। তুমি না থাকলে আমি নেই এবং আমি না থাকলে তুমি নেই। এর অপর নাম ভক্ত-ভগবান, জীবাত্মা-পরমাত্মা, শিষ্য-গুরু, দাস-প্রভু প্রভৃতি। ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে নিত্য সম্বন্ধ আছে। কোন একটিকে বাদ দিয়ে অপরটি সিদ্ধ হয় না। এ-ই সত্য ও তত্ত্বের মহিমা। ভগবানের স্বরূপ ও গুণের মহিমা প্রকাশ হয় ভক্তেরই মাধ্যমে। স্বয়ংপ্রকাশ ঈশ্বর আত্মা লীলামানসে বহু রূপ ও মাধ্যম কল্পনা করে তার মাধ্যমেই নিজেকে প্রকাশ করেন। নিজের মধ্যে নিজের অভাব কখনও হয় না। অর্থাৎ আত্মার বিচ্ছেদ হয় না। আত্মা অচ্যুত নিত্য পূর্ণস্বরূপ বলে খণ্ডিত হয় না অর্থাৎ বিকৃত হয় না, এবং রূপান্তরিতও হয় না। ভগবানের মধ্যে ভগবানের অভাব কখনও হয় না। সুতরাং অ-ভক্ত ও ভক্তবেশে ভগবানই স্বয়ং। ভক্তের মাঝে এই সত্য সম্যক্‌রূপে অনুভূত হয়। যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ, অংশ-অংশী, বিচ্ছেদ-মিলন, আর্বিভাব ও তিরোভাব, জন্ম-মৃত্যু, ধর্ম-অধর্ম, পাপ-পুণ্য, সদসৎ, বন্ধন-মুক্তি, ব্যষ্টি-সমষ্টি প্রভৃতি এবং স্বগত, স্বজাতীয়, বিজাতীয় ত্রিবিধ ভেদপ্রতীতি মানসকল্পিত ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান। সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম আত্মা ঈশ্বরবোধে কোন প্রকার ভেদজ্ঞান থাকে না। ভেদজ্ঞান হল জীবের লক্ষণ ও অভেদজ্ঞান হল ঈশ্বর আত্মা ব্রহ্মের লক্ষণ। ভক্ত ও ভগবান উভয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে উভয়েই পূর্ণ। উভয়েরই উভয়ের প্রয়োজন। উভয়ের মিলিত প্রকাশই সেই সত্যস্বরূপ স্বয়ংপ্রকাশ একজন। এই হল অদ্বয়তত্ত্ব, পরমতত্ত্ব শাশ্বত নিত্য সত্য।

সর্বভেদের মূলে অভেদ

মহাপ্রাণের বুকে প্রতিটি প্রাণবিন্দু তাঁর সন্তান নিত্যযুক্ত। তাদের পরস্পরের মধ্যে কখনও বিচ্ছেদ হয় না। মৃত্যু বিচ্ছেদ নয়, শুধু বিশ্রাম মাত্র। অমৃতত্ব লাভের সর্বোত্তম সহায়ক হল মৃত্যু। যেমন জ্ঞান লাভের সহায়ক হল অজ্ঞান।

শুদ্ধবোধ হল আত্মজ্ঞান এবং অশুদ্ধবোধ হল অনাত্মজ্ঞান

আত্মবোধে পরস্পর প্রকাশের মধ্যে কোন বিরোধ থাকে না। পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের যে মধুর একাত্ম সম্পর্ক আছে তা অবগত হওয়া যায় শুদ্ধবোধের মাধ্যমে। দ্বন্দ্ব বিরোধ বিদ্বেষ হল ভ্রান্তিমূলক ইন্দ্রিয়জ প্রতীতি।

প্রত্যেকের মধ্যে যে আপনবোধের সংস্কার আছে তাই হল স্মৃতি। অতীতকে ধারণ করে রাখে এই স্মৃতি। অতীতের স্মৃতিই বর্তমানের রূপ নিয়ে প্রকাশ পায়। জ্ঞান বিজ্ঞান শিল্পকলা এবং কর্মের মধ্যে আবার নূতন করে সৃষ্টি হয় ভবিষ্যতের সংস্কার, স্মৃতির বীজ। পূর্ণতা লাভের জন্য তা প্রয়োজন হয়। আপনবোধে সর্ববৃত্তিকে বরণ করাই হল পূর্ণতা লাভ।

জ্ঞানঘন ঈশ্বর আত্মাকে পরিপূর্ণভাবে অবগত হওয়াই হল সর্বজীবনের প্রথম উদ্দেশ্য। মহাপ্রাণ ভগবানের সন্তান প্রতিজীবন ভগবৎ মহিমার ধারক বাহক ও পরিপোষক। আত্মপ্রাণের মূল ধর্মই হল ভালবাসা। ভেদজ্ঞান হল ভ্রান্তিমূলক।

ভুল ভাঙ্গাবার জন্য ও সকলের আত্মবোধ জাগিয়ে দেবার জন্য মহাপ্রাণ বিশেষ বিশেষ রূপে কখনও কখনও এই সংসারে অবতীর্ণ হন। তাঁদের উপস্থিতি আচার ব্যবহার ও অনুশাসনের দ্বারা অপরের ভুল শোধিত হয়, অন্তরে কৃতজ্ঞতাবোধ জাগে, ভ্রান্তি ও অজ্ঞানতা নাশ হয় এবং তারা সত্যের আলোর সন্ধান পায়।

ঈশ্বরের দিব্য আবির্ভাবের তাৎপর্য

লোক সংগ্রহের জন্য, দিব্যভাবের পূর্ণ বিকাশের জন্য, পরস্পরের মধ্যে প্রেমানুরাগ, সহানুভূতি, সমবেদনা, অনুকম্পা প্রভৃতি দিব্যভাবের প্রকাশের জন্য সচ্চিদানন্দস্বরূপ ঈশ্বরের দিব্য আবির্ভাব হয়। তাঁদের উদ্দেশ্য হল স্বভাবাত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে সকলকে সচেতন করা এবং উপযুক্ত অধিকারীকে সচ্চিদানন্দস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করে দেওয়া। *** বিশ্বকে তাঁরা দিয়ে যান মহাপ্রাণস্বরূপের নির্মল শুদ্ধ স্পর্শ। তাঁদের মধুর নির্মল ও পবিত্রঘন দিব্যজীবনের সংস্পর্শে এসে তাঁদের প্রভাবে অপরের অন্তরে ধর্মভাব জাগ্রত হয় এবং সকলে পায় নূতন জীবন। *** তাঁদের জীবনের মধুর প্রভাব সকলের মধ্যে নূতন জীবনের মর্যাদাবোধ জাগিয়ে দিয়ে যায়। তাঁদের এই শ্রেষ্ঠ অবদানের কাছে সমগ্র বিশ্বই ঋণী থাকে। তাঁদের দেবদুর্লভ মহান ঈশ্বরীয় জীবনের প্রাণময় প্রেমময় অমৃতময় ধর্মাদর্শগুলি ভালবেসে প্রীতিপূর্বক প্রিয়বোধে ও আপনবোধে পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে পূর্ণতায় প্রতিষ্ঠিত হলেই শুধু তাঁদের ঋণ শোধ করা সম্ভবপর হয়।

প্রেমস্বরূপ হল পূর্ণতা সমতা ও একতা এবং তার স্বভাব হল ছড়িয়ে পড়া। প্রেমের লক্ষণই হল আপনাকে বিলিয়ে দেওয়া। নিরবচ্ছিন্ন আত্মদান ও শর্তবিহীন সমর্পণ হল এর বিশেষত্ব। *** আত্মদানের মাধ্যমে হয় তাদের ঋণস্বীকার। অপরের প্রতি ঋণবোধ ঋণ পরিশোধ করার জন্য অন্তর হতে যা দেওয়া হয় তার কোন প্রতিদানের আশা থাকে না। এই দেওয়ার মধ্য দিয়েই হয় তাদের প্রতি আনুগত্যের দীক্ষা, শ্রদ্ধা ভক্তি প্রেম ভালবাসা ও বিশ্বাসের দীক্ষা এবং সমবোধে আপনবোধে একাত্মবোধে সব গ্রহণ করা বা 'মেনে মানিয়ে চলা'। এ-ই হল দক্ষিণা[১] দান। এই দক্ষিণাই হল গুরুবন্দনা, শ্রেষ্ঠ বন্দনা, মহাপ্রাণকে আপন করে নেবার চেষ্টা ও প্রেরণা। এই হল দক্ষিণার তাৎপর্য। *** দক্ষিণা হল প্রীতিপূর্বক প্রাণদান বা প্রেমদান অর্থাৎ ব্রহ্মবোধে সব 'মেনে মানিয়ে চলা'। ভালবেসে আপনাকে বিলিয়ে দেওয়াই হল প্রেমদান। বিশুদ্ধ জ্ঞান দানই হল আত্মদান বা শ্রেষ্ঠ দান। এ একমাত্র স্বানুভবসিদ্ধের পক্ষেই সম্ভব। আত্মানুশীলন আত্মসংযম আত্মানুশাসনপূর্বক আত্মানুসন্ধানের পরাকাষ্ঠাই

১। অভিনব সংজ্ঞা।

হল স্বানুভূতি। অন্যথায় স্বানুভূতিলাভের সম্ভাবনা নেই। উল্লেখিত যোগ্যতালাভ সর্বোত্তম পুরুষকারযোগে ঈশ্বরের এবং সদ্‌গুরুর অনুগ্রহেই সাধক সমর্থ হয় এবং তা বহু জন্মের সুকৃতির ফলশ্রুতি।

বিশ্বপ্রাণের মহিমা অনন্ত। তাই দেখা যায় যে-সন্তান শৈশবেই মাতৃপিতৃহীন হয় সে লালিত হয় বিশ্বমাতার কোলে, জগন্মাতার কোলে, জগদ্ধাত্রীর কোলে, বিশ্বপ্রাণের কোলে। লৌকিক মাতাপিতার সঙ্গে বিচ্ছেদ হলেও মহাপ্রাণ আত্মারূপী মাতাপিতার সঙ্গে কখনও কারও বিচ্ছেদ হয় না। গর্ভধারিণী মাতাকে হারালেও জগদ্ধাত্রী মাতা বা বিশ্বমাতাকে কেউ হারাতে পারে না। সে হল মায়ের ব্যাপক রূপ। *** যথার্থ মায়ের রূপ হল এই বিশ্বমাতা সচ্চিদানন্দঘন মহাপ্রাণ। তাঁর কাছ থেকে জন্ম জন্মান্তর পেয়েই সকলে পুষ্ট ও তুষ্ট হয়ে পরিণামে পূর্ণতা লাভ করে।

বিশ্বপ্রাণের কাছে সবাই ঋণী

জন্ম জন্মান্তর ঋণ গ্রহণ করেই সকলে বাঁচে; অর্থাৎ প্রতিদানে কিছু না দিয়ে কেবল গ্রহণ করে পুষ্ট ও তুষ্ট হয়ে চলে। তার ফলে মহাপ্রাণরূপী মাতার অবদান ঋণরূপে ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। ঋণী তার ঋণ শোধ না করে শান্তি পায় না কখনও। ঋণ শোধের একমাত্র উপায় হল ঋণদাতা সেই মহাপ্রাণরূপী অমৃতময়ী সচ্চিদানন্দময়ী বিশ্বমাতাকে আপন অপেক্ষাও অধিক প্রিয়বোধে ভালবেসে তাঁর কাছে নিজেকে পূর্ণভাবে সঁপে দেওয়া, নিবেদন করা বা সমর্পণ করা। এই সমর্পণের তাৎপর্য হল আপনবোধে বা বিশুদ্ধ একবোধে সমগ্র বিশ্বকে গ্রহণ করা, জানা ও মানা—'মেনে মানিয়ে চলা'।

ঋণ পরিশোধের সাধনা

নিজের সর্ব অঙ্গকে মায়ের সর্বাঙ্গ বলে সর্বান্তঃকরণে মানতে পারলেই নিজের অঙ্গকে মায়ের অঙ্গ বলে জানা যায় ও ভালবাসা যায়। *** আত্মসমর্পণের ফলে বা আপনবোধে 'মেনে মানিয়ে চলার' ফলে কোন ঋণ আর অবশিষ্ট থাকে না। অর্থাৎ কোন ভেদজ্ঞান বা পার্থক্যবোধ থাকে না। বৈচিত্র্যের ধারণা, ভেদজ্ঞান বা দ্বৈতজ্ঞান হল ঋণীবোধের লক্ষণ এবং অভেদজ্ঞান সমজ্ঞান ও একাত্মজ্ঞান হল অঋণীবোধের লক্ষণ। ঋণমুক্তির তাৎপর্য আপনবোধে সব 'মেনে মানিয়ে চলার' ফলে সিদ্ধ হয়।

বস্তুযজ্ঞ নয়, জ্ঞানযজ্ঞই হল আত্মসিদ্ধির বিজ্ঞান

কেবলমাত্র বস্তু ঐশ্বর্য শক্তি ও জ্ঞানের আহুতি দ্বারা আত্মাহুতি পূর্ণ হয় না। আত্মাও বোধের স্বরূপ। বোধ দিয়ে বোধের ব্যবহার হল বোধস্বরূপের ব্যবহার। বোধের বিকৃত ব্যবহার হল বস্তু গুণ শক্তি ঐশ্বর্য প্রভৃতি। এ হল মনের ব্যাপার। ভালবাসার মাধ্যমে প্রাণের সঙ্গে প্রাণ এবং চৈতন্যের সঙ্গে চৈতন্য মিশে একীভূত হয়ে গেলে হয় আত্মার পূর্ণাহুতি বা পূর্ণ সমাধি।

অমৃতস্বরূপ আত্মার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মহিমা

অমৃতময় পূর্ণ আত্মস্বরূপের কোন অভাব অজ্ঞানতা রোগ শোক মৃত্যু নেই। আত্মা হল অজর অমর অপাপবিদ্ধ নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব। সে অনন্ত অসীম সর্বশক্তি সর্বজ্ঞান সর্বানন্দ অখণ্ড ভূমা অমৃতময়। এই হল সকলের যথার্থ পরিচয়। *** সকলের অভাব অজ্ঞান মৃত্যুভয় প্রভৃতি যথার্থ নয়। এ ভান মাত্র, সঙ মাত্র। এ হল স্বকল্পিত ভ্রান্তিবিলাস। শুধু খেলার খেলা, আপনাকে নিয়ে আপনার প্রেমলীলা এই আনন্দমেলা সুখ ও বিলাসের জন্য।

অমৃতানুভূতির উপায়

মৃত্যুকে জয় করা যায় অমৃতত্ব লাভ করে। এই অমৃতত্ব হল অদ্বৈতজ্ঞান, সমজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান ও ঈশ্বরপ্রীতি। দিব্য প্রেম ভালবাসা দ্বারাই মৃত্যুকে বশ করা যায়, জয় করা যায় এবং অতিক্রম করা যায়।

অমৃতত্বের মাহাত্ম্য

প্রাণক্রিয়ার অভাবের নামই মৃত্যু। প্রাণের স্বভাবের মৃত্যুর একান্ত অভাব। সে মহাপ্রাণের সঙ্গে সততই যুক্ত আছে। প্রাণের নাশ নেই। মহাপ্রাণের বুকে তার অভাবও হয় না। প্রাণই হল অমৃতত্ব। এর ক্ষয় বা শেষ নেই। এ নিত্যপূর্ণ অমৃতময়। এই অমৃতই হল আত্মা। আত্মা স্বয়ংপ্রকাশ। যে দিতে পারে, যে দিতে জানে সে-ই পূর্ণ। অমৃতময় আত্মা নিত্যপূর্ণ। ভোগ্যবস্তু মাত্রই ক্ষয়শীল বিনাশশীল বিকারী অনিত্য ও মিথ্যা। খণ্ডভাবই হল অভাব এবং এই অভাবই হল মৃত্যু। স্বভাব হল অমৃত। স্বভাব নিত্যপূর্ণ বলে তাকে কিছু দিয়েই অতিক্রম করা যায় না। এই স্বভাবস্বরূপই হল মহাপ্রাণ বা আত্মা। সে অনন্ত অসীম অদ্বয় অব্যয় অমৃতময়।

উপাধি যোগে বন্ধন, উপাধি নাশে মুক্তি

অহংকার অভিমান বা 'আমার আমিবোধ' হল উপাধি। এই উপাধি দ্বারা আত্মজ্ঞান সাময়িকভাবে আবৃত থাকে মাত্র। পরে আত্মজ্ঞানের জ্যোতিতে এই উপাধি গলে যায়। তখন শুধু স্বয়ংপ্রকাশ আত্মাই স্বমহিমায় বিরাজ করে।

জীব ও ঈশ্বরের ভেদাভেদ স্বীকৃত

সমগ্র ব্যষ্টি আত্মা হল সমষ্টি আত্মা বা বিশ্বাত্মার অবিচ্ছেদ্য অংশ। বিশ্বাত্মা হল সগুণ ঈশ্বর। তাঁর ব্যষ্টি প্রকাশ হল জীব বা ব্যষ্টি আত্মা। প্রজ্ঞানঘন সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরব্রহ্ম বা পরমাত্মার বিজ্ঞানময় রূপ হল বিশ্বাত্মা বা জীবাত্মা। ব্রহ্ম আত্মা ঈশ্বর ও জীবের স্বরূপ হল সচ্চিদানন্দময়। কিন্তু উপাধি যোগে পরস্পরের মধ্যে ভেদ প্রতিভাত হয়। পরব্রহ্ম পরমাত্মা হল উপাধিমুক্ত গুণাতীত দ্বন্দ্বাতীত ভেদাতীত অদ্বয় অব্যয় অমৃতময় অখণ্ড ভূমাস্বরূপ। ঈশ্বর হল শুদ্ধ সত্ত্বগুণযুক্ত। জীব হল মলিনসত্ত্ব এবং রজোগুণ ও তমোগুণ যুক্ত। ত্রিগুণের শোধন হলে জীব ঈশ্বরের স্বরূপ প্রাপ্ত হয় এবং প্রলয়কালে শুদ্ধ সত্ত্বগুণের প্রভাবে ঈশ্বর ব্রহ্মের সঙ্গে যখন মিশে যায় তখন শুদ্ধ জীবও ব্রহ্মের সঙ্গে মিশে যায়। এ-ই হল বেদান্তের প্রতিপাদ্য বিষয়।

নিত্যমুক্ত আত্মা সবার

বিশুদ্ধ বোধস্বরূপ আত্মার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই, সে-ই হল একমাত্র বিজ্ঞান তা সাক্ষীচেতা ও নিত্যদ্রষ্টা। তার কোন জ্ঞাতা দ্রষ্টা ও বেত্তা নেই। আত্মার আমি সর্বজীবের আমিরূপে প্রকাশমান।

মায়ের অনন্ত মহিমার সাক্ষী হল মাতৃসমাধি

সমষ্টিবোধস্বরূপ মায়ের আমি বা বিশ্বাত্মার সঙ্গে ব্যষ্টি আত্মার মিলন হলে হয় আত্মসমাধি। 'আমারবোধ' ছেড়ে 'আমিবোধে' আমির মধ্যে বাস করাই হল আত্মবোধের লক্ষণ।

আত্মার মধ্যে 'ইতি-নেতি' নেই। মায়ের মহিমারও 'ইতি-নেতি' নেই। তাঁর অন্ত নেই, সেই জন্যই তিনি

অনন্ত। তাঁর সীমা নেই, সেই জন্যই তিনি অসীমা। তাঁর আদি নেই সেই জন্যই তিনি অনাদি। তাঁর মধ্যে মিশে তাদাত্ম্য লাভ করলে তাঁর মহিমা অনুভূত হয়।

জীবের উৎপত্তি পুষ্টি তুষ্টি স্থিতি ও পরম গতিই হল মা স্বয়ং

মা-ই ফিরিয়ে দেন সন্তানের হারানো বা বিস্মৃত আত্মস্মৃতি। তাঁর স্ব-স্বরূপের পূর্ণ পরিচয় বা জ্ঞান জাগ্রত করার জন্য বহু বেশে সন্তানের কাছে মা-ই উদিত হন। ভয় সংশয় অশ্রদ্ধা অবিশ্বাস প্রভৃতি দ্বন্দ্ব-বিরোধের কারণ সৃষ্টি করে সন্তানরূপী জীবাত্মার সসীমবোধের সম্প্রসারণ করে দেন মা।

মাতৃলীলার অভিনবত্ব

আত্মারূপী মাকে জীব ভোলে কিন্তু মা সন্তানকে ভোলে না। আত্মারূপী মায়ের স্মৃতি সন্তান ভুলে থাকলেও মা কিন্তু প্রতিক্ষণ তাকে স্ববোধে ধারণ করে পালন করছেন ও রক্ষা করছেন। মা যদি এক মুহূর্ত তাঁর কর্তব্য অবহেলা করেন তাহলে বিশ্ব ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে, ধ্বংস হয়ে যাবে, কিছু থাকবে না। কিন্তু মা তা চান না। যদি বা একটু ভাঙ্গেন তবে গড়েন মা দ্বিগুণ করে। তাই দেখা যায় এক দিকে হয় ধ্বংস, অপর দিকে হয় সৃষ্টি। একদিকে মৃত্যু এসে প্রাণকে কেড়ে নিয়ে যায়, আর এক দিকে শিশু হয়ে নববেশে উদয় হয়। নদীর একূল ভাঙ্গে আবার ওকূল গড়ে। আমিরূপ সন্তান আবার একূল ছেড়ে ওকূলে গিয়ে উদয় হয়। বৃদ্ধ হয়ে স্থবির হয়ে মরে যায়, আবার নববেশে নবতেজে শিশু হয়ে ফিরে আসে এ পৃথিবীতে। পূর্ণতা লাভ করে আত্মবোধে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্যই বারবার তার এই আসা-যাওয়ার প্রয়োজন হয়।

কালাতীত কালী মা-ই তিনকালের সাক্ষী ও সাক্ষ্য

অতীতের আমির প্রমাণ হল বর্তমানের আমি। ভবিষ্যৎকে বর্তমানের বক্ষেই পাওয়া যায়। বর্তমানকে বাদ দিয়ে কোন কালেরই যথার্থ পরিচয় মেলে না। আসলে কাল তিনভাবে প্রতিভাত হলেও কালের যথার্থ রূপ একটি। তা হল নিত্যবর্তমান অর্থাৎ নিত্যবিদ্যমান।

আত্মলীলা আত্মমহিমারই দ্যোতক

আত্মচৈতন্য ও আত্মশক্তি অভেদ। এ স্বরূপত নির্বিকার হলেও এর পরিণামরূপ ব্যবহার প্রতিভাত হয়। সেইজন্য একে বিকারবিহীন পরিণাম বলা হয়। পরিণাম প্রাপ্ত হয়েও এ অপরিণামী। প্রকাশের রূপান্তর ও তারতম্য হল পরিণামের লক্ষণ এবং সাক্ষীজ্ঞাতা হিসাবে এ অপরিণামী। অপরিণামী আত্মার স্বরূপ হল অজর অমর অপাপবিদ্ধ নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত। অনিত্য অশুদ্ধ জঁড় পাপ ও মৃত্যু পূর্ণ আমিকে স্পর্শ করতে পারে না। অপাপবিদ্ধ আত্মা পাপপুণ্যের সাক্ষী।

জ্ঞান-অজ্ঞানের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ

অজ্ঞান সংকীর্ণতা সসীমতা স্বার্থপরতা অনিত্য মিথ্যা বিকার হল পাপ। আত্মাতিরিক্ত কোন কিছুকে ভাবা ও স্বীকার করা হল ভ্রান্তি মায়া মিথ্যা ও অজ্ঞান। অহংকার ও অভিমানই হল অজ্ঞানের লক্ষণ। জ্ঞানের লক্ষণ হল সমদৃষ্টি, আপনবোধ, অহংকারশূন্যতা, অভিমানশূন্যতা প্রভৃতি। মানার ফলে যথার্থ জানা হয়। যথার্থ জ্ঞানই হল সত্য। এর দ্বারাই অজ্ঞান পাপ বিদূরিত হয়। যথার্থ জ্ঞানের উদয় হলেই মিথ্যা ও অজ্ঞানের প্রভাব কেটে যায়।

পাপ ও অজ্ঞান হল শুদ্ধ পূর্ণজ্ঞানের সংকুচিত সীমিত ও আবৃত প্রকাশ বা আভাস অথবা প্রতিবিম্ব মাত্র।

আলো ও আঁধারের যুগপৎ লীলা আত্মবক্ষে ছায়াচিত্রসম ভাসে

আলোর অভাব হল আঁধার এবং আঁধারের অভাব হল আলো। শুদ্ধজ্ঞানের অভাব হল মিথ্যা অজ্ঞান এবং মিথ্যা ও অজ্ঞানের অভাব অর্থাৎ বিনাশ বা বাধ হলে শুদ্ধজ্ঞানের প্রকাশ হয়। আলো ও আঁধার এবং জ্ঞান ও অজ্ঞান এক বিশুদ্ধ বোধেরই দ্বিবিধ ভাব মাত্র। 'আত্মার মহিমা—নেই তার সীমা'। এক হয়েও সে বহু, বহু হয়েও সে এক। সে-ই এক আবার দুই ও বহু। কিন্তু তত্ত্বত সে বহুও নয়, দুইও নয় এবং একও নয়। সে নিত্য অদ্বৈত।

'যাওয়া আসার গতি প্রাণের মাঝেই আছে তার স্থিতি'। আত্মপ্রাণের গতির মধ্যে যেমন স্থূলরূপ বা দেহ ভেসে ওঠে, অবস্থান করে আবার বিলীন হয় সেইরূপ তার মধ্যে স্থূলরূপ বা দেহও ভেসে ওঠে, অবস্থান করে, আবার বিলীন হয়। প্রত্যেকের সত্য পরিচয় আপনবোধেই হয়; অর্থাৎ প্রত্যেকেই মহাপ্রাণরূপী পরমাত্মার বক্ষে আমিবোধে ছিল আছে ও থাকবে। এ-ই আত্মার স্বভাবলীলা।

আত্মছায়াই হল আত্মমায়া

অখণ্ডস্বরূপের অনন্ত মহিমা যে-ব্যবহারদোষে আবৃত হয় তাকেই বলে অজ্ঞান মায়া মিথ্যা অশুদ্ধ ভ্রান্তি বা ভুল। বারবার সকলে এই ব্যবহারদোষে অশুদ্ধ হয়ে যায়, ভুলে যায় সে আত্মার স্বরূপ মহিমা। আবার আত্মা স্বয়ং হৃদয় হতে প্রকাশ করে ও ঘোষণা করে তাঁর পূর্ণতা, অমৃতত্ব। তখন সকলে তা শ্রবণ করে, স্মরণ ও মনন করে পূর্ণ ও অমৃতময় হয়। এইভাবেই চলে যুগে যুগে মহাপ্রাণের বুকে জীবনের বা প্রাণের গতি। একবার পূর্ণতা আবার অপূর্ণতা; একবার অমৃত, একবার মৃত্যু; একবার একত্ব বা সমান আবার বহুত্ব বা বহুমান—অবমান বা অপমান।

স্বভাবস্বরূপের মাহাত্ম্য

'স্ব' হল সত্তা, আত্মা, ঈশ্বর, মাতা। 'ভাব' হল সন্তান, জীব বা প্রকাশ। 'স্ব'-র সঙ্গে ভাবের সম্বন্ধ নিত্যযুক্ত থাকে বলেই স্বভাব বলা হয়। যেমন আলো ও তার রশ্মি আলাদা নয়, নিত্যযুক্ত। সেইরূপ ব্রহ্ম-আত্মা-ঈশ্বর ও জীব অর্থাৎ ভগবতী মাতা ও তাঁর সন্তান নিত্যযুক্ত ও অভেদ। উভয়ের মধ্যে বাহ্যিক দৃষ্টিতে ভেদ সম্বন্ধ ; কিন্তু তত্ত্বের দৃষ্টিতে অভেদ সম্বন্ধ। জীববোধে ভেদ কিন্তু ঈশ্বর ও ব্রহ্মবোধে অভেদ। ভেদাভেদ রূপে প্রতীয়মান হলেও এ নিত্য অ-ভেদাভেদ অর্থাৎ নিত্যাদ্বৈত।

জীব ও ঈশ্বর, ভক্ত ও ভগবান, মাতা ও সন্তান প্রভৃতি হল অদ্বৈত-দ্বৈতভাব। উভয়ের মধ্যে একাত্মসম্বন্ধ হল প্রেম ভালবাসা ও বিশুদ্ধ জ্ঞান এবং ভেদসম্বন্ধ হল ভ্রান্তি অবিদ্যা ও অজ্ঞানমূলক।

আপনবোধের বৈশিষ্ট্য

শুদ্ধবোধ, শুদ্ধাভক্তিও পূর্ণ ভালবাসার সঙ্গে যুক্ত হয়ে শুদ্ধপ্রেমের রূপ নেয়। আপনবোধে ভালবাসার সঙ্গে কৃতজ্ঞতাবোধ যুক্ত থাকে। তাই শুদ্ধবোধের সহায়ক হয়। মাকে যে মানে না তাকে বলে অসুর এবং তাকে বলে কুসন্তান। 'কুপুত্র যদিও হয়, কুমাতা কখনও নয়।' কৃতজ্ঞতাবোধ জাগলে ভালবাসার টান বোঝা যায়। কৃতজ্ঞতাবোধেই

মায়ের প্রতি কর্তব্যবোধ ও ভালবাসা বাড়ে। সকলের মধ্যে এই কৃতজ্ঞতাবোধ জাগাবার জন্যই সচ্চিদানন্দময়ী মা স্বয়ং অবতার বেশে, মহাপুরুষ বেশে বারবার আসেন।

বোধাশ্রয়ে আত্মানুশাসনের সম্যক্ বিজ্ঞান

ভুল করা দোষের নয়। ভুল অবগত হয়ে তা শোধন না করাই হল দোষ বা পাপ। না-জেনে ভুল করা অন্যায় নয়; কিন্তু জেনে ভুল করলে তা ক্ষমার অযোগ্য। প্রেম ভালবাসা হল মহতের ধর্ম। এটা দুর্বলের ধর্ম নয়। না-মানা দুর্বল ও অজ্ঞানীর ধর্ম; কিন্তু মানা হল মহাবীর শক্তিমান জ্ঞানীর ধর্ম। যদি কেউ বুঝে থাক যে ভুল করেছ তবে তা এখন স্ববোধের সাহায্যে শোধন কর। প্রেম ভালবাসার দ্বারা ক্রোধ ও হিংসাকে জয় কর। কৃতজ্ঞতা শ্রদ্ধা ও ভক্তির দ্বারা বিদ্বেষ ভাবকে জয় কর। সংযম ও সহিষ্ণুতা দ্বারা কাম ও লোভকে জয় কর। নিরলস কর্ম ও প্রচেষ্টা দ্বারা জড়তা, তামসিকতা ও নিদ্রাকে জয় কর। বিকার ও মৃত্যুর চিন্তন দ্বারা দেহ ও বস্তুর প্রতি মোহ ও আসক্তি জয় কর। সদাচার ও নিয়ম দ্বারা কৃত্রিমতা ও অনাস্থাকে জয় কর। নিত্য ও অনিত্যের বিচার দ্বারা সত্য বস্তুর আশ্রয় নাও, সত্যে প্রতিষ্ঠিত হও। নিত্য সত্য বস্তুই হল অমৃতময় বোধস্বরূপ আত্মা। বিশুদ্ধ বোধ ও বিশুদ্ধ আনন্দই হল তার স্বরূপ। বোধের আশ্রয়ে নিত্য বাস কর। তাহলেই বোধ বা চৈতন্যে প্রতিষ্ঠা হবে। বোধ দিয়েই বোধের ব্যবহার কর। বোধ দিয়ে বোধের দর্শন কর। বোধ ছাড়া জড় বস্তুর প্রতি আসক্তি হল মোহ অজ্ঞান। বিশুদ্ধ বোধের সাহায্যে এই মিথ্যা অজ্ঞানকে দূর কর। নাম রূপ হল বিকারী, পরিবর্তনশীল ও বিনাশী। নাম রূপের বিজ্ঞাতাই হল অপরিণামী, অবিনাশী, নিত্য শাশ্বত বোধময় আত্মা। তা-ই যথার্থ স্বরূপ সবার। তাঁর বোধে তাঁর সঙ্গে নিত্যযুক্ত থাক অখণ্ড শুদ্ধাভক্তি বিশ্বাসের মাধ্যমে। তাহলেই ভূমানন্দ বিশুদ্ধ প্রেম ও অখণ্ড শান্তিতে পূর্ণ প্রতিষ্ঠা হবে।

অবতারের তাৎপর্য

ভগবানের অবতারগণ সচ্চিদানন্দ—সহিষ্ণুতা, করুণা ও প্রেম-ভালবাসার ঘনীভূত মূর্তি। ভগবান স্বয়ং যুগে যুগে পৃথিবীর সর্বদেশেই মানুষের ও জগতের যথার্থ প্রয়োজনে নেমে আসেন মানুষের বেশে। নবরূপে প্রকাশিত হয়ে জগতে ঈশ্বরীয় ভাবের অভাবকে নিজ জীবন দিয়ে পূরণ করে দিয়ে যান। তাঁরা যখন আসেন মানবজীবনের সর্বরকম দুঃখকষ্ট যন্ত্রণাকে বর্জন না করে পূর্ণভাবে গ্রহণ করে তাঁরা মহৎ গুণের পরিচয় দেন। প্রেমের বাণী, ভালবাসার বাণীর মাধ্যমে তাঁরা প্রাণের যথার্থ স্বরূপ ও তার পরিচয়, আত্মস্বরূপের যথার্থ মহিমা ও তার পরিচয়, মহাপ্রাণরূপী মাতার যথার্থ মহিমা ও তাঁর অমৃতত্বের পরিচয় জানিয়ে দেন। এগুলি বলে তাদের অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ করে স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়ে যান। তাঁদের কাজই হল মানুষকে অমৃতময় করে তোলা। সকল যোগী সিদ্ধপুরুষ, মহাপুরুষ ও অবতারপুরুষগণ অমৃতময় স্বরূপের স্মৃতি ও তাঁর প্রেম ভালবাসার স্বভাবস্মৃতিকে জগতের মাঝে বিলিয়ে দিতে, সবার প্রাণে মহাজাগরণ এনে দিতে বারেবারে আসেন এবং মানুষের ভুল ভেঙে দিয়ে যান।

যেখানে গুণ শক্তি জ্ঞান আনন্দ ভালবাসা ও প্রেমের বিশেষ কোন একটি অথবা একাধিক বা সমগ্রতার অভিব্যক্তি সেখানেই মায়ের প্রকাশ প্রত্যক্ষ করা যায়। এইভাবে সত্য নিজেই নিজেকে প্রকাশ করে এবং প্রকাশ অনুরূপ অনুভূতি হয়। ছোট একটি রূপ বা মূর্তির মধ্যেও সে স্বয়ংপূর্ণভাবে বিরাজ করে। সেই অনন্ত অসীমকে ধরবার জন্য, জানবার জন্য, বুঝবার জন্য সন্তানের যেন কষ্ট না হয়, তাই মা সন্তানের কাছে সসীম হয়ে রূপের

মাঝে ধরা দেন। তার জন্যই তৈরি হয়েছে এই বিশ্বসংসার। নিজেকে নিজের কাছে ধরা দেবার উদ্দেশ্যে নিজেই সসীমরূপ ধারণ করেন।

পূজা ও উপাসনার মাহাত্ম্য

সকল পূজা ও উপাসনার মাধ্যমে মানবীয় প্রকৃতির মধ্যে দেবভাবের ও ঈশ্বরীয় ভাবের প্রভাব, প্রকাশ, বিকাশ সম্যক্ অভিব্যক্ত হয়। পূজা[১] শব্দের মানে পূর্ণভাবে পুরোভাগে জাত হওয়া, জাগ্রত হওয়া অথবা পূর্ণতাকে জানা।

সম্যক্‌বোধের বৈশিষ্ট্য

প্রতিটি ব্যষ্টিপ্রকাশ অর্থাৎ জীবভাবের মধ্যেই সেই অনন্ত অসীম বিরাট মহতোমহীয়ান লুকিয়ে আছেন। অন্তর হতে ক্রমধারায় তাঁর পূর্ণ প্রকাশ ও অভিব্যক্তি হয়। সুতরাং কোন ক্ষুদ্র প্রকাশও হেয় নয়। ক্ষুদ্রকে বাদ দিলে মহতের প্রকাশধারা ব্যাহত হয়। সম্যক্‌বোধে দেখা যায় সবেতেই এক আছে। ছোট বড় প্রভৃতি ভেদদৃষ্টি মনের ভ্রম। সর্বত্রই সেই মহতোমহীয়ান। অণোরণীয়ানরূপে সে বহির্দৃষ্টিতে প্রতীয়মান হলেও অন্তর্দৃষ্টিতে তা সত্য নয়।

বিগ্রহের মাহাত্ম্য

যে মৃত্তিকাকে সবাই পদদলিত করে তা দ্বারাই আবার দেবমূর্তি তৈরি হয়। তাকেই সকলে আবার প্রণাম জানায়। এর মহিমা অনন্ত ও অপরিমেয়। দেববিগ্রহ সত্যবোধের প্রতীক। সে বিশেষরূপ গ্রহণ করে বলেই তাকে বিগ্রহ[২] বলা হয়। কিসের রূপ? সেই মহিমার রূপ। দেবতা অনন্ত অসীম শক্তির অধিকারী, মহত্ত্বের অধিকারী। আপন মহত্ত্ব সকলকে সে দেয় বলেই তাকে দেবতা[৩] বলা হয়। সেই দেওয়ার রূপ বা মূর্তিই হল দেববিগ্রহ। তাকে সামনে রেখে সকলে আবার আত্মদানের মহিমা অনুভব করার চেষ্টা করে। তাকে শ্রদ্ধা ভক্তি বিশ্বাস সহকারে সবাই পূজা করে, দ্রব্য, গুণ ও প্রাণকে আহুতি দেয়; বহির্ভাব ও অন্তর্ভাবকে অর্ঘ্য ও ভোগরূপে নিবেদন করে; পরিশেষে পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে।

নমস্কারের তাৎপর্য

নমঃ মানে এই নাও মা, মহেশ, মাধব বা মহৎ। এই ভাব অন্তর্মনেই সুপ্ত থাকে। মনের বহির্মুখী ভাবগতিকে অন্তর্মুখী করে নেওয়াই হল নমঃ বা নমস্কার[৪]। এইভাবে প্রত্যেকের সঙ্গে অখণ্ডের সম্বন্ধ, মহতের সম্বন্ধ বা পূর্ণের সম্বন্ধ অনুভূত হয়।

আত্মমায়ের তাৎপর্য

মা-ই সন্তান সেজে এসে আবার মা হয়ে মহাপ্রাণ মায়ের সঙ্গে মিশে যান। এই মা-ই হলেন আত্মা। ক্ষুদ্র প্রাণবিন্দু হয়ে এসে সে মহাপ্রাণ বিশ্বমায়ের বুকে লালিত-পালিত ও বর্ধিত হয়। পূর্ণরূপে অন্তরপ্রাণের সম্প্রসারণ হওয়ার পরে সে অখণ্ড মহাপ্রাণের সঙ্গে মিশে যায়। এই প্রাণ ছাড়া প্রাণের এত আপন আর কেউ নেই।

[১৫।৬।৬৮]

১। স্বানুভূতির দৃষ্টিতে। ২। অভিনব সংজ্ঞা। ৩। বিজ্ঞান দৃষ্টিতে। ৪। অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে।

সত্য ও সত্তাস্বরূপ ঈশ্বরের দর্শন ও প্রত্যক্ষ অনুভূতির উপায়

ঈশ্বরের মহিমা অনন্ত। তাঁর নিত্য নূতন ভাব, নিত্য নূতন বেশ। শব্দমাত্রই ঈশ্বরের কথা, রূপমাত্রই ঈশ্বরের রূপ, নাম ও গুণ মাত্রই ঈশ্বরের মহিমা ও পরিচয়। সর্ব রূপ নাম ভাব বোধে যখন এক ঈশ্বরকে দেখা, অনুভব করা বা আবিষ্কার করা যায়, তখনই মানুষ পূর্ণতা লাভ করে স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়।

সর্বপ্রকাশের মধ্যে ঈশ্বর আত্মা স্বয়ং বিদ্যমান বলে সবকিছু থেকেই অনুভূতি পাওয়া যায়। সর্ব অনুভূতি ঈশ্বরাত্মাবোধেরই নিদর্শন। অনুভূতিশূন্য বোধ বা বোধশূন্য অনুভূতি সম্ভব নয়। বোধস্বরূপ ঈশ্বরাত্মাই হল অনুভূতিস্বরূপ ও প্রমাণ।

সুখ দুঃখ আনন্দ বেদনা সবই তাঁর প্রকাশ। অনুভূতির মধ্যে তা ধরা পড়ে। অনুভূতির পূর্ণতাকেই স্বানুভূতি বলে। স্বানুভূতিলাভের পূর্ব পর্যন্ত সুখদুঃখ ভালমন্দ প্রভৃতি 'আমার বোধের' মাধ্যমে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু স্বানুভূতিলাভের পরে 'আমার বোধের' ব্যবহার থাকে না; থাকে 'তুমি ও তোমার বোধ' অথবা শুধু 'আমি বোধের' ব্যবহার। 'তুমি তোমার বোধ' হল শুদ্ধাভক্তির লক্ষণ এবং শুধু 'আমিবোধের' ব্যবহার হল শুদ্ধ জ্ঞানীর লক্ষণ।

যথার্থ সাধুর পরিচয়

সাধুতা হল হৃদয়ের ধর্ম, শুদ্ধ অন্তঃকরণ ও আত্মার ধর্ম। সাধুবোধেই সাধুকে চেনা যায়। অসাধু সাধুকে কখনও চিনতে পারে না। সাধশূন্য চিত্তই হল শুদ্ধচিত্ত। সাধশূন্য মানে কামনা-বাসনাশূন্য। সাধশূন্য চিত্তই হল সাধুর লক্ষণ। সাধু হওয়া যত কঠিন, সাধুতা রক্ষা করা ততোধিক কঠিন। চিত্তশুদ্ধি না হলে কেউ সাধু হতে পারে না। শুদ্ধবোধের সঙ্গে যুক্ত না হয়ে কেউ সিদ্ধ বা পূর্ণ হতে পারে না। অখণ্ড বিশুদ্ধবোধে প্রতিষ্ঠিত না হয়ে কেউ মুক্তি শান্তি পূর্ণতা ও অমৃতত্ব লাভ করতে পারে না। যথার্থ সাধুর অবদান অতুলনীয়।

সংযত ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বস্তু অর্থ কাল (সময়) বিদ্যা ও জীবনের যথার্থ ব্যবহারকেই সৎকর্ম[১] বলে। অমৃতত্ব ও পরাশান্তিই হল পরমতত্ত্ব, একেই চরম ও পরম বলা হয়।

অজ্ঞানজাত কাম ও আশাই হল জীবনবন্ধন ও দুঃখকষ্টের কারণ

যথার্থ সাধু বিষয় ভোগ-সুখ পরিহার করে দুঃখকে বরণ করে নেয়। তার ফলে সে যথার্থ সুখের সন্ধান পায়। দুঃখ ছোটে সুখের পিছনে এবং সুখ ছোটে দুঃখের পিছনে। এ-ই হল সংসারের ধর্ম। সুখের আশায় সংসারী মানুষ দুঃখ পায়। এই আশাই হল দুঃখের কারণ। সুখের আশা ত্যাগ করলেই দুঃখের কারণ বিনষ্ট হয়। সুখকে ছেড়ে দুঃখকে বরণ করলেই সুখের আশা প্রতিহত হয়। তার ফলে দুঃখের কারণ বিনষ্ট হয় এবং যথার্থ সুখের সন্ধান মেলে।

ঈশ্বরানুভূতি হলে সুখ-দুঃখ সমান হয়, অথবা উভয়েরই অবসান হয়

সুখের অভাব হল দুঃখ এবং দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হল সুখ। ঈশ্বর আত্মা হল জ্ঞানস্বরূপ, সুখস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ ও শান্তিস্বরূপ। তাঁর অনুশীলন দ্বারাই অজ্ঞান মোহ ও দুঃখকষ্ট মৃত্যুর নিবৃত্তি হয় এবং যথার্থ সুখ জ্ঞান আনন্দ ও শান্তির প্রতিষ্ঠা হয়। মুক্তপুরুষ সুখদুঃখ বোধের অতীত অবস্থা নিত্যসমবোধে নিত্যস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকে। বন্ধন ও মুক্তির কোন প্রভাব তাকে স্পর্শ করে না।

১। অভিনব সংজ্ঞা।

সাধক সাধন সাধ্য ও সিদ্ধি ঈশ্বরের এক অভিনব লীলাচাতুরী

সাধনায় সিদ্ধিলাভের পূর্বে সাধকদের দুঃখকষ্ট রোগশোক যন্ত্রণা এবং নানাবিধ প্রতিকূল অবস্থা ও পরিবেশের সম্মুখীন হতে হয়। তখন সেগুলি পরিহার করার চেষ্টা না করে ঈশ্বরীয় বোধে গ্রহণ করে ধৈর্য স্থৈর্য সহকারে সহ্য করে যেতে হয়। তাহলে এই বেদনাদায়ক অবস্থাগুলি সহজে অতিক্রম করে পরম সিদ্ধি লাভ করা সম্ভব হয়। এইরূপ আচরণের মাধ্যমে যাঁরা সর্বস্তরের অভিজ্ঞতা লাভ করে চরম অবস্থায় প্রতিষ্ঠা লাভ করেন তাঁদের মহাপুরুষ বলা হয়।

অদ্বৈতই হল নিত্য এবং দ্বৈত হল অনিত্য

পরমার্থই হল সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্ম আত্মা ঈশ্বর সত্তা। অখণ্ড বিশুদ্ধবোধই হল এর স্বরূপ এবং এ-ই হল নিত্যবস্তু। এর অতিরিক্ত আর কিছু নেই। এর অতিরিক্ত যা কিছু প্রতীয়মান হয় তা অনিত্য অ-বস্তু অর্থাৎ অবিদ্যা অজ্ঞান মায়া মিথ্যা ও ভ্রান্তি। এ-ই মতান্তরে প্রকৃতি ও শক্তিরূপে পরিচিত।

নিত্যবস্তু হল ঈশ্বর আত্মা ব্রহ্ম অর্থাৎ বিশুদ্ধ বোধস্বরূপ। এই বিশুদ্ধ বোধস্বরূপ নিত্য অদ্বৈত নিত্য সমান ও নিত্যবর্তমান। দ্বৈত ও নানাত্ব বহুত্ব প্রভৃতি বৈচিত্র্যময় প্রতীতি হল অবিদ্যা অজ্ঞান ও মায়ার খেলা। এই অজ্ঞানের খেলাই হল জগৎনাট্য।

আত্মজ্ঞানীই হলেন সাক্ষীপুরুষ

আত্মজ্ঞানী দিব্যপুরুষগণ ভবচক্রের রহস্য অবগত হয়ে বিশ্বাতীত অমৃতময় বিশুদ্ধবোধে প্রতিষ্ঠিত থেকে কেবল সাক্ষীদ্রষ্টারূপে অবিদ্যা মায়ার জগৎ অভিনয় দেখে যান। তাঁরা জগতের কোন সৃষ্টি বা ঘটনা দ্বারাই প্রপীড়িত, বিব্রত, বিমোহিত হন না।

বাহ্য জগৎ মোহ আসক্তি ও ভ্রান্তিমূলক

বাহ্যিক দৃষ্টিতে যা সুন্দর তা-ই মোহ ও ভ্রান্তিমূলক এবং অজ্ঞান ও বন্ধনের কারণ। সৌন্দর্য হল হৃদয়ের ধর্ম। শুদ্ধচিত্তে শুদ্ধবোধে তার অভিব্যক্তি হয়। অভিমানশূন্য জ্ঞানই হল আত্মজ্ঞান বা বিশুদ্ধ জ্ঞান।

ত্রিগুণের মোহ আসক্তি ও বন্ধন খণ্ডন ও মুক্তির উপায়

তমোগুণের বিকার রজোগুণ দ্বারা শোধিত হয়, রজোগুণের বিকার সত্ত্বগুণের দ্বারা এবং সত্ত্বগুণের বিকার শুদ্ধসত্ত্ব অর্থাৎ শুদ্ধবোধের দ্বারা পরিশোধিত হয়। শুদ্ধসত্ত্বের ব্যবহার সত্ত্বগুণের মাধ্যমে হয়। ঈশ্বরের স্তবস্তুতি ও গুণিজনের গুণগান দ্বারা সত্ত্বগুণের বিকাশ হয় এবং রজঃ ও তমোগুণের শোধন হয়। রজঃ ও তমোগুণই হল শুদ্ধবোধের প্রতিবন্ধক। রজোগুণ হল বিক্ষেপাত্মক এবং তমোগুণ হল আবরণাত্মক। ত্রিগুণের বন্ধন হল প্রকৃতির বন্ধন। শুদ্ধবোধের সাহায্যে এই বন্ধনের মুক্তি হয়। শুদ্ধবোধ হল আত্মজ্ঞান বা আত্মা স্বয়ং। আত্মা নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত। সত্ত্বগুণের প্রভাবে মানুষ সাধু হয় এবং শুদ্ধসত্ত্বগুণের প্রভাবে সে ব্রহ্ম-আত্মা-ঈশ্বর জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়। সাধুভাব হতেই সাধুভাবের বিকাশ হয়। আসাধুর দাবি থাকে বলেই শান্তির ঘরে চাবি বন্ধ থাকে। সাধুর কোন দাবি থাকে না বলে সে উদার ও মুক্ত। সাধুর কাজ হল অপরকে সাধু বানানো। *** প্রকৃত সাধু ঈশ্বরের নির্দেশে কাজ করেন, নিজের স্বার্থের জন্য নয়। ঈশ্বরবোধে সকলের সেবা করাই হল সাধুর ধর্ম। এই সেবাধর্মের মাধ্যমে সৃষ্টির কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়।

সমগ্র বিশ্বের কলা-কৌশল হল ঘড়ির মত। পরস্পর পরস্পরের সম্পূরক ও পরিপূরক। সুদর্শনচক্র হল এর নিদর্শন। প্রত্যেকের হৃদয়ে বসে বোধস্বরূপ আত্মা যন্ত্রী হয়ে সকলকে যন্ত্রবৎ পরিচালিত করেন, যা ব্যষ্টি ও সমষ্টিভেদে দ্বিবিধভাবে অনুষ্ঠিত হয় এবং দ্বিবিধভাবেই অনুভূত হয়।

আত্মসাধনা ও আত্মশুদ্ধির তাৎপর্য

সাধনা সংসারেই করতে হয়, জঙ্গলে নয়। সংসার বর্জন করে সংসারের অভিজ্ঞতা অর্জন করা যায় না। নির্জনতা মনের প্রস্তুতির সহায়ক। নির্জনে বসে সংসারের অভিজ্ঞতাগুলি সাজিয়ে নিতে হয়। সাজানো অভিজ্ঞতার মধ্যে গভীর মনোনিবেশ করলে সত্যবোধের সন্ধান পাওয়া যায়। অন্তরের বোধই হল বৈচিত্র্য ও সমতার কারণ। ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি বৈচিত্র্যপ্রধান। একেই বিষয়বোধ বলা হয়। মনের অনুভূতি দ্বৈতপ্রধান অর্থাৎ বিষয়-বিষয়ী, জ্ঞাতা-জ্ঞেয়, কর্তা-কর্ম প্রভৃতি ভাবে অনুভূত হয়। মনের গভীরে হৃদয়কেন্দ্র হল একত্ববোধ বা সমবোধের অধিষ্ঠান। একেই আত্মবোধ বা আত্মজ্ঞান বলে। অভিজ্ঞতার সর্বনিম্ন মান হল ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান এবং সর্বোচ্চ মান হল আত্মজ্ঞান।

সংসারে থেকে হয় ব্যবহারিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা। নির্জনে বসে চিন্তার মাধ্যমে তৈরি হয় যুক্তি জ্ঞান। উভয় জ্ঞানের সমীকরণ হল আত্মজ্ঞান।

সত্য বাকের তাৎপর্য

সত্য ব্যক্ত হয় সত্য বাকের মাধ্যমে। সত্যের শক্তি বাক্ এবং বাকের শক্তি সত্য। সত্য হল বিশুদ্ধবোধ অর্থাৎ ব্রহ্ম-আত্মা-ঈশ্বর স্বরূপ। বাক্ সত্যানুভূতিকে ধারণ করে, পোষণ করে, বহন করে ও পরিবেষণ করে। সত্য হল নিত্যবস্তু এবং সত্যবাক্ও নিত্যবস্তু। সত্যবাকের মাধ্যমে নিত্যসত্যকে অবতারগণ রেখে যান সর্বমানবের কল্যাণের জন্য। তাঁদের নিত্যসত্য বাণী সর্বকালে সর্বদেশে সকলের দ্বারা গ্রাহ্য না হলেও তা সত্যবোধের সহায়ক হয়েই থাকে। মহাপুরুষগণ ও সিদ্ধপুরুষগণ সেই সকল বাণীকে সত্যবোধে গ্রহণ করে, আচরণ করে সিদ্ধিলাভ করেন। তারপরে তা দ্বারাই অপরকে তাঁরা অনুশাসন করেন ও শিক্ষা দেন। তাঁরা নূতন কিছুই বলেন না। অবতারগণের নির্দেশিত পথ ও বাণী অনুসরণ করে যে সিদ্ধিলাভ হয় তার ব্যবহার পদ্ধতি অপরকে তাঁরা ধরিয়ে দেন। অবতারদের বাণী ও ধর্মাদর্শের ধারক বাহক ও পরিবেষক হলেন মহাপুরুষ ও সিদ্ধপুরুষগণ। অবতারদের অবদান হল মৌলিক এবং তা সর্বভাবগ্রাহী, স্থান কাল পাত্র ও মতবাদের প্রভাবমুক্ত। সিদ্ধপুরুষদের মধ্যে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে কিছু থাকে না। মহাপুরুষ ও ঋষিদের মধ্যে বহুলাংশে সাদৃশ্য আছে।

শক্তির সিদ্ধি হল সিদ্ধপুরুষদের বৈশিষ্ট্য। শক্তি ও জ্ঞান উভয়ের সিদ্ধি হল মহাপুরুষের বৈশিষ্ট্য। শক্তি জ্ঞান ও আনন্দের পূর্ণসিদ্ধি হল সিদ্ধমহাপুরুষের বৈশিষ্ট্য। শক্তি জ্ঞান আনন্দ ও প্রেমের পরম উৎকর্ষই হল অবতারপুরুষের বৈশিষ্ট্য।

বাক্য মনের অতীত হল ভূমাতত্ত্ব। ব্রহ্ম আত্মা ঈশ্বর হল তার পরিচয়। সচ্চিদানন্দ হল তার স্বরূপ। সর্বজীবনই সচ্চিদানন্দের অভিব্যক্তি। সমগ্র জগৎ হল সচ্চিদানন্দ শক্তির লীলানিকেতন।

সিদ্ধদের মানের পরিচয়

যে-জীবনের মাধ্যমে সৎ-এর শক্তি ব্যাপকভাবে অভিব্যক্ত হয় তাকে সিদ্ধপুরুষ বলা হয়। যাঁর মাধ্যমে সৎ ও চিৎ উভয়ের অথবা শুধু চিৎ বা শুধু আনন্দের শক্তির সম্যক্ অভিব্যক্তি হয় তাঁকে মহাপুরুষ বলা হয়। এবং

যার মাধ্যমে সদানন্দ বা চিদানন্দ অথবা সচ্চিদানন্দ শক্তির পূর্ণ অভিব্যক্তি হয় তাঁকে অবতারপুরুষ বলা হয়। সিদ্ধপুরুষের বৈশিষ্ট্য একটি, তা হল—প্রাকৃতশক্তির উপর আধিপত্য। মহাপুরুষের বৈশিষ্ট্য দুইটি, তা হল—বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তরপ্রকৃতির উপর আধিপত্য। বহিঃপ্রকৃতি, অন্তরপ্রকৃতি ও কেন্দ্রপ্রকৃতির উপর আধিপত্য সিদ্ধমহাপুরুষের বৈশিষ্ট্য। অবতারের বৈশিষ্ট্য চারটি—বহিঃপ্রকৃতি, অন্তরপ্রকৃতি, কেন্দ্রপ্রকৃতি ও তুরীয়ের উপর আধিপত্য।

সিদ্ধপুরুষগণ ক্রিয়াশক্তির উপর বেশি গুরুত্ব দেন বলে কর্মতত্ত্বের বিজ্ঞান সম্বন্ধে মানুষকে বেশি অনুপ্রাণিত করেন।

মহাপুরুষদের মধ্যে অন্যান্য গুণের সঙ্গে শক্তি ও জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য। জ্ঞানশক্তি ও আনন্দশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত থাকেন বলে তাঁরা সকলকে যোগ ও জ্ঞানের পথে অনুপ্রাণিত করেন।

সিদ্ধমহাপুরুষদের মধ্যে শক্তি জ্ঞান ও আনন্দশক্তির সম্যক্ ব্যবহার দৃষ্ট হয়, তদনুসারে তাঁরা শরণাগত অধিকারী ভক্তকে অনুশাসিত ও অনুপ্রাণিত করেন।

অ-মন আত্মার পরিচয়

চিন্তাশূন্য মনই হল অ-মন। অ-মনই হল ধ্যানসিদ্ধির লক্ষণ। ধ্যানসিদ্ধি হল জীবন্মুক্তির লক্ষণ। সৎ হল নিত্য এক। নিত্য একে প্রতিষ্ঠিত চিত্তই হল শুদ্ধচিত্ত, ধ্যাননিষ্ঠ চিত্ত বা সমাহিত চিত্ত।

অনাসক্তি হল কর্মজ সিদ্ধি লাভের উপায়। কর্মফল ও কর্তৃত্ব ত্যাগ হল জ্ঞানসিদ্ধি লাভের উপায়।

সিদ্ধিলাভের ক্রমিক মান

মুমুক্ষু না হলে ধ্যানসিদ্ধি হয় না। ধ্যানসিদ্ধি না হলে আত্মজ্ঞানও লাভ হয় না। আবার আত্মজ্ঞান লাভ না হলেও ধ্যানসিদ্ধি হয় না। আত্মপ্রতিষ্ঠা বা ব্রহ্মপ্রতিষ্ঠা শুদ্ধজ্ঞানসাপেক্ষ, কিন্তু ধ্যানসাপেক্ষ নয়। ধ্যান, উপাসনা হল ক্রিয়াসাপেক্ষ ও ইচ্ছাসাপেক্ষ। জ্ঞান হল নিত্যবস্তু ও স্বতন্ত্র। আত্মা ও ব্রহ্ম অভেদ। আত্মজ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞান এবং ব্রহ্মজ্ঞানই আত্মজ্ঞান। এ নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত ও সর্ববিধ উপাধিশূন্য; সুতরাং ক্রিয়াসাপেক্ষ নয়।

সিদ্ধপুরুষগণ প্রচলিত সত্য ও ধর্মাদর্শের ধারাকে অনুসরণ করে তার অন্তর্নিহিত শক্তি ও ভাবধারার সঙ্গে যুক্ত থাকেন এবং তা রক্ষাকল্পে সর্বতোভাবে সচেষ্ট থাকেন। তাঁরা স্বতন্ত্র কিছু বা নূতন কিছু দিয়ে যান না এবং বলেও যান না। ধর্মের পূর্ণ ধারাকেই সবার কাছে তুলে ধরেন। মহাপুরুষগণ প্রচলিত ধর্মাদর্শ ও সত্যের অন্তর্নিহিত তত্ত্ব অনুভব করে তা জনসাধারণের কল্যাণের জন্য বিজ্ঞানসম্মতভাবে ব্যক্ত করে যান। তাঁদের মধ্যেও নূতনত্ব ও মৌলিকত্ব বিশেষ না থাকলেও সত্যের অতীত ও বর্তমানের পূর্বাপর ব্যবহারের মধ্যে যে ঐক্য ও সামঞ্জস্য নিহিত আছে তা বিজ্ঞানসম্মতভাবে তাঁরা সকলের কাছে ব্যক্ত করে যান। শিক্ষা দীক্ষা সমাজ সংস্কারের প্রতি তাঁদের দৃষ্টি থাকে বলে তাঁদের প্রভাব কাব্য দর্শন শিল্প সাহিত্য সঙ্গীত কলা ও বিজ্ঞান ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে ক্রিয়া করে। মহাপুরুষদের মধ্যেও অনুভূতির মানের কিছু বৈশিষ্ট্য দৃষ্ট হয়। তার ফলে মহাপুরুষ এবং অবতারপুরুষের মাঝামাঝি এমন অধিকারী পুরুষ আছেন যাঁদের সিদ্ধমহাপুরুষ বলা হয়। তাঁদের মধ্যে অবতারপুরুষের কিছু বৈশিষ্ট ব্যক্ত হতে দেখা যায়।

অবতার বা অবতারকোটি মহাপুরুষগণের মধ্যে মৌলিকতা ও নূতনত্ব বিশেষভাবে প্রকাশ পায়। তাঁদের অনুভূতি আচার ব্যবহার ভাষা বর্তমানের পক্ষে নবজাগরণ এনে দেয়। তা দ্বারা সমগ্র সমাজজীবন ও জাতীয় জীবন নূতনভাবে অনুপ্রাণিত হয়। ধর্মাদর্শ ও জীবনাদর্শের গতি রূপান্তরিত হয়। এক কথায় অবতারগণ সত্যধর্মের

জাগরণ ও সম্প্রসারণের জন্য নবভাবে শক্তির সঞ্চার করে যান এবং সত্য শক্তির বীজ ছড়িয়ে যান। সত্যের সত্য তা হতেই জাত হয়। তাঁদের ভক্ত সেই সত্যকে অনুভব করে তার ধারা ঘোষণা করে।

অবতারগণ হলেন ভগবানের নিত্য নব মূর্তরূপ।

অবতারদের মহিমা অবতারগণই জানেন। অপরের পক্ষে তা ধারণা করা সম্ভব নয়। কৃপা করে তাঁরা যাকে যেমন বোঝান সে তেমনই বোঝে।

অবতারপুরুষদের মধ্যে সিদ্ধপুরুষ, মহাপুরুষ ও সিদ্ধমহাপুরুষদের দিব্যগুণগুলি সবই থাকে, তা ছাড়া এমন কতকগুলি গুণ থাকে যা কেবলমাত্র অবতারদের মধ্যে সম্যক্‌ভাবে প্রকাশ পায়। অবতারদের মধ্যে ১৬টি ঈশ্বরীয় গুণের প্রকাশ দেখা যায়।

অবতারদের বৈশিষ্ট্য হল অন্তরে তাঁরা চিদ্‌ঘন বা প্রজ্ঞানঘন এবং বাইরে তাঁরা শুদ্ধাভক্তি বা প্রেমভক্তি সম্পন্ন। মহাপুরুষদের বৈশিষ্ট্য হল তাঁরা অন্তরে শুদ্ধাভক্তি সম্পন্ন এবং বাইরে তাঁরা জ্ঞানঘন। সিদ্ধপুরুষের বৈশিষ্ট্য হল অন্তরে শক্তি, বাইরে জ্ঞানের আবরণ।

ভাবের শুদ্ধ পূর্ণ অবস্থাই হল ভক্তি। *** ভক্তির উৎকর্ষেই হয় প্রেম।

নিত্য এক সত্যবোধে যে বাস করে সে-ই হল সাধু।

সাধুবাক্য পালন না করে সাধুর সঙ্গে তর্ক করাও অন্যায়। সাধুবাক্য অবিশ্বাস করেও অসাধুর বাক্যে বিশ্বাস করে সাময়িক উন্নতি লাভ করা অপেক্ষা সাধুবাক্যে বিশ্বাসের ফলে সাময়িক ক্ষতি হলেও তা শ্রেয়স্কর। *** সাধুবাক্যই হল ঈশ্বর বাক্য বা আপ্তবাক্য। একেই বেদবাণী বলে।

যথার্থ সাধুর পরিচয়

সর্ব মতপথ ও ভাবের অনুগামী, উচ্চ নীচ, বড় ছোট নির্বিশেষে সকলেই সমান ব্যবহার পায় যার কাছে সেই হল প্রকৃত সাধু। সাধনসিদ্ধ হলে সাধু হওয়া যায়। সাধু হওয়া সোজা বটে কিন্তু সাধুতা বজায় রাখা বা রক্ষা করা সহজ নয়।

মাধুর্য ও ঐশ্বর্যের অধিপতি হলেন ঈশ্বর

ঈশ্বরের দ্বিবিধ শক্তি হল—ঐশ্বর্য ও মাধুর্য। মাধুর্য হল ঈশ্বরের অন্তরঙ্গ শক্তি এবং ঐশ্বর্য হল বহিরঙ্গ শক্তি। শক্তি বিভূতি হল বহিরঙ্গ শক্তির অন্তর্ভুক্ত। সাধক সাধনা দ্বারা বিভূতি শক্তি অর্জন করতে পারে। কিন্তু মাধুর্য শক্তির অধিকারী সকলে হতে পারে না। শক্তি বিভূতির অধিকারী সাধক ইচ্ছা অনুসারে বিভূতি ব্যবহার করতে পারে। মাধুর্যের অধিকারী মহাসাধকদের মধ্যে বিভূতি অনেক সময় আপনা হতেই প্রকাশিত হয়। বিভূতিশক্তি ব্যবহার দোষে বিনষ্ট হয়। এই শক্তি সহজে স্থায়ী হয় না। কিন্তু মাধুর্যের অধিকারী মহাসাধকদের মধ্যে এর ব্যবহার দোষ হয় না। ঈশ্বরের কাছে এই শক্তি যথাযথভাবে অক্ষয় থাকে। বাহ্যিক আড়ম্বরযুক্ত সাধকদের মধ্যে ব্যবহার দোষে এ বিকৃত হয়। স্বার্থসিদ্ধির কাজে প্রয়োগ না করলে আপনা হতে এর ব্যবহার হলে বিশেষ ক্ষতি হয় না। কর্তৃত্বদোষে ব্যবহার দোষ হয়।

মহতের বিশেষত্ব হল যে, সে ছোটকেও মহৎ করে তোলে। ছোটর সমস্ত দোষত্রুটি নিজের মধ্যে গ্রহণ করে তার পরিবর্তে সে নিজের মহৎ গুণ দিয়ে তাকে মহিমান্বিত করে।

মানা ও জানার বৈশিষ্ট্য

সাধু হতে গেলে তৃণের মত নিচু হতে হয়, তরুর মত সহিষ্ণু ও সর্বংসহ হতে হয় এবং সমবোধে বা

আপনবোধে সব গ্রহণ করতে হয়। এককথায় সর্বেশ্বর জ্ঞানে বা একাত্ম জ্ঞানে অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানে সব 'মেনে মানিয়ে চলতে' হয়। যে মানে সে সবই জানে। কিন্তু যে জানতে চায় সে মানতে পারে না। জানা অপেক্ষা মানা শ্রেয়। 'মানা' অর্থ হল শুদ্ধবোধ দিয়ে সবকিছু গ্রহণ করা, দেখা ও ব্যবহার করা। এ-ই সর্বসাধনার সার কথা। মানা পূর্ণ না হলে সাধনা পূর্ণ হয় না। সবকিছু মানার মাধ্যমে জানা যায়। কিন্তু জানার মাধ্যমে মানা যায় না। জানার সাধনায় অভিমান প্রচ্ছন্ন থাকে কিন্তু মানার সাধনায় অভিমান আর থাকে না। মানা পূর্ণ হলেই প্রেমের উদয় হয়। প্রেমের ব্যবহারই হল মাধুর্যের ব্যবহার। সমবোধ একাত্মবোধ ব্রহ্মবোধ ও আপনবোধের ব্যবহার হল বিশুদ্ধ প্রেমের লক্ষণ। দিব্যজ্ঞান লাভের পরে হয় দিব্যপ্রেমের অভিব্যক্তি। দিব্যপ্রেমের ব্যবহার অতীব রহস্যপূর্ণ। দিব্যপ্রেমে পাগল হলেই মাধুর্যভাব অভিব্যক্ত হয়।

ব্রহ্ম আত্মা ঐক্যজ্ঞান হলে সমবোধ হয় অথবা সমবোধই ব্রহ্ম আত্মা ঐক্যজ্ঞানের লক্ষণ। সর্ববোধে একাত্মবোধ এবং সর্বপ্রাণের সঙ্গে যুক্ত হলে সমবোধ বা একবোধ হয়। একে ব্রহ্ম আত্মা ঈশ্বরোপলব্ধি বলে।

মহৎ কাজের জন্য দৃঢ় সংকল্পের প্রয়োজন। সংকল্প দৃঢ় হলে কর্ম সুসম্পন্ন হতে বিলম্ব হয় না। দৃঢ়সংকল্প না হয়ে কোন মহৎ কাজ আরম্ভ করতে নেই। তীব্র ইচ্ছাই হল সংকল্প সিদ্ধির কারণ। মৃদুমন্দ ইচ্ছার দ্বারা কোন কর্ম সুসম্পন্ন হয় না, কোন কর্মজ সিদ্ধিও লাভ হয় না। সর্ববিধ প্রতিকূলতা ও বিরুদ্ধ অবস্থার মধ্যে সকল রকম কষ্ট সহ্য করেও কর্তব্যকর্ম নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতে হয়। কর্তব্যনিষ্ঠা হল কর্মজ সিদ্ধির চাবি।

দিব্যজীবন লাভের উপায়

দিব্যজীবন লাভ করা মানে ভগবানের হাতের যন্ত্র হওয়া। এইরূপ দিব্যজীবন লাভের জন্য কর্তব্যনিষ্ঠা ও গুরুভক্তি প্রথম থেকেই প্রয়োজন। গুরুর কৃপাতেই সব হয় এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস থাকা দরকার। আত্মজ্ঞান ও ব্রহ্মসেবা অনুশীলন করাই হল গুরুসেবা করা। একনিষ্ঠভাবে এইরূপ গুরুসেবা করার ফলে গুরুকৃপা মেলে অর্থাৎ আত্মজ্ঞান লাভ হয়।

সাত্ত্বিক ত্যাগ হল স্বতঃস্ফূর্ত, রাজসিক ত্যাগ হল অভিমানাত্মক অর্থাৎ অহংকারপূর্বক ত্যাগ এবং তামসিক ত্যাগ হল ভীতিসম্ভূত অর্থাৎ কায়িক ও মানসিক আরামের ব্যাঘাতজনিত দুঃখকষ্টের ভয়ে ত্যাগ।

সাধনার উদ্দেশ্য হল তমোগুণ ও রজোগুণকে অভিভূত করা বা শোধন করা এবং সম্যক্‌রূপে সত্ত্বগুণ অর্জন করা। শুদ্ধসত্ত্বই হল ঈশ্বরের স্বভাব।

অবতার হলেন দেবমানব। তাঁরা যোগস্থ হয়ে কর্ম করেন অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বকে আশ্রয় করে কর্ম করেন। কখনও স্বভাবে, কখনও মহাভাবে, কখনও বা শুদ্ধভাবকে আশ্রয় করে তাঁরা লীলা করে যান। সেইজন্য তাঁদের আচরণ কখনও দেবমানবের প্রভাবশূন্য হতে দেখা যায় না। [১৬।৬।৬৮]

নিত্যসিদ্ধ শান্তির অনুভূতির কেন্দ্র হৃদয়

শান্তি হৃদয়ের সম্পদ। এই শান্তি হৃদয়েই একাগ্রচিত্তে ও শুদ্ধমনে অনুভূত হয়। যেহেতু চিত্তের মধ্যে বিশ্বজগৎ এবং সমগ্র বিশ্বজগৎরূপে চিত্তই ব্যক্ত হয়ে আছে, সেই হেতু সর্ববস্তুর মধ্যে শান্তি মিশে আছে। হৃদয়ে শান্তি অনুভূত হলে সর্ববস্তুর মধ্যেই তার সন্ধান মেলে। যথার্থ শান্তি হল ব্রহ্ম আত্মা ঈশ্বরের স্বরূপ। ব্রহ্ম আত্মা ঈশ্বর সর্বব্যাপী ও সর্বধারী। সুতরাং শান্তিও সর্বব্যাপী ও সর্বধারী। এর অনুভূতি আপন হৃদয়েই হয়; কারণ অনুভূতির কেন্দ্র হল হৃদয়। এই হৃদয় আবার সর্বব্যাপী। কেন্দ্র হৃদয় দিয়েই সর্বব্যাপী হৃদয়ের অনুভূতি হয়। শান্তির স্বরূপ অখণ্ড। খণ্ডজ্ঞান হল ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি। দ্বৈতজ্ঞান হল মনের প্রতীতি, কিন্তু অখণ্ড অনুভূতি হল স্বানুভূতি বা আত্মানুভূতি।

দুধে যেমন মাখন মিশে থাকে সেইরূপ শান্তিও সর্ববস্তুর মধ্যে মিশে আছে। আত্মজ্ঞান লাভের অর্থ সর্ববস্তুর সঙ্গে এক হয়ে মিশে যাওয়া। শান্তিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া মানে অদ্বয় জ্ঞানে সবকিছুর সঙ্গে একাত্ম হওয়া। আত্মজ্ঞান লাভ হলে শান্তি লাভ হয়। শান্তি হলে যেমন সবকিছুর সঙ্গে একাত্মতা লাভ হয় সেইরূপ সর্ববস্তুর সঙ্গে মিশে গেলেই শান্তি পাওয়া যায়। শান্তি অর্থ হল সর্ববস্তুকে সমানবোধে বা আপনবোধে গ্রহণ করা, দেখা ও ব্যবহার করা। শান্তি ও প্রেম একই বস্তু। সুতরাং সর্ববস্তুর যথার্থ ব্যবহার হলে তবেই শান্তি পাওয়া যায়।

সুখ ও দুঃখকে সমানবোধে গ্রহণ করে সমষ্টির সঙ্গে মিশে গেলেই শান্তি লাভ হয়। অর্থাৎ সুখ ও দুঃখকে কোন প্রকার প্রাধান্য না দিলে অথবা উভয়কে সমবোধে গ্রহণ করলে শান্তি পাওয়া যায়।

কামনাযুক্ত চিত্তে যেখানেই যাওয়া যায় সেখানেই অশান্তি। এককথায় কামনা বাসনা হল অশান্তির কারণ। *** কামনাশূন্য নিষ্কাম চিত্তই হল শান্তি লাভের সহজ উপায়।

ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানই হল প্রাকৃত জ্ঞান

জাগতিক জ্ঞান, ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান ও দেহবুদ্ধিই হল সংসার। এই বোধে যেখানে যাওয়া যায় সেখানেই সংসার। কামনা-বাসনার লক্ষণ হল অহংকার অভিমান। অহংকার অভিমানই হল সংসারের লক্ষণ। নিরহংকার ও নিরভিমান চিত্তে সংসারবোধ থাকে না, তার মধ্যে থাকে সমসার। সমষ্টির সঙ্গে একাত্মবোধ হলেই শান্তি লাভ হয়। যতদিন পৃথকবোধ থাকে ততদিনই দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হয়।

আশ্রিত-আশ্রয়বোধে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সকলে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। সকলের সঙ্গেই সকলের আত্মীয়তা আছে। প্রত্যেকে প্রত্যেকের সঙ্গে কেন্দ্রসত্তায় যুক্ত ও সমান। অন্তরসত্তায় আত্মীয় সম্বন্ধ ও বহিঃসত্তায় ভেদ বা পৃথক সম্বন্ধ।

পরস্পরের মধ্যে উপাদানগত ঐক্যই হল স্বানুভূতি বা আত্মানুভূতি। বাহ্যিক প্রকৃতিগত ভেদ হল ভ্রান্তিমূলক প্রতীতি। অনন্ত নভোমণ্ডল হতে আরম্ভ করে ভূমণ্ডলের সর্বত্র সমগ্র সৃষ্টির মধ্যেই ইন্দ্রিয়গত ভেদ ও পার্থক্য এবং আত্মগত অভেদ ও ঐক্য বা সমতা উভয়ই আত্মানুভূতি বা সত্যানুভূতির বিষয়। মহৎ অর্থ ব্যাপ্তার্থে বৃহৎ। প্রত্যেকেই এই বৃহত্তর বস্তুর অংশ। প্রত্যেকের অস্তিত্ব নির্ভর করে মাটি জল অগ্নি বায়ু আকাশ এবং বস্তুজগতের প্রতি প্রকাশের উপরে। এর কোন কিছুকেই বাদ দেওয়া যায় না। প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকে পরোক্ষ বা অপরোক্ষ ভাবে যুক্ত আছে। সকলের সঙ্গে সম্বন্ধ না রেখে কারও বাঁচার উপায় নেই। আশ্রিত ও আশ্রয়বোধে পরস্পর সংযুক্ত। প্রকৃতিমুক্ত হতে গেলে সম্পূর্ণ নিরালম্ব ও নিরাশ্রয় হতে হয়। এই হল জীবন্মুক্তের লক্ষণ।

চিত্তের মূলে জগৎ ও জগতের মূলে চিত্ত

প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের মধুর সম্বন্ধ আছে। সমগ্র বিশ্ব শক্তির অণু পরমাণু দ্বারা গঠিত। এই পরমাণুগুলি যখন একদিকে শক্তির দ্বারা প্রবাহিত হয় তখনই গতি সৃষ্টি হয়। কিন্তু পরস্পর পরস্পরকে যখন আকর্ষণ করে এবং গতি যখন স্তব্ধ হয় তখন হয় স্থিতি। সমস্ত চাওয়া যখন একমুখী হয় তখন হয় গতি। সকলেই এই প্রকাশ, স্থিতি ও গতির অন্তর্ভুক্ত। অণু সবকিছুকে পৃথক করে, আবার সংযুক্তও করে।

ত্যাগের বৈশিষ্ট্য

বিশ্ব থেকে কেউ এবং কারও থেকে বিশ্ব পৃথক নয়; পৃথক কেউ ছিলও না, এবং হতেও পারে না। ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দ সম্পূর্ণ বর্জন করতে পারলেই হয় যথার্থ ত্যাগ। ব্যষ্টির কল্যাণ ও মুক্তি নির্ভর করে সমষ্টির উপর,

সুতরাং নিজের কল্যাণ ও মুক্তি লাভ করতে হলে সকলের কল্যাণ ও মুক্তি চাইতে হয়। পূর্ণশান্তি লাভ হয় সর্বত্যাগে অর্থাৎ সব ঈশ্বরে সঁপে দিলে। আমি কর্তা এবং আমার সবকিছু এইভাব পরিত্যাগ করলেই হল আসল ত্যাগ। ব্রহ্ম বা ঈশ্বরার্পণ বোধে সবকিছু সমর্পণ করলে সর্বত্যাগ সিদ্ধ হয়। তখন তাঁর একান্ত বাধ্য হয়ে তাঁর প্রীত্যর্থে সেবারূপ কর্মে নিযুক্ত থাকা যায়। ঈশ্বরের প্রীত্যর্থে সেবা করলে মুক্তি লাভ হয়। সর্বত্যাগের ফলে আত্মজ্ঞান লাভ হয়, অথবা আত্মজ্ঞান লাভ হলে সর্বত্যাগে প্রতিষ্ঠা হয়। সর্বত্যাগ মানে ব্রহ্ম বা আত্মবোধে সবকিছু গ্রহণ, দর্শন ও ব্যবহার। এককথায় সকলের প্রীতিনিমিত্ত কর্ম করলে ঈশ্বরে প্রীতি হয়। একে ব্রহ্মকর্ম বা যজ্ঞ, বিষ্ণুযজ্ঞ, আত্মযজ্ঞ ও নিষ্কাম কর্ম বা কর্মযোগ বলা হয়। এর মাধ্যমেই আসে যথার্থ জ্ঞান।

বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারলীলা এক মহানীতির মাধ্যমেই নিয়ন্ত্রিত হয়। অনুগত ও একান্ত বাধ্য হয়ে এই নীতির অনুসরণ না করলে শুভ, কল্যাণ ও নিঃশ্রেয়স্কর ফল লাভ করা যায় না।

জ্ঞান ও ভক্তির যথার্থ স্বরূপ

সব তুমি ও তোমার এবং তোমার আমি রূপে যে সত্যের ব্যবহর হয় তা-ই যথার্থ ভক্তের লক্ষণ। সবই 'আমি' এই সত্যবোধের অনুভূতি হল জ্ঞানীর লক্ষণ। যথার্থ জ্ঞানী ও যথার্থ ভক্তের অনুভূতি সমান। তারা উভয়েই নিত্য একবোধে বা সমবোধে প্রতিষ্ঠিত থেকে সবকিছুকে একবোধেই ব্যবহার করে। ভক্তের একবোধ হল 'সব তুমি' এবং জ্ঞানীর একবোধ হল 'সম আমি'। উপাদান বোধস্বরূপ উভয়ের মধ্যেই সমান। সুতরাং আমি ও তুমিবোধও সমান অর্থবোধক। জ্ঞানী বলে, হংসঃ সোহম্ এবং ভক্ত বলে হংসঃ দাসোহম্। জ্ঞানী বলে শিবোহম্, ভক্ত বলে শিবদাসোহম্। জ্ঞানী বলে ব্রহ্মাস্মি, ভক্ত বলে ব্রহ্মদাসোস্মি। উভয় ভাবই একতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত। এই একই হল নিত্যসত্য, মহাসত্য, শাশ্বত অচ্যুত অমৃত পরমতত্ত্ব। সমগ্র আধ্যাত্মিক সাধনার মূল লক্ষ্য হল চরম বা পরম একের বোধে প্রতিষ্ঠিত থেকে একের জ্ঞানে বাস করা।

একের মধ্যেই বিশ্ব এবং বিশ্বের মধ্যেও এক। এই একই হল বিশ্বের জননী বা বিশ্বমাতা বা বিশ্বপিতা। এই এক যখন একেতে পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত তখন তা নির্গুণতত্ত্ব। এ-ই শাশ্বত নিত্যের পরিচয়। এই এক যখন বহুরূপে প্রতিভাত হয় তখনই একে সগুণ তত্ত্ব বলে। এ-ই লীলার পরিচয়। নিত্য এবং লীলার মধ্যে বহির্দৃষ্টিতে পার্থক্য দেখায় বটে কিন্তু অনুভূতির দৃষ্টিতে উভয়ই একতত্ত্বের পরিচয়।

মূর্ত ও অমূর্ত এবং ব্যক্ত ও অব্যক্তর তাৎপর্য

নিত্য একের মধ্যে বহু সুপ্ত বা অব্যক্ত ভাবে থাকে এবং লীলায় বহুর মধ্যে এক ব্যক্ত বা মূর্ত হয়েও অব্যক্ত। অর্থাৎ একের স্বরূপ একই থাকে। বহুত্বরূপ বিশেষণ দ্বারা এর স্বরূপ কখনো বিকৃত বা নষ্ট হয় না। কিন্তু বহুত্বরূপ বিশেষণের অস্তিত্ব নিত্য এক ছাড়া কখনও সম্ভব হয় না। বিশ্ব হল সমগ্র বৈচিত্র্যের একক রূপ। সমগ্র বৈচিত্র্য অর্থাৎ ব্যষ্টিসকল বিশ্বের মধ্যেই অবস্থিত। বিশ্ব আবার অদ্বয়ব্রহ্মে বা আত্মস্বরূপে অবস্থিত। বিশুদ্ধ অখণ্ড বোধস্বরূপ ব্রহ্ম বা আত্মার স্বভাবশক্তি হল মন ও বুদ্ধি। সমগ্র বিশ্ব হল মানস সৃষ্টি। মনেই তার স্থিতি এবং মনেই তার লয় হয়। এই মনোরূপ স্বভাবশক্তি আবার পরমবোধি বা বোধস্বরূপ আত্মার বক্ষে উদিত, স্থিত এবং পরিণামে লীন হয়।

ব্রহ্ম বা আত্মার স্বভাবশক্তি এই মানসপ্রকৃতি হল সমগ্র বিশ্বের জননী। এই মা তার সকল প্রকাশসন্তানকে অর্থাৎ বৈচিত্র্যময় সৃষ্টিকে প্রকাশ করে লালনপালন করে পুষ্ট, তুষ্ট ও পূর্ণ করে আপনার মাঝে লীন করে নেয়। সৃষ্টি ও সংহারের মধ্যবর্তী স্তর হল স্থিতি। ক্রম অনুসারে যেমন সৃষ্টি হয়, ক্রম অনুসারেই আবার সংহার হয়।

স্থিতির ক্রম সৃষ্টি ও সংহার উভয় ক্রমের মধ্যবর্তী বলে উভয় ক্রমের প্রভাব তার মধ্যে অধিক থাকে। সেইজন্যই স্থিতিকাল স্থায়ী নয়।

ব্রহ্ম আত্মা ঈশ্বর এক অর্থবোধক। তাঁর স্বভাবশক্তির সঙ্গে তাঁর নিত্য অভেদ সম্বন্ধ। ঈশ্বরের নির্গুণ স্বরূপে তাঁর স্বভাবশক্তি বিলীন বা অব্যক্ত থাকে। কিন্তু তাঁর সগুণ স্বরূপ স্বভাবশক্তি যুক্ত হয়েই অভিব্যক্ত হয়। স্বভাবশক্তির খেলাই হল সগুণ ঈশ্বরের খেলা। সগুণ ঈশ্বরের অনুভূতি পূর্ণ হলেই নির্গুণ স্বরূপের অনুভূতি লাভ হয়। সগুণ স্বরূপের অনুভূতি না হলে নির্গুণ স্বরূপের অনুভূতি হয় না।

মা ও সন্তানের নিত্য অভেদ সম্বন্ধ

মায়ের সঙ্গে জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত এবং মৃত্যুর পরেও জীবের এক অবিচ্ছেদ্য মধুর সম্পর্ক ও আত্মীয়তাবোধ থাকে। এ কথা সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করে সতত স্মরণ করে মেনে মানিয়ে চললে সহজে হৃদয়ে কৃতজ্ঞতাবোধ জাগ্রত হয়। কৃতজ্ঞতাবোধের অর্থ অভ্রান্ত ও অবিস্মরণীয় মহত্তর ও বৃহত্তর বোধের স্মৃতি। এই কৃতজ্ঞতাবোধের যথার্থ ব্যবহার যখন আরম্ভ হয় তখন জীবন মধুর ঈশ্বরীয় অনুভূতির সন্ধান পায়। কিন্তু এই অবিচ্ছেদ্য এক আত্মীয় সম্পর্ক বিস্মৃত হওয়ার ফলে জীবনে অকৃতজ্ঞতাবোধের উদয় হয়। তার জন্য দম্ভ অহংকার কর্তৃত্বাভিমান ভোগলিপ্সা ও পৃথক 'আমার আমি ভাব' বা স্বার্থবোধের প্রকাশ হয়। পৃথক ভাব পোষণ করে চলাই হল অহংকার অভিমানের লক্ষণ। 'আমার আমি' প্রভৃতির মাধ্যমে তার ব্যবহার হয়।

প্রকৃত সাধু ও সন্ন্যাসীর কর্তৃত্বাভিমান ও অহংকার থাকে না। তারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র ঈশ্বরীয় রূপই শুধু দর্শন করে।

সৃষ্টির অণু পরমাণুর মধ্যেও ঈশ্বরীয় শক্তি নিহিত আছে

সমগ্র বিশ্ব হল সচ্চিদানন্দস্বরূপ ঈশ্বরীয় বক্ষে তাঁর স্বভাবশক্তির অভিব্যক্তি। সর্বপ্রকাশের মধ্যে ঈশ্বরের সত্তা ও শক্তি যুক্তভাবে অবস্থান করে। অনন্ত আকাশ ঈশ্বরের অনন্ত মহিমা ঘোষণা করে। বায়ু জল অগ্নি পৃথিবী সর্বত্রই তাঁর শক্তির খেলা। ব্যষ্টি ও সমষ্টি সকলের মধ্যেই তাঁর উপস্থিতি অর্থাৎ সত্তা ও শক্তি নিহিত আছে। এককথায় তিনিই সব হয়েছেন এবং সর্ব রূপ-নাম-ভাবের মধ্যে তিনিই খেলে চলেছেন। এর আদি অন্ত অনুমান করা যায় না।

প্রাণের মাহাত্ম্য

এই বিরাট বিশ্ব আকাশ বাতাস অগ্নি জল মৃত্তিকা প্রভৃতি চিদ্‌রসে পুষ্ট; অর্থাৎ চৈতন্যশক্তির অভিব্যক্তি সব। মাটিই হল মা। গাছপালার মধ্যে প্রাণ আছে। বৃক্ষের থেকে পাওয়া যায় অন্ন বস্ত্র ঔষধ। তাই কৃতজ্ঞতাবোধে দৈনন্দিন পূজা ও ক্রিয়াকর্মের মধ্যে তার ব্যবহার অপরিহার্য। প্রাণ ছড়িয়ে আছে সর্ববস্তুর মধ্যে। সব মিলে তার বৃহৎ রূপ। তখন সে মহাপ্রাণ। বৃহতের মধ্যে নিজেকে পরিপূর্ণ সঁপে দেওয়া হলে নিজের বৃহৎ পরিচয় পাওয়া যায়। অর্থাৎ পূর্ণ সমর্পণ দ্বারাই স্বরূপের পরিচয় মেলে। বৃহতের কাছে সমর্পণ অর্থ হল বৃহৎকে সর্বান্তঃকরণে বরণ করা, গ্রহণ করা ও 'মেনে মানিয়ে চলা'।

চিতিমাতার সর্বাণী নামের তাৎপর্য

মাকে সর্বগ্রাসী ও সর্বনাশী বলার কারণ হল তিনি সর্বরূপ আপন প্রকাশধারাকে আপনি সংহার করে নিজের

মধ্যে মিলিয়ে নেন। এই হল সর্বাণী মায়ের সর্বসংহারিণী রূপ। অর্থাৎ যিনি স্রষ্টী (কর্ত্রী ও নিয়ন্ত্রী), তিনিই পালয়িত্রী এবং তিনিই আবার সংহর্ত্রী। স্বয়ংপ্রকাশ প্রকাশের মাধ্যমেই ধরা দেন; অর্থাৎ প্রকাশের মাধ্যমেই প্রকাশককে জানা যায়। যেমন ফল দিয়ে হয় বৃক্ষের পরিচয়, সেইরূপ সন্তান বা প্রকাশ দিয়েই হয় মায়ের পরিচয়। মা কালী ও মা দুর্গার বাহ্যিক রূপ হল সংহারমূর্তি কিন্তু অন্তরে তাঁর স্নেহ প্রীতিও সমদৃষ্ট।

দিব্য প্রেমানুভূতি হলে সর্বপ্রকাশের মধ্যেই দিব্যদৃষ্টি খেলে। এই দিব্যদৃষ্টি লাভ করাই হল জীবন সাধনার উদ্দেশ্য।

পরম তত্ত্বানুভূতির রহস্য

স্থূল সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতর (কারণ) ও সূক্ষ্মতম (মহাকারণ)—এই চর্তুবিধ অভিব্যক্তির মধ্যে এক চৈতন্য সত্তা ও শক্তি খেলা করে। ব্রহ্মবোধে একে মানলে ব্রহ্মজ্ঞান, আত্মবোধে মানলে আত্মজ্ঞান, ঈশ্বরবোধে মানলে ঈশ্বরজ্ঞান, গুরুবোধে মানলে গুরুজ্ঞান, সত্তাবোধে মানলে সত্তার জ্ঞান, শক্তিবোধে মানলে শক্তির জ্ঞান ও মাতৃবোধে মানলে মাতৃজ্ঞান লাভ হয়।

সব দেবদেবীরই এক হাতে বরাভয় ও আশিস্ অপর হাতে অস্ত্র। জড়ত্ব ভেঙে প্রাণের চেতনা জাগাবার জন্য, তামসিকতা ও অজ্ঞানতাকে নাশ করার জন্য এবং মৃত্যুকে পরাভূত করার জন্য এই অস্ত্রের প্রয়োজন। আশিস্[১] হল দেব সত্তা-শক্তির অর্থাৎ দিব্য অস্তিত্ব ও ভাবের প্রমাণসুলভ আশ্বাস এবং তার ব্যবহারিক লক্ষণ।

বিশ্ব সৃষ্টি জগন্মাতার অভিনব লীলা প্রকরণ

সৃষ্টির আদিতে অব্যক্ত বীজের মধ্যে সকলেই প্রলীন ছিল। মায়ের ইচ্ছাই আবার সকলকে পৃথিবীতে নিয়ে এসেছে। মায়ের মত বড় চাষী আর কেউ নেই। 'আমি'-রূপ বীজ হতে মা জীবনরূপ ফসল তৈরি করেন।

দেহ হল স্পন্দিত প্রাণের আবরণ বা কোষ। একেই অন্নময় কোষ বলে। প্রাণ হল মনের আবরণ বা কোষ। এর নাম প্রাণময় কোষ। মন হল বুদ্ধির আবরণ বা কোষ। এর নাম মনোময় কোষ। বুদ্ধি হল আত্মার আবরণ বা কোষ। এর নাম বিজ্ঞানময় কোষ। কারণদেহ হল গাঢ় নিদ্রা। এ হল আত্মার কোষ। একে আনন্দময় কোষ বলে। এই কোষ আত্মার সঙ্গে যুক্ত বলে অনন্ত ব্যাপ্ত ও সূক্ষ্মতম। পঞ্চকোষের অধিশ্বরী মায়ের আরেক নাম কৌশিকী।

স্থূলদেহে অধিষ্ঠিত চৈতন্যের প্রকাশকেই জাগ্রত অবস্থা বলে। সূক্ষ্মদেহে অধিষ্ঠিত চৈতন্যের প্রকাশ ও খেলাকে স্বপ্নাবস্থা বলে। কারণদেহে অবস্থিত চৈতন্যের স্থিতিকে সুষুপ্তি অবস্থা বলে। সুষুপ্তি অবস্থাই হল সমষ্টি অজ্ঞান। এর অধিষ্ঠানচৈতন্য হল ঈশ্বর।

এক অধিষ্ঠানচৈতন্যই স্তরভেদে ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত

সমষ্টি কারণদেহের অধিষ্ঠানচৈতন্য হল ঈশ্বর। ব্যষ্টি কারণদেহের অধিষ্ঠানচৈতন্য হল প্রাজ্ঞ। সমষ্টি সূক্ষ্মদেহের অধিষ্ঠানচৈতন্য হল হিরণ্যগর্ভ বা সূত্রাত্মা অথবা মহাপ্রাণ বা সগুণ ঈশ্বর। ব্যষ্টি সূক্ষ্মদেহের অধিষ্ঠানচৈতন্যের নাম হল তৈজস। সমষ্টি স্থূলদেহের অধিষ্ঠানচৈতন্যের নাম হল বিরাট বা বৈশ্বানর এবং ব্যষ্টি স্থূলদেহের অধিষ্ঠানচৈতন্যের নাম বিশ্ব। এক পরমচৈতন্যই আপন স্বভাবপ্রকৃতি ও গুণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে চতুর্বিধ অধিষ্ঠাতা, চতুর্বিধ চৈতন্যের অবস্থা এবং চতুর্বিধ দেহরূপে অভিব্যক্ত হয়।

১। অভিনব সংজ্ঞা।

চৈতন্যসত্তা নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত কেবল সাক্ষী মাত্র। এ নিত্য অদ্বৈত ও নিত্য বর্তমান। একেই পরমতত্ত্ব ও পরমসত্য বলে। এর অনুভূতিই হল সর্বোত্তম অনুভূতি।

ঈশ্বরের ক্ষেত্র পর্যন্ত অনুভূতি দ্বৈতভাবের অন্তর্গত। কিন্তু চতুর্থ ও তুরীয় স্তরের অনুভূতি অদ্বৈতবাদের স্বরূপ। সর্বস্তরের সমান অনুভূতি হল নিত্য অদ্বৈতবাদের স্বরূপ।

শান্তি ও বিশ্রামের প্রভেদ

প্রাণ যখন ঘুমায় তখন তা জড় অবস্থায় থাকে। ঘুমের পর জাগরণ এবং নবজীবনের প্রচেষ্টা ও কর্মের উদ্যম করে সফলতা দান। তারপর আসে বিশ্রাম। বিশ্রাম প্রয়োজন। এ প্রাণের ব্যবহারিক অবস্থা বিশেষ। সৃষ্টির মধ্যে সর্বপ্রাণীর জন্য বিশ্রামের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু শান্তি ও বিশ্রামের মধ্যে পার্থক্য আছে। *** দেহেন্দ্রিয় ভূমিতে হল বিশ্রাম ও নিদ্রা। কিন্তু আত্মভূমিতে হল শান্তি।

বুদ্ধি ও বোধিস্বরূপ আত্মার মধ্যে পার্থক্য

বুদ্ধি হল দেহের অধিপতি। মন প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে সে দেহকে পরিচালিত করে। বুদ্ধি বোধি বা আত্মার জ্যোতি দ্বারা জ্যোতিষ্মান বা বুদ্ধিমান হয়ে সর্বকার্য সম্পন্ন করে। বুদ্ধির নিজস্ব কোন জ্যোতি নেই। বুদ্ধির আলো হতে পর্যায়ক্রমে মন অহংকার চিত্ত প্রাণ ও ইন্দ্রিয়াদি আলোক পেয়ে সক্রিয় হয়। চতুর্বিধ অন্তঃকরণের অধিপতি হল বুদ্ধি। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়ের অধিপতি হল মন। মন অহংরূপে হয় কর্তা এবং বুদ্ধি হল অধিকর্তা। মনের আর এক নাম চিতি ও চৈতী। বুদ্ধির নাম হল বিজ্ঞান। বুদ্ধি সর্বদেহ জুড়েই বিরাজমান। তার উপস্থিতি ও সমর্থন ব্যতীত অন্তঃকরণ সমষ্টিও নিষ্ক্রিয় হয় এবং বহিরিন্দ্রিয়াদিও নিষ্ক্রিয় হয়।

সুষুপ্তি বা কারণদেহ হল প্রকৃতিলয় অবস্থা। এই অবস্থায় তিনগুণ সাম্য অবস্থায় থাকে। এ-ই হল সমষ্টি অজ্ঞান বা ঈশ্বরের ক্ষেত্র। সমষ্টিজ্ঞানের অধিপতি হলেন ঈশ্বর। শুদ্ধসত্ত্বগুণের মাধ্যমে ঈশ্বর গুণাধীশ হয়ে বিরাজ করেন। অজ্ঞান দ্বারা তিনি বাধিত হন না। কিন্তু জীব সমষ্টি অজ্ঞানে এসে প্রাজ্ঞ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। প্রাজ্ঞ শব্দ অর্থ প্রকৃষ্টরূপে অজ্ঞ বা প্রচুর অজ্ঞ (প্রধান অজ্ঞ)। ঈশ্বরের বুদ্ধি শুদ্ধসত্ত্বপ্রধান, সেইজন্য অজ্ঞানমুক্ত। কিন্তু জীবের বুদ্ধি মলিনসত্ত্বপ্রধান অর্থাৎ তম-রজ দ্বারা অভিভূত বলে অজ্ঞানের দ্বারা বাধিত হয় অর্থাৎ অজ্ঞানের অধীন। অজ্ঞান ভেদ করে জীবের বুদ্ধি শুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ আত্মার সন্ধান পায় না।

জাগ্রত ও স্বপ্ন অবস্থায় বুদ্ধির কাজ হল গুণের সংবাদ পরিবেষণ করা। অন্তর বাহির উভয়ক্ষেত্রে সংগঠন ক্রিয়াই হল এর তাৎপর্য। বুদ্ধির এই কাজকে বিজ্ঞান বলা হয়।

বিজ্ঞানের পূর্ণতা হতেই আসে মুক্তি বা নির্বাণ অর্থাৎ প্রজ্ঞানস্থিতি। বিশ্বের সর্ববস্তুর সঙ্গে একাত্মলাভ হলেই হয় বিশ্বাত্মার অনুভূতি। এ-ই হল জীবনের উদ্দেশ্য।

এক আমির দ্বিবিধ পরিচয়

প্রত্যেকের মধ্যেই দুটি আমি আছে। এই দুই আমির একটি হল অহংকারের আমি, অপরটি হল শুদ্ধবোধের আত্মার আমি। প্রথম আমি হল 'কাঁচা আমি' বা 'ছোট আমি'। এ দেহাত্মবুদ্ধি যুক্ত। ব্যষ্টি ও সসীম ভাব হল এর বিশেষত্ব। 'আমার বোধ' হল এর ব্যবহার। 'আমার বোধ'-ই হল মমত্ববোধ। 'কাঁচা আমির বোধ' হল অভিমান। অভিমান ও অহংকারের ক্ষেত্রই হল সংসার। কিন্তু দ্বিতীয় আমি হল আত্মার বা শুদ্ধবোধের আমি। একেই বলে

'পাকা আমি' বা অহংদেব। এই আমি নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত অজর অমর অপাপবিদ্ধ অনঙ্গ অসঙ্গ অভঙ্গ ও অখণ্ড। প্রথমোক্ত আমি (অহংকারের আমি) হল দ্বিতীয় আমির আভাস বা প্রতিবিম্ব। সুতরাং তা অনিত্য ও মিথ্যা। শেষোক্ত আমিকে প্রথম আমি জানে না। এই আমির পরিচয় শুধু আমিই জানে। অর্থাৎ আত্মাই আত্মাকে জানে, অহংকার জানে না। অহংকারের আমির পরিচয় আত্মার আমি জানে। অর্থাৎ 'কাঁচা আমির' পরিচয় 'পাকা আমি' জানে। কাঁচা আমির প্রভাবেই সংসারী মানুষ চলে; কিন্তু তারা এর উৎপত্তি বা কারণ জানে না।

'আমি ও আমার বোধের' মূলে আছে 'পাকা আমি বোধ' বা আত্মবোধ। আত্মবোধের স্বরূপ হল আনন্দময়। আত্মবোধ নিত্য বিশুদ্ধ ও অখণ্ড বলে আত্মানন্দও নিত্য বিশুদ্ধ ও অখণ্ড। এই আনন্দই সর্বকারণের কারণ। এই আনন্দই সর্বপ্রকাশের সারতত্ত্ব এবং সবকিছুর অন্তর্নিহিত সত্তা, সর্বজীবনের মৌলিক উপাদান এবং সর্বত্রই বিদ্যমান।

আত্মার পরিচয়

আত্মা হল সচ্চিদানন্দঘন। অখণ্ড আত্মাই হল পরমাত্মা এবং এ-ই পরব্রহ্ম। ব্রহ্মের আমি বা আত্মার আমি হল অখণ্ড সচ্চিদানন্দের আমি। এই আমির সৎ ও চিৎ অংশ পুরুষ-প্রকৃতিরূপে অভিব্যক্ত হয়। সৎ ও চিৎ হল জড় (প্রকৃতি) ও মন (পুরুষ) বা জীবাত্মা। সৎ হল ক্রিয়াশক্তি, চিৎ হল জ্ঞানশক্তি। এদেরই অপর নাম প্রকৃতিপুরুষ। এই সৎ চিৎ-এর মধ্যে আনন্দসত্তা নিহিত আছে। সৎ চিৎ-এর মাধ্যমে আনন্দ পূর্ণমাত্রায় উদ্ভাসিত হওয়াই হল সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য। পুরুষ-প্রকৃতির মিলনের ফলে হয় সৃষ্টি। এই সৃষ্টিই হল আনন্দের সন্তান বা প্রকাশ। আনন্দই হল একের তত্ত্ব। সৎ ও চিৎ-এর অস্তিত্ব তার বিজ্ঞানের শাশ্বত ভূমি। আনন্দই সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারের মূল কারণ। আনন্দ হতে সবাই জাত হয়ে, আনন্দের দ্বারা, আনন্দের মধ্যে প্রতিপালিত হয়ে পরিণামে আনন্দের মধ্যেই বিলীন হয়। সচ্চিদানন্দ অবিভাজ্য হলেও সৎ ও চিৎ-এর অংশে জীবজগৎ এবং আনন্দের অংশে ব্রহ্ম আত্মা ঈশ্বর। অনন্দেতেই সৎ ও চিৎ-এর পূর্ণতা। সৃষ্টির মধ্যে সৎ হল জড়, চিৎ হল জীবন এবং আনন্দ হল অমৃতত্ব। সৎ-এর মধ্যে চিৎ সুপ্ত ভাবে আছে এবং চিৎ-এর মধ্যে আনন্দ সুপ্ত ভাবে আছে। কিন্তু আনন্দের মধ্যে সৎ ও চিৎ পূর্ণমাত্রায় প্রকাশমান বা অভিব্যক্ত।

জ্ঞান ও অজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য

সাধারণ মানুষ অজ্ঞানের বুকেই বাস করে। তম হল অবিদ্যা অজ্ঞান বা জ্ঞানপ্রকাশের আদি অবস্থা। একে অবিদ্যাশক্তি বা আদ্যামাতা বলে। আদ্যাশক্তি হল অব্যক্ত। এই অব্যক্তই ব্যক্ত হয়ে সৃষ্টিরূপে প্রকাশ পায়। প্রাণের অব্যক্ত অবস্থা থেকে প্রাণের অভিব্যক্তি হয়। তারপর পূর্ণ অবয়ব ধারণ করে তা প্রকাশিত হয় মায়েরই ক্রিয়াকৌশলে। মাটি হল শক্তির তম অবস্থা। এখানে প্রাণ নিদ্রিত আছে। মাটির ভিতরে যে রস আছে তা-ই প্রাণশক্তির বিশেষ রূপ। এই প্রাণশক্তি অবয়ব বা কায় অর্থাৎ অঙ্গ বা শরীর ধারণ করে বাইরে প্রকাশ পায়। একেই বলে প্রাণের অভিব্যক্তি বা রূপায়ণ।

আত্মসিদ্ধি প্রকৃতিবিরুদ্ধ নয়

প্রতি ব্যষ্টি জীবন প্রকৃতিশক্তির অধীন। মানুষ পরতন্ত্র। আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান চর্চার মাধ্যমে সে তার স্বতন্ত্র স্বরূপ অবগত হতে পারে কিন্তু বিশ্বপ্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করতে পারে না। কোন ব্যষ্টি জীবনই বিশ্বপ্রকৃতিকে অতিক্রম করতে পারে না।

যেমন সাগর হতে সৃষ্ট নদী বহু দেশ ও পথ অতিক্রম করে সাগরে মিশে সাগরময় হয়ে যেতে পারে কিন্তু পৃথক সাগর হতে পারে না, সেইরূপ ঈশ্বর হতে জাত জীব ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে এবং ঈশ্বরীয় ভাব লাভ করতে পারে কিন্তু দ্বিতীয় একজন ঈশ্বর হতে পারে না। অর্থাৎ ঈশ্বরের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারের পূর্ণ ক্ষমতা লাভ করতে পারে না। সমষ্টি শক্তির প্রভাবই হল ঈশ্বরীয় মহিমা। এই মহিমা দেখে শুনে জীব যখন মোহিত হয় এবং অসহায় বোধ করে তখন সে ঈশ্বরের শরণাগত হয়।

সকাম ও নিষ্কামের বৈশিষ্ট্য

অভাববোধ হতেই সাধনা আরম্ভ হয়। ধর্মসাধনার প্রথম অবস্থায় সকামভাব যুক্ত থাকে। তারপর ক্রমপর্যায়ে চিত্ত শুদ্ধ হলে নিষ্কামভাবের উদয় হয়।

আত্মসমর্পণের তাৎপর্য

সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতি আত্মসমর্পণ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই সমগ্র সমর্পণ নীতিই হল ঈশ্বরের আত্মলীলার তাৎপর্য। সমুদ্রের জলরাশি সমগ্র বিশ্বপ্রাণের এক অভিন্ন উপকরণ হয়েও জীবজগতের অন্তরে ও বাইরে পুষ্টি তুষ্টি ও অন্যান্য প্রয়োজন বিশেষভাবে সম্পাদন করে। সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতির অন্তর্নিহিত ভিন্ন ভিন্ন শক্তির বিভাগগুলির মধ্যে পরস্পর পরিপূরক বা সম্পূরক সম্বন্ধ আছে। সমগ্র প্রকৃতি পরমপুরুষের সেবায় আপনাকে আহুতি দেয়। সত্তার বুকে প্রকৃতিশক্তি তার সমস্ত বৈভব ও সম্পদ প্রকাশ করে সঁপে দেয়।

অদ্বয়তত্ত্ব ও সত্তার মহিমা

অদ্বৈতবাদীর মতে ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। কিন্তু দ্বৈতবাদীর মতে জগৎ ব্রহ্মেরই পরিণাম বা বিবর্ত। ঈশ্বর আপন চৈতন্য থেকেই জগৎ সৃষ্টি করছেন। ঈশ্বরীয় প্রকৃতি হল চিতিশক্তি। এই চিতিশক্তির অভিব্যক্তি হল সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড। প্রতিটি সৃষ্ট বস্তুর মৌলিক উপাদানই হল চৈতন্য। কিন্তু তাদের বাহ্যিক আকৃতি ও প্রকৃতির মধ্যে গুণগত পার্থক্য আছে। সত্যের প্রকাশ সত্যস্বরূপের তুলনায় সমান সত্য না হলেও একেবারে মিথ্যা নয়। কারণ উপাদান সত্তা সবার মধ্যে এক। এই সত্তা অখণ্ড অবিভাজ্য ও অপরিহার্য। অখণ্ড ভূমা আত্মসত্তা বা ব্রহ্মসত্তার অন্তর্গত হল সমগ্র সৃষ্ট বস্তু। বৈচিত্র্য নানাত্ব বহুত্ব হল বাহ্যিক বা ব্যবহারিক রূপ। এদের অন্তরসত্তা হল এক নিত্য শাশ্বত সত্য।

এক তুলো দিয়েই যেমন নানাবিধ পোশাক তৈরি হয় এবং এক সোনা দিয়েই যেমন নানাবিধ অলংকার তৈরি হয়, সেইরূপ এক বস্তু বা চৈতন্য উপাদান দিয়েই সমগ্র বিশ্বজগৎ সৃষ্ট। সমগ্র বৈচিত্র্যের মধ্যে এই একতত্ত্বকে সম্যক্‌রূপে জানা-ই হল আত্মদর্শন, ঈশ্বরদর্শন, ব্রহ্মদর্শন বা সত্যদর্শন[১]।

একতার পরিণাম

কর্মের ফল হল অভিজ্ঞতা। বহু অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়ে এক বিশেষ বোধের রূপ নেয়। এইরূপ বিশেষ বোধ বহুল ভাবে সঞ্চিত হয়ে পূর্ণতার টানে পূর্ণতার দিকে সবেগে প্রবাহিত হয় এবং তার সঙ্গে মিশে একীভূত হয়ে যায়। এইভাবেই ব্যষ্টি চৈতন্য সমষ্টি চৈতন্যের সঙ্গে তাদাত্ম্য লাভ করে।

১। স্বানুভূতির দৃষ্টিতে।

ধর্ম ও কর্মের তাৎপর্য

ব্যষ্টির স্বার্থ ত্যাগ করে সমষ্টির স্বার্থের নিমিত্ত কর্ম করাই হল ধর্মের তাৎপর্য। শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম হল অধর্ম। শাস্ত্রবিহিত কর্মই হল ঈশ্বরীয় কর্ম বা ধর্ম। এইরূপ ধর্ম ও কর্মের সাধনের মাধ্যমে তপোবল লাভ হয়।

সত্যের মহান তাৎপর্য

সত্যই হল পরম ধর্ম এবং পরম তপঃ। সুতরাং তপোবলই হল সত্যের বল। আবার সত্যের বলই হল তপোবল। সত্য তপস্যা দ্বারা লব্ধ। বিনা তপস্যায় সত্য লাভ করা যায় না। সত্যের পরিপন্থী হল মিথ্যা। মিথ্যার দোসর হল সকাম ভাব। নিষ্কাম ভাবই হল সত্যলাভের উপায়। নিষ্কাম ভাবের সাধনার দ্বারাই তপোবল লাভ হয়। তপোবলের প্রভাবেই মিথ্যার প্রভাব দূরীভূত হয়। সত্যনিষ্ঠ হলে জ্ঞাননিষ্ঠা বাড়ে। সত্যস্বরূপই হল ব্রহ্ম আত্মা ঈশ্বর। আবার ব্রহ্ম আত্মা ঈশ্বরই হল বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ। সুতরাং সত্য ও বিশুদ্ধ জ্ঞান সমার্থবোধক। এই জ্ঞান নিত্য শাশ্বত অমৃত নির্বিকার অখণ্ড অনন্ত অপরিণামী।

মা-ই মায়ের উপমা স্বয়ং

আত্মারূপী মা সকলের হৃদয়েই আছেন আবার সর্বজীব বিশ্বাত্মা বা বিশ্বমায়ের হৃদয়েই বিরাজ করে। উভয় ক্ষেত্রেই এক আত্মা সেই মা।

সর্ববোধের আদি মধ্য অন্তে মা-ই স্বয়ং সর্বতত্ত্বের সমাধান

একবোধে, সমবোধে, আপনবোধে, মাতৃবোধে, গুরুবোধে, আত্মবোধে, ঈশ্বর বা ব্রহ্মবোধে সবকিছু 'মেনে মানিয়ে চললে' তাঁর কৃপা লাভ হয়। তার ফলে সবাই অমৃতময়, আত্মময়, ব্রহ্মময়, সত্যময় বা মাতৃময় অনুভূত হয়। অখণ্ড ভূমাতত্ত্বের এ-ই হল পরিচয়।

ভূমা একের পরিচয়

অখণ্ড একেকে দেখা, জানা, একে থাকা এবং এক হয়ে যাওয়াই হল পরম পুরুষার্থ বা পরম গতি।

ধ্রুবাস্মৃতিই গতি ও স্থিতির মূলে

গতি হল স্থিতির অংশ। উভয়েই পরস্পর যুক্ত হয়ে চলে। কর্মই হল গতি। স্মৃতি ছাড়া কোন কর্মই হয় না। স্মৃতির পরিধি যত বাড়ে কর্ম বা গতিও তত প্রসারিত হয় এবং অন্তর ততই পুষ্ট হয়। বোধের ধ্রুবাস্মৃতিই হল গুরুর স্বরূপ। স্মৃতিময় হল গুরুমূর্তি। প্রাণ ও মনের স্পন্দনই হল কর্ম বা গতি। এ-ই হল গুরুর চরণ[১]। প্রাণের স্পন্দন স্মৃতিকে রক্ষা করে ও ধরে রাখে। গুরু এই স্মৃতিকে পোষণ করেন।

ধর্মের রহস্য

নিষ্ক্রিয়তা প্রাণের ধর্ম নয়। সক্রিয়তাই হল প্রাণের ধর্ম। প্রাণের পুষ্টির জন্য নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে না থেকে কর্ম করে যেতে হয়। গুরুবোধে, আত্মবোধে বা ঈশ্বরবোধে কোন কর্মই উপেক্ষণীয় নয়, হেয় বা ছোট নয়। তত্ত্বত সব কর্মই সমান। কর্মের মাধ্যমে তাপের সৃষ্টি হয় ও প্রাণের স্ফুরণ হয় এবং তার ফলে জড়ত্বের আবরণ ভেঙ্গে

১। তত্ত্বদৃষ্টির ফলশ্রুতি।

যায়। সদসৎ কর্মের ফল পুষ্ট হয়ে ধর্মের রূপ নেয়। অর্থাৎ কর্মের অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়ে ও পরিশোধিত হয়ে ধর্মে পরিণত হয়। ধর্মসাধনের ফলে জ্ঞান লাভ হয়। জ্ঞানের পরিণাম হল বিজ্ঞান। বিজ্ঞানরূপেই গুরুর অভিব্যক্তি হয়।

দুঃখ-কষ্ট, রোগ-শোক, আঘাত-বেদনা, প্রভৃতির মাধ্যমে বিশেষভাবে যে অভিজ্ঞতা লাভ হয় তা অন্তরের বোধকে জাগ্রত করতে সাহায্য করে। সর্ববিধ প্রতিকূলতার মধ্য থেকে যে শিক্ষা লাভ হয় তা দ্বারা স্মৃতির বিকাশ হয়। বিনা আঘাতে অন্তরের সুপ্ত চেতনা জাগ্রত হয় না। বেদনার মাত্রা গভীর হলে অন্তরে তীব্র বেদন বা সংবেদনের সৃষ্টি হয়। সংবেদনের অনন্ত পরিণামই বেদস্বরূপ। এই বেদই হল গুরুমূর্তি।

মহাপ্রাণের তাৎপর্য

প্রাণের পূর্ণরূপই হল প্রজ্ঞা বা আত্মা। এই প্রাণের কখনও নাশ নেই। দেহীরূপে তা প্রতি দেহেই বিরাজমান। একেই জীবাত্মা বলে। দেহ প্রাণেরই অংশ। কিন্তু তা বিকারী ও পরিবর্তনশীল। দেহীর কিন্তু বিকার নেই। দেহী নিত্য নির্বিকার।

সন্ন্যাসের তাৎপর্য

সন্ন্যাসের মানে ত্যাগের দ্বারা পূর্ণ শান্তিতে প্রতিষ্ঠা। সৎ-এর ন্যাসই হল সন্ন্যাস। ন্যাসের অর্থ হল ত্যাগ করা ও বিশেষভাবে সাজানো। সত্যবোধের স্মৃতিগুলিকে সম্যকরূপে ন্যাস করে বা সংযুক্তভাবে সাজালে স্বভাবের মধ্যে সামঞ্জস্য ফুটে ওঠে, সমবোধের স্মৃতি স্বভাবের মধ্যে সক্রিয় হয়ে ওঠে। তার বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় যে-ভাবের মাধ্যমে তা-ই সন্ন্যাস[১]।

বিশেষণের ন্যাস হলেই বিশেষ্যের সন্ন্যাস হয়। নাশ করার মূল উদ্দেশ্য হল সন্ন্যাসে প্রতিষ্ঠা। অহংকার অভিমান স্বার্থ ব্যক্তিগত পছন্দ ও অপছন্দ প্রভৃতি স্মৃতি হল বিশেষণ। এই বিশেষণগুলিই হল সসীমতা ও বন্ধনের কারণ। বিশেষণ নাশ হল সন্ন্যাস এবং সন্ন্যাসের ফল হল মুক্তি।

উত্তম অধিকারী শ্রবণমাত্র সত্যের ফল লাভ করে। মধ্যম অধিকারী শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসনের মাধ্যমে সত্যের ফল লাভ করে। সাধারণ অধিকারী গুরু-নির্দিষ্ট কর্ম সম্পাদন করে দেহ মনকে শোধন করে ধীরে ধীরে সৎসঙ্গের বিষয় গ্রহণ ও অনুধাবন করার যোগ্যতা লাভ করে।

পরমহংসের পরিচয়

অদ্বৈতজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হলে পরমহংস অবস্থা হয়। *** পরমহংস অবস্থায় নিজ প্রাণের স্পন্দনের সঙ্গে বিশ্বপ্রাণের স্পন্দনের ঐক্য ও সমতা অনুভূত হয়। এই অনুভূতিই হল একাত্মবোধের অনুভূতি, পরমতত্ত্ব ও অমৃতত্বের জ্ঞান। এই জ্ঞানের অধিকারী গুণাতীত দ্বন্দ্বাতীত ভাবাতীত ও ভেদাতীত বিশুদ্ধ বোধস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। অখণ্ড বিশুদ্ধ একবোধে দ্বৈতের ভান থাকে না। সে আপনাকে ব্যতীত দ্বিতীয় কাউকেও আর দেখে না, জানে না এবং অনুভব করে না। এই হল ব্রহ্মজ্ঞান আত্মজ্ঞান বা ঈশ্বরস্বরূপের লক্ষণ।

ভূমাবোধের স্মৃতিই হল ব্রহ্মস্মৃতি বা আত্মস্মৃতি। এর সাহায্যে মন ব্রহ্ম বা আত্মবোধে প্রতিষ্ঠিত হয়। মহান আদর্শই মনকে মহৎ লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়। মহতের ধারণা হতেই মহতের স্মৃতি তৈরি হয়। প্রকৃত জ্ঞানী সমবোধে প্রতিষ্ঠিত থেকে সমবোধে সকলকে মান দেয়। *** সবাইকে মান দেবার অর্থ হল একবোধ সমবোধ বা আপনবোধে

১। অভিনব সংজ্ঞা।

সকলকে দেখা। সকলকে মান দেওয়াই হল পূর্ণতার লক্ষণ। জ্ঞানী সকলের মধ্যে আপনাকে ও আপনার মধ্যে সকলকে একবোধে জেনে আপনাকে আপনি অর্থাৎ নিজেকেই নিজে প্রণাম করে।

আপনবোধের তাৎপর্য

ঈশ্বরপ্রীতি বা·আত্মপ্রীতি বলতে সর্বভূতে প্রীতিকেই নির্দেশ করে। আবার সর্বভূতে প্রীতি বা সমদৃষ্টি বলতে আত্মজ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞান বা ঈশ্বরপ্রেমকেই বুঝায়। আত্মা বা ঈশ্বরকে পরমপ্রেমাস্পদ বলা হয়। সুতরাং প্রেমের ধর্ম হল সমত্ব একত্ব অমৃত নিত্য ও শাশ্বত। রসব্রহ্ম, আনন্দব্রহ্ম, আনন্দ আত্মা, মধুব্রহ্ম, মধু আত্মা পূর্ণ প্রেমস্বরূপেরই পরিচয়। এই আত্মপ্রেম শিক্ষা দেয়—সকলকে সমবোধে আপনবোধে গ্রহণ করতে ভালবাসতে ও মানতে। আত্মতত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্ব পূর্ণ অদ্বৈতজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত বলে বিশুদ্ধ প্রেমের স্বরূপকে একমাত্র এর মাধ্যমেই অবগত হওয়া যায়। আত্মজ্ঞান হল প্রজ্ঞান। এ হল সর্ব জ্ঞান-বিজ্ঞানের অধিষ্ঠান। পরমাত্মা অখণ্ড ও নিত্য অদ্বৈত। এই আত্মা অতিরিক্ত আত্মার মধ্যে দ্বিতীয় কিছু নেই। আত্মবিজ্ঞান ও সর্ববিজ্ঞান সর্বধর্মের অধিষ্ঠান। আত্মজ্ঞানে সর্ব মতপথের সমাধান মেলে।

প্রেমস্বরূপের পরিচয়

প্রকৃত ভালবাসা ভাললাগার উপর নির্ভর করে না। প্রকৃতির উন্নত অবস্থায় তমোগুণ ও রজোগুণের শোধন হয় এবং সত্ত্বগুণের প্রভাব বাড়ে। সত্ত্বগুণী স্বভাবের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ভালবাসারূপ বৃত্তি আপনি ব্যক্ত হয়ে পড়ে। এ অন্তরের ধর্ম। এ আরও উন্নত অবস্থায় পরিশোধিত হয়ে শুদ্ধ সত্ত্বগুণের প্রভাবে আপনবোধ বা একত্ববোধের বৈশিষ্ট্য বা স্বতন্ত্রতাকে পূর্ণভাবে প্রকাশ করে। তখনই এর নাম হয় প্রেম। *** সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্ম আত্মা ঈশ্বর ভগবানের স্বরূপই হল প্রেমময়। এই পূর্ণ প্রেমস্বরূপ ভগবান আনন্দের আতিশয্যে লীলামানসে বহু নামরূপের মাধ্যমে নিজেকে অভিব্যক্ত করে আত্মলীলা আস্বাদন করেন। আপন প্রেমানন্দে আপনি মগ্ন হয়ে তাঁর বিশ্বলীলায় আপনার স্বরূপমহিমা আপনি ব্যক্ত করেন এবং আপনিই আস্বাদন করেন। এই আত্মলীলা হল তাঁর স্বকীয়তা, আপনতা, স্বভাবধর্ম, খেয়াল ও ইচ্ছা।

অখণ্ড ভূমাতত্ত্বই হল প্রাচ্যের জীবনাদর্শ ও লক্ষ্য

প্রাচ্যদেশের আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানের সারতত্ত্ব হল অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম আত্মা ঈশ্বর। সমদৃষ্টি সমজ্ঞান আপনবোধ বা অদ্বয়জ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান, আত্মজ্ঞান, ব্রহ্ম-আত্মা-ঈশ্বর ঐক্য জ্ঞান, সদানন্দ, চিদানন্দ ও প্রেমানন্দ প্রভৃতি হল তাঁর অনুভূতি। নামরূপের বৈচিত্র্যের মধ্যে, নানাত্ব বহুত্বের মধ্যে, একত্ববোধ সমত্ববোধ এবং প্রীতিপূর্বক আপনবোধ বা নিজবোধকেই অদ্বয়জ্ঞান বলে। এই অদ্বয়জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হল সচ্চিদানন্দস্বরূপ। এই আপনবোধ বা নিজবোধের প্রকাশই হল মধু প্রেম বা বিশুদ্ধ ভালবাসা[১]। এই আপনবোধের তাৎপর্যই হল নিজের মধ্যে সবাইকে এবং সবার মধ্যে নিজেকে দেখা। প্রেম ভালবাসাই হল আত্মা বা নিজবোধস্বরূপ সত্তার সর্বোত্তম স্বভাবধর্ম।

ছোট-বড়, প্রিয়-অপ্রিয়, সাধু-অসাধু, জ্ঞানী-অজ্ঞানীর মধ্যে এমনকি অতিবড় পাষণ্ড ও পাপীর মধ্যেও সচ্চিদানন্দঘন নিজবোধস্বরূপ পরমাত্মা পরব্রহ্ম পরমেশ্বর ভগবান নিত্য বিদ্যমান। সর্বপ্রকাশের তিনিই একমাত্র অধিষ্ঠান ও মৌলিক উপাদান।

১। স্বানুভূতির দৃষ্টিতে।

আত্মলীলার মহিমা

তাঁর বিশ্বলীলায় নিজের অনন্ত বেশের মধ্যে স্বয়ং পাপীর বেশে পাপের প্রকৃতি বা পোশাক পরে, পাপের দৃষ্টান্ত নিয়ে, নিজেই প্রভু উপস্থিত হন। এইরূপ বহুবেশ ধারণ করে নিজের সঙ্গে নিজের মিলন বা লীলাখেলা হল তাঁর স্বভাব[১]। স্বপক্ষ ও প্রতিপক্ষরূপে দ্বন্দ্ব, বিরোধ ও মিলনের মাঝে এই ঈশ্বর বা আত্মাই খেলে চলেছেন। অর্থাৎ আপনার স্বভাববিজ্ঞানকে অবলম্বন করে নিজেকে স্বপক্ষ বিপক্ষ ও প্রতিপক্ষরূপে স্বেচ্ছায় বিভক্ত করে নিজের সঙ্গে নিজের দ্বন্দ্ব, বিরোধ ও মিলনের মাধ্যমে অবিরাম লীলা করে চলেছেন। সর্ববেশে সর্বরূপে সর্বনাম ও সর্বভাব এবং সর্বকর্মের মধ্যে গুণের মাত্রা সকলরকম বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে সবার মধ্যে তিনি নিজে বিচ্ছেদ-মিলনের ভাব ধরে আনন্দখেলায় সতত রত আছেন। নিজেই তিনি নিজেকে আপন যোগমায়া প্রকৃতির দ্বারা আবৃত করে অজ্ঞান সেজে আবার জ্ঞানের সাধন করেন ও শুদ্ধজ্ঞান খুঁজে বেড়ান। এ যেন নিজের সঙ্গে নিজের লুকোচুরি খেলা। বিরুদ্ধ ভাব অবস্থা গুণ ও কর্মের প্রতিপাদন বা প্রমাণ দিয়ে তাঁর এই খেলা প্রকাশ পায়। এইরূপ না হলে তাঁর খেলা জমে না। আত্মলীলা সম্পাদনের জন্য তিনি অজ্ঞানমানবের বেশে অবতীর্ণ হয়ে আবার জ্ঞানের বেশে তারই পাশে মিলেন এসে। অজ্ঞানীদের মধ্যে সপক্ষ বিপক্ষ সেজে কখনও দ্বন্দ্ব করেন এবং দ্বন্দ্বের ফল নিজেই ভোগ করেন। আবার জ্ঞানী সেজে তিনি দ্বন্দ্বের সমাধান করেন।

ভগবতী মাতার সত্য পরিচয়

সচ্চিদানন্দস্বরূপের অপর নাম মা। এই মা সবই হয়ে আছেন। সবকিছুই হল তার পরিচয়। তাঁকে বাদ দিয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অন্য কিছু পাওয়া যায় না। মায়ের অনন্ত বক্ষে তাঁর অনন্তশক্তির অভিনব লীলাখেলাও অনাদি অনন্ত। মায়ের মহিমার শেষ নেই। মা নিজেই নিজের উপমা। সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হল তাঁর প্রতিমা। সর্ব রূপ-নাম-ভাব সচ্চিদানন্দ মায়েরই লীলাবিলাস মাত্র। তাঁর ইচ্ছা সকলের ইচ্ছারূপে ক্রিয়া করে। তাঁর বোধ সকলের বোধরূপে, তাঁর স্বভাব সকলের ভাব ও প্রকৃতিরূপে, তাঁর মহানাম সকলের নামরূপে, তাঁর অনির্বচনীয় রূপ সকলের রূপের মধ্যে ব্যক্ত হয়ে আছে। অর্থাৎ তাঁর থেকেই সব, তাঁর জন্যেই সব, তাঁর দ্বারাই সব, তাঁর সঙ্গেই সব, তিনি-তেই সব এবং সবেতেই তিনি স্বয়ং[২]। সবই মা, মা-ই সব। সেই জন্য মায়ের নাম সর্বাণী। সর্ব হল শিব এবং সর্বাণী হল শিবানী। শিব ও শিবানী অর্থাৎ সত্তা ও শক্তি অভিন্ন অখণ্ড অদ্বয় অব্যয় অমৃতময়।

মা-ই পরমাত্মা, পরব্রহ্ম, পরমেশ্বর, নির্গুণ-সগুণ, প্রজ্ঞান-বিজ্ঞান, বিশ্বাতীত-বিশ্বমূর্তি, ব্যষ্টি-সমষ্টি সবই। তিনিই বিশ্বাত্মা বিশ্বপ্রাণ বা মহাপ্রাণ সমগ্র ব্যষ্টি আত্মা ও ব্যষ্টি প্রাণের অধিষ্ঠান। সর্বজীবন হল তাঁর প্রকাশসন্তান অথবা তিনিই স্বয়ং। জীবনের বহিঃসত্তা, অন্তরসত্তা ও তুরীয়সত্তা সব নিয়েই তাঁর পরিচয়। সুতরাং এই মা-ই স্বয়ং বিশ্বরূপে ও ব্যাষ্টিরূপে অর্থাৎ সমষ্টি ও ব্যষ্টি দেহরূপে, সমষ্টি নাম ও প্রাণ এবং ব্যষ্টি নাম ও প্রাণরূপে, সমষ্টি ভাব ও ব্যষ্টি ভাবরূপে এবং সমষ্টি বোধ ও ব্যষ্টি বোধরূপে আপনাকে ব্যক্ত করে স্বভাবলীলায় রত আছেন।

জীবনের চরম উদ্দেশ্য

জীবনের উদ্দেশ্য প্রাণকে ধরে সাধনা করে জীবনের উৎসে পৌঁছানো, অর্থাৎ ব্যষ্টি জীবনের ও সমগ্র সত্তার সমষ্টিযোগের মাধ্যমে বিশ্বজীবনের সমগ্র সত্তার সঙ্গে সর্বতোভাবে মিশে এক হয়ে যাওয়া।

১। অদ্বয় বোধের ফলশ্রুতি। ২। অভিনব মাতৃ পরিচয়।

আত্মপ্রেমী মায়ের দিব্য মহিমা

আত্মপ্রেমী মা-ই হলেন প্রজ্ঞানমাতা, বিজ্ঞানমাতা, জ্ঞানমাতা ও অজ্ঞানমাতা। তাঁরই অপর নাম প্রজ্ঞা ও প্রাণ। এই মহাপ্রাণের বিস্তারই হল বিশ্বসংসার। নিজেকে তিনি একবার বাইরে ছড়িয়ে দেন নানাত্বের মধ্যে আবার নিজেকে গুটিয়ে নেন অন্তরে একত্বের মধ্যে। তাঁর এই লীলাখেলারও শেষ নেই, মহিমারও শেষ নেই। তাঁর বহিরাবরণ, দেহ-আধার, পোশাক প্রভৃতির বিকার হয়; কিন্তু অন্তঃপ্রাণচৈতন্য বা দেহীরূপী আত্মার কোন বিনাশ নেই। প্রাণের ক্ষয় নেই। যে আধারের মধ্যে প্রাণ নিজের স্বরূপ ক্রমধারায় প্রকাশ করতে থাকে সেই আধারের বিকার বা পরিবর্তন হয়। আধারের রূপান্তর হয় বলেই আধার ক্ষয়িষ্ণু। প্রাণ তার স্বরূপ মহিমা পূর্ণভাবে প্রকাশ করার জন্য অযোগ্য আধারকে পরিত্যাগ করে যোগ্যতর যোগ্যতম দেহ বা আধার ধারণ করে। এক একটি দেহের মধ্য দিয়ে তার ক্রমবর্দ্ধমান মহিমার প্রকাশ পূর্বাপেক্ষা অধিকতর বিস্তৃতি লাভ করে। তার ইচ্ছা গতি শক্তিকে বাড়িয়ে দেয় পূর্ণতা প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে। যতদিন পর্যন্ত পূর্ণতা প্রাপ্তি না হয় অর্থাৎ প্রাণের পূর্ণ বিকাশ না হয় ততদিন পর্যন্ত দেহকে আশ্রয় করে তার সাধন চলতে থাকে। যে-দেহে তার প্রকাশ পূর্ণভাবে সম্ভব হয় সেই দেহ হল পরিপূর্ণ শুদ্ধ আধার। তার মধ্যে পূর্ণপ্রাণের খেলা অর্থাৎ ভগবৎ অভিব্যক্তি বা ঈশ্বরীয় সত্তার পূর্ণপ্রকাশ হয়। এইসব শুদ্ধ আধারযুক্ত মহাপ্রাণের প্রকাশকে দিব্যজীবন, মহাপুরুষ বা অবতারপুরুষ বলা হয়।

স্বানুভূতির পরিচয়

বিশ্বাত্মজ্ঞানের অনুভূতিতে ব্যষ্টি আত্মার মুক্তি হয়। আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হলে সমগ্র বিশ্বকে আপনার অঙ্গ বা আপন সত্তার বিস্তার বা অভিব্যক্তি বলে অনুভূত হয়। এই অনুভূতি হল স্বানুভূতি। স্বানুভূতি হলেই মহামুক্তি মহানন্দ ও মহাশান্তি লাভ হয়।

চতুষ্পদ জ্ঞানে অহংকারের ভূমিকা

অহংকার অভিমান যতখানি জানে তার দ্বিগুণ থাকে অজানা। এই তিন অংশ অজানাকে বাদ দিয়ে একাংশ জ্ঞানে আত্মানুভূতি হয় না। এই একাংশ জ্ঞানকে অজ্ঞান বলা হয়। দ্বিতীয় অংশের সঙ্গে পরিচিত হলে জ্ঞান হয়, তৃতীয় অংশের সঙ্গে পরিচিত হলে বিজ্ঞান হয়, এবং চতুর্থ অংশের সঙ্গে পরিচিত হলে প্রজ্ঞানময় আত্মার স্বরূপ প্রকাশ পায়। এই চতুষ্পদ জ্ঞান হল আত্মজ্ঞানের চার প্রকার অভিব্যক্তি। আত্মজ্ঞান অখণ্ড ও অনন্ত। খণ্ডজ্ঞান এর অংশমাত্র। খণ্ডজ্ঞানের ধারণা দ্বারা অখণ্ডকে দেখা, বোঝা ও জানা যায় না। এক অংশ জ্ঞানের সঙ্গে অপর তিন অংশ জ্ঞানকে মানতে পারলে চতুষ্পদ জ্ঞানের যোগ হয়। তখন অহংকার অভিমানের লেশমাত্র থাকে না। অখণ্ডকে অখণ্ডবোধেই মানতে হয়। তাহলে অখণ্ডবোধের ধারণা জন্মে। অখণ্ডের ধারণা সিদ্ধ হলে শুদ্ধজ্ঞানের অভিব্যক্তি হয়। অখণ্ডের ধারণা না আসা পর্যন্ত কারও শুদ্ধজ্ঞানের অনুভূতি হয় না। অখণ্ড বোধের এক চিন্তা ও এক ভাবকে কেন্দ্র করে অখণ্ডের সেবা করতে হয়। তাহলেই জীবনে পূর্ণতা লাভ সম্ভব হয়।

অখণ্ডের শরণাগতিই হল অখণ্ডের সাধনা ও সিদ্ধির উপায়

অখণ্ডকে জীবনের লক্ষ্য ধরে অখণ্ডের উদ্দেশে কর্ম করাই হল নিষ্কাম কর্ম। অখণ্ডের চিন্তায় চিত্ত নিমগ্ন রাখাই হল অখণ্ডের ধ্যান বা আত্মধ্যান। অখণ্ডের বোধে সবকিছুকে গ্রহণ করা ও দেখাই হল আত্মজ্ঞান। অভেদ জ্ঞানে অখণ্ড ভাবকে 'মেনে মানিয়ে চলা' হল ইষ্টপ্রেম, আত্মপ্রেম বা বিশুদ্ধা ভক্তি।

এক কেন্দ্রের মাহাত্ম্য

এক কেন্দ্র ধরে চলাই হল ধর্ম। সমগ্র বিশ্বকে এক পরিবার রূপে মানতে পারলে প্রত্যেকের জন্যে প্রত্যেকে নিঃস্বার্থ ও নির্দ্বন্দ্বে সহানুভূতিসম্পন্ন হয়ে সমভাবাপন্ন হতে পারে।

ভয়ের চিন্তা দ্বারা ভয় বাড়ে, কোনমতেই ভয়কে দূর করা যায় না। ভয়কে প্রশ্রয় দিতে নেই। ভয়ের চিন্তা দ্বারাই ভয়কে প্রশ্রয় দেওয়া হয়। ভয় করাই হল ভয়ের কারণ। ভয়কে সাহসের সঙ্গে মোকাবিলা করলেই ভয় থাকে না। ভয়কে হেয় ও তুচ্ছজ্ঞান করলেই ভয় বিদূরিত হয়। আত্মা বা নিজ অতিরিক্ত কোন কিছুকে গ্রহণ করা বা মানা হলে দ্বৈতজ্ঞান হয়। দ্বৈতজ্ঞানই হল অজ্ঞান ভয় ও সংশয়ের কারণ।

ব্রহ্ম আত্মা ঈশ্বর অতিরিক্ত কোন কিছুরই সত্য অস্তিত্ব নেই। ব্রহ্ম আত্মা ঐক্যজ্ঞানই হল অদ্বয়জ্ঞান। এ-ই অমৃতত্ব, মহামুক্তি ও পরম শান্তিস্বরূপ।

অধ্যাত্ম সাধনার মূল্য লক্ষ্য কী?

অদ্বয়জ্ঞান অর্থাৎ আত্মজ্ঞানের বিকাশ হলেই সকলের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান হতে পারে। কিন্তু ভেদজ্ঞান বা দ্বৈতজ্ঞানে কখনও-ই তা সম্ভব নয়। ব্রহ্ম আত্ম ঐক্য জ্ঞানে সকলের সঙ্গে সমান বা ঐক্যসম্বন্ধ অনুভব করা যায়। অদ্বয়জ্ঞানেয় মাধ্যমে জানা যায় যে সকলের সঙ্গে সুসঙ্গতি ও মাধুর্যপূর্ণ সম্বন্ধ আছে। এই মাধুর্যপূর্ণ সম্পর্ক আবিষ্কার করাই হল অধ্যাত্মসাধনার মূল লক্ষ্য।

বিশ্বপ্রাণের বক্ষে সমগ্র ব্যষ্টিপ্রাণের সম্মিলিত মহাসঙ্গীতের ঐকতানিক সুরলহরী বিশুদ্ধ প্রেমানন্দের ভাবধারায় সকলকে বরণ করে নেওয়াই অদ্বয়জ্ঞানের বিশেষত্ব। এক অখণ্ড সত্য জ্ঞান ও আনন্দের ঘনীভূত মূর্ত বা ব্যক্তরূপই হল এই বিরাট বিশ্বমূর্তি। প্রতি ব্যষ্টি প্রাণসত্তাই এর শাশ্বত অবিচ্ছেদ্য অংশ।

অদ্বয়তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। সমগ্র বিশ্বচৈতন্যের সঙ্গে ব্যষ্টিচৈতন্যের প্রীতিসুলভ আপন সম্বন্ধ আবিষ্কার করা ও গড়ে তোলাই হল জীবনসাধনার তাৎপর্য।

আত্মমায়ের কৃপাশিসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

আত্মশক্তি বা গুরুশক্তিরূপা মায়ের কৃপাশিস্ ও সাহায্য ব্যতীত জাগতিক ও আধ্যাত্মিক কোন প্রকার উন্নতি, সফলতা ও কৃতিত্বের অধিকারী কেউ হতে পারে না।

আত্মদানের দ্বিবিধ ব্যবহার অনুলোম ও বিলোম গতির মাধ্যমে সাধিত হয়। অনুলোম গতির মাধ্যমে পরমাত্মা অনন্ত ব্যষ্টি আত্মা রূপে নিজেকে ব্যক্ত করেন। আবার বিলোম গতির মাধ্যমে ব্যষ্টি আত্মা সমষ্টি আত্মা ও পরমাত্মার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে তাদাত্ম্য লাভ করে। দেওয়া ও নেওয়া উভয় ক্রিয়ার মাধ্যমে জীবন গড়ে ওঠে।

ধর্মের তাৎপর্য

ধর্ম হল অন্তরাত্মার অভিব্যক্তির বিজ্ঞান। যা সর্বতোভাবে নিঃশ্রেয়স্কর এবং যা চরমতম আদর্শ ও সত্যের বাহন বা প্রকাশক তা-ই হল ধর্ম। সর্বজীবনের সঙ্গে তা যুক্ত আছে। এটা আত্মার সনাতন নীতি।

ধর্মের দ্বিবিধ ভাব হল নিত্য ও অনিত্য। নিত্যভাবের ধর্ম হল লোকাতীত ইন্দ্রিয়াতীত ও আধ্যাত্মিক। এও আবার পারমার্থিক ও আধ্যাত্মিক ভেদে দ্বিবিধ। পারমার্থিক ধর্ম নিত্য অদ্বৈতে প্রতিষ্ঠিত। আধ্যাত্মিক ধর্ম সগুণ ঈশ্বর ও দ্বৈতবাদের সঙ্গে যুক্ত। অনিত্য ধর্ম হল লৌকিক ধর্ম বা জাগতিক ধর্ম। এও দ্বিবিধ, যথা—চেতন ধর্ম ও অচেতন ধর্ম। চেতন ধর্ম হল জীবধর্ম। জীবধর্ম সমষ্টি ও ব্যষ্টি ভেদে দ্বিবিধ, আবার উভয়েই অন্তর বাহির

ভেদে দ্বিবিধ। জড়ধর্ম নৈসর্গিক ও পার্থিব ভেদে দ্বিবিধ। নৈসর্গিক ধর্ম হল নক্ষত্র, সূর্য, বায়ু প্রভৃতির ধর্ম। এককথায় পঞ্চতন্মাত্র বা সূক্ষ্ম পঞ্চভূতের ধর্ম। পার্থিব ধর্ম হল স্থূল পাঞ্চভৌতিক ধর্ম। পঞ্চভূতের প্রত্যেকের পৃথক পৃথক ধর্ম। আবার পরস্পরের মধ্যে সংযুক্ত ধর্ম। পঞ্চভূতের ধর্ম আবার ত্রিগুণের ধর্মের অন্তর্ভুক্ত। ত্রিগুণের ধর্ম হল—সত্ত্বগুণের প্রকাশ, রজোগুণের ক্রিয়া এবং তমোগুণের ঘোরত্ব বা জড়ত্ব।

অখণ্ড ধর্মের মূল বিভাগ পাওয়া গেল চারটি। তা হল (১) পরব্রহ্ম পরমাত্মা পরমেশ্বরের ধর্ম। এ বিশ্বাতীগ অর্থাৎ বিশ্বাতীত শাশ্বত সনাতন ধর্ম। (২) ব্রহ্ম আত্মা ঈশ্বরীয় ধর্ম। এ বিশ্বানুগ অর্থাৎ বিশ্বাত্মক বা সমগ্র ব্যষ্টির সম্মিলিত একক ধর্ম। (৩) জীবের ধর্ম বা অধ্যাত্ম ধর্ম। এ-ও ব্যষ্টি সমষ্টি ভেদে দ্বিবিধ। (৪) প্রকৃতির অন্তর্নিহিত ধর্ম বা নৈসর্গিক ধর্ম এবং জীবের অন্তঃপ্রকৃতির ধর্ম। এ-ই হল আধিদৈবিক ধর্ম। এ-ও ব্যষ্টি সমষ্টি ভেদে দ্বিবিধ। (৫) স্থূল পাঞ্চভৌতিক ধর্ম ও জীবের দৈহিক বা শারীরিক ধর্ম। একে আধিভৌতিক ধর্ম বলে। এ-ও ব্যষ্টি সমষ্টি ভেদে দ্বিবিধ।

প্রাণের ধর্ম

প্রাণের ধর্ম বলতে অন্তরের ধর্মকে বোঝায়। এরই নামান্তর স্বভাবধর্ম। এই ধর্ম চারভাগে সক্রিয় হয়—যথা, মন বুদ্ধি অহংকার চিত্ত। এদের প্রত্যেকের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আছে—যথা, প্রাণের ধর্ম ক্ষুৎপিপাসা, গতাগতি ইত্যাদি। মনের ধর্ম—সঙ্কল্প বিকল্প কাম কর্তৃত্ব সুখ দুঃখ ভয়াদি। বুদ্ধির ধর্ম—প্রভুত্ব অভিমান স্বার্থ মত্ততা খলত্ব বিচার যুক্তি ন্যায়নীতি ইত্যাদি। অহংকারের ধর্ম—কর্তৃত্বাভিমান দম্ভ দর্প কাম (কামনা) লোভ মোহ আসক্তি ভেগেচ্ছা হিংসা অসূয়া অবজ্ঞা পাণ্ডিত্যাভিমান প্রভৃতি। চিত্তের ধর্ম—ভোগলালসা শুভকামনা বাসনা বিষয়স্পৃহা স্বাতন্ত্র্য পরিকল্পনাদি। এ-ছাড়া আছে ইন্দ্রিয়াদির ধর্ম, যথা পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের প্রত্যেকের স্বকীয় ধর্ম এবং পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ের পৃথক পৃথক ধর্ম। এ-সব যথাক্রমে চোখের ধর্ম—রূপ ও রঙ গ্রহণ; শ্রবণেন্দ্রিয়ের ধর্ম—শব্দগ্রহণ; ত্বকের ধর্ম—স্পর্শ; জিহ্বার ধর্ম—রসনাগ্রহণ এবং বাক্ সম্পাদন; ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের ধর্ম—গন্ধগ্রহণ এবং শ্বাস প্রশ্বাস সম্পাদন। পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ের মধ্যে বাকের ধর্ম কথোপকথন এবং মনের ভাব অবস্থা এবং অনুভূতি আদি যথাযথ প্রকাশ করণ। পানি বা বাহুর ধর্ম হল কর্ম সম্পাদন, বস্তু আদি দেওয়া-নেওয়া লেনদেন সম্পাদন। পাদের ধর্ম বা কার্য হল গমনাগমন চলাবসা। উপাস্থের ধর্ম—মূত্রাদি নিঃসরণ এবং সন্তান উৎপাদন (প্রজনন ক্রিয়া) এবং পায়ুর ধর্ম বা ক্রিয়া হল দেহের মলাাদি বহিষ্করণ। ইন্দ্রিয়াদির ধর্মই হল ইন্দ্রিয়াদির কর্ম। এইরূপ ক্ষুদ্র বৃহৎ সর্ববিধ প্রাকৃত শক্তির স্বকীয় ধর্ম ও কর্ম আছে। অধিভূতের ধর্ম আলাদা, অধিদৈবের ধর্ম অধ্যাত্ম, অধিযজ্ঞের ধর্ম আলাদা। ধর্মের নিগূঢ় তাৎপর্য খুব সূক্ষ্ম এবং দুর্বোধ্য, কারণ এই শব্দটির বহু ব্যবহার প্রচলিত আছে কিন্তু ক্ষেত্রভেদে তাদের অর্থ বা তাৎপর্য পৃথক। কোথাও স্বভাব অর্থে ধর্মকে ব্যবহার করা হয়েছে, কোথাও প্রকৃতি অর্থে, কোথাও গুণ এবং ভাবার্থে, কোথাও আচার ব্যবহার অর্থে আবার কোথাও তার অন্তর্নিহিত স্বরূপ ও সত্তার অর্থে। সেইজন্য এর যথার্থ পরিচয় কেবলমাত্র শাস্ত্র অধ্যয়ন পাণ্ডিত্য এবং বাহ্য লক্ষণ ধরে সম্যক্‌রূপে জানা সম্ভব নয়। সর্বধর্মের মূলে যে সত্যধর্ম আছে তা কেবলমাত্র স্বানুভূতির মাধ্যমেই সিদ্ধ হয়, অন্যভাবে নয়। শাস্ত্রের নির্দেশ হল, সত্যই ধর্ম, অহিংসা ধর্ম, সেবা ধর্ম, শরণাগতি ধর্ম, জ্ঞান ধর্ম, দান ধর্ম, ধ্যান ধর্ম, ত্যাগ ধর্ম, প্রেম ভালবাসা বা আপনতা ধর্ম, একতাই ধর্ম, সমতাই ধর্ম, পূর্ণতা ধর্ম। এইসব পৃথক পৃথক ধর্ম ভাববোধের সম্যক্ সমাধানই হল ব্রহ্মানুভূতি তথা স্বানুভূতি, জ্ঞানের জ্ঞান প্রজ্ঞান, অদ্বৈতসিদ্ধি। এ-ই সমগ্র বেদান্ত শাস্ত্রের সারমর্ম এবং সর্বোত্তম অনুশাসন।

প্রাণের জন্য প্রাণ যখন সব ত্যাগ করতে পারে তখনই হয় পূর্ণপ্রাণে প্রতিষ্ঠা। পূর্ণপ্রাণে প্রতিষ্ঠিত হলে সত্যযুগ আরম্ভ হয়। যর্থাৎ প্রাণের যথার্থ মর্যদাবোধই হল সত্যবোধ। সত্যবস্তুর মূল্য সত্য দিয়েই নিরূপিত হয়। প্রাণের জন্য প্রাণের দ্বারা প্রাণেতে প্রাণের স্থিতি হল প্রাণপ্রতিষ্ঠা, সত্যস্থিতি। এ-ই হল মুক্তির রূপ। বস্তু ছেড়ে প্রাণকে অবলম্বন করলেই প্রাণের মর্যাদাবোধ বাড়ে ও প্রাণের পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাণ দিয়ে প্রাণের সেবা মানে শিবজ্ঞানে জীবসেবা। এ-র তাৎপর্য অনুধাবন করলে জীবনে নবচেতনা ও আলোর স্ফুরণ হয়। তার ফলে নবযুগের প্রকাশ হয়। প্রেম ও ভালবাসা দ্বারা প্রাণের সর্বোত্তম পূজা হয়।

গতিশীল প্রাণই শক্তি

শক্তির দ্বিবিধ লক্ষণ হল স্থিতি ও গতি। উভয় পরিচয়ই অনুভূতিসাপেক্ষ। সর্ব অনুভূতি আবার সত্তাবোধসাপেক্ষ। সত্য বোধস্বরূপ হল ঈশ্বর আত্মা গুরু মা। যেখানে শক্তির প্রকাশ সেখানেই বিদ্যা। যেখানে কর্মের কৌশল, সেখানেই যোগ। যেখানে যোগের পূর্ণতা সেখানেই ঈশ্বরীয় অভিব্যক্তি। ***

নিত্যযোগের তাৎপর্য

সমত্ব বা ঐক্যই হল যোগ। সকল প্রকার ক্রিয়াযোগ এর অন্তর্ভুক্ত। অন্যান্য যোগ হল এর প্রস্তুতি মাত্র। এই যোগ নিত্য শাশ্বত সুতরাং সত্য ও অখণ্ড। একেই 'রসামৃত যোগ, মধুযোগ বা নিত্যযোগ'[১] বলা হয়। নিত্যযোগের অন্তর্ভুক্ত হল মহাযোগ, মহাযোগের অন্তর্ভুক্ত হল সমষ্টিযোগ এবং সমষ্টিযোগের অন্তর্ভুক্ত হল ব্যষ্টিযোগ। ব্যষ্টিযোগ বিশেষ ক্রিয়াপদ্ধতি অবলম্বন করে সাধিত হয়। এর পূর্ণতাই হল সমষ্টিযোগের ভিত্তি। সমষ্টিযোগের পূর্ণতা হল মহাযোগের ভিত্তি। এবং মহাযোগের উৎকর্ষ হল নিত্যযোগ। ব্যষ্টি ও সমষ্টিযোগ হল সাধনসাপেক্ষ। এ আরোহণ নীতির অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু মহাযোগ ও নিত্যযোগ হল ব্যক্তিগত, সাধননিরপেক্ষ ও স্বতঃস্ফূর্ত। এ ঈশ্বরের অবতরণ নীতির অন্তর্ভুক্ত।

ব্যষ্টিযোগ ক্রিয়াকর্মসাপেক্ষ বলে কর্মের উপর গুরুত্ব বেশি দেয়। সমষ্টিযোগ জ্ঞানসাপেক্ষ বলে ঐক্যের উপর গুরুত্ব অধিক দেয়। মহাযোগ শুদ্ধ আনন্দভিত্তিক বলে এর বিশেষত্ব হল আপনবোধে বা সমবোধে সব মানা অর্থাৎ 'মেনে মানিয়ে চলা'। নিত্যযোগ প্রেমভিত্তিক বলে তা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অখণ্ড ধারায় প্রকাশ পায়। এর মধ্যে কোন খণ্ড ব্যবহার সম্ভব নয়।

মহাপ্রাণের মধ্যে ছোটবড় ভেদ অবান্তর

নিম্নস্তরের লোকেদের কখনও-ই অবহেলা করা উচিত নয়। তাদের অবহেলা করলে প্রাণের অমর্যাদা করা হয়। তার ফলে প্রাণশক্তি ক্রমশ দুর্বল হয় এবং উত্তরোত্তর অশান্তি ও দুঃখকষ্টের মাত্রা বেড়ে যায়। নিম্নস্তরের লোকেরাই হল সমাজের ভিত্তি। এবং উচ্চস্তরের লোকেদের সর্বপ্রকার সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের কারণ।

মুক্তিলাভের সহজতম উপায়

আপনবোধ একবোধ বা সমবোধের সম্বন্ধ ধরে সকলের সঙ্গে মিলিত হয়ে নিজের পূর্ণতা উপলব্ধি করাই হল মুক্তি লাভ করা। আধ্যাত্মিক ভাষায় একে আত্মানুভূতি বা ঈশ্বরানুভূতি বলে। এর তাৎপর্য হল সবার মাঝে নিজেকে আবিষ্কার করা ও দেখা এবং নিজের মাঝে সবাইকে আপনবোধে খুঁজে পাওয়া ও দেখা। এ-ই হল আত্মদর্শন বা সত্যদর্শন।

১। স্বানুভূতির ফলশ্রুতি।

ভেদের মাঝে অভেদ দর্শন

প্রতি ব্যষ্টি আত্মার মধ্যে আকৃতি ও প্রকৃতিগত ভেদ বা পার্থক্য যথেষ্ট থাকা সত্ত্বেও পরস্পরের মধ্যে ঐক্য ও সাদৃশ্য ভাবও নিহিত আছে। এই আভ্যন্তরীণ ঐক্য ও সাদৃশ্যকে ব্যবহারগত পার্থক্য দ্বারা সীমাবদ্ধ না রেখে অন্তরদৃষ্টির সুদীপ্ত জ্যোতিতে সমষ্টির একীকরণ বা একাত্মবোধের দর্শন অভ্যাস করাই হল আত্মসমীক্ষা। পরস্পরের সঙ্গে এই নিত্য সমান ও নিত্য ঐক্য সম্বন্ধ ধরতে না পারলে এবং বোধের মধ্যে এর ব্যবহার সহজ ভাবে প্রকাশ না হলে কারও মুক্তি বা শান্তি অন্য কিছু দ্বারা সম্ভব হবে না।

অভেদ ও অখণ্ডের মধ্যে ভেদ ও খণ্ড দর্শন হল জগৎ দর্শন। এবং ভেদ ও পূর্ণ জগতের মধ্যে অভেদ অখণ্ড দর্শনই হল ঈশ্বর-আত্মা-ব্রহ্ম দর্শন, সত্য দর্শন।

কারণ হল স্থিতি ও অভেদ, কার্য হল গতি ও ভেদপূর্ণ

বৈচিত্র্যময় জগতে পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের যত বৈষম্যই থাকুক না কেন সবকিছুর মূল কারণ একই উপাদান সত্তা। বস্তুজগৎ, প্রাণীজগৎ ও জীবজগতের অন্তর্গত প্রাণশক্তির বৈচিত্র্যময় প্রকাশগুলির মধ্যে রূপ-নাম-ভাবের মাত্রাগত বৈষম্য হল ব্যবহারিক সত্য। কিন্তু সে সবগুলির মূল বা কেন্দ্র হল এক অখণ্ড পারমার্থিক সত্তা। একে পূর্ণ সত্য, ব্রহ্ম আত্মা, ঈশ্বর প্রভৃতি বলা হয়। এ-ই হল প্রত্যেক ব্যষ্টি জীবনের সত্যস্বরূপের পরিচয়।

আত্মজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য

আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হলে সবাবধ দ্বৈতবোধের অবসান হয়। ভয় সংশয় চিরতরে বিলুপ্ত হয়। তখন মনে হয় জন্ম মৃত্যু আত্মবক্ষে সামান্যতম ঘটনা মাত্র। রোগ শোক তাপ অভাব দুর্ঘটনা প্রভৃতি বহুভাবে মানুষের মৃত্যু হতে পারে। অপরের কল্যাণের জন্য জীবনদান করাই হল গৌরবময় মৃত্যু[১]। অভী ও নির্ভীক চিত্তই জীবনদান বা আত্মোৎসর্গের উপযোগী অধিকারী।

আত্মদান ও আত্মসমর্পণের তাৎপর্য

আত্মদান পূর্ণমাত্রায় হলেই হয় পূর্ণ আত্মসমর্পণ। আবার পূর্ণ আত্মসমর্পণ হলেই আত্মদান পূর্ণ হয়। দান ও আত্মসমর্পণের মাধ্যমে মানুষ পূর্ণতা লাভ করে পূর্ণ সত্যস্বরূপ অখণ্ড সচ্চিদানন্দস্বরূপে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। এ-ই হল ভূমানন্দস্বরূপ অখণ্ড শান্তি, শাশ্বত মুক্তি ও পরম অমৃতস্বরূপ। এ-ই আধ্যাত্মিক ভাষায় ব্রহ্ম আত্মা ঈশ্বরের স্বরূপদর্শন ও উপলব্ধি। [১৭।৬।৬৮]

অজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য

অজ্ঞানই হল কামনা-বাসনার কারণ। কামনা-বাসনা হল অভাবসৃষ্টির মূল কারণ। অভাববোধ থেকেই আসে চাওয়া ও পাওয়ার চেষ্টা। অজ্ঞান সমষ্টি ও ব্যষ্টিভেদে দ্বিবিধ। কামনা-বাসনা, অভাব, চাওয়া-পাওয়া প্রভৃতিও সেইরূপ সমষ্টি ও ব্যষ্টিভেদে দ্বিবিধ। এই সমষ্টি অজ্ঞানই হল কারণদেহ বা আনন্দময় কোষ এবং ব্যষ্টি অজ্ঞান হল ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান বা বস্তু জ্ঞান। সমষ্টি কামনা-বাসনা হল ঈশ্বরের ইচ্ছা যা দ্বারা সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার সম্পাদিত হয় এবং ব্যষ্টি কামনা-বাসনা হল জীবের। সমষ্টি অভাব হল অব্যক্ত প্রকৃতির রূপ এবং ব্যষ্টি অভাব হল ব্যষ্টি

১। তত্ত্বানুভূতির দৃষ্টিতে।

জীবের প্রকৃতিগত ভাব। সমষ্টি চাওয়া-পাওয়া হল ঈশ্বরের লীলাবিলাস ও আনন্দ আস্বাদন এবং ব্যষ্টি চাওয়া-পাওয়া হল জীবের স্বভাবগত প্রকৃতি। সমষ্টির ক্ষেত্র হল মহত্তত্ত্বের অন্তর্গত এবং ব্যষ্টির ক্ষেত্র হল অহংকার তত্ত্বের অন্তর্গত। ঈশ্বরের অন্তর্গত হল মহত্তত্ত্ব এবং মহত্তত্ত্বের অন্তর্গত হল অহংকার তত্ত্ব। অহংকার হল অধ্যাত্ম। এর অন্তর্গত হল পঞ্চতন্মাত্র, অধিদৈব ও অধিভূত।

গুণভেদে কামনার ভেদ ও তার বৈশিষ্ট্য

ত্রিগুণভেদে মানুষের কামনা-বাসনা ত্রিবিধ, যথা—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। সাত্ত্বিক কামনাই হল আত্মজ্ঞান লাভ, ঈশ্বরানুভূতি ও মুক্তিলাভের ইচ্ছা। রাজসিক কামনা হল জ্ঞান বিদ্যা শক্তি অর্থ বিত্ত নাম যশ খ্যাতি প্রভৃতি লাভের ইচ্ছা। তামসিক কামনা হল প্রয়োজন অতিরিক্ত অন্নবস্ত্র লাভের ইচ্ছা এবং দৈহিক আরাম ও সুখ প্রাপ্তির ইচ্ছা।

গুণভেদে অভাবের লক্ষণ ও কার্যভেদ

অভাব ও চাওয়া-পাওয়া ত্রিগুণভেদে ত্রিবিধ, যথা—সাত্ত্বিক অভাব, রাজসিক অভাব ও তামসিক অভাব। সাত্ত্বিক অভাব হল সমতা সামঞ্জস্য ও শান্তির অভাব। সাত্ত্বিক অভাব মানুষকে মুক্তি ও শান্তিলাভের প্রেরণা যোগায় বা অনুপ্রাণিত করে। রাজসিক অভাব হল প্রাণশক্তি, কর্মশক্তি প্রভৃতির অভাব, অর্থাৎ অপটুতা, অযোগ্যতা, অসুস্থতা প্রভৃতি। তামসিক অভাব হল নিত্যব্যবহার্য বস্তুর অভাব, অর্থাৎ জীবনধারণের উপযোগী প্রয়োজনীয় বস্তুর অভাব।

গুণভেদে চাওয়া-পাওয়ার প্রকারভেদ

চাওয়া-পাওয়ার রূপও সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিকভেদে ত্রিবিধ। সাত্ত্বিক চাওয়া-পাওয়া হল ধর্মজীবন ও দিব্যজীবন লাভের ইচ্ছা। রাজসিক চাওয়া-পাওয়া হল সংসারে প্রতিপত্তি লাভ ও গণ্যমান্য হওয়ার ইচ্ছা এবং তামসিক চাওয়া-পাওয়া হল পর্যাপ্ত পরিমাণে ইন্দ্রিয়জ ভোগ্য বস্তু লাভের ইচ্ছা।

ঈশ্বর ও জীবের স্বভাবপ্রকৃতির পার্থক্য

ঈশ্বর হলেন অজ্ঞান মায়া অবিদ্যার অধীশ, এবং জীব হল অজ্ঞান মায়া ও অবিদ্যার অধীন।

মুক্তির তাৎপর্য

মুক্তি অর্থে অজ্ঞানমুক্তি ও অবিদ্যামায়ার প্রভাবমুক্তি বোঝায়। মুক্ত হওয়া মানে আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হওয়া বা ঈশ্বরানুভূতি লাভ করা, ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত থাকা।

জ্ঞানীর ভাষায় ত্রিগুণা প্রকৃতি হল অজ্ঞান মায়া ও অবিদ্যা। সুতরাং জগৎ হল ত্রিগুণা প্রকৃতিজাত অর্থাৎ প্রকৃতির গুণের বিস্তার। ব্রহ্ম আত্মা ঈশ্বর নিত্যসত্য অদ্বয় বস্তু। এ নিত্য অপরিণামী নির্বিকার অমৃতস্বরূপ। প্রকৃতিজাত জগৎ ত্রিগুণমিশ্রিত, বিকারী ও পরিণামী। যা নিত্য নির্বিকার ও অপরিণামী তাই সৎ শাশ্বত নিত্যবর্তমান; কিন্তু যা বিকারী, পরিণামী ও অস্থায়ী তা অসৎ অনিত্য ও মিথ্যা। এই মিথ্যা অবিদ্যার প্রভাব বিশুদ্ধ বোধস্বরূপ ব্রহ্ম আত্মা ঈশ্বরের মধ্যে মিথ্যা জ্ঞানাভাস হল জগৎ রূপ।

সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম আত্মা ঈশ্বরের সত্য পরিচয়

বিশুদ্ধ অখণ্ড চৈতন্যস্বরূপই হল ব্রহ্ম আত্মা ঈশ্বর। তাঁকে সচ্চিদানন্দ বলা হয়। সৎ-এর দ্বারা তাঁকে নিত্য অখণ্ড বর্তমান বোঝায়। সেজন্য তাঁকে অস্তি বলা হয়। চিৎ-এর দ্বারা তাঁকে জ্ঞানময় ভাতিময় বা প্রকাশময় বোঝায় এবং আনন্দ দ্বারা তাঁকে রসময় সুখময় সুন্দর মাধুর্যময় আনন্দময় বোঝায়।

সমষ্টি অজ্ঞানযুক্ত সচ্চিদানন্দস্বরূপ হল ঈশ্বর এবং ব্যষ্টি অজ্ঞানযুক্ত সচ্চিদানন্দস্বরূপ হল জীব।

অধ্যাত্ম সাধনার লক্ষ্য ও তাৎপর্য

আধ্যাত্মিক সাধনার অর্থ হল—প্রথমে সত্ত্বগুণের বিকাশ সাধন করা। তারপর তা দ্বারা রজোগুণ ও তমোগুণকে পরিপূর্ণ ভাবে অভিভূত করে শুদ্ধ সত্ত্বগুণের অনুশীলন করা। তারপর শুদ্ধ সত্ত্বগুণের সাহায্যে সত্ত্বগুণ অতিক্রম করে গুণমুক্ত বিশুদ্ধ বোধে প্রতিষ্ঠা লাভ করা। মুক্তি লাভ করার মানে হল ত্রিগুণমুক্ত হওয়া। গুণাতীত বোধস্বরূপই হল ব্রহ্ম আত্মা ঈশ্বর। নিত্যবস্তুই হল বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ। একেই ব্রহ্ম আত্মা ঈশ্বর বলে। এ স্বয়ংপূর্ণ স্বতঃসিদ্ধ স্বয়ংপ্রমাণ ও স্বয়ংপ্রকাশ। এর প্রকাশের জন্য অপরের সাহায্য প্রয়োজন হয় না। অপরকে এ-ই স্বয়ং প্রকাশ করে।

ব্রহ্ম-আত্মজ্ঞান লাভের বিজ্ঞান

ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান ক্রিয়াসাপেক্ষ বা সাধনসাপেক্ষ নয়। মহাবাক্য বিচার শ্রবণেই এর অনুভূতি হয়। পূজা উপাসনা ধ্যান প্রভৃতি হল ধ্যানসাপেক্ষ ও সাধনসাপেক্ষ। এর দ্বারা চিত্তমল পরিশোধিত হয়। সুতরাং তা আত্মজ্ঞান লাভের মুখ্য কারণ নয়, গৌণ কারণ। অর্থাৎ কর্মযোগ ধ্যান ভক্তির সাধন হল ব্রহ্ম লাভের বা মুক্তি লাভের গৌণ উপায়। এর মুখ্য উপায় হল ব্রহ্মজ্ঞ আচার্যমুখে ব্রহ্মবিচার শ্রবণ। উত্তম অধিকারী একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞান লাভে সমর্থ।

ভক্তের সাধনবিজ্ঞান

ভক্তের ভাষায় জগৎ হল ঈশ্বরীয় শক্তির অভিব্যক্তি। জীবের হৃদয় হল তাঁর লীলাভূমি। ঈশ্বরীয় শক্তির ত্রিবিধ রূপ হল (১) স্বরূপশক্তি বা যোগমায়াশক্তি, একে কেন্দ্রশক্তি বা পরাশক্তি বলা হয়; (২) স্বভাবশক্তি বা মহামায়াশক্তি, একে অন্তরশক্তি বা অন্তরঙ্গ শক্তি, বিদ্যাশক্তি বা জীবশক্তি বলা হয়; (৩) আধারশক্তি বা মায়াশক্তি, একে বহিরঙ্গ শক্তি, অবিদ্যা ও অজ্ঞানশক্তিও বলা হয়।

ত্রিবিধ শক্তির বৈশিষ্ট্য

বহিরঙ্গ শক্তি বহির্জগত সৃষ্টি করে স্বতন্ত্রভাবে তার কার্যাদি সম্পন্ন করে। অন্তরঙ্গ শক্তি বা জীবশক্তি তার সঙ্গে যুক্ত থেকে তা ভোগ করে ও তার প্রভাবে চলে। স্বরূপশক্তি বা কেন্দ্রশক্তি নিত্যমুক্ত।

জীবশক্তির দ্বিবিধ গতি। কেন্দ্রে ঈশ্বরীয় শক্তির প্রভাবযুক্ত হলে হয় তার মুক্তি এবং বহিরঙ্গশক্তির প্রভাবযুক্ত হলে হয় তার ভোগ। ভোগাসক্ত জীব স্বরূপশক্তি ঈশ্বরশক্তি বা আত্মশক্তির পরিচয় জানে না। সেইজন্য মুক্তির আস্বাদনও সে পায় না। কিন্তু ঈশ্বরীয় শক্তির শরণাগত হয়ে তাঁর প্রীত্যর্থে সাধন ভজন করলে তাঁর কৃপায় সে ভোগমুক্ত হয়, অর্থাৎ গুণমুক্ত হয়। রাগভক্তি হল ঈশ্বরের কৃপালাভ ও তাঁর অনুভূতিলাভ এবং তাঁর নিত্যসহচর বা অন্তরঙ্গ সাথী হওয়ার শ্রেষ্ঠ উপায়। জ্ঞান ও যোগ হল এর গৌণ মাধ্যম। এই রাগভক্তি হল প্রেমভক্তি। এই ভক্তি বিশুদ্ধ চিত্ত বা বিশুদ্ধ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। নিষ্কাম ভাবই হল বিশুদ্ধ ভাব।

শান্তি ও অমৃতত্ব লাভের উপায় (বিজ্ঞান)

কামনা-বাসনা পূরণের দ্বারা স্থায়ী তৃপ্তি বা শান্তি মেলে না। শাশ্বত শান্তি অমৃতলাভ হলেই পাওয়া যায়। এই অমৃতত্ব আত্মজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। আত্মজ্ঞান নিষ্কাম নির্মল শুদ্ধচিত্তের উপর প্রতিষ্ঠিত। শুদ্ধচিত্ত আবার ত্যাগ-বৈরাগ্য, বিচার-বিবেক প্রভৃতি সত্ত্বগুণের উপর প্রতিষ্ঠিত। সত্ত্বগুণসকল অনুশীলন বা সাধনসাপেক্ষ। সাধন অনুশীলন গুরুকৃপা আত্মকৃপা শাস্ত্রকৃপা ও ঈশ্বরকৃপাসাপেক্ষ। সর্বপ্রকার কৃপাই সৎসঙ্গসাপেক্ষ। সৎসঙ্গ অতি দুর্লভ বস্তু। মহাভাগ্যের ফলে সাধুসঙ্গ বা সৎসঙ্গ মেলে। সৎসঙ্গের প্রভাবে চরিত্র গঠন ও দিব্যজীবন লাভ হয়। তারপর যথা প্রণালীতে পরম পুরুষার্থ লাভ হয়।

নিষ্কাম ও সকাম চিত্তের পার্থক্য

নিষ্কাম চিত্তই হল ধনী চিত্ত। তার কখনও অভাব বোধ হয় না। কিন্তু সকাম চিত্ত হল দরিদ্র চিত্ত। সর্বদাই এর অভাববোধ থাকে। চরিত্রহীনের ধর্মলাভ হয় না, অর্থাৎ সত্ত্বগুণের বিকাশ হয় না এবং ধর্মহীনের শ্রদ্ধা-ভক্তি-বিশ্বাস বাড়ে না। শ্রদ্ধাহীনের শাস্ত্র গুরু ঈশ্বরে ভক্তি বিশ্বাস হয় না। এইরূপ অভক্ত ও অবিশ্বাসীর ইহকাল পরকাল কোন কালেই সুখশান্তি মেলে না। এইরূপ মনুষ্যজীবনকেই পশুজীবন বলা হয়। বহু জনম পশুজীবনের দুর্গতি ভোগ করার পর তার পশুজীবনের অবসানের নিমিত্ত আত্মপ্রচেষ্টা জাগে অর্থাৎ সত্ত্বগুণ লাভের জন্য ইচ্ছা হয়। তখন তার চাওয়া-পাওয়ার গতি ঈশ্বরের ইচ্ছায় সৎসঙ্গের দিকে যায়। সৎসঙ্গের প্রভাবে তার জীবনের নবরূপায়ণ হয়। ধীরে ধীরে তার সকাম চাওয়া কমে আসে এবং নিষ্কাম চাওয়ার ভাব বেড়ে যায়। এই প্রকারে নিত্য-অনিত্য, আত্ম-অনাত্ম জ্ঞান বিবেকবিচারের দ্বারা লাভ করে সে দিব্যজীবনের অধিকারী হয়। বিবেকখ্যাতি না হলে প্রকৃতিমুক্ত হওয়া যায় না।

নিত্যপুরুষের পরিচয়

একমাত্র নিত্যপুরুষই হল নিত্যমুক্ত। এই পুরুষ হল বিশুদ্ধ বোধস্বরূপ আত্মা। শুদ্ধবোধের দ্বারা শুদ্ধবোধের ব্যবহারই হল বিবেকখ্যাতি। শুদ্ধবোধের স্থিতিই হল প্রজ্ঞাস্থিতি। প্রজ্ঞাস্থিতি হল আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠা, অর্থাৎ কেবল পুরুষ বা জ্ঞানস্বরূপে প্রতিষ্ঠা।

ত্যাগ, বৈরাগ্যপূর্ণ জ্ঞান ও প্রেমভক্তির গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য

সন্ন্যাস বা ত্যাগ হল আত্মজ্ঞান বা মুক্তি লাভের মুখ্য উপায়। যোগ ভক্তি প্রভৃতি হল এর গৌণ উপায়। কিন্তু ঈশ্বরোপলব্ধির জন্য প্রেমভক্তি হল মুখ্য উপায় এবং যোগ জ্ঞান হল গৌণ উপায়।

নিত্যলীলায় এক পরম তত্ত্বেরই পরিচয়

সগুণতত্ত্বের উপলব্ধি না হলে নির্গুণতত্ত্বের উপলব্ধি হওয়া সম্ভব নয়। তত্ত্বজ্ঞানই হল বিশুদ্ধ জ্ঞান। এই বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপই হল ব্রহ্ম আত্মা ঈশ্বর। নিত্য ও লীলাভেদে এক তত্ত্বই নির্গুণ ও সগুণ উভয়ভাবে অনুভূত হয়। লীলাবাদী সগুণ ঈশ্বরের উপাসক এবং নিত্যবাদী অর্থাৎ মুক্তিকামী হল নির্গুণতত্ত্ব অর্থাৎ নির্গুণ ঈশ্বরের উপাসক।

লীলাবাদী ধ্যান, ভক্তি ও আত্মসমর্পণযোগের মাধ্যমে আপন ইষ্ট সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের উপাসনা করে। তাঁর দর্শন ও অনুভূতি লাভ করে সে কৃতকৃত্য হয়। জ্ঞানী করে আমিকে ধরে সাধনা এবং ভক্ত করে তুমিকে ধরে সাধনা। ভক্ত নিজের আমিকে ঈশ্বরের আমির কাছে সঁপে দেয়। জ্ঞানীর কাঁচা আমি ও পাকা আমি এক হয়ে

যায়। সে অখণ্ড এক ভূমা আমির স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ভূমা আমিই হল অমৃতত্ব সচ্চিদানন্দঘন অদ্বয় ব্রহ্ম ও আত্মা। ভক্ত তার কাঁচা আমিকে ঈশ্বরের সেবায় যুক্ত রেখে, শোধন করে ঈশ্বরের আমিকে অর্থাৎ পাকা আমিকে ইষ্টবোধে নিত্য সেবা করে।

লীলাবাদ হল সগুণ ও দ্বৈতবাদ এবং মায়াবাদ হল নির্গুণ ও অদ্বৈতবাদ। ব্রহ্ম আত্মা অদ্বৈত। ঈশ্বরও দ্বৈত এবং জীবও দ্বৈত। ঈশ্বরদ্বৈত হল নিত্যমুক্ত কিন্তু জীবদ্বৈত হল গুণবদ্ধ ও অশুদ্ধ। ঈশ্বরের কৃপায় জীব ভক্ত হয়ে গুণমুক্ত হয়।

ভক্তি ও ভক্তের বৈশিষ্ট্য

ঈশ্বরের কৃপাই হল ভক্তিবাদের শ্রেষ্ঠ বস্তু। ভক্তের কাছে এ-ই হল শ্রেষ্ঠ সম্পদ। করুণাময় ঈশ্বরের নিত্য কৃপালাভই হল ভক্ত জীবনের চরমতম উদ্দেশ্য।

একনিষ্ঠ ইষ্টগত চিত্তই হল শুদ্ধভক্তের লক্ষণ। শুদ্ধ ভক্ত ভগবানের সঙ্গে নিত্যযুক্ত এবং ভগবানও তাঁর সঙ্গে নিত্যযুক্ত। উভয়ের মধ্যে ভেদ কল্পনা করা অন্যায় ও অবৈধ। শুদ্ধ ভক্ত ও ভগবানের অভেদ সম্বন্ধ পরিপক্ক অবস্থায় অদ্বৈত জ্ঞানে পরিণত হয়। এ অতীব দুর্লভ অবস্থা। এইরূপ বিশুদ্ধ ভক্তজীবনও দুর্লভ।

জ্ঞানী ও ভক্তের অনুভূতি পরিণামে অভিন্ন

বিশুদ্ধ ভক্ত ও অদ্বৈত জ্ঞানীর মধ্যে মূলত কোন পার্থক্য নেই। শুদ্ধ ভক্ত শুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞানীর মত ঈশ্বরসত্তার সঙ্গে বা কেন্দ্রবোধের সঙ্গে যুক্ত থাকে।

বিশুদ্ধ বোধস্বরূপ কেন্দ্রসত্তাই হল ঈশ্বর আত্মা। যোগী ও ভক্ত তাঁর সঙ্গে ধ্যান ও ভক্তির মাধ্যমে যুক্ত হয় এবং জ্ঞানী বিচার-বিবেকের মাধ্যমে যুক্ত হয়। শুদ্ধচিত্ত প্রেমিক ভক্ত ও যোগী কেন্দ্রবোধসত্তার নৈর্ব্যক্তিক ব্যক্তিরূপকে আপন সর্বস্ব সমর্পণ করে। জ্ঞানী কেন্দ্রসত্তার নৈর্ব্যক্তিক রূপকে আপন স্বরূপজ্ঞানে অনুভব করে।

লীলা অবতারের বৈশিষ্ট্য

লীলাবাদে ঈশ্বরের নৈর্ব্যক্তিক ব্যক্তিরূপকেই ভক্ত আরাধনা করে। নৈর্ব্যক্তিক ঈশ্বরের ব্যক্তিরূপই হল অবতারগণ—শিব রাম কৃষ্ণ দুর্গা কালী প্রভৃতি। নিত্য নৈর্ব্যক্তিক পরমতত্ত্ব হল এক ব্রহ্মবস্তুরই অতিমানস ভিন্ন ভিন্ন অভিনব ব্যক্তিরূপ। এদের মধ্যে ভেদ কল্পনা করা অযৌক্তিক অজ্ঞান ও মূঢ়তার লক্ষণ।

লীলাবাদের বৈশিষ্ট্য

লীলাবাদ হল শক্তিময়ের শক্তির খেলা। লীলাতে শক্তিরই প্রধান ভূমিকা। ভক্ত এই শক্তিকেই সচ্চিদানন্দময়ী মাতৃবোধে আরাধনা করে। শিব রাম কৃষ্ণ প্রভৃতি বেশে ঈশ্বরের যেমন অবির্ভাব হয়, দুর্গা কালী লক্ষ্মী রাধা প্রভৃতি বেশেও তাঁর আবির্ভাব হয়।

মাতৃলীলার তাৎপর্য

মাতৃবোধে ঈশ্বরের সাধনাকেই শক্তিবাদ বলে। সত্তার মত শক্তিও স্বরূপত অদৃশ্য, কিন্তু এর প্রকাশবৈচিত্র্য দৃশ্য ও অনুভবগম্য। সচ্চিদানন্দময়ী মা সর্ব রূপ-নাম-ভাব-বোধে নিত্য বর্তমান। দেশ কাল ও সর্ব কারণ-কার্যরূপে তিনি-ই স্বয়ং প্রকাশমান। এই মা স্বয়ং অদ্বৈত হয়েও দ্বৈতরূপে এবং বৈচিত্র্যময় অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড রূপে নিজেই ব্যক্ত হয়ে আছেন। তিনি বিশ্বজননী জগৎপালিনী আবার নিজেই সংহারিণী। এই ত্রিবিধ রূপে তিনি

নিজেকে নিজে ব্যক্ত করেন, নিজেই নিজেকে ভজন করেন এবং নিজেই নিজেকে অনুভব করেন। স্থিতি সত্তা রূপে তিনি-ই হলেন পরমশিব বা পরমাত্মা। শক্তিরূপে তিনিই হলেন সমগ্র প্রকৃতি। সর্বজীবন হল তাঁর সন্তান বা প্রকাশরূপ। বহিঃসত্তায় সমগ্র অধিভূতরূপে, অন্তঃসত্তায় সমগ্র অধিদৈবরূপে, কেন্দ্রসত্তায় সমগ্র অধ্যাত্মরূপে এবং তুরীয়সত্তায় পূর্ণ অধিযজ্ঞরূপে তিনি-ই স্বয়ং বিদ্যমান। ব্যষ্টি সমষ্টিরূপে নিজেকে বিভক্ত করে তিনি নিজেই লীলা করে চলেছেন।

ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনের সমগ্র সত্তা ও শক্তির মধ্যে স্বয়ং থেকেও মা আপন স্বরূপ আবৃত করে রেখে বৈচিত্র্যের খেলা খেলেন। কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব জ্ঞাতৃত্ব প্রভৃতি ভাব মায়েরই প্রকাশ। ব্যষ্টি অহংকাররূপেও মা, সমষ্টি অহংকাররূপেও মা। ব্যষ্টি আত্মারূপেও মা, সমষ্টি আত্মারূপেও মা। ব্যষ্টি অহংকারের লক্ষণ হল 'আমার আমি বোধ' এবং সমষ্টি অহংকারের লক্ষণ হল 'আমি আমার বোধ'।

ব্যষ্টি ও সমষ্টির মধ্যে ভেদাভেদ সম্বন্ধ

অহংকারের মধ্যে ত্বংকারের সুর অর্থাৎ 'আমার আমি বোধের' মধ্যে 'আমি আমার বোধ' অথবা ত্বংকারের সুর অর্থাৎ ঊর্ধ্ব প্রকৃতির ক্রিয়া না হওয়া পর্যন্ত অভাব অজ্ঞান ও চাওয়া-পাওয়ার দাবি চলতেই থাকে। ঊর্ধ্ব প্রকৃতির ক্রিয়া আরম্ভ হলে অভাব অজ্ঞানের পরিবর্তন হয় এবং চাওয়া-পাওয়ারও পরিবর্তন হয়। তখন অভাবের পরিবর্তে ভাবের বিজ্ঞান, অজ্ঞানের পরিবর্তে জ্ঞানের বিকাশ, চাওয়া-পাওয়ার পরিবর্তে নিষ্কাম সেবা ও সমদৃষ্টি এবং অপূর্ণতার পরিবর্তে পূর্ণতার লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই স্তরের ঊর্ধ্বে হল তুরীয় স্তর। এখানে কোন পরিবর্তন নেই, রূপান্তর নেই, শুধু নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত সচ্চিদানন্দঘন স্বভাব। এ-ই অখণ্ডের ঘর।

আত্মসমর্পণের ফলশ্রুতিই হল আত্মজ্ঞান

জন্মমৃত্যুরূপ বিকারের কারণ হল মহাকারণ। এই মহাকারণের বিকার নেই, সুতরাং জন্মমৃত্যুও নেই। কার্য ও কারণরূপ জন্মমৃত্যুকে মহাকারণরূপী মায়ের কাছে নিঃস্বার্থে সঁপে দিলে নির্বিকার আত্মার স্বরূপ অবগত হওয়া যায়।

অজ্ঞানযোগে আত্মার দেহবন্ধন

অজর অমর অদ্বয় অপাপবিদ্ধ আত্মা অজ্ঞান বশত গুণসঙ্গ করে দেহ ধারণ করে। দেহ সহবাসে বিকারী ও পরিণামী দেহের গুণ আত্মাতে আরোপিত হয় এবং আত্মচৈতন্যও গুণজাত প্রাকৃত দেহেতে আরোপিত হয়। তার ফলে দেহাত্মবুদ্ধি হয়। এই দেহাত্মবুদ্ধি হল জন্মমৃত্যুরূপ বিকারের কারণ। বিশুদ্ধ আত্মা প্রকৃতির গুণসঙ্গ করে গুণের প্রভাবে জীবাত্মারূপে প্রতিভাত হয়। জীবাত্মার লক্ষণ হল 'আমি বোধ' এবং প্রকৃতির লক্ষণ হল 'আমার বোধ'। এই 'আমি' ও 'আমার বোধের' সংযোগেই জীবাত্মা দেহঘরে অর্থাৎ সংসারে বাস করে পুনঃপুনঃ জন্মমৃত্যুর দশা ভোগ করে।

জ্ঞানযোগে আত্মা বন্ধনমুক্ত হয়

প্রকৃতি ও পুরুষ হল 'আমার ও আমি' অর্থাৎ 'দেহবোধ ও আমিবোধ'। এই 'প্রকৃতি পুরুষ বিবেকখ্যাতি' অর্থাৎ 'আমার ও আমি বিবেকখ্যাতি' হলে জীব প্রকৃতিমুক্ত হয়ে পুরুষস্বরূপে বিরাজ করে। বিবেকখ্যাতি হল উভয়ের মধ্যে ভেদ বা পার্থক্য জ্ঞান।

প্রকৃতির পরিচয়

শুদ্ধ আত্মার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। এ নিত্য অদ্বৈত স্বয়ংপূর্ণ স্বয়ংপ্রকাশ নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত। প্রকৃতি হল আত্মশক্তির অনির্বচনীয় রূপ। এর স্বরূপ জানা যায় না বলে এ দুর্বোধ্য, অদৃশ্য ও অপরিমেয়, কিন্তু এ নিত্যবস্তু নয়। কারণ বিশুদ্ধ আত্মাতে আত্মাতিরিক্ত কোন বস্তু সিদ্ধ নয়। এই কারণে প্রকৃতির কোন পারমার্থিক সত্তা নেই কিন্তু ব্যবহারিক সত্তা আছে। ব্যবহার করলে এর প্রকাশ অনুভবগম্য হয়, কিন্তু পারমার্থিক জ্ঞানে অর্থাৎ আত্মজ্ঞানের উদয়ে প্রকৃতির কোন সত্তা থাকে না, সুতরাং তার কোন কার্যও থাকে না।

আত্মার মাহাত্ম্য

কার্য-কারণ হল প্রকৃতির ধর্ম, কিন্তু আত্মার কোন কার্য-কারণ ধর্ম নেই। এ নিত্য সমধর্মী ও সমরস। আত্মাস্বরূপ নিষ্ক্রিয়, কেবল স্বয়ংপ্রকাশতাই হল তার বিশেষত্ব।

ভক্তের অনুভূতির তাৎপর্য

ভক্ত প্রকৃতিকে জ্ঞানীর মত মায়া ও মিথ্যা বলে না। তার কাছে শক্তি হল ঈশ্বরের সংকল্প অনুবিধায়িনী ও নিত্য আনন্দদায়িনী নিত্যলীলা সাথী। সুতরাং এই শক্তির সাহায্যেই জীব মুক্তির আনন্দ ও ঈশ্বরানন্দ লাভ করতে পারে। সমগ্র সৃষ্টি ব্যাপার হল ঈশ্বরের লীলা। অনন্তশক্তি লীলাময়ী মা-ই হলেন জগৎকর্ত্রী ও জগৎনিয়ন্ত্রী। সেইজন্য তাঁকে মহানিয়তি বলা হয়। সচ্চিদানন্দময় ঈশ্বরের স্বরূপশক্তিই হল সচ্চিদানন্দময়ী মা। জগৎলীলায় তিনিই একচ্ছত্র কর্ত্রী। সবই তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীনে চলে।

মায়ের নিত্যলীলার নিত্যসাক্ষী হওয়াই হল সর্বোত্তম যোগীর লক্ষ্য

আপন নিত্যানন্দস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত থেকে মুক্তানন্দ হয়ে সচ্চিদানন্দময়ী মায়ের নিত্যলীলায় মত্ত থাকাই হল নিত্যযোগ, মহাযোগ ও মহামুক্তি।

সমবোধে সব 'মেনে মানিয়ে চলার' বিজ্ঞান আত্মসমর্পণযোগের অনুরূপ এক অভিনব বিজ্ঞান পদ্ধতি।

মাতৃসত্তায় মা-ই সর্বেসর্বা

সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড হল মায়ের বক্ষ। চৈতন্যময়ী মায়ের প্রাণ হতে সঞ্জাত এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অণুপরমাণু হতে আরম্ভ করে স্রষ্টা পর্যন্ত সবকিছুই হল মায়ের পরিচয়। সচ্চিদানন্দময়ী মায়ের বক্ষে মায়েরই জন্য (নিজের জন্য বা আত্মার জন্য বা শুদ্ধবোধের জন্য) মা হতেই, মায়ের দ্বারা, মাকে মা নিজেই অনন্ত ভাবে প্রকাশ করে সর্বপ্রকাশের মধ্যে নিজে থেকে পরস্পরের সঙ্গে দ্বন্দ্ব বিচ্ছেদ ও মিলনরূপ লীলা করে আপনানন্দ আপনি আস্বাদন করেন। এ-ই তাঁর নিত্যলীলা, নিত্যযোগ বা মধুযোগ। না-জানা ও অভাব অজ্ঞানরূপ বৃত্তি দ্বারা মা নিজের সত্যস্বরূপ জীবের অন্তরে লুকিয়ে রেখে পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করেন। জানাজানির যুক্তি দ্বারা আবার মা নিজেই পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেন। তখন বিচার বৈরাগ্য দ্বারা তা নিরসনের চেষ্টা করেন। মানার ব্যবহার দ্বারা পরস্পরের মধ্যে মা মিলন ঘটান।

মাতৃ ইচ্ছার অনন্ত মহিমা

মায়ের ইচ্ছার তিনটি রূপ জ্ঞান-বল-ক্রিয়ারূপে কাজ করে। বল হতে কর্ম, ক্রিয়া হতে ভোগ আস্বাদন ও

জ্ঞান হতে বিরাগ বা ত্যাগ। ভোগে যোগ অর্থাৎ আসক্তি বা বদ্ধ, যোগ ভোগ-আস্বাদন বা যুক্তি এবং ত্যাগে বিশ্রাম বা মুক্তি ও শান্তি। প্রবৃতি হতে যোগ ও ভোগ এবং নিবৃত্তি হতে ত্যাগ, মুক্তি ও শান্তি হয়। প্রবৃত্তি মার্গ হল সগুণতত্ত্বের অন্তর্গত এবং নিবৃত্তি মার্গ হল নির্গুণতত্ত্বের অন্তর্গত। সগুণতত্ত্ব দ্বৈত এবং নির্গুণতত্ত্ব হল অদ্বৈত।

অজ্ঞান হতে প্রজ্ঞান পর্যন্ত সর্বস্তরে মা-ই স্বয়ং কারণ-কার্য ও কার্য-কারণরূপে বিদ্যমান

সদ্‌গুরুরূপী মা-ই স্বয়ং উভয় তত্ত্বের সাধক, সাধ্য, সাধন ও সিদ্ধিস্বরূপ। 'ব্যষ্টি আমিবোধে' সে দীর্ঘকাল প্রবৃত্তিমার্গে পরিভ্রমণ করে তারপর বিশ্রাম বা শান্তি চায়। তখনই সে সদ্‌গুরুর প্রয়োজন বোধ করে এবং যথাকালে তাঁর দর্শনও পায়।

নমঃ শব্দের তাৎপর্য

'নমঃ' মানে নাও মা (মাধব, মহৎ বা মহেশ)। এই নমস্কার দিয়ে জীবনের সর্বব্যবহার করাই হল দীক্ষা গ্রহণ করা। চার বার নমস্কারের মাধ্যমে চতুঃসত্তার সমর্পণ হয় এবং 'মেনে মানিয়ে চলার' সাধন পূর্ণ হয়। এই চতুঃসত্তা হল (১) সমগ্র রূপ, (২) সমগ্র নাম, (৩) সমগ্র ভাব ও (৪) সমগ্র বোধ।

গুরুবোধে মাতৃবোধে বা বিশুদ্ধ বোধাত্মজ্ঞানে (সমদৃষ্টি বা আপনবোধে) নিত্য 'মেনে মানিয়ে চলাই' হল পূর্ণমুক্তি ও অখণ্ড শান্তিতে অর্থাৎ ভূমাতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বিজ্ঞান। চতুর্বিধ নমস্কার অথবা নিত্য 'মেনে মানিয়ে চলা' বিজ্ঞানের মাধ্যমে পরমাত্মবোধের সঙ্গে মহামিলন হয়। এই মহামিলনের অনুভূতি হল স্বানুভব-রসাস্বাদন বা স্বানুভূতি।

অখণ্ড ভূমার প্রতি অনুরাগ বা আসক্তি হতে ভূমার দর্শন ও তাঁর অনুভূতির জন্য মধুযোগ বা নিত্যযোগ অর্থাৎ মানার[১] সাধন হয়। এই মানার ফলসিদ্ধি হল নিত্যাদ্বৈতের স্বানুভূতি।

সচ্চিদানন্দের ব্যবহার সচ্চিদানন্দ ভাববোধেই সিদ্ধ হয়

সর্বসমর্পণের অর্থ সর্বকামনা অর্থ নাম যশ ও মানের চাহিদা এবং অহংকার যুক্ত দেহ প্রাণ মন বুদ্ধি সব একত্রে সদ্‌গুরুরূপী মায়ের কাছে নিবেদন করা অর্থাৎ সচ্চিদানন্দবোধ দিয়ে সচ্চিদানন্দের ব্যবহার। আত্মদানের মাধ্যমেই আত্মজ্ঞান লাভ হয়। আত্মদানের ফলে পৃথক অস্তিত্ববোধ অর্থাৎ ব্যষ্টি ও সমষ্টিবোধ সবই নিত্য অখণ্ড বোধস্বরূপে যুক্ত হয়ে যায় এবং আপনাকে আপনি পূর্ণ করে পায়। আমির কাছে আমিকে দিয়ে আমি পূর্ণ হয়। অর্থাৎ পাকা আমির কাছে কাঁচা আমি আপনাকে সঁপে দিয়ে পাকা আমির সঙ্গে মিশে পাকা আমি হয়ে যায়।

কাঁচা আমি ও পাকা আমির অভেদ সম্বন্ধ

কাঁচা আমি হল অনন্ত ব্যষ্টি আমি; কিন্তু পাকা আমি অখণ্ড ভূমা অদ্বয় আমি। পাকা আমির সন্তান হল সর্ব ব্যষ্টি আমি। পাকা আমিই হল সদ্‌গুরুরূপী মা এবং কাঁচা আমি সকল হল তাঁর অবিচ্ছেদ্য অংশ, সন্তান বা শিষ্য।

আত্মদানেই হয় পূর্ণ দীক্ষা ও পূর্ণ আত্মজ্ঞান

সদ্‌গুরুর জীবন হল পূর্ণদীক্ষার জীবন, অর্থাৎ আত্মদানের জীবন। তাঁরা ব্যষ্টি জীব সন্তানের অহংকাররূপ মলিনতা গ্রহণ করে আপনার শুদ্ধ স্বরূপ দান করেন। আত্মজ্ঞান দানই হল পূর্ণ দীক্ষাদান। সদ্‌গুরুর কাছে আপন

১। মানার বিজ্ঞানের অভিনব সংজ্ঞা।

অহংকারকে সঁপে দিয়ে সদ্‌গুরুর দেওয়া আত্মজ্ঞান গ্রহণ করাই হল সত্যের দীক্ষা। স্ববোধে সব মানাই হল আত্মজ্ঞান লাভ করা বা সত্যদীক্ষার তাৎপর্য। জানা হল জ্ঞান এবং মানা হল বিজ্ঞান।

নিত্যাদ্বৈতের তাৎপর্য

বহুর মধ্যে এক হল যোগমায়া। তা অত্যন্ত দুর্লভ অবস্থা—অদ্বৈত হয়েও দ্বৈত। শিবও আমি, শক্তিও আমি এবং শিব-শক্তির যে প্রকাশ তাও আমি। সমর্পণের অর্থ সমভাবে গ্রহণ।

নিজবোধের ব্যবহারিক ক্রম

অপরকে ছোট করে শান্তিতে থাকা যায় না। অর্জিত অর্থ বিদ্যা শক্তি আনন্দ প্রভৃতির অংশ অপরকে দিতে হয় এবং অপরের জন্য শান্তিও প্রার্থনা করতে হয়। নিজের কল্যাণচিন্তা অপেক্ষা অপরের কল্যাণচিন্তায় মুক্তির পথ পরিষ্কার হয়। নিজের জন্য চাওয়াই স্বার্থপরতা। যে দিতে পারে সে-ই অমর। যে নিয়ে না দেয় সে-ই মৃত্যুর দাস হয়। অপরকে আঘাত দিয়ে ছোট করে বা মেরে পরোক্ষভাবে নিজেদের ঘাড়েই আঘাতকে টেনে আনা হয়। অপরকে দুঃখ দিয়ে ও মেরে নিজেদের দুঃখ ও মৃত্যুর কারণ তৈরি হয় শুধু। অপরের প্রতি যেরূপ আচরণ ও ব্যবহার করা হয় সেরূপ প্রতি-আচরণ ও প্রতিব্যবহার অপরের কাছ থেকে ফিরে আসে। সবাই শান্তিতে থাকলে নিজেও শান্তি পাওয়া যায়।

ধনী ও দরিদ্রের দৃষ্টিশুদ্ধি

লক্ষ দরিদ্রের মধ্যে একটি ধনী শান্তিতে বাস করতে পারে না। আবার লক্ষ ধনীর মধ্যে একটি গরিব থাকে না, সেও ধনী হয়ে যায়। যে পাহাড়ে বসে ভগবানের চিন্তা করে সেও একদিকে স্বার্থপর। তাকে আবার সংসারে ফিরে আসতে হয় সংসারের ঋণ শোধ করার জন্য। সংসারের ঋণ পরিশোধ হলে হয় তার মুক্তি। ঋণশোধ মানে হল সকলের কল্যাণ সাধন করা ও সকলের সেবা করা। .

অখণ্ড স্মৃতি ও খণ্ড স্মৃতির বৈশিষ্ট্য

অখণ্ড স্মৃতিই হল ধ্রুবাস্মৃতি। এই স্মৃতি মুক্তির কারণ। খণ্ড স্মৃতি হল বিষয় স্মৃতি ও ভোগের স্মৃতি। এ ভ্রান্তি অজ্ঞান দুঃখকষ্ট ও বন্ধনের কারণ।

সৎ কর্মের স্মৃতি হল সাত্ত্বিক এবং অসৎ কর্মের স্মৃতি হল রাজসিক ও তামসিক। সৎ কর্মের স্মৃতির মাধ্যমে অসৎ কর্মের স্মৃতি শোধন করে নিতে হয়। সাত্ত্বিক কর্ম ধর্মাত্মক ও জ্ঞানাত্মক। রাজসিক ও তামসিক কর্ম অধর্মাত্মক ও অজ্ঞানপ্রসূত। সত্ত্বের স্মৃতিকে শুদ্ধসত্ত্বের স্মৃতির সেবায় নিযুক্ত রেখে তাকে শুদ্ধসত্ত্বময় করে নিতে হয়। শুদ্ধসত্ত্বময় স্মৃতিই হল ধ্রুবাস্মৃতি। সৎসঙ্গের মাধ্যমে ঈশ্বরের স্মৃতি সকলকে শান্তির পথে নিয়ে যায়। সংকল্প থেকে আসে প্রেরণা, তার থেকে আসে জ্ঞান। সেই জ্ঞান হয় শান্তির কারণ ও শান্তির আশ্রয়।

জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে ভেদ হল দ্বৈতমূলক

জীববেশে ঈশ্বরই স্বয়ং। জীববোধে ভেদজ্ঞানের মাধ্যমে তিনি খেলেন। কিন্তু ঈশ্বরীয় বোধে ভেদজ্ঞান থাকে না। ঈশ্বর দ্বৈত, জীবও দ্বৈত। ঈশ্বর দ্বৈত হল নিত্যমুক্ত কিন্তু জীব দ্বৈত অশুদ্ধচিত্ত হেতু বদ্ধ। ঈশ্বরেতে সব এবং সবেতে তিনি নিজেই শাশ্বত অনন্ত স্বয়ংপূর্ণ অখণ্ড একজন।

সাধারণ মানুষ মৃত্যুকে ভয় করে কিন্তু সাধকরা মৃত্যুকে আহ্বান করেন এবং মহাপুরুষগণ মৃত্যুকে নিয়ন্ত্রণ করেন।

ঈশ্বরের জীবলীলা হল তাঁর আনন্দবিলাস

দেহের স্তর, প্রাণের স্তর, মনের স্তর, বুদ্ধির স্তর এবং সামগ্রিক একক স্তর নিয়ে ব্যষ্টি জীবন গঠিত। সমষ্টি জীবনের খেলাঘর হল এই বিশ্বজগৎ। ভগবান ঈশ্বর পরমাত্মা পরব্রহ্ম হল সমষ্টি জীবনের ও জগতের শ্রেষ্ঠ আশ্রয়।

ব্যষ্টি জীবন হল ঈশ্বরের ও জীবজগতের ক্ষুদ্রতম নমুনা মাত্র। ব্যষ্টি জীবের দেহই হল বিশ্ব। সমষ্টি জীবনের দেহ হল বিরাট বা বৈশ্বানর। ব্যষ্টির দেহতত্ত্ব না জানলে সমষ্টির দেহতত্ত্ব জানা যায় না। অর্থাৎ বিশ্বকে না জানলে বিরাটকে জানা যায় না। অপরপক্ষে বিশ্বকে জানলে বিরাটকে জানা যায় এবং বিরাটকে জানলে বিশ্ব অজ্ঞাত থাকে না।

মানবদেহের মাধ্যমে ঈশ্বরের অভিব্যক্তির অভিনব বিজ্ঞান

যোগশাস্ত্র বা আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান অনুযায়ী মানবদেহের স্নায়ু বা নাড়ির সংখ্যা হল ৩ লক্ষ, ৭২ হাজার। কিন্তু বেদান্ত মতে এর সংখ্যা ৭২ কোটি, ৭২ লক্ষ, ৭২ হাজার, ২ শত, ১। এদের অধিকাংশই নিষ্ক্রিয় বা সুপ্ত। সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রায় ৩০ হাজার স্নায়ু বা নাড়ি কমবেশি সক্রিয় এবং অন্যগুলি অতি সূক্ষ্মভাবে সুপ্ত থাকে। কর্ম ও চিন্তার মাধ্যমে এই স্নায়ুগুলি সক্রিয় হয়ে ওঠে। জীবনের ভিন্ন ভিন্ন স্তরে অভিজ্ঞতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সুপ্ত স্নায়ুতন্ত্রীগুলি সক্রিয় হয়। সর্ববিধ অভিজ্ঞতা জীবনীশক্তিকে অধিকমাত্রায় বাড়ায়। তার ফলে স্নায়ুগুলি সচল ও সক্রিয় হয়।

অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের সাধকদের মধ্যে স্বভাব প্রকৃতি ও গুণের উন্নত মান, কর্ম ও শক্তির অসাধারণ যোগ্যতা এবং আত্মশক্তি ও অসাধারণ জ্ঞানবিজ্ঞানের অভিব্যক্তি প্রকাশ পায়। তার কারণ অনুশীলন করলে দেখা যায় মানুষের মধ্যে অসীম শক্তি, অনন্ত জ্ঞান ও ভূমানন্দ পূর্ণমাত্রায় স্বভাবতই অন্তর্নিহিত আছে। এর পূর্ণ প্রকাশ বা অভিব্যক্তি সম্ভব হয় তখনই, যখন দেহের অন্তরে অবস্থিত সূক্ষ্ম জীবকোষগুলি ও সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম নাড়ি ও স্নায়ুতন্ত্রীগুলি অধিক মাত্রায় সচল ও সক্রিয় হয়। তখন সে পূর্ণভাবে সেই শক্তি জ্ঞান ও আনন্দের ধারক বাহক ও পরিবেশক হতে পারে।

সমগ্র ঈশ্বরীয় শক্তি জ্ঞান ভাব ও আনন্দের অভিব্যক্তির ক্রম অনুসারে সাধকদের পরিচয় হল— (১) মহর্ষি, (২) দেবর্ষি, (৩) রাজর্ষি, (৪) ব্রহ্মর্ষি। (১) ভূতপ্রকৃতি ও ভূতশক্তির সূক্ষ্ম অনুভূতি ও সম্যক্ উপলব্ধি যাঁদের হয় তাঁরা মহর্ষি নামে পরিচিত। (২) জীবপ্রকৃতি ও জীবশক্তির সূক্ষ্মানুভূতি ও সম্যক্ অনুভূতি হয় যাঁদের মধ্যে তাঁরা হলেন দেবর্ষি। (৩) দেবশক্তি ও দেবপ্রকৃতি সম্বন্ধে যাঁদের সূক্ষ্মানুভূতি ও সম্যক্ উপলব্ধি হয় তাঁদের বলা হয় রাজর্ষি। (৪) ব্রহ্ম আত্মা ঈশ্বরের স্বরূপ ও ঈশ্বরের শক্তি সম্বন্ধে যাঁদের সূক্ষ্মানুভূতি ও সম্যক্ উপলব্ধি হয় তাঁরা ব্রহ্মর্ষি নামে পরিচিত হন।

স্বানুভূতির দৃষ্টিতে উপরোক্ত প্রসঙ্গ ভিন্নভাবে অভিব্যক্ত হয়। যথা, শক্তির বিজ্ঞানের সঙ্গে সম্যক্ পরিচয় যাঁর হয় তিনি হলেন সিদ্ধপুরুষ, শক্তি ও জ্ঞানের বিজ্ঞানের সঙ্গে যাঁর সম্যক্ পরিচয় হয় তিনি হলেন মহাপুরুষ, শক্তি জ্ঞান আনন্দের সঙ্গে যাঁর সম্যক্ পরিচয় হয়েছে তিনি হলেন সিদ্ধমহাপুরুষ, আবার শক্তি জ্ঞান আনন্দ প্রেমের সঙ্গে যাঁর সম্যক্ পরিচয় হয়েছে তিনি হলেন অবতারপুরুষ।

এঁদের মধ্যে কখনও কখনও কিছু ব্যতিক্রমও দৃষ্ট হয়। সেই ব্যতিক্রমের দৃষ্টিতে সিদ্ধপুরুষগণ শক্তির ব্যবহারে লিপ্ত থাকেন বেশি, মহাপুরুষগণ জ্ঞানের ব্যবহারে, সিদ্ধমহাপুরুষগণ আনন্দের ব্যবহারে এবং অবতার-পুরুষগণের মধ্যে অন্যান্য বিজ্ঞানের সঙ্গে প্রেমের ব্যবহারই দৃষ্ট হয় বেশি।

এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল এই যে শক্তি জ্ঞান আনন্দ প্রেম একাধারে ঈশ্বরের স্বরূপমহিমার অন্তর্ভুক্ত, অপরদিকে তাঁর স্বভাববিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। স্বরূপ দৃষ্টিতে পরস্পর এই চতুষ্পাদ অভেদ ও অভিন্ন অদ্বয় তত্ত্বরূপে পূর্ণ সিদ্ধ। কিন্তু স্বভাববিজ্ঞানের দৃষ্টিতে তাঁদের পরস্পরের মধ্যে প্রকাশ ক্রমের উৎকর্ষের তারতম্য ব্যবহারিক দৃষ্টিতে পরিলক্ষিত হয়।

সেইজন্য দেখা যায় জাগতিক বিজ্ঞানে জীবনের বহির্দেশে শক্তির তাৎপর্য অধিক, অন্তরে জ্ঞান বিজ্ঞানের, কেন্দ্রে আনন্দ বিজ্ঞানের এবং তুরীয়তে প্রেমের বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সম্যক্‌ভাবে অনুভূত হয়। এই কারণে জীববিজ্ঞানের ক্রমবিবর্তনের সম্যক্ পর্যালোচনা করলে পরস্পর জীবের মধ্যে শক্তি জ্ঞান আনন্দ প্রেমের ব্যবহারে মাত্রাগত তারতম্য যোগ্যতা ও সাফল্যের মানের তারতম্য, কার্যক্ষমতা, অনুভূতি, বিচার -সামর্থ্য, ব্যবহার-কৌশল, নিপুণতা এবং সর্বোপরি সামঞ্জস্য বোধের ঐক্য ও সমতাবোধের আপনবোধের ব্যষ্টি অপেক্ষা সমষ্টির স্বার্থবোধের সুখশান্তি ও পূর্ণতাবোধের মানের তারতম্য ব্যাপকভাবেই দৃষ্টিগোচর হয়। এর নিগূঢ় তত্ত্ব বহুল-প্রচারিত আধুনিক বিজ্ঞানের কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। কেবলমাত্র স্বানুভবসিদ্ধ, পরমতত্ত্ব এবং পরমার্থে যাঁরা পূর্ণ সিদ্ধ তাঁদের কাছে এর নিগূঢ় রহস্য অতি সহজবোধ্য এবং সহজসিদ্ধ, তা বলাই বাহুল্য।

শক্তির সাধক জ্ঞানের সন্ধান পরিপূর্ণভাবে দিতে পারে না। জ্ঞানের সাধক আনন্দের সন্ধান পরিপূর্ণভাবে দিতে পারে না। আনন্দের সাধক প্রেমের সন্ধান পরিপূর্ণভাবে দিতে পারে না, কিন্তু প্রেমের সাধক সবই দিতে পারে।

সর্বানুভূতির মূলে চিতিমাতাই স্বয়ং

ঈশ্বর হলেন সমগ্রতার ঘনীভূত একক মূর্তি। স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ, সুখ-দুঃখ সবই ঈশ্বর বা মা। প্রেমিক ভক্তের কাছে পাওয়া যায় স্বরূপের পরিচয়। প্রেমিকের কাছে সবই অনন্ত পূর্ণ। সে বলে 'সবই মা, মা-নিয়ে চলি'। যা কিছু সে দেখে সবই মা (মহৎ, মাধব, মহেশ), যা শোনে সবই মা। জাগরণ স্বপ্ন নিদ্রা বা সুষুপ্তি এবং সমাধি সবই মা।

যারা যোগ্যতার অভাবে নিজেদের জীবন নিজেরা পরিমার্জিত, পরিশোধিত করে সত্যদর্শন বা আত্মোপলব্ধি করতে না পারে তাদের জীবনভার সদ্‌গুরু মহাপুরুষদের উপর ছেড়ে দিয়ে তাঁদের নির্দেশে, তাঁদের উপদেশ আদেশ ও শিক্ষাধীনে থেকে তাঁদের কথা মেনে চলে জীবন যাপন করলে জীবন শুদ্ধ ও পরিশোধিত হয়ে সত্যময় চৈতন্যময় ও আনন্দময় হয়ে ওঠে। তখন ঈশ্বরোপলব্ধির কোন অন্তরায় বিশেষ থাকে না। দেহ মন বুদ্ধির ময়লা হল অনন্ত কামনা-বাসনা। অহংকার ও কর্তৃত্বাভিমান হল তার কারণ ও আধার। উত্তম অধিকারী ছাড়া অপরের পক্ষে শুধু ব্যক্তিগত চেষ্টা দ্বারা এগুলি অপসারিত করা যায় না এবং ঈশ্বরের কৃপা ও সদ্‌গুরু মহাপুরুষদের সাহায্য না পেলে উত্তম অধিকারীর পক্ষেও এ সম্ভব নয়। মহাপুরুষদের কাছে কেউ আত্মসমর্পণ করলে তাঁরা তার অশুদ্ধ চিত্তকে শুদ্ধ ও নির্মল করে দেন এবং শুদ্ধচিত্তকে ঈশ্বরবোধে প্রতিষ্ঠিত করে দেন।

সদ্‌গুরুর কাজের বৈশিষ্ট্য

ধোপার কাজের সঙ্গে সদ্‌গুরুর কাজের অনেকাংশে তুলনা চলে। গুরু যেন ধোপা, জীবপ্রকৃতি হল যেন পোশাক পরিচ্ছদ, জীব হল বাবুমশায়। বীজমন্ত্র বা ইষ্টনাম হল সাবান সোডা, জ্ঞানবিচার হল অগ্নি বা তাপ।

নিত্যকর্ম বা সাধন নিষ্ঠা (যোগধ্যান) হল ভাটি। শ্রদ্ধা হল পৈঠা, ভক্তি হল জল, বিশ্বাস হল কলপ এবং আনন্দ হল ইস্ত্রি এবং প্রেম হল স্বানুভূতি।

জীব জীবনকে অজ্ঞানবশত ভুল করে ব্যবহার করে। এইরূপ ব্যবহার দোষে জীবন মলিন হয়। জীবনের মল হল অজ্ঞানজাত দোষ, যথা কামনা বাসনা অহংকার অভিমান দম্ভ দর্প লোভ মোহ ক্রোধ স্বার্থপরতা প্রভৃতি। এদের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়াই হল জীবনের বন্ধন। জীব নিজে এই মলরূপ বন্ধন শোধন করতে পারে না বলে মলের শোধন এবং মলমুক্তির জন্য তাকে সদ্‌গুরুর আশ্রয় নিতে হয়। সদ্‌গুরু যথাবিধি সাধন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শরণাগত আশ্রিত ভক্তজনের চিত্তমল শোধন করে তাকে সর্বতোভাবে বিকারমুক্ত করে দেন। গুরুর কৃপায় বদ্ধজীব পুনরায় মুক্ত স্বরূপ প্রাপ্ত হয়ে মুক্তানন্দে সদ্‌গুরুর জয়গান গেয়ে মুক্তির মহিমা প্রচার করে, অর্থাৎ অপরকে মুক্ত হতে সাহায্য করে।

ত্যাগের নিগূঢ় রহস্য

কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগের তাৎপর্য হল কামিনী-কাঞ্চনরূপ ধারণা বা তদ্‌রূপ মনের ভাবনার ত্যাগ। কেবলমাত্র অর্থ ও নারীকে দূরে সরিয়ে রেখে বা তাদের থেকে নিজেকে দূরে রাখলেই কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ হয় না। সর্বেশ্বরবাদের মতে ঐগুলিকেও ঈশ্বরবোধে গ্রহণ ও ব্যবহার করতে হয়। তাহলেই ওদের গতানুগতিক ভাব বা প্রবাহ থাকে না। যে মনোবৃত্তি দ্বারা কামিনী-কাঞ্চন ব্যবহার করা হয় সেই মনোবৃত্তির শোধন করাই হল মূল উদ্দেশ্য। বস্তুমাত্রই বিষ্ণুর প্রকাশ এবং নারীমাত্রই ভগবতী মায়ের প্রকাশ—এইরূপ ধারণার দ্বারা চিত্ত শোধন হয় এবং ঈশ্বরীয় ভাব ও অনুভূতির বিকাশ হয়। মাতৃবোধে বা গুরুবোধে সব গ্রহণ ও ব্যবহার করলে বস্তু, ব্যক্তি ও কর্মত্যাগ না করেও ত্যাগের ফলস্বরূপ চিত্তের শুদ্ধি, বোধের স্থিতি ও অনাবিল শান্তি পাওয়া যায়।

গুণভেদে সত্যের প্রকাশক্রম

সত্য তমোগুণীর কাছে আবৃত, রজোগুণীর কাছে বিকৃত এবং সত্ত্বগুণীর কাছে অনাবৃত ও অবিকৃতভাবে প্রকাশ পায়। ত্রিগুণের স্বরূপ অদৃশ্য ও অজ্ঞেয় কিন্তু তাদের প্রকাশক্রিয়া দৃশ্য ও জ্ঞেয়। ত্রিগুণজাত সংসারে কোন বস্তুই ত্রিগুণমুক্ত নয়।

আমিষ ও নিরামিষের নিগূঢ়ার্থ

ত্রিবিধ আহার বা খাদ্য হল তামসিক রাজসিক ও সাত্ত্বিক। ব্যাপক অর্থে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুই হল আহার বা খাদ্য। ইন্দ্রিয়ের বিষয় আহরণ বা সংগ্রহ করাই হল আহার করা। আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান মতে অহংকারের দ্বারা (আমারবোধের দ্বারা) ইন্দ্রিয়ের যে কোন বস্তু আহরণ বা গ্রহণই হল আমিষ খাদ্য। 'ত্বংকারবোধে', গুরু আত্মা ঈশ্বর ও ব্রহ্মবোধে কোন জিনিস গ্রহণ, আহরণ ও ব্যবহার করা অথবা অহংকার, কর্তৃত্বাভিমান ও বিষয় অভিলাষ ত্যাগ হল নিরামিষ খাদ্যের তাৎপর্য। সর্বতোভাবে স্থূলবস্তুর ব্যবহারই হল তামসিক খাদ্য। সর্ববিধ সূক্ষ্ম অর্থাৎ সর্ববিধ কৃষ্টি ও সংস্কৃতি হল রাজসিক খাদ্য এবং সর্ববিধ সূক্ষ্মতম অর্থাৎ আত্মজ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞানের অনুশীলনই হল সাত্ত্বিক খাদ্য।

নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্মের সাধনার তাৎপর্য

অখণ্ড বোধতত্ত্বের সাধনা হল ব্রহ্ম আত্মা ঈশ্বর বা মুক্তি ও অমৃতত্বের সাধনা। মনস্তত্ত্ব প্রাণতত্ত্ব ও অহংকার তত্ত্বের সাধনা হল সগুণ ঈশ্বরের সাধনা। সগুণ ঈশ্বরের প্রধান তিনভাব হল ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর। মনোময় ও

বিজ্ঞানময় কোষ হল ব্রহ্মা। প্রাণময় কোষ হল বিষ্ণু। আনন্দময় কোষ হল রুদ্র। জপ হল প্রাণময় কোষের সাধনা, ধ্যান হল মনোময় কোষের সাধনা, জ্ঞান হল বিজ্ঞানময় কোষের এবং ভক্তি হল আনন্দময় কোষের সাধনা।

সগুণতত্ত্বের সাধনা হল ভক্তিযোগের সাধনা। কর্মযোগ ধ্যানযোগ প্রভৃতি সবই হল এই ভক্তিযোগের অন্তর্ভুক্ত। এই ভক্তিযোগকেই 'ইতিবাদ' বলে। নির্গুণতত্ত্বের সাধনা হল জ্ঞানযোগের সাধনা। এই জ্ঞানযোগ হল 'নেতিবাদ'। সর্বত্যাগই হল এর সাধন।

জীবনলীলায় প্রাণচৈতন্যের ভিন্ন ভিন্ন সাধনার বৈশিষ্ট্য

জীবন হল চৈতন্যসাগরে চৈতন্যের পুতুল। এই চৈতন্যই হল প্রজ্ঞাপ্রাণ বা মহাপ্রাণ। অখণ্ড মহাপ্রাণসাগরে অনন্ত তাঁর প্রকাশ জীবজগৎ ধারণ করে আছে। প্রাণের মধ্যেই প্রাণের বাস অর্থাৎ প্রাণের মধ্যে প্রাণের অভিব্যক্তি। প্রাণে মন যোগ করলে হয় সগুণ ঈশ্বরের সাধনা অর্থাৎ ভক্তিযোগের সাধনা। মনেতে নিরোধপূর্বক প্রাণযোগ করলে হয় জ্ঞানযোগের সাধনা। মনেতে হয় বিচার। ধ্যানের সাধনা ভক্তিযোগের অন্তর্ভুক্ত। ধ্যানযোগের লক্ষ্য হল মনঃসংযম করে অর্থাৎ চিত্তের সকল বৃত্তিকে নিরোধ করে মনঃশূন্য অর্থাৎ অ-মন আত্মাতে বাস করা। চিত্তবৃত্তির নিরোধ হলেই চিত্তশুদ্ধি হয়। অথবা চিত্তশুদ্ধি হলে চিত্তবৃত্তির নিরোধ হয়। নিরুদ্ধচিত্তই হল ধ্যানসিদ্ধির লক্ষণ। অর্থাৎ বিষয়শূন্য মনই হল ধ্যানসিদ্ধির লক্ষণ। বিষয়শূন্য মন হল প্রজ্ঞাস্থিতি বা আত্মবোধের লক্ষণ। মনোলয় বা মনোনাশই হল ধ্যানযোগের উদ্দেশ্য। কিন্তু জ্ঞানযোগে মনকে লয় বা নাশ না করে মনের সম্যক্ বিস্তার দ্বারা ব্রহ্মাকারা বৃত্তি লাভ করাই হল উদ্দেশ্য।

সামান্য জ্ঞান অজ্ঞাননাশক নয়। সামান্য জ্ঞান জ্ঞান অজ্ঞান উভয়েরই প্রকাশক। অজ্ঞানের দ্বারা তা বাধিত হয় না। বিশেষ জ্ঞান জ্ঞান অজ্ঞান দ্বারা বাধিত হয়। ব্রহ্মাকারা বৃত্তি দ্বারা সমষ্টি অজ্ঞানের বাধ হয়। অজ্ঞান বাধিত হলে ব্রহ্মজ্ঞানের স্ফুরণ হয়।

ভক্তির উৎকর্ষই হল প্রেম। প্রেমের উদয় হলে যুগলতত্ত্বের অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণ সীতারাম লক্ষ্মীনারায়ণ এবং শিবদুর্গা প্রভৃতির রহস্য পরিষ্কার জানা যায়। যুগলতত্ত্বের অনুভূতি হলেই শুদ্ধবোধের উদয় হয়।

যা সৎ তা বর্তমান। এই সৎ-এর শক্তিই হল ভগবতীমাতা। এই সৎ-এ যারা বাস করে তারাই সত্যবান। মৃত্যু হল চৈতন্যের বক্ষে বিশ্রাম বা স্থিতি। জন্ম হল চৈতন্যের বক্ষে চৈতন্যের অভিব্যক্তি।

সত্যের বক্ষে সত্যের মহিমা

সত্য আমির সন্তান আমিও সত্য। সত্যই হল অমৃত। সত্যই আমি, আমিই সত্য। আমিই অমৃত, অমৃতই আমি। সত্যই হল শুদ্ধ পবিত্র সুতরাং আমিও শুদ্ধ ও পবিত্র। সত্যই প্রবুদ্ধ ও মুক্ত। সুতরাং আমিও প্রবুদ্ধ ও মুক্ত।

পূজা কেন জীবের স্বভাবধর্ম?

সংসারে শিব কালীকে পূজা করে এবং কালী শিবকে পূজা করে। এইরূপে কৃষ্ণ রাধাকে পূজা করে এবং রাধা কৃষ্ণকে পূজা করে। রাম সীতাকে পূজা করে এবং সীতা রামকে পূজা করে। নারায়ণ লক্ষ্মীকে পূজা করে এবং লক্ষ্মী নারায়ণকে পূজা করে। অর্থাৎ মন প্রাণকে পূজা করে এবং প্রাণ মনকে পূজা করে। অথবা আমি তুমিকে পূজা করে এবং তুমি আমিকে পূজা করে। এই পূজাই হল জীবের স্বভাবধর্ম। অন্তরবোধের জাগরণই হল পূজা। সেজন্য দেখা যায় জীবনের অন্তঃসত্তা বহিঃসত্তাকে পূজা করে এবং বহিঃসত্তা অন্তঃসত্তাকে পূজা করে। আবার

তুরীয়সত্তা কেন্দ্রসত্তার মাধ্যমে সর্বসত্তার পূজা করে এবং সর্বসত্তা কেন্দ্রসত্তার মাধ্যমে তুরীয়সত্তাকে পূজা করে। সমগ্র বিশ্বসত্তা সমগ্র বিশ্বশক্তিকে পূজা করে এবং সমগ্র বিশ্বশক্তি সমগ্র বিশ্বসত্তাকে পূজা করে। সমষ্টি সত্তা ব্যষ্টি সত্তাকে পূজা করে এবং ব্যষ্টি সত্তা সমষ্টি সত্তাকে পূজা করে। এইরূপ পূজার মাধ্যমে পরস্পরের মধ্যে নিত্য সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ থাকে। সত্তার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ এবং স্বভাবের অভিব্যক্তি হল এই পূজা। এই পূজার মধ্যে নিত্যও আছে এবং লীলাও আছে। এই হল যুগলতত্ত্বের তাৎপর্য।

তত্ত্বজ্ঞের লক্ষণ

যে এক ছাড়া দুইকে জানে না ও দেখে না সে-ই হল যথার্থ জ্ঞানী[১]। যে এককে ভালবেসে একের সেবা করে সে-ই হল যথার্থ ভক্ত। আপনাকে ছাড়া দ্বিতীয় কাউকেও যে দেখে না বা জানে না সে-ই হল আত্মজ্ঞ বা ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ। যার চিত্ত কামনাশূন্য, সর্বসাধশূন্য, অর্থাৎ যার কোন চাওয়া নেই সে-ই হল শ্রেষ্ঠ ধনী। যার চিত্তে কামনা, সাধ ও চাওয়া আছে সে পৃথিবীর রাজা হলেও ভিখারি এবং দরিদ্র। যে সর্বসাধ ও সর্বকামনাশূন্য তার শান্তির কখনও অভাব হয় না। নির্গুণ যার লক্ষ্য, সগুণ তার পক্ষ। জীবনের সর্বব্যাপারে নিজেকেই যে দায়ী করে সে হল বিজ্ঞানবিদ্‌, অজাতশত্রু, নির্ভীক ও সাধকশ্রেষ্ঠ।

জীবনের সর্বোত্তম আশ্চর্য কী এবং তার পরিচয়

অখণ্ড আমিবোধ হল শুদ্ধ ও পূর্ণ কিন্তু আমারবোধ হল মিথ্যা ও অসত্য ও ভ্রান্তি। 'আমার ভাবযুক্ত আমি' হল বদ্ধ জীব এবং 'আমার ভাবমুক্ত আমি' হল মুক্ত শিব বা আত্মা। জীবের আমি অর্থাৎ 'আমার ভাবযুক্ত আমি' হল 'কাঁচা আমি'। 'কাঁচা আমি হল জীবাত্মা এবং 'পাকা আমি' হল পরমাত্মা। কাঁচা আমি হল ভক্ত ও শিষ্য, পাকা আমি হল ব্রহ্ম ঈশ্বর ও সদ্‌গুরু।

একবোধে, সমবোধে বা আপনবোধে অন্তরে বাইরে সবকিছুকে যে 'মেনে মানিয়ে চলে' সে অদ্বয়তত্ত্বে সর্বদাই প্রতিষ্ঠিত থাকে। সে-ই হল প্রাজ্ঞশ্রেষ্ঠ, প্রেমের শিরোমণি। নারীমাত্রকে যে মাতৃবোধে গ্রহণ করতে পারে অচিরেই তার চিত্তশুদ্ধি হয় এবং সে দিব্যভাবের অধিকারী হয়। জীবমাত্রেই যে হরিনারায়ণ জ্ঞানে, শিবজ্ঞানে গোবিন্দ নামে, গুরু ও ইষ্টজ্ঞানে দর্শন করে ও সেবা করে সে ঋষিকল্প মহাপুরুষ। দ্বৈতভাবশূন্য যার চিত্ত সে-ই হল যথার্থ স্বাধীন ও যথার্থ মুক্ত। সর্বব্যাপী বোধকেই যে সর্বত্র দেখে শোনে ও জানে সে ব্রহ্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত। তার জন্মও নেই, ক্ষয়ও নেই, বৃদ্ধিও নেই। তার সৃষ্টিও নেই, লয়ও নেই। সে-ই হল নিত্যপুরুষ।

'আমার বোধের' ব্যবহারই হল অজ্ঞান। এই হল সংসারবন্ধন, দুঃখকষ্ট ও জন্মমৃত্যুর কারণ। 'তোমার বোধের' ব্যবহার দ্বারা আমার বোধের শোধন হয়। তখন সংসারবন্ধন শিথিল হয়, দুঃখকষ্ট লাঘব হয় এবং জন্ম ও মৃত্যু রুদ্ধ হয়।

পূর্ণের অন্তর্গত হল কিছু। কিছু চাইলে ও কিছু নিলে পূর্ণকে চাওয়াও হয় না এবং নেওয়াও হয় না। পূর্ণকে চাওয়া যায় না, নেওয়াও যায় না। কিছু না-চাইলে এবং না-নিলে পূর্ণই থেকে যায়। পূর্ণতে পূর্ণ থাকার রহস্যই হল কিছু না-চাওয়া এবং শুধু চেয়ে দেখা।

কর্তা ভোক্তা জ্ঞাতা হল অন্তঃকরণের বৃত্তি ও ব্যবহার। সাক্ষীদ্রষ্টা হল কূটস্থ চৈতন্য বা শুদ্ধ আত্মার লক্ষণ। অসাক্ষী ও অদ্রষ্টা হল নির্গুণ তত্ত্বের পরিচয়। [১৯।৬।৬৮]

১। অভিনব সংজ্ঞা।

সংস্কারের গুরুত্ব

প্রকৃতিগত গুণ রুচি শক্তি সামর্থ্য যোগ্যতাকেই সংস্কার বলে। এই সংস্কার অনুযায়ী মানুষের জীবনধারা কর্ম ধর্ম সাধন ও সিদ্ধি লাভ হয়। আপন আপন সংস্কার অনুযায়ী মানুষ জীবনের লক্ষ্য ও তার সাধনপদ্ধতি বেছে নেয়।

ব্রহ্মতত্ত্বের দ্বিবিধ মহিমা

ব্রহ্ম আত্মা ঈশ্বরের স্বরূপ ও তাঁর স্বভাবশক্তিকে অবলম্বন করে দ্বিবিধ ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। একটি হল মাধুর্যের ভাব এবং অপরটি হল ঐশ্বর্যের ভাব। উভয়ই এক তত্ত্বের এপিঠ ওপিঠ মাত্র। প্রথমটি হল কেন্দ্রের রূপ, দ্বিতীয়টি হল অন্তর ও বাইরের রূপ। মাধুর্যভাবের সাধনা হল প্রেমভক্তির সাধনা। মাধুর্যভাবের সাধকের সেবা প্রীতিযুক্ত হয়ে স্ববোধের রূপ নেয়। স্ববোধরূপ আত্মার প্রীতিই হল প্রেম ও মাধুর্যের তাৎপর্য। স্ববোধ হল নিজবোধ, আপনবোধ বা আত্মবোধ। নিজবোধে বা আপনবোধে সেবা করাই হল আত্মবোধের ধর্ম। আত্মবোধই হল ব্রহ্মবোধ বা সত্যবোধ। আপনবোধে সেবার নামই মাধুর্যের সাধনা। প্রীতিবোধ ও আপনবোধের ব্যবহার দ্বারা যে-সেবা বা ভজন প্রভৃতি হয় তার সঙ্গে থাকে শুদ্ধ অন্তরের প্রেম অনুরাগ ও ভালবাসা। এই প্রেমের মাধ্যমেই পরম তত্ত্বের সঙ্গে একাত্মমিলন হয়। বিশুদ্ধ প্রেমের ধর্ম হল ঐক্য সমতা একতা ও পূর্ণতা।

ভাবের মাধ্যমেই আত্মার সঙ্গে সম্বন্ধ

আনন্দস্বরূপের সঙ্গে জীবের অভেদ সম্বন্ধ পঞ্চবিধ মাধুর্য ভাবের মাধ্যমে ক্রমপর্যায়ে সিদ্ধ হয়। এই পঞ্চবিধ সম্বন্ধ হল শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য, সখ্য ও কান্তা ভাব।

ঐশ্বর্য ও মাধুর্য সাধনার লক্ষ্য ভিন্ন

ঐশ্বর্য ভাবের সাধনায় শক্তির প্রভাব থাকে প্রধান। আগে শক্তি পরে হল স্বরূপ। কিন্তু মাধুর্য ভাবের সাধনায় শক্তি অপেক্ষা স্বরূপের প্রাধান্য সর্বাধিক থাকে। শক্তির বিশিষ্ট বিশিষ্ট প্রকাশকে ঐশ্বর্য বলে। ঐশ্বর্য সাধক শক্তির বিভূতিকে লক্ষ্য করেই সাধনা করে। তাদের ধারণা শক্তিকে ধরে শক্তিমানের পরিচয় পাওয়া যায়। শক্তির সাধনায় সিদ্ধি হয় অর্থাৎ শক্তিকে পেয়ে তারা কিন্তু শক্তিমানকে ভুলে যায়। ভগবানকে স্বরূপত পায় না। মাধুর্য ভাবের সাধনায় ঈশ্বরের স্বরূপের সঙ্গে পূর্ণভাবে একাত্ম হওয়া যায়। ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁর ঐশ্বর্য থাকেই। মাধুর্যের সঙ্গে তার ঐশ্বর্য নিত্যযুক্ত থাকাতে মাধুর্যের সাধনায় মাধুর্য ও ঐশ্বর্য উভয়কেই পাওয়া যায়। কিন্তু ঐশ্বর্যের সাধনায় শুধু ঐশ্বর্যই পাওয়া যায়, মাধুর্য আবৃত থাকে।

বিশুদ্ধ প্রেম ভালবাসার মধ্যে যে-আনন্দ আছে তা অখণ্ড। মাধুর্য ভাবের সাধক ঈশ্বরকে জীবনের সর্বস্তরে সমানভাবে অনুভব করে। বিশুদ্ধ প্রেমই হল পরম তত্ত্বের স্বরূপ অর্থাৎ ঈশ্বরের স্বরূপ। আনন্দের পরাকাষ্ঠাই হল প্রেম।

ঐশ্বর্যের সাধনা আড়ম্বর ও জাঁকজমকপূর্ণ। কিন্তু মাধুর্যের সাধনায় জাঁকজমক নেই, আড়ম্বর নেই। এ একান্ত গোপন সাধনা।

প্রেমের সাধনার তাৎপর্য

শুদ্ধ ইন্দ্রিয়মনকে গোপী[১] বলে। এই গোপীভাব দিয়েই ঈশ্বরের সঙ্গে প্রেমের সম্বন্ধ ও প্রেমের সাধনা শুরু হয়। প্রেমের সাধনা হল শুদ্ধ মন প্রাণকে বোধস্বরূপ আত্মার কাছে পূর্ণভাবে সমর্পণ করা।

দৈবী ও আসুরিক ভাবের পার্থক্য

সংসারে দুই প্রকৃতির লোক আছে। এক দল হল সুর বা দেবভাবাপন্ন, অপর দল হল অসুরভাবাপন্ন। দৈবী সম্পদ হল সত্ত্বগুণান্বিত এবং আসুরিক সম্পদ হল রাজসিক ও তামসিক গুণান্বিত। দৈবী সম্পদ হল অভয়, শুদ্ধবুদ্ধি, জ্ঞাননিষ্ঠা, ধ্যান-যোগনিষ্ঠা, ইন্দ্রিয়সংযম, দান, যজ্ঞ, স্বাধ্যায়, তপস্যা, সরলতা, অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, শান্তি, অবিদ্বেষ, দয়া, বস্তুর প্রতি অলোভ, মৃদুতা, লজ্জা, অচপলতা, তেজ, শৌচ, ক্ষমা, ধৃতি (ধৈর্য, স্থৈর্য, সহিষ্ণুতা), অদ্রোহ, অভিমানশূন্যতা প্রভৃতি। আসুরিক সম্পদ হল কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, দম্ভ, অহংকার, অভিমান, অজ্ঞানতা প্রভৃতি। দৈবী গুণসকল সত্য-ঈশ্বর-আত্মোপলব্ধি ও মুক্তি লাভের সহায়ক। আসুরিক গুণসকল বন্ধন জন্মমৃত্যু ও দুঃখকষ্টের কারণ। স্বেচ্ছায় দুঃখকষ্ট বরণ করাই হল যথার্থ তপস্যা[২]।

জীবনের ধর্ম ও কর্ম প্রবৃত্তির কারণ

অজ্ঞানজাত আশা ও কামনাই হল জীবনের ঊর্ধ্বগতি ও নিম্নগতির কারণ। তা হতেই ধর্ম ও কর্মের প্রবৃত্তি জাগে। কর্ম অনুরূপ অভিজ্ঞতা ও ফলভোগ হয়। কর্ম অস্থায়ী বিকারশীল ত্রিগুণাত্মক ও অজ্ঞানপ্রসূ বলে কর্মজ সংস্কার, জ্ঞান ও ফলভোগ অস্থায়ী ও বিকারী। কিন্তু জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম আত্মা কর্ম বা সাধনসাপেক্ষ নয়। এ নিত্যবস্তু স্বয়ংপ্রকাশ। সুতরাং জ্ঞান হল নিত্যবস্তু এবং জ্ঞানসাপেক্ষ, বিষয়সাপেক্ষ নয়।

বস্তু ও প্রকৃতির মধ্যে পার্থক্য

বস্তু হল নিত্য সত্য পরম তত্ত্ব এবং বিষয় হল প্রকৃতিজাত ত্রিগুণের সংমিশ্রিত প্রকাশ বিশেষ। বিষয় হল ভৌতিক এবং বস্তু হল পারমার্থিক। ব্রহ্মই হল যথার্থ বস্তু। এ অপ্রাকৃত অস্পৃষ্ট শাশ্বত নিত্যনির্বিকার অদ্বয় অব্যয় অমৃতময়। বিশুদ্ধ বোধস্বরূপই হল ভূমাস্বরূপ। এ সচ্চিদানন্দময়, অর্থাৎ সৎস্বরূপ চৈতন্যস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপই হল নিত্যবস্তুর যথার্থ পরিচয়। এই ব্রহ্ম ছাড়া আর সবই অবস্তু বা বিষয়। তা-ই হল অসৎ অচিৎ এবং আনন্দশূন্য। অর্থাৎ অজ্ঞানই হল বিষয়। এই অজ্ঞান বা বিষয় সৎও নয় অসৎও নয়, সদসৎও নয় আবার 'সদসৎ নয়' তাও নয়। এ অনির্বচনীয় যৎকিঞ্চিৎ ভাব মাত্র। অর্থাৎ এর ব্যবহারিক অস্তিত্ব আছে কিন্তু পারমার্থিক অস্তিত্ব নেই। আত্মজ্ঞান হল বিশুদ্ধজ্ঞান। বিশুদ্ধজ্ঞানে অজ্ঞান থাকে না এবং অজ্ঞানের ক্রিয়াও থাকে না। অজ্ঞানের ক্রিয়াই হল জগৎ প্রতীতি।

ঈশ্বরীয় শক্তির স্তরবিভাগ

এক ঈশ্বরীয় শক্তির পঞ্চবিধ স্তর—(১) ভূতশক্তি বা ভূতপ্রকৃতি, (২) জীবশক্তি বা জীবপ্রকৃতি, (৩) দৈবশক্তি বা দৈবপ্রকৃতি, (৪) ঈশ্বরীয় শক্তি বা প্রকৃতি, (৫) পরমেশ্বরীয় শক্তি বা প্রকৃতি।

পাঞ্চভৌতিক স্তর হতে মনুষ্য স্তর পর্যন্ত যে শক্তি তার নাম মায়াশক্তি। নানাত্ব বহুত্বের খেলা হল এর

১। তত্ত্বের দৃষ্টিতে। ২। তত্ত্বের দৃষ্টিতে।

বিশেষত্ব। দেবতাদের মধ্যে মহামায়াশক্তি এবং ঈশ্বরের মধ্যে যোগমায়াশক্তি। মায়াশক্তি তমোপ্রধান, মহামায়াশক্তি রজোপ্রধান এবং যোগমায়াশক্তি সত্ত্বপ্রধান।

ত্রিগুণের পরস্পর বৈশিষ্ট্য

তমোগুণের বৈশিষ্ট্য হল আবরণ, রজোগুণের বৈশিষ্ট্য হল গতি ও ক্রিয়া এবং সত্ত্বগুণের বৈশিষ্ট্য হল স্থিতি ও প্রকাশ।

তিন গুণের তিন শক্তির তাৎপর্য

মায়াশক্তির দুইটি কাজ হল আবরণ ও বিক্ষেপ। আবরণ হল তমোপ্রধান এবং বিক্ষেপ হল রজোপ্রধান। মায়াশক্তি এই উভয়ের মধ্যে ক্রিয়া করে। মহামায়াশক্তি হল রজ ও সত্ত্বগুণাত্মক। এ হল দেবশক্তি। দেবশক্তির দ্বারাই ভূতশক্তি নিয়ন্ত্রিত হয়। এই দেবশক্তির মধ্যে জীবশক্তি নিহিত। জীব মহামায়ার সাহায্য ছাড়া মায়াশক্তি অর্থাৎ তমোশক্তির প্রভাবমুক্ত হতে পারে না। জড়তা তামসিকতা প্রভৃতি দূর করার জন্য দৈবশক্তির সাহায্য মানুষ চায়। সেইজন্য মানুষ দেবতাদের পূজা অর্চনা করে ও তাঁদের আশীর্বাদ প্রার্থনা করে। দেবতাদের আশীর্বাদে মানুষ দৈবী সম্পদের অধিকারী হয়। এই দৈবী সম্পদই হল সত্ত্বগুণসকল। সত্ত্বগুণের অধিষ্ঠাত্রী হল যোগমায়াশক্তি। মহামায়ার কৃপা পেলে যোগমায়ার কৃপাও লাভ করা যায়।

তিনগুণের মিশ্রণেই জগৎ সৃষ্টি। পরস্পর গুণের সঙ্গে দ্বন্দ্বই হল ভেদের কারণ। গুণের রাজ্যে গুণের প্রভাবে পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও বিরোধ হল প্রধান। তমোগুণী মানুষ হল পশুভাবাপন্ন, রজোগুণী মানুষ হল আসুরীভাবাপন্ন এবং সত্ত্বগুণী মানুষ হল দেবভাবাপন্ন।

শরৎকালের তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

শরৎকাল হল ক্ষিতিতত্ত্ব প্রধান। ক্ষিতিতত্ত্বের প্রাধান্য হল জড়ত্ব বা তমোগুণের প্রাধান্য। এই তমোগুণের প্রভাবমুক্ত হওয়ার জন্য মহামায়াশক্তির পূজার আয়োজন হয়। মায়ের আশীর্বাদে রজোগুণের বিকাশ হওয়ার পর সত্ত্বগুণের অধিকারী হওয়া যায়।

অদ্বৈতবাদীর সিদ্ধান্ত

অদ্বৈতজ্ঞানবাদীর মতে ব্রহ্মই সত্য এবং সেই সত্য ব্রহ্মই আমি। সে ব্রহ্মবোধে ব্রহ্ম হয়ে বাস করে। দ্বৈতবাদী প্রথমে 'তুমি ও আমি' বোধে ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক পাতায় পরে 'সবই তুমি' বোধে মানে। তার ফলে তার ইষ্টতাদাত্ম্য লাভ হয়।

দ্বৈতবাদীর (লীলাবাদীর) সিদ্ধান্ত

জগৎ হল মায়ের খেলা ও স্বভাবশক্তির খেলা। এই বোধে অবতারগণ লীলা করেন। অবতারগণ যোগমায়াশক্তিকে মাধ্যম করে কাজ করেন। তাঁরা মায়াশক্তিকে অস্বীকার না করে যোগমায়াশক্তির অন্তর্গত বা স্বভাবের অন্তর্গত করে তা ব্যবহার করেন। মায়াশক্তি দ্বারা আবৃত বা অভিভূত হয়ে তাঁরা কোন কাজ করেন না।

ভক্ত ও জ্ঞানীর সাধন ভিন্ন কিন্তু লক্ষ্য এক

মায়াশক্তির প্রভাব অতিক্রম করা খুব কঠিন। অদ্বৈতবাদী মায়াকে স্বীকার করে জ্ঞানের দ্বারা মায়ার প্রভাব অতিক্রম করে। বিচারের দ্বারা তারা প্রকৃতিপুরুষের বিবেকখ্যাতি লাভ করে প্রকৃতিমুক্ত অর্থাৎ ত্রিগুণমুক্ত হয়। ভক্ত যোগী মায়াকে মাতৃবোধে গ্রহণ করে ও 'মেনে মানিয়ে চলে' মায়ার প্রভাবমুক্ত হয়। মাতৃবোধে মায়াকে মানলে মায়ার প্রভাব যথার্থই কমে যায় ও পরিশেষে থাকে না।

ঐশ্বর্য ও মাধুর্য ভাবের সাধনার মধ্যে পার্থক্য

ঐশ্বর্য ভাবের সাধনায় অহংকারের প্রাধান্য থাকে বলে এতে পার্থক্য বা ভেদজ্ঞান থেকে যায়। সেই জন্যই তার অপরের উপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা থাকে। কিন্তু মাধুর্য ভাবের সাধনায় ত্বংকারের প্রভাবে সাধকের মধ্যে প্রকাশ পায় একাত্ববোধ, পরস্পরের প্রতি শুভেচ্ছা, সহানুভূতি ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। ভক্তির উপাসনাতে যুক্তি বিচার অপেক্ষা বিশ্বাসের প্রাধান্য অধিক থাকে। কিন্তু জ্ঞানের সাধনায় বিশ্বাস অপেক্ষা যুক্তি বিচার ও বিশ্লেষণের প্রাধান্য অধিক থাকে। বিচারের দ্বারা মস্তিষ্কের বিকাশ ঘটে কিন্তু হৃদয়বত্তার বিকাশ হয় না। ফলে নীরস শুষ্ক ভাব বেড়ে যায়। বিশ্বাসের সাধনা হৃদয়বত্তাকে অবলম্বন করে হয় বলে তা স্বয়ংসম্পূর্ণ। হৃদয় হল আনন্দ ও প্রেমরসের কেন্দ্র, বিশ্বাসের স্থান এবং পরম ঐক্য ও মহামিলনের ভাবকেন্দ্র।

সাধ ও সাধ্যের রহস্য

অন্তরে সাধ রেখে পূর্ণ সমর্পণ হয় না। সর্ব সমর্পণ করে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করলে সাধ্য বাড়ে। নির্ভরতার ফলে সাধ কমে যায়, সাধ্য অধিক হয়। সাধ্য হল ইষ্টেরই বিশেষ রূপ। ঈশ্বরের উপর সর্বতোভাবে নির্ভর করার সহজ উপায় হল অখণ্ড বিশ্বাসের সঙ্গে জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ম শ্বাসপ্রশ্বাসের প্রতি সচেতন হওয়া। শ্বাসপ্রশ্বাস হল প্রাণের ধর্ম ও ক্রিয়া। শ্বাসপ্রশ্বাস হল প্রাণের জন্য এবং প্রাণ হল মহাপ্রাণের জন্য। প্রাণের কাছে প্রাণই হল সর্বাপেক্ষা প্রিয়। প্রাণের প্রিয় কর্ম হল শ্বাসপ্রশ্বাস। ইষ্টের প্রিয় হল প্রাণ এবং প্রাণের প্রিয় হল ইষ্ট। অর্থাৎ ভক্ত হল ঈশ্বরের প্রিয় এবং ঈশ্বরও হলেন ভক্তের প্রিয়।

মন দিয়ে ইষ্টের স্মৃতি ভাবনা করাই হল ইষ্টপ্রেমের লক্ষণ এবং মনের মধ্যে ইষ্টের স্মৃতি জাগ্রত হওয়াই হল ভক্তের প্রতি ইষ্টের অনুগ্রহ। একান্ত মনে ঈশ্বরের কথা ভাবলে তাঁকে পূর্ণ মন দেওয়া হয়ে যায়। তাতে পূর্ণ মনসংযোগ করাই হল ভক্তিসাধনার মূল উদ্দেশ্য।

সমর্পণ একাধিক ভাবে হতে পারে

সমর্পণ চার ভাগে সম্পন্ন হয়—(১) প্রীতিপূর্বক বোধের দ্বারা বোধের দর্শন ও বোধের ব্যবহার হল বোধের সমর্পণ। এ-ই হল পূর্ণ সমর্পণ। (২) পৃথক বোধের অস্তিত্বকে অহংকার বলে। অহংকার হল কর্তা। সমষ্টিবোধের কাছে অহংকারের কর্তৃত্বকে সমর্পণ। (৩) আত্মগুরু, ইষ্ট বা বোধের প্রীত্যর্থে সর্ব কর্ম করা হল কর্ম সমর্পণ। (৪) ঈশ্বর আত্মা গুরু ইষ্টকে সর্ববিধ কর্মফলের সমর্পণ।

বিশ্বাস ও বোধ তত্ত্বত অভিন্ন

অখণ্ড বিশ্বাসই হল বিশুদ্ধ বোধের লক্ষণ। যেহেতু বিশুদ্ধ বোধস্বরূপই হল ঈশ্বর সেই হেতু অখণ্ড বিশ্বাসের ঘনীভূত রূপ হল ঈশ্বর।

শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের সত্য পরিচয়

শ্রদ্ধা হল শ্রেষ্ঠ ও মহতের প্রতি আনুগত্যমূলক ব্যবহার এবং বিশ্বাস হল সত্যানুভূতির ব্যবহার। সত্যকে ধারণ করাই হল শ্রদ্ধা এবং সত্যকে জানা হল বিশ্বাস। উভয়ের মধ্যে যে প্রীতিসুলভ সম্বন্ধ তা-ই হল ভক্তি।

গুণভেদে শ্রদ্ধা-ভক্তি-বিশ্বাস ত্রিবিধ

ত্রিবিধ শ্রদ্ধা-ভক্তি-বিশ্বাস হল—সাত্ত্বিক শ্রদ্ধা, রাজসিক শ্রদ্ধা ও তামসিক শ্রদ্ধা। সাত্ত্বিক ভক্তি, রাজসিক ভক্তি ও তামসিক ভক্তি। সাত্ত্বিক বিশ্বাস, রাজসিক বিশ্বাস ও তামসিক বিশ্বাস।

শ্রদ্ধাকে মা বলা হয়। ভক্তি, বিশ্বাসও মায়েরই স্বরূপ। এই চিতিমাতা সর্বরূপ ধারণ করেছেন।

গুণ-উপাধিযোগে চৈতন্যের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার পরিচয়

জড়ত্ব হল চৈতন্যশক্তির এক বিশেষ ঘনীভূত অবস্থা। প্রাণই চৈতন্য এবং চৈতন্যই প্রাণরূপে নিজেকে প্রকাশ করে। প্রাণই প্রাণকে প্রকাশ করে অর্থাৎ চৈতন্যই চৈতন্যকে প্রকাশ করে। প্রকাশের পূর্বাপর ধারা অনুসারে প্রকাশগুলির মধ্যে মানের তারতম্য হয়। সর্বনিম্ন মানের প্রকাশকেই বলা হয় জড় বস্তু এবং সর্বোচ্চ মানই হল বিশুদ্ধ চৈতন্য। এই উভয়ের মাঝে বহু স্তর আছে। সবগুলি স্তরকে ব্যবহারের সুবিধার জন্য চার ভাগে ভাগ করা হয়, যথা—রূপ নাম ভাব বোধ, অথবা দেহ প্রাণ মন আত্মা। নিম্ন দিক হতে বিচার করলে পরস্পর স্তরগুলির সঙ্গে আধার-আধেয় সম্বন্ধ। যেমন রূপ হল আধার এবং নাম হল আধেয়, নাম ও নামরূপ একসঙ্গে আধার এবং ভাব হল আধেয়। আবার ভাব ও রূপ নাম ভাব এক সঙ্গে আধার এবং বোধ হল আধেয়। এই বোধরূপ আধেয় হল সর্বশ্রেষ্ঠ। আধার হল সৃষ্টি এবং আধেয় হল স্রষ্টা, নিয়ন্তা ও পাতা। নিয়ন্তা তার সৃষ্টির মধ্যে বিনা দ্বিধায় থাকতে পারে। আধারের অন্তরেও চৈতন্য এবং বাইরেও চৈতন্য। অন্তর এবং বাহির উভয়ই পরস্পর সংযুক্ত হয়েই অবস্থান করে। অন্তরের চৈতন্য নিজেকে যখন বাইরে ব্যবহার করে বা প্রকাশ করে তা-ই হল প্রকৃতি ও সৃষ্টি। আবার প্রকৃতি ও সৃষ্টি বাইরে থেকে যখন অন্তরে ফিরে আসে তখন হয় স্বভাবে অনুভূতি। অন্তরের অনুভূতি বাইরে সৃষ্টিরূপে ব্যক্ত হয় আবার বাইরের সৃষ্টি অন্তরে অনুভূতি রূপে ফিরে আসে। উভয়ের মধ্যে এক চৈতন্যই আছে। দুটি সমধর্মী বস্তু পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে এক হয়ে যেতে পারে কিন্তু দুইটি বিপরীত ধর্মী বস্তু মিশে এক হয়ে যেতে পারে না। বোধের সঙ্গে বোধই এক হয়ে মিলে/যেতে পারে। প্রতি বস্তুর মধ্যে বোধ অনুস্যূত হয়ে আছে বলেই প্রতি বস্তুর অনুভূতি হয়। অর্থাৎ প্রতি বস্তুর বোধ এক হয়ে মিশে যায়। এই হল বোধের দর্শন। এক চৈতন্যই আপন ইচ্ছারূপে প্রকৃতিযুক্ত হয়ে নানাত্ব বহুত্বের মধ্যে যখন বাস করে এবং নানাত্ব বহুত্বকে যখন ব্যবহার করে তখন সে-ই হল সংসারী জীব। সেই চৈতন্যই যখন বহির্ভাব পরিত্যাগ করে অন্তরভাবের সঙ্গে যুক্ত হয় তখন হল সে সাধক। সেই চৈতন্যই আবার যখন বহিরন্তর উভয় ভাবের সঙ্গে সমান ভাবে যুক্ত থাকে তখন সে হল প্রকৃতি অধিপতি সগুণ ঈশ্বর। আবার যখন সেই চৈতন্য নিজের মধ্যে নিজে সমাহিত থাকে এবং তার কোন অন্তর বাহির প্রভৃতি থাকে না তখন সে হল নির্গুণ নির্বিশেষ পরব্রহ্ম পরমাত্মা পরমেশ্বর।

কেবলমাত্র বহির্ব্যবহারের প্রাধান্যযুক্ত চৈতন্যই হল জীব। কেবলমাত্র অন্তর্ব্যবহারের প্রাধান্যযুক্ত চৈতন্য হল সাধক। বাহির ও অন্তর উভয় ভাবের ব্যবহারের সঙ্গে সমানভাবে যুক্ত চৈতন্য হল সগুণ ঈশ্বর এবং বাহির অন্তর উভয় ভাবের ব্যবহারশূন্য অখণ্ড বিশুদ্ধ নিবিশেষ চৈতন্য হল পরব্রহ্ম।

তপস্যার দ্বিবিধ বিজ্ঞান

দ্বিবিধ তপস্যার একটি হল বহির্মুখী বা সৃষ্টিমুখী পরিক্রমা এবং অপরটি হল কেন্দ্রমুখী বা স্থিতিমুখী পরিক্রমা। সগুণে হল সৃষ্টি ও গতি এবং নির্গুণে হল লয় ও স্থিতি।

তপোশক্তি বা জ্ঞানশক্তির বহিরভিব্যক্তি হল ক্রিয়াশক্তি অর্থাৎ সৃষ্টি ও গতি এবং তপোশক্তির অন্তরস্থিতি হল স্বানুভূতি মুক্তি ও শান্তি। বুদ্ধির বহিরভিব্যক্তি হল কর্ম ও সৃষ্টি এবং বুদ্ধির আত্মাতে স্থিতিই হল মুক্তি ও শান্তি।

অদ্বয়জ্ঞানই হল আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান। এই অদ্বয়জ্ঞানই হল অমৃতত্ব। দ্বৈতভাবে হয় দ্বন্দ্ব, মৃত্যুভয় প্রভৃতি। অদ্বৈতবোধ হল নির্দ্বন্দ্ব ও অভয়পদ। [২২।৬।৬৮]

জীবের সম্যক্ পরিচয়

দেহকে আশ্রয় করে প্রাণের অভিব্যক্তিকেই জীবন বলা হয়। জীবনের সত্য পরিচয় হল বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম বা আত্মা। যার মাধ্যমে তিনি নিজেকে নিজে আস্বাদন করেন তাকে জীব আখ্যা দেওয়া হয়। সুখ-দুঃখ, আনন্দ-নিরানন্দ প্রভৃতি ভাবগুলি জীবস্বভাবের বৈশিষ্ট্য। জীবের অন্তরাত্মারূপে পরমাত্মা স্বয়ং এগুলি আস্বাদন করেন। এগুলি আস্বাদন করেও তিনি শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত ও নির্বিকার থাকেন। নিত্য নির্বিকার স্বভাবই হল তাঁর বৈশিষ্ট্য। জীবভাব হল তাঁর প্রকাশমাধ্যম বা লীলামাধ্যম।

অভিন্ন সত্তা ও শক্তির পরিচয়

ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি অথবা পরমাত্মা বা পরমাত্মশক্তি অভেদ। ব্রহ্মশক্তি বা পরমাত্মশক্তিরূপী মহাকালী ব্রহ্ম-আত্মার সত্য স্বরূপকে নিরন্তর প্রকাশ করেন। ব্রহ্মের নির্গুণ স্বরূপকেও তিনি প্রকাশ করেন এবং সগুণ স্বরূপকেও তিনি প্রকাশ করেন। তিনি বিজ্ঞানময়ী ও প্রজ্ঞানময়ী উভয়ই, নির্গুণা ও সগুণা উভয়ই, অদ্বৈত ও দ্বৈত উভয়ই, নিরাকার ও সাকার উভয়ই, অমূর্ত ও মূর্ত উভয়ই। তিনি সমগ্র শক্তি জ্ঞান আনন্দের ঘনীভূত রূপ। এক কথায় সচ্চিদানন্দময়ী মা-ই ব্রহ্ম আত্মা ঈশ্বর স্বয়ং। শক্তি ও শক্তিমান অভেদ, নির্গুণ ও সগুণ অভেদ, প্রজ্ঞান ও বিজ্ঞান অভেদ, প্রকাশক ও প্রকাশ অভিন্ন, নিত্য ও লীলা অভেদ, অদ্বৈত ও দ্বৈত অভেদ।

মা কালী তাঁর জিহ্বা দ্বারা জীবত্বকে নির্দেশ করেন। জিহ্বা হল আস্বাদনের কর্তা। জিহ্বা দিয়েই জীব আস্বাদন করে। মা তাঁর জিহ্বা দ্বারা জিভ্ ও জীব উভয়কেই প্রকাশ করেন। জিহ্বা দ্বারা আস্বাদন হয়। জীবই আস্বাদন করে। ইন্দ্রিয়মাত্রই জিভের অধীন। ইন্দ্রিয়গুলি হল আস্বাদনের করণ।

সর্ব ব্যষ্টিজীবনের উদ্দেশ্য হল স্বভাবমহিমা আস্বাদনের শেষে আপন অখণ্ড পূর্ণ স্বরূপে পুনরায় মিশে যাওয়া। স্বভাবমহিমা আস্বাদনের জন্য জীব সংসারী হয়।

জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

জীবনের উদ্দেশ্য হল স্বভাব আনন্দ আস্বাদন করা। এই আনন্দ আস্বাদন করতে হলে সর্ববিধ গুণ থাকা দরকার। আস্বাদন কখনও হয় খণ্ডিত ভাবে কখনও হয় অখণ্ড ভাবে। গুণভাবে হয় খণ্ড আস্বাদন, অর্থাৎ পৃথক পৃথক দর্শন ও জ্ঞান হয় ইন্দ্রিয় বোধে, অতীন্দ্রিয় বোধে হয় সমষ্টির জ্ঞান ও আস্বাদন এবং ইন্দ্রিয়াতীত হল অখণ্ডের বোধ ও আস্বাদন। সহজ কথায় বস্তুজ্ঞান হল খণ্ডজ্ঞান ও আস্বাদন, অধ্যাত্মজ্ঞান হল সমষ্টি জ্ঞান ও আস্বাদন এবং অমৃতত্ব বা ব্রহ্মজ্ঞান হল অখণ্ড জ্ঞান আস্বাদন। অদ্বয়তত্ত্বে প্রতিষ্ঠাই হল অখণ্ড ভূমাতে প্রতিষ্ঠা।

জীবভাব হল ব্যষ্টিভাব। ব্যষ্টিভাবই হল খণ্ড জ্ঞান। ঈশ্বরীয় ভাব (সগুণ ঈশ্বর) হল সমষ্টি জ্ঞান। সগুণ ঈশ্বর হল বিশ্বাত্মা অর্থাৎ সমগ্র ব্যষ্টিজীবের অধিপতি। নির্গুণ ঈশ্বর হল পরব্রহ্ম পরমাত্মা বা নির্বিশেষ তত্ত্ব। সচ্চিদানন্দ হল তাঁর স্বরূপ।

জীব ও আত্মার পরিচয়

গুণরূপে অর্থাৎ বিশেষণরূপে বিশেষ্যের সঙ্গে যুক্ত ভাবই হল জীবভাব। সকলের মধ্যে 'আমি বোধে' যে আছে সে-ই হল অদ্বয় বোধস্বরূপ আত্মা। ব্যষ্টি আমির সঙ্গে সমষ্টি আমি ও অখণ্ড আমির সম্পর্ক হল জীবাত্মা ও পরমাত্মা, কাঁচা ও পাকা, অংশ ও অংশী, তরঙ্গ ও সাগর, আশ্রিত ও আশ্রয়, অঙ্গ ও অঙ্গী, রথ ও রথী, ঘর ও ঘরণী, যন্ত্র ও যন্ত্রী, প্রকাশ ও প্রকাশক প্রভৃতি। এই ব্যষ্টি আমিই হল তিনি বা অখণ্ড আমি। এই আমির দুইটি ভাব আছে। একটি হল কেন্দ্রগত এবং অপরটি হল বহিরাগত। কেন্দ্রের আমি হল অখণ্ড পূর্ণ পাকা আমি। এই আমি শান্ত অব্যয় অজর অমর নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত ও পূর্ণ। পরিধির আমি সগুণ, বহু, পরিবর্তনশীল, ক্রিয়াশীল, গতিশীল ও সুখ-দুঃখ জন্ম-মৃত্যু সবকিছুর সঙ্গে জড়িত। একেই কাঁচা আমি বলে। বিদ্যা-অবিদ্যা, ধর্ম-অধর্ম, সত্তা-শক্তি দ্বৈত নিয়ে অদ্বৈতস্বরূপ পাকা আমি স্বয়ং। কেন্দ্রমুখী ও বহির্মুখী উভয় ভাবের মাধ্যমে তাঁর প্রকাশ ও লীলা হয়। কেন্দ্রে জ্ঞান এবং পরিধিতে অজ্ঞান; কেন্দ্রে আনন্দ এবং পরিধিতে নিরানন্দ; কেন্দ্রে এক এবং পরিধিতে বহু; কেন্দ্রে জন্ম এবং পরিধিতে মৃত্যু; কেন্দ্রে পুরুষ নির্গুণ এবং পরিধির পুরুষই হল প্রকৃতি ও সগুণ, কেন্দ্রে স্বভাব এবং পরিধিতে অভাব ও ভাব। এই ভাবে বহু ও দ্বৈত আমির বেশে অদ্বৈতের আমি খেলে বেড়ায়। কেন্দ্রের আমির সঙ্গে পরিধির আমি প্রতিদিন নিদ্রাকালে মিলিত হয়; আবার জাগ্রত অবস্থায় গুণ ও উপাধিযোগে ব্যষ্টিভাবে খেলতে নামে। অদ্বয় আমি হল তুরীয় আমি। এই তুরীয় আমি হল পরব্রহ্মের আমি। এ প্রজ্ঞানঘন অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ বা বোধস্বরূপ।

কেন্দ্রসত্তার তাৎপর্য

কেন্দ্রের আমি হল পরব্রহ্ম পরমাত্মার আমি। এ অখণ্ড বিশুদ্ধ পূর্ণ স্বয়ংপ্রকাশ বোধসত্তা। কোন অবস্থাতেই এর অভাব সম্ভব নয়। এই বোধসত্তার বক্ষে ঈশ্বরীয় ভাব ও জীবভাব অভিব্যক্ত হয়ে লীলা করে আবার এরই মধ্যে লীন হয়ে যায়। জীববোধ বা চৈতন্য দ্বৈত ও বদ্ধ। ঈশ্বর চৈতন্যও দ্বৈত অথচ মুক্ত। কিন্তু পরব্রহ্ম চৈতন্য নিত্যাদ্বৈত নিত্যশুদ্ধ নিত্যমুক্ত অমৃতত্ব।

এক ও বহুত্বের সত্য সম্বন্ধ

অসংখ্য ব্যষ্টি যোগে সমষ্টি এক। এই 'এক আমি' বাইরে বহু আমি রূপে প্রকাশিত হয়। বহুত্ব এক হতেই জাত এবং একের সঙ্গেই যুক্ত হয়ে একের মধ্যেই স্থিত আছে। এই এক হল বহুর সত্তা। এই একাকে বাদ দিয়ে বহু বা পৃথক একের কোন অস্তিত্ব সম্ভব নয়। এই নিত্য একের বহুভাবই হল জগৎভাব বা সগুণ ভাব।

জীবের শিবত্ব লাভের উপায়

জীবের অন্তঃসত্তা হল ঈশ্বরীয় সত্তা এবং কেন্দ্রসত্তা হল পরব্রহ্ম সত্তা। সুতরাং জীব ঈশ্বর ও ব্রহ্মকে হৃদয়ে নিয়েই চলে অজ্ঞাতসারে। এ বিষয়ে জ্ঞাত হলেই জীবের জীবত্ব খসে যায়। তখন সে শিব হয় অর্থাৎ নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত চৈতন্য সত্তার স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। জীবভাবে স্বেচ্ছায় আবদ্ধ হয়ে ব্রহ্ম ভ্রান্তিদোষে ঘুরে বেড়ায়। এই মোহ ভ্রান্তি কেটে গেলে জীবরূপ ব্রহ্ম স্বয়ংপ্রকাশ স্ব-স্বরূপ প্রাপ্ত হয়।

কেন্দ্রসত্তার স্মৃতি এবং অন্তঃসত্তার স্মৃতি ভুলে থাকার জন্য মানুষ শুধু ইন্দ্রিয়বোধের মাধ্যমে বহিঃসত্তার বৈচিত্র্যের প্রাধান্যে জীবন কাটায়। এ-ই হল জীবভাবের বিশেষত্ব।

এক আমিরই তিন অবস্থা

সর্ব আমির মূল সত্তাই হল ব্রহ্মসত্তা। এ-ই আমি ও আমিত্বের স্বরূপ। 'আমার বোধ' এর বহির্মুখী অভিব্যক্তির ধারা। 'কেন্দ্রের আমি' সাক্ষীদ্রষ্টা, 'অন্তরের আমি' কর্তা ভোক্তা ও জ্ঞাতা এবং বাইরের 'আমার আমি' করণ, বিশেষণ ও বিষয়। আস্বাদনের জন্য বাইরের আমিই হল বিষয় বা আমার। আমিই পরিধিতে বিশেষরূপ বা বিরাট। অন্তঃসত্তা দুই ভাগে বিভক্ত। একভাগ বহিঃসত্তার সঙ্গে যুক্ত এবং অপর ভাগ কেন্দ্রসত্তার সঙ্গে যুক্ত। প্রথম ভাগের নাম ব্যষ্টি অর্থে প্রাণ এবং সমষ্টি অর্থে বিশ্বাসের নাম মহাপ্রাণ। দ্বিতীয় ভাগের নাম ব্যষ্টি অর্থে তৈজস এবং সমষ্টি অর্থে হিরণ্যগর্ভ বা ঈশ্বর। বহিঃসত্তা ক্ষরভূত, অন্তঃসত্তা অক্ষর এবং কেন্দ্র ও তুরীয় সংযোগে পুরুষোত্তমের আমি। সর্বপ্রকাশ নিয়েই পরমাত্মা স্বয়ং। প্রতি ব্যষ্টিসত্তাই তাঁর অবিচ্ছেদ্য সনাতন অংশ। তিনিই স্বয়ং সর্বকর্ম ও যজ্ঞের ভোক্তা, তিনি-ই উপদ্রষ্টা অনুমন্তা ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বর। গতি প্রভু সাক্ষী নিবাস শরণ সুহৃদ সবই স্বয়ং তিনি। প্রতি প্রকাশের মধ্য দিয়ে তিনিই আস্বাদন করেন নিজেকে নিজেই।

ভাগ্য ও নিয়তির পরিচয়

জন্মজন্মান্তরের সকল স্মৃতি আমির বক্ষেই বা অন্তরে যুক্ত থাকে। তা-ই ভাগ্য বা নিয়তি রূপে জন্মজন্মান্তরের গতিচক্রকে পরিচালিত করে। পূর্বাপর বোধের বৃত্তির ধারা অনুসরণ করে কারণ ও কার্য এবং কার্য ও কারণ রূপে পূর্ব সংস্কারের মূর্তি নিয়তি, দৈব ও পুরুষকার বেশে ক্রিয়া করে।

কেন্দ্রের আমিকে গুরুবোধে ব্যবহারের ফলশ্রুতি

আত্মস্মৃতি সাধনার পদ্ধতি হল, 'গুরু, প্রভু! তুমি পূর্ণ সচ্চিদানন্দময় অখণ্ড ভূমা। আমার তুমি এবং তোমার আমি। তুমি আমাকে তোমার বক্ষে প্রকাশ করেছ তোমার প্রীতির জন্য। আমাকে তুমি তোমার প্রয়োজনে তোমার উদ্দেশ্যে পরিচালিত কর। কৃপা করে তোমার মধ্যে তোমার এই আমিকে মিলিয়ে নাও। তুমিই জান, আমি জানি না, তুমিই বোঝ, আমি বুঝি না।' এই ভাবে 'তুমি বোধ ধরে' সকলে কেন্দ্রের আমিত্বের সাহায্য প্রার্থনা করে এবং পরে কেন্দ্রের সঙ্গে মিশে এক হয়ে যায়।

প্রত্যেকেই তাঁর (পরমাত্মার) যন্ত্র, প্রত্যেকে সেই সমষ্টি বা পূর্ণেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। অখণ্ড অদ্বয় আমি স্বমহিমায় সর্বব্যাপী, সর্বধারী, সর্বগত, সান্ত-অনন্ত, ব্যক্ত-অব্যক্ত, এক ও বহু, সগুণ ও নির্গুণ রূপে নিত্যপ্রকাশমান। তাঁরই অনন্ত প্রকাশধারার কালান্তক অংশবিশেষ সকলের জীবন।

কামনার যোগে ও বিয়োগে জীবের বন্ধন ও মুক্তি

কামনার মাধ্যমেই জীবের জীবত্বভোগ বা আস্বাদন হয়। কামনা নাশে জীবের জীবত্ব চলে যায়। কামনাযুক্ত শিবই হল জীব এবং কামনাশূন্য জীবই হল শিব; অর্থাৎ কামনা ভোগে জীব এবং কামনা ত্যাগে শিব। অজ্ঞানে হয় ভোগ এবং জ্ঞানে হয় ত্যাগ। জ্ঞানেতে ত্যাগ হলে সানন্দে ত্যাগ হয়। জোরপূর্বক ত্যাগ হয় না। 'আমার বোধে' ভোগ হয়, কিন্তু ত্যাগ হয় 'তোমার বোধে' অথবা বিশুদ্ধ আত্মা বা আমি বোধে; অর্থাৎ 'আমার আমি বোধে' ভোগ কিন্তু 'তোমার আমি বোধে' অথবা 'আমির আমি বোধে' হয় ত্যাগ। 'তোমার আমি বোধে' যে-ত্যাগ হয় তা ভক্তের বৈশিষ্ট্য কিন্তু 'আমির আমি বোধে' যে ত্যাগ হয় তা হল জ্ঞানীর বৈশিষ্ট্য।

পঞ্চবিধ সিদ্ধির পরিচয়

ত্যাগ-বৈরাগ্য ব্যতীত কখনওই চরম সিদ্ধি আসে না। কর্মজ সিদ্ধি, ধ্যানজ সিদ্ধি, ভক্তিসিদ্ধি, নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি বা জ্ঞানসিদ্ধি এবং প্রেমসিদ্ধি—এই হল পঞ্চবিধ সিদ্ধি। কেবলমাত্র ত্যাগ-বৈরাগ্যের মাধ্যমেই এই সকল সিদ্ধি লাভ হয়। ত্যাগ-বৈরাগ্য ছাড়া এ কখনও সম্ভব হয় না।

'মুক্তি মানে অদ্বয়স্বরূপে প্রতিষ্ঠা। দ্বৈত ভাব হল বদ্ধ। অদ্বৈত ভাবই হল অমৃতত্ব ও মুক্তি'[১]।

চিত্তশুদ্ধির অভিনব বিজ্ঞান

চিত্তশুদ্ধির জন্য প্রথম ভাবতে হয় আমি বিষয়, তুমি বিষয়ী; আমি অন্ন, তুমি প্রাণ; আমি আশ্রিত, তুমি আশ্রয়; আমি রথ, তুমি রথী; আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী; আমি প্রকাশসন্তান, তুমি প্রকাশক, পিতা বা মাতা। এইরূপ ভাবনা দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয় এবং শুদ্ধচিত্তে শুদ্ধাভক্তি ও শুদ্ধজ্ঞানের বিকাশ হয়। তার ফলে ঈশ্বরানুভূতি ও আত্মানুভূতি স্বতঃস্ফূর্ত হয়। এ-ই সগুণতত্ত্বের চরম অবস্থা। এর পরে নির্গুণতত্ত্বের স্বরূপ। নির্গুণতত্ত্বের দ্বারা পরব্রহ্ম পরমাত্মা ও পরমেশ্বরকে বোঝায়। ব্রহ্ম আত্মা ঈশ্বরবোধ দ্বৈত অথচ মুক্ত। পরব্রহ্ম পরমাত্মা পরমেশ্বর কিন্তু অদ্বৈত ও পূর্ণমুক্ত এবং অব্যক্ত বা তুরীয়। নির্গুণতত্ত্বের ও সগুণতত্ত্বের যুগ্ম অভিব্যক্তি হল নির্গুণগুণী। তাঁর পরিচয় হল পুরুষোত্তম ভগবান। এ নিত্য অদ্বৈত ও নিত্যবর্তমান অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ ও নিরবচ্ছিন্নভাবে স্বয়ংপ্রকাশ।

সগুণ ও নির্গুণ তত্ত্বের পরিচয়

সগুণতত্ত্ব হল সবিশেষ সাকার সাবয়ব অথচ অতীন্দ্রিয় বুদ্ধিগ্রাহ্য। নির্গুণতত্ত্ব হল নির্বিশেষ নিরাকার নির্বিকার নিরবয়ব নিষ্ক্রিয় অচিন্ত্য অজ্ঞেয় অপরিণামী অসাধ্য ইন্দ্রিয়াতীত অগ্রাহ্য ও গুণাতীত তুরীয় পরম অব্যক্ত ভূমা অখণ্ড বিশুদ্ধ সচ্চিদানন্দস্বরূপ কেবলম্। এই নির্গুণতত্ত্বের সর্বোত্তম অভিব্যক্তি হল স্বগুণতত্ত্ব। নির্গুণতত্ত্ব হল ঊর্ধ্বে এবং সগুণতত্ত্ব হল নিম্নে। নির্গুণ থেকে সগুণ নেমে আসে অর্থাৎ অভিব্যক্ত হয় আবার নির্গুণে উঠে লীন হয়ে যায়। নির্গুণগুণী স্বরূপে অখণ্ড ভূমাতত্ত্ব পূর্বাপর স্বভাবে অর্থাৎ নির্গুণ সগুণকে সমভাবে বরণ করে অ-ভেদাভেদ রূপে নিত্যবর্তমান। এই তত্ত্বে ভেদ এবং অভেদ উভয় ভাবই উভয়ের সম্পূরক ও পরিপূরক হয়ে নিত্যবর্তমান বোধে নিত্যাদ্বৈতেরই বোধক।

পূজাতত্ত্বের নিগূঢ় তাৎপর্য

সমস্ত কর্ম জ্ঞানবক্ষে উদিত হয়ে জ্ঞানেই পরিসমাপ্ত হয়। সুতরাং সমস্ত কর্মই জ্ঞান, ঈশ্বরের পূজা বা অর্চনা। মন্দিরের বিগ্রহ পূজা হল বিশেষ আনুষ্ঠানিক পূজা; কিন্তু এ-ই পূজার সব নয়। তা সমস্ত কাজের একটা অংশ মাত্র। একই ব্যক্তি বহুবিধ কাজ করে বহু কাজের মাধ্যমে বহু অভিজ্ঞতা লাভ করে। বোধরূপ এক উপাদানকেই বিভিন্নভাবে আস্বাদন করা হয়। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে এক চৈতন্য ও আনন্দকেই পাঁচ প্রকার অনুভূত হয়; কিন্তু ইন্দ্রিয়াতীতে অর্থাৎ তুরীয়তে ও কেন্দ্রসত্তায় অখণ্ড এক সচ্চিদানন্দ রূপেই তা অনুভূত হয়। অদ্বৈত অনুভূতি হল স্বানুভূতি, অন্তরের দ্বৈতবোধ হল অনুভূতি এবং পঞ্চেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে তা-ই হল প্রতীতি। নির্গুণতত্ত্ব হল অখণ্ড ভূমা একস্বরূপ। একেই চিদানন্দস্বরূপ বলা হয়। সগুণতত্ত্ব এরই সবিশেষ রূপ। সগুণতত্ত্বের লীলার জন্য তার স্বভাবশক্তির সপ্তব্যাহৃতি হয়। অর্থাৎ পরমাত্মশক্তি অষ্টবিধা প্রকৃতিরূপে ও ষোড়শ বিকাররূপে অভিব্যক্ত হয়।

এই চতুর্বিংশতি তত্ত্বের মাধ্যমে সগুণ ঈশ্বর অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ লীলা করেন এবং এই চতুর্বিংশতি তত্ত্বের

১। তত্ত্বের দৃষ্টিতে।

যথার্থ জ্ঞান ও অপরোক্ষ অনুভূতি দ্বারা সগুণ ঈশ্বরের অনুভূতি হয়, তারপরে সগুণতত্ত্বের ঊর্ধ্বে নির্গুণতত্ত্বের অনুভূতি হয় তীব্র ত্যাগ ও বৈরাগ্যের মাধ্যমে। আচার্য মুখে শ্রুত মহাবাক্য বিচার অনুশীলন দ্বারা সেইরূপ ত্যাগ-বৈরাগ্যযুক্ত মুমুক্ষু সাধকের নির্গুণতত্ত্বের স্বানুভূতি লাভ হয় অর্থাৎ নির্গুণতত্ত্বে প্রতিষ্ঠা হয়।

মূর্চ্ছা, নিদ্রা ও মৃত্যুর পার্থক্য

মূর্চ্ছা ও নিদ্রার মধ্যে মন ও বুদ্ধির ক্রিয়া বন্ধ থাকে কিন্তু প্রাণের ক্রিয়া মৃদুভাবে চলতে থাকে, একেবারে বন্ধ হয় না। সেইজন্য ব্যুত্থানে আবার মন ও বুদ্ধির ক্রিয়া পূর্ববৎ চলে। নিদ্রা হল অন্তঃকরণ মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদির কারণ শরীরে অবস্থান এবং মূর্চ্ছা হল বিকার ও ব্যাধিবশত অন্তর ইন্দ্রিয়ের অভিভূত বা স্তব্ধ অবস্থা। মৃত্যুতে প্রাণ ও মন উভয়ের ক্রিয়া বন্ধ হয়, তার ফলে আর ব্যুত্থান হয় না।

জন্ম বৃদ্ধি ক্ষয় ব্যাধি ও মৃত্যু দেহেরই হয়। আত্মার কোন জন্ম মৃত্যু ক্ষয় বৃদ্ধি নেই। আত্মা নিত্য নির্বিকার, অপরিণামী, অখণ্ড বিশুদ্ধ বোধস্বরূপ। দ্রষ্টা ও সাক্ষী রূপে তা দেহের মধ্যে বাস করে।

শৈশবাদি অবস্থা ও নানাবিধ পরিণামের সাক্ষী নিত্যমুক্ত আত্মা

শৈশব কৈশোর যৌবন প্রৌঢ়ত্ব ও বার্ধক্য হল মন ও দেহেন্দ্রিয়াদির বিকার ও রূপান্তর। এদের মধ্যে আত্মা বা আমি নিত্যসাক্ষীরূপেই আছে। আত্মার অস্তিত্বেই এদের অস্তিত্ব ও রূপান্তর সম্ভব হয়। কিন্তু এদের অস্তিত্ব বিকার ও রূপান্তর আত্মাকে স্পর্শ করতে পারে না। দেহেতে অবস্থান করেও আত্মা দেহমুক্ত অর্থাৎ দেহাতীত ইন্দ্রিয়াতীত ও বাক্যমনাতীত। এই বোধকেই আত্মজ্ঞান বলে। এই আত্মজ্ঞান হলেই জীব জীবন্মুক্ত হয়। দেহাত্মবুদ্ধি অর্থাৎ আমি দেহ ও আমার দেহ এই বোধে হয় জীব বদ্ধ। আবার আমি দেহাতিরিক্ত নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত বিশুদ্ধ আত্মা সচ্চিদানন্দস্বরূপ এই বোধে জীবত্ব নাশ হয় এবং শিবত্ব লাভ হয় অর্থাৎ জীবন্মুক্তি হয়, এবং অমৃতত্বে প্রতিষ্ঠা হয়।

আত্মবোধ বা আত্মজ্ঞানই হল একমাত্র নিত্যবস্তু। এই নিত্যবস্তুর সাহায্যেই মন সর্বব্যাধিমুক্ত হয়ে অমৃত-স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। আত্মজ্ঞান বিনা আর কোন কিছুর সাহায্যে মন অমৃতত্বে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে না। আত্মজ্ঞানের অতিরিক্ত কিছু নেই। এ-ই চরম বা পরম সত্য। সব কিছুই হল আত্মজ্ঞানের অধীন। আত্মজ্ঞানই হল সর্বজ্ঞানের অধিষ্ঠান। এই আত্মাই হল সর্বজীবের সত্যস্বরূপ নিত্যসাথী শ্রেষ্ঠ বন্ধু পরম আপন এবং প্রিয় হতে প্রিয়তম। এ স্বতঃসিদ্ধ নিত্যাদ্বৈত অখণ্ড ভূমা পূর্ণসত্তা।

ত্রিকালের মধ্যে বর্তমানই হল মুখ্য ও তাৎপর্যপূর্ণ

বর্তমানকে সকলের স্বীকার করতে ও মানতে হয়। বর্তমানকে মানলে অতীতকেও মানতে হয়। অতীতই বর্তমান হয় এবং বর্তমান থেকেই ভবিষ্যৎ হয়। সুতরাং বর্তমান জীবনের অতীত অতীত জন্মগুলিকেও স্বীকার করতে হয় এবং ভবিষ্যতের বা আগামী জীবনকেও বর্তমান জীবন হতে ধারণা করা যায়। আপন আপন কর্মসংস্কারই প্রত্যেকের জন্মমৃত্যুর কারণ এবং জীবন্মুক্ত ও পূর্ণ হওয়ার কারণও তা-ই। সবকিছুর মূলে এক কারণ আছে তাকেই মহাকারণ বলে। এই মহাকারণই হল সকলের উৎস। এই মহাকারণই হল অসৃষ্ট অনাদি কারণ। তাকেই পরব্রহ্ম পরমাত্মা বলা হয়। তা হতেই আদি কারণ আদি পুরুষ জগৎস্রষ্টা ও জগৎকর্তা ঈশ্বর অভিব্যক্ত হন এবং তা হতেই জীবজগতের অভিব্যক্তি হয়। প্রত্যেকের স্রষ্টা ঈশ্বরই হলেন প্রত্যেকের প্রভু ও নিয়ন্তা। এই ঈশ্বর জীবাত্মার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত; কিন্তু জীব তা অজ্ঞানবশত জানতে পারে না।

ত্বংকার বোধে ঈশ্বরের হাতের যন্ত্র হওয়ার তাৎপর্য

জীব যখন নিজেকে ঈশ্বরের হাতের যন্ত্র বলে অনুভব করে তখনই সে শুদ্ধ ও মুক্ত হয়। ঈশ্বরের হাতের যন্ত্র হওয়ার অর্থ হল আপনবোধ দ্বারা অখণ্ড বোধস্বরূপের সেবা করে তাঁর মধ্যে বাস করা। ত্বংকারবোধে অর্থাৎ 'তুমি তোমার বোধের' আশ্রয়ে তদ্‌বোধের ব্যবহার দ্বারা জীবন শোধন হয় ও মুক্ত হয়। 'ত্বংকারবোধে' সচেতন হয়ে সবকিছুকে ব্যবহার করাই হল ঈশ্বরের হাতের যন্ত্র হওয়া।

অভিমান অহংকার ঈশ্বরলাভের অন্তরায়

কামনা-বাসনাই হল অহংকার অভিমান ও জীবন বন্ধনের কারণ। কামনাশূন্য হলে জীবন শুদ্ধ ও মুক্ত হয়। কামনাশূন্য এবং অভিমানশূন্য মূলত এক অর্থবোধক। কেবলমাত্র বুদ্ধি দ্বারা ঈশ্বরতত্ত্ব বা আত্মতত্ত্ব জানা যায় না।

অভিমানশূন্য হলেই ঈশ্বরলাভ হয়

বস্তুজগতের সবকিছুই ঈশ্বরীয় অভিব্যক্তি, নিজের ব্যক্তিগত কিছু নেই। 'আমার আমি' বলতে যা কিছু সব তাঁরই অভিব্যক্তি—এই ধারণা হলে তখনই কামনা-বাসনার প্রাধান্য ক্ষীণ হয় এবং কামনা বাসনার ভোক্তা হিসাবে পৃথক অহংকার ও অভিমানের বিলোপ হয়।

ভ্রান্তিরূপে মায়ের মহিমা

পূর্বাপর সম্বন্ধ ধরে পরস্পরের যে অভিব্যক্তি হয় তার মূল্যবোধ জাগাবার জন্য ভুলের উদয় হয়। লোকে বলে 'ভুল করি', কিন্তু সত্য উপলব্ধি হলে জানা যায় যে ভুল হয়, ভুল করা নয়। তাই সত্যদ্রষ্টাগণ বলেন কেউ ভুল করে না। ভুলরূপে সত্যময়ী মা-ই মানুষের মধ্যে উদয় হয়ে তাঁর মহিমা প্রকাশ করেন এবং কার্য-কারণ ধারায় অভিজ্ঞতার মাত্রা বাড়ান। সেই অভিজ্ঞতার দ্বারাই তিনি পূর্বের ভুলকে শোধন করতে সাহায্য করেন। এই ভাবে ক্রমপর্যায়ে অভিজ্ঞতার মান বাড়িয়ে জীবকে তিনি আত্মবোধে প্রতিষ্ঠিত করে নেন।

ভুল বা ভ্রান্তির পরিচয়

ভুল বা ভ্রান্তি হল বোধের বৃত্তি। একে মিথ্যা জ্ঞান বা আরোপিত জ্ঞান বলে। ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞানের উদয়ে এই অধ্যাসরূপ মিথ্যা জ্ঞান থাকে না। অধ্যাসশূন্য বিশুদ্ধ জ্ঞানই হল আত্মার স্বরূপ।

কামনার মাধ্যমে জীব ও ঈশ্বরের লীলা সাধিত হয়

ব্যষ্টি কামনা দ্বারা পৃথক বোধে জীবলীলা হয় এবং সমষ্টি কামনা দ্বারা সগুণ ঈশ্বরের জগৎলীলা হয়। নির্গুণস্বরূপ কামনাশূন্য, ক্রিয়াশূন্য, ভাবশূন্য ও গুণাতীত। কামনা হয় সগুণে, নির্গুণে নয়। খণ্ড কামনা বহির্মুখী ও বহুমুখী ধারায় প্রকাশ পায় এবং বৈচিত্র্য হল তার বিশেষত্ব। কিন্তু অখণ্ড বা সমষ্টি কামনা কেন্দ্রমুখী ধারায় প্রকাশ পায়। একতা সমতা ও বিশুদ্ধতা হল তার বৈশিষ্ট্য। কেন্দ্রমুখী কামনা দ্বারা জীব ঈশ্বর আত্মার উপলব্ধি ও মুক্তির সাধনা করে।

কামনার প্রকাশই হল কর্ম। ইচ্ছার গতিই হল কর্ম। এই কর্ম ত্রিবিধ, যথা—কর্ম, অকর্ম ও বিকর্ম। কর্ম হল রাজসিক, অকর্ম হল সাত্ত্বিক এবং বিকর্ম হল তামসিক। সাত্ত্বিক কর্ম হল ঈশ্বরীয় কর্ম। ঈশ্বরীয় কর্মে কর্মের

প্রতিক্রিয়া থাকে না, কিন্তু রাজসিক ও তামসিক কর্মের প্রতিক্রিয়া থাকে। রাজসিক কর্মকে কাম্য কর্ম বলে এবং তামসিক কর্মকে নিষিদ্ধ কর্ম বলে। এই নিষিদ্ধ কর্মই হল বিকর্ম ও নিষ্কর্ম। নিত্যনৈমিত্তিক কর্মই হল সৎকর্ম। সৎকর্মের ফলই হল ধর্ম ও স্বর্গভোগ। অসৎকর্মের ফল হল অধর্ম ও নরকভোগ। সদসৎ মিশ্র কর্মের ফলভোগ হয় মর্ত্যলোকে বা মনুষ্যলোকে।

সৃষ্টিকার্য কালাধীন

সর্ব কর্ম ও তার ফল অস্থায়ী, বিকারী এবং পরিবর্তনশীল। কর্মলব্ধ অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানও পরিণামী, বিকারী ও অস্থায়ী। বিশুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞানই হল নিত্যস্থায়ী ও অপরিণামী। কর্মের ফল বিকারী ও পরিণামী বলে তা মৃত্যুর অধীন। বিকার ও পরিণামই হল মৃত্যু[১]। নির্বিকার ও অপরিণাম হল অমৃত। বিশুদ্ধ জ্ঞানই হল অমৃতত্ব। দেশ কাল পাত্র ও কর্ম ত্রিগুণাপ্রকৃতি জাত। সমগ্র সৃষ্টির উপরেই কালের একছত্র আধিপত্য। কালের সঙ্গে কর্মের অবিচ্ছেদ্য নিবিড় সম্বন্ধ আছে। ক্রিয়ার আধার ও অধিকরণ হল কাল। কালই হল নিয়তি। নিয়তিই হল দৈব ও কারণ। কার্য হল তার বহিঃপ্রকাশ বা পুরুষকার। কালই হল মৃত্যু। কালরূপ নিয়তিই কর্ম ও কর্মফলের নিয়ন্তা। সুতরাং কর্ম ও কর্মফল কালের অধীন। কাল নিত্যবিকারী সুতরাং কর্ম ও কর্মফলও পরিণামী ও বিকারী। যা বিকারী ও পরিণামী তা অস্থায়ী ও অনিত্য। বিকার ও পরিণামই হল মৃত্যু। সমগ্র বিশ্ব হল কর্মনীতির অধীন; সেইজন্য সৃষ্ট বস্তু মাত্রই মৃত্যুর অধীন। অর্থাৎ বিষয়মাত্রই পরিণামী বিকারী অস্থায়ী ও অনিত্য। অনিত্য বস্তুর সাধনা দ্বারা নিত্যবস্তু লাভ হয় না। অর্থাৎ কর্মের দ্বারা অমৃতত্ব লাভ হয় না। মৃত্যু বা কাল হল মহাকালের প্রকাশ। মহাকাল হল অমৃতস্বরূপ অখণ্ড ভূমাতত্ত্ব। এই মহাকালই হল অমৃতময় পরম শিব। পরম শিবই হল পরব্রহ্ম পরমাত্মা পরমেশ্বর পুরুষোত্তম ভগবান। মৃত্যুর মৃত্যু হল মহাকালরূপ পরম শিব বা পরব্রহ্ম।

কর্মের প্রয়োজনীয়তা

কর্মের দ্বারা মুক্তি ও অমৃতত্ব লাভ না হলেও চিত্তশুদ্ধির জন্য এবং মুক্তি শান্তি ও অমৃতত্বের সুযোগ্য অধিকারী হওয়ার জন্য এর একান্ত প্রয়োজন আছে।

কর্মী ও জ্ঞানীর মধ্যে পার্থক্য

কর্মযোগ ভক্ত ও যোগীর জন্য প্রযোজ্য। কর্মসাধনার ফলসিদ্ধি হল কর্মজ সিদ্ধি। জ্ঞানসাধনার ফল হল জ্ঞানসিদ্ধি। কর্মসিদ্ধি লাভ না করে জ্ঞানসিদ্ধি লাভ করা যায় না। নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি হল কর্মত্যাগ। কর্মসিদ্ধি না হলে নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিও হয় না। চিত্তশুদ্ধির আগে কর্মত্যাগ করলে মিথ্যাচার হয়। এ ধর্মাচার নয়। জ্ঞানীর কর্ম থাকে না। জ্ঞানীর কাছে কর্ম করা ও কর্ম না-করা উভয়ই সমান বলে তার দ্বারা একমাত্র নিষ্কাম কর্ম সম্ভব। কর্মফলে অনাসক্তি, অকর্তাবোধে কর্ম অথবা ঈশ্বরের নিমিত্ত ঈশ্বরজ্ঞানে কর্ম ও কর্মফল উভয়কেই সমর্পণ করা হল নিষ্কাম কর্ম অথবা ঈশ্বরীয় কর্ম। এ-ই শুদ্ধ কর্ম। সৎকর্ম ও শুদ্ধকর্মের মধ্যে পার্থক্য হল সৎকর্মের ফলভোগ থাকে কিন্তু শুদ্ধকর্মের ফলভোগ থাকে না।

মুক্ত জ্ঞানী ও ঈশ্বর উভয়ের কর্ম হল অকর্ম অর্থাৎ প্রতিক্রিয়াশূন্য কর্ম। এ-ই হল ব্রহ্মকর্ম, আত্মকর্ম—বিষ্ণুযজ্ঞ, শিবযজ্ঞ ও ব্রহ্মযজ্ঞ। পরাভক্তি যোগে বা প্রেমভক্তি যোগে ভক্তের যে কর্ম তা-ও অকর্ম পর্যায়ের অর্থাৎ প্রতিক্রিয়াশূন্য কর্ম। কারণ ভক্তের কর্ম হল ঈশ্বরজ্ঞানে, ঈশ্বর প্রীত্যর্থে, ঈশ্বরের নিমিত্ত ঈশ্বরীয় কর্ম।

১। তত্ত্বের সৃষ্টিতে।

ভক্তের মুক্তি সহজলভ্য

জ্ঞানীর কর্তাবোধ থাকে না, সুতরাং কর্ম ও কর্মফলে আসক্তি স্পৃহা বা কোন ইচ্ছাও থাকে না। সে দ্রষ্টা ও সাক্ষীবোধে প্রকৃতি বা গুণের দ্বারা সর্বকর্ম সম্পাদিত হতে দেখে। সে সর্বকর্মের মধ্যে সাক্ষীবোধে অবস্থান করে। সাক্ষীবোধ হল বিশুদ্ধ আত্মবোধ বা ব্রহ্মবোধ। এই বোধ গুণাতীত ভেদাতীত ও দ্বন্দ্বাতীত। সর্বকর্ম ও কর্মফল ঈশ্বরকে সমর্পণ করে ভক্ত ও যোগী কর্মবন্ধন মুক্ত হয়ে ঈশ্বরের মধ্যে বাস করে।

চিত্তশুদ্ধি সংসারে থেকেই সম্ভব

সংসারধর্ম চিত্তশুদ্ধির সহায়ক, অন্তরায় নয়। সংসার হল কর্মক্ষেত্র। এখানে থেকে প্রত্যক্ষভাবে শাস্ত্রবিধি অনুসারে গুরু ও আচার্য-নির্দিষ্ট পথে কর্ম সম্পাদন করে সকলেই চিত্তশুদ্ধি লাভ করতে পারে। শুদ্ধচিত্তে সগুণ ঈশ্বরের স্বরূপ ও মহিমা উপলব্ধি করে তারপরে সে নির্গুণতত্ত্বের উপাসনা দ্বারা পরমগতি লাভ করতে পারে।

ঈশ্বরীয় কর্মের তাৎপর্য

ঈশ্বরের নিমিত্ত কর্মই হল যথার্থ কর্ম। এর লক্ষণ বিদ্যা, শক্তি (জীবন), অর্থ, সময় ও বস্তুর যথার্থ ব্যবহার। এর কোনটির অবহেলা বা অপব্যবহার হলে তার প্রতিক্রিয়ার ফল দ্বারা অন্যগুলির ফলও বিকৃত হয়।

সদা সচেতনভাবে সবকিছু ব্যবহার করাই হল যথার্থ ব্যবহার।

কাম্য কর্মই হল অহংকারের কর্ম

'আমার বোধের বৃত্তি' হল অহংকার। এই 'আমার বোধ' বা অহংকারের দ্বারা যে কাজ হয় তা অপূর্ণ ও ভ্রমাত্মক বলে তা-ই কাম্য কর্ম বা অকর্ম।

কর্মতত্ত্বের উদ্দেশ্য

প্রতিক্রিয়াযুক্ত অকর্ম ও বিকর্মকে কর্মে পরিণত করাই হল কর্মতত্ত্বের উদ্দেশ্য। কর্মে পরিণত হলে এইগুলি প্রতিক্রিয়াশূন্য হয় এবং পূর্ণ সিদ্ধিপ্রদ হয়।

দিব্যকর্মের বৈশিষ্ট্য

ঈশ্বরীয় বা দিব্যকর্মে দেহ-প্রাণ-মন-বুদ্ধির সমতানগতি থাকে। এদের সক্রিয় সহযোগিতায় সুষ্ঠুভাবে দিব্যকর্ম নিষ্পন্ন হয়। কোন অঙ্গের বা প্রত্যঙ্গের অসমর্থন বা অনিচ্ছা বা অসহযোগিতার লক্ষণ কখনও প্রকাশ পায় না। অসুবিধা বা ভ্রান্তি দিব্যকর্মে থাকে না। প্রীতিপূর্বক সেবা অনুশীলন হল দিব্যকর্মের বৈশিষ্ট্য। দিব্যকর্ম হল ঈশ্বর, গুরু ও ইষ্ট প্রীত্যর্থে কর্ম।

কর্মবন্ধন মুক্ত হওয়ার উপায়

কর্ম ও কর্মফল ঈশ্বরে সমর্পণ করাই হল কর্মবন্ধন মুক্ত হওয়ার শ্রেষ্ঠ উপায়। কর্ম ও কর্মফলের পূর্ণ সমর্পণ হলে কর্মজ সিদ্ধি বা নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি হয়। কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগের ফলে হয় জ্ঞানসিদ্ধি। কর্তৃত্ব হল প্রকৃতির। আত্মা সর্বতোভাবে নিষ্ক্রিয়—এইরূপ বিচারের দ্বারা অকর্তাবোধে প্রতিষ্ঠা হয়। অকর্তাবোধে প্রতিষ্ঠিত হলে কর্ম ও কর্মবন্ধন থাকে না। সেই জন্য বলা হয় জ্ঞানীর কর্ম থাকে না। জ্ঞানীর মধ্যে কর্ম হয়। ভক্ত গুরু ও ইষ্টের প্রীত্যর্থে

তন্নিমিত্ত ও তৎপরায়ণ হয়ে তাঁর আনন্দের জন্য তাঁর হয়ে কর্ম করে। তার ফলে ভক্তের সর্বকর্মই দিব্যকর্মে পরিণত হয়।

কর্মবন্ধনের কারণ

অহংকার অভিমানই হল কর্তৃত্বের কারণ এবং কামনা-বাসনাই হল ফলভোগের কারণ। সাধক 'আমার আমি বোধে' কর্মফল ভোগ করে এবং 'তোমার আমি বোধে' ভোগমুক্ত হয়।

আত্মসমর্পণের বিজ্ঞান

কর্তা কর্ম ও কর্মফলের মধ্যে গুরু ইষ্ট বা ঈশ্বরকে বসিয়ে তদুদ্দেশ্যে এই ত্রিবিধ ভাবকে নিবেদন করে তাঁর নাম ভাব ও বোধকে সংযুক্ত করে সচেতনভাবে কর্ম সম্পাদন করলে আত্মসমর্পণযোগ সিদ্ধ হয়।

প্রেমভক্তির মাধ্যমেই পূর্ণ আত্মসমর্পণ সম্ভব হয়। আত্মসমর্পণের অর্থ হল আত্মার ব্যষ্টি ভাবকে সমষ্টি ভাবের কাছে অর্পণ করা অর্থাৎ পরমাত্মার কাছে নিজেকে সঁপে দেওয়া। একে আত্মদান, আত্মত্যাগ বা আত্মসমর্পণ বলা হয়। এই আত্মসমর্পণ প্রীতিযোগে হওয়া চাই। প্রীতিযোগে না হলে পূর্ণ আত্মসমর্পণ হয় না। আত্মত্যাগ ও আত্মদানের মধ্যে অর্থাৎ নিজেকে পরমাত্মার কাছে প্রীতিপূর্বক সঁপে দেওয়ার মধ্যে নির্মল আনন্দ আছে। সমর্পণকারী ছাড়া অপরের পক্ষে সেই আনন্দ পাওয়া সম্ভব নয়।

সচ্চিদানন্দস্বরূপের স্বতঃস্ফূর্ত আত্মদানের ফলে বিশ্বসৃষ্টি, স্থিতি ও রক্ষা অর্থাৎ বিশ্বের কল্যাণ ও মঙ্গল সাধিত হয়। সচ্চিদানন্দস্বরূপ ঈশ্বর সর্ব সৃষ্টবস্তুর মধ্যেই নিজেকে বিলিয়ে দেন অর্থাৎ নিজেই সর্ব সৃষ্টবস্তুর মধ্যে অবস্থান করেন। আবার সৃষ্টবস্তুর অন্তর থেকে নিজেকেই সমর্পণ করেন নিজের পূর্ণ স্বরূপের কাছে।

ক্ষমা ও ত্যাগের বৈশিষ্ট্য

ক্ষমা ও ত্যাগ হল ঈশ্বরের দিব্যভাবের বিশেষ লক্ষণ। এ না হলে জীবন ও সৃষ্টির ক্রমবিকাশ সম্ভবপর নয়। দেওয়া এবং নেওয়া এই উভয় বৃত্তির যোগেই হল 'দুনিয়া'। একদল দেয়, অপর দল পায়। অর্থাৎ দিলে মেলে, না-দিলে মেলে না। পেলে আবার দিতে হয়। না-দিলে আর পাওয়া যায় না। দেওয়া-নেওয়া রূপ কর্ম চক্রাকারে ঘুরতে থাকে। ঈশ্বরের আত্মদানে দেবতারা পুষ্ট, আবার দেবতাদের আত্মদানে ঈশ্বর তুষ্ট। সেইরূপ দেবতাদের আত্মদানে জীবজগৎ পুষ্ট এবং জীবজগতের আত্মদানে দেবতারাও তুষ্ট হন। দেবতাগণ তুষ্ট হলে জীবের অভাব দুঃখকষ্ট থাকে না, কিন্তু দেবতাগণ রুষ্ট হলে জীবের সুখশান্তি তো দূরের কথা নিশ্চিন্তে নির্ভাবনায় জীবন যাপন করাই সম্ভবপর হয় না এবং জীবের দুঃখকষ্টের আর অন্ত থাকে না। কারও নিকট হতে কিছু নিয়ে প্রতিদানে তাকে তা ফিরিয়ে না-দিলে অখণ্ড পূর্ণের সতঃস্ফূর্ত আনন্দধারা অর্থাৎ সুষ্ঠু পরিণামের গতিকে ব্যাহত করা হয়; তার ফলে জীবন সংকুচিত হয়ে স্বার্থের সীমায় আবদ্ধ হয়, অর্থাৎ অহংকার অভিমান বশত নিজের পৃথক কর্তৃত্ব সম্বন্ধে অধিক সচেতন হয়। একেই পাপধর্ম বা অধর্ম বলা হয়।

জ্ঞানী ও ভক্তের সাধনাদর্শ পৃথক

শক্তি ও গুণের খেলা জ্ঞানীর কাছে হল অবিদ্যা মায়ার খেলা। জ্ঞানী 'নেতি নেতি' বিচারযোগে জগৎরূপ মায়ার খেলাকে অতিক্রম করে জ্ঞানস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। ভক্তের কাছে শক্তি ও গুণ হল ঈশ্বরীয় ভাব। ভক্ত তাকে ঈশ্বরজ্ঞানে মাতৃবোধে উপাসনা করে। ভক্তের কাছে অবিদ্যা মায়া জ্ঞানীর মত মিথ্যা নয়। ভক্তির দ্বারা

সে ঈশ্বরকে প্রীত করে অবিদ্যার প্রভাব মুক্ত হয়। জ্ঞানীর অবিদ্যা মায়াই হল ভক্তের কাছে পরমেশ্বরী শক্তি দুর্গা কালী লক্ষ্মী সরস্বতী অম্বা ভবানী সীতা রাধা প্রভৃতি। তাকে মাতৃবোধে ভজন করে ভক্ত সহজেই ঈশ্বরের কৃপা লাভ করে। সেইজন্য ভক্তের কাছে মায়াশক্তি হল মা।

মাতৃবোধে মায়ার প্রভাব থাকে না। শিববোধে জীবের প্রভাব, গুরুবোধে লঘুর প্রভাব, বিষ্ণুবোধে বিষয়ের প্রভাব, হরিবোধে অশ্রদ্ধা ও অভক্তি, চৈতন্যবোধে জড়ত্বের প্রভাব প্রভৃতি আর থাকে না। সচ্চিদানন্দজ্ঞানে সবই সচ্চিদানন্দময় অনুভূত হয়।

সর্ব সৃষ্টবস্তুর মধ্যেই ঈশ্বর আছেন। ঈশ্বরবোধে ঈশ্বরের নিমিত্ত জীবন ও সর্ববস্তুর ব্যবহার করাই হল ঈশ্বরের ইচ্ছা ও সর্বজীবনের উদ্দেশ্য। এই দীক্ষা ও শিক্ষাই তাঁরা জগৎকে দিয়ে যান।

জন্ম ও জীবনের উদ্দেশ্য ব্যক্তিগত নয়, পরমার্থসিদ্ধির

সকলের জন্ম নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য নয়। এমন কি নিজের ব্যক্তিগত মুক্তি ও পূর্ণতার জন্যও নয়; পরন্তু অখণ্ড সচ্চিদানন্দস্বরূপের নিত্যস্বভাবলীলা ইচ্ছাপূরণের জন্য।

ঈশ্বরের সেবা ও ধর্ম পালনের বিজ্ঞান

সর্বেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর ব্যবহারে সমদৃষ্টি এবং অন্তরের সৌম্য শান্ত একাত্মবোধ নিয়ে প্রীতিযোগে আপামর সকলের সেবা করাই হল ঈশ্বরের বা স্বভাব আত্মার সেবা করা এবং তাঁর ধর্ম পালন করা। ব্রহ্ম আত্মা ঈশ্বর ঐক্যজ্ঞানে সর্বেন্দ্রিয় দিয়ে যে-কর্ম নিষ্পন্ন হয় তা দ্বারা ঈশ্বরের সেবা হয় এবং ঈশ্বরীয় সেবার মাধ্যমে সর্ববস্তুর যথার্থ ব্যবহার হয়। বৈষ্ণবীয় ভাষায় এ-ই হল সর্বেন্দ্রিয় দিয়ে বাসুদেবের সেবা, যোগীর ভাষায় পরমাত্মা ও জীবাত্মার নিত্যযোগ এবং জ্ঞানীর ভাষায় ব্রহ্মোপাসনা।

সাধনমাত্রই প্রস্তুতি

যোগযাগ, সাধনভজন, বিচার প্রভৃতি বিভিন্ন পদ্ধতি সত্যানুভূতি ও সত্যব্যবহারের প্রস্তুতি মাত্র। এ-সবের আচরণ দ্বারা সবকিছুর যথার্থ ব্যবহার হয়। সত্যই হল শুদ্ধবোধ। শুদ্ধবোধের সঙ্গে মিলনই হল যোগ; শুদ্ধবোধের সামগ্রিক অনুষ্ঠান হল যাগ; এর বিকাশের চেষ্টা হল সাধনা; এর মধ্যে নিত্য বিচরণ করা হল বিচার। একে আপনবোধে গ্রহণ করা, সেবা করা ও ভালবাসা হল ভক্তি। শুদ্ধবোধের ধর্মই হল প্রেম; এর স্থিতি হল শান্তি; এর স্বরূপ হল অমৃতত্ব; এতে অবস্থান করা হল মুক্তি। 'বিচার' মানে হল সত্যবোধে সত্যের মধ্যে বিশেষরূপে বিচরণ করা, অবস্থান করা, বাস করা ও চরে বেড়ানো।

প্রকৃতির ঋণ শোধ না-করে জীবন্মুক্তি হয় না

প্রকৃতির দানে সকলেই পুষ্ট। প্রকৃতির কাছ থেকে সবকিছু নিয়ে জীবন পরম সিদ্ধির পথে এগিয়ে চলে। তার এই উপকারকে অস্বীকার করা এবং তার বিরোধিতা করাই হল অকৃতজ্ঞতা। প্রকৃতির সঙ্গে বিরোধিতা করে চলতে গেলে জীবন আবার বিব্রত সীমিত ও সংকুচিত হয়ে পড়ে। প্রকৃতি অর্থে পরমার্থ শক্তিকেই বোঝায়। জীবপ্রকৃতি হল তার অংশমাত্র। বহিঃপ্রকৃতি হল পরমাপ্রকৃতির বহিরঙ্গ। জীবদেহ এর দ্বারাই গঠিত।

পরোক্ষ ও অপরোক্ষ ভাবে মানুষ পৃথিবী থেকে আজীবন যা-কিছু ভোগ করে ও আস্বাদন করে তার প্রতিদান স্বরূপ তাকে কিছু দিতে হয়; নতুবা সে পৃথিবীর কাছে ঋণী হয়ে থাকে। প্রতিদান পরিশোধ করার মানে ঋণ

পরিশোধ করা। ঋণী হয়ে কেউ মুক্তির আস্বাদন পায় না। ঋণ পরিশোধ হলেই মুক্তি হয়। ঋণবোধ হল কৃতজ্ঞতাবোধ।

যথার্থ ব্যবহার

সত্যবোধে বা একাত্মবোধে অর্থাৎ শুদ্ধবোধের দ্বারা শক্তি জ্ঞান আনন্দের যথার্থ ব্যবহার হয়। সৎকর্মই হল শক্তির যথার্থ ব্যবহারের লক্ষণ। কল্যাণ সাধনই হল ধর্মবিজ্ঞানের বিশেষত্ব। সত্যবোধের অভাবে অর্থাৎ শুদ্ধবোধের অভাবে একাত্মবোধের স্মৃতি থাকে না। তার ফলে সত্য শক্তি জ্ঞান ও আনন্দের অপপ্রয়োগ হয়। এই অপপ্রয়োগই হল কুকর্ম, পাপকর্ম বা অধর্ম।

সত্যধর্মের বিজ্ঞান

সত্যধর্মের বিজ্ঞানই হল সত্যজ্ঞানের বিজ্ঞান; অর্থাৎ ঈশ্বর আত্মা ও ব্রহ্মতত্ত্বের বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞানের প্রতিপাদ্য বিষয় হল—সত্য নিত্য এক ও নিত্যবর্তমান। ধর্ম নিত্য এক ও নিত্যবর্তমান। ধর্মই হল সত্যের বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞানের প্রতিপাদ্য বিষয় হল সত্যজ্ঞান আনন্দের সমাধান, অর্থাৎ প্রজ্ঞানের সমাধান। এই বিজ্ঞান বলে—(১) ব্রহ্মই সত্য। ব্রহ্ম অতিরিক্ত আর কিছু নেই। ব্রহ্মাতিরিক্ত কিছু স্বীকার করা মানে মিথ্যাকে স্বীকার করা। ব্রহ্মই জগৎরূপে বর্তমান। পৃথক জগতের কোন অস্তিত্ব নেই। জগতের পৃথক অস্তিত্বের ধারণা হল রজ্জু-সর্প ও স্বপ্নবৎ মিথ্যা ও ভ্রান্তি। ব্রহ্মই সব এবং সবই ব্রহ্ম। এ-ই হল এর তাৎপর্য। অন্ন ব্রহ্ম, প্রাণ ব্রহ্ম, হৃদয় ব্রহ্ম, বিজ্ঞান ব্রহ্ম ও প্রজ্ঞান ব্রহ্ম। স্থূলবস্তু মাত্রই হল অন্ন। এ অপেক্ষা সূক্ষ্ম ও ব্যাপক হল প্রাণ। প্রাণ অপেক্ষা সূক্ষ্ম ও ব্যাপক হল মন। মন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হৃদয়। তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান (মহৎ বুদ্ধি)। তদপেক্ষা সূক্ষ্ম প্রজ্ঞান। প্রজ্ঞান সর্বশ্রেষ্ঠ। পরম বোধি অর্থাৎ প্রজ্ঞানের ব্যবহারের জন্য বিজ্ঞানবোধের (মহৎ বুদ্ধির) প্রয়োজন হয়। বিজ্ঞানবোধের জন্য ভাবময় মনের প্রয়োজন হয়। মনের জন্য প্রাণের, প্রাণের জন্য ইন্দ্রিয়ের ও ইন্দ্রিয়ের জন্য স্থূল আধার ও অন্নের প্রয়োজন হয়।

প্রজ্ঞান হল সর্বজ্ঞান ও বিজ্ঞানের পূর্ণ অধিষ্ঠান। শক্তিতত্ত্বের উপর জ্ঞানতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত, জ্ঞানতত্ত্বের উপর বিজ্ঞান ও আনন্দতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত, বিজ্ঞান ও আনন্দের উপর প্রজ্ঞান ও প্রেমতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত। প্রজ্ঞানঘন প্রেম সর্বাধিষ্ঠান। এ নিত্যতুরীয় ও নিত্যবর্তমান।

ব্রহ্মানুভূতির দ্বিবিধ ক্রম

পূর্ণ সত্যোপলব্ধির ধারা দ্বিবিধ। অনুভূতির বিজ্ঞানকে ক্রমপর্যায়ে সাজালে পাঁচটি বিশেষ স্তর পাওয়া যায়, যথা—(১) অন্নব্রহ্ম, (২) প্রাণব্রহ্ম, (৩) মনব্রহ্ম, (৪) বিজ্ঞানব্রহ্ম ও (৫) আনন্দব্রহ্ম। বিপরীত ক্রমে—(১) আনন্দব্রহ্ম, (২) বিজ্ঞানব্রহ্ম, (৩) মনব্রহ্ম, (৪) প্রাণব্রহ্ম ও (৫) অন্নব্রহ্ম। এইভাবে নির্গুণ ও সগুণের নিত্যলীলাবিগ্রহ পূর্ণব্রহ্মের পরিচয় অনুভূত হয়।

অখণ্ডানুভূতির সাধনা ও সিদ্ধি

অখণ্ড সত্যের পূর্ণ উপলব্ধির জন্য সাধনা ও প্রস্তুতি দরকার। অন্তরে বাইরে সর্বশুদ্ধি হল এই সাধনার প্রস্তুতি ও লক্ষ্য। সর্বশুদ্ধির আটটি বিশেষ লক্ষণ হল—(১) অকর্তাবোধ, (২) নৈর্ব্যক্তিক বোধ, (৩) নিষ্কামতা, (৪) অভিমানশূন্যতা, (৫) নির্ভীকতা, (৬) অহিংসা, (৭) প্রশান্তচিত্ততা ও (৮) সন্তোষ। কামনা-বাসনা ও আশা

হল সত্যবোধের প্রধান প্রতিবন্ধক। এ অজ্ঞানসম্ভূত। আলো ও আঁধার যেমন পরস্পর এক সঙ্গে থাকতে পারে না সেইরূপ সত্য ও অজ্ঞান পরস্পর এক সঙ্গে থাকতে পারে না। অজ্ঞান হল মিথ্যা। সত্যের অভাবই হল মিথ্যা। সত্য প্রকাশিত হলে মিথ্যা থাকে না। সত্য হল বিশুদ্ধবোধ বা অখণ্ড প্রজ্ঞান। আশা ও নিরাশা চক্রাকারে ঘোরে। এই আশাই হল সুখ-দুঃখের কারণ। সুখ-দুঃখও চক্রাকারে ঘোরে। একটিকে বাদ দিলে অপরটি থাকে না। আশা হল অযোগ্যতা ও অসামর্থ্যের লক্ষণ। সামর্থ্য অনুরূপ কর্ম করলে আশা ও নিরাশা প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। অন্যের কাছ থেকে কিছু প্রত্যাশা করার পূর্বে অপরের জন্য তা নিজে সম্পন্ন করা উচিত। তাহলে প্রত্যাশার ফল পেতে বিলম্ব হয় না। ভগবান তাকেই সাহায্য করেন, যে অপরকে সাহায্য করে। যে দুঃখী, দুর্বল ও অজ্ঞানী সে অপরকে সাহায্য করতে পারে না সত্য, কিন্তু তার জীবন থেকে শিক্ষনীয় অনেক কিছু পাওয়া যায়। যাঁরা মহৎ ও উদার তাঁরা সকলের কাছ থেকেই শিক্ষা গ্রহণ করেন। ধনী, শক্তিমান, জ্ঞানী এবং দুঃখী, অসহায়, দুর্বল ও অজ্ঞানী পরস্পর বিরোধী। এই উভয় প্রকার জীবন থেকে সমান ভাবে শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়, তাহলেই সমানের বিজ্ঞান অবগত হওয়া যায়।

আত্মা ও দেহের ধর্ম পৃথক

আত্মার জন্ম, বিকার ও মৃত্যু নেই। আত্মা অজাত অজর নির্বিকার অপরিণামী ও অমৃত স্বরূপ। জীবনের বহিঃসত্তা হল দেহাবরণ। এর জন্ম, ক্ষয় ও বৃদ্ধি, জরা, ব্যাধি, পরিণাম ও মৃত্যু আছে। পূর্ণতা লাভের পূর্বে জীবকে একের পর এক বহু দেহপোশাক গ্রহণ ও বর্জন করতে হয়।

বন্ধন ও মুক্তির লক্ষণ

দেহাধীন আত্মভাবই হল দেহবুদ্ধি, দেহবন্ধন বা ভববন্ধন। এ-ই অজ্ঞানতা। আবার দেহাতীত নিত্য স্বাধীন আত্মা—এই বোধই হল জীবন্মুক্তের লক্ষণ।

যথার্থ সত্যবোধ সত্যসংকল্প এবং সৎকর্মের মাধ্যমে এই জীবন নিত্যসত্যে প্রতিষ্ঠিত থাকে। একমাত্র সত্যবোধেই সৎকর্ম ও জীবনের সদ্ব্যবহার হয়। তার ফলে অমৃতস্বরূপ আত্মজ্ঞান লাভ করে অনন্ত অসীম অদ্বয় অব্যয় পরব্রহ্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকা যায়। তখন তাঁর স্বভাবধর্ম প্রাপ্ত হয়ে বিকারবিহীন অপরিণামী নিত্যলীলায় সর্বাবস্থায় নিত্যযুক্ত ও নিত্যমুক্ত থেকে নির্দোষ ও সমানবোধে বিচরণ করা যায়। এই সর্বোত্তম পূর্ণতা হল অখণ্ড সচ্চিদানন্দঘন শান্তিময় প্রেমপুরুষের মর্মবাণী। এ-ই তাঁর সর্বোত্তম ভাগবতী ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য, যা দিব্যজীবনের সর্ববিধ দিব্য কর্মধারার মাধ্যমে অভিব্যক্ত হয়।

অখণ্ড পূর্ণের কোন বিকল্প নেই

সমুদ্রের সঙ্গে নদী ঝর্ণা প্রভৃতি যেমন নিত্যযুক্ত সেইরূপ পূর্ণের সঙ্গে অপূর্ণের, অখণ্ডের সঙ্গে খণ্ডের, সমষ্টির সঙ্গে ব্যষ্টির, অনন্ত অসীমের সঙ্গে সান্ত সসীমের, পিতামাতার সঙ্গে সন্তানের নিত্য অভেদ যোগ সম্বন্ধ আছে। সেইরূপ কারণের সঙ্গে কার্যের, অব্যক্তের সঙ্গে ব্যক্তের, ধর্মের সঙ্গে অধর্মের, সত্যের সঙ্গে মিথ্যার, অন্তরের সঙ্গে বাইরের, ভূমার সঙ্গে ভূমির, নির্গুণের সঙ্গে সগুণের, আমির সঙ্গে তুমির নিত্যযুক্ত অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ নিত্যবর্তমান। এই অখণ্ড অবিচ্ছেদ্য অদ্বয় সম্বন্ধের বোধেই নিত্যস্বরূপের নিত্যযোগ নিত্যবর্তমান। অখণ্ড সচ্চিদানন্দস্বরূপে তাঁর নিত্যবোধে নিত্যযোগে নিত্যলীলা নিত্যসম্পন্ন হয়। তাঁর নিত্যযোগে নিত্যলীলার অনুভূতির লক্ষণ হল অখণ্ড বিশ্বাস। এই বিশ্বাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ। এ সর্বজীবনের মৌলিক সত্তার অন্যতম

বৈশিষ্ট্য। সচ্চিদানন্দস্বরূপের অভিব্যক্তি হল জীবন। সচ্চিদানন্দস্বরূপ জীবনের মাধ্যমে শ্রদ্ধা-ভক্তি-বিশ্বাসযুক্ত হয়েই অভিব্যক্ত হয়। সৎ হল শ্রদ্ধা, চিৎ হল ভক্তি এবং আনন্দ হল বিশ্বাস। 'সৎ'-এর মধ্যে চিৎ ও আনন্দ লীন থাকে। চিৎ 'সৎ'-এ প্রতিষ্ঠিত এবং আনন্দ তাতে লীন। কিন্তু পূর্ণানন্দ সৎ ও চিৎ উভয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। পূর্ণানন্দে সৎ ও চিৎ পূর্ণভাবেই অভিব্যক্ত। সৎস্বরূপ, চিৎস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ এই ত্রিবিধ অভিব্যক্তি হল সচ্চিদানন্দের পরিচয়। সৎ হল সর্বসত্তা, চিৎ হল তাঁর ভাতি বা প্রকাশরূপ এবং আনন্দ হল তাঁর পূর্ণাঙ্গ পরিচয়।

আনন্দই হল সৎচিৎ-এর পূর্ণ লক্ষণ

জীবের মধ্যে সৎ হল তার সত্তা এবং চিৎ হল তার চৈতন্য। জীবচৈতন্য মলিন বলে চিৎ-এর পূর্ণ অভিব্যক্তির সাধনা সে করে। 'চিৎ'-এর অপূর্ণতার জন্য আনন্দেরও অভাব থাকে। সেজন্য জীব নিরানন্দ ভোগ করে। 'চিৎ'-এর অপূর্ণতাই হল অজ্ঞানবন্ধন এবং চিৎ-এর পূর্ণতা হল অজ্ঞান-নাশ ও মুক্তি। পূর্ণ চিৎ-এর উপরেই আনন্দের অভিব্যক্তি হয়, তাই মুক্তিতেই আনন্দ।

শ্রদ্ধা, ভক্তি, বিশ্বাসের সম্যক্ রূপ

অন্তরের শ্রদ্ধা অনুযায়ী ভক্তি এবং ভক্তি অনুযায়ী বিশ্বাস তৈরি হয়। অন্যভাবে বলা চলে সৎ ও শ্রদ্ধা হল চরণ বা জমি বা নিম্নাঙ্গ, চিৎ ও ভক্তি হল মধ্যাঙ্গ এবং আনন্দ ও বিশ্বাস হল ঊর্ধ্বাঙ্গ। বিশ্বাস ভেঙ্গে যাওয়ার মানে ঊর্ধ্বাঙ্গে আঘাতের কারণ হয়। কারও বিশ্বাসে আঘাত করতে নেই। অপরের বিশ্বাস বর্ধিত করার জন্য সাহায্য করাই হল ধর্মের উদ্দেশ্য।

সেবাবোধের তাৎপর্য

সেবাবোধে পরস্পরকে সাহায্য করাই হল সৎকর্মের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সেবাবোধে কাজ হল পূজাবোধে কাজ। মহতের নিমিত্ত কর্মই হল সেবা বা পূজা। মহতের নিমিত্ত ক্ষুদ্র যে-কাজ করে তা-ই পূজা ও সেবা এবং ক্ষুদ্রের নিমিত্ত মহৎ যে-কাজ করে তা হল করুণা অনুগ্রহ আশিস্ ও কৃপা।

বর্ণাশ্রমের তাৎপর্য

সেবাকর্মই হল শূদ্রের কাজ অর্থাৎ ক্ষুদ্রের কাজ। শূদ্র সবারই সেবক। পরস্পরের মধ্যে বিষয়ের সহবণ্টন, কৃষি ও গোরক্ষা হল বৈশ্যের কাজ। শক্তি, শৌর্য, বীর্য, সাধনায় যারা বড় তারাই ক্ষত্রিয়। আত্মীয় পরিজনের পরিপালন ও রক্ষা, আত্মরক্ষা, ধনসম্পত্তি রক্ষা ও শত্রুর হাত থেকে দেশকে রক্ষা করা হল তাদের কাজ। ব্রহ্মকে যে জানে অর্থাৎ শুদ্ধবোধের সর্বোত্তম অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত যে হয় তাকেই ব্রাহ্মণ বলে। ব্রাহ্মণ অর্থে শুদ্ধবোধে প্রতিষ্ঠিত বিশেষ ব্যক্তিকে বোঝায়।

এই চতুর্বিধ বর্ণ বা বোধের অবস্থার সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে সবাই যুক্ত। অর্থাৎ একই ব্যক্তির মধ্যে ক্ষেত্র, অবস্থা ও সময় বিশেষে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রের ভাব ও আচরণ ব্যক্ত হতে পারে। এই চতুর্বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণত্বই হল শ্রেষ্ঠ। সাধনলব্ধ যোগ্যতা ও অধিকারের উপর স্বভাবগত প্রকৃতিমানের তারতম্য নির্ভর করে। স্বভাবগত গুণ যোগ্যতা ও কর্মের উপর ভিত্তি করেই চতুর্বর্ণের বিভাগ অতীতে ঈশ্বরই সৃষ্টি করেছেন। এটা জন্মগত অধিকার নয়, সাধনলব্ধ বা অর্জিত গুণ ও কর্মগত যোগ্যতার পরিচয় এবং অবস্থা। এই চারটি বর্ণ হল পরমাত্মবোধের চারটি ক্রমস্তরের নমুনা বা বিশেষ উদাহরণ।

সামগ্রিক ধর্ম ও সৃষ্টিকে রক্ষার জন্য মানুষের জ্ঞান, শক্তি, গুণ ও কর্মের যোগ্যতা অনুসারে এই চতুর্বর্ণের সৃষ্টি করা হয়েছে। আপন আপন স্বভাবজ কর্মে রত থেকে প্রত্যেকেই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারে। এই ছিল প্রাচীন ভারতের ধর্ম ও সভ্যতার বিধান।

ধর্ম ও অধর্মের লক্ষণ

নিজের স্বার্থের জন্য সমগ্রতা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে অপরের স্বার্থকে আঘাত করাই হল পাপ ও অধর্ম[১]।

ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত কল্যাণের জন্য কোন ধ্বংসাত্মক আদর্শ বা ভাবধারা এবং অনিষ্টকর চিন্তা ও কর্মপদ্ধতিকে প্রশ্রয় না দেওয়াই হল ধর্মসাধনার উদ্দেশ্য।

জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে উভয় ভাবেই অপরাধ হতে পারে

অজ্ঞাতসারে অর্থাৎ না-জেনে ভুল করা অপরাধ হলেও তা ক্ষমার যোগ্য। কিন্তু জ্ঞাতসারে বা জেনে স্বেচ্ছাকৃত যে ভুল বা অন্যায় করা তা-ই পাপ।

সত্যজ্ঞান সত্যকর্ম এবং সৎসঙ্গের মাধ্যমে জীবনের সর্ববিধ দোষত্রুটি ও হীন প্রবৃত্তিকে শোধন করা সম্ভব।

সদাশ্রয়ে এবং সৎ-এর সাহায্যে জীবনের সামগ্রিক শোধন ও পরিণাম সাধিত হয়

জীবনের নিম্ন অভিজ্ঞতার মান হতে উচ্চতম অভিজ্ঞতার স্তর পর্যন্ত উপনীত হতে মানুষকে বহুবিধ ভুলত্রুটির মধ্য দিয়েই যেতে হয়। অন্তঃপ্রকৃতির ক্রমবিকাশ ও পরিশোধন কার্য ভুলের মধ্য দিয়েই ক্রমপর্যায়ে এগিয়ে চলে। এক স্তরে যা ভুল, অন্য স্তরে তা-ই শুদ্ধ হয়। পরবর্তী স্তরের ভিত্তিও প্রকাশমানের তুলনায় শ্রেয়। যথার্থ মহৎ পাপীকে ঘৃণা করেন না, পাপকর্মকে ঘৃণা করেন। ধর্ম ও অধর্ম পাপ ও পুণ্য, সত্য ও মিথ্যা প্রভৃতি পরস্পর যুক্ত আছে। একটিকে বাদ দিয়ে অপরটিকে পূর্ণভাবে ধরা যায় না।

জীবনে শিক্ষা ও সাধনার রহস্য

একটি বীজকোষের মধ্যে যেমন বিরাট মহীরুহ লুকিয়ে থাকে সেইরূপ জীবনের মধ্যেও পূর্ণতা অমৃতত্ব ও শান্তি লুক্কায়িত আছে। এটা আবিষ্কার করাই হল সাধনা[২]।

ধর্ম ও কর্মের ভিত্তিই অনুভূতি

কর্ম ও ধর্মের সঙ্গে জ্ঞান ও অনুভূতি অবিচ্ছিন্ন ভাবে যুক্ত। কোনও কর্মই অভিজ্ঞতাশূন্য নয় এবং কোনও অভিজ্ঞতাই কর্ম বা ধর্মশূন্য নয়। কর্ম ও ধর্ম এক তত্ত্বেরই দ্বিবিধ ভাব। ধর্ম হল অনন্ত অসীম অখণ্ড একক সর্বধারী সর্বগ্রাহী এবং স্বতঃস্ফূর্ত সক্রিয় পদ্ধতি। এই ধর্মই হল মহানিয়তি। কর্ম হল ধর্মের ব্যবহারিক রূপ।

সনাতন ধর্মের তাৎপর্য ও মাহাত্ম্য

সর্ব ধর্মভাবের অন্তর্নিহিত সত্যধর্ম হল এক সনাতন ধর্ম। এই ধর্মের সঙ্গেই সর্ব ধর্মভাব ও মতের মৌলিক যোগসূত্র আছে। হিন্দু পার্শী ইহুদী খ্রিস্টান বৌদ্ধ জৈন শিখ মুসলমান এবং অন্যান্য ধর্মভুক্ত সকলেই এই সনাতন ধর্মের অন্তর্ভুক্ত থেকে সেই একের অধীনে এবং একের সমাধানে সতত যুক্ত। সকলেই এক ঈশ্বরের সন্তান।

১। অভিনব সংজ্ঞা। ২। অভিনব সংজ্ঞা।

মানবতার নিগূঢ় তত্ত্ব

মানবতার কেন্দ্র এক এবং অদ্বিতীয়। এ-ই অদ্বয় সত্তা। সেই অখণ্ড একক সত্তা সবারই সত্য পরিচয়। আপন হৃদয়ে তার অনুভূতি মেলে। তার সঙ্গে একীভূত হয়ে গেলে অন্তরে শাস্ত্র বেদ বেদান্ত আপনিই উদগীত হয়। [২৩।৬।৬৮]

আত্মসাধনার লক্ষ্য

প্রকৃতিগত দোষত্রুটি শোধন করাই হল আত্মসাধনার প্রথম লক্ষ্য। দেহ প্রাণ মন ও বুদ্ধির বৈষম্যই হল সত্যবোধের অন্তরায়। এই বৈষম্যই হল চিত্তের অশুদ্ধি। এই অশুদ্ধির লক্ষণ হল দেহের জড়তা অলসতা, মনের কর্তৃত্ব অহংকার কামনা বাসনা ক্রোধ মদ মাৎসর্য ভীতি সংশয় প্রভৃতি, প্রাণের ভোগ লাভ স্বার্থপরতা অস্থিরতা চঞ্চলতা বিকার ব্যাধি প্রভৃতি এবং বুদ্ধির পাণ্ডিত্যাভিমান ও পক্ষপাত দোষ প্রভৃতি।

বুদ্ধিযোগে জীবের জীবত্ব আর বুদ্ধিশুদ্ধিতে শিবত্ব

বুদ্ধি হল জীবের পরিচালক। মন প্রাণ হল তার অনুগত সেবক। এদের পরস্পরের মধ্যে সহযোগ সম্বন্ধ আছে। এদের কোন একটা বিকৃত হলে অপরগুলিও কিয়ৎ পরিমানে বিকৃত হয়। বুদ্ধির শোধন সর্বাগ্রে প্রয়োজন। বুদ্ধির শোধন হলে অপরগুলিও সহজে পরিশোধিত হয়।

সাধনার পরিণামের ক্রম

সাধনার প্রথম পর্যায় হল বহিরঙ্গ প্রধান, দ্বিতীয় পর্যায় হল অন্তরঙ্গ প্রধান, তৃতীয় পর্যায়ে হয় সিদ্ধি এবং চতুর্থ পর্যায়ে হয় মুক্তি ও শান্তিতে প্রতিষ্ঠা। তারপরে পঞ্চম স্তরে হল নিত্যলীলা। অস্থির চঞ্চল চিত্তই হল অশুদ্ধ চিত্ত এবং স্থির ও প্রশান্ত চিত্ত হল শুদ্ধ চিত্তের লক্ষণ।

চৈতন্যের ভিন্ন ভিন্ন অভিব্যক্তির বৈশিষ্ট্য

এক চৈতন্যসত্তারই সগুণ অভিব্যক্তি হল জীব ও জগৎ। জীবের মধ্যে আবার ব্যষ্টি সমষ্টি এবং জগতের দৃষ্টিতেও ব্যষ্টি সমষ্টির বিভাগ আছে।

দ্বৈতবাদী ও অদ্বৈতবাদীর সিদ্ধান্ত

অদ্বৈতবাদী নির্গুণতত্ত্বে বিশ্বাসী এবং দ্বৈতবাদী হল সগুণতত্ত্বে বিশ্বাসী। সগুণবাদী জগতের সত্যতা স্বীকার করেন। জগতের সত্য পরিচয় হল ঈশ্বরের অভিব্যক্তি অর্থাৎ চৈতন্যের অভিব্যক্তি ও প্রকাশধারা। সুতরাং জগৎকে জগৎবোধে গ্রহণ না করে ঈশ্বরবোধে মানার অভ্যাসই হল সহজ সাধনা। তার ফলে ঈশ্বরানুভূতি সহজে হয়। ঈশ্বরবোধে জগতের সবকে সেবা করাই হল ঈশ্বরবোধে সকলকে মানা। ঈশ্বরের নিমিত্ত কর্মই হল নিঃস্বার্থ কর্ম। নিজের নিমিত্ত কর্মই হল সকাম ও স্বার্থযুক্ত কর্ম।

ঈশ্বরের কৃপালাভ ও সর্বসমাধানের উপায়

চিন্তা কর্ম ও জীবনের ব্যবহারে সামঞ্জস্য রেখে চলাই হল ঈশ্বরের কৃপালাভ ও সর্বসমাধানের সহজ উপায়।

স্বভাব ও স্ববোধের উৎকর্ষের ফলশ্রুতি

প্রিয়বোধই হল আপনবোধ বা স্ববোধ আত্মার বৈশিষ্ট্য। এর উৎকর্ষই হল আত্মজ্ঞান। আত্মজ্ঞানে সকলের জীবনই সমান মূল্যবান। আত্মজ্ঞানে বা সমজ্ঞানে জীবনের মূল্যবোধ সকলের সমান এবং এই মূল্যবোধের উপরেই সুষ্ঠু সুন্দর উন্নত সমাজজীবন তৈরি করা সম্ভব। জীবনের মূল্যবোধ শ্রদ্ধা-ভক্তি-বিশ্বাসশূন্য বুদ্ধিবৃত্তির চিন্তা দ্বারা ও কর্মের দ্বারা কোনদিনই সম্ভব নয়।

মৌলিক সত্যের মৌলিকতা

সর্বোত্তম ও সর্বোচ্চ আদর্শ যা সর্বযুগে সর্বদেশে সর্বজাতির মধ্যে সময়োপযোগী প্রেরণা উদ্দীপনা শক্তি জ্ঞান আনন্দ ও শান্তি প্রদান করে তারই সর্ববাদীসম্মত নাম হল নিত্যসত্য অমৃতত্ব ঈশ্বর আত্মা ভগবান ব্রহ্ম ইত্যাদি।

একমাত্র ঈশ্বরীয়বোধে, ভগবৎবোধে সকলকে সমভাবে নেওয়া সম্ভব। সবার মধ্যে এক অখণ্ড বোধকে মেনে নিতে পারলে ও সেই বোধে কাজ করলে অর্থাৎ ঈশ্বর আত্মার প্রীত্যর্থে কাজ করলে কোন ব্যক্তিগত ভাবনা থাকে না। তার ফলে কোন পৃথক ভাবনা বা কোন স্বার্থভাবনা না রেখে কাজ করা যায়। তখন আত্মবোধে থেকে আত্মভাব, বিষয় থেকে বিষ্ণুভাব এবং দৃশ্য থেকে দ্রষ্টাভাব আসে।

স্বভাবের পরিণামই স্ববোধ

একাত্মবোধ হল ব্রহ্ম আত্মা ঈশ্বর ঐক্য জ্ঞান। তার বিজ্ঞানকেই স্বভাববিজ্ঞান বলে। বহুর মধ্যে অখণ্ড এককে ধরতে পারলেই সমবোধে আসা সম্ভব হয়।

স্রষ্টা ও সৃষ্টি অভিন্ন

স্রষ্টা নিজের মধ্য থেকেই এই সমগ্র জগৎ সৃষ্টি করেছেন এবং সৃষ্টির মধ্যে নিজেই আছেন। তিনিই স্বয়ং একমাত্র কর্তা ভোক্তা জ্ঞাতা। সকলে তাঁর মাধ্যম মাত্র। অর্থাৎ সকলের মধ্যে বসে তিনি নিজেই কর্তা ও জ্ঞাতা সেজে সবকিছু করেন এবং তা ভোগ করেন। জীব যথার্থ কর্তা নয়। জীব হল তাঁর অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং লীলামাধ্যম।

নিষ্কাম কর্মের বৈশিষ্ট্য

স্রষ্টার নিমিত্ত কর্মই হল নিষ্কাম কর্ম। নিষ্কাম কর্ম স্বার্থশূন্য কর্ম বলে প্রীতিপূর্বক ও সচেতন ভাবে হয়। নিষ্কাম কর্ম করলে ব্যক্তিগত কামনা নিবেদন ও সমর্পণের মাধ্যমে পরিশোধিত হয়ে স্বভাবে পরিণত হয়। তখন কর্মের ফল নির্বীজ হয়ে যায় এবং তার শুভাশুভ প্রভাব বা বন্ধনও থাকে না।

বন্ধন ও মুক্তির কারণ

কর্ম সকাম হলে জীবনের বন্ধনের কারণ হয় এবং নিষ্কাম হলে মুক্তির কারণ হয়। 'আমার আমি বোধে' বন্ধন এবং 'তুমি তোমার বোধে' মুক্তি। কর্তা, কর্ম ও কর্মফলের সঙ্গে আমি-ভাব যুক্ত করলে বন্ধন, আবার এ-সবের সঙ্গে তুমি-ভাব যুক্ত করলে হয় মুক্তি।

দ্বৈত ও অদ্বৈতের বৈশিষ্ট্য

অদ্বয়বোধই হল সত্যজ্ঞান এবং দ্বৈতবোধ হল অশুদ্ধজ্ঞান বা অজ্ঞান। যেখানে দ্বৈত নেই তা-ই হল অদ্বয়বোধ। অদ্বয়বোধে সব একাকার। তাতে কোন ভাগ নেই, কোন তুলনা নেই।

মনুষ্য জন্মের সার্থকতা একাত্মবোধে

একাত্মবোধে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্যই এই দুর্লভ মনুষ্য জন্ম। বহু জন্মের পরে ঈশ্বরের কৃপায় জীব এই মনুষ্য জন্ম পায়। দুর্লভ মনুষ্য জন্ম পেয়ে ঈশ্বর আত্মার সন্ধান করাই হল অধ্যাত্ম সভ্যতার বৈশিষ্ট্য। মনুষ্য জীবনে ঈশ্বর আত্মার সাধন না করা হল জাগতিক সভ্যতার নিদর্শন। জাগতিক সভ্যতা হল দেহাত্মবুদ্ধি ও পার্থিব ভোগসুখের সাধনার ফল। অধ্যাত্ম সভ্যতা হল অখণ্ড সত্য ও ঈশ্বরাত্মা ঐক্য জ্ঞানের সাধনা ও তার অনুভূতি।

ঈশ্বরের মহিমা জীবজগৎ

ঈশ্বর জীব ও জগৎকে সৃষ্টি করেছেন, অথবা তিনি নিজেই জীবজগৎ রূপে অভিব্যক্ত হয়েছেন। মানুষ তাঁর মধ্যে এক বিশেষ প্রকাশ মাত্র। অনন্ত বিশ্বসত্তা ও তার প্রকাশের কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। সৃষ্টির বৈচিত্র্য হল ঈশ্বরীয় শক্তির লীলাবিলাস। প্রত্যেকের সঙ্গে বিশ্বের সর্বপ্রকাশের অভেদাভেদ সম্বন্ধ। ভেদ থেকেও নেই আবার না-থেকেও আছে। অভেদ নিত্য কিন্তু বহিঃপ্রকাশ দ্বারা আবৃত। ভেদসমূহের দ্বারা অভেদ সত্যের কোন ক্ষতি হয় না; বরং অভেদের অনন্ত মহিমাই প্রকাশ পায়। ইন্দ্রিয় দৃষ্টিতে পরস্পরের মধ্যে ভেদ প্রতীত হয়, কিন্তু আত্মদৃষ্টিতে অভেদ অনুভূত হয়। আত্মজ্ঞানই হল অখণ্ড ভূমাজ্ঞান বা নিত্যপূর্ণ স্বয়ংপ্রকাশ নির্বিকার সচ্চিদানন্দ সত্তা। পরস্পর প্রকাশসমূহের মধ্যে এক অবিচ্ছেদ্য মধুর সম্বন্ধ এবং যোগসূত্র নিহিত আছে। প্রেম ও আত্মসমর্পণের মাধ্যমে একাত্মবোধের এই যোগসূত্র বা মধুর সম্বন্ধ আবিষ্কার করাই হল জীবনসাধনার মূল উদ্দেশ্য।

বস্তুবাদ ঈশ্বরবাদের অন্তরায়

বস্তুজগতের প্রভাবে সাধারণ মানুষ চলে; সেইজন্য বস্তুজগতের ঊর্ধ্বে বিশ্বচৈতন্যের সঙ্গে আপনার সম্বন্ধ সে সহজে অবগত হতে পারে না। বস্তুবাদী কোন ব্যক্তি বা সমাজ কাউকেও পূর্ণতা ও মুক্তি দিতে পারে না; কিন্তু একজন পূর্ণসিদ্ধ মানব তা পারে। জাগতিক উন্নতি হয় রজোশক্তির প্রাধান্যে কিন্তু দিব্যজীবন লাভ হয় সত্ত্বগুণের প্রাধান্যে গুণাতীত বোধের দ্বারা।

অসংযত অবিবেকী চিত্তের পরিণাম

যখন হিতাহিত ও পরিণাম না-ভেবে ক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত বহুলোক একত্র হয়ে অন্যায়ভাবে নিজেদের দাবিপূরণের চেষ্টা করে তখন সমাজ-শৃঙ্খলা ও নিয়ম ভঙ্গ হয়। সাধারণের শান্তি বিনষ্ট হয়, সর্বত্র সন্ত্রাস ও ভীতির সৃষ্টি হয়। তখন অসৎ লোক শক্তি পেয়ে কার্যসিদ্ধি করে, নগন্য ব্যক্তি গণ্যমান্য হয় এবং দুশ্চরিত্রের দল ভবিষ্যতের কাজ গুছিয়ে নেয়। এরূপ অবস্থায় জীবগণ নির্বাক মৌনী ও দ্রষ্টা হয়ে থাকে। সৎ ব্যক্তিগণ ক্ষমতাশূন্য হয়, নির্বোধ মতলববাজগণ প্রাধান্য পায়, নির্দয় নিষ্ঠুর হৃদয়হীন ব্যক্তিগণই নেতা হয়ে শাসনভার গ্রহণ করে। জাগতিক সভ্যতার এই হল পরিণাম। ইতিহাস হল তার সাক্ষী।

অখণ্ড সত্যই হল অধ্যাত্ম সভ্যতার ভিত্তি

অধ্যাত্ম সভ্যতার বিশেষত্ব হল যে সমগ্র জীবনই অখণ্ড সত্যের অভিব্যক্তি। সত্যের মধ্যেই সৎ ব্যক্তির বাস।

সত্যের সকল গুণ ও প্রকৃতি জীবনের মধ্যেই অভিব্যক্ত হয়। যে-জীবনের মাধ্যমে সত্ত্বগুণসকল অভিব্যক্ত হয় এবং যে সেগুলিকে অন্তরে ও বাইরে যথাযথ সুন্দর ও শুদ্ধভাবে সর্বদা ব্যবহার করতে পারে সে-ই হল প্রকৃত জ্ঞানী। সত্যে স্থিতি থেকেই নিষ্ঠা আসে। নিষ্ঠা ও সরলতা হল সবলের লক্ষণ। দুর্বলের মধ্যে নিষ্ঠা ও সরলতার অভাব থাকে।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় দেশের জীবনাদর্শ ধর্মাদর্শ ও কর্মাদর্শ সম্পূর্ণ পৃথক। কোন দেশের পক্ষেই অপর দেশের আদর্শকে সর্বতোভাবে অনুসরণ করা সম্ভব নয়। কিন্তু প্রয়োজন অনুসারে আদর্শের বিনিময় উভয় দেশের পক্ষেই সম্ভব এবং তা উভয় দেশের পক্ষেই কল্যাণকর।

ভারত শব্দের নিগূঢ়ার্থ

ভারতবর্ষের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য হল—'ভা'-তে রত এই দেশ[১]। 'ভা' শব্দের অর্থ জ্যোতিস্বরূপ অখণ্ড বিশুদ্ধ সচ্চিদানন্দ আত্মা। তাতে রত থাকা অর্থাৎ তদ্‌বোধে তার ধ্যানে, তার সেবায়, তার আদর্শে, তন্নিমিত্ত তদ্‌পরায়ণ হয়ে, তন্নিষ্ঠ হয়ে তৎকর্মকৃৎ হয়ে থাকা। এ হল এই দেশের মূলনীতি, আদর্শ, ধর্ম, ব্রত ও কর্ম। সেইজন্য এই দেশের মূল আদর্শ হল একাত্মবোধ আগে তারপরে অন্য কিছু। আত্মবোধের জাগরণ হওয়া প্রয়োজন সর্বাগ্রে। আত্মবোধ হতেই আসে একত্বের প্লাবন। একত্বের প্লাবন হল বিপ্লবের বিরুদ্ধে বিপ্লব। এই বিপ্লবই এনে দেয় সমাজজীবনে সর্বতোমুখী, সর্বাঙ্গসুন্দর পারস্পরিক একত্ববোধের নিত্যসত্য সম্বন্ধ। বিশ্বের সর্বস্তরের সঙ্গে এক অভিনব মহামিলন, প্রীতির বন্ধন, বিশ্বমৈত্রী ও স্বভাবের ঐক্য। ধর্ম হল অন্তঃপ্রাণের পূর্ণ অভিব্যক্তি ও দিব্য বিকাশের বিজ্ঞান।

ভারতের বিপ্লবাদর্শ আধ্যাত্মিক—পাশ্চাত্যের হল বস্তুতান্ত্রিক বিপ্লবাদর্শ

এই দেশের বিপ্লবের ধারা হল ধর্ম অবলম্বন করে আভ্যন্তরীণ বিপ্লব অর্থাৎ ধর্মসাধনের মাধ্যমে অন্তরের ভেদজ্ঞান অজ্ঞান যথা তমোগুণ ও রজোগুণের প্রভাব শোধন করা এবং শুদ্ধ একাত্মবোধে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। একমাত্র আত্মবোধেই সমদৃষ্টি লাভ করা সম্ভব কিন্তু ইন্দ্রিয়বোধের দ্বারা তা সম্ভব নয়। পাশ্চাত্য দেশের বিপ্লব হল বহিঃসত্তার বিপ্লব। এর ভিত্তি হল বস্তুতান্ত্রিক। ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানকে অবলম্বন করে সমত্বের স্বপ্ন দেখাই হল তাদের বিপ্লবধারা। ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান বিকারধর্মী ও পরিবর্তনশীল বলে তাদের বিপ্লব বোধের সমাধান আনতে পারে না। সাময়িক ভাবে যে সমাধান হয় তা-ও ঘনঘন পরিবর্তিত হয়।

প্রত্যেক দেশের এবং জাতির জীবনাদর্শ ও সমাজ আদর্শ বিভিন্ন। অপরের আদর্শ ধার করে আপন আদর্শের পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়া যায় না। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন আদর্শের মধ্যে যে পার্থক্য বা ভেদ আছে সেই দিকে দৃষ্টি না-রেখে এদের মধ্যে যে অন্তর্নিহিত মৌলিক যোগসূত্র ও মিল আছে সেদিকে লক্ষ্য রেখে চলতে পারলে সকলেরই উপকার হয়। কেবলমাত্র পার্থক্যের দৃষ্টি নিয়ে নিজের দেশের আদর্শকে আঘাত করে বা পরিহার করে তার পরিবর্তে ভিন্ন আদর্শকে গুরুত্ব দিয়ে তার প্রাধান্য স্থাপন অথবা তার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা শুধুমাত্র দেশাত্মবোধের অন্তরায় নয়, তা দেশদ্রোহিতাও বটে। অন্য দেশের বিকার এনে আপন দেশের বিকারের সঙ্গে যুক্ত করলে বিকার বাড়ে ছাড়া কমে না। হাতির মাথা কেটে ঘোড়ার গলায় লাগালেই ঘোড়া হাতি হয় না, অথবা ব্যাঘ্র বা সিংহের মাথা বা তার

১। স্বানুভূতিতে।

পোশাক পরিধান করলে ব্যাঘ্র বা সিংহ হওয়া যায় না। পরীক্ষার ছলে ব্যবহার করতে গেলে উভয় ক্ষেত্রে শুধু বিকারই সৃষ্টি হয়। বিকৃত ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে বিকারই সৃষ্টি হয়। যখনই যে-দেশে কোন বিকারজনিত পরিবেশ সৃষ্টি হয় তার মূলে থাকে বিকৃত চিন্তা এবং কর্ম।

জড়বিজ্ঞান হল বস্তুকেন্দ্রিক কিন্তু অধ্যাত্মবিজ্ঞান হল ঈশ্বর ও আত্মকেন্দ্রিক অর্থাৎ সনাতন ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই সনাতন ধর্মই হল অখণ্ড ভূমা সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্ম-আত্মা-ঈশ্বর ঐক্য জ্ঞান। এই হল অদ্বয়তত্ত্ব বা অমৃতত্ব।

প্রাচ্যদেশের ধর্ম ও বিজ্ঞানের তাৎপর্য পাশ্চাত্য দেশের থেকে ভিন্ন

জীবনের বাইরে সত্যসন্ধানের নাম জড়বিজ্ঞান এবং জীবনকে কেন্দ্র করে সত্যসন্ধানের নাম ধর্মবিজ্ঞান বা অধ্যাত্মবিজ্ঞান। সত্য অখণ্ড অনন্ত অসীম। ধর্ম হল ভিত্তি, বিজ্ঞান হল সৌধ এবং দর্শন হল সব কিছুর একীকরণ বা সমীকরণ।

পার্থিব সুখ ও পারমার্থিক সুখের পার্থক্য

জীবনের দ্বিবিধ লক্ষ্য হল পার্থিব সুখ ও পারমার্থিক সুখ লাভ। পার্থিব সুখের ফল ভোগ ও মৃত্যু এবং পারমার্থিক সুখের ফল অমৃতত্ব ও শান্তি। কেবলমাত্র ব্রহ্ম-আত্মা-ঈশ্বরের বিজ্ঞানই অমৃত ও শান্তি দিতে পারে। অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের সাহায্যে জীবনের যথার্থ ব্যবহার হলে জীবন সুস্থ নিরাময় ও দীর্ঘায়ু লাভ করে অমৃত শান্তির অধিকারী হয়।

সত্যধর্ম ও অধ্যাত্মবিজ্ঞানের ফলশ্রুতি

সত্যধর্ম বা অধ্যাত্মবিজ্ঞান অবলম্বনে জীবন পরিচালিত হলে মানুষের ভোগাসক্তি বাড়ে না এবং জীবন বিকৃত হওয়ার সুযোগও পায় না। সুতরাং তার কোন ওষুধেরও প্রয়োজন হয় না। তার কাছে 'মাইসিটিন' জাতীয় প্রতিক্রিয়াধর্মী দামী উগ্র ঔষধ অপেক্ষা ধর্মবিজ্ঞানের অনুশাসন অধিক মূল্যবান ও স্থায়ী ফলপ্রদ। এই ধর্মবিজ্ঞানের মাধ্যমে সবল সুস্থ বলিষ্ঠ সখ ও শান্তিপূর্ণ অমৃতময় জীবনের অধিকারী হওয়া যায়।

বস্তুবাদ ও অধ্যাত্মবাদের পার্থক্য

পাশ্চাত্য জাতি বস্তুতান্ত্রিক। বস্তুতন্ত্রে উন্নত হয়েও তারা প্রকৃত শান্তির সন্ধান আবিষ্কার করতে পারে নাই। বস্তুর প্রাধান্য দিয়ে সত্যের সত্তায় উপনীত হওয়া বা আত্মবোধে প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভবপর নয়। কাজেই পাশ্চাত্য জগতে আত্মিক উন্নতি কিছু হয় নাই। দৈহিক সুখ ও আরামের জন্য তারা বস্তুজগতের উন্নতি করেছে কেবলমাত্র, কিন্তু শান্তির পথ পায় নাই। অধ্যাত্মবাদী হল শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী। অধ্যাত্মবিজ্ঞানের সাহায্যে জগৎ ও জীবনের অভেদ সত্যের পূর্ণ পরিচয় জানা যায় এবং আপনবোধেই তার উপলব্ধি হয়।

কোন দেশেই কোন যুগের সভ্যতাই ভারতীয় সভ্যতার প্রভাবমুক্ত নয়

কি প্রাচীনযুগে কি মধ্যযুগে এমনকি বর্তমান যুগেও এমন কোন সভ্য দেশ পৃথিবীতে নেই যে-দেশ ও সভ্যতা ভারতীয় সভ্যতার প্রভাব হতে সম্পূর্ণ মুক্ত। অপ্রতিদ্বন্দ্বী এই সভ্যতার বিশেষ অবদান হল সচ্চিদানন্দঘন অখণ্ড ভূমা

ব্রহ্মতত্ত্ব আত্মতত্ত্ব ঈশ্বরতত্ত্ব অদ্বয়তত্ত্ব অমৃতত্ব পরমার্থতত্ত্ব নিত্য শাশ্বত অখণ্ড ভূমাতত্ত্ব, তার নির্গুণ ও সগুণের যথার্থ পরিচয়, সর্বোত্তম ধর্মাদর্শ, প্রজ্ঞানের বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানের প্রজ্ঞান, বিজ্ঞানের বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানের জ্ঞান, জ্ঞানের বিজ্ঞান ও অজ্ঞানের বিজ্ঞান এবং অজ্ঞানের জ্ঞান প্রভৃতির নির্ভুল যথার্থ পরিচয় ও তার সত্য মহিমা। সে-ই এর মৌলিকতা এবং তার সর্বসত্যের অধিকারী। ধ্যানলব্ধ অখণ্ড সত্যের উপলব্ধি প্রজ্ঞানঘন ভূমাতত্ত্বের গভীর গবেষণা, জ্ঞানবিজ্ঞানের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ এবং ভূমাতত্ত্ব উপলব্ধির নানাবিধ উপায় ও পদ্ধতি আবিষ্কারের দ্বারা গৌরবময় বৈদিক সভ্যতার শ্রেষ্ঠ ধারক, বাহক ও পরিবেশক হল এই দেশ।

ঈশ্বর জ্ঞানে দেশসেবার আদর্শ একমাত্র ভারতেই দৃষ্ট হয়

ঈশ্বর জ্ঞানে দেশসেবা—সমগ্র দেশকে বিশ্বজননী দুর্গাবোধে গ্রহণ করে নিজেকে তাঁর সেবায় নিয়োজিত করাই হল দেশপ্রেমের লক্ষণ।

এই দেশের আদর্শ হল সর্ববস্তুকেই ব্রহ্মবোধে আত্মবোধে ঈশ্বরবোধে গুরুবোধে বা মাতৃবোধে মানা। এদেশে বিষয়কে বিষ্ণুবোধে, মায়াকে মাতৃবোধে এবং পৃথিবীকে ধরিত্রী-মা বোধে মানা হয়। মাটি থেকে শুরু করে মহাপ্রাণচৈতন্য পর্য্যন্ত সবকিছুকেই পূজা করা হয় ঈশ্বর আত্মবোধে। অন্ন হল প্রাণ। অন্নকে পৃথকবোধে না নিয়ে ব্রহ্মবোধে মানা হয়। সেজন্য অন্নকেও পূজা করা হয়। প্রাণের জন্যই প্রাণের দান। ঔষধপথ্য সবকিছুই প্রাণের ভিন্ন ভিন্ন অভিব্যক্তি।

বিশ্বপ্রাণই হল মহাপ্রাণ ভগবান। ব্রহ্ম আত্মা ঈশ্বর গুরু হল তার যুগোপযোগী ভিন্ন ভিন্ন নাম। সেই জন্য বেদবানী হল—সবকিছু ব্রহ্মময় আত্মময় ঈশ্বরময় গুরুময় শিবময় রামময় কৃষ্ণময় হরিময় বা মাতৃময়। অণুব্রহ্ম প্রাণব্রহ্ম মনব্রহ্ম বিজ্ঞানব্রহ্ম ও আনন্দব্রহ্ম। সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্মসাগরে ব্রহ্ম ছাড়া আর দ্বিতীয় কিছু নেই। যোগীদের ভাষায় বিশ্বপ্রাণই হল বিশ্বাত্মা এবং জীবাত্মা তার সন্তান অংশ প্রকৃতি বা তার লীলামাধ্যম। ভক্তের ভাষায় সেই হল গুরু ইষ্ট ভগবান। সকলেই তার ভক্ত সন্তান অংশ বা প্রকৃতি। কর্মীর ভাষায় তা হল গুরু বা আদর্শ। এই আদর্শ হল সর্বোত্তম বা নিঃশ্রেয়স্কর। তাঁর উদ্দেশ্যে তাঁকে অবলম্বন করে তদ্‌নুরূপ হওয়াই হল কর্মীর লক্ষ্য।

সকাম ও নিষ্কাম ভোগের বৈশিষ্ট্য

ভোগ বা কামনা হল অসংস্কৃত অনুন্নত তামসিক ও রাজসিক সংস্কার। উপযুক্ত শিক্ষা ও সাধনার মাধ্যমে তা পরিশোধিত হয়ে ভক্তিতে পরিণত হয়। ভোগ দ্বিবিধ—সকাম ও নিষ্কাম। সকাম ভোগ হয় 'আমি আমার বোধের' ব্যবহারে এবং নিষ্কাম ভোগ হয় 'তুমি তোমার বোধের' ব্যবহারে। 'আমি আমার বোধে' ভোগের পরিণাম বন্ধন কিন্তু 'তুমি তোমার বোধে' ভোগের পরিণাম হল জীবন্মুক্তি ও শান্তি। ত্যাগের মাধ্যমে ভোগ হল নিষ্কাম ভোগ। নিজের জন্য ভোগ করলে শুধু দুর্ভোগই বাড়ে, কিন্তু ঈশ্বরের জন্য ভোগ ভক্তিতে পরিণত হয়। নিজের জন্য কর্মের ফল হল ভোগ, ঈশ্বরের জন্য কর্মের ফল হয় ত্যাগ ও ভক্তি।

ভারতের দেবদেবীদের হাতে অস্ত্রের তাৎপর্য

ভারতবর্ষে দেবতার এক হাতে যেমন অস্ত্র আছে, তেমন অপর হাতে বরাভয়ও আছে। এই অস্ত্রের তাৎপর্য হল জীবের অজ্ঞান নাশ করে তাকে জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত করা। তাদের অন্তরে মৈত্রী কৃপা করুণা সহানুভূতি মমতা স্নেহ ভালবাসা প্রেম ও অহিংসা।

ভারতীয় সংস্কৃতির তাৎপর্য

ভারতীয় সংস্কৃতি—'ভা'-তে রত হল ভারত; অর্থাৎ ভালতে—অখণ্ড ভাস্বর জ্যোতির্ময় একাত্মবোধের সাধনায় রত। এই অখণ্ড একাত্মবোধের সাধনায় রত হওয়াই হল ভারতীয়দের জীবনের লক্ষ্য। এই হল ভারতীয় সংস্কৃতির তাৎপর্য।

ঈশ্বরীয় মনের সঙ্গে মানবীয় মনের অভেদ সম্বন্ধ

মানুষের মন ঈশ্বরীয় মনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। অনন্ত অসীম দিব্যমনের সঙ্গে মানবীয় মনের নিত্যযোগ সম্বন্ধ আছে। সেই কারণে মানুষ তার অন্তর্নিহিত দিব্যমন ও দিব্যসত্তার অনুভূতি লাভ করে তাতে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। অধ্যাত্মবিজ্ঞান বা ঈশ্বরীয় বিজ্ঞানের যথার্থ অনুশীলন দ্বারা মানুষ তার হৃদয়ে অনন্ত দিব্য মানসচৈতন্যসত্তার পরিচয় সম্যক্‌ভাবে অবগত হতে পারে। এই দিব্য মানসসত্তার যে অংশে মানুষের মন অবস্থিত তার মধ্যেও সপ্তস্তর ও মন নিহিত আছে। এই সপ্তস্তর দিব্যমনের সপ্তব্যাহৃতির সঙ্গে যুক্ত। সমগ্রতার দিক হতে এই মন চারটি বিশেষ ভাগে বিভক্ত হয়ে কাজ করে। মনের চারটি বিভাগ হল বহিঃপ্রকৃতিসত্তার সঙ্গে যুক্ত বহির্মন, অন্তরসত্তার সঙ্গে যুক্ত অন্তরমন, কেন্দ্রসত্তার সঙ্গে যুক্ত কেন্দ্রমন এবং তদূর্ধ্বে তুরীয়সত্তার সঙ্গে যুক্ত তুরীয়মন। এই চারটি বিভাগের প্রথম দুই ভাগ মিলে হয় নিম্নমন এবং পরবর্তী দুই ভাগ মিলে হয় ঊর্ধ্বমন। নিম্নমন ঊর্ধ্বমনের খবর সাধারণত রাখে না। বৈচিত্র্যময়, সৃষ্টির সঙ্গেই তার বেশি সম্বন্ধ থাকে বলে বৈচিত্র্যের প্রভাবে সে চলে। অন্যভাবে বলা হয় এই বৈচিত্র্যের কারণই হল নিম্নমন। মন ও সৃষ্টি অভেদে যুক্ত। ঊর্ধ্বমন সৃষ্টির মধ্যে থেকেও সৃষ্টির ঊর্ধ্বে; অর্থাৎ তার স্বভাব নির্বিকার, প্রশান্ত।

ঊর্ধ্বমন ও নিম্নমনের সম্বন্ধ

অস্থিরতা চঞ্চলতা অশান্ত ভাব হল নিম্নমনের বিশেষত্ব। ঊর্ধ্বমনের সাহায্যে নিম্নমনকে শোধন করতে হয়। প্রথমে নিম্নমনকে তার অশান্ত ভাব থেকে সংযত করে ঊর্ধ্বমনের গভীরে প্রবেশ করার অভ্যাস করতে হয়। তাহলেই সে দিব্যমনের সন্ধান পায়। ঊর্ধ্বমনের প্রভাবে নিম্নমনকে দিব্যমনের সঙ্গে যুক্ত করে নিম্নমনের শোধন হয় ও রূপান্তর হয়। তখন সে শান্ত সমাহিত হয়ে অন্তরের গভীরে কেন্দ্রমনের স্বভাবসিদ্ধ পূর্ণশক্তির অধিকারী হয়। তখন সে সেই শক্তির ব্যবহার করে প্রকৃতির অন্তর্নিহিত সূক্ষ্মতর স্তরের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে এবং তার রহস্য অবগত হয়ে ইচ্ছামত প্রয়োগ করতে পারে। মনের এই শক্তিই হল বিভূতি শক্তি। এই বিভূতি শক্তির অপপ্রয়োগের ফলে মনের এই শক্তি আবার লুপ্ত হয়। তবে বিভূতি শক্তির ব্যবহার না করে এই মন ইচ্ছা করলে বিশ্বমন বা দিব্যমনের সঙ্গে মিলে তাদাত্ম্য লাভ করতে পারে। বিশ্বমনকেই ঈশ্বরীয় মন বলা হয়। এ-ই অখণ্ড বিশুদ্ধ মানসসত্তা অধ্যাত্মবাদীদের কাছে। এই মনের স্বভাবপ্রকৃতি হল কামরাগবিবর্জিত অহংকার-অভিমানশূন্য বিশুদ্ধ সত্যকাম, সত্যসংকল্পময়, অনন্ত ও অসীম। সমগ্র ইচ্ছার ঘনীভূত রূপ এই মন অনন্ত অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের সর্বঘটনা ও প্রকাশের জীবন্ত যন্ত্র। সমগ্র সৃষ্টির কারণ ও কার্যসমূহের মূল বা নিয়ন্তা। এরই অপর নাম মহানিয়তি। সমগ্র বিশ্বসৃষ্টি এরই নিয়ন্ত্রণাধীন।

নিম্নমনের অশান্ত অস্থির অসংযত চিন্তাতরঙ্গের প্রভাববশে পরিচালিত হয়ে যতদিন মানুষ থাকে ততদিন পর্যন্ত সে ঊর্ধ্বমনের ও দিব্যমনের সন্ধান পায় না। নিম্নমনের কাজই হল ভোগ মোহ আসক্তি সৃষ্টি করা। এই মনই হল সংসারবন্ধন বা দেহবন্ধনের কারণ। এ প্রকৃতির অধীন বলে এই মন দ্বারা প্রকৃতির অন্তর্নিহিত কার্য-কারণের যথার্থ পরিচয় জানা যায় না। মহতের কৃপায় এই নিম্নমন ঊর্ধ্বমনের স্থান পায় এবং তার সাধনায় রত

হয়। গুরু ইষ্টের অনুগ্রহ ও কৃপায় মানুষ তার দিব্য স্বরূপ ও স্বভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। দিব্যস্বরূপই হল অতিমানস স্তর। দিব্যমনের দ্বারাই প্রকৃতির তত্ত্ব এবং সর্বরহস্য সম্যক্‌ভাবে অবগত হওয়া যায়। দিব্যস্বরূপ ও স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হলে মানুষ অতিপ্রাকৃত শক্তির অধিকারী হয়। এই অতিপ্রাকৃত শক্তিই হল ঈশ্বরীয় শক্তি।

ভারতের বৈশিষ্ট্যই হল ধর্মবিজ্ঞান

কলিযুগের লক্ষণ হল জীবনের অমর্যাদা ও কলের প্রাধান্য। এদেশের ধর্মবিজ্ঞানের মতে জীবনের প্রাধান্য আগে—পরে যন্ত্রের প্রাধান্য। যন্ত্রের প্রয়োজনে জীবন নয়, জীবনের প্রয়োজনে যন্ত্র। কাউকেও ঘৃণা করে, ছোট করে, হেয় করে নিজে বড় হওয়া যায় না।

চতুর্যুগের বৈশিষ্ট্য

সত্যযুগ হল ষোল আনা সত্য বিশুদ্ধবোধের যুগ। জ্ঞান তপস্যাই হল এ যুগের বিশেষত্ব। এই যুগ মিথ্যার প্রভাব বর্জিত। ত্রেতাযুগে হল বার আনা সত্য এবং চার আনা মিথ্যা। ধ্যান ও জ্ঞানবিচার হল এ যুগের সাধনা। মিথ্যার প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য এ যুগে যাগযজ্ঞ ও হোমের প্রবর্তন হয়। দ্বাপর যুগ হল অর্ধ সত্য ও অর্ধ মিথ্যা মিশ্রিত অর্থাৎ আট আনা সত্য ও আট আনা মিথ্যার যুগ। সেবা দান ও ভক্তি হল এ যুগের সাধনা। কলি হল চার আনা সত্য ও বার আনা মিথ্যা মিশ্রিত যুগ। ঈশ্বরের নামকীর্তন দান ও আত্মসমর্পণ হল এ যুগের সাধনা।

সত্যযুগে বোধের প্রাধান্য অধিক, ত্রেতায় মনের প্রাধান্য, দ্বাপরে প্রাণের প্রাধান্য এবং কলিতে দেহেন্দ্রিয়ের প্রাধান্য হল সর্বাধিক। কলিযুগে জীবনের কোন মূল্য নেই—কলের মূল্য অত্যধিক। মানুষের অধীন যন্ত্র নয়, যন্ত্রের অধীন হল মানুষ, অর্থাৎ যন্ত্রের দাস মানুষ। এ-ই কলির মাহাত্ম্য। টাকা ও যন্ত্রের প্রাধান্য দান এবং ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ করাই হল কলির নীতি।

ত্যাগের মাহাত্ম্য

ত্যাগের মাধ্যমেই শুধু শাশ্বত শান্তি লাভ হয়। ত্যাগের মাধ্যমে নিজেকে বিলিয়ে দেবার মাধ্যমে অভাবনীয় শক্তি ও আনন্দ লাভ হয়।

প্রাচ্য দেশ ও পাশ্চাত্য দেশের ধর্ম ও সমাজজীবনের আদর্শ ও লক্ষ্য ভিন্ন

ভারতীয় সভ্যতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল বেদভিত্তিক ধর্ম এবং ধর্মভিত্তিক সমাজ। এ দেশের নীতি ও আদর্শ, ধর্মসাধনা এবং ধর্মজীবনে ব্যক্তি স্বাধীনতা সমর্থন করে, কিন্তু সমাজজীবনে ব্যক্তি স্বাধীনতা সমর্থন করে না। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে ধর্মসাধনা ও ধর্মজীবনের ব্যক্তি স্বাধীনতা নেই। তাদের ধর্মীয় জীবন হল সসীম ও বাঁধা নীতির অন্তর্গত এবং পারিবারিক জীবনে ও সমাজজীবনে ব্যক্তি স্বাধীনতা অনুমোদিত।

ব্রহ্মের আমি এবং আত্মার আমিই হল পুরুষোত্তম

শুদ্ধ আত্মাই হল শুদ্ধ আমি। শুদ্ধ আত্মা হল অখণ্ড ভূমা সচ্চিদানন্দঘন। এই সচ্চিদানন্দঘন ভূমা আমিই হল প্রজ্ঞানঘন ব্রহ্মের আমি। এই আমি বিশ্বাতীত এবং বিশ্বময় উভয়ই। সমগ্র সৃষ্টি মিলেই হল বিশ্বমূর্তি। এই বিশ্বমূর্তিই হল প্রজ্ঞানঘন আত্মা বা আমির বিজ্ঞানময় রূপ। ত্যাগে হয় প্রজ্ঞানে স্থিতি এবং যোগে হয় বিজ্ঞানে স্থিতি। বিশ্বাতীত

হল পরমাত্মা পরমব্রহ্ম পরমেশ্বর। বিশ্বময় হল বিজ্ঞানাত্মা ব্রহ্ম ও ঈশ্বর। প্রজ্ঞানাত্মা হল নির্গুণ এবং বিজ্ঞানাত্মা হল সগুণ। উভয় ভাবের একনিষ্ঠ সাধক হল ভারত।

আত্মা অখণ্ড এক ও অদ্বয়। অনন্ত জীবভাব হল তার বিজ্ঞানময় রূপ বা লীলামাধ্যম। সমগ্র ব্যষ্টি আত্মাই বিশ্বাত্মার অবিচ্ছেদ্য অংশ। বিশ্বাত্মার সেবা পূজা উপাসনা ধারণা ও ধ্যান বলতে প্রতি জীবাত্মার সেবাকেই বোঝায়। এ-ই ভারতের অধ্যাত্ম সাধনার বিশেষত্ব। এই সাধনার ফলই হল অদ্বয়তত্ত্বে প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ ব্রহ্ম-আত্মা-ঈশ্বর ঐক্যজ্ঞান।

তিনকালের মধ্যে বর্তমানের প্রাধান্য ও গুরুত্ব

বর্তমান সর্বতোভাবে অতীতের কাছে ঋণী। বর্তমান হল কার্য এবং অতীত হল কারণ। বর্তমান হল ফল এবং অতীত হল বীজ। অতীত ছাড়া বর্তমান হয় না। বর্তমানই অতীতে পরিণত হয়। আবার বর্তমান ছাড়া ভবিষ্যৎও হয় না। বর্তমানই হল ভবিষ্যতের কারণ।

প্রতি মুহূর্তই অতীত ও ভবিষ্যতের মর্ম জানিয়ে যায়। বর্তমানকে স্বীকার করলে অতীত ও ভবিষ্যতকেও স্বীকার করতে হয়। বর্তমানের প্রত্যেক জীবনেরই অনন্ত অতীত যেমন ছিল তেমন অনন্ত ভবিষ্যৎও আছে, তা স্বীকার করতে হয়। সত্য সর্বকালেই সমানভাবে বিদ্যমান থাকে বলে নিত্যবর্তমান বলা হয়। এই নিত্যবর্তমান কোন কাল নয়। এ হল সর্বকালের প্রকাশক অস্তিত্ব সত্তা। ত্রিকাল হল নিত্যবর্তমানের প্রকাশধারা। সত্য নিত্যবর্তমান কারণ তা গুণাতীত এবং তার নিত্যবর্তমানতাও গুণাতীত ও কালাতীত কাল। এ-ই মহাকালের পরিচয়। মহাকাল হল সর্বকালের প্রকাশক। কাল হল মৃত্যু, মহাকাল হল মৃত্যুরও মৃত্যু। মহাকালের বক্ষে কালরূপ মৃত্যু নৃত্য করে।

রাজনীতির আধ্যাত্মিক অর্থ

রাজনীতি অর্থ হল শ্রেষ্ঠ নীতি। রাজ অর্থ হল শ্রেষ্ঠ। এই শ্রেষ্ঠ নীতিই হল আত্মনীতি। এই আত্মনীতি হল রাজবিদ্যা। এ পরম গুহ্য বিষয়। আত্মা নিত্য অদ্বয় অব্যয় অখণ্ড ভূমা সচ্চিদানন্দঘন। আত্মবোধে দ্বৈত ও নানাত্ব বহুত্ব থাকে না। আত্মা আত্মাকেই ভালবাসে অর্থাৎ আত্মার আত্মস্বরূপতাই হল আত্মপ্রীতি। এই আত্মস্বরূপতা হল আত্মার স্বভাবসিদ্ধ স্বয়ংপূর্ণ স্বয়ংপ্রকাশ সতঃস্ফূর্ত একতা বা সমরস। সুতরাং রাজনীতি হল সমরসরূপ সচ্চিদানন্দ প্রেমের নীতি অর্থাৎ সমতা একতা ও পূর্ণতার নীতি। নীতি হল নিয়ন্ত্রণ বিজ্ঞান। যে-বিজ্ঞান নিত্য সমতা একতা ও পূর্ণতাকে সমভাবে প্রকাশ করে ও নিয়ন্ত্রণ করে তা-ই হল যথার্থ রাজনীতি।

বাস্তব অর্থে কূটনীতি

পলিটিক্স হল কূটনীতি। ইংরাজীতে 'পলি' মানে বহু, বৈচিত্র্য। কূট মানে মায়া। বৈচিত্র্য এবং নানাত্বই হল মায়া। এ মিথ্যা ও ভ্রান্তিমূলক। মায়া হল অজ্ঞান। পলিটিক্স হল অজ্ঞানের নীতি। সেইজন্য তা ভ্রান্তিমূলক এবং দুঃখকষ্ট ও অশান্তির কারণ।

আত্মজ্ঞান লাভই মনুষ্য জীবনের চরম লক্ষ্য

দিব্যভাবের উৎকর্ষ লাভের পরিণামে হয় আত্মজ্ঞান। আত্মতত্ত্ব লাভ ও আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই হল মনুষ্য জীবনের চরম লক্ষ্য। এ-ই হল ঈশ্বরত্ব বা অমৃতত্ব, মুক্তি ও শান্তি। ব্যষ্টিগত ভাবে কেউই মুক্ত পূর্ণ ও স্বাধীন নয়। সমষ্টি ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত হলেই জীবন পূর্ণতা লাভ করে। অপরকে জ্ঞান দেবার আগে নিজে জ্ঞান অর্জন করতে

হয়। দেশের সকলকে শান্ত ও স্থির করতে হলে আগে নিজে শান্ত হতে হয় এবং আদর্শ অনুরূপ নিজেকে তৈরি করতে হয়।

সাধনা বিনা কেবলমাত্র অনুকরণ দ্বারা মহৎ হওয়া যায় না।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শিক্ষা ও সংস্কৃতি ভিন্ন

ভারতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি সর্বেশ্বরবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। পাশ্চাত্যের শিক্ষা ও সংস্কৃতি হল বস্তুতান্ত্রিক এবং জড়বিজ্ঞান হল তার আদর্শ। পাশ্চাত্য থেকে শিক্ষনীয় হল জাগতিক উন্নতির কর্মকৌশল ও বিজ্ঞান পদ্ধতি।

ধর্মের মর্মার্থ আবিষ্কারই জীবনের শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার

মৌলিকতাই হল জীবনের পূর্ণতা। প্রত্যেকের মধ্যে অনন্ত শক্তি জ্ঞান আনন্দ ও প্রেম নিহিত আছে। এটা আবিষ্কার করাই হল জীবনের চরমতম লক্ষ্য। [২৪।৬।৬৮]

সমস্যা এবং সমাধান উভয়ই সংসারে বর্তমান

সংসারের ধর্মই হল সমস্যার সৃষ্টি করা। সমস্যার সমাধান বস্তু বা ব্যক্তির দ্বারা হয় না। ব্রহ্ম-আত্মা-ঈশ্বর ঐক্যজ্ঞানের দ্বারাই জীবনের সর্ববিধ সমস্যার সমাধান হয়। তা ছাড়া পূর্ণ সমাধান আর কিছু দ্বারাই সম্ভব নয়।

ভোগের দ্বারা ভোগের সমাধান হয় না। ত্যাগের দ্বারাই ভোগের সমাধান হয়। ত্যাগ শিক্ষা হয় বৃহত্তর আদর্শের সঙ্গে মনকে যুক্ত রাখলে।

প্রেয় ও শ্রেয় পথের পার্থক্য

প্রেয় পথের আদর্শ হল জাগতিক ভোগ এবং শ্রেয় পথের আদর্শ হল জাগতিক ভোগ ত্যাগ এবং ঈশ্বরীয় স্বভাব আস্বাদন ও অদ্বয়বোধে স্থিতি।

প্রবৃত্তি মার্গ ও নিবৃত্তি মার্গের রহস্য

প্রবৃত্তি মার্গের পরিণাম হল গুণ শক্তি বিকার মৃত্যু ও শোক এবং নিবৃত্তি মার্গের পরিণাম হল সমতা অমৃত ও শান্তি।

অদ্বয়বোধ বা জ্ঞানের মহিমা

যথার্থ জ্ঞান হল অদ্বয় জ্ঞান বা এক জ্ঞান। এ-ই হল ব্রহ্ম-আত্মা-ঈশ্বর ঐক্যজ্ঞান। সর্বভূতে সমদৃষ্টি আপনবোধ বা প্রেমপ্রীতি হল অদ্বয়বোধের বা ব্রহ্ম-আত্মা-ঈশ্বর জ্ঞানের লক্ষণ।

প্রেমের তাৎপর্য

আসল ভালবাসা হল ঈশ্বরের ভালবাসা অর্থাৎ বিশুদ্ধ বোধের সঙ্গে শুদ্ধ বোধের সম্বন্ধই হল প্রেম প্রীতি ও ভালবাসা। কেবল ভালবাসার জন্যই ভালবাসা অর্থাৎ প্রেমের জন্যই শুধু প্রেম। এই হল বিশুদ্ধ ভালবাসা বা প্রেমের বৈশিষ্ট্য। শর্ত ও স্বার্থযুক্ত ভালবাসা হল মনের ধর্ম। এটা বিকারী ও পরিণামী। ভাললাগা হল ইন্দ্রিয়ের ধর্ম। এ সর্বদাই পরিবর্তনশীল।

আত্মসমালোচনা ভিন্ন অন্য যে-কোনও সমালোচনাই দিব্যজ্ঞানের অন্তরায়

এক শ্রেণীর লোক ঈশ্বরের সমালোচনা করে, আর এক শ্রেণীর লোক জগতের সমালোচনা করে। এই দ্বিবিধ ভাবই দিব্যজ্ঞান লাভের অন্তরায়। জীবনের আসল উদ্দেশ্য ভোগসুখ নয়। জীবনের উদ্দেশ্য হল একাত্মবোধের উপলব্ধি, মুক্তি ও শান্তি লাভ। এই আত্মবোধের জাগরণের জন্যই জীবনসাধনা।

যথার্থ ব্যবহারবিজ্ঞানই হল অধ্যাত্মসাধনা। ঈশ্বরজ্ঞানে বা সত্যবোধে অথবা গুরু বা মাতৃবোধে সবকিছু গ্রহণ করা ও ব্যবহার করা হল যথার্থ ব্যবহারবিজ্ঞান।

অনুভূতিই সর্ব পরিচয়ের মাধ্যম

ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে কোন কিছুর সাধনা হয় না। আত্মাই হল ঈশ্বর। চিন্ময় আত্মাই হল সর্বময়। অন্তরের অনুভূতি হল তার পরিচয়। অনুভূতিকে বাদ দিয়ে কোন জিনিসের পরিচয় জানা যায় না। আত্মাতিরিক্ত কোন কিছুই সম্ভব নয়। সর্বজ্ঞানের অধিষ্ঠানই হল আত্মজ্ঞান। আত্মা স্বানুভবসিদ্ধ বলে আত্মবোধের উপরই সর্ববোধকে নির্ভর করতে হয়।

প্রকৃতির অধীন জগৎ, ঈশ্বরের অধীন প্রকৃতি

জন্মমৃত্যু হল জীবনের বিশেষ দুটি ঘটনা। জন্মমৃত্যু হল প্রকৃতির অধীন এবং প্রকৃতি হল ঈশ্বরের অধীন।

জ্ঞানী ও ভক্তের সিদ্ধি অভিন্ন, কিন্তু সাধন ভিন্ন

জ্ঞানযোগী সংসার ত্যাগ করে ও নির্জনে ব্রহ্ম আত্মা ঈশ্বরের সাধন করে জীবন্মুক্ত হয়। ভক্ত যোগী সংসারে থেকে ঈশ্বরের সাধন করে দিব্যজীবন লাভ করে।

ভোগী ও ত্যাগীর লক্ষণ

ভোগী ও ত্যাগী উভয়ের জীবনাদর্শ পৃথক ; সুতরাং জীবনের পরিণামও উভয়ের পৃথক। ভোগীর জীবন অহংকার অভিমান স্বার্থ ও ভোগপরায়ণ; কিন্তু ত্যাগীর জীবন হল নিরহংকার নিরভিমান নিঃস্বার্থ নিষ্কাম ভয়-ভাবনা-ভোগশূন্য মুক্ত জীবন। ধর্মহীন ও নীতিবিবর্জিত ভোগীর জীবন ইহলোকসর্বস্ব। ধার্মিক ও নৈতিক জীবন হল পরকালসর্বস্ব। কিন্তু সর্বত্যাগী মুক্তজীবন হল কালাতীত ও ত্রিগুণাতীত অখণ্ড পূর্ণ সত্যে প্রতিষ্ঠিত জীবন।

অধার্মিক, ধার্মিক ও মুক্তজীবনের পরিচয়

ধর্মহীন ব্যক্তি পশুর সমান। পশুজীবন হল তমোপ্রধান, রজোগুণাত্মক। ধর্মহীন ভোগী জীবনও তমোপ্রধান, রজোগুণাত্মক। ধর্মহীন জীবনে উন্নত নৈতিক শিক্ষা, সত্যচিন্তা, যথার্থ কর্ম, সুস্থ জীবন এবং যথার্থ জ্ঞান লাভ হয় না। ধর্মজীবন হল রজোপ্রধান, সত্ত্বগুণাত্মক এবং অনুভবসিদ্ধ মুক্তজীবন হল সত্ত্বপ্রধান সত্ত্বগুণাত্মক।

সমগ্র বিশ্ব হল ঈশ্বরের ব্যক্ত বা মূর্তরূপ। বিশ্বরূপে ঈশ্বরের পূজা করে যোগী বিশ্বাত্মার দর্শন লাভ করে।

ভাবানুরূপ অনুভূতি ও দৃষ্টিভঙ্গি

এই জগৎ কারও মতে দুঃখময়, কারও মতে স্বপ্নবৎ বা রজ্জু-সর্পবৎ অসত্য ও মিথ্যা এবং কারও মতে সত্য ও ঈশ্বরের লীলাভূমি। আবার কারও মতে জগৎ রূপে ঈশ্বরই স্বয়ং।

ত্যাগী সন্ন্যাসী হল জ্ঞানবাদী ও মায়াবাদী। তাদের মতে জগৎ দুঃখময় ও মিথ্যা এবং ব্রহ্মই সত্য। লীলাবাদী হল ভক্ত ও যোগী। তাদের মতে জগৎ সত্য অর্থাৎ জগৎ রূপে হলেন ঈশ্বরই স্বয়ং। দুঃখবাদী হল মায়াবাদী এবং লীলাবাদী হল জীবনবাদী। লীলাবাদীর দৃষ্টিভঙ্গি সবই ঈশ্বরময়। জগৎ হল রসরাজ আনন্দময় প্রেমময় সচ্চিদানন্দস্বরূপ ঈশ্বরের লীলাভিনয়। প্রেমভক্তির মাধ্যমে ঈশ্বরের প্রিয় ও আপনজন হয়ে ঈশ্বরের কৃপায় ঈশ্বরের এই নিত্যলীলায় ভক্ত তাঁর নিত্যসাথী হতে চায়। ভক্ত হল তাঁর নিত্যখেলার সাথী। জ্ঞানবাদী বা মায়াবাদী ঈশ্বর ও তাঁর জগৎলীলাকে মুখ্য স্থান না দিয়ে গৌণ স্থান দিয়েছে। তাদের মতে লীলা বিকারী ও অস্থায়ী। তারা বিকারী ও অস্থায়ী। তারা বিকারমুক্ত জগদাতীত নির্গুণ নিত্য অমৃতস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়াকেই শ্রেষ্ঠ মনে করে।

ঈশ্বরের অনন্ত মহিমা। তাঁর নিত্যরূপও সত্য এবং লীলারূপও সত্য।

বহির্মুখী মনই হল ভোগীজীবন এবং এর বিপরীত অর্থাৎ অন্তর্মুখী মন হল ত্যাগী জীবনের লক্ষণ।

কামনা বাসনা প্রভৃতি অবিদ্যার বীজ ঈশ্বরের মধ্যেই নিহিত আছে। আত্মচৈতন্যে বা ঈশ্বরচৈতন্যে শান্ত সাম্য স্থিতিই হল সত্যের পূর্ণ স্বরূপ। তার স্ফুরণ হতেই সৃষ্টির বীজ কামনা বাসনা অবিদ্যা প্রভৃতি উদ্বুদ্ধ হয়। সুতরাং সদসতের মূল ঈশ্বরের মধ্যেই নিহিত। ঈশ্বরের অভিব্যক্তি সকল সদসৎ গুণযুক্ত। মানুষের মধ্যেও সদসৎ উভয় গুণই নিহিত আছে। সৎ-এর প্রাধান্যে হয় দেবতা, অসতের প্রাধান্যে হয় পশু এবং সদসৎ মিশ্রণ হল মানুষ। অসৎ হল সৎ-এর পূর্বাবস্থা অথবা পূর্ণ সৎ-এর অভাব অবস্থা। অসৎ হল মিথ্যা ও ভ্রান্তি। সৎ-এর প্রভাবেই ভ্রান্তি চলে যায়। সদসতের অতীত হল পরমাত্মা স্বয়ং। পরমাত্মা হল অখণ্ড ভূমা বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ।

কামনা-বাসনাই হল অশান্তির কারণ। অহংকার হল কামনা-বাসনার কারণ এবং অবিদ্যা ও অজ্ঞান হল অহংকারের কারণ।

অবিবেকী ও বিবেকীর পার্থক্য

বিবেক-বিচারবিহীন মানুষ অবিদ্যার বশে পশুতুল্য। বিবেক জাগ্রত না হলে মনুষ্যত্ব জাগে না। মনুষ্যত্ব না জাগলে অন্তরে দেবত্বের বিকাশ হয় না। দেবত্বের বিকাশ বিনা ঈশ্বরত্ব বা আত্মতত্ত্বের অভিব্যক্তি সম্ভবপর হয় না। গুণগত ভেদই হল পরস্পরের মধ্যে পার্থক্যের কারণ। এক চৈতন্যই গুণভেদে পশু, মানষ, দেবতা ও ঈশ্বররূপে প্রতীয়মান হয়।

'মানুষ' শব্দের তাৎপর্য হল মান+হুঁশ; অর্থাৎ অন্তরে হুঁশ বা চৈতন্যকে 'মেনে মানিয়ে চলে' যে তাকে মানুষ বলে।

সকাম ও নিষ্কামের পার্থক্য

কামনাশূন্য না হলে চিত্তশুদ্ধি হয় না। চিত্তশুদ্ধি হলে অহংকার অভিমান থাকে না। কামনা-বাসনাই হল অবিদ্যা। এই অবিদ্যাই হল অহংকার অভিমান। এ আত্মসমর্পণের অন্তরায় সৃষ্টি করে। কামনাশূন্য চিত্ত হল জীবন্মুক্ত। অর্থাৎ অহংকার অভিমানশূন্য জীবনই হল অমৃতময় দিব্যজীবন। [২৫।৬।৬৮]

সমগ্র জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত

সমগ্র জগৎ ও জীবন এক অখণ্ড ভূমা চৈতন্যসত্তারই বিবর্ত মাত্র। শুদ্ধজ্ঞানের দৃষ্টিতে জীব ও জগতের পৃথক কোন অস্তিত্ব থাকে না; কিন্তু ভেদজ্ঞান বা অজ্ঞানের দৃষ্টিতে বৈচিত্র্যময় জগৎ ও পরিবর্তনশীল জীবনের

গতির পুনঃপুনঃ উত্থান ও পতন, আবির্ভাব ও তিরোভাব প্রভৃতি দৃষ্ট হয়। এদের অন্তর্নিহিত সত্যের পরিচয় পাওয়া যায় না অবিদ্যা ও অজ্ঞানের জন্য। পরিদৃশ্যমান জগৎ এক বৃহৎ শক্তি দ্বারা সৃষ্ট ও পরিচালিত হয়। ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবের কারণও সেই বৃহৎ শক্তি। এই শক্তির বিশেষত্ব হল যে তা গতিশীল ও পরিবর্তনশীল। সৃষ্টি স্থিতি সংহার হল তাঁর খেলা। প্রতি জীবনই তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি মাত্র। প্রতি জীবের অন্তরে এই শক্তি মন বুদ্ধি অহংকার রূপে ক্রিয়া করে। জীবের পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়ের বিষয়াদি সবই সেই শক্তির ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ ভঙ্গিমা। এই শক্তির নামই হল চিৎশক্তি বা মহাচিৎ। জীবের মধ্যে অহংকার রূপে সে-ই কর্তৃত্ব করে।

মহাচিৎ শক্তি তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে লীলা করে

কেন্দ্রে বিশুদ্ধ চিৎরূপে, অন্তরে চিৎ ও অচিৎরূপে এবং বাইরে অচিৎরূপে তাঁর (মহাচিৎ শক্তির) স্ফুরণ হয়—আসলে বাইরে অচিৎ, অন্তরে চিদাচিৎ মিশ্রণ, কেন্দ্রে চিৎ এবং তুরীয়তে পরাচিৎ।

গুণভেদে অহংকার ত্রিবিধ

ত্রিবিধ অহংকার হচ্ছে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। এদের মধ্যে কেবলমাত্র সাত্ত্বিক অহংকারই বৈচিত্র্যময় জীবজগতের কারণ, রহস্য ও তাৎপর্য অবগত হতে পারে।

চিত্ত স্থির ও শান্ত না হলে কোন কিছুর দোষত্রুটি সংশোধন করা সম্ভব হয় না। চলন্ত গাড়ির কোন যান্ত্রিক দোষত্রুটি চলন্ত অবস্থায় সারান যায় না। গাড়ি থামিয়ে তার দোষত্রুটি যথাযথ অবগত হয়ে তার মেরামত করতে হয়। সেইরূপ জীবন সমস্যার সমাধান অস্থির চঞ্চল বিক্ষুব্ধ মন দ্বারা সম্ভব নয়। স্থির শান্ত সমাহিত মন ও বুদ্ধি দ্বারা আবার সমাধান সম্ভব হয়।

গুণ ও শক্তি অভিন্ন

শক্তির যথার্থ স্বরূপ হল অখণ্ড ও অনন্ত এবং খণ্ডতা হল তার গুণের লক্ষণ। গুণের বিস্তার ও সম্প্রসারণ হলেই শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। শক্তির ধর্ম সংকোচন ও সম্প্রসারণ। সংকুচিত শক্তি হল গুণ এবং সম্প্রসারিত গুণই হল শক্তির লক্ষণ।

ব্রহ্মাত্মশক্তির মহিমা

মহাচিৎ শক্তিই হল আত্মশক্তি, ব্রহ্মশক্তি বা ঈশ্বরশক্তি। শক্তি ও শক্তিমান অভিন্ন, সুতরাং প্রতি ব্যষ্টি জীবনই ঈশ্বরের অভিব্যক্তি।

ঈশ্বরীয় বিজ্ঞানে অবিদ্যার ভূমিকা

অবিদ্যারূপ অজ্ঞানের দ্বারা সকলকে আবেশিত করে এক ঈশ্বরীয় শক্তি সকলের মধ্যে নিরন্তর কাজ করছে। প্রত্যেকের দেহেন্দ্রিয় প্রাণ মন বুদ্ধি হল তাঁর যন্ত্র বা মাধ্যম। আবার এই সব রূপে স্বয়ং তিনি নিজেই। সকলের অন্তরে তিনিই ইচ্ছা রূপে, কামনা-বাসনা রূপে, কর্তৃত্বাভিমান ও অহংকার রূপে, মন বুদ্ধি চিত্ত রূপে, প্রাণ ও চৈতন্য রূপে নানা বেশে লীলা করেন। দ্বৈত ও অদ্বৈত উভয় ভাবেরই কারণ তিনি। তিনিই অবিদ্যাশক্তি, তিনিই বিদ্যাশক্তি। অবিদ্যার প্রভাবে তিনিই স্বতন্ত্র ইচ্ছা ও কামনা-বাসনার রূপ নিয়ে জগৎভাবে অর্থাৎ দ্বৈতভাবে লীলা করেন। আবার

বিদ্যাশক্তি রূপে দিব্যভাবের বিকাশ দ্বারা অদ্বৈতবোধে অর্থাৎ বিশুদ্ধ আত্মবোধে প্রকাশ করেন নিজেকে। স্বতন্ত্র ইচ্ছা বা কামনা-বাসনার লেশমাত্র না থাকলেই ঈশ্বরীয় সত্তার অভিব্যক্তি হয় জীবনে।

অবিদ্যাশক্তির বিশেষত্বই হল ভ্রান্তিমূলক বৈচিত্র্যসৃষ্টি, পার্থক্য ও ভেদজ্ঞান। বিদ্যাশক্তির বিশেষত্ব হল ভ্রান্তিমূলক অবিদ্যার প্রভাব নাশ করে, চিত্তের মল অপসারিত করে এবং সর্ববিধ দ্বৈতভাব মুক্ত করে বিশুদ্ধ বোধের প্রকাশ করা; অর্থাৎ অবিদ্যামূলক কামনা-বাসনা অহংকার অভিমানের শোধন করে বিদ্যাশক্তি আত্মজ্ঞান লাভে সাহায্য করে।

বহির্দৃষ্টিতে প্রতিটি প্রকাশের মধ্যে পার্থক্য দেখা গেলেও অন্তর্দৃষ্টিতে সবই এক আত্মময় বা চৈতন্যময় সত্তা। আত্মজ্ঞান লাভ হলে জগৎ ভ্রান্তি আর থাকে না। তখন সবই ব্রহ্মময় আত্মময় হয়ে যায়।

ঈশ্বরীয় লীলায় চৈতন্যের ভূমিকা

দেহেন্দ্রিয় প্রাণ মন বুদ্ধি এক আত্মচৈতন্যেরই ভিন্ন ভিন্ন স্ফুরণ মাত্র। চৈতন্যই এদের মূল সত্তা। চৈতন্য অতিরিক্ত এদের কোন অস্তিত্ব নেই। এক অখণ্ড চৈতন্যসাগরে ভিন্ন ভিন্ন অভিব্যক্তি হল বৈচিত্র্যময় জীবজগৎ। এর প্রতিটি প্রকাশেরই সত্তা হল চৈতন্য। চৈতন্য অতিরিক্ত জগতের কোন অস্তিত্ব নেই। সবই চৈতন্যময়। চৈতন্যই সবকিছুর মূল উপাদান। সুতরাং চৈতন্য অতিরিক্ত জগৎ মিথ্যা। চৈতন্যস্বরূপই হল ব্রহ্ম আত্মা। এই ব্রহ্ম আত্মাই হল সর্বময়। ব্রহ্মসত্তায় বা আত্মসত্তায় এক ব্রহ্ম বা আত্মাই স্বয়ং বিদ্যমান। তদতিরিক্ত কোন জগৎ, বস্তু বা পদার্থ নেই।

আত্মার আমি চৈতন্য, অহংকারের আমি তার আভাস

চৈতন্যশক্তি এবং চৈতন্য অভেদ। ব্রহ্মচৈতন্যের ইচ্ছাই হল ব্রহ্মশক্তি বা চিৎশক্তি। চিৎশক্তির বিলাসই হল জগৎসৃষ্টি। চৈতন্যই হল প্রত্যেকের আত্মা। আমিবোধে এই আত্মা নিজেকে প্রকাশ করে। অহংকার হল এই আমির সসীম ভাব। এই আত্মা বা আমির মধ্যে আমি অতিরিক্ত কিছু নেই। কিন্তু অহংকারের প্রভাবে অজ্ঞানবশত ভেদজ্ঞানের উদয় হয়, তখন কামনা-বাসনা দ্বারা বৈচিত্র্য কল্পনা করে জগৎ সৃষ্টি হয়। ব্যষ্টি অহংকারের কাছে ব্যষ্টি জগৎ এবং সমষ্টি অহংকারের কাছে সমষ্টি জগৎ। উভয়ই কল্পনাপ্রসূত। এই কল্পনাই হল ভ্রান্তিজ্ঞান বা মিথ্যা জ্ঞান। মরীচিকার জলের মত বা স্বপ্নদৃষ্ট নগরের মত জগৎদর্শন হল ভ্রান্তিমূলক, অলীক বা মিথ্যা। স্বপ্নদর্শন এবং জাগ্রত দর্শন উভয়ই কল্পনামূলক সুতরাং ভ্রান্তি ও মিথ্যা। দ্বৈতবোধই হল কল্পনাপ্রসূত। অহংকারেই দ্বৈত প্রতীতি হয়। নিরহংকার নিরভিমান হলে অদ্বৈতবোধ হয়। তখন দ্বৈত প্রতীতি আর থাকে না।

অবিদ্যা অজ্ঞান-জাত কামনা কর্তৃত্ব অহংকার

কামনাযুক্ত মনই হল অহংকার। অহংকারই হল অজ্ঞান অবিদ্যা। অবিদ্যাই হল সংসার। অর্থাৎ কামনারূপ অহংকারই হল সংসার। চিত্তই হল সংসার। কারণ অহংকার অবিদ্যা কামনা ও চিত্ত এক অর্থবোধক। কামনা, কল্পনা ও চিন্তা এক অর্থবোধক। কামনাশূন্য মানে চিত্তশূন্য বা অহংকার-অভিমানশূন্য। এই হল আত্মার স্বরূপ। আত্মা বিশুদ্ধ নির্মল বলে আত্মার মধ্যে এসব কিছু নেই। দেহবুদ্ধি হল অহংকার, অজ্ঞান ও সংসার। এ-ই হল বন্ধন। আমি দেহ নই, চৈতন্যস্বরূপ, এই বোধই হল আত্মবোধ বা মুক্তির লক্ষণ।

'আমার বোধ'-যুক্ত আমিই হল অহংকার বা বন্ধন। 'আমার আমি'-শূন্য বোধই হল মুক্তি বা আত্মজ্ঞানের লক্ষণ।

আত্মার অন্তরদর্শন ও বাহিরদর্শনের বৈশিষ্ট্য

আত্মার বহির্মুখী দৃষ্টিই হল জগৎদর্শন। আবার অন্তর্মুখী দৃষ্টি হল আত্মদর্শন। অহংকার আত্মারই স্ফুরণ। অন্তরদর্শনে এই অহংকার বিলীন হয়ে যায়।

মৃত্যু ও অমৃতত্বের তাৎপর্য

আত্মবিস্মৃতিই হল যথার্থ মৃত্যু এবং আত্মস্মৃতির জাগরণ হল মৃত্যুর মৃত্যু, অর্থাৎ অমৃতত্বে প্রতিষ্ঠা।

ব্রহ্মাত্মৈক্য দৃষ্টির তাৎপর্য

আত্মজ্ঞানের ব্যবহার হল সমদৃষ্টি সমবোধ একাত্মবোধ আপনবোধ বা অখণ্ড নিজবোধ। তখন নিজের মধ্যে সবকে এবং সকলের মধ্যে নিজেকে সমবোধে দেখা যায়। একেই ব্রহ্মাত্মৈক্য দৃষ্টি বলে।

চিত্তের বহির্মুখী দৃষ্টির পরিণাম

অহংকার বশত চিত্তের বহির্মুখী দৃষ্টির ফলে চৈতন্যের জড়ভাব অনুভূত হয়। জগৎদর্শনই হল জড়দর্শন। চৈতন্যস্বরূপে জড়ত্ব বলে কোন পদার্থ নেই। সুতরাং জগৎদর্শন বা জড়দর্শন হল মিথ্যা ও ভ্রান্তিমূলক। এ রজ্জু-সর্পবৎ মিথ্যা জ্ঞান।

বহিঃপ্রকৃতি অপেক্ষা অন্তরপ্রকৃতির গুরুত্ব অধিক

অহংকারের প্রাধান্যে সমগ্র পৃথিবী জয় করলেও মুক্তি বা শান্তিলাভ হয় না। বিশ্বজয় অপেক্ষাও আপন প্রকৃতিকে জয় করে আত্মজ্ঞান লাভ করা শ্রেয়।

পরমাত্মার আমির সঙ্গে তাদাত্ম্যলাভের উপায়

তীব্র ইচ্ছা, সংকল্প ও পুরুষকারের মাধ্যমে ব্যষ্টি অহংকারকে প্রথম সমষ্টি অহংকারে পরিণত করতে হয়। তারপরে পূর্ণ অনাসক্তি ও অসঙ্গতার অনুশীলন দ্বারা সমষ্টি অহংকারের পরিশোধন করে পরমাত্মাতে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে হয়; অর্থাৎ পরমাত্মার আমির সঙ্গে তাদাত্ম্য লাভ করতে হয়। এই 'পরমাত্মার আমি'—আমিও নয়, তুমিও নয় কিন্তু সর্ব আমিময়।

পরমাত্মদেবের নিত্যস্বরূপ ও লীলাস্বরূপের পরিচয়

'পরমাত্মার আমি' হলেন সর্বোত্তম নাট্যকার, সর্বশ্রেষ্ঠ প্রযোজক, সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা, পরিবেশক, প্রদর্শক, দ্রষ্টা, পরিচালক ও বিজ্ঞাতা। সমুদ্রের মধ্যে এক জলই যেমন তরঙ্গ, লহরী, আবর্ত, প্রবাহ, বুদ্বুদ, ফেনা প্রভৃতি রূপে নিজেকে প্রকাশ করে সেইরূপ পরমাত্মা স্বয়ং অর্থাৎ 'পুরুষোত্তমের আমি' নানা বেশে, নানা সাজে ভিন্ন ভিন্ন জীবনের ভূমিকায় নিজের মধ্যে নিজেই প্রকাশ করে স্বমহিমা নিজেই আস্বাদন করেন। তাঁর মধ্যে তিনি ছাড়া আর দ্বিতীয় কেউ নেই। প্রতিটি জীবনই হল তাঁর লীলামাধ্যম এবং ক্ষুদ্র বৃহৎ সর্বজীবনের মধ্য দিয়ে তিনিই স্বয়ং নানাভাবে অভিনয় করছেন। অনন্ত ভাবে নিজেকে প্রকাশ করেও নিজের স্বরূপচ্যুত তিনি কখনও হন না। কঙ্কন, বাজু প্রভৃতি স্বর্ণালংকারের মধ্যে আলংকারিক ভাব যুক্ত হয়েও এক সোনা যেমন আপন স্বরূপ হতে বিচ্যুত কখনওই হয় না, সেইরূপ বৈচিত্র্যরূপে অভিব্যক্ত হয়েও চিৎস্বরূপ পরমাত্মা বা পরমব্রহ্ম কখনওই আপন স্বরূপ

হতে বিচ্যুত হন না। বাহ্যিক রূপান্তর যা প্রতীত হয় তা কল্পনামাত্র। এই কল্পনাকে ভ্রান্তিজ্ঞান বা ভেদজ্ঞান বলা হয় শুদ্ধজ্ঞানের দৃষ্টিতে এই ভ্রান্তি থাকে না।

পরমাত্ম-বক্ষে তাঁর স্বভাব-মনে কারণ ও কার্যরূপ

চৈতন্যস্বরূপ হল আত্মা। মন হল তার স্পন্দনময় স্বভাবপ্রকৃতি। আবার মনের বিস্তার হল জগৎ। মনের এক অংশে হল কার্য এবং অপর অংশে হল কারণ। কার্য অংশ হল বাইরে এবং কারণ অংশ হল অন্তরে।

জীবনের মাধ্যমে চৈতন্যের বহুমুখী লীলাভিনয় পরিণামে স্ববোধস্বরূপে স্থিতিলাভ করে

প্রতি জীবনই হল চৈতন্যের বিশেষ অভিব্যক্তি। নানাবিধ অবস্থার মধ্য দিয়ে তাঁর এই অভিব্যক্তি আপনার অন্তর্নিহিত পূর্ণ স্বরূপকে ব্যক্ত করার জন্য চেষ্টা করে। তার এই চেষ্টার ফলে কখনও অন্তরের সঙ্গে বাইরের দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়, অপ্রীতিকর ঘটনা ও পরিবেশের সম্মুখীন হতে হয় এবং প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে জীবন কাটাতে হয়। আবার কখনও কখনও অনুকূল অবস্থা, প্রীতিকর ঘটনা ও পরিবেশের মধ্য দিয়েও জীবন চলে। উভয় ভাবের মধ্যে সমতা বা সমবোধ সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত অন্তঃপ্রকৃতি স্ববিরুদ্ধ ভাব অবস্থা পরিবেশ ও ঘটনা সৃষ্টি করে। কখনও বা কর্তা ভোক্তা জ্ঞাতা সাজে আবার কখনও সে শরণাগতির ভাব নিয়ে বৃহত্তর সত্তা ও শক্তির উপর নির্ভর করে চলে। মুক্তির সাধককে তীব্র পুরুষকার যোগে বিচার, ত্যাগ ও বৈরাগ্যের মাধ্যমে সর্বরকম বাধাকে অতিক্রম করে এগিয়ে যেতে হয় সাধনার পথে। ভক্তকে আর্তি ও শরণাগতি নিয়ে সবকিছুকে ঈশ্বরের দান বলে গ্রহণ করতে হয়। সর্বরকম দুঃখকষ্ট হল আত্মপরীক্ষা। সাধকের ভক্তি, বিশ্বাস ও নিষ্ঠাকে পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত করার জন্য দুঃখকষ্ট বিপদ আপদ পুনঃপুনঃ তার কাছে আসে। এ সবের মাধ্যমে সাধকের নূতন ভাবে অন্তরের শক্তি ও চৈতন্যের স্ফুরণ হয়। তা-ই আত্মবোধের সহায়ক হয় এবং পরিণামে তার পূর্ণ সমর্পণের সামর্থ্য বা যোগ্যতা হয়। সমর্পণ পূর্ণ হলেই ঈশ্বর আত্মার সঙ্গে তার মিলন হয়, অর্থাৎ বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপের সঙ্গে তার তাদাত্ম্য লাভ হয়।

সর্বরকম জীবন সমস্যার সমাধানের জন্য অন্তরে বাইরে সর্বদা সবকিছুকে এক অখণ্ড চৈতন্যের প্রকাশরূপে গ্রহণ করতে হয় ও মেনে চলতে হয়। পরিদৃশ্যমান জগৎ ও অন্তরের বোধ সবই এক চৈতন্যসত্তার ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ মাত্র। এদের অন্তর্নিহিত সত্যই হল চৈতন্য। সবই চৈতন্যময়। সত্তার বক্ষে চৈতন্য অতিরিক্ত কিছু সম্ভব নয়। এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয় ও মানা দ্বারা সর্বরকম সমস্যার সমাধান সহজেই হয় এবং একাত্মবোধের অনুভূতি অনায়াসসাধ্য হয়। ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশের দিকে প্রাধান্য দিলে হেয় ও উপাদেয় জ্ঞানে ব্যবহার দ্বারা সমস্যা ও বিকার বেড়ে যায়, কোন কিছুর সমাধান হয় না। ভেদদৃষ্টিই হল সমস্যার কারণ। ভেদদৃষ্টি মিথ্যা হয়েও সত্যরূপে প্রতিভাত হয়। চৈতন্যের সমদৃষ্টিতে এই ভেদজ্ঞান থাকে না সুতরাং ভেদজ্ঞানকে মিথ্যা বলে সর্বদা পরিহার করে চলতে হয়।

অহংকারের ব্যবহারের ফল

অহংকার অভিমানের ব্যবহারের লক্ষণ হল হেয় ও উপাদেয় রূপ ভেদজ্ঞান। মিথ্যার ব্যবহার দ্বারা মিথ্যা ফলই সৃষ্টি হয় এবং সত্যের ব্যবহার দ্বারা সত্যের ফলই পাওয়া যায়। ভ্রান্তিময় অহংকার অভিমানের ব্যবহারে চঞ্চলতা ও অস্থিরতাই অধিক থাকে; তার ফলে দুঃখকষ্ট বাড়ে।

চতুর্বিধ আহারের বৈশিষ্ট্য

আহার স্থূল সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতর ও সূক্ষতম ভেদে চারপ্রকার। (১) স্থূল আহার সর্বতোভাবে তামসিক, (২) সূক্ষ্ম আহার রাজসিক, (৩) সূক্ষতর আহার সাত্ত্বিক এবং (৪) সূক্ষ্মতম আহার হল শুদ্ধসাত্ত্বিক। স্থূল আহার হল পাঞ্চভৌতিক ও তমোগুণাত্মক, সূক্ষ্ম আহার হল আধিদৈবিক ও রাজসিক, সূক্ষ্মতর আহার হল আধ্যাত্মিক ও সাত্ত্বিক এবং সূক্ষ্মতম আহার হল স্বানুভূতি ও শুদ্ধসাত্ত্বিক।

ব্রহ্মচর্যের তাৎপর্য

দেহ মন ও বুদ্ধির স্থিতি পূর্ণ ব্রহ্মচর্যের উপর নির্ভর করে। বীর্য ধারণই হল ব্রহ্মচর্য। এর উৎকর্ষ লাভ হওয়াই হল পরাসিদ্ধি লাভ। সত্যানুভূতি হল জ্ঞাননেত্র। আত্মজ্ঞান লাভ হলেই তৃতীয় নয়ন বা জ্ঞাননয়ন খুলে যায়। জ্ঞাননেত্র ও আত্মজ্ঞান সমার্থবোধক। সত্ত্বগুণই হল বুদ্ধি। শুদ্ধসত্ত্ব হল বোধ।

সংকল্পের বৈশিষ্ট্য

সংকল্পই হল সৃষ্টির কারণ। সংকল্প অনুরূপ মন সৃষ্টি করে ও তার ফল আস্বাদন করে। সেইজন্য বলা হয় কামনা অনুরূপ কর্ম ও ভোগ হয় জীবনে।

বিষয়ানন্দ ও ভূমানন্দের পার্থক্য

বিষয় ভোগে হয় বিষয়ানন্দ এবং অমৃতত্ব লাভে হয় ভূমানন্দ। অমৃতত্বে প্রতিষ্ঠাই হল মুক্তি। মুক্তি লাভের জন্য অনাসক্তি, ত্যাগ ও অসঙ্গতাই হল সাধনা। সর্বসমর্পণ ও আপনবোধে সব গ্রহণ উভয়ই সমার্থবোধক। উভয়েরই পরিণাম সমান।

সত্য আত্মব্রহ্ম নির্বিকার ও অদ্বয়

আত্মার স্বরূপ কোন অবস্থাতেই বিচ্যুত হয় না। বৈচিত্র্যরূপে নিজেকে প্রকাশ করেও স্বরূপত সে একভাবেই থাকে। সে জন্য আত্মাকেই সত্য এবং বৈচিত্র্যকে মিথ্যা বলা হয়। আত্মা বা ব্রহ্ম হল এক বস্তু। সমগ্র জগৎ হল আত্মময় বা ব্রহ্মময়। এক আত্মা বা ব্রহ্ম সর্বরূপে নিজেই প্রকাশিত হচ্ছে। সেই জন্যই বলা হয় ব্রহ্মই সত্য এবং বৈচিত্র্য মিথ্যা। সমগ্র বৈচিত্র্য এই এক চৈতন্যেরই ভিন্ন ভিন্ন স্ফুরণ মাত্র। এই চৈতন্য হল অনুভূতিময়। যা অনুভূতিময় তা-ই চৈতন্যময়। বৈচিত্র্যময় জগৎরূপে যা অনুভূত হয় তা চৈতন্যময় বা আত্মময়। চৈতন্য অতিরিক্ত কোন অনুভূতি কারও পক্ষে কখনও সম্ভব নয়। আপন স্বরূপই হল আত্মস্বরূপ। এই হল চৈতন্যময় ঈশ্বর বা ব্রহ্ম। এই জ্ঞানে বৈচিত্র্য বা দ্বৈতজ্ঞান থাকে না, সুতরাং জগৎভাবও থাকে না। এ-ই চিৎতত্ত্ব অর্থাৎ ব্রহ্ম বা আত্মতত্ত্বের তাৎপর্য।

কামনার বৈশিষ্ট্য

কল্পনা বা চিন্তাই হল কামনা। এই কামনাই স্বরূপের বোধকে ভুলিয়ে দেয়। কামনাশূন্য হলেই আবার স্বরূপের বোধ জেগে ওঠে। স্বরূপবোধেই হয় যথার্থ শান্তি ও আনন্দ। বৈচিত্র্যবোধে দুঃখকষ্ট। কল্পনাই হল বৈচিত্র্যের কারণ সুতরাং কল্পনাই হল দুঃখের কারণ। ভোগ কর্মসাপেক্ষ এবং কর্ম কষ্টসাপেক্ষ। মুক্তি ত্যাগসাপেক্ষ। কিন্তু ত্যাগ কষ্টসাপেক্ষ নয়। ভোগে হয় বন্ধন, ত্যাগে হয় মুক্তি। আত্মা স্বয়ং ভোগ ও মুক্তির অতীত।

পরমাত্মলীলায় তাঁর অভিনব মহিমার পূর্বাপর সম্বন্ধ

আত্মজ্ঞান বিনা পূর্ণ আনন্দ ও শান্তি মেলে না। পুরুষকারের মাধ্যমে আত্মসাধনা বিনা আত্মজ্ঞানও লাভ হয় না। গুরুকৃপা ও আত্মকৃপা বিনা পুরুষকার বা আত্মসাধনাও সম্ভব হয় না। অন্তরাত্মার ইচ্ছা ছাড়া গুরুকৃপা ও আত্মকৃপা লাভ হয় না। সৎসঙ্গ ছাড়া অন্তরাত্মার সাধন ইচ্ছা জাগে না। শুভকর্ম ও সুকৃতির সংস্কার না থাকলে সৎসঙ্গ লাভ করা সম্ভব হয় না। সংসারের নানাবিধ ঘাত-প্রতিঘাতজনিত অভিজ্ঞতা সঞ্চিত না থাকলে শুভকর্ম বা সৎকর্ম ও ধর্মচেষ্টাও হয় না। জন্ম-মৃত্যু জরা-ব্যাধি রোগ-শোক অভাব-অভিযোগ দরিদ্রতা দ্বারা প্রপীড়িত না হলে জীবন সাধনার অভিজ্ঞতা পুষ্ট হয় না। সুতরাং এক ব্রহ্ম বা আত্মার নিজবক্ষে ইচ্ছারূপ স্ফুরণের ক্রমধারাই জীবনের উৎপত্তি বিকাশ ও পরিণতি রূপে অভিব্যক্ত হয়। সর্ব অবস্থাতে আত্মা স্বরূপত সমানই থাকে।

চৈতন্যলীলায় সত্যসাধনার গুরুত্ব

চৈতন্যের গড়া বিশ্বে সর্ব বৈচিত্র্যরূপে চৈতন্যই আছে। জড়তা ও নানাত্ব বহুত্ব হল ভ্রান্তি। চৈতন্যের বক্ষে ভ্রান্তিবিলাসে বা কল্পনাবিলাসে চিন্ময় জীবের সংসারভোগ, আবার চৈতন্যবিলাসে তার স্বরূপে স্থিতি। অন্তরে বাইরে সব কিছুকে চৈতন্যবোধে গ্রহণ করা এবং 'মেনে মানিয়ে চলার' অভ্যাসকেই সত্যসাধনা বলে।

ব্রহ্মবিদ্যা, আত্মবিদ্যার পরিচয়

আত্মশক্তি ও আত্মার ঐশ্বর্যসকল আত্মচৈতন্য অতিরিক্ত কিছু নয়। আত্মবোধে এর ব্যবহারকে ব্রহ্মবিদ্যা বা আত্মবিদ্যা বলা হয়। আত্মবোধের ব্যবহারই হল স্বভাবযোগ। আত্মসমর্পণ ও স্বভাবযোগ উভয়ের তাৎপর্য সমান। এই যোগের মাধ্যমেই জীবাত্মার ছোট আমি তার পূর্ণ আমি অর্থাৎ পরমাত্মার আমির সঙ্গে মিলিত হয়ে যায়। তখন সে পরমাত্মার স্বরূপ ও স্বভাবধর্ম প্রাপ্ত হয়।

কামনার উৎস

আত্মার বিষয়প্রবৃত্তি হতে ইচ্ছার স্ফুরণ হয়। এই ইচ্ছাই হল কামনা। এই কামনা হতে প্রথম শুদ্ধ অহংকারের উৎপত্তি হয়, তা হতে বুদ্ধি, বুদ্ধি হতে মন, মন হতে চিত্ত—এইভাবে ক্রমপর্যায়ে রজঃ ও তমোগুণাত্মক কর্তৃত্ব ও অহংকারের প্রকাশ হয়। এই কর্তৃত্ব অহংকারই হল আত্মার জীবভাব। এই জীবভাবের মাধ্যমে জীবাত্মা বৈচিত্র্য আস্বাদন করে সংসার চক্রে অনন্তকাল বন্ধনদশা ভোগ করে। এ-ই হল আত্মার ভ্রান্তিবিলাস। আবার চৈতন্যবিলাসে আত্মা চিত্তবৃত্তিরূপ সংকল্প কামনা ও চিত্তকে বিচার ও বিবেক-বৈরাগ্যের দ্বারা শোধন করে অবিদ্যারূপ অহংকার ও অভিমানকে নির্মূল করে বিশুদ্ধ শান্ত অখণ্ড চৈতন্যস্বরূপে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই হল আত্মার চৈতন্যবিলাস।

বন্ধন ও মুক্তির রহস্য

জীবন্মুক্তির মানে অহংকার মুক্ত হওয়া। অহংকারই বন্ধন এবং নিরহংকার মুক্তি। [২৬।৬।৬৮]

অদ্বয় ব্রহ্মের মানসদৃষ্টি ও আত্মদৃষ্টি

মন দিয়ে বৈচিত্র্য দর্শন হয়। মনের উল্টো ব্যবহার হলেই হয় নম। তখন বৈচিত্র্যের মূলে চৈতন্যের দর্শন হয়। মনের দর্শনই হল বৈচিত্র্য। এই বৈচিত্র্যই হল ভ্রান্তি। মনের সংকল্পই হল বৈচিত্র্য। সুতরাং মনোময় দর্শনই হল

ভ্রান্তিমূলক বৈচিত্র্য দর্শন। কিন্তু বোধস্বরূপের দর্শন হল অখণ্ড পূর্ণ সত্যদর্শন। দ্রষ্টারূপে মন বহু দেখে ও বহু আস্বাদন করে। আবার দ্রষ্টারূপে বোধ স্বয়ং অখণ্ড পূর্ণ আত্মাস্বরূপ। প্রকৃতপক্ষে আত্মা কর্তাও নয়, ভোক্তাও নয়; জ্ঞাতাও নয়, দ্রষ্টাও নয়। সে স্বয়ংপ্রকাশ অদ্বয়স্বরূপ।

সমাধির তাৎপর্য

মন সংকল্পশূন্য হলেই অ-মন হয়। তখন মনের আর পৃথক দর্শন হয় না। এ-ই হল মনের সমাধি অবস্থা। সমাধি অবস্থায় সবই বোধময়। সমাধিলব্ধ অনুভূতি দ্বারা ভ্রান্তিজ্ঞানের প্রভাব কেটে যায়। তখন মন দৃঢ়নিশ্চয় হয় যে এক অখণ্ড মহাপ্রাণচৈতন্য ছাড়া চৈতন্যের বক্ষে কোথাও আর অন্য কিছুই নেই।

সর্বপ্রকাশক সত্তার বক্ষে তাঁর অনন্ত প্রকাশভঙ্গিমার লীলামাধুর্য

বস্তু হল প্রাণচৈতন্যের এক বিশেষ প্রকাশরূপ। তার অন্তরে আছে বহু সূক্ষ্মভাব ও স্পন্দন। তারও কেন্দ্রে আছে প্রশান্ত বোধময় সত্তা। ছোট বড় সমস্ত বৈচিত্র্যময় রূপ হল এক অখণ্ড রূপের খণ্ড প্রকাশ অংশ, প্রতিরূপ বা প্রকারভেদ। সর্ব নাম বা শব্দ এক অখণ্ড নাদব্রহ্ম প্রণবের খণ্ড প্রকাশ, অংশ, প্রতিধ্বনি বা প্রকারভেদ মাত্র। বৈচিত্র্যময় সমগ্র ভাব হল এক অখণ্ড মহাভাবময় স্বভাবের ভিন্ন ভিন্ন স্ফুরণমাত্র। অর্থাৎ সমগ্র রূপ নাম ভাব বোধ এক অখণ্ড চৈতন্যময় সত্তার বক্ষে তার স্পন্দনমালা। যেমন তরঙ্গ লহরী আবর্ত বুদ্বুদ্ ফেনা প্রভৃতি অনন্ত জলরাশি সমুদ্রের বক্ষে তার ভিন্ন ভিন্ন স্পন্দনমাত্র। ক্ষুদ্র বৃহৎ সমস্ত জীবনই এক অখণ্ড জীবনের খণ্ড প্রকাশ, অংশ ও প্রকারভেদ মাত্র। ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল প্রাণ এক অখণ্ড মহাপ্রাণসত্তার খণ্ড প্রকাশ, অংশ, সন্তান বা প্রকারভেদ মাত্র। এইরূপ সমগ্র মন এক অখণ্ড মনের ভিন্ন ভিন্ন স্ফুরণমাত্র। সমগ্র সংকল্প ইচ্ছা এক অখণ্ড মনের সংকল্প ও ইচ্ছার বিস্তার বা প্রকারভেদ মাত্র। এক অনাদি অনন্ত অখণ্ড চৈতন্যসত্তা আপনবক্ষে আপনি নিজেকে বহুরূপে নামে ভাবে ও বোধে অভিব্যক্ত করে স্বমহিমা স্বয়ং প্রকাশ করেন। এসব করেও তিনি স্বস্বরূপে নিষ্ক্রিয়ভাবে বিদ্যমান।

চিদণুর অনন্ত মহিমা

চৈতন্যের অণুই হল সর্বপ্রকাশের কেন্দ্র। সেই অণুর মধ্যেই অনন্ত বিশ্ব প্রতিভাত হয়। চৈতন্য বক্ষেই চৈতন্যের অণু এবং সেই অণুর বক্ষে অনন্ত অভিব্যক্তি। সুতরাং চৈতন্যের বাইরে কিছুই নেই। চৈতন্যের অন্তরে চৈতন্যেরই প্রকাশ ওঠে ভাসে ডোবে।

আত্মসংকল্পের অভিব্যক্তির ক্রম

আত্মচৈতন্য স্বকীয় মানসপ্রবাহে প্রথমে সংকল্পময় হয়, তারপর সংকল্পের স্পন্দন অনুসারে তেজোময় বিগ্রহরূপ ধারণ করে। এই তেজোময় বিগ্রহই সংকল্পের আদিরূপ। একেই হিরণ্ময় ব্রহ্ম বলে। এ-ই ব্রহ্ম বা আত্মার মানসরূপ। এ শুভ্রজ্যোতির্ময় অর্থাৎ চিন্ময় মানসদেহ। তার স্পন্দনের মাত্রা বিস্তৃত হতে হতে বুদ্ধি অহংকার প্রভৃতি রূপ ধারণ করে ভিন্ন ভিন্ন স্তরে ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করে ক্রমশ বিভক্ত হতে থাকে এবং তা-ই পর্যায়ক্রমে পঞ্চমহাভূত, পঞ্চ অন্তরিন্দ্রিয়, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ অন্তঃপ্রাণ, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চস্থূলভূতরূপে অভিব্যক্ত হয়।

সমগ্র জ্ঞেয় বস্তু জ্ঞানস্বরূপ চিদাত্মার নিজ বক্ষে নিজের স্পন্দনসমষ্টি মাত্র। সুতরাং জ্ঞাতা-জ্ঞেয়-জ্ঞান রূপে, দ্রষ্টা-দৃশ্য ও দর্শন রূপে এক চৈতন্যময় আত্মা বা ব্রহ্মই স্বয়ং বিদ্যমান। এই চৈতন্যময় ব্রহ্ম বা আত্মাকেই তত্ত্বজ্ঞ পুরুষগণ শিব রাম বিষ্ণু হরি প্রভৃতি নামে অভিহিত করেছেন।

অনুভূতির ক্রমিক মান

বাইরে যা স্থূলরূপে অনুভূত হয় তা-ই হল চৈতন্যের বিশেষ প্রকাশ। একে অধিভূত বলে। যা অন্তরে মনেতে অনুভূত হয় তা চৈতন্যের সূক্ষ্ম প্রকাশ। একে অধিদৈব বলে। যা হৃদয়ে অনুভূত হয় তা চৈতন্যের সূক্ষ্মতর রূপ। একে অধ্যাত্ম বলে। এই তিন স্তরের ঊর্ধ্বে যা নিত্য সমবোধে, একবোধে বা আপনবোধে স্বতঃস্ফূর্ত অনুভূত হয় তা-ই হল সম্বিৎ বা চৈতন্যের যথার্থ রূপ। একে অধিযজ্ঞ পুরুষ বা আত্মা বলা হয়।

অনুভূতির গভীরতার বৈশিষ্ট্য

অন্তরমনের বহিঃপ্রকাশকেই সৃষ্টি বলে। আবার বহির্মনের অন্তরে প্রবেশকে পুষ্টি, তুষ্টি ও অনুভূতি বলে। অন্তরমন ও বহির্মনের মিলন হলে হয় অনুভূতি। হৃদয়ে অন্তরমন প্রবেশ করলে হয় অধ্যাত্ম অনুভূতি অর্থাৎ আত্মবোধের উন্মেষ বা জাগরণ। হৃদয়ে অন্তরমনের স্থিতি হলে মন সংকল্পশূন্য হয়ে অ-মন হয়। তার ফলে মন বিশ্বাত্মা বা বিজ্ঞানাত্মার পরিচয় লাভ করে। বিজ্ঞানাত্মার ঊর্ধ্বে হল প্রজ্ঞানাত্মা। প্রজ্ঞানাত্মা বিশ্বাতীত নিত্যনিরঞ্জন অখণ্ড শান্ত শুদ্ধ বোধস্বরূপ। এ-ই হল শিবময় শান্ত ব্রহ্ম।

শিক্ষা ও দীক্ষার তাৎপর্য

মন যখন নিজ প্রয়োজনে বৃহৎ ও মহতের কাছ হতে কিছু গ্রহণ করে তখনই হয় তার শিক্ষা। আবার যখন বৃহৎ বা মহৎকে সে নিজে কিছু অর্পণ করে বা দেয়, তখনই হয় দীক্ষা শুরু।

ঈশ্বরকে অবলম্বন করে ভিন্ন ভিন্ন সাধনার পরিচয়

ঈশ্বরের রূপে মনোনিবেশ করা বা মহতের সেবাই হল অর্চনা। নামে মন দেওয়া মানে জপ করা। ভাবে মন দেওয়া মানে ধ্যান করা। এবং বোধে মন দেওয়া মানে বিচার করা।

ঈশ্বরের নাম ও জাগতিক শব্দের মধ্যে পার্থক্য

ঈশ্বরীয় নামই হল মন্ত্র। এই নাম শুদ্ধ ভাব ও বোধযুক্ত। জাগতিক শব্দ প্রাকৃত ধর্মযুক্ত বলে তার শুদ্ধ ভাব ও বোধ আবৃত থাকে। কিন্তু ঈশ্বরীয় নাম প্রাকৃত প্রভাবমুক্ত বলে শুদ্ধ ভাব ও বোধযুক্ত থাকে।

মহাপ্রাণচৈতন্যের স্বরূপবিগ্রহই হল ভগবতী মাতা। তিনিই আদ্যাশক্তি সনাতনী।

চিৎশক্তির ভিন্ন ভিন্ন অভিব্যক্তির পরিচয়

চিন্ময়ী মাতৃসত্তা ও চিন্ময় অখণ্ড আত্মসত্তা অভেদ এবং স্বরূপত উভয়েই এক। এই চিৎশক্তিরূপী মাতার চতুর্বিধ অভিব্যক্তি হল শক্তি, জ্ঞান, আনন্দ ও প্রেম এবং তাঁর প্রকাশের চতুর্বিধ পদ্ধতি হল কর্ম, যোগ, জ্ঞান ও ভক্তি।

শক্তি বা বোধ ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য নয়। তা সমষ্টি শক্তি মায়ের জন্য।

চিতিমাতার বহির্বিস্তারই হল অনন্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড। সমগ্র ব্যষ্টিজীবন হল চিতিমাতার সন্তান বা স্বভাবের বিস্তার। প্রাণধারণের উপযোগী সমস্ত উপকরণ রূপে চিৎশক্তি স্বয়ং বর্তমান। ভোক্তা-ভোজ্য-ভোজন রূপে এক চৈতন্যই স্বয়ং আছে। এইরূপ জ্ঞাতা-জ্ঞেয়-জ্ঞানের মধ্যে এবং দ্রষ্টা-দৃশ্য-দর্শনের মধ্যেও এক চৈতন্যই বর্তমান। এইরূপ তিন ভাবের মধ্যে এক বোধের দৃষ্টিই হল আত্মজ্ঞানের পরিচয়। অখণ্ড চৈতন্যসাগরে তার ব্যষ্টি ও সমষ্টি প্রকাশ মিলেই হল বিশ্বরূপ এবং সকলের অন্তর্নিহিত সত্তা হল এক অখণ্ড চৈতন্যময় আত্মা।

চৈতন্যের স্বরূপস্থিতির পূর্বাবস্থা

বৈচিত্র্য হল চৈতন্যের বাহ্যিক রূপ এবং এই বৈচিত্র্যের অন্তর্নিহিত সত্তাই হল চৈতন্যস্বরূপ। চৈতন্যশূন্য বৈচিত্র্য হয় না। কিন্তু বৈচিত্র্যশূন্য চৈতন্যস্বরূপ হল চৈতন্যের যথার্থ পরিচয়। বৈচিত্র্যযুক্ত হল চৈতন্যের বিজ্ঞানময় রূপ।

শ্রদ্ধা ভক্তি বিশ্বাসের মাধ্যমে ক্ষুদ্রতর প্রাণচৈতন্য বৃহত্তর প্রাণচৈতন্যের সঙ্গে মিশে এক হয়ে যায়। অপর পক্ষে বৃহত্তর প্রাণচৈতন্যের প্রকাশ ক্ষুদ্রতর প্রাণচৈতন্যের প্রকাশের সঙ্গে যখন সংযুক্ত হয় তখন তার ব্যবহারে থাকে কৃপা দয়া করুণা আদর স্নেহ আশিস অনুগ্রহ অনুকম্পা ভালবাসা ও প্রেম। তার ফলে প্রকাশ পায় তার মহত্ত্ব উদারতা বদান্যতা মহানুভবতা সহৃদয়তা আত্মীয়তা সমতা পূর্ণতা প্রভৃতি।

বিশ্বাত্মার অনুভূতির উপায়

সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতি হল ব্রহ্ম আত্মা ঈশ্বরের বহিরঙ্গ রূপ অথবা চৈতন্যশক্তির লীলাবিলাস রূপ। সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে নিজের একতা সমতা বা তাদাত্ম্য লাভ হলে বিশ্বাত্মার অনুভূতি হয়। তারপরে বিশ্বাতীত পরমাত্মার অনুভূতি স্বতঃস্ফূর্ত হয়।

চৈতন্যশক্তির ভিন্ন ভিন্ন নাম

অখণ্ড বিশুদ্ধ চৈতন্যময় ব্রহ্ম আত্মা ঈশ্বর স্বয়ংপূর্ণ স্বয়ংপ্রকাশ। তাঁরই সক্রিয় রূপ হল চিৎশক্তি। সেইজন্য একে ব্রহ্মশক্তি আত্মশক্তি বা ঈশ্বরীয় শক্তি বলা হয়।

নামময় ব্রহ্মের পরিচয়

চৈতন্যের স্পন্দনই হল নাম। এই নাম হল সত্য। আবার প্রাণের প্রকাশ হল নাম। সর্ব নামই প্রাণচৈতন্যের স্পন্দন। সুতরাং সব নামের মূলে হল প্রাণচৈতন্য। (আদি নাম হল প্রণব, ওঁকার।। একেই নামময় ব্রহ্ম বলে।) এরই বিস্তার হল সর্ব নাম রূপ এবং বিশ্বজগৎ।

চৈতন্যের ব্যবহারবিজ্ঞানের পরিচয়

সত্যের মধ্যে সত্যের প্রকাশ সবই সত্য তত্ত্বের দৃষ্টিতে; কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে বৈচিত্র্য বা ভেদ প্রতীত হয়। এ-ই ভ্রান্তি। এই ভ্রান্তিও চৈতন্যের বক্ষেই জাত হয়ে, চৈতন্যের বক্ষেই খেলা করে আবার চৈতন্যের বক্ষেই লীন হয়ে যায়। চৈতন্যের বৃত্তি সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণরূপে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে ভ্রান্তিবিলাসের কারণ হয়। এ ব্যবহারিক সত্য, কিন্তু পারমর্থিক সত্য নয়। তমোগুণ স্থূলতা ও আবরণ প্রভৃতির কারণ। রজোগুণ অহংকার, ক্রিয়া, গতি, শক্তি, কর্ম প্রভৃতির কারণ। সত্ত্বগুণ জ্ঞান, সুখ, তৃপ্তি, আনন্দ প্রভৃতির কারণ।

আনন্দস্বরূপের ব্যবহারবিজ্ঞান

আনন্দ হল সৃষ্টির কারণ, স্থিতির কারণ এবং সংহারের কারণ। রজোগুণাত্মক আনন্দই হল সৃষ্টির কারণ। সাত্ত্বিক আনন্দ হল স্থিতির কারণ এবং তামসিক আনন্দ হল সংহারের কারণ।

আনন্দের স্বরূপ হল ভূমা, আনন্দের জ্ঞান হল অখণ্ড এবং আনন্দের শক্তি হল অনন্ত। এই আনন্দস্বরূপই হল ব্রহ্ম আত্মা ঈশ্বর স্বয়ং।

উপাধিযোগে অদ্বয় আত্মার দ্বৈতবিলাস

পরিবর্তন, রূপান্তর বা বিকারই হল মৃত্যু। খণ্ড ও সসীমতা হল বিকারধর্মী। অখণ্ড ভূমা হল নির্বিকার সুতরাং ভূমাই হল অমৃত। ভূমাবোধে মৃত্যুভয় থাকে না। ভূমাবোধই হল আত্মার স্বরূপ। স্বল্পবোধে হয় জীবভাব। স্বল্পবোধ অর্থ ব্যষ্টিভাব। ব্যষ্টিবোধে হল জীব, সমষ্টিবোধে হল ঈশ্বর এবং সর্বাতীত অখণ্ড শুদ্ধ শান্ত বোধই হল পরমব্রহ্ম পরমাত্মা পরমেশ্বর।

যুগের ধর্ম ও বিভাগের লক্ষণ

সত্যনুভূতির মানের তারতম্য অনুসারে যুগ বিভাগ হয়। সত্যযুগের লক্ষণ ষোল আনা সত্যানুভূতি। ত্রেতাযুগে বার আনা, দ্বাপরে আট আনা এবং কলিতে চার আনা। কলিযুগে বার আনা সত্য আবৃত, দ্বাপরে সত্যের অর্ধভাগ উন্মুক্ত, ত্রেতায় তিনভাগ উন্মুক্ত এবং একভাগ আবৃত এবং সত্যযুগে সত্যের ষোল ভাগই উন্মুক্ত। সত্যযুগ হল জ্ঞান ও বিজ্ঞানময়, ত্রেতা হল মনোময়, দ্বাপর হল প্রাণময় এবং কলি হল অন্নময়। কলিযুগে জীবের দেহবুদ্ধি সর্বস্ব। জীবিকা অর্জনের জন্য কলের উপরেই সে নির্ভর করে বেশি। অর্থাৎ কলের প্রাধান্যই এ যুগে বেশি। সেই অর্থেও কলিযুগ বলা চলে।

সত্যানুভূতির লক্ষণ

নিরহংকার, নিরভিমান পূর্ণ শ্রদ্ধা-ভক্তি-বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠা, ভগবৎপ্রেম, নিষ্কাম কর্ম, ঈশ্বরে সমর্পিত জীবন, সমজ্ঞান, সমদৃষ্টি, সমভাব অর্থাৎ ব্রহ্মাত্মৈক্যবোধ হল সত্যানুভূতির লক্ষণ। সর্বভূতে একাত্মবোধ, আপনাতে সকলকে এবং সকলের মধ্যে আপনাকে দেখাই হল একাত্মবোধের লক্ষণ।

প্রীতি ও আনন্দপূর্বক অন্তরে বাইরে সবকিছুর মধ্যে চৈতন্যময় গুরু, আত্মা, ঈশ্বর বা মাকে মানার অভ্যাস দ্বারা সমর্পণ সহজসাধ্য হয়।

অহংকারের সংসার এবং নিরহংকারের ব্রাহ্মীস্থিতি বা আত্মবোধে প্রতিষ্ঠা

মনের চিন্তাই হল কামনা-বাসনা। এই কামনা-বাসনারূপ চিন্তাই হল অহংকার বা সংসারবোধ। এই চিন্তার বৃত্তিগুলি প্রশান্ত হলেই মন লীন হয়, অহংকার বিদূরিত হয় এবং সংসার ধারণার অবসান হয়। এই অবস্থাকেই প্রজ্ঞাস্থিতি বা ব্রাহ্মীস্থিতি বলা হয়। এ-ই সত্যবোধ বা আত্মবোধের পরিচয়।

প্রেমময় ঈশ্বরের বহিরঙ্গ অভিব্যক্তি হল বিশ্ব

জগতে সবকিছুর মধ্যে এক চৈতন্য নিহিত আছে বলে সর্বপ্রকাশের মধ্যে প্রেমের সম্বন্ধ আছে। এই প্রেমের

দ্বারাই প্রেমস্বরূপ ঈশ্বর নিত্যসিদ্ধ। ঈশ্বরের বিভূতি হল বিশ্বমূর্তি। বিশ্বের সর্বপ্রকাশের মধ্যেই ঈশ্বরচৈতন্য স্বয়ং নিহিত।

চৈতন্যের বিজ্ঞানময় রূপ মহাপ্রাণের বিস্তারই হল বৈচিত্র্যময় বিশ্ব

চৈতন্য হল মৌলিক উপাদান। প্রাণ হল তার ব্যবহারবিজ্ঞান। অখণ্ড চৈতন্যসত্তার বক্ষে তারই প্রকাশ মহাপ্রাণ বৈচিত্র্যরূপে অভিব্যক্ত হয়। প্রাণের অনন্ত রূপ। মূর্ত ও অমূর্ত ভেদে তা চার প্রকার, যথা—স্থূল, সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতম। স্থূলরূপ হল অন্নময়, সূক্ষ্মরূপ হল প্রাণময়, সূক্ষতর রূপ মনোময় এবং সূক্ষ্মতম রূপ বিজ্ঞানময়।

গুণ ও প্রকৃতি ভেদে প্রাণীর দেহ হল পঞ্চবিধ, যথা—খনিজ, উদ্ভিজ্জ, স্বেদজ (কৃমিজ), অণ্ডজ ও জরায়ুজ।

চিদাভাস মন-প্রকৃতির ধর্মই হল বন্ধন ও মুক্তি

মনোময় জগতে মনই হল স্রষ্টা সৃষ্টি বা দৃশ্য সবই। মন আবার চিদাত্মার স্পন্দন। মনের সৃষ্টি মনেতেই লীন হয় এবং মন আবার চিদাত্মাতে লীন হয়। মনেতে লীন হল প্রকৃতি লয়। চিদাত্মাতে লীন হল মুক্তি। প্রকৃতি লয় স্থায়ী নয়। পুনঃপুনঃ আবির্ভাব ও তিরোভাব অর্থাৎ সৃষ্টি ও লয় হল মন বা প্রকৃতির অন্তর্গত। চিদাত্মাতে লীন মানে মন কল্পনাশূন্য হওয়া বা নির্বীজ হওয়া। চৈতন্যের দৃষ্টিতে পৃথক মন ও সৃষ্টি নেই। এক চৈতন্যই সর্বময়। চৈতন্যময় পরমাত্মাই স্বয়ং সর্বরূপ অনুভব করে তদাকারে নিজেকে নিজেই দর্শন করেন; অর্থাৎ আপন হৃদয়েতে জগদাকার অনুভব করে আপনি তা দর্শন করেন। সুতরাং জগতের পৃথক অস্তিত্ব নেই। আছে শুধু চিদাত্মাই।

[২৮।৬।৬৮]

চিদাত্মার ইচ্ছাতেই জীবদশা বন্ধন এবং তাঁর ইচ্ছাতেই জীবন্মুক্তি শান্তি ও স্বরূপস্থিতি

চিদাত্মাই অহংকারের মাধ্যমে কর্তা সেজে কামনা-বাসনার দাস হয়ে স্বেচ্ছায় বন্ধনদশা বরণ করেন ও সংসার ভোগ করেন; আবার অকর্তাবোধে অনাসক্তি ও অনাসঙ্গ যোগে অহংকার নাশ করে বিবেকবৈরাগ্যের অনুশীলন দ্বারা মুক্ত হয়ে স্ব-স্বরূপে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হন।

রাগ ও বিরাগের পার্থক্য

বিরাগ=বি-রন্‌জ্‌ ধাতু ঘঞ। 'রন্‌জ্‌' মানে রঞ্জিত করা। একে রাগ বলে। চিত্তকে নানাত্ব বহুত্বের ভাবে রঞ্জিত করে বলে একে রাগ বলে। বৈচিত্র্যের প্রভাবে মোহিত করে মনকে ভুলিয়ে রাখে এই রাগশক্তি। এ-ই বন্ধন। রাগে হয় সৃষ্টি ভোগ ও বন্ধন এবং বিরাগে হয় মুক্তি ও শান্তি। কামনা-বাসনাই হল রাগ। চিত্ত মন অহংকার কামনা-বাসনা রাগ বা আসক্তি মোহ এই সবই অবিদ্যা ও অজ্ঞান। এই অজ্ঞানই হল বৈচিত্র্য, সৃষ্টি, ভোগ ও বন্ধনের কারণ। এ-ই হল চৈতন্যের অনুলোমগতির পরিণাম। তার বিলোম বা প্রতিলোম গতির পরিণামে হয় চিত্তের শুদ্ধি অহংকার অভিমান কামনা-বাসনা আসক্তি মোহ ও অবিদ্যারূপ ভ্রান্তির অবসান এবং শুদ্ধ আত্মজ্ঞানের জাগরণ। রাগের বিপরীত গতিই হল বিরাগ অর্থাৎ কামনা-বাসনা ও ভোগের প্রতি অরুচি, অনাসক্তি ও বৈরাগ্য। দৃশ্যবস্তু ও ভোগ্যবস্তুর আকর্ষণ হতে, প্রভাব হতে, মুক্ত করে এই বৈরাগ্য। বৈরাগ্য থেকে জাত হয় বিবেক বা শুদ্ধজ্ঞান। এই শুদ্ধজ্ঞানই হল আত্মজ্ঞান। অনাসক্তি ও অসঙ্গতাই হল আত্মজ্ঞানলাভ ও জীবন্মুক্তির শ্রেষ্ঠ উপায়।

মুক্তির তাৎপর্য

মুক্তি হল দ্বৈতজ্ঞানের অবসান ও শুদ্ধ একবোধে প্রতিষ্ঠা। জীব-ঈশ্বর বা জীব-ব্রহ্ম-আত্ম ঐক্যজ্ঞানই হল মুক্তি। চিৎতত্ত্বকে আনন্দঘন পরমতত্ত্ব বলা হয়। তাকেই আবার পরব্রহ্ম পরমাত্মা পরমেশ্বর বলে। এই চিৎতত্ত্ব হল অখণ্ড ভূমা চিদাকাশ বা চৈতন্যসাগর। এ প্রজ্ঞানঘন সচ্চিদানন্দস্বরূপ। এই চিৎতত্ত্ব বা অমৃতত্ব নিত্য অদ্বৈত এবং অনুভবসিদ্ধ। সেইজন্য একে স্বানুভবদেব বলা হয়। এর স্বভাববিজ্ঞান বা শক্তিকেই স্বানুভূতি বলে। স্বানুভব ও স্বানুভূতি নিত্য অভিন্ন।

মহামুক্ত দিব্যমানবদের বৈশিষ্ট্য

এক শ্রেণীর অধিকারী আছেন—তাঁরা সংখ্যায় খুবই কম। তাঁরা স্বভাবসিদ্ধ নিত্যসিদ্ধ নিত্যমুক্ত বিশুদ্ধ স্বভাবযুক্ত দিব্যমানব। এঁদের সকলকেই জীবন্মুক্ত বলা হয়। এই জীবন্মুক্তগণ চৈতন্যময় ব্রহ্মতত্ত্ব বা আত্মতত্ত্বের সঙ্গে সাযুজ্য যোগে যুক্ত অর্থাৎ নিত্যাদ্বৈত জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত। এঁরা পূর্ণতার বোধে নিত্য বাস করে পূর্ণতাই আস্বাদন করেন। অদ্বয় জ্ঞানকেই অমৃতত্ব বলে। এই অমৃতত্বে প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মমানবগণ সৃষ্টির মধ্যে সর্বোত্তম আশ্চর্য, কারণ এঁরা সত্যস্বরূপ, সত্যসংকল্প, সত্যভাবন, সত্যবাদী ও সর্বসত্যময়। এঁরা ব্যক্ত হয়েও অব্যক্ত আবার অব্যক্ত হয়েও ব্যক্ত, সগুণ হয়েও নির্গুণ এবং নির্গুণ হয়েও সগুণ। এঁদের কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই ও দ্বৈত নেই। এঁরা কালাতীত আবার কালস্বরূপ, দেশাতীত আবার দেশস্বরূপ, প্রজ্ঞানময় হয়েও বিজ্ঞানময় আবার বিজ্ঞানময় হয়েও প্রজ্ঞানময়।

দেহাত্মবুদ্ধির লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য

দেহাত্মবোধই হল বন্ধন। এই দেহাত্মবোধ হল আমি দেহ, আমার দেহ অথবা আমার সংসার ও আমি কর্তা। দেহাসক্তি ও দেহভোগের মাধ্যমেই এই বন্ধন সৃষ্টি হয়। বিষয়ভোগে যে সুখ ও আনন্দ আছে তা ব্রহ্মানন্দ বা আত্মানন্দেরই কণামাত্র। যা স্বল্প তা ক্ষণস্থায়ী ও দুঃখজনক। সুতরাং বিষয়ভোগে চরম সুখ সম্ভব নয়।

অহংকারের লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য

নিজেকে পৃথক করে ভাবাই হল অহংকার। অহংকারের লক্ষণ হল আমি ভাল থাকব, ভাল খাব, পাঁচজনের চেয়ে বড় হব; আমার দেহ সুস্থ থাকবে, আমার সংসারের সবকিছু আমার আধীনে থাকবে, আমার মনের মত সবাই হবে এবং আমার কথামত সবাই চলবে। এ-ই হল সংসারবোধ বা দেহাত্মবোধ। এ-ই হল ভবব্যাধি।

সত্যের লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য

সত্য হল দেশকালের প্রভাবমুক্ত। যা সর্বকালে সর্ব অবস্থায় সর্বতোভাবে সমান বা একই রকম থাকে অর্থাৎ কোন অবস্থাতেই যার স্বরূপ বিকৃত হয় না তাকেই সত্য বলে এবং যা বিকারী অস্থায়ী অনিত্য তা-ই হল মিথ্যা।

অজ্ঞান ও জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য ও লক্ষণ

বিবেকবৈরাগ্যের অভাবকেই অজ্ঞান বলে। বিবেক সত্যাশ্রয়ী, সত্যসেবী ও সত্যময়। অবিবেক হল অজ্ঞান অবিদ্যা। এ অহংকারাশ্রয়ী চিন্তা ও কল্পনামূলক, কামনা ও বাসনাপ্রিয় এবং নানাত্ব বৈচিত্র্যসেবী অর্থাৎ অলীক ও মিথ্যা।

অদ্বয়বোধের লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য

অদ্বয়বোধই হল আত্মবোধ। এই আত্মবোধই হল অমৃতত্ব—মুক্তি, শান্তি ও পূর্ণতার অধিষ্ঠান। সমতাই হল অদ্বয়বোধ। এ নির্বিকার শাশ্বত অচ্যুত ধ্রুব। সমজ্ঞানই শুদ্ধজ্ঞান এবং শুদ্ধজ্ঞানই হল পরম সত্য। সমবোধে মিথ্যা অজ্ঞান মৃত্যু নিরানন্দ কামনা অহংকার বৈচিত্র্য প্রভৃতি থাকে না।

চৈতন্যস্বরূপের বৈশিষ্ট্য ও লক্ষণ

চৈতন্যময় সাগরে এক চৈতন্যই স্বভাবে লীলা করে। চৈতন্য দিয়েই হয় চৈতন্যের অনুভব; অর্থাৎ চৈতন্য পূর্বাপর চৈতন্যময়ই থাকে। চৈতন্যই স্বয়ং সত্তা ও স্বয়ং শক্তি, স্বয়ং দৃক্ (দ্রষ্টা) ও স্বয়ং দৃশ্য, স্বয়ং জ্ঞাতা এবং স্বয়ং জ্ঞেয়। সর্ব অবস্থাতেই জ্ঞানস্বরূপের চিন্ময়ত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে। তার সমতা পূর্ণতা শান্তি ও চিন্ময়ত্ব স্বতঃসিদ্ধ স্বতঃস্ফূর্ত স্বয়ংপ্রমাণ।

চিদাত্মার বৈশিষ্ট্য ও লক্ষণ

চৈতন্যময় আত্মার স্বভাবলীলায় আত্মস্বরূপের বন্ধনও নেই মুক্তিও নেই, আছে শুধু বিশুদ্ধ আত্মবোধ। চৈতন্যময় সত্তা সামান্য অর্থাৎ অখণ্ড ভূমা নিত্যবোধময় সত্তাই হল আত্মসত্তা। আত্মবক্ষে আত্মবোধে সর্বপ্রকাশের পরিচয়ই হল এক আত্মা। নিত্যচৈতন্যময় আত্মস্বরূপের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশই হল তার স্বানুভূতি। আত্মা স্বয়ং হল স্বানুভবদেব। তার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশরূপই হল ভাতিময় রূপ। তার এই ভাতিময় প্রকাশরূপকেই চিৎশক্তি বলা হয়। এই চিৎশক্তিই হল স্বানুভূতি। সত্তা ও শক্তি যেমন অভেদ, স্বানুভব ও স্বানুভূতিও সেইরূপ অভেদ । উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ হল মাধুর্যপূর্ণ প্রেমের সম্বন্ধ। একেই স্বভাব সম্বন্ধ বলা হয়।

অস্তি-ভাতি-প্রীতির লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য

অস্তি হল অখণ্ড বোধময় ভূমা আত্মসত্তা বা ব্রহ্মসত্তা। একেই নিত্যাদ্বৈত স্বানুভবদেব বলা হয়। ভাতি হল তার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ। একে মহাচিতিশক্তি বা মহাদেবী স্বানুভূতি বলে। প্রীতি হল অস্তি ও ভাতি উভয়ের মধ্যে অভেদ সম্বন্ধ। নিত্যতা, সমতা, একতা ও পূর্ণতা হল এর স্বভাবধর্ম। এই প্রীতিই হল আনন্দরস বা প্রেম।

স্ববোধ ও স্বভাব

স্বভাবে অভাব থাকে না। আনন্দ ও প্রীতি স্বভাব বা স্ববোধ ছাড়া হয় না। স্ববোধই হল আপনবোধ বা আত্মবোধ।

স্বানুভবদেব পুরুষোত্তমের পরিচয়

বিশুদ্ধ চৈতন্যময় পুরুষোত্তম পরমাত্মাই হলেন একমাত্র গতি, ভর্তা, প্রভু, সাক্ষী, নিবাস, শরণ, সুহৃদ। তিনিই আবার উপদ্রষ্টা, অনুমন্তা, ভর্তা, ভোক্তা, মহেশ্বর, তিনিই একমাত্র বিজ্ঞাতা ও একমাত্র দ্রষ্টা পুরুষ। অহংকার তাঁর দাস, অঙ্গ, যন্ত্র, প্রকাশসন্তান, শক্তি ও প্রকৃতি। সর্ব অনুভূতি হল চৈতন্যময় এবং সর্ব অনুভূতির অধিষ্ঠানই হল স্বানুভবদেব পরমাত্মা।

এক চিৎতত্ত্বের অবস্থাভেদে ভিন্ন ভিন্ন পরিচয়

বাইরে যা দৃশ্য অন্তরে তাই হল অনুভূতি, কেন্দ্রে তাই সাক্ষী দ্রষ্টা বোধ এবং চতুর্থ তুরীয়তে হল সর্বময় বিজ্ঞাতা প্রভু আত্মা এবং সব মিলে হল স্বানুভদেব পুরুষোত্তম পরব্রহ্ম পরমাত্মা। দৃশ্য হল নামরূপময় কিন্তু তা সদাই অনুভূতিময় বা চৈতন্যময়। অনুভূতি ছাড়া রূপনামের অস্তিত্ব নেই। অনুভবদেব ছাড়া আবার অনুভূতিও নেই। যেথা হয় অনুভূতি সেথা আছেন অনুভবদেব। সুতরাং অনুভবদেব আত্মা সর্বময়। তাঁর কোন বাধক নেই। তিনি কারও বাধ্যও নন, তিনি অনুভব করেন তাই প্রকাশ হয়। অনুভব ছাড়া কোন প্রকাশই সম্ভব নয়। সুতরাং এক ব্রহ্ম বা আত্মাই সত্য এবং স্বয়ং প্রকাশমান। পৃথক বৈচিত্র্যময় নামরূপের জগৎ বলে কিছু নেই। এ-ই ব্রহ্ম সত্য ও জগৎ মিথ্যার তাৎপর্য।

চৈতন্যের বক্ষে তাঁর লীলাভিনয়ই হল কেবল অনুভূতির খেলা

বৈচিত্র্য সাজে নামরূপের অভিব্যক্তি এই জগৎরূপে যা প্রতীত হয় তা বৈচিত্র্যরূপে হল ভ্রান্তি, কিন্তু চৈতন্যময় অনুভূতিরূপে সত্য। অনুভূতির খেলাই হল চৈতন্যের অভিনয়। এই চৈতন্যের লীলা অভিনয়ে অদ্বয় চৈতন্যস্বরূপ সর্বোত্তম নাট্যকারের মত বহু সাজে অভিনয় করে আপন অভিনয় আপনিই আস্বাদন করেন। কোথাও কোন স্থূল রূপ-নাম-ভাব বোধে নিজেকে অনুভব করে এবং তদাকারে নিজেকে প্রকাশ করে তা স্ববোধে উপলব্ধি করেন; কোথাও বা সূক্ষ্ম রূপ-নাম-ভাব বোধে অনুভব করে তদাকারে নিজেকে প্রকাশ করে নিজেই তা স্ববোধে আস্বাদন করেন। কোথাও সূক্ষ্মতর রূপ-নাম-ভাব-বোধে নিজেকে অনুভব করে তদাকারে প্রকাশিত হয়ে নিজেই স্ববোধে তা উপলব্ধি করেন; আবার কোথাও কখনও সূক্ষ্মতম রূপ-নাম-ভাব-বোধে নিজেকে অনুভব করে তদাকারে প্রকাশিত হয়ে নিজেই স্ববোধে তা উপলব্ধি করেন। এ হল তাঁর বিজ্ঞানময় স্বরূপের পরিচয়। তত্ত্বত তিনি স্ববোধ অতিরিক্ত কোন কিছু অনুভব করেন না, প্রকাশ করেন না এবং উপলব্ধি করেন না। পূর্বাপর তিনি সর্বসময় শান্ত ও সমানই থাকেন। এ-ই তাঁর প্রজ্ঞানময় স্বরূপের যথার্থ পরিচয়।

অখণ্ড সম্বিৎ স্বয়ং প্রকাশক ও প্রকাশরূপে নিজেই নিজেকে ব্যক্ত করেন। এ-ই সত্যস্বরূপ অখণ্ড ভূমা চৈতন্যের পরিচয়।

বৈচিত্র্যময় প্রকাশ অর্থাৎ নামরূপের মাধ্যমে চৈতন্যস্বরূপ স্বয়ং নিজেকে নানা ভঙ্গিমায় প্রকাশ করেও আপনার চৈতন্যস্বরূপ কখনও হারান না অর্থাৎ তাঁর কখনও কোন বিকার বা রূপান্তর হয় না।

চৈতন্যের প্রকাশলীলায় চৈতন্যের স্বরূপ হল স্বানুভব এবং তার প্রকাশ হল স্বানুভূতি। স্বানুভূতির মাধ্যমেই স্বানুভবদেব ভূমাচৈতন্য নিরন্তর জগৎনাট্যের অভিনয় করেন। অখণ্ড সম্বিৎসাগরে তাঁর লীলা অধ্যায় অসংখ্য ও অপরিমেয়। প্রতি লীলা অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হল অসংখ্য বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। অসংখ্য অভিনেতারূপে সম্বিৎময় স্বানুভবদেব স্বয়ং স্বকল্পিত নগর দৃশ্য ভোগ্য উপকরণাদি এবং ইচ্ছানুরূপ দেহধারণ করে স্বভাবে পৃথক পৃথক ভূমিকায় স্বানুভূতির অভিনয়ে রত। অভিনয় শেষে আপন অনুভূতির মাঝে আপনি লীন হয়ে বিশ্রাম করেন। স্বভাবশক্তি যোগে কল্পনার মাধ্যমে নাটকের অঙ্ক ও পরিবেশাদি সৃষ্টি করে পুনঃপুনঃ অভিনয় করা ও তা আস্বাদন করাই হল তাঁর বিজ্ঞানময় স্বরূপের বৈশিষ্ট্য।

জীবজগৎ হল চৈতন্যের লীলানাট্যের উদাহরণ। চৈতন্যময় স্বানুভবদেবের অখণ্ড বক্ষে অসংখ্য জীবজগৎ হল তাঁর রঙ্গমঞ্চ বা লীলানিকেতন। জীবরূপে তিনিই হলেন অভিনেতা। প্রাকৃতিক পরিবেশাদি হল রঙ্গমঞ্চের দৃশ্যাবলী। সবই সম্বিৎময়।

বিষয়ী-বিষয় এক চৈতন্যেরই দ্বিবিধ পরিচয়। জীবচৈতন্য হল বিষয়ী কর্তা ভোক্তা জ্ঞাতা ও দ্রষ্টা এবং জগৎ হল বিষয় ও দৃশ্য। উভয়ের মিলনে হয় সম্বিতের অনুভূতি।

প্রাণচৈতন্যের চতুর্বিধ অভিব্যক্তি

প্রাণচৈতন্যের চতুর্বিধ অভিব্যক্তিকে পথ্য, তথ্য, তত্ত্ব ও পরমতত্ত্বরূপে চৈতন্যই প্রকাশ করে, ব্যবহার করে আবার অনুভব করে। জীবনের মধ্যে এই চতুর্বিধ অনুভূতি পর্যায়ক্রমে কর্ম যোগ জ্ঞান ভক্তির ব্যবহার রূপে অভিব্যক্ত হয়। চতুর্বিধ অনুভূতির পূর্ণরূপই স্বানুভবদেব।

বুদ্ধিসত্ত্বের বৈশিষ্ট্য

বুদ্ধিসত্ত্বই হল জীবাত্মা অর্থাৎ জীবের অন্তর্নিহিত সম্বিৎ বা চৈতন্যসত্তা। জীবভাব ও উপাধিযুক্ত চৈতন্যই হল জীবাত্মা বা জীবচৈতন্য। সমষ্টিজীবের পরিচয় হল মহত্তত্ত্ব, ব্যষ্টিজীবের পরিচয় হল বুদ্ধিসত্ত্ব। পরমবোধি হল স্বানুভবদেব পরমাত্মা বা পরব্রহ্মের পরিচয়। বোধসাগরে বুদ্বুদ্ আকারে প্রতি জীব বিরাজ করে। বুদ্বুদ্ আকারে ধী-ই হল বুদ্ধি। বিষয়ের কামনা ও সন্তাপে শান্ত ধী চঞ্চল হয়ে বুদ্বুদের মত বুদ্ধির আকারে প্রকাশ পায়। বুদ্ধিরূপে যে চৈতন্য তা-ই জীবদেহের প্রভু। ধারণ, বহন ও পালন করাই হল তার কাজ। ধী-সত্তার অর্থাৎ চৈতন্যসত্তার রশ্মি বুদ্বুদ্‌রূপ বুদ্ধির মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করে। এই বুদ্ধি আবার অহংকারাত্মক মন ও চিত্ত রূপে, মন ইন্দ্রিয়াদি রূপে এবং ইন্দ্রিয়সকল বিষয়রূপে অভিব্যক্ত হয়। বাইরে কার্য, অন্তরে কারণ; আবার অন্তরে কার্য এবং কেন্দ্রে কারণ। এইভাবে কেন্দ্রে কার্য এবং তুরীয়তে কারণ। তুরীয়ের কারণকেই কারণাতীত বলে।

চতুর্থ স্তরের বোধই হল সর্বস্তরের বোধের অধিষ্ঠান। এই বোধস্বরূপ ব্রহ্ম আত্মা ঈশ্বর বা স্বানুভবদেবের উপর নির্ভর করে সর্বস্তরের অস্তিত্ব, প্রকাশ, স্থিতি ও অনুভূতি।

অহংকার ও অহংদেবের পরিচয়

জীবের মধ্যে চৈতন্য খণ্ডবোধে অহংকার ও সমষ্টিবোধে অহংদেব বা আমার-শূন্য আমিরূপ প্রকাশ করে। অহংকার চায় পৃথক অধিকার এবং অহংদেব চান সর্ব সমাহার। অহংকারের হল সংসার এবং অহংদেবের হল সমসার অর্থাৎ পূর্ণতা ও সমতা। অহংকারের ধর্ম সকাম এবং অহংদেবের ধর্ম হল নিষ্কাম। অহংকার কর্তা এবং অহংদেব হল অকর্তা। জীবভাবের আমিকেই অহংকার বলে এবং শিবভাবের আমিকে অহংদেব বলে।

কর্মের প্রকারভেদ

কর্ম, অকর্ম ও বিকর্ম—এই হল ত্রিবিধ কর্ম। কর্ম বলতে সাধারণত পুন্যকর্মকেই বোঝায়। অকর্ম বলতে ভ্রান্তিমূলক কর্মকে বোঝায় এবং বিকর্ম অর্থ নিষিদ্ধ ও পাপকর্ম।

দিব্যজীবনের লক্ষণ

পূর্ণ আত্মসমর্পণের পরিণাম হল পূর্ণ দিব্যজীবন লাভ। এই দিব্যজীবনের লক্ষণ— (১) স্বভাবের প্রশান্ত ভাব অর্থাৎ প্রশান্তচিত্ততা, (২) সরলতা, (৩) সমতা, (৪) অহংকারশূন্যতা, (৫) অভিমানশূন্যতা, (৬) নির্মমতা, (৭) নিষ্কাম স্বার্থশূন্যতা, (৮) অকর্তাবোধ বা কর্তৃত্বাভিমানশূন্যতা, (৯) আন্তরিকতা, (১০) উদারতা, (১১) বদান্যতা, (১২) পবিত্রতা, (১৩) নম্রতা ও বিনয়, (১৪) সৌম্য ভাব, (১৫) দয়া, (১৬) ক্ষমা, (১৭) মৈত্রী, (১৮) করুণা, (১৯) মুদিতা, (২০) একতা, (২১) অমৃতত্ব, (২২) মৌলিকতা, (২৩) পূর্ণতা ও (২৪) শাশ্বত প্রেম।

শ্রদ্ধার বৈশিষ্ট্য

শ্রদ্ধা হল ঈশ্বর, গুরু ও শাস্ত্রবাক্য গ্রহণ করে ও মেনে তার মর্ম উপলব্ধি করার প্রস্তুতি। এ হল ভক্তিভাবের পূর্ণ অবস্থা। শ্রদ্ধার পরিণামই হল বিশ্বাস। পূর্ণ বিশ্বাস হল শ্রদ্ধা ও ভক্তির পরিণাম[১]।

ভক্তির ত্রিবিধ অবস্থা

ভক্তির ত্রিবিধ অবস্থা হল ভাব, ভক্তি ও প্রেম। ভক্তির ত্রিবিধ ক্রম হল সাধনভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি। সাধনভক্তি দ্বিবিধ, যথা—বৈধী ও অনুরাগা। বৈধীভক্তি হল নয় প্রকার আনুষ্ঠানিক ভক্তি এবং অনুরাগা ভক্তি হল বৈধী-ভক্তির পরিণাম। অথবা স্বভাবজাত ঈশ্বরের প্রতি আসক্তিকেও অনুরাগা ভক্তি বলা হয়।

ভালবাসার পরাকাষ্ঠাই হল প্রেম। এ ভালবাসা নিষ্কল নির্মল শুদ্ধ ও পবিত্রতম।

ভেদজ্ঞান অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানই হল অজ্ঞান। ভেদজ্ঞানের লক্ষণ হল দোষদৃষ্টি, নিন্দা, ঘৃণা, অবহেলা, হিংসা প্রভৃতি স্বভাববিরুদ্ধ আচরণ। এদের মূল হল অহংকার অভিমান। অহংকার অভিমানের মূল হল কামনা-বাসনা। কামনা-বাসনার মূল হল অবিদ্যা। অহংকার অভিমান দ্বারা ঈশ্বরানুভূতি হয় না।

অবতার কেন?

ভগবান সর্বশক্তিমান। তিনি মানুষের মধ্যে মানুষের বেশে জীবাত্মার বন্ধন মোচনের জন্য ও উদ্ধারের জন্য অবতরণ করেন বলে তাঁকে অবতার বলা হয়। আবার জীবাত্মা বা মানুষ সাধনভজনের মাধ্যমে ঈশ্বরের অনুভূতি লাভ করে ঈশ্বরভূমিতে আরোহণ করে।

জীবের হল সাধনভজনের মাধ্যমে জীবন্মুক্ত হয়ে ঈশ্বরভূমিতে আরোহণ এবং সর্বব্যাপী ঈশ্বরের হল প্রেমাতিশয্যে মানুষের মধ্যে অবতরণ ও স্বভাবলীলা অভিনয়। মনুষ্যজীবন সাধারণত প্রকৃতির অধীন কিন্তু সাধনভজনের মাধ্যমে সে প্রকৃতিমুক্ত হয়ে ঈশ্বরের দাস, সেবক, সাথী ও প্রকৃতি হতে পারে। ঈশ্বরের জীবরূপ ধারণ প্রকৃতির অধীন নয়, তাঁর দিব্য ইচ্ছা ও ভাবের অধীন। সুতরাং অবতারের দেহধারণ, লীলা ও অন্তর্ধান সবই দিব্যভাবময় অর্থাৎ অতিপ্রাকৃত চিদানন্দশক্তির অধীন। অবতারকে ভালবাসা হল ভগবানকে ভালবাসা। এ ভালবাসা অতীব দুর্লভ।

মনের ধর্ম ও বোধের ধর্ম

ভালমন্দ মনের ধর্ম, কিন্তু বোধস্বরূপের ধর্ম হল সমতা ও একতা। মনের ধর্ম দ্বারা সাধনভজন হয়। বোধের ধর্ম হল স্বানুভূতি অর্থাৎ সত্যের অনুভূতি।

সন্ন্যাসের তাৎপর্য[২]

অহংকার অভিমানের বিনাশ হলেই যথার্থ সন্ন্যাস হয়। ঈশ্বরে সমর্পিত জীবনই হল সন্ন্যাসজীবন অর্থাৎ ঈশ্বরাত্মবোধে জীবনকে যে গড়ে তোলে এবং তদ্‌বোধে জীবন অতিবাহিত করে তদ্‌বোধেই যার জীবনের অবসান হয় সে-ই হল যথার্থ সন্ন্যাসী। অথবা সত্যনিষ্ঠ ঈশ্বর প্রেমিকই হল সন্ন্যাসী। শুদ্ধবোধে বা একাত্মবোধে প্রতিষ্ঠিত যে সে-ই হল সন্ন্যাসী। অদ্বৈতবোধের অধিকারীই হল সন্ন্যাসী। দেহবোধশূন্য ভেদজ্ঞানশূন্য জীবন্মুক্তই হল যথার্থ সন্ন্যাসী।

১। তত্ত্বের দৃষ্টিতে।　২। স্বানুভূতির দৃষ্টিতে।

অনুভূতির স্বরূপই হল জগৎ

ঈশ্বরবোধে, আত্মবোধে, গুরুবোধে, শিব-বিষ্ণু-রাম ও হরিবোধে জগৎবোধ থাকে না। এর অর্থ এই নয় যে জগৎ শূন্য হয়ে যায়। জগৎ তখন ব্রহ্মময়, আত্মময়, গুরুময়, শিবময়, বিষ্ণুময়, রামময়, হরিময় অনুভূত হয়; অর্থাৎ অনুভূতির স্বরূপ নিজেই জগৎরূপে বর্তমান। তদতিরিক্ত পৃথক জগৎ বলে কিছু নেই এবং মায়া বলেও কিছু নেই। ব্রহ্ম বা হরিবোধে সবকিছুকে না-মানাই হল মায়া বা অজ্ঞান। তদ্‌বোধে মানলে হয় জ্ঞান ও বিজ্ঞান। জগৎকে জগৎবোধে না-নিয়ে সচ্চিদানন্দময় ঈশ্বরবোধে বা সত্যবোধে গ্রহণ করলে সত্যানুভূতি বা ঈশ্বরানুভূতি প্রত্যক্ষ বোধের দর্শন হয়।

অনুভূতি ভেদ ও অভেদের মূলে

ব্রহ্ম ছাড়া, ঈশ্বর ছাড়া জগৎ নয়; সুতরাং জগৎও ব্রহ্ম ছাড়া, ঈশ্বর ছাড়া নয়। আত্মা ঈশ্বর এবং জগৎ বস্তুত অভেদ। যেমন সূর্যের আলো ও তাপ সূর্যের সঙ্গে অভেদে যুক্ত, অগ্নি ও তার তাপ অভেদ, সেইরূপ জগৎ ও চৈতন্যময় ব্রহ্ম ঈশ্বর আত্মা পৃথক নয়। ভেদবোধে মেনে নিলে ভেদ অনুভব হয় এবং অভেদবোধে মেনে নিলে অভেদ অনুভূত হয়। অনুভূতি হল বোধের ক্রিয়া। ভাব অনুযায়ী বোধের ক্রিয়ার ভেদ বা পার্থক্য হয়। কল্পনা অনুযায়ী ভাবের তারতম্য হয়। এই কল্পনা আবার চৈতন্যসত্তার স্পন্দনমাত্র।

প্রতীতি, অনুভূতি, স্বানুভূতি

প্রতীতি হল ইন্দ্রিয়বোধের ব্যবহার ও জ্ঞান। অনুভূতি হল মন ও বুদ্ধির ব্যবহারিক জ্ঞান। কিন্তু স্বানুভূতি হল চৈতন্যময় আত্মার বিজ্ঞান। ইন্দ্রিয়জ প্রতীতি হল বৈচিত্র্যময়, সুতরাং অজ্ঞান। অন্তরের মানস অনুভূতি হল দ্বৈত কিন্তু আত্মার স্বানুভূতি হল অদ্বৈত।

ব্যবহারিক বোধ ও আত্মবোধের পার্থক্য

বোধের অশুদ্ধ আচরণ হল ইন্দ্রিয় ও মনের ধর্ম এবং শুদ্ধ আচরণ হল শুদ্ধচিত্ত তথা আত্মার ধর্ম। ইন্দ্রিয় মন পরিশোধিত হলে বোধের আচরণে ত্রুটি থাকে না। অন্তর শুদ্ধ না হলে শুদ্ধবোধের আচরণ করা সম্ভব হয় না। মন ও মুখ সমান না-হলে সত্যবাক্ হয় না। আত্মার সঙ্গে মনের মিলন না-হলে মন শুদ্ধ হয় না। অশুদ্ধ মন কখনওই সত্যপালন করতে পারে না।

প্রাণের লীলায় প্রাণের মাহাত্ম্য

সমগ্র বৈচিত্র্যের মধ্যে যে নির্বিকার শুদ্ধ অমৃতময় পুরুষ আছে তাকেই আত্মা বলা হয়। আত্মার ধর্ম হল অখণ্ড, বিশুদ্ধ চৈতন্যময়, বিশুদ্ধ আনন্দময় ও প্রেমময়। সর্ববস্তুর অন্তরসত্তাই সে। প্রাণরূপে হয় তার অভিপ্রকাশ। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সর্বত্রই প্রাণের বক্ষে প্রাণকে নিয়েই প্রাণের খেলা। প্রাণই প্রাণকে চায়, প্রাণ প্রাণকে প্রাণ দেয় এবং প্রাণ প্রাণ হতে প্রাণকেই পায়। প্রাণের সঙ্গে প্রাণ মিশে আবার প্রাণময় হয়ে যায়। প্রাণই খাদ্য, আবার প্রাণই খাদক, প্রাণই আশ্রিত আবার প্রাণই আশ্রয়; প্রাণই দাতা ও গ্রহীতা উভয়ই। পরস্পর প্রাণের সঙ্গে মিশে প্রাণই প্রাণের খেলা খেলে। প্রাণ বাইরে থেকে অন্তরে যা কিছু আহরণ করে তা-ই হল তার খাদ্য। প্রাণ প্রাণকে খাদ্যরূপে গ্রহণ করে নিজের প্রাণে মিলিয়ে নেয়। আবার অন্তর থেকে প্রাণ যা কিছু বাইরে প্রকাশ করে তা-ও প্রাণ ছাড়া অন্য

কিছু নয়। অর্থাৎ অন্তর হতে প্রাণ যখন প্রাণকে বার করে দেয় তা-ই হল প্রাণের সৃষ্টি। প্রাণের মধ্যে প্রাণের দ্বারাই প্রাণের হয় জন্ম, প্রাণের দ্বারা প্রাণের হয় পুষ্টি; প্রাণের দ্বারা প্রাণের হয় তুষ্টি এবং প্রাণের দ্বারা প্রাণের হয় প্রীতি, স্থিতি ও শান্তি।

অভিন্ন চিৎসত্তা ও শক্তির বক্ষে চিৎশক্তির বিচিত্র লীলাভিনয়

চিৎস্বরূপ ও চিৎশক্তি অভেদ একতত্ত্ব। ভিন্ন ভিন্ন ভাবের মাধ্যমে এই চিৎশক্তি ভিন্ন ভিন্ন নামরূপের সাজে অভিব্যক্ত হয়। চিৎশক্তিরই অপর নাম হল মহাপ্রাণ। বৈচিত্র্যময় বিশ্ব চৈতন্যময় প্রাণশক্তিরই বিজ্ঞানময় রূপ বা লীলাবিলাস।

মহাপ্রাণ চিতির স্বভাবই হল লীলাবিলাস বা খেলা। নিজেকে নিয়েই তাঁর নিজের খেলা। এই নিজবোধের মধ্যে নিজবোধ অতিরিক্ত অন্য কিছু নেই এবং অন্য কিছু থাকা সম্ভবও নয়। তাঁর এই খেলার বাহ্যিক তিন রূপ হল সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার। তাঁর সমষ্টি রূপ হল এই বিশ্বসংসার। তাঁর আভ্যন্তরীণ রূপ হল তরঙ্গায়িত মানস সরোবর বা স্বপ্নবিলাস। তারও গভীরে হল প্রশান্ত চিদাকাশ অর্থাৎ শান্ত পরব্রহ্ম বা পরমাত্মা।

আকাশবৎ মহাপ্রাণচৈতন্যের ত্রিবিধ পরিচয়

মহাপ্রাণরূপী চৈতন্যের স্বরূপ হল আকাশবৎ। সেইজন্য তাঁকে চিদাকাশ বা পরাকাশ অথবা মহাশূন্য বা পরমব্যোম বলা হয়। এই চিদাকাশই হল তাঁর যথার্থ স্বরূপ। এই চিদাকাশের বক্ষেই চৈতন্যের বৈচিত্র্যময় লীলা হয়।

পরিদৃশ্যমান স্থূল বিশ্ব চিদাকাশে ওঠে ভাসে ডোবে। এর আবির্ভাব ও তিরোভাব আছে বলে এ অনিত্য, অস্থায়ী, অলীক ও মিথ্যা কল্পনা মাত্র। কল্পনা হল নিরাকার নিরবয়ব মানস বৃত্তি। মহাশূন্যে চিদাকাশের স্পন্দন হল নিরাকার মন। মনের স্পন্দন হল নিরাকার কল্পনা। নিরাকার কল্পনার স্বপ্ন বা সৃষ্টি হল মিথ্যা ও অলীক পরিদৃশ্যমান জগৎ। শ্রষ্টা চিদাকাশ চিদ্‌ঘন হয়েও নিরবয়ব। সুতরাং তাঁর সৃষ্টি ঘনীভূত আকৃতিবৎ হলেও চিদাকাশময়। অর্থাৎ চিদাকাশই আছে জড়ত্ব বা ঘনীভূত পরিদৃশ্যমান জগৎরূপে। মানস কল্পনা ও সৃষ্টি হল বিশ্বজগৎ। সুতরাং সমগ্র জগৎ হল মনোময়। মন আবার চিদাকাশময়। সুতরাং সমগ্র জগৎ হল চিদাকাশময়। এই চিদাকাশই হল ব্রহ্ম বা আত্মা। সুতরাং সমগ্র জগৎই হল ব্রহ্মময় বা আত্মময়। ব্রহ্ম বা আত্মাতিরিক্ত কোন সত্য নেই। যা-কিছু দৃশ্য হয় ও অনুভূত হয় তা এই চিদাকাশ বা ব্রহ্ম আত্মা। দ্রষ্টা ও দৃশ্য উভয়ই এক চিদাকাশেরই পরিচয়।

সত্যানুভূতির উপায়

চৈতন্যস্বরূপই হল ব্রহ্ম আত্মা ঈশ্বর গুরু ইষ্ট এবং চৈতন্য দিয়ে তাঁর সেবা করেই সত্যানুভূতি হয়। চিৎশক্তিকে মাতৃবোধে উপাসনা করে চিৎস্বরূপের পূর্ণ অনুভূতি হয়। মানার অর্থ হল চৈতন্য দিয়ে চৈতন্যকে গ্রহণ ও ব্যবহার অর্থাৎ চিতিমাতাকে আপন চৈতন্য দ্বারা গ্রহণ করে ও বহন করে চলা। এর অর্থ হল মাকে নিয়ে চলা।

চৈতন্যস্বরূপ স্বভাবত অনাদি, অনন্ত, শুদ্ধ, মুক্ত ও স্বতন্ত্র। তাঁর ইচ্ছা, চিন্তা ও কল্পনা স্বতঃস্ফূর্ত। তিনি যেমন ইচ্ছা করেন তেমনই অনুভব করেন ও তদাকারে প্রকাশিত হয়ে প্রকাশরূপকে আবার উপলব্ধি করেন।

বন্ধন ও মুক্তি চৈতন্যের ব্যবহারিক পরিচয়

ব্যবহারের দিক হতে চৈতন্যের দ্বিবিধ অবস্থা হল 'বন্ধন ও মুক্তি; কিন্তু স্বরূপের দৃষ্টিতে চৈতন্যের বন্ধনও নেই মুক্তিও নেই। তিনি স্বতঃসিদ্ধ স্বয়ংপূর্ণ স্বতঃপ্রকাশ নিষ্কল নির্মল অদ্বয় অব্যয় অমৃতময় অখণ্ড ভূমা।

পূর্ণাহুতির তাৎপর্য

উপায় ও উপেয় অর্থাৎ সাধ্য, সাধন ও সাধক সবই সেই চিদানন্দময়ী মাতা নিজে। অন্তরে বাইরে সবই চিতি মা বলে মেনে নেওয়াই হল পূর্ণ আত্মসমর্পণ বা পূর্ণ আহুতি। এই চিতি মাতাই হলেন স্বানুভূতি মা। স্বানুভূতি মা নিজেকে নিজেই অবিরাম ধারায় প্রকাশ করেছেন নিজের কাছে নিজের অনুভূতির জন্য। তিনি নিজেই পরমাগতি সর্বোত্তম গন্তব্যস্থল পরমপদ। নিজেই গাড়ি, নিজেই চালক, নিজেই টিকেট্, নিজেই যাত্রী। সুতরাং সর্বসমর্পণকারী, সমর্পণ ও তার ফল সবই হল সেই অখণ্ড ভূমা সচ্চিদানন্দস্বরূপ সর্বাত্মা বা সচ্চিদানন্দময়ী সর্বাণী মাতা।

স্বানুভূতির মধ্যে অন্তর বাহির থাকে না। সব অখণ্ড সমান। [২৯।৬।৬৮]

অদ্বৈতবাদী ও দ্বৈতবাদীর সত্যদর্শন

অদ্বৈতবাদীর মতে দ্রষ্টা ও দৃশ্য অভেদ এবং এই অভেদ অনুভূতিই হল অদ্বয় জ্ঞান। কিন্তু দ্বৈতবাদীর মতে দ্রষ্টা ও দৃশ্য অভেদ নয়। ঈশ্বর হল উপাস্য এবং জীব হল উপাসক। জীব ঈশ্বরের নিত্যদাস, সেবক, অংশ ও প্রকৃতি। ঈশ্বরের কৃপায় ভক্তিযোগের মাধ্যমে ভক্ত ঈশ্বরের নানাবিধ লীলা দর্শনের যোগ্যতা লাভ করে। শুদ্ধাভক্তিই হল এই যোগ্যতা। শুদ্ধচিত্তেই শুদ্ধাভক্তির বিকাশ হয়।

অধ্যাত্ম সাধনার তাৎপর্য

জপ, পূজা, উপাসনা ও ধ্যানের পরিণামে শুদ্ধাভক্তির বিকাশ হয়। এই সকল সাধনার মাধ্যমে স্বভাবাত্মার মলাবরণ সরে যায়। স্বভাবের পরিশোধন বা পরিমার্জন করাই হল অধ্যাত্ম সাধনা।

প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির পরিচয়

বিশুদ্ধ শান্ত চৈতন্যময় আত্মস্বরূপ থেকে মন যখন ভোগায়তন দেহে নেমে আসে তখন সে দ্বিবিধ বৃত্তির অধীনে চলে। এই দ্বিবিধ বৃত্তি হল প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি।

প্রবৃত্তিমার্গের দেবতাদের কাজ হল জাগতিক ভোগসুখের জন্য অর্থকরী উন্নতি প্রতিপত্তি ধনসম্পত্তি প্রভৃতি বৃদ্ধি করা এবং নিবৃত্তিমার্গের দেবতাদের কাজ হল জাগতিক ভোগসুখে অনাসক্তি, ত্যাগবৈরাগ্য, তপস্যা এবং সত্ত্বগুণের পূর্ণাঙ্গ বিকাশ সাধন করা।

প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উভয় ভাবের অভিব্যক্তিকেই কর্ম বলা হয়। অন্তরের প্রাণশক্তি বা স্বভাবশক্তির দ্বিবিধ গতি হল অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী। অন্তর্মুখী গতি কেন্দ্রানুগ এবং বহির্মুখী গতি হল কেন্দ্রাতিগ। কেন্দ্রানুগ গতির মাধ্যমে মন বৈচিত্র্য ও দ্বৈতপ্রভাব ছেড়ে কেন্দ্রে প্রশান্ত স্বরূপ প্রাপ্তির চেষ্টা করে। এই হল অধ্যাত্মসাধনা। এই সাধনার সিদ্ধি হল ঈশ্বর আত্মানুভূতি, মুক্তি ও শান্তি। কেন্দ্রাতিগ গতির মাধ্যমে মন ইন্দ্রিয়বৃত্তি সহযোগে বহির্জগতে নিজেকে বৈচিত্র্যের মধ্যে ছড়িয়ে দেয় এবং তা ভোগ বা আস্বাদনের চেষ্টা করে। এ-ই হল মনের সংসার দশা বা বিষয়ানুবৃত্তি।

প্রবৃত্তিকেই বলে আসক্তি বা ভোগ। এ-ই হল বন্ধন। নিবৃত্তিকে বলে অনাসক্তি বা ত্যাগ। এ-ই হল মুক্তি। মুক্তিই হল শান্তি বা অমৃতত্ব। মনের বহির্বিস্তার হল প্রবৃত্তিমূলক, এবং মনের স্বরূপে স্থিতি হল নিবৃত্তিমূলক।

নিবৃত্তিমূলক মনের বৃত্তিগুলিকে শুদ্ধসাত্ত্বিক বা সদ্‌বৃত্তি বলা হয়। এই সদ্‌বৃত্তিগুলি হল নিবৃত্তিমার্গের দেবদেবী। এদের স্বভাব শুদ্ধসাত্ত্বিক এবং এরা সদাই পরমাত্মা ও পরমেশ্বরের অনুগত প্রিয় সেবক। এদের কৃপাতেই মানুষ শুদ্ধাভক্তি ও শুদ্ধজ্ঞানের অধিকারী হয়। পরমাত্মা পরমেশ্বর এদের মাধ্যমেই তাঁর শুদ্ধ স্বভাবলীলা বা নিত্যলীলা সম্পন্ন করেন। আবার প্রবৃত্তিমার্গের বৃত্তিগুলি রাজসিক ও তামসিক। এদেরই অসৎবৃত্তি বলা হয়। এই অসৎবৃত্তি হল অসুর অপদেবতা কুদেবতা প্রভৃতি। এরা সর্বদাই ভোগপরায়ণ ও উগ্রকর্মা। জীবনে উভয়বিধ প্রাণ ও মনের গতির বৃত্তিগুলির মধ্যে নিরন্তর সংঘর্ষ ও দ্বন্দ্ব হয়। এই দ্বন্দ্বকেই দেবাসুরের যুদ্ধ, সু ও কু-এর সংগ্রাম এবং সৎ ও অসতের লড়াই বলা হয়।

দেবাসুরের পরিচয়

সৎ-এর প্রাধান্যে হয় দেবজীবন ও ধর্মজীবন এবং অসৎ-এর প্রাধান্যে হয় অসুরজীবন বা অধর্মজীবন। প্রবৃত্তিমূলক অসুরবৃত্তিগুলি কর্মাত্মক অর্থাৎ ক্রিয়াশক্তির ধারক, বাহক ও পরিবেশক। এদের চেষ্টা হল বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা ও তা ইচ্ছামত ভোগ করা।

সদাশ্রিত নিবৃত্তির তাৎপর্য

নিবৃত্তিমূলক সদ্‌বৃত্তিগুলি জ্ঞানাত্মক অর্থাৎ জ্ঞানশক্তির ধারক, বাহক ও পরিবেশক। এদের চেষ্টা হল ত্যাগ অনাসক্তি বিবেকবৈরাগ্যের মাধ্যমে জ্ঞানের উৎকর্ষ লাভ করা ও সর্ববিধ প্রকৃতির প্রভাব মুক্ত হওয়া।

দেবাসুরের তত্ত্ব

কর্মাত্মক ও প্রবৃত্তিমূলক অসুরগণ এবং জ্ঞানাত্মক ও নিবৃত্তিমূলক সুরগণ উভয়ই অন্তর্যামী চিদাত্মারূপী প্রজাপতি ব্রহ্মার সন্তান। এদের মধ্যে ক্রিয়াত্মক অসুরগণ হল জ্যেষ্ঠ এবং জ্ঞানাত্মক সুর বা দেবতাগণ হল কনিষ্ঠ।

জ্ঞানের উৎকর্ষ হলে কর্মের শোধন ও রূপান্তর হয়। একেই দেবতাদের প্রভাবে অসুরদের বিনাশরূপে ব্যক্ত করা হয়। এক আত্মচৈতন্যেরই ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ অসুর ও সুর অর্থাৎ কর্ম ও জ্ঞানবৃত্তিসমূহ। পরস্পর দ্বন্দ্বের মাধ্যমে প্রথমে তারা উভয়েই উৎকর্ষ লাভের চেষ্টা করে, পরিশেষে উভয়ে মিলিত হয়ে আত্মার অনুগত হয় ও আত্মসেবার দ্বারা আত্মবোধের সঙ্গে একীভূত হয়ে যায়।

কর্মফলে নিরপেক্ষ ও অনাসক্ত হওয়াই হল কর্মের কৌশল। এ-ই হল যোগ।

সদসৎ কর্মপ্রসঙ্গ

শুভকর্মের বিলম্ব হলে অসুরবৃত্তি বাধা সৃষ্টি করে। পরিমিত আহার, নিদ্রা ও কর্মই হল যোগের সহায়ক। কামনা-বাসনাই হল কর্মের জননী। অজ্ঞান হল বাসনার জনক। পূর্বজন্মের বাসনাই পরবর্তী জন্ম ও কর্মের কারণ হয়। অহংকারযুক্ত মনই কর্ম করে ও কর্মের ফল ভোগ করে। নিষ্কাম কর্ম হয় শুদ্ধ চিত্ত ও শুদ্ধ অহংকারের দ্বারা।

কর্ম ও স্বপ্নদর্শন অহংকারে

অহংকারপ্রধান চিত্ত বা মনই সংকল্পের মাধ্যমে স্বপ্ন ও দৃশ্যাবলী দর্শন করে। চিন্তাই হল সংকল্প এবং এ-ই

হল মানসকর্ম, এরই বাহ্যিক রূপ হল ইন্দ্রিয়জ কর্ম ও তার ফল হল দৃশ্যময় বাহ্যজগৎ। অশান্ত চিত্ত হল কামনা-বাসনা প্রধান। সংকল্প অনুরূপ কর্ম, সৃষ্টি, ভোগ ও দৃষ্টি। সংকল্পই হল জগৎ। চিত্ত প্রশান্ত হলে কর্ম ভোগ স্বপ্ন ও দৃশ্য কমে যায়। প্রশান্তচিত্ত বোধস্বরূপের সঙ্গে সংযুক্ত। বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপই হল ঈশ্বরাত্মা। চৈতন্যময় ঈশ্বরাত্মার ইচ্ছার প্রকাশ সংকল্পময় চৈতন্যের স্পন্দন যে-ভাবে অভিব্যক্ত হয় সেই ভাবেই ঈশ্বর আত্মা তা দর্শন করেন। অর্থাৎ ঈশ্বর আত্মা নিজের মধ্যে নিজের সংকল্পময় সৃষ্টিকে স্বপ্নরূপে দর্শন করেন। চৈতন্যময় ঈশ্বরাত্মা যেমন আকাশবৎ তাঁর সংকল্প সৃষ্টি স্বপ্নও সেইরূপ আকাশবৎ। তাঁর জীবরূপ ধারণ ও তার অন্তরে বসে সংকল্প সৃষ্টি স্বপ্নদর্শন ও ভোগ সবই আকাশবৎ। ঈশ্বরের জগৎরূপ দর্শন হল চিন্ময় ও পূর্ণানন্দময় কারণ তা শুদ্ধ সত্যবোধে সত্যস্বভাবে সংকল্পিত ও অনুভূত হয়। অপর পক্ষে জীবের সংকল্পিত জগৎদর্শনরূপ স্বপ্ন অজ্ঞানমূলক ও দুঃখময় অথচ আনন্দশূন্য নয়। জীবের জগৎরূপ স্বপ্নদর্শনেও আনন্দ আছে। এই আনন্দ হল খণ্ড ও স্বল্প কারণ তা অজ্ঞান ও দুঃখমিশ্রিত। একমাত্র শুদ্ধচৈতন্যের আশ্রয়ে জীব তার এই অজ্ঞান ও নিরানন্দমূলক স্বকল্পিত জগৎরূপ স্বপ্নদর্শন হতে নিষ্কৃতি পায়।

ঈশ্বর বা আত্মা অকর্তা, অভোক্তা—শুধু সাক্ষী মাত্র

ঈশ্বর বা আত্মা নিজে কোন কর্ম করেন না। তাঁর প্রকৃতি কর্ম করে। সর্ব কর্ম সম্পন্ন করার জন্য ঈশ্বর, প্রকৃতি বা আত্মশক্তি নিজেকে বহুভাগে বিভক্ত করে প্রতি ভাগকে বিশেষ বিশেষ কর্মে নিযুক্ত রাখেন।

ব্রহ্ম গুণাতীত, ভাবাতীত, দ্বন্দ্বাতীত, ভেদাতীত

পরব্রহ্ম নিজে কিছু করেনও না এবং অপরকে দিয়েও করান না। তিনি নিত্যাদ্বৈত নিত্যসমরস স্বয়ংপূর্ণ স্বয়ংপ্রকাশ। তিনি আপনবক্ষে আপনবোধে আপনি আপন আনন্দে বিভোর থাকেন। কারণ তিনি স্বয়ং চিদানন্দস্বরূপ।

জাগ্রত কালে দৃশ্যাবলী অধিক কাল স্থায়ী এবং স্বপ্নকালে দৃশ্যাবলী স্বল্পকাল স্থায়ী। জাগ্রত অবস্থায় যা স্বল্পকাল স্থায়ী বলে অনুভূত হয় তা স্বপ্নতুল্য এবং স্বপ্নকালে যা দীর্ঘকাল স্থায়ী বলে অনুভূত হয় তা জাগ্রৎকালীন দৃশ্যতুল্য।

জ্ঞানীর লক্ষণ

জ্ঞানীর লক্ষ্য নির্বাণ ও মুক্তি। সে ঐশ্বর্য ও মাধুর্য উভয় ভাবেতে অনাসক্ত ও উদাসীনবৎ থাকে। সে সর্বপ্রকার মনোধর্মকে বিচারের দ্বারা বিলীন করে শুধুমাত্র বিশুদ্ধ চিৎস্বরূপে অবস্থান করে।

শুদ্ধ চিৎতত্ত্বের ভিন্ন ভিন্ন নাম

শুদ্ধ চিৎতত্ত্ব হল অখণ্ড ভূমা সচ্চিদানন্দসাগর। পরব্রহ্ম, পরমাত্মা, পরমেশ্বর, পরাকাল প্রভৃতি হল এর ভিন্ন ভিন্ন নাম। সচ্চিদানন্দসাগর বা আকাশ তার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশের অন্তর্গত ঈশ্বর আত্মা আপন ইচ্ছায় নিজ সংকল্পজাত জগৎ সৃষ্টির স্বপ্নবিলাস স্বভাবযোগে সদাই দর্শন করেন। এর আদি ও অন্ত নেই। তাঁর সংকল্পজাত জীবভাবের মধ্যেও সেইরূপ সংকল্পময় জগৎ সৃষ্টিরূপ স্বপ্নদর্শনবিলাস অসংখ্য ও অপরিমেয়। কিন্তু ঈশ্বরের জগৎদর্শনরূপ স্বপ্নবিলাস কল্প অবসানে বন্ধ হলে জীবন্মুক্তের স্বপ্নদর্শনও পরবর্তী কল্পসৃষ্টি পর্যন্ত বন্ধ থাকে। এ বিষয়ে বিশেষ জ্ঞাতব্য হল ঈশ্বরের অনন্ত সৃষ্টির অন্তর্গত কোন বিশেষ এক সৃষ্টির কল্প কল্পান্তরকেই এখানে উল্লেখ করা হল।

স্রষ্টা ও সৃষ্টির সম্বন্ধ

অন্তরের ভাব অনুরূপ কল্পনা ও সৃষ্টি হয়। সৃষ্টির সঙ্গে স্রষ্টার সম্বন্ধ হল দ্রষ্টা ও দৃশ্যরূপ সম্বন্ধ। কল্পনার অবসানে সৃষ্টিরূপ দৃশ্যের অবসান হয়। স্রষ্টার আপন সৃষ্টি আস্বাদনই হল দ্রষ্টার দৃশ্যরূপ স্বপ্নদর্শন। সমষ্টি চৈতন্য ঈশ্বরের স্বভাব সৃষ্টি স্বকল্পিত জগৎ স্বপ্নদর্শনের মত ব্যষ্টি চৈতন্যজীবেরও স্বকল্পিত জগৎস্বপ্ন দর্শন হয়। দৃশ্যের স্বরূপ যতদিন জীব যথার্থভাবে অবগত হতে না-পারে ততদিনই সে দৃশ্যের প্রভাবাধীন থাকে। স্বপ্নরূপ দৃশ্যের যথার্থ পরিচয় অবগত হলে দৃশ্যের প্রভাব আর থাকে না। অর্থাৎ মানস কল্পনার রহস্য অবগত হলেই জীব বিশুদ্ধ আত্মবোধে প্রতিষ্ঠিত হয়।

সর্ববিধ ভাবের সাধনার লক্ষ্য ও গতি হল সচ্চিদানন্দময় এক ব্রহ্ম আত্মা ঈশ্বর।

শুভাশুভ দর্শনের ফল

দর্শনের ফল শুভ ও অশুভ উভয়ই হতে পারে। শুভ ফলের লক্ষণ হল ভক্তি বিশ্বাসের বৃদ্ধি ও স্থিতি এবং অন্তঃপ্রকৃতির শোধন। অশুভ ফলের লক্ষণ হল সিদ্ধির অভিমান প্রভৃতি। গুণ অনুসারে ভাব ও অনুভূতির তারতম্য হয়। সত্ত্বগুণের আধিক্যে দিব্যভাবের বিকাশ হয়। তখন নানাবিধ দেবদেবী প্রভৃতির দর্শন হয়। শুদ্ধসত্ত্বগুণের আধিক্যে দর্শনের প্রভাব কমে যায়। তখন শুধু স্বানুভবরসাস্বাদন। এটা চরম অনুভূতির পর্যায়েই হয়ে থাকে। এ অতি দুর্লভ অবস্থা। অতি উচ্চকোটির সাধকদেরই এই অবস্থা হয়।

গৌণ ও মুখ্য প্রাণের বৈশিষ্ট্য

গৌণ প্রাণের কাজ হল জীবদেহের গঠন ও সর্ববিধ কর্ম নিষ্পন্ন করা এবং মুখ্য প্রাণের কাজ হল জীবচৈতন্যরূপে গৌণপ্রাণের দ্বারা নিষ্পন্ন সবকিছু আস্বাদন করা। উভয় প্রাণের গভীরে আছেন প্রাণের মূল স্বরূপ আত্মা। গৌণ প্রাণের প্রভাবে ইন্দ্রিয়বৃত্তি পরিচালিত হয় এবং মুখ্য প্রাণের প্রভাবে জীবলীলা আস্বাদিত হয়। আত্মার কাছে এই উভয়বিধ প্রাণের ক্রিয়াই হল স্বপ্নদর্শন।

পঞ্চপ্রাণের পরিচয়

পঞ্চপ্রাণের রূপ হল হৃদয়ে প্রাণ, নাভির নিম্নে অপান, নাভিতে সমান, সর্বাঙ্গে ব্যান এবং মস্তকে উদান। এই পঞ্চপ্রাণই হল পঞ্চবায়ু। এরা হল গৌণ প্রাণের পঞ্চবিভাগ। মুখ্য প্রাণের ভিন্ন ভিন্ন নাম হল অগ্নি, তেজ, তাপ, সংবেদন, স্বভাব, বেদস্বয়ং বিজ্ঞানাত্মা, জ্ঞানঘন মহাপ্রাণ ও সূত্রাত্মা। প্রাণের স্বরূপ অনন্ত ও বিশ্বব্যাপী। ব্যষ্টি প্রাণ এর অংশমাত্র। প্রাণের স্বরূপ অবিনাশী। গতিশীল অবস্থায় একে প্রাণ বলা হয় এবং স্থির অবস্থায় এরই নাম আত্মা। এই আত্মসত্তাই হল অনন্ত অখণ্ড সম্বিৎসাগর বা ভূমা বিশুদ্ধ চিৎসত্তা বা সম্বিৎসত্তা।

পঞ্চদেবতার বৈশিষ্ট্য

পঞ্চদেবতার অধীন হল সর্বদেবতা। অগ্নি দেবতাদের মধ্যে প্রধান। অগ্নি সর্বব্যাপী। অগ্নিদেবতার মাধ্যমেই সর্বদেবতাকে আহুতি দেওয়া হয়। বাক্ হল অগ্নিরূপ প্রাণের অভিব্যক্তি। অগ্নিরূপ ব্রহ্ম বা বাক্‌ব্রহ্ম অভেদ। বাকের মাধ্যমে সত্য অভিব্যক্ত হয় বলে বাক্ স্বভাবত সত্যময়। কামনা-বাসনা ও ব্যক্তিগত স্বার্থের দ্বারা বাক্ কলুষিত হলে সত্য আবৃত হয় বা সংকুচিত হয়ে প্রকাশ পায়। এই সংকুচিত বা বিকৃত সত্যের প্রকাশই হল মিথ্যা; অর্থাৎ আবরিত বিকৃত বাকই হল মিথ্যা। গোপন করা বা সংকোচন করা হল মিথ্যার স্বভাব। বাক্‌সংযমের

মাধ্যমে মিথ্যার প্রভাব কমে যায় এবং সত্যের প্রভাব বাড়ে। সত্যবাদিতাই হল মহান আদর্শ ও ধর্মের অন্যতম লক্ষণ।

ইচ্ছা ও কামনা মূলত এক। সমগ্র ইচ্ছা হল ঈশ্বরের অধীন এবং ব্যষ্টি ইচ্ছা বা কামনা হল জীবের অধীন।

দর্শনের বিজ্ঞান

দর্শনরূপ কার্যের কারণ সূক্ষ্ম। এ অতীত অতীত জন্মের চিন্তা ও কর্মের সূক্ষ্মবৃত্তি। অনন্ত বৃত্তি ও কামনার সমষ্টি হল মন। মনই দ্রষ্টা ও দৃশ্যরূপ ধারণ করে আপন সৃষ্টি আপনিই জগৎ ও স্বপ্ন অবস্থার মাধ্যমে অনুভব করে। গাঢ় নিদ্রার মধ্যে মন বিশ্রাম করে বলে সেখানে মন ও ইন্দ্রিয়ের কোন ক্রিয়া থাকে না। ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে মনের সৃষ্টিরূপ দর্শন হল চৈতন্যের জাগ্রত অবস্থা। ইন্দ্রিয় ব্যতীত শুধুমাত্র মন দ্বারা চৈতন্যের সংকল্পজাত সৃষ্টি দর্শন করা ও আস্বাদন করা হল চৈতন্যের স্বপ্নাবস্থা। স্বপ্নশূন্য নিদ্রা হল চৈতন্যের সুষুপ্তি অবস্থা। কার্যের বৃত্তি অপেক্ষা কারণের বৃত্তি সূক্ষ্ম ও ব্যাপক। ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি অপেক্ষা মনের বৃত্তি সূক্ষ্ম ও ব্যাপক। কার্যের পূর্বাবস্থা হল কারণ এবং পরবর্তী অবস্থা হল ক্রিয়া । কারণ ও ক্রিয়া উভয়েই পরস্পর অভেদ। পূর্ব পর্যায়ের কার্যই পরবর্তী পর্যায়ের কারণ হয়। এই কারণ ও কার্য হল ইচ্ছা বা কামনার দ্বিবিধ রূপ। সংকল্পময় ইচ্ছা কার্যে পরিণত হয় সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বর বা জীবন্মুক্তদের মধ্যে। কিন্তু সংস্কারবদ্ধ জীবের মধ্যে সংকল্প বা ইচ্ছামাত্র ভাব কার্যে পরিণত হয় না। তীব্র সংবেগের মাধ্যমে প্রচেষ্টার দ্বারা সংকল্প কার্যে পরিণত করতে হয় জীবের পক্ষে।

দেবদেবীদের পরিচয়

দেবদেবীগণ হলেন আত্মবোধের সাত্ত্বিক বৃত্তিসমূহ। এঁরা অন্তরে সুপ্ত থাকেন। সংস্কার অনুসারে সংকল্পের ধারা ধরে এঁরা স্বপ্নের মাধ্যমে অথবা ভাবাবস্থায় দর্শন দেন। দ্রষ্টা ও দৃশ্যভাব বিজ্ঞানাত্মার অন্তর্ভুক্ত। স্বপ্নদর্শন হল মনোময় পুরুষের বিশেষত্ব এবং ভাবমূর্তি দর্শন হল বিজ্ঞানময় পুরুষের বিশেষত্ব।

প্রবুদ্ধ আত্মার মাহাত্ম্য

প্রবুদ্ধ আত্মার স্বপ্নদর্শন হয় না। তাঁর দিব্যভাবের দর্শন হয় সমাধির মাধ্যমে; অর্থাৎ সংকল্পের বিষয় দর্শন হয় সমাধির মাধ্যমে। প্রবুদ্ধ আত্মার সংকল্প সাধারণ মানুষের কামনার মত নয়। এ সংকল্প নিষ্কামরূপ কামনা অর্থাৎ বিশুদ্ধ সংকল্প বা সত্য সংকল্প।

নিয়তির পরিচয়

জন্ম-জন্মান্তরের চিন্তা কামনা প্রার্থনা ইচ্ছা কর্ম অভিজ্ঞতার সূক্ষ্ম বৃত্তিগুলি চিত্তের মধ্যে সংস্কার রূপে সঞ্চিত থাকে। তাকেই কর্মফল, দৈব বা নিয়তি বলা হয়। এরই অংশবিশেষ ইচ্ছা ও কামনার মাত্রা অনুসারে কর্মফল আস্বাদন ও ভোগের নিমিত্ত জীবদেহ ধারণ করে ইচ্ছাপূরণের প্রচেষ্টায় অন্তরের স্বভাব অনুযায়ী আপনিই প্রকাশ পায়। একেই পুরুষকার বা প্রযত্ন বলে। সর্বকর্মের সূক্ষ্ম বৃত্তিই হল নিয়তি বা জগৎবিধায়িনী শক্তি। তার সমগ্র প্রচেষ্টার রূপ হল সমগ্র পুরুষকাররূপ আদিপুরুষ ব্রহ্মা বা হিরণ্যগর্ভ। ব্যষ্টি জীব হল সমষ্টি জীবরূপ হিরণ্যগর্ভের অবিচ্ছেদ্য অংশ। সেইজন্য জীবের মধ্যেও নিয়তি (দৈব) ও পুরুষকাররূপে স্বভাবপ্রকৃতি কারণ-কার্য ও কার্য-কারণ সম্বন্ধ ধরে অভিব্যক্ত হয়। অতীত অতীত সংস্কারের ভোগায়তন ক্ষেত্রই হল বর্তমান দেহ। ত্রিবিধ কর্ম হল প্রাক্তন, প্রারব্ধ ও সঞ্চিত। এদের পরিমাণ নির্ণয় করা খুব কঠিন। সামগ্রিক ভাবে কখনও এরা এক জীবনে রূপায়িত হয় না। এদের অংশবিশেষ হতেই জন্ম-জন্মান্তরের ভোগায়তন দেহ তৈরি হয়।

কর্মের ত্রিবিধ পরিচয়

বর্তমান জীবনের কর্মকে প্রারব্ধ কর্ম বা ক্রিয়মান কর্ম বলা হয়। এই কর্ম অতীত অতীত জীবন ও কর্মের ধারক ও বাহক এবং ভাবী জীবনের কারণ ও কারক।

চিত্তমূলে সংসার, সংসারমূলে চিত্ত

মনের কার্যাবলী স্বপ্নতুল্য বলে জাগ্রৎ অবস্থার সৃষ্টি ও অনুভূতিও স্বপ্নতুল্যই। জগৎ ও চিত্ত অভেদ। চিত্তবৃত্তির সমষ্টি হল সংসার; অর্থাৎ চিত্তই হল সংসার। জাগ্রৎ অবস্থা ও স্বপ্ন উভয়ই হল চিত্তের সৃষ্ট জগৎ। চিত্ত আপন সৃষ্টি আপনিই দর্শন করে। বৃত্তিময় চিত্ত হল সৃষ্টি ও ভোগ। চিত্তশূন্য অবস্থা হল মোক্ষ বা মুক্তি। গাঢ় নিদ্রা হল প্রলীন অবস্থা। একেই প্রকৃতিলয় বা স্বভাবলয় বলা হয়।

তুরীয়ের বৈশিষ্ট্য

সুষুপ্তি অবস্থায় জাগ্রৎ ও স্বপ্ন অবস্থা উভয়ই প্রলীন থাকে। কিন্তু এই তিন অবস্থার মধ্যে বিশুদ্ধ চৈতন্যময় আত্মা সাক্ষীরূপে সদা বর্তমান থাকে। চতুর্থ অবস্থা হল চৈতন্যের তুরীয় অবস্থা। এই অবস্থায় পূর্ব তিন অবস্থার কোন কার্য থাকে না। শুধু বিশুদ্ধ আত্মবোধই স্বতঃস্ফূর্ত থাকে।

সাক্ষী আত্মার পরিচয়

সাক্ষী আত্মার সর্বপর্যায়ের অনুভূতি স্মৃতিরূপে চিত্তের গভীরে যুক্ত থাকে। স্মৃতিশূন্য অনুভূতি এবং অনুভূতিশূন্য কোন স্মৃতি হয় না। চৈতন্য ছাড়া কোন স্মৃতি বা অনুভূতি কিছুই সম্ভব নয়, আবার অনুভূতি ও স্মৃতি ছাড়া চৈতন্যের কার্যও সম্ভব নয়। চৈতন্যময় সাক্ষী আত্মাকে বাদ দিয়ে কোন জিনিসের অনুভূতিই সম্ভব নয়। অনুভূতির সাক্ষী হল আত্মা। অর্থাৎ আত্মা হল স্বানুভবসিদ্ধ। সর্বব্যাপী আত্মা সর্ববিধ বিজ্ঞান বা মনের মানসক্রিয়ার নিত্যসাক্ষী। আত্মাকে বাদ দিয়ে মন ও বুদ্ধির অস্তিত্ব ও কর্ম কখনওই সম্ভব হয় না। যেখানে মন ও বুদ্ধি সক্রিয় সেখানে আত্মার উপস্থিতি প্রত্যক্ষ। মন বুদ্ধি ছাড়াও আত্মা সর্বব্যাপী স্বয়ংপ্রকাশ ও স্বমহিমায় নিত্য বর্তমান।

চিত্তের অশুদ্ধির কারণ

বস্তুজগতের প্রতি আসক্তি ও মোহ চিত্তের অশুদ্ধির কারণ। সুদীর্ঘকাল সৎচিন্তা ও ধর্মজীবনের আচরণের ফলে বস্তুজগতের প্রতি মোহ, আসক্তি ও আস্থা কমে যায়। তখন চিত্তবৃত্তি প্রশান্ত হয়ে আসে। চিত্ত প্রশান্ত হলেই স্বপ্নময় স্তর অতিক্রম করা সহজসাধ্য হয়।

যথার্থ ধর্মাচরণের লক্ষণ প্রশান্তচিত্ততা এবং প্রতিকূল ও অনুকূল উভয় অবস্থাতে নির্বিকার ও নিরুদ্বিগ্ন ভাব প্রভৃতি।

স্বপ্নদর্শন ও দিব্যদর্শন

স্বপ্নদর্শন ও দিব্যদর্শনের মধ্যে পার্থক্য আছে। স্বপ্নদর্শনের কারণ পূর্ব সঞ্চিত চিন্তা, কর্ম ও ঘটনার স্মৃতি বা সংস্কারের মিশ্রিত অথবা অমিশ্রিত ভাবের পুনরভ্যুদয়। দিব্যদর্শন হল দিব্যভাবের কৃপা, করুণা, আশিস্ ও শুভসূচনাজ্ঞাপক।

ধ্যানের বিজ্ঞান

ধ্যান করতে হয় হৃদয়ে বা মস্তকোপরি। হৃদয়ে ধ্যান হয় সগুণ ঈশ্বরের এবং মস্তকোপরি হয় নির্গুণ ঈশ্বরের।

বোধস্বরূপ হল আকাশবৎ। আকাশবৎ বোধের ধ্যানে আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হয়। সবই চৈতন্যময়, এইরূপ বিচার বা অনুশীলনের দ্বারা চৈতন্যময় ব্রহ্মাকারা বৃত্তি তৈরি হয়। তার মধ্যে মন লীন হয়ে গেলে ব্রহ্মবোধের প্রতিষ্ঠা হয়।

বিষয়বোধ ও আত্মবোধের পার্থক্য

সর্বরকম দৃশ্যই হল কল্পনাসম্ভূত। আত্মবোধের দৃষ্টিতে কল্পনাসম্ভূত দৃশ্য হল মিথ্যা।

মূর্তি ও বিগ্রহাদির তাৎপর্য

চৈতন্যময় ঈশ্বর আত্মার অভিব্যক্তির চতুর্বিধ রূপ হল—(১) বিগ্রহ, (২) মূর্তি, (৩) বিগ্রহ-সংযুক্ত মূর্তি ও (৪) লিঙ্গ, শিলা, ঘট, পট প্রভৃতি।

আত্মদৃষ্টি ও বৈচিত্র্যদৃষ্টি

সর্বপ্রকার রূপ নাম ভাবের মধ্যে আত্মচৈতন্যই স্বয়ং বিদ্যমান। বৈচিত্র্য হল চৈতন্যের লীলায়িত প্রকাশরূপ।

চিদাত্মার পরিচয়

চৈতন্যময় আত্মস্বরূপের সমগ্র প্রকাশই চৈতন্যময় ও সত্য। এই সর্বপ্রকাশ মিলেই অখণ্ড চৈতন্যের পূর্ণ বিগ্রহ বা স্বরূপ।

পরমার্থবিদ্যা

পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার সম্বন্ধ ভেদও নয় অভেদও নয় এবং ভেদাভেদও নয়। যেখানে জীবাত্মা সেখানেই পরমাত্মা, যেখানেই প্রকাশ সেখানেই প্রকাশক।

চিৎসত্তার চিদ্‌রূপতা স্বতঃসিদ্ধ

কল্পনাময় মনের শান্ত অবস্থাই হল মনের মৃত অবস্থা বা মুক্ত অবস্থা। আবার শান্ত চৈতন্যের বক্ষে কল্পনার উদয় হলেই জীবন ও বন্ধনের সৃষ্টি হয়। চৈতন্যময় আকাশের বক্ষে চৈতন্যময় আকাশই স্বভাবে নিজেকে প্রকাশ করে। সুতরাং চিৎসত্তার বক্ষে চৈতন্য ছাড়া কোন পৃথক পদার্থ বা সৃষ্টি সম্ভব নয়।

চিদাকাশে মনের বিলাসই হল জগৎ

চিদাকাশে বোধই ইচ্ছারূপে স্ফুরিত হয় যখন তাকে বলে মন। এই মনের স্ফুরণসমূহই হল জগৎ। সুতরাং জগৎ চিদাকাশ ভিন্ন অন্য কিছুই নয়।

চিদাকাশের স্তরবিন্যাস

জীবলোক হল প্রাণচৈতন্যের বহিঃস্পন্দনের স্তর, দেবলোক হল তার অন্তর স্পন্দনের স্তর এবং ঈশ্বরলোক হল তার অন্তরতম স্পন্দনের স্তর। প্রাণময় আকাশ হল জীবলোক, মনোময় আকাশ হল দেবলোক, বিজ্ঞানময় আকাশ হল ঈশ্বরলোক এবং প্রজ্ঞানময় আকাশ হল পরমেশ্বরলোক।

কর্মের বিজ্ঞান ও মুক্তির বিজ্ঞানের নির্দেশক

মহাপুরুষগণ মুক্তির বিজ্ঞান শিক্ষা দিয়ে যান। সিদ্ধপুরুষগণ কর্মের বিজ্ঞান শিক্ষা দিয়ে যান।

অহংকার ও তার শোধনবিজ্ঞান

অহংকার হল জীবভাব। অহংকার হল সংসার। অহংকার হল মনের কল্পিত রূপ। সুতরাং সংসার হল মনের কল্পিত রূপ।

পূজা-অর্চনা ও ধ্যান-ধারণা প্রভৃতির মাধ্যমে অহংকারের শোধন হন। জ্ঞানবিচারের মাধ্যমে মনের কল্পনা ও তার বীজ বিলীন হয়।

অহংকার অভিমান হল মনের ধর্ম। চৈতন্যময় আত্মাকাশে কল্পনার মাধ্যমে জাত হয়ে তা কল্পনাবিলাসে অবস্থান করে। আবার চিন্ময় আত্মাকাশে আপনাকে পূর্ণভাবে বিসর্জন দেওয়া বা নিবেদন করাই হল অহংকারের বিমুক্তি। [৩০।৬।৬৮]

তৃতীয় অধ্যায়

তত্ত্ব সংগ্রহ

যার যা আছে তা বাড়ানোই হচ্ছে জীবনের ধর্ম।

বৃহতের দিকে যতই এগিয়ে যাওয়া যায় ততই ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ হয়। ঈশ্বরের অভাব কোথাও নেই। মহতের মহত্ত্বই হচ্ছে ঈশ্বরীয় প্রকাশ। শক্তি জ্ঞান বাড়তে বাড়তে তার একটা সমান অবস্থা অ্যাসে এবং তার সমান ব্যবহারও আসে। এরই লক্ষণ equality and equanimity। অন্তরে বোধের সমতা ও স্থিতি হচ্ছে equanimity, বাইরে তার সমব্যবহার হচ্ছে equality।

বোধের চারটি অবস্থা—(১) রূপের বোধ, (২) ইন্দ্রিয়ের বোধ, (৩) ভাবের বোধ ও (৪) বোধের বোধ। এই সব কয়টাই অখণ্ড পূর্ণ আমি তথা বোধসত্তার চারটি পরস্পর সংযুক্ত প্রকাশ মাত্র।

ব্যষ্টি আমি ও সমষ্টি আমির লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য

নিম্ন প্রকৃতির দ্বারা প্রভাবান্বিত 'আমি' ঊর্ধ্ব প্রকৃতির দ্বারা প্রভাবান্বিত 'আমির' খবর জানে না, কিন্তু ঊর্ধ্ব প্রকৃতির দ্বারা প্রভাবান্বিত 'আমি' উভয় প্রকৃতির 'আমির' সম্বন্ধে সচেতন। সেই জন্য ছোট 'আমিকে' বৃহত্তর 'আমির' অধীন করে রাখতে হয়।

বুদ্ধি যদি তাঁর হয়ে যায় তখন সর্বোত্তম বোধের জ্যোতিতে (by the light of the supreme Consciousness) মানুষ আত্মবোধের অধিকারী হয়, তখন সকলের শুভবুদ্ধি আসে।

আত্মসমপর্ণের বৈশিষ্ট্য

ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ করা থাকলে মৃত্যুভয়ও থাকে না। মৃত্যু এলেও তাকে বরণ করে নেওয়া যায়। আত্মসমর্পণের জন্য কোন কঠিন নিয়ম পালনের দরকার হয় না। তাঁকে যে যতটা স্মরণ করবে তার ততটাই জমা থাকবে। তাঁর কাছে যতটা সমর্পণ করা যায় তার দশগুণ বেশি পাওয়া যায়।

ভক্ত ও ভগবানের সম্পর্ক

ভগবান ভক্তকে এত বেশি শক্তিমান করে দেন যা অভাবনীয়। ভক্ত এমন জিনিস পায় যা ভগবান ছাড়া আর কেউ দিতে পারে না। চৈতন্যের লীলার সময় নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপাতেই ভক্তদের ঈশ্বরীয় ভাব লাভ হয়েছিল।

ঈশ্বরের মহিমা সকলের কাছে বলে তাঁর হয়ে কাজ করলে তিনি প্রীত হন এবং পরিণামে সাধককে আপনার মধ্যে মিলিয়ে নেন অথবা সেই সাধকের মধ্যে তিনি পূর্ণভাবে অভিব্যক্ত হন।

শুভাশুভ কর্ম ও ফলের বৈশিষ্ট্য

অস্থির চঞ্চল লোক অহংকার নিয়ে জগতের যত কল্যাণই করতে থাক না কেন, তাতে কোন কাজ হয় না। তাঁর শুভ ইচ্ছা নিয়ে ছোট প্রতিষ্ঠান আরম্ভ করলেও সেই প্রতিষ্ঠান ক্রমে বড় হয়।

আত্মসমর্পণের পূর্বাবস্থা ও পরবর্তী অবস্থা

অহংকার দিয়ে আবৃত করে রাখলে অনন্ত অসীমের বোধটা স্মৃতিতে থাকে না। যারা অহংকার দিয়ে নিজেদের আবৃত করে রাখে তারা imperfect, তাদের 'আমিটা' ঈশ্বরের যন্ত্রমাত্র হয়ে গেলে তখন হবে perfect।

অহংকারের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ

অহংকারের কোন স্বাধীনতা নেই, কিন্তু তার স্বতন্ত্র ইচ্ছা বা চিন্তা করার সুযোগ আছে।

অহংকার দ্বারা শুধু বন্ধনের পর বন্ধনই সৃষ্টি হয়, কিন্তু বন্ধন মুক্ত হয় না। যত বেশি অহংকার অভিমান কমে, তত বেশি দুর্ভোগিও কমে।

জীবদৃষ্টি ও ঈশ্বরদৃষ্টির পার্থক্য

জীবনে উন্নতি করতে হলে দুঃখকষ্ট পাওয়া অতি আবশ্যক। সত্তার পূর্ণ মহিমা যেভাবে জীবনে অভিব্যক্ত এবং প্রকাশিত হতে চায় তার জন্য উপযুক্ত একটি আধার ঈশ্বরই তৈরি করে নেন।

ঈশ্বরের মত ভাল banker আর কেউ নেই। নিজের অহংকারকে এই bank-এ fixed deposit হিসাবে জমা দিলে তার আসল সুদ 'মুক্তি' পাওয়া যায়।

কখন যে জীবন শেষ হয়ে যাবে, কেউ জানে না। কাজেই ঈশ্বরের শরণ নেওয়া দরকার এই মুহূর্তেই। নদীর মধ্যে নাবিকহীন নৌকা যেমন বিপথগামী হয়, সেই রকম সাহায্য ছাড়া জীবনে চলতে গেলে পথভ্রষ্ট হতে হয়।

পূজা শব্দের তাৎপর্য

পুরোভাগে জাগ্রত হওয়া, পূর্ণ ভাবের মধ্যে জাত হওয়া বা পূর্ণতাকে জানাই হল পূজার উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য।

[১।৭।৬৮]

অখণ্ড সচ্চিদানন্দস্বরূপের অনুভূতির বৈশিষ্ট্য

এক অখণ্ড পরমাত্মার প্রকাশ সৎভাবে যোগীর কাছে, চিৎভাবে জ্ঞানীর কাছে এবং আনন্দভাবে ভক্তের কাছে প্রকাশিত হয়। কিন্তু সৎ-চিৎ-আনন্দ এই তিনটা যে একেরই প্রকাশ এটা যে মনে রাখতে পারে, সে সত্যের অখণ্ডতা থেকে বিচ্যুত হয় না কখনও।

ভাবের মাহাত্ম্য

অহংকারকে ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করে দেবার যে শক্তি তাকেই ভাব বলা হয়। এই ভাব ছাড়া ভক্তের রাগানুগাভক্তি কখনও সম্ভব নয়।

অহংকারকে কোন কিছু দ্বারা খর্বিত না করে মায়ের কাছে সঁপে দিতে হয়। তাহলে শান্তভাব আসে এবং মা স্বয়ং সেখানে অভিব্যক্ত হন।

শুদ্ধভাবের প্রকাশই হল সাত্ত্বিক বিকার

ভক্তের ভিতরে জাগ্রত বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা হলে তার লক্ষণ প্রকাশ পায় উন্নত ভাবের অভিব্যক্তি দ্বারা। এই অভিব্যক্তিগুলিকেই সাত্ত্বিক বিকার বলা হয়।

গুরু ও ইষ্ট অভিন্ন

ভক্তের সুবিধার জন্য ইষ্টই গুরুমূর্তিতে তার কাছে আসেন। ভিতর মহলে যিনি ইষ্ট, বার মহলে তিনিই গুরু।

ঈশ্বরের অভিব্যক্তি কর্তা, কর্ম, করণাদি

যে দেখে, যা দেখে, যা দিয়ে দেখে, দেখার ফলে যা হয় সবই ঈশ্বর বা মা। যে করে, যা করে, যা দিয়ে করে, এবং করার ফলে যা হয় সব মা। যে শোনে, যা শোনে, যা দিয়ে শোনে, এবং শোনার ফলে যা হয় সব মা। অর্থাৎ কর্তা, কর্ম, করণ এবং কর্মফল সবই ঈশ্বর বা মা।

সাধু বা মুক্তপুরুষের বৈশিষ্ট্য

বিশ্বাস বাড়াবার উপায়—বিশ্বাসী লোকের সঙ্গ করা। এঁরাই হলেন সাধু বা মুক্ত পুরুষ, যাঁদের 'আমার আমি' বোধ নেই। এঁদের কাছ থেকেই জগৎ সর্বাপেক্ষা উপকৃত হয়েছে।

তত্ত্বদৃষ্টি

দুর্ভোগ, পরাজয় প্রভৃতি আসে মানুষের ধৈর্য ও স্থৈর্য পরীক্ষার জন্য।

সমস্ত বস্তুকে যথার্থ ভাবে মর্যাদা দেওয়াকেই আত্মসমর্পণ করা বলে।

প্রত্যেকেই যে সর্ববস্তুর কাছে ঋণী এই বোধটা জাগলে ক্রমশ মানুষ নত হতে শেখে। 'অণু ভব'—তাহলেই হয় অনুভব। [২।৭।৬৮]

মহাপুরুষের মাধ্যমেই ঈশ্বরের করুণা লাভ হয়

জীবনে কোন মহাপুরুষের সঙ্গ করার সুযোগ পাওয়াই হল ঈশ্বরের করুণা লাভের প্রথম নিদর্শন।

জীবনের চরম উদ্দেশ্য ব্যষ্টি আমিকে সমষ্টি আমির সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া।

সদ্‌গুরুমাত্রই ভগবানের মূর্ত বিগ্রহ

সদ্‌গুরু বা সত্যদ্রষ্টা মহাপুরুষগণ ভগবানের মূর্ত বিগ্রহ। তাঁরা যা-কিছু করেন বা বলেন সবই সত্য। তাঁদের কাছে গেলে মাথা আপনিই নত হয়, চিত্ত শান্ত হয়।

'মেনে মানিয়ে চলা'র মাধ্যমেই আত্মসমর্পণ সিদ্ধ হয়

আত্মসমর্পণ বা সহজযোগে কারওর কিছু ছাড়তে হয় না, কিছু দিতে হয় না। প্রত্যেকেই যে পূর্ণ এটা শুধু মেনে নিতে হয়।

সংসারের গূঢ়ার্থ

সংসার মিথ্যা নয়, মায়া নয়। সংসারের আসল অর্থ হচ্ছে সম+সার; অর্থাৎ সমত্বই হচ্ছে সার। (Equality is the essence of all; 'I' exist equally in everybody, everything, everywhere.)

'সব' ও 'শবের' ভাবার্থ

যাকে ছোট বলা হয়, তার মধ্যেও এমন গুণ দেখা যায় যা সকলের মধ্যে দেখা যায় না। কাজেই সবারটা মিলিয়ে নিতে পারলে হয় সব, তা নইলে হয় 'শব'। 'সব' মানে শিব এবং 'শব' মানে মৃতদেহ।

ঈশ্বরের নিমিত্ত কর্মই হল চিত্তশুদ্ধি ও কর্মফলমুক্তির বিজ্ঞান

প্রীতির সঙ্গে ঈশ্বরের জন্য কর্ম করা হলেই হয় যথার্থ ব্যবহার। তাহলে কর্মফল আর স্পর্শ করে না। কার্যে বিফল হলেও কারওর কোন কষ্ট হয় না।

কর্মফল নিজের জন্য নয়, ঈশ্বরের জন্য। ঈশ্বরের প্রীতির জন্য কাজ করলেই নিষ্কাম কর্ম হয়।

আত্মসমর্পণের বিজ্ঞান

আত্মসমর্পণের পথে চলতে গেলে কারওর দোষক্রটি দেখা চলে না। কারও প্রতি বিরক্তি ভাব অথবা ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দ বজায় রাখতে চাইলে শুধু বিব্রত হতে হয়।

মৃত্যুর গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য

মৃত্যু, বৃহত্তর সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন। প্রত্যেকটি মৃত্যুই নূতন জন্মের ইঙ্গিত বহন করে।

মহাপুরুষের মাহাত্ম্য

ভিতরের বোধটা যাঁদের সংস্পর্শে জাগে তাঁরাই মহাপুরুষ। মহাপুরুষরা সকলকে প্রেরণা দিয়ে অন্তরের বোধটা জাগিয়ে দেন এবং অভয় করে দেন।

জীবনের চরম লক্ষ্য হল সসীমতাকে ছেড়ে অনন্ত অসীম-অস্মির দিকে এগিয়ে যাওয়া

শুধু নিজেকে সীমায়িত করে, সঙ্কুচিত করে ব্যক্তিবিশেষের প্রতি মায়া না-রেখে বিশ্বের সকলের প্রতি মায়া থাকা খারাপ নয়। সকলের জন্য প্রাণ দিতে পারাটা ঈশ্বরীয় প্রকাশের লক্ষণ।

সমগ্র বৈচিত্র্যের মধ্যে ঈশ্বররূপে আপনাকে আবিষ্কার করাই জীবনের চরম ও পরম প্রাপ্তি

সকলে অখণ্ড একের সঙ্গে নিত্য যুক্ত হয়েই আছে। জীবনের উদ্দেশ্য—এই নানাত্ব বহুত্বের মধ্যে থেকেও সেই অখণ্ড একককে উপলব্ধি করা।

বাড়ির কর্তার সঙ্গে অমিল হলে যেমন তাঁর সম্পত্তি পাবার আশা করা যায় না, সেইরকম ঈশ্বরকে না-মানলেও ঈশ্বরীয় গুণ প্রকাশ হবে এটা আশা করা যায় না। [৪।৭।৬৮]

অন্তরসত্তা ও বহিঃসত্তার বৈশিষ্ট্য

শারীরিক বিকার বা অসুখ—এটা অন্তরসত্তার কোন অবস্থা নয়, বহিঃসত্তার তরঙ্গ বিশেষ। অন্তরের স্থির ও শান্ত ভাবের সঙ্গে যুক্ত হতে না-পারলে বাইরের দ্বন্দ্ব বিরোধ বা অমিলের সমাধান হয় না।

ঈশ্বরকে ভালবাসার লক্ষণ

প্রশান্ত ভাব, সমবোধ, সমব্যবহার প্রভৃতি অভ্যাস (maintain) করার নাম হচ্ছে ঈশ্বরকে ভালবাসা।

ত্রিবিধ অধিকারীর বিশেষ লক্ষণ

শুনে আর দেখে যে শেখে সে উত্তম অধিকারী। ঠেকে যে শেখে সে মধ্যম অধিকারী। আর ঠেকেও যে শেখে না সে অধম অধিকারী। তাকেই নিম্ন অধিকারী বলা হয়। দেহের সুখ ও আরাম ছাড়া সে আর কিছুই জানে না।

বলা ও হওয়ার মধ্যে গভীর পার্থক্য

'সবই ভগবান' এটা মুখে বলা এবং প্রাণে ও বোধের মধ্যে অভেদে মিশে যাওয়া এদুটো এক কথা নয়। একটা হওয়ার পূর্বাবস্থা এবং আর একটা অভেদ পূর্ণ হওয়া।

ঈশ্বরই সর্ববস্তুর মূলে

ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে, শুধু ব্যক্তিত্ব কেন, কোন কিছুরই মূল্য নেই।

ভক্তের কাজ ক্ষুদ্র হলেও বিরাট

সংসারে বেশিরভাগ মানুষই অস্থির চঞ্চল হয়ে তাদের শক্তির অপব্যবহার করে। যথার্থভাবে তার ব্যবহার হলে অনেক বৃহৎ কাজ হয়। ঈশ্বরের যে ভক্ত, সে অন্তরের শক্তি দ্বারাই বিরাট কাজ করতে পারে এটা প্রত্যক্ষ।

দেশের নেতা হতে চাইলে, দেশভক্ত হতে চাইলে, অনন্ত অসীমের শরণ নিতে হয়, তবেই অনন্ত শক্তি পাওয়া যায়।

উত্তম ভক্তের বৈশিষ্ট্য

উত্তম ভক্তের দুঃখকষ্ট যেমন থাকে, সেটা সহ্য করার শক্তিও সেইরকম থাকে। সেইজন্য যত দুঃখকষ্টই আসে ভক্ত তা হাসিমুখে বরণ করে নেয়। এইরকম ভক্তকে স্মরণ করে অপরেও প্রেরণা পায় এবং ভক্ত হয়।

গুণভেদে ভক্তের লক্ষণ

শ্রেষ্ঠ ভক্ত সে-ই যার মধ্যে ভগবান স্বয়ং অভিব্যক্ত হয়ে কাজ করেন। মধ্যম শ্রেণীর ভক্ত নিজেই প্রাণবন্ত ও গতিশীল হয়ে কাজ করে। অধম শ্রেণীর ভক্ত মিনমিনে হয়ে থাকে।

ঈশ্বর আর দেবতার বৈশিষ্ট্য

ভিন্ন ভিন্ন দেবতাকে পূজা করলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। কিন্তু কেউ যদি ঈশ্বরকে ভজনা করে তাহলে সমস্ত দেবতাই তাকে সাহায্য করে।

শুভ সঙ্কল্পের তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য

শুভ সঙ্কল্প নিয়ে কোন কিছু আরম্ভ করলে হৃদয়ের একটা দরজা খুলে যায়। সঙ্কল্প=সম+কল্প। সম মানে সমতা বা সবই মা, সবই মাধব, সবই মহৎ, সবই মহেশ। কল্প মানে তাঁর শক্তি গতিশীল হয়ে যখন যে-রূপ ধারণ করে অর্থাৎ কখনও ব্যক্ত কখনও অব্যক্ত, কখনও সঙ্কুচিত, কখনও প্রসারিত।

জীবনের মূল লক্ষ্যের নির্দেশ

ব্যক্তিগত দেহ মন বুদ্ধির গুণ ও সামর্থ্যের দ্বারা পরিচালিত না হয়ে পরিপূর্ণভাবে দিব্যজ্ঞানে, ধীর স্থির প্রশান্ত ভাবে, সমদৃষ্টি ও সমজ্ঞানে, সদাপ্রীত মনে জীবন যাপন করাই জীবনের লক্ষ্য হওয়া চাই।

Not to move with personal ego sense, will, capacity and quality of physical, vital and mental power but to be moved and guided entirely by Divine Consciousness in calmness, quietness, equality, equanimity, silence and bliss.

অহংকারে নয়, ত্বংকারে আত্মসমর্পণ সিদ্ধ হয়

আত্মসমর্পণযোগের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—এতে অহংকার অভিমানের প্রাধান্য থাকে না। যেখানে অহংকার নেই, সেখানে তুমিময়। প্রত্যেকের জীবন যেন এই রকম হয়।

সর্বত্র ঈশ্বর দর্শনই জীবন লক্ষ্যের উদ্দেশ্য

জীবনে সমস্ত কর্মের মধ্যে ঈশ্বরের অভিব্যক্তি হওয়া চাই। তাঁর জন্যই যেন জীবন হয়; তাঁর জন্যই যেন সব চাওয়া হয়।

আত্মদান সম্পূর্ণ হলেই আত্মদর্শন হয়। শুধুমাত্র গ্রহণের দ্বারা জীবন সঙ্কুচিত হয়। আত্মদানের ফলে জীবন সম্প্রসারিত হয়। আত্মদানেই আত্মসিদ্ধি।

সত্যোপলব্ধির তাৎপর্য ও গুরুত্ব

সত্যোপলব্ধি বা ঈশ্বরোপলব্ধি হল ঈশ্বরের লীলাবিলাস বা খেলার তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করা। এই ঈশ্বরীয় খেলার তাৎপর্য বা প্রকৃতির অন্তর্নিহিত সত্যকে ভিন্ন ভিন্ন সাধক ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উপলব্ধি করেছেন।

ঈশ্বরীয় শক্তির ত্রিবিধ স্তর

ঈশ্বরীয় শক্তির তিনটি স্তর, যথা—(১) বাইরে মায়াশক্তি, (২) অন্তরে মহামায়া শক্তি এবং (৩) কেন্দ্রে যোগমায়া শক্তি।

শক্তির বহির্ভাগে মায়া, অন্তরে মহামায়া ও কেন্দ্রে যোগমায়ার খেলা

বাইরে মায়াশক্তির অন্তর্গত বস্তুজগতের সমস্ত জ্ঞান ও কর্ম ভগবতীলীলার বহির্বিন্যাস। এর গভীরে গেলে প্রাণশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এ স্বভাবের অন্তর্গত। অন্তরে বিশ্বমন ও তার কার্যাবলীর পরিচয় পাওয়া যায়। তা মহামায়ার শক্তি দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। তার গভীরে কেন্দ্রে গেলে মোহ-বন্ধন, নানাত্ব বহুত্ব, অজ্ঞানতা বা মৃত্যু থাকে না। সেখানে থাকে শুধু 'বিকারবিহীন পরিণাম'। এখানে শুধু যোগমায়াশক্তির প্রভাব।

কেন্দ্রে যোগমায়াশক্তির কাজ হচ্ছে ভাববিন্যাস। এখানে কোনরকম সাধনার প্রয়োজন হয় না। ভাবনা আপনিই চলে। সাধককে জ্ঞানের স্তরে আসা পর্য্যন্ত চেষ্টা করতে হয়। এই যোগমায়ার খবর সাধারণ মানুষ জানে না।

অহংকার শোধিত হলে ভাব-ভক্তির উদয় হয়

অহংকার বা নিম্ন প্রকৃতির প্রভাব থাকা পর্যন্ত ভক্তি বা ভাব জাগে না। সেইজন্য দেখা যায় বৃন্দাবনলীলাতে জ্ঞানের প্রভাব অপেক্ষা ভক্তি ও প্রেমভাবের প্রাধান্য অনেক বেশি। জ্ঞান প্রথমে ভাবের গুরুত্ব দেয় না। ভাব দেহ-মন-প্রাণ-বুদ্ধির মধ্যে মিশে আছে। ভক্ত তার নিজের আমিকে পূর্ণের সেবায় বিলিয়ে দেয়। এইরকম ভক্তের কাছেই ভাবের সন্ধান পাওয়া যায়। ভক্ত হয় ভাবতনু দিয়ে গড়া।

সৃষ্টিতত্ত্বের নিগূঢ় রহস্য

বহির্জগতের প্রকাশ ছন্দের মাধ্যমেই অভিব্যক্ত হয়েছে। যতরকম নামরূপের অভিব্যক্তি দেখা যায়, সবই ছন্দের এক একটি ঘনীভূত মূর্তি। ভাগবতে দেখা যায় শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হয়েছে ছন্দের মধ্য দিয়ে ঝুলতে ঝুলতে। এই হল ঝুলনের তাৎপর্য। Silence break করে প্রথম নাদব্রহ্মের সৃষ্টি এবং সেখান থেকেই এই বৈচিত্র্যময় বিশ্বরূপের সৃষ্টি হয়েছে এই ছন্দের মাধ্যমে।

ভাবের তাৎপর্য

ভাব হল এমন বস্তু যা সবকিছুকে সমসুরে মেলাতে পারে। তার এমন গতিশক্তি যে যত কাঠিন্যই থাকুক তাকেও দ্রবীভূত করে দিতে পারে। জানা-বোঝার অহংকার চলে গেলেই এই ভাবের প্রকাশ হওয়া সম্ভব।

শরণাগতির ফলশ্রুতি

সর্বতোভাবে যখন অহংকার চলে যায় এবং ঈশ্বরের কাছে কেউ শরণ নেয় ও তাঁকে ভালবাসে তখনই প্রেমস্বরূপ ঈশ্বর তার মধ্যে প্রকাশিত হন।

ভক্ত, জ্ঞানী ও যোগীর বৈশিষ্ট্য

ভক্তের কাছে ঈশ্বর হলেন প্রেমস্বরূপ, জ্ঞানীর কাছে জ্ঞানস্বরূপ। সেইজন্য জ্ঞানীরা হয় স্থির ও শান্ত। কিন্তু যোগীদের শক্তি থাকে বেশি। তারা সত্তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে সত্তার শক্তি উপলব্ধি বেশি করে এবং তার ব্যবহারও করে। ভক্তের সাহস বেশি হয়। শরণাগত ভক্তের প্রার্থনায় তার মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য ঈশ্বর ছোট হয়ে এসে ভক্তের কাছে ধরা দেন।

সিদ্ধমহাপুরুষের বৈশিষ্ট্য

ঈশ্বর যেমন নির্বিচারে সকলকে বক্ষে ধারণ করে আছেন সেইরকম অবতারকল্প সিদ্ধ মহাপুরুষগণও সকলকে সমানভাবে গ্রহণ করেন। তাঁরা কাউকেই বর্জন বা ত্যাগ করতে পারেন না। কাউকে ত্যাগ করলে ঈশ্বরকে খণ্ডিত করা হয়। ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দ দিয়ে বিচার করতে গেলে অনন্ত অসীমকেই সীমায়িত করা হয়।

অদ্বৈতবাদীর বৈশিষ্ট্য

জগৎকে জগৎবোধে না মেনে ব্রহ্মবোধে মানা এবং অনুভব করার নির্দেশ অদ্বৈতবাদীগণ দিয়ে থাকেন। এ সত্যানুভূতির সর্বোত্তম স্তরের কথা।

ঈশ্বর আত্মা ব্রহ্মই সত্য, আর সব তাঁর আভাসমাত্র

স্বয়ং ঈশ্বরই মানবের বেশে এসে জানিয়ে দিয়ে যান যে ভাল-মন্দ, পুণ্য-পাপ, ধর্ম-অধর্ম, অমৃত-মৃত্যু সবটার মধ্যে তিনিই রয়েছেন। প্রতিটি বিরুদ্ধভাবের দ্বন্দ্ব-বিরোধের মধ্যে এক ঈশ্বরই স্বয়ং বিদ্যমান। সর্বব্যাপী এক অখণ্ড নিত্যসত্য প্রকাশস্বরূপ হচ্ছে তাঁর পরিচয়।

অহংকারে বন্ধন ও মৃত্যু, অহংকারশূন্যতায় মুক্তি ও শান্তি

অহংকার অভিমান বজায় রেখে যত বড় জ্ঞানীই হোক কেউ সুখী হতে পারে না। সমস্ত কিছুকে স্বভাবে গ্রহণ করে অখণ্ড একের সঙ্গে যুক্ত হলেই একমাত্র শাশ্বত শান্তির অধিকারী হওয়া যায়। অহংকার অভিমান নিয়ে মানুষকে শুধু দুঃখভোগই করতে হয়। পূর্ণভাবে সমর্পণ হলেই শুধু তাঁর সঙ্গে মিলন সম্ভব হয়।

রাগে সৃষ্টি আর বিরাগে মুক্তি

আগুনে যত ঘি ঢালা যায় ততই আগুন বাড়ে। সেইরকম কামনা-বাসনার ইন্ধন জোগালেও কামনা-বাসনা বেড়েই চলে। যা কিছু জ্ঞান বিচার, সৌন্দর্য, শক্তি, অর্থ সব ঈশ্বরের জন্য। সব তাঁকে দিয়ে দিতে হয়, তবেই শান্তি। ঈশ্বরে পূর্ণ যুক্ত হলেই প্রেমানন্দঘন দিব্যজীবন লাভ হয়।

নিত্য স্মরণই হচ্ছে ঈশ্বরাত্মার শ্রেষ্ঠ সাধন

অখণ্ড নিত্য পূর্ণ ভগবানকে নিত্য স্মরণে রাখতে হয়। সর্বদা স্মরণ করতে হয় সর্বরূপ ঈশ্বরেরই এবং সবেতে ঈশ্বর স্বয়ং প্রকাশমান। যা-কিছু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু সবই ঈশ্বরমূর্তি, মাতৃমূর্তি। এইভাবে নিত্য স্মরণের দ্বারা ঈশ্বরের সঙ্গে নিত্য যুক্ত থাকা যায়।

পূর্ণ আত্মসমর্পণই হচ্ছে ঈশ্বরানুভূতির বৈশিষ্ট্য

মায়ের কাছে এমন ভাবে নিজেকে সঁপে দিতে হয় যেন তাঁর পূর্ণ অভিব্যক্তি প্রকাশ হতে পারে। এই ভাবে আত্মসমর্পণের ফলে মা বা ঈশ্বর তার মধ্যে পূর্ণভাবে প্রকাশিত হবার সুযোগ পান। তখন স্বয়ং ঈশ্বরই সেই দেহে প্রকাশ হয়ে লীলা করে যান। তাঁকেই তখন মহামানব বলা হয়। এইরকম মহামানবের কাছে সবই ব্রহ্ম-আত্মা-ঈশ্বর। এঁদের সঙ্গ করে এবং এঁদের কথা শুনলে অন্য সকলেরও ঈশ্বরীয় ভাব জাগ্রত হতে পারে।

জীববোধে অহংকার, শিববোধে ঈশ্বরাত্মা সবার

পূর্ণভাবে সমর্পণ না হলে জীবনের দুঃখকষ্ট দূর হয় না। সৎপ্রসঙ্গ ও ঈশ্বরপ্রসঙ্গ শুনে প্রত্যেকের অন্তরকে সমসুরে বেঁধে নিতে হয়। ঈশ্বর সর্বত্রই আছেন। অহংকার অভিমান দ্বারা পছন্দ অপছন্দ ভালমন্দ বিচার করে নিজেদের সংকুচিত করা হয় মাত্র। ঈশ্বরের পরিচয় সত্য, শিব ও সুন্দর। কাজেই প্রত্যেকেরই এই গুণগুলি অর্জন করে তাঁর সেবা করে যেতে হয়।

অসৎসঙ্গ ও সৎসঙ্গের বৈশিষ্ট্য

কামনা-বাসনার জন্যই মানুষের মন এত চঞ্চল হয়। কামনা-বাসনা ও চঞ্চলতা থাকা পর্যন্ত ঈশ্বরীয় শান্ত সুন্দর ভাব অনুভব করা যায় না। যারা ধীর-স্থির প্রাজ্ঞ ব্যক্তির সঙ্গ না করে তার বিপরীত সঙ্গ করে, তাদের শুধু উত্তেজনা ও চঞ্চলতাই বৃদ্ধি হয়।

দুঃখকষ্টের মাধ্যমে ভক্তের পরীক্ষা হয় ও মুক্তের না-পাওয়া সিদ্ধ হয়

শরণাগত সাধকের কাছে চরমতম দুঃখকষ্টও উপস্থিত হয় তার ধৈর্য ও বিশ্বাসের পরীক্ষার জন্য। বন্ধনহীন মুক্ত সাধকের কাছে কিছু পাওয়ার চাইতে না-পাওয়াটাই অধিক শ্রেয়। অহংকার অভিমানের প্রাধান্য থাকা পর্যন্ত এই ভাবটা আসে না।

শান্ত ভাব দিয়ে ঈশ্বরীয় সাধনা শুরু হয় ও সমশান্ত বোধে তার পরিণাম সিদ্ধ হয়

ঈশ্বরকে ভালবাসতে গেলে সর্বপ্রথম চিত্তের শান্ত অবস্থাটা বজায় রাখতে হয়। অন্তরে ঈশ্বরীয় ভাব যুক্ত হয়ে গেলে সহজেই বাইরেও তদ্ভাবে যুক্ত থাকা যায়। সৎসঙ্গের থেকেই সবচেয়ে বেশি উপকার পাওয়া যায়। ঈশ্বরকে সমবোধে সবকিছুতে নিত্য মানতে পারলে মন্ত্র প্রভৃতি বা কঠিন কোন রকম সাধন পদ্ধতির আর প্রয়োজন থাকে না।

চাওয়া দিয়ে জীবন শুরু, কেবল সাক্ষীরূপে চেয়ে-দেখা দিয়ে তার শেষ

সকলের জীবনেই চাওয়া পাওয়া প্রথম থাকে। কিন্তু সৎসঙ্গের মাধ্যমে এসে এই চাওয়াগুলি ক্রমশ শোধন করে নিতে হয়। ভগবানকে ভালবাসতে হলে বাইরে কোথাও যেতে হয় না। বাড়িতে নিজের মা ও বাবাকে দিয়েই প্রথম শুরু করতে হয়।

অ-মানীকে মান দিলেই ভক্তিরাজ্যে প্রবেশ করা যায়

মানুষকে উপেক্ষা করে, জীবনকে অবহেলা করে কল্পিত ঈশ্বরের পিছনে ছুটে লাভ হয় না। সেইজন্য চৈতন্যদেব অ-মানীকেও মান দিতে বলেছিলেন।

পিতামাতাকে না মেনে ঈশ্বরকে মানা যায় না

আগে মা-বাবা, পরে প্রতিবেশী এবং তারপরে দেশকে ভালবাসতে হয়। মা-বাবাকে ভাল না বাসলে দেশকে ভালবাসা যায় না। পিতামাতাকে অশ্রদ্ধা করে জীবনে কেউই মহৎ হতে পারে না। সবাইকে ভালবাসতে হয়। অহংকার পুষ্ট হলে পূর্ণতা লাভ কঠিন হয়। অহংকারের কাজই হল অপরের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা ও তাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা।

প্রশান্ত হৃদয়ে মহাপুরুষগণ ঈশ্বরের বাণী শ্রবণ করেন ও তাঁর রূপ দর্শন করেন

মহাপুরুষগণ সর্ব অবস্থাতেই একটা প্রশান্ত অবস্থার মধ্যে থাকেন। এইরকম প্রশান্ত অবস্থার মধ্যে থাকলেই স্ব-হৃদয়ে ঈশ্বরের বাণী শুনতে পাওয়া যায়। ঈশ্বরই সকলের প্রভু, আর কেউ নয়।

বাইরে বহু প্রকাশ, অন্তরে তাঁর এক নির্যাস

ভগবৎ প্রসঙ্গ শুনতে শুনতেই ঈশ্বরীয় ভাবের প্রকাশ হয়। বাইরে বহু প্রকাশ থাকলেও অন্তরে একজনই আছেন। ঈশ্বর প্রত্যেকটি প্রকাশের মধ্যে সমভাবে আছেন। আকাশকে যেমন ভাগ করা যায় না, সেইরকম ঈশ্বরীয় সত্তাকেও ভাগ করা যায় না।

চাওয়াতে অপূর্ণতা, না-চাওয়াতে পূর্ণতা

সেই সবচেয়ে বড় ভক্ত যে কিছু চায় না। সে শুধু দিতে পারে। মহতের সেবা করতে হয়। তাহলেই মহতের কৃপায় মহৎ হওয়া যায়।

'সমস্ত প্রকৃতি তাঁর পায়ে
আপনারে সদা আহুতি দেয়।'

এই বিরাট সৌরমণ্ডল এবং সমগ্র প্রাকৃত জগৎ নিত্য ঈশ্বরেরই সেবা করে চলেছে।

চাওয়া-পাওয়ার তাৎপর্য

মানুষের মধ্যে চাওয়ার স্বাধীন ইচ্ছা আছে, কিন্তু পাওয়া বা হওয়া ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন। মানুষ অসৎ হতে চাইলে অসৎ হতে পারে এবং সৎ হতে চাইলে সৎ হতেও পারে। দুটোর মধ্যে একটা পথ বেছে নিতে পারে।

সর্ব বিকল্পের মধ্যে নির্বিকল্পকে আবিষ্কার করাই হল পরম পুরুষার্থ

সর্বদা সবকিছুর মধ্যে সমবোধে ঈশ্বর বা মাকে মেনে নিয়ে চললে অতি কুৎসিৎ জিনিসের মধ্যেও সৌন্দর্য, মৃত্যুর মধ্যে অমৃত, অজ্ঞানের মধ্যে জ্ঞান, জড়ের মধ্যে চেতনা, নিজের মধ্যে ঈশ্বরকে, ঈশ্বরের মধ্যে নিজেকে, বহুর মধ্যে এককে এবং অন্তরে বাইরে অখণ্ডবোধে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা যায়। তখন সবকিছুই মাতৃময় বা ঈশ্বরময় হয়ে যায়।

সবকিছুর মধ্যে মা কে জানা-ই হল সর্বোত্তম জানা

সর্বত্র সবকিছুর মধ্যে মা-ই বিরাজ করছেন। সকলের প্রতি সর্বদা তাঁর সজাগ দৃষ্টি আছে। প্রত্যেকের নিদ্রিত অবস্থাতে মা-ই রক্ষা করেন সকলকে। কাজেই মায়ের কাছে প্রার্থনা করা দরকার যেন নয়ন দিয়ে কুদৃশ্য দেখতে না হয়, কর্ণে যেন কুশ্রবণ না হয়, পঞ্চেন্দ্রিয় যেন ঈশ্বরীয় কর্মই হয়। সন্তানকে পূর্ণ করে নেবার জন্য এইভাবে মায়ের কাছে প্রার্থনা করতে হয়।

অহংকারের উৎকর্ষই পুরুষকার, পুরুষকারের পরিণামে পরমার্থ সিদ্ধি

অহংকার শুধু প্রলোভন দেখায়, সৎসঙ্গে যেতে বাধা দেয়। অহংকার থাকলেই পুরুষকার থাকবে। এই পুরুষকার দিয়ে শুধু ঈশ্বরের সেবা করে যেতে হয়। [৬।৭।৬৮]

সমগ্র বিশ্বই মাতৃবিগ্রহ

মহাপ্রাণরূপী মায়ের বাইরে কেউ যেতে পারে না। মা সকলকে নিজের বক্ষে রেখেই সকল রকম পুষ্টি দিয়ে পূর্ণতার দিকে নিয়ে চলেছেন। বিশ্বটা হল মায়ের মূর্ত বিগ্রহ।

মায়ের আসল জিনিস হল মায়ের স্থির প্রশান্ত ভাবটি। এই বিশ্বচক্র চালাচ্ছেন অথচ তিনি স্থির। সেইজন্যই পূর্ণ। মায়ের কথা স্মরণ মাত্রই স্বহৃদয়ে মায়ের আবির্ভাব হয়। মায়ের একটা মাত্র রূপ নয়, সর্বরূপই মায়ের রূপ। সর্বরূপ, সর্বনাম, সর্বভাব, সর্ববোধ মিশে মায়ের পূর্ণ স্বরূপ।

কর্ম রহস্য

কর্মে একনিষ্ঠতা এবং একনিষ্ঠ কর্ম (Silence in action and action in Silence)—এটাই হচ্ছে কর্মের রহস্য।

পূর্ণতার সর্বোত্তম মান

ব্যষ্টি জীবনের পূর্ণতাই পূর্ণতার সর্বোত্তম মান নয়। এ-ও স্বার্থপরতার অন্তর্ভুক্ত। অহংকার অভিমান পরিপূর্ণ ভাবে চলে গেলে হয় সমষ্টির পূর্ণতা। এ-ই পূর্ণতার সর্বোত্তম মান।

'আমার আমি' বোধ থেকে সকলকে 'আমিত্বের আমি'-র বোধে যেতে হবে।

ঈশ্বর অদ্বৈত ও মুক্ত

ঈশ্বরই শুধু আছেন। ঈশ্বরের সঙ্গে মিশে যাওয়া যায়, কিন্তু দ্বিতীয় আর একজন ঈশ্বর হওয়া যায় না।

বৈষ্ণবের পরিচয়

ভগবানের নাম যে নেয়, সে-ই বৈষ্ণব। তাঁকে যে প্রাণমন সঁপে দিয়েছে সে-ই বৈষ্ণব। বিষ্ণু ব্যাপ্তার্থে সর্বব্যাপী, অর্থাৎ সর্বব্যাপী ভগবানকে বিষ্ণু বলা হয়। এই বিষ্ণুর যে ভক্ত তাঁকে বৈষ্ণব বলা হয়।

ভাবভক্তির তাৎপর্য

ভাববিহীন ভক্তি সম্ভব নয়, ভাবের আতিশয্য বা পরিণাম থেকেই প্রেমাশ্রু আসে। ভাব ঘনীভূত হয়ে মহাভাব এবং মহাভাবের মাধ্যমেই ঈশ্বরীয় মহিমা বা চৈতন্যস্বরূপের প্রকাশ হয়। [৭।৭।৬৮]

আন্তরিকতার বৈশিষ্ট্য

দেহ প্রাণ মন বুদ্ধি দিয়ে আন্তরিকভাবে চাইলে সবরকম সমস্যারই একটা সমাধান মেলে।

যথার্থ ব্যবহারের গুরুত্ব

সব জিনিসের যথার্থ ব্যবহার আগে শিখতে হয়। এটাই হল ধর্ম। সবকিছুর যথার্থ ব্যবহার দ্বারাই জীবনে ব্যাপকভাবে উন্নতি করা সম্ভব এবং শান্তিতে থাকা সম্ভব।

অহিংসার মাহাত্ম্য

অহিংসা দুর্বলের ধর্ম নয়, হিংসা দ্বারা কেউ কখনও সবল হতে পারে না।

মহতের বৈশিষ্ট্য

যারা দিতে পারে তারাই মহৎ। আত্মদান করা মহৎ গুণ। পূর্ণ হতে চাইলে বিনা শর্তে অপরকে শুধু দিয়ে যেতে হয়। নিজেকে দিতে পারা ঈশ্বরীয় গুণ।

সত্যের মহিমা

সত্যই হচ্ছে সকলের চিরস্থায়ী আশ্রয়। শাশ্বত শান্তি লাভের জন্য এই স্থিতি বা আশ্রয়টিই সকলের সর্বপ্রথম দরকার।

দার্শনিকদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির বৈশিষ্ট্য

দার্শনিক বিজ্ঞানীর সত্য উপলব্ধি বস্তুসাপেক্ষ। কিন্তু দার্শনিক কবি বস্তু ও জীবনের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যের প্রতি অধিক আকৃষ্ট। দার্শনিক বিজ্ঞানীদের অধিকাংশই জ্ঞানরসের অধিকারী কিন্তু দার্শনিক কবিগণ ভক্তি ও প্রেমের অধিকারী।

আত্মজ্ঞান, আত্মনীতিই যথার্থ রাজনীতি[১]

যথার্থ রাজনীতি অর্থ আত্মজ্ঞান, আত্মনীতি। কারণ আত্মজ্ঞান লাভ হলেই ঈশ্বরজ্ঞানে তথা আপনবোধে সকলের সেবা করা সম্ভব হয়।

বর্তমান রাজনীতি আত্মনীতির পরিপন্থী

সমাজের নেতাদের নিবেদিত জীবন হওয়া দরকার। তাদের আত্মদানের পরিণামে দেশের ও দশের যথার্থ কল্যাণ সাধিত হতে পারে।

'দিয়ে হয় দেবতা, নিয়ে হয় নেতা'[২]

ঈশ্বরকে ভাল না-বাসলে নিঃস্বার্থ হওয়া যায় না। আবার নিঃস্বার্থ না-হলেও ঈশ্বরকে ভালবাসা যায় না। সব বিলিয়ে দিয়েই হয় ঈশ্বর। 'দিয়ে হয় দেবতা, নিয়ে হয় নেতা।' [১০-১১।৭।৬৮]

তত্ত্ব লহরী

সর্ববস্তুর সঙ্গে প্রত্যেকের কী সম্পর্ক সেটা জানা হলে ঈশ্বরীয় লীলার তাৎপর্য বোঝা যায়।

একটি সুতো দ্বারাই মালার মণিগুলো যেমন গাঁথা থাকে, তেমন চিৎ ও প্রেমের সূত্রে জগতের প্রতিটি প্রকাশ গ্রথিত আছে। প্রত্যেকের ভিতরেই অস্তিত্বসত্তারূপে তা সমভাবে যুক্ত আছে।

বহিঃপ্রকৃতি একটা সুনির্দিষ্ট গতিতে চলেছে, ঈশ্বরীয় শক্তির প্রভাবেই। প্রেমের আকর্ষণে বহির্জগতের সবকিছু পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে শুধু। অখণ্ড চৈতন্যসত্তার সঙ্গে মিলন হলেই সত্যের কথা বলা চলে। ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হলেই শুধু যুক্তি আসে। আসল যুক্তি[৩] আসে সকল বস্তুর সঙ্গে যখন আপনবোধে সম্বন্ধ স্থাপন হয়।

ভাব মানে প্রীতি, আনন্দ ও মধুর সম্পর্ক। ভাবশূন্যতাকে বলে অভাব। এই অভাবের প্রকাশ দুই প্রকার—আবির্ভাব ও তিরোভাব।

১। স্বানুভূতির দৃষ্টিতে। ২। অভিনব সংজ্ঞা। ৩। আত্মবোধের দৃষ্টিতে।

অখণ্ড একের মধ্যে স্বভাববোধে লীলামানসে বৈচিত্র্যের অভিব্যক্তিকে আবির্ভাব বলে। আবির্ভাবের বৈচিত্র্যে একত্বের ও সমত্বের অভাব থাকে।

বৈচিত্র্যময় আবির্ভাবের যখন সমগতি বা বিলুপ্তি ঘটে, অর্থাৎ নানাত্ব বহুত্ব যখন একত্বে পরিণত হয়, তখন বহুর তিরোভাব হয় অর্থাৎ বহুত্বের অভাব হয়।

স্ববোধ আত্মাই হচ্ছে পূর্ণ আমি—সচ্চিদানন্দস্বরূপ, সমগ্র শক্তি, জ্ঞান ও আনন্দের ঘনীভূত রূপ।

যে জ্ঞানের জ্ঞান অর্থাৎ প্রজ্ঞান অবগত হয়েছে, তাঁকেই বলে তত্ত্ববিৎ[১]।

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনগুণের সাহায্যেই ত্রিগুণা প্রকৃতি খেলে চলেছে।

সত্ত্বগুণের লক্ষণ হচ্ছে সমতা, প্রকাশ, জ্ঞান ইত্যাদি; রজোগুণের লক্ষণ অহংকার অভিমানযুক্ত ক্রিয়াশক্তি ও বিক্ষেপশক্তি এবং তমোগুণের লক্ষণ হল জড়তা, অলসতা, নিদ্রা, আবরণশক্তি।

আমিসত্তা হচ্ছে জীবাত্মা ও পরমাত্মা। 'আমারবোধে' 'আমিবোধ' আবৃত থাকে। আবার 'আমিবোধে' 'আমারবোধের' অভাব থাকে।

শ্রদ্ধাভক্তি-বিশ্বাসহীন জীবনে 'আমারবোধ' প্রধান থাকে। এই 'আমার বোধ'-যুক্ত জ্ঞান ও কর্ম যোগও ভক্তিশূন্য। তার ফলে হয় জীবনবন্ধন। 'আমার বোধ' চলে গেলেই হয় মুক্তি।

শ্রদ্ধা-ভক্তি-বিশ্বাসের অনুশীলন দ্বারা জ্ঞান ও কর্ম, যোগ ও ভক্তি যুক্ত হয়। তার ফলে 'আমারবোধ' কমে যায় এবং 'আমিবোধ' বেড়ে যায়।

'আমার বোধ'-শূন্য পূর্ণ আমিবোধে 'পরমহংস' অবস্থা এবং স্বল্পমাত্র 'আমার বোধ'-যুক্ত শুদ্ধ আমির বোধে 'হংসঃ সোহম্' অবস্থা।

'তুমি ও আমি' সমানবোধে যোগযুক্ত, মুক্ত, জ্ঞানী ও যোগীর অবস্থা।

'তুমি তোমার' বোধপ্রধান 'আমি'-বোধে উত্তম ভাগবৎজীবন তথা ভক্তজীবন এবং 'আমি তুমি' বোধশূন্য কৈবল্য অবস্থা।

'আমার বোধ'-যুক্ত আমি দুঃখ ভোগ করে। 'আমি বোধে' আমি নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত। এই মুক্ত আমি সুখ-দুঃখে থেকেও সুখদুঃখ ভোগ করে না। সে-ই সব হয়েছে, অথচ কোন কিছুর দ্বারা বিব্রত নয়।

নানাত্ব বহুত্ব ও 'আমার বোধের' প্রভাব থাকে নিম্নপ্রকৃতির উপরে। উর্ধ্বপ্রকৃতির মধ্যে শুদ্ধ আমির প্রকাশ হয়। তৃষ্ণাই সকলকে বহির্মুখী করে দেয়। ভোগের গতি বহির্মুখী, ত্যাগের গতি অন্তর্মুখী। Maniness or My-ness is the influence of lower nature, 'I-ness' is the Lord of upper nature.

জানার চেষ্টা ত্যাগ করে মানার চেষ্টা দ্বারা ঈশ্বরের উপর পূর্ণ বিশ্বাসে নির্ভরশীল হওয়াই আত্মসমর্পণের সাধনা[২]।

জগতের কর্তা-ভোক্তা-জ্ঞাতা-দ্রষ্টা এক ঈশ্বরই। মানুষ ভাবে সে দুঃখকষ্ট ভোগ করে, কিন্তু আসলে মা-ই দুঃখকষ্ট ভোগ করছেন।

God is the only doer (Creator), enjoyer, knower and witness seer of all.

কারওর দেহ প্রাণ মন নিজের বশে নেই, অথচ সকলে বলে—'আমার দেহ', 'আমার মন' ইত্যাদি। এই ভুলকেই মোহ অজ্ঞান বলা হয়। 'পূর্ণ আমি' বোধে শিব এবং পূর্ণ 'আমার বোধে' পার্বতী মাতা। এটাই সত্তা-শক্তির খেলা।

Absolute I-ness is Lord or God. Absolute 'Thyness' is Parvati—Divine Mother.

১। স্বানুভূতির দৃষ্টিতে। ২। তত্ত্বের দৃষ্টিতে।

'আমার বোধ' মানুষের চরম শত্রু ও মৃত্যুর কারণ। অর্থাৎ অজ্ঞানতাই মৃত্যু। তাকে জয় করা মানে জ্ঞানস্বরূপ শিব ও শক্তির সেবা করা। অসতের থেকে সৎ-এ যাওয়া তমঃ (অন্ধকার) থেকে জ্যোতিতে যাওয়া, মৃত্যু থেকে অমৃতে যাওয়া—শুধু তাঁর কৃপাতেই হওয়া সম্ভব।

প্রেম স্বয়ংসম্পূর্ণ, সর্বশক্তিসম্পন্ন। ঈশ্বর প্রেমস্বরূপ। তিনি শুধু দিয়েই যাচ্ছেন অনন্তকাল। আপনাকে বিলিয়ে দেওয়া অর্থাৎ স্ব-বোধে বিস্তারই তাঁর সর্বোত্তম মহিমা। [১২।৭।৬৮]

স্বতঃসিদ্ধ স্বতঃস্ফূর্ত ঈশ্বরের মহিমাও স্বতঃসিদ্ধ

ভগবৎ মহিমা প্রত্যেকের কাছে তার স্বভাব অনুযায়ী ধরা পড়ে। সেজন্য কারও কাছে শক্তিরূপে, কারও কাছে জ্ঞানরূপে, কারও কাছে আনন্দরূপে এবং কারও কাছে প্রেমরূপে তিনি প্রকাশিত হন। তাঁর অনন্ত রূপ, অনন্ত নাম ও অনন্ত ভাব।

ঈশ্বরকে কারওর প্রয়োজন নেই, এই কথা বলে রেহাই পাওয়া যায় না। কারণ মানুষের যা-কিছু প্রয়োজন, সেটা যেখান হতে যেভাবে মেটে তার মধ্যে ঈশ্বরই বিদ্যমান। কেবলমাত্র ঈশ্বরের বদলে ভিন্ন শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

ঈশ্বরকে মেনে অথবা না-মেনে যে যে-ভাবেই চলে, সকলে পরিণতির দিকেই এগিয়ে চলেছে, তবে মানিয়ে চলতে পারলে জীবন সুখকর হয়, না পারলেই অশান্তি।

ঈশ্বরীয় বোধের স্মৃতির তারতম্য অনুসারে মানুষের অনুভূতি হয়

যে যে খানেই বাস করে, সত্তা বা ঈশ্বরের মধ্যেই বাস করে; কিন্তু ঈশ্বরীয় বোধের স্মৃতির অভাবে অনুভূতির তারতম্য হয়।

জগতের পরিচয় মন বুদ্ধি দিয়ে হয় না, আত্মার পরিচয় কেবল আত্মবোধে হয়

একটা জনমই মানুষের শেষ নয়। অনাদিকাল ধরে জীবনের যাত্রা শুরু হয়েছে এবং অনন্তকালই চলবে। এই জন্মমৃত্যুর রহস্য শুধু বুদ্ধির সাহায্যে মানুষ জানতে পারে না। মানুষের বুদ্ধির বিচার সমুদ্রের তরঙ্গের মত ওঠে আর নামে।

যতক্ষণ পর্যন্ত মন বৃহতের দিকে, ব্যাপকতার দিকে না যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত মন অশান্ত থাকে ও অল্পতেই পীড়িত হয়।

নিজে শান্তিলাভ করতে গিয়ে অন্যের অসুবিধা করা চলে না।

সর্বোত্তম উন্নতির কারণ

সর্বোত্তম উন্নতির জন্য সামগ্রিকভাবে মন প্রাণ বুদ্ধির ব্যাপক সম্প্রসারণ দরকার।

(For the highest progress in life a greater dynamic speed is required. It brings total and integral expansion of vital, mental and intellectual being.)

উত্তম ভক্তের বৈশিষ্ট্য

উত্তম ভক্ত হওয়া বড় কঠিন। কারও ভাব নষ্ট না-করে যে সকলের সঙ্গে মিলতে পারে সে-ই হচ্ছে আসল ভক্ত।

আপনবোধই ঈশ্বরের প্রকাশমাধ্যম

ঈশ্বরের সঙ্গে আপনবোধে যার সম্পর্ক হয়, তার মধ্যে ঈশ্বরের সব মহিমা প্রকাশিত হয়। ঈশ্বরের নাম, ঈশ্বরের মহিমা নিয়ে যে থাকে, সে-ই ভক্ত।

ঈশ্বরবোধ ঈশ্বরভাবনার মাধ্যমেই হয়

চিন্তার মধ্যে ঈশ্বর স্বয়ং না এলে, তাঁকে কেউ চিন্তাও করতে পারে না। তাঁর চিন্তা মনে জাগ্রত হওয়া মানে—হৃদয়ে তাঁর আবির্ভাব বা প্রকাশ হওয়া।

জীবের পক্ষে ঈশ্বরের শরণাগতিই হল শ্রেষ্ঠ উপায়

ঈশ্বরের অনন্ত মহিমা ব্যক্ত করা কারও পক্ষে কখনোই সম্ভব নয়। শুধু তাঁর শরণাগত হয়ে থাকতে হয়। পরমেশ্বরই সর্বজীবনের প্রভু, কর্তা, ভোক্তা, জ্ঞাতা, দ্রষ্টা ও সাক্ষীপুরুষ। (That Supreme Person is the only seer, only enjoyer, only knower and only doer.)

জ্ঞানীর বিশেষ লক্ষণ

জ্ঞানী একমাত্র সে-ই, যে বলতে পারে—আমি কিছুই জানি না। এটাই একমাত্র জ্ঞানের বিশেষ লক্ষণ।

একমাত্র তাঁরই আশ্রিত সকলে, তাঁরই সন্তান সবাই, এই বোধ হওয়া চাই। [১৩।৭।৬৮]

ভাব ও অভাবের পরিচয়

মানুষের থাকে অভাব, ঈশ্বরের থাকে ভাব। ভাব হলেই অভাব চলে যায়। ভাব হচ্ছে প্রীতির আনন্দের মধুর সম্পর্ক। ভাব হলে দেহ-প্রাণ-মনের সমতা আসে।

অভাবে যতক্ষণ ততক্ষণ শুধু 'নাই, নাই'। 'না' হচ্ছে অভাবের, যেখানে ভাবের প্রকাশ কম। ভাবে 'না' নেই, সেখানে সর্বদাই তৃপ্তি ও তুষ্টি।

ঈশ্বরের ভাবকে স্বভাব বলে। অর্থাৎ 'স্ব'-এর ভাব। স্ব মানে নিজ। নিজের ভিতরেই এই ভাব আছে, বাইরের থেকে আসে না। সেটা প্রকাশের জন্য ভাবের মানুষের কাছে যেতে হয়। ভাবের মানুষ হচ্ছে সাধু সন্ন্যাসী, যাদের মধ্যে ঈশ্বরীয় ভাব প্রকাশ হয়েছে।

ভাব থেকে হয় ভব। ভাবের মাধ্যমেই নাম-রূপের সমষ্টি বিশ্বের প্রকাশ হয়, এবং তার মাধ্যমে ঈশ্বরের প্রকাশ হয়।

মা বা ঈশ্বরের সঙ্গে ভাব করতে হলে, সম্পর্ক পাতাতে হলে, বিচার চলে না। বিচারে শুধু সংশয়, অস্থিরতা, চঞ্চলতাই আসে।

ছোট শিশু যেমন আপনবোধে সকলের সঙ্গে মিশে যায়, সেই রকম ঈশ্বর জ্ঞানে আপনবোধে সবার সঙ্গে মিশতে হয়।

সমস্ত বস্তুর মধ্যে ঈশ্বর আছেন এই বোধে মেনে নেবার নাম ভাব[১]। ভক্তের সঙ্গ করলেই ভাবের প্রকাশ হওয়া সম্ভব, কারণ ভক্তের হৃদয়েই ভাবের প্রকাশ থাকে। ভাবের লক্ষণ হচ্ছে সরলতা, উদারতা, স্থিরতা, ধীরতা, নীরবতা, সমতা, শান্তি ইত্যাদি।

১। অভিনব সংজ্ঞা।

ত্রিগুণের প্রভাব হতে তিনি সরিয়ে না-নিলে নিজের চেষ্টায় বর্জন সম্ভব নয়। বর্জনে পথে অনেক গর্জন। কিন্তু প্রেমের শক্তি দ্বারা ভালবাসার মাধ্যমে সাধনার পথে যা অসম্ভব, তা-ও সম্ভব হয়।

প্রেমের মাহাত্ম্য

জ্ঞানেরও ঊর্ধ্বে প্রেম। প্রেম হচ্ছে ভালবাসার পূর্ণ অবস্থা।

ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হবার সর্বোত্তম উপায় হল—সর্ব অবস্থায় সবকিছুকেই ঈশ্বর বা মা-বোধে গ্রহণ করা। (একেই 'মেনে মানিয়ে চলা'-র বিজ্ঞান বলা হয়েছে।)

ঈশ্বরকে মনন করা অর্থ মন্ ন। অর্থাৎ মনটাই সব নয়। কাজেই মনাতীতকে মন দিয়ে ভাবনা করাই হল মনন[১]। মনটা তাঁর। মন দিয়ে তাঁর কথাই ভাবতে হয়।

ঈশ্বরীয় মহিমার ব্যক্ত রূপটাই হল এই বিশ্ব। বিশ্ব হচ্ছে তাঁর সগুণ রূপ অর্থাৎ মহি+মা। এই মহীটাই[২] মা।

ভাবের পরিণামে ভক্তি

ভাব হল ঈশ্বরের প্রকৃতি। এ-ই যোগমায়াশক্তি। তাঁর কৃপা আশীর্বাদেই ভোগ চলে গিয়ে ভক্তি আসে।

ভাব লাভের উপায়

ভাব হচ্ছে বিশুদ্ধ প্রকৃতির করুণা বা প্রসাদ। ভাব পেতে হলে 'জানি না, বুঝি না পারি না', এই ভাবে চলতে পারা চাই।

লঘুর গুরুবোধ গুরুভাব হতে হয়

গুরু হচ্ছে ভাবময় জ্ঞানঘন মূর্তি। লঘুকে গুরুতে পরিণত করতে গুরুই সাহায্য করেন। [১৪।৭।৬৮]

সাধন সিদ্ধির গুপ্ত রহস্য

ভগবৎ সাধনায়—সাধনা করার কাজ সাধকের, কিন্তু সিদ্ধিটা থাকে ভগবানের হাতে। সাধক যদি সিদ্ধি ব্যবহার করতে যায় তবে তা বিকৃত হয়ে যায়।

সাধনা করার ভারটা নিজের হাতে না-রেখে ঈশ্বর, গুরু বা মায়ের কাছে সমর্পণ করে দেওয়াই নিরাপদ। সর্বময় কর্তৃত্বভার গুরু, ইষ্ট বা মায়ের উপর থাকলে নিজে যন্ত্রস্বরূপ হয়ে থাকা যায়।

সাধনা ও সিদ্ধি নিত্য অভিন্ন

মাকে স্মরণমাত্র মা হৃদয়ে প্রকাশিত হন। অর্থাৎ ধ্যান জপ বা নাম স্মরণ করা অথবা মনে তাঁর উদয় হওয়া এক কথাই।

নিত্য স্মরণ সিদ্ধিসম

কারো যদি চব্বিশ ঘণ্টাই ঈশ্বরের নাম মনে পড়ে তবে সর্বক্ষণ সে ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্তই থাকে—এটা সিদ্ধির লক্ষণ। তার আর কোন সাধনার প্রয়োজন হয় না।

১। মননের নিগূঢ় তাৎপর্য। ২। অভিনব সংজ্ঞা।

তাঁর কৃপা না হলে তাঁকে কেউ স্মরণও করতে পারে না। সেজন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে হয়—তুমি যদি হৃদয়ে অভিব্যক্ত না হও, তাহলে তোমাকে আমি স্মরণও করতে পারব না। তুমি কৃপা করে অভিব্যক্ত হও।

নাম ও নামী অভিন্ন এবং সব সাধনার গতি সমান

নামের বিরাট শক্তি। বিশ্বটা নামের শক্তিতেই চলছে। জ্ঞানী ও যোগী যে গতি লাভ করে, নামের সাধকও সেই গতিই লাভ করে।

সাধ্য-সাধক-সাধন-সিদ্ধিরূপে মা-ই সব

তাঁর কাছে প্রার্থনা করে বলতে হয়—রূপে নামে ভাবে বোধে যে-ভাবে খুশি সে-ভাবেই এসো তুমি; কিন্তু তোমাকে চিনতে যেন ভুল না হয়। সমস্ত জীবনটা তাঁর চরণে যেন উৎসর্গ করে দিতে পারা যায়।

সংসারজীবনে সর্ব রূপে নামে ভাবে বোধেই যদি ঈশ্বরকে মানা যায় তাহলে ঈশ্বর উপলব্ধি সহজ হয়।

সর্ববস্তুর মধ্যেই যখন ঈশ্বর বা মাকে মানা হয় তখনই ঈশ্বর বা মা সেই ভক্তের মধ্যে প্রকাশিত হন। সেই ভক্ত তখন তত্ত্ববিদ্ হয়ে যায়।

নিজের চেষ্টায় তত্ত্ববিদ্ হওয়া যায় না। একমাত্র ভক্ত ভক্তির দ্বারা সর্ববস্তুতে 'তৎত্বম্' এই বোধে মানার ফলে ঈশ্বরের কৃপায় তত্ত্ববিদ্ হতে পারে।

সাযুজ্য যোগের পরিচয়

পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের পরে ঈশ্বরময় যাঁরা হয়েছেন, সেইসব মহাপুরুষদের মধ্যে ঈশ্বর স্বয়ং অভিব্যক্ত হন এবং তাঁরা পরিপূর্ণভাবে ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যান। এইরকম ভাবে ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হওয়াকেই সাযুজ্য যোগ বলা হয়।

প্রেমিক ভক্তের বৈশিষ্ট্য

'প্রেমিক ভক্তকে দেখা মানেই ভগবানকে দেখা।' এইরকম ভক্তের মধ্যে ভগবানের পূর্ণ আবির্ভাব হয়ে থাকে। এই স্তরের মহাপুরুষ জগতে দুর্লভ।

প্রেমিক ভক্ত কোন যুগে যদি একজনও আসেন তবে তাঁর দিব্য আবির্ভাবের, দিব্য আলোকের ও দিব্য প্রকাশের ফলে জগতের অশেষ কল্যাণ হয়। কিন্তু পেঁচা যেমন সূর্যালোক সহ্য করতে পারে না, সেইরকম তাঁর দিব্যজ্যোতি সহ্য করতে পারে না বলে ভোগী লোকও তাঁর সংস্পর্শে আসতে পারে না।

সর্বাশ্রয়েই ভগবান নিত্য বর্তমান

ভগবান হচ্ছেন সর্বলোকাশ্রয়, সর্বরূপাশ্রয়, সর্বনামাশ্রয়, সর্বভাবাশ্রয়। তাঁকে বাদ দিয়ে কোন কিছুরই অস্তিত্ব নেই।

একনিষ্ঠ ভক্তির পরিচয়

ভক্ত না-হলে মাধুর্যের রসাস্বাদন করা সম্ভব নয়। অহংকার বা দেহাত্মবোধ অথবা 'আমার আমি'-বোধ থাকা পর্যন্ত শুদ্ধাভক্তি তথা একনিষ্ঠ ভক্তি সম্ভব নয়।

'আমি'-র ভাবার্থ

'আমি'-টা ঈশ্বরেরই দেওয়া। ঈশ্বরই আমির বেশে এসে খেলে চলেছেন। এই 'আমি'-টাকে ঈশ্বরীয় বোধে যুক্ত করতে হয়। তাহলে 'আমি'-র বদলে শুধু 'তুমি' থাকে, অহংকার রূপান্তরিত হয়ে শুধু 'ত্বংকার' থাকে।

শান্ত ও অশান্ত অবস্থার ব্যবহার লক্ষণ

সন্তান বোধে থাকতে হয়। তাহলেই হওয়া যায় শান্ত। কিন্তু তাঁর কৃতিত্বকে নিজের কৃতিত্ব বলে গ্রহণ করলে আসে অশান্ত অবস্থা।

মহাভক্তের অন্তরের ভক্তি সমুদ্রগামী নদীর মত ছুটে যায় পরম ইষ্টের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য

নদী যেমন সমস্ত বাধা অতিক্রম করে সাগরাভিমুখী ছুটে চলে মিলনের জন্য, সেইরকম অহংকার চলে গেলে, সমস্ত দেহ প্রাণ মন বুদ্ধির একতানগতি নিয়ে ভক্তও ছোটে উদ্দেশ্য শুধু মহাচৈতন্যসমুদ্র বা মাতৃবক্ষ। তার সঙ্গে মিলে গিয়ে এক প্রশান্ত অবস্থা হয়। এইখানেই তার যাত্রার সমাপ্তি।

সকলেরই যেন প্রার্থনা থাকে— সেই অমৃতময় মাতৃবক্ষে, প্রেমঘনস্বরূপের মধ্যে নিজের এই ক্ষুদ্র আমিটা যেন লয় হয়ে যায়। [১৫।৭।৬৮]

সাধন সিদ্ধির জন্য দেহের সাহায্যও দরকার হয়

ভক্তের কাছে দেহের মূল্য অধিক। এই দেহ দিয়ে এবং সর্ব ইন্দ্রিয় দিয়ে ভগবানের সেবা করতে হয়। তাহলেই প্রেমানন্দস্বরূপ ঈশ্বরীয় উপলব্ধি হয়।

দেহটাকে মিথ্যা বা মায়া বলে এটাকে একেবারে বাদ দিয়ে চলা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। দেহের বাইরে ভগবানকে প্রথমে উপলব্ধি করা কঠিন। প্রথমে অন্তরে উপলব্ধি করা দরকার, তারপরে বাইরে উপলব্ধি।

সুস্থ সবল দেহ দ্বারাই বৃহৎ কর্ম সম্পাদন করা সম্ভব হয়। অসুস্থ দেহে, বৃহৎ মস্তিষ্ক দ্বারাও কোন মহৎ কাজ হয় না। আবার ঈশ্বরীয় চিন্তাবিহীন হাতির মতন বিরাট দেহ নিয়েও জীবনে উৎকর্ষ লাভ হয় না।

সমান ভাবে পুষ্ট হয়ে দেহ মন প্রাণ বুদ্ধির একতানগতি হলেই ব্রহ্মলাভ সহজ হয়। এগুলিকে সমপর্যায়ে আনবার জন্যই মানুষের বারবার জন্ম নিতে হয়।

অস্থিরতা, চঞ্চলতা সকলের পক্ষেই খুব ক্ষতিকর। অতি উল্লাস, অনিয়মিত ভোজন, অনিয়মিত নিদ্রা, বিশ্রামের অভাব, পরদোষদর্শন প্রভৃতির ফলে দেহে একপ্রকার প্রদাহ হয়। ফলে শরীরের পুষ্টি নষ্ট হয়, এবং মনের অশান্ত ভাব হয়।

দেহকে পরিপূর্ণ সুস্থ রাখার জন্যই ব্রহ্মচর্য পালনের প্রয়োজন হয়। দেহের, মনের, প্রাণের, বুদ্ধির সর্বস্তরের জন্যই ব্রহ্মচর্যের বিধান আছে।

দেহ মন প্রাণ বুদ্ধির মধ্যে সমতা এসে গেলে দুঃখকষ্ট অতিক্রম করা সহজ হয়। অহংকারকে পোষণ করলে সমতা নষ্ট হয়, চঞ্চলতা বাড়ে ও আয়ু কমে।

সমবোধের সাধনাই হল অচ্যুতের আরাধনা

অচ্যুতের সাধমা হল সমবোধে সবকিছুর সঙ্গে স্ববোধের অভেদ ভাবনা। তার ফলেই অমরত্ব লাভ করা সম্ভব। সমবোধের অখণ্ডতাই নিত্য শাশ্বত অমৃতত্ব অচ্যুত তথা বিষ্ণুর স্বরূপ।

সমবোধে শান্ত হলেই সবল হয়। সমত্বের সাধনা দ্বারাই দেবত্ব ও ঈশ্বরত্ব লাভ হয়। শান্তি লাভের জন্য এই সমত্বের সাধনা করাই প্রয়োজন।

কুণ্ডলিনী শক্তির অভিনব পরিচয়

অনন্ত ঈশ্বরীয় শক্তি জীবদেহে জড়ীভূত ভাবেই থাকে। সেই জন্যই একে কুণ্ডলিনী শক্তি অথবা আধার শক্তি বলা হয়। এই অনন্ত শক্তি বিরুদ্ধ অবস্থা, ঘটনা ও সংঘাতে জাগ্রত হয়। প্রকাশের ব্যাপক সুযোগ পেলে এই শক্তি আপনাকে সুসংযতভাবে ব্যক্ত করে। একমাত্র বিজ্ঞানসম্মত সাধনা দ্বারাই এর পূর্ণ অভিব্যক্তি সম্ভব।

এই কুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত হবার পরে অসংযতভাবে ব্যবহার হলে তা বিকৃত হয়ে যায়। তার ফলে দেহ ইন্দ্রিয় প্রাণ মনের বিকার হয়। একমাত্র ঈশ্বরীয় ভাবধারায় এর সুসংযত ব্যবহার ও বিকাশ হয়।

মহৎ, উদার, ভক্ত, সাধু, সন্ন্যাসী, মুক্তপুরুষ প্রভৃতি অনন্ত শক্তির বিশেষ প্রকাশবিভূতি বা অভিব্যক্তি। শক্তির যথার্থ ব্যবহার হলে তবেই জীবনে অগ্রসর হওয়া যায়।

মায়ের পরিচয় সবার কাছে সমান নয়

মাকে কেউ বলে ত্রিগুণাময়ী, কেউ বলে শান্তিময়ী; কেউ বলে মা বিকারধর্মী, কেউ বলে সে নির্বিকার। এইসব নিয়ে মতভেদের কোন অর্থ হয় না। শাস্ত্রে যা আছে সবই ঠিক তবে শাস্ত্রের একই নির্দেশ সবার উপযোগী নয়।

শাস্ত্রের রহস্য সহজবোধ্য নয়

শাস্ত্রপাঠ সে-ই করতে পারে, যার জীবনের সঙ্গে শাস্ত্রের মিল আছে। স্ব-হৃদয়ে অনুভূতি হবার পরে শাস্ত্র পড়লে যথার্থ উপকার হয় এবং শাস্ত্রের অর্থ আরও সুন্দরভাবে অনুভূত হয়। তা না-হলে বিপরীত অর্থ বুঝে নিজেদের ক্ষতিও যেমন হয়, অহংকারও তেমন বাড়ে।

বহিঃপ্রকৃতির বিশেষ কোন অভিব্যক্তি শাস্ত্র তৈরি করে না। শাস্ত্র কেউ বানায় না—মানুষের স্বভাব থেকে শাস্ত্র প্রকাশিত হয়।

মহাপুরুষদের জীবনই হচ্ছে জীবন্ত শাস্ত্র এবং তাঁরাই শাস্ত্রের জীবন্ত বিগ্রহ। মহাপুরুষদের সঙ্গ করা শাস্ত্র পড়ার চেয়ে অনেক মূল্যবান।

মহাপুরুষদের জীবনের ধারাগুলি দেখে গেলেই শাস্ত্রপাঠের কাজ হয়ে যায়। প্রাণ যেখানে সংযত ও সমাহিত, সেই প্রাণের সঙ্গ করতে হয়।

মহাপুরুষদের এক একটা কথা শাস্ত্রের এক একটা বিরাট অঙ্গ। তাঁদের একটা কথাকে অবলম্বন করে জীবনে চলতে পারলেও মহৎ হওয়া যায়। তাঁদের কাছ থেকে যে-কোন একটা বিধান নিয়ে অনুসরণ করলেও জীবনে জ্বালাযন্ত্রণা, রোগশোক, দুঃখকষ্ট দূর হয়ে যায়।

মায়ের করুণা বিনা তাঁর সংসাররূপ অতিক্রম করা যায় না

ভব সংসারের ভবব্যধি দূর করেন বলেই মায়ের নাম ভবতারিণী। এই জগৎরূপ সমুদ্র পার হওয়া তাঁর কৃপা ছাড়া অসম্ভব।

'ভবতারিণী তারা গো মা
তুমি ভবের তরণী হয়ে দাঁড়াও।'

মাকে প্রথমে গুণের মধ্যে ধরতে না পারলে গুণের অতীতে যাওয়া যায় না। সগুণের উপাসনা না করে নির্গুণের উপাসনা সম্ভব হয় না। সগুণের অনুভূতি না হলে নির্গুণের অনুভূতি হয় না।

গুণের সমতাই শক্তির পরিণতি নিয়ে আসে; এবং শক্তির সাম্যভাব এলেই পূর্ণ জ্ঞানস্বরূপ তথা সকলের মধ্যে সমভাবে ও সমবোধে মিশে যাওয়া যায়।

বিশ্বসংসারের মূল্য অনেক। এখানে ভূমি, বাতাস, জল আগুন এইরূপ সবকিছুরই সত্যমূল্য আছে; কারণ সবকিছুর মধ্যে মা আছেন। কোনটাকেই বাদ দেওয়া যায় না। বেঁচে থাকবার জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিটি উপাদান বিশ্বের চারিদিকে মা-ই সাজিয়ে রেখেছেন।

মান থাকলে ভক্ত হওয়া যায় না এবং ঈশ্বরের দর্শনও পাওয়া যায় না। মানটা তাঁকে দিতে হয়। বৃন্দাবনে সব বেশেই কৃষ্ণ ঘুরছে; কিন্তু মনের একটুখানি সংশয় বা দ্বন্দ্ব থাকলে তাঁর দর্শন মেলে না।

সকল রূপের মধ্যে ভগবান কৃষ্ণকে দেখতে চেষ্টা না করলে পরমাত্মারূপী কৃষ্ণকে দেখা যায় না। সমস্ত রূপে -নামে-ভাবে-বোধে কৃষ্ণকে মানা হলে অখণ্ড কৃষ্ণদর্শন হয়। তখনই সমগ্র বিশ্বভুবন সচেতন বৃন্দাবন হয়।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সবকিছুই পরমাত্ম রূপী কৃষ্ণ। এ বোধ জাগ্রত না হওয়া পর্যন্ত কৃষ্ণের দর্শন হয় না।

ব্যাকুলতাই ঈশ্বর লাভের শ্রেষ্ঠ উপায়

কালীয় বিষ হল সর্বগ্রাসী বিষ। এ বিষ না ঢুকলে ভগবান লাভের ইচ্ছা জাগে না। এটাই হল বিরহজ্বালা। ভক্ত যখন ঈশ্বরকে পাবার জন্য ব্যাকুল হয়, সেই ব্যাকুলতাটাই কালীয় বিষ। [১৬।৭।৬৮]

দেহ-দুর্গে মাতা দুর্গাই বাস করেন

দেহটা হচ্ছে দুর্গ, এর মধ্যে যে বাস করে সে দুর্গা। সমস্ত শক্তি জ্ঞান আনন্দ প্রেম ও শান্তির পূর্ণতা এই দেহের মধ্যেই আছে। বাইরে বহুরূপে যা প্রকাশিত হয়ে আছে তা এই দুর্গারই প্রকাশ।

শরণাগতির তাৎপর্য

এক শক্তির বহুমুখী গতি এই বিশ্বসৃষ্টি। বহুমুখী গতির মধ্যে এই একের শরণ নেওয়াকেই শরণাগতি বলে।

শরণাগতির দ্বারা ভক্তের জীবনে স্মরণ মনন স্বপন ধর্ম কর্ম প্রভৃতি সবই দুর্গামিয় হয়ে যায়। দুর্গানাম করলে আত্মা, ব্রহ্ম, গুরু, ইষ্ট সকলের নাম করার কাজই হয়ে যায়।

দুর্গার অনন্ত মহিমা

দুর্গাকেই মহাকালী, মহালক্ষ্মী, মহাসরস্বতী বলা হয়। মহাপ্রাণ, ইষ্ট, গুরু, দুর্গা এক অর্থবোধক। প্রাণকে দেখা এবং দুর্গা, গুরু, ইষ্টকে দেখা একই অর্থ।

দুর্গা শব্দের তাৎপর্যার্থ হল দ + উ + র + গ + আ—এই পাঁচটি বর্ণ। পাঁচটি বর্ণ হচ্ছে পঞ্চতন্ত্র, পঞ্চ আত্মা, পঞ্চতন্মাত্রা, পঞ্চভূত, পঞ্চদেব, পঞ্চতত্ত্ব, পঞ্চবেদ, পঞ্চমুখ।

পঞ্চমুখ হচ্ছে শিবের। শিব হচ্ছে তত্ত্বময়। এই তত্ত্ব প্রকাশ হচ্ছে পঞ্চমুখ দিয়ে। পঞ্চমুখই পঞ্চপ্রাণ। পঞ্চপ্রাণ হচ্ছে দুর্গার 'দ' হতে 'আ' পর্যন্ত পঞ্চবর্ণ, অর্থাৎ দ + উ + র + গ + আ।

দুর্গা—দ + উ + র + গ + আ।

'দ' মানে দিয়ে দেওয়া, দমন করা, দয়া করা, দান করা। 'উ' মানে জ্ঞান, বোধ, চৈতন্য, উপলব্ধি, অনুভূতি। 'র' মানে রজঃশক্তি গতিশীল হয়ে যখন নানাত্ব বহুত্ব সৃষ্টি করে। 'গ' মানে সুর, ছন্দ, লয়, তাল, গতি ; যার সাহায্যে সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ের কাজ প্রণালীবদ্ধ ও সুব্যবস্থিত ভাবে সুসম্পন্ন হয়। 'আ' মানে আনন্দ। এর মাধ্যমেই সৃষ্টি, স্থিতি, লয় হয়। এই আনন্দই স্থূলে সসীমে আরামরূপে প্রকাশ পায়। সূক্ষ্মে এ-ই আবেগ, আবেশ ও আর্তি। কারণে এ-ই আদ্যাশক্তি। এ-ই আদি মধ্যে অন্তে নিত্য বিদ্যমান।

স্বর্ণকার যখন সোনার তাল গলিয়ে নানারকম ডিজাইন ও প্যাটার্নের অলঙ্কার তৈরি করে, শিল্পী যখন সমতল ক্ষেত্রের উপরে রেখা ও নানারকম রংয়ের সাহায্যে নিপুণতার সঙ্গে তার অন্তরের কল্পনাকে রূপায়িত করে তোলে, ভাস্কর বা মৃৎশিল্পী যেমন পাথর খোদাই করে বা খড় ও মাটির সাহায্যে দক্ষতার সঙ্গে তার মানসমূর্তির রূপ দান করে, তখন তাদের মধ্যে আনন্দের মাধ্যমে দুর্গারিই অভিব্যক্তি হয় অর্থাৎ সকল সৃষ্টির মধ্যেই দুর্গার পরিচয় আনন্দরূপে প্রকাশিত হয়।

আবার জরায়ুর মধ্যে সুকৌশলে মাতাপিতার বীর্য ও শোণিতের মিশ্রণের ফলে দশমাস ধরে যথাযথ ও সুষ্ঠুভাবে ক্রমধারায় বর্ধিত হয়ে শিশুদেহ তৈরি হয়, তার পিছনেও সেই মহাপ্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর আনন্দশক্তির ক্রিয়া থাকে।

মাতৃমহিমার সত্য পরিচয় ভক্তের হৃদয়েই প্রকাশ পায়

সৃষ্টির পিছনে মায়ের কতখানি সজাগ দৃষ্টি, কত ত্যাগ, কত সংযম, কত ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা এবং তার সঙ্গে অন্তরের শুভ কল্যাণ মঙ্গল ইচ্ছা, তাঁর প্রেম ভালবাসা স্নেহ করুণাধারার অভিনব বিকাশ প্রকাশ, তা ভক্ত হৃদয় ছাড়া কারও কাছে ধরা পড়ে না।

প্রকৃতিরাজ্যের গূঢ়তম রহস্য মা তাঁর ভক্ত সন্তান, একান্ত অনুগত শরণাগত বাধ্য যে জন সেই সন্তানের কাছে প্রকাশ করে দেয়। জ্ঞান ও শক্তির সাধনায় এর রহস্য সবটা প্রকাশিত হয় না, কিছুটা আবরিত থাকে।

অভিনব মাতৃলীলার সাক্ষী তাঁর ভক্ত সন্তান

শরণাগত সাধক যে মায়ের কাছে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করে দেয় এবং মায়ের ইচ্ছা তার মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হবার সুযোগ দেয়, সেখানেই লীলার ছলে মা সবকিছু প্রকাশ করে। ভক্ত সন্তান শুধু বসে দেখে। এটা মাধুর্য সাধনার একটা বিশেষ পর্যায়ে পড়ে।

বিজ্ঞান দৃষ্টির পূর্বাবস্থা ও পরবর্তী অবস্থা

বিজ্ঞানীর কাছে মা তাঁর সৃষ্টি, স্থিতি, ধ্বংসের উপরিভাগের কিছুটা প্রকাশ করে। সেই বিজ্ঞানী যখন অনুগত, আর্ত, জিজ্ঞাসু, দীনার্ত ও শরণাগত হয়, তখন মা তার কাছে সব প্রকাশ করে দেয়।

যোগী ও ভক্তের পার্থক্য

যোগীদের কাছে অনেক বিভূতি শক্তি প্রভৃতি দেখা যায়, কিন্তু ভক্ত মায়ের মধুর স্পর্শ পায়।

শক্তির সাধক ও জ্ঞানের সাধকের ভিন্ন গতি

যারা শক্তির সাধনা করে তাদের প্রকৃতির লয় পর্যন্ত গতি, তারপরে তারা আর কিছু জানে না। প্রকৃতির লয় হচ্ছে মায়ার রাজ্যের সীমা। তারপরে মহামায়ার রাজ্য, সেখানে জ্ঞানীদের প্রবেশ অধিকার।

মা সাধকের ভাব অনুযায়ী, তার অন্তরের ও প্রাণের গতি অনুযায়ী, ভিন্ন ভিন্ন ভাবের সম্পর্ক রাখে ভিন্ন ভিন্ন সাধকের সঙ্গে।

প্রাণের তাৎপর্য

প্রাণই হচ্ছে গুরু, আত্মা, মা, ইষ্ট, ব্রহ্ম প্রভৃতি। এই প্রাণই সাধককে ভিন্ন ভিন্ন স্তরে নিয়ে যায়।

আকাশ হচ্ছে তমোগুণ ও প্রকৃতির লয়ের স্থান। তার পরের স্তরে দেবলোকে নিয়ে যায়। রজঃশক্তি হল দেবতার। রজোগুণী দেবশক্তি সত্ত্বগুণের কেন্দ্র হিরণ্যগর্ভে নিয়ে যায়। তার পরের স্তরে সাধককে সত্যলোকে নিয়ে যায়। এইভাবে সেই আত্মশক্তি তমোরজোগুণ অতিক্রম করে সত্ত্বগুণের কেন্দ্র হিরণ্যগর্ভের কাছে, সূত্রাত্মা বা সমষ্টিচৈতন্যের কাছে পৌঁছে দেয়। সে তাকে শুদ্ধসত্ত্বের কেন্দ্র নারায়ণ প্রভুর কাছে পৌঁছে দেয়। প্রভু তাকে পরমাত্মার মধ্যে বিলীন করে নেয়। এটাই ভক্তের চরম অবস্থা।

ব্রহ্মবিদ্যার অভিনব পরিচয়

যোগমায়াকে বলা হয় ব্রহ্মবিদ্যা। সে-ই হচ্ছে (ভূমা) উমা, দুর্গা, যোগদা। শক্তির সাহায্যেই সত্তার সঙ্গে মিশে যাওয়া সম্ভব হয়।

স্তরভেদে সাধন সিদ্ধির পরিণাম

ভিন্ন ভিন্ন স্তরের সিদ্ধ সাধকদের বলা হয় লোকপাল। এইরূপ দেবলোক, পিতৃলোক, মাতৃলোক, সত্যলোক প্রভৃতি বিভিন্ন স্তরের সিদ্ধ সাধকদের ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে।

ভাবলোকের সাধন সিদ্ধির পরিচয়

সত্যলোক হতে আরম্ভ হল উমা, দুর্গা, মহালক্ষ্মী, রাধা। এই সবগুলি একজনেরই নাম। এখানে এসে ভক্তি রাজ্যের খেলা শুরু হয়। এখানে এসেই ভক্ত ঈশ্বরীয় ভাবগুলির সাক্ষাৎ পায়। সেইজন্যই একে ভাবলোক বলে।

বিশুদ্ধা ভক্তি ও বিশুদ্ধ জ্ঞান অভিন্ন

প্রকৃত ভক্ত ও জ্ঞানীর মধ্যে কোন তফাৎ নেই। চরমতম অবস্থায় পৌঁছে গেলে সেখানে দুই নেই, ফলে কোন দ্বন্দ্বও নেই। বিশুদ্ধ জ্ঞান ও বিশুদ্ধা ভক্তি একই কথা।

ভক্তের ব্রাহ্মণত্ব লাভের অবস্থা

নারায়ণ হচ্ছে মায়ের একটা বিশেষ প্রকাশ অবস্থা। এই অবস্থায় পৌঁছলে সেই ভক্তকে ব্রাহ্মণ বলা হয়।

ব্রাহ্মণের আচরণের মধ্যে থাকে সবটাই সত্য। তাঁর কাছে ভাল বা মন্দ বলে কিছু থাকে না। সর্বদাই তিনি শান্ত। সর্বজীবের মধ্যে একবোধ। সম্পূর্ণ নিরভিমান ও নিরহংকার। তাঁর কাছে রূপ মাত্রই সত্যরূপ, সত্যনারায়ণ

বা সত্যমাতা। শব্দমাত্রই তাঁর কাছে প্রাণের ভাষা, নারায়ণের কথা, তাঁর ইষ্টের কথা, গুরুর কথা, মায়ের কথা। ভাবমাত্রই তাঁর ইচ্ছা।

এই ব্রাহ্মণ জাত ব্রাহ্মণ নয়। ব্রাহ্মণ হয়েছে ব্রাহ্মণের ইচ্ছায় বা কৃপায়। তাঁর মধ্যে সত্য প্রকাশিত হয়েছে। কারওর মধ্যে সত্য প্রকাশ হলে তাঁকেই ব্রাহ্মণ বলে। ব্রাহ্মণত্ব প্রাণের পূর্ণ রূপ, অর্থাৎ এক সত্যের প্রকাশ। সেইজন্য সে বলে এখানে দুই নেই।

ঐশ্বর্যপ্রিয় অসুরগণ চিরকালই দেববিরোধী

প্রাণকে যে নাশ করে সে অসুর। নানাত্ব বহুত্ব অসুরদের প্রিয় বলে একের সাধনায় তারা বাধা দেয়।

ব্রাহ্মণত্ব হচ্ছে সাধনার সর্বশেষ স্তর

ব্রাহ্মণ নির্গুণতত্ত্বকে প্রণাম করে। বহুর মধ্যে সে একলা। সেই এককেই সে প্রণাম করে। সেই অবস্থায় না পৌঁছানো পর্যন্ত অসুরের পর্যায়েই থাকতে হয়।

পূর্ণ আত্মসমর্পণ ও পূর্ণাহুতি হলেই ব্রাহ্মণত্ব লাভ করা সম্ভব হয়। ব্রাহ্মণত্ব লাভের জন্য অখণ্ড মহাপ্রাণরূপী দুর্গা মায়ের শরণ নিতে হয়। মাকে বা ঈশ্বরকে নিত্য স্মরণ করে 'আমার আমি'-কে বিলীন করে দিতে হয়।

শ্রীনামের মাহাত্ম্য

এ যুগে নাম করাটাই সবচেয়ে উপযুক্ত সাধনা। বোধকে জাগাতে হলে নাম করাটাই সহজ উপায়। নাম করতে করতে সবকিছু অর্থাৎ নানাত্ব বহুত্ব লয় হয়ে যায়। নামের মধ্যে মন ডুবে গেলে আপনিই সব স্থির হয়ে যায়।

অহংকারকৃত সর্বকর্মেরই প্রতিক্রিয়া হয়

অহংকারশূন্য যে কর্ম, সেটা তাঁর। অহংকারযুক্ত যে কর্ম, সেটা আমার। 'আমার বোধ' তথা 'মনের বোধ' অশুদ্ধ, অজ্ঞানযুক্ত ও ত্রুটিপূর্ণ।

ভক্ত ও ভগবানের সম্পর্ক মধুরতর

ভগবানের কাছে ভক্ত যে কত আনন্দের বস্তু, সে শুধু ভক্ত ও ভগবানই জানেন। ভক্ত তার সমস্ত চিন্তা, ভাবনা, কর্ম, চেষ্টা সবকিছু ভগবানকেই সমর্পণ করে দেয়।

ভক্ত শুধু ভগবানের মহিমা প্রচার করে যায়। ভক্ত যেমন ভগবানের মহিমা প্রচার করে, ভগবানও তেমন ভক্তের সর্বোত্তম আদর্শ তুলে ধরে জগতের কাছে।

ভগবানই ভক্তের মধ্যে অভিব্যক্ত হয়ে ভগবৎ মহিমা গেয়ে যায়; তা নাহলে ভক্তের সাধ্য হয় না ভগবানের মহিমা কীর্তন করা। চঞ্চল মন, বিক্ষিপ্ত মন নিয়ে ভগবানের গুণগান করা যায় না।

সারা অঙ্গে ভক্তের পদরজ মেখে, ভক্ত সঙ্গ করে ভক্তের সেবা করলে ভক্তি লাভ হয়। সাধনার রাজ্যে ভক্তি সর্বাপেক্ষা দুর্লভ বস্তু। ভক্তের যে কতবড় শক্তি তার উদাহরণ হনুমান, প্রহ্লাদ প্রভৃতি।

ভক্তির সাহায্যেই শুধু ঈশ্বরের উপরে নির্ভরতা ও বিশ্বাস রাখা সম্ভব হয়। ভগবানই ভক্তের মধ্যে সেই শক্তিটা দেন, যার ফলে শ্রদ্ধা ভক্তি বিশ্বাসে স্থিতি আসে। [১৭।৭।৬৮]

সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টা স্বমহিমায় বিদ্যমান

ম্যাজিক হচ্ছে ঈশ্বরের মহিমা, কিন্তু ঈশ্বর স্বয়ং এই মহিমার উর্ধ্বে এবং তিনিই এই মহিমা ব্যবহার করেন। প্রকৃতির রাজ্যে প্রতি মুহূর্তে যে জন্মমৃত্যুর খেলা চলছে এটাও তাঁর মহিমার অন্তর্গত।

যাদুকর সত্য, কিন্তু তার খেলা মিথ্যা

মানুষ যে-সব ম্যাজিক দেখায়, সে-সব খেলার কতগুলি কৌশলমাত্র। যারা বড় বড় যাদুকর বলে পরিচিত, তাদের সবটাই খেলা। সত্যের সঙ্গে তাদের পরিচয় নেই। যাদুকরের খেলা মিথ্যা, কিন্তু যাদুকর সত্য।

জগৎবোধে ঈশ্বর অজ্ঞাত এবং ঈশ্বরবোধে জগতের অভাব

জগৎটা মনের সৃষ্টি, আবার মনটা ঈশ্বরের সৃষ্টি। এ-সব অতিক্রম করে সকলকে স্থির ধীর প্রশান্ত অবস্থায় পৌঁছতে হবে।

শান্ত মনই শুদ্ধ মন, শুদ্ধ মনেই হয় ঈশ্বর দর্শন

ভগবানকে ভালবাসা মানে শান্ত হওয়া, স্থির হওয়া। অস্থিরতা চঞ্চলতা নিয়ে ঈশ্বরানুভূতি হয় না।

সর্বসমপর্ণের পরিণামে হয় মুক্তি, শান্তি

অন্তরের বিকাশের জন্য দেহ, প্রাণ, মন, বুদ্ধি সব মায়ের কাছে সমর্পণ করে দিতে হয়। সব সমর্পণ হয়ে গেলে তৃপ্তি, সন্তোষ, প্রীতি আপনা থেকেই আসে। তখন দেহও সুস্থ নীরোগ হয়ে যায়।

শুদ্ধ মনে হয় শুদ্ধ দেহ, শুদ্ধ দেহে হয় ইষ্টসিদ্ধি

তাঁকে প্রতিনিয়ত স্মরণ করতে হয়। সর্ববস্তুর মধ্যে মাকে মানতে হয়। দেহটা যে মা এই বোধ সবার শেষে আসে। আগে বুদ্ধি ও মনকে সমর্পণ করতে হয়। বুদ্ধি স্থির হলেই মন স্থির হয় এবং মন স্থির হলেই দেহও সুস্থ হয়।

অসংযম ও অনিয়মই হল পাপ ও অধর্ম

নিয়ম বা নীতির বাইরে যাওয়াটাই পাপ। সেটাকেই অধর্ম বলা হয়। স্বার্থের সীমা দিয়ে যে গতি তার নামই পাপ।

ঈশ্বরীয় সাধনার দ্বারাই জীবনের চরম পরিণতি আসে

ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধা বা স্বার্থচিন্তার মধ্যে থাকলে নিজেকে শুধু সীমায়িত করা হয়। ঈশ্বরকে স্মরণ করেই শুধু জীবনের পক্ষে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয়।

স্বার্থবোধে অজ্ঞান বন্ধন এবং নিঃস্বার্থবোধে মুক্তি ও শান্তি

আত্মপ্রশংসা আত্মহত্যার সমান,-সম্মান অপমান সমান এবং প্রতিষ্ঠা শূকরীবিষ্ঠার সমান। গৌরব নরকতুল্য,

কিন্তু ঈশ্বরের জন্য গৌরব বোধ করলে সেটা হয় স্বর্গবাস। নিজের জন্য গৌরব বোধ করলে সেটা হয় নরকবাস। সেইজন্য নিজে সম্মান না নিয়ে অপরকে সম্মান দিতে হয়।

সাধুর ব্যবহার

সাধুদের নির্দেশ—অপরকে সম্মান দেবে ও তন্নাম নেবে। কিন্তু বেশির ভাগ লোকই নিজেরা মান নেয়, আবার ঈশ্বরের নামটাও ভুলে যায়। সেই জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা করা দরকার—অহংকারটা তুমি কৃপা করে এসে নিয়ে নাও। সম্পূর্ণ অসহায় বোধে প্রার্থনা করলে তিনি নিজে এসেই সব প্রকাশ করেন।

অহংকারে কোন সাধনাই সিদ্ধ হয় না

তিনি নিজে প্রকাশ হয়ে নিজেই নাম করেন, তা না-হলে অহংকার দিয়ে তাঁর নামও করা যায় না। নিজেরা কর্তা সেজে অহংকার অভিমান দ্বারা যারা সবকিছু করতে যায় তারা ভগবান যে প্রকাশিত হন সেটা ধরতে পারে না।

ভক্তের আচরণ

ভক্ত অনুভব করে—'আমার আমি'-র মধ্যে ভগবানই বসে থেকে সবকিছু করছেন। সে তাই বলতে পারে—তোমার সত্তায় আমার জীবন। তুমি না-থাকলে আমার কোন অস্তিত্বই নেই। এটাই হচ্ছে মাধুর্যের ভাব।

যথার্থ ভাগ্যবানের লক্ষণ

অর্থশালী, বিত্তশালী, শক্তিমান, জ্ঞানবান প্রভৃতি আসল ভাগ্যবান নয়। অনন্ত অসীমের সঙ্গে যে সর্বদা যুক্ত থাকে সে-ই হচ্ছে আসল ভাগ্যবান। শক্তি জ্ঞান বিদ্যা বুদ্ধি যদিও সব তাঁরই দেওয়া তবুও অহংকার দিয়ে ব্যবহার করলে সে-সব কলুষিত হয়ে যায়।

স্বার্থবোধে ব্যবহার এবং ঈশ্বরবোধে ব্যবহারের পার্থক্য

'আমার বোধে' ব্যবহার হলে হয় শোক, কিন্তু ঈশ্বরীয় বোধে ব্যবহার হলে হয় শক্তি। নিজের জন্য ব্যবহার হলে যা ভোগ, ঈশ্বরের জন্য ব্যবহার হলে তা-ই ভক্তি। নিজের জন্য ব্যবহার হলে হয় অজ্ঞান, ঈশ্বরের জন্য ব্যবহার হলে হয় জ্ঞান। নিজের জন্য ব্যবহার হলে হয় মিথ্যা, ঈশ্বরের জন্য ব্যবহার হলে হয় সত্য। নিজের জন্য ব্যবহার হলে হয় দুঃখ, ঈশ্বরের জন্য ব্যবহার হলে হয় সুখ।

মন দ্বারা প্রতি মুহূর্তে তাঁকে স্মরণ করার নাম মন দিয়ে দেওয়া। নিজের জন্য ব্যবহার করলে যেটা বিষরূপ হয়ে দাঁড়ায়, ঈশ্বরের জন্য ব্যবহার করলে সেটাই বিষ্ণুস্বরূপ হয়।

এই ক্ষুদ্র আমিটা নিজের জন্য নয়, শুধু ভগবানের সেবার জন্য। ঈশ্বরীয় জ্ঞানবিচারের জন্যও নয়। বর্তমানের দেহ, মন, প্রাণ, বুদ্ধি নিয়ে অনন্ত অসীমকে বিচার করতে গেলে সুবিধা হয় না, অনেক কষ্ট করতে হয়।

জীবনের মূল উদ্দেশ্য

স্থিরত্ব ও শান্তি লাভ করা হল জীবনের উদ্দেশ্য, সুতরাং নানারকম বিরুদ্ধ মতবাদের কথা শুনে লাভ হয় না, শুধু সংশয় ও চঞ্চলতা বাড়ে।

সমবোধের বৈশিষ্ট্য

সমস্ত মতপথকে সমানভাবে মূল্য দিতে হয়। এটাই এ যুগের বিশেষ পথ বা নির্দেশ। পরমতসহিষ্ণুতা বহির্জগতের উন্নতির অন্তরায় হলেও অন্তরের বিকাশের পথে বিশেষ সহায়ক। অন্তরের বিকাশ হলে বাইরের দুঃখ, কষ্ট, দৈন্যকে তুচ্ছ করা যায়। অন্তরে ও বাইরে সমবোধ না-হলে ঈশ্বর লাভ সম্ভব হয় না।

নিম্নপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্য

নিম্নপ্রকৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েই লোকে ভোগের বৃত্তিকে প্রশ্রয় দেয় এবং তার সমর্থনে নানারকম যুক্তিতর্ক দেখায়। তবে সংসারে থেকেও পূর্ণতায় পৌঁছবার একটা উপায় আছে, সেটা সকলে জানে না।

জীবনে আত্মসমর্পণ ও মধ্যম পন্থার গুরুত্ব

বর্তমানে আত্মসমর্পণই সহজ উপায়। সাধনার পথে মধ্যম পন্থাই সংসারীদের পক্ষে শ্রেয়। আহার বিহার বিশ্রাম বা নিদ্রা সবকিছুই পরিমিত হওয়া চাই।

ভক্তিযোগের অনুশাসন

ভক্তিযোগের প্রথম নির্দেশ—সর্ববস্তুর মধ্যেই যে ঈশ্বর আছেন সমানভাবে এটা মেনে নিতে হয়। ভালমন্দ বিচার থাকলে চলে না। অহংকারকে কোনমতেই প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। [১৯।৭।৬৮]

নিত্য প্রেম নহে সাধ্য

অন্তরের প্রিয়বোধের মূল্যই হচ্ছে প্রেম। পৃথিবীতে এমন কিছু নেই যা দিয়ে প্রেমের মূল্য দেওয়া যায়। যখন সবাইকে ঠিক ঠিক মূল্য দেওয়া হয় তখনই প্রেমের রূপ নেয়।

সমবোধেই হয় প্রেমের পরিচয়

নিত্য সমানবোধ বজায় রাখতে পারলেই প্রেমের আস্বাদন হয়। যদি কোনও রকম ভাবে তা ব্যহত হয় তাহলে প্রেমের বিকাশ হতে পারে না।

প্রেমের লক্ষণ স্বতন্ত্র

মানুষকে শক্তি জ্ঞান আনন্দ অনেক বড় করে তোলে, কিন্তু প্রেমে পাগল করে দেয়।

নির্গুণ ও সগুণের সাধনা পৃথক

ভগবানকে যে-কোন নাম রূপ ভাব বোধ দিয়ে ধরা যায়। আবার কোন নাম রূপ ভাব বোধ ছাড়াও তাঁকে অনুভব করা যায়। এগুলি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা মাত্র।

ভগবৎপ্রেমী পাগলের লক্ষ্যচ্যুতি হয় না

অনেক রকম প্রেমের পাগল আছে। সব পাগলের মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে পার্থক্য থাকলেও লক্ষ্য তাদের এক। সেইজন্য এই সব পাগলের মধ্যে একজনেরই পরিচয় পাওয়া যায়।

বিকৃতমস্তিষ্ক ও পূর্ণ পাগলের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট

পূর্ণ পাগল এককে কখনও ছাড়ে না। ঈশ্বরীয় বোধে পূর্ণ পাগল ও বিকৃতমস্তিষ্ক পাগলের মধ্যে অনেক তফাৎ।

মৃত্যুর তাৎপর্য

যখন সমস্ত কর্মের মধ্যে 'আমি বোধ' থাকবে না, শুধু 'তুমি বোধ' থাকবে, তখনই অহংকারের আমি মরে যায়। দেহের মরা আসল মরা নয়, ওটা রূপান্তর মাত্র। অহংকারের অবসানই হচ্ছে মৃত্যুর[১] যথার্থ তাৎপর্য।

বস্তুর মাঝে একের অনুভূতিই হল অমৃত আস্বাদন

অহংকার মরলে কেবল রামনামই ফুটবে, আমার বোধ ফুটবে না। এই অবস্থায় অমৃতত্ব লাভ হয়। সমস্ত শব্দের মধ্যে যে একটাই শব্দ শোনে, সে-ই রামনামের মর্ম বোঝে। পাখির ডাক ও সর্বশব্দের মধ্যে সে রামনামই শোনে।

ঈশ্বর জ্ঞানে বস্তুজগৎও আনন্দময়

বস্তুকে ভগবান বললেও প্রাণে শান্তি পাওয়া যায়। ভগবানের সাক্ষাৎ পেলে তখন যথার্থ অনুভূতি হয় যে ভগবানই বস্তুরূপ নিয়েছেন। তখন এই বস্তুও ভাল লাগে।

স্বরূপের পরিচয় দ্বারাই সবকিছুর মূল্যায়ণ হয়

প্রত্যেকের ভিতরেই অনন্ত অতীত, অসীম বর্তমান ও অনাগত বিরাট ভবিষ্যৎ যুক্ত আছে। এই দেহেই দেহের বিনিময়ে তা জানা যায়। সবটার পরিচয় হয় একমাত্র স্বরূপের পরিচয় হলে।

পূর্ণ 'আমি'-র পরিচয় পেলে অপূর্ণ 'আমি' শান্ত হয়ে যায়

আমির পরিচয় ঠিক মত না-জেনেই সবাই আমি, আমি ব্যবহার করে। সকলের এই অপূর্ণ আমির মধ্যে একটা পূর্ণ আমি আছে। সেই পূর্ণ আমির পরিচয় পেলে অপূর্ণ ছোট আমিটা শান্ত হয়ে যায়। তখন পূর্ণ আমির স্বরূপ আপনিই প্রকাশ হয়ে পড়ে।

পূর্ণ আমির শরণ নিলে অপূর্ণ সসীম জীবের আমি শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত হয়ে যায়

পূর্ণ আমির মধ্যে কোন ভেদজ্ঞান, অজ্ঞান নেই। কোন মনের প্রাধান্য বা বিকার নেই। মন ও বুদ্ধির পিছনে সেই পূর্ণ আমির সন্ধান মেলে। আমি পারি, আমি জানি, এগুলি অপূর্ণ ছোট আমির কথা।

নির্বিকারের বক্ষেই বিকার খেলে

নিজের পরিচয় জানা না-হলে অন্যের পরিচয় জানা যায় না। বাইরের পরিবর্তন ও বিকার হয়, কিন্তু কেন্দ্রের বিকার বা পরিবর্তন নেই।

১। অভিনব সংজ্ঞা।

অদ্বয় নির্বিকার বোধে বিকারের অবসান

অখণ্ড পূর্ণবোধের আমিতে দ্বৈত নেই। অজ্ঞান জ্ঞান, পাপপুণ্য, ভালমন্দ, ধর্মাধর্ম নেই। একেই অদ্বয়তত্ত্ব বলা হয়।

মহাপ্রাণের বক্ষে মহাপ্রাণেরই অভিনয় হয় স্বমহিমায়

যা-কিছু কারণ সবই মহাপ্রাণ, যা-কিছু কার্য সবই মহাপ্রাণ, আমি তুমি সবই মহাপ্রাণ। কাঁচা আমি বা তুমি পূর্ণ নয়। মহাপ্রাণচৈতন্য আমি ও তুমি সাজে বটে কিন্তু তাঁর সত্যস্বরূপ নির্বিকার থাকে। [২১।৭।৬৮]

অদ্বয় ঈশ্বরের স্বভাব নিত্য অদ্বয়, জীবের স্বভাব বৈচিত্র্য

সচ্চিদানন্দঘন ভগবানের একটাই মাত্র ইচ্ছা, এক সত্য, এক ধর্ম, এক শক্তি, এক ধ্যান জ্ঞান আনন্দ প্রেম ও শান্তি। সে নিত্য এবং এক। কিন্তু মানুষের অনন্ত ইচ্ছা, অনন্ত শক্তি, অনন্ত রকম শক্তির গতি, যার ফলে মানুষের এত অস্থিরতা চঞ্চলতা ও অশান্ত ভাব।

ঈশ্বর বিচার করেন অর্থাৎ বিচরণ করেন একের মধ্যে এবং মানুষ বিচরণ করে বহুর মধ্যে। ঈশ্বর নিত্য একেতে প্রতিষ্ঠিত, মানুষ ঘুরে বেড়ায় বহুর মধ্যে।

একে দ্বন্দ্ব বিরোধ কিছুই নেই। দুইয়ের মধ্যে বা বহুর মধ্যে এলেই দ্বন্দ্ব, বিরোধ, অশান্তি। সেখানে হিংসা, দ্বেষ, ঘৃণা ও পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা। বহু হল অজ্ঞানের রাজ্য, সেখানে একে অপরকে ছোট করে নিজে বড় হতে চায়। অপরের সম্পদ কেড়ে নিয়ে নিজে সুখে থাকতে চায়, অপরকে ধ্বংস করে নিজে বেঁচে থাকতে চায়। এই হল বহুত্বের পরিণাম।

একের সন্ধান পেতে গেলে বহুর দিকে দৃষ্টি রাখলে চলে না। অনন্ত সুখ বা শান্তি পেতে হলে বহুকে ছেড়ে একেতে অর্থাৎ ঈশ্বরেতে থাকার চেষ্টা করতে হয়।

বহুমুখী মনকে একের সেবায় লাগিয়ে রাখাই ধর্মসাধনা

বহুর কারণ বা ভূমি হচ্ছে মন। কাজেই মনের ঊর্ধ্বে যাওয়া দরকার, অথবা মনকে একের সেবায় লাগিয়ে রাখা দরকার। প্রতিনিয়ত মনকে একের সেবায় লাগিয়ে রাখতে পারলে ছোট বড়, ভাল মন্দ, সাধু অসাধু এসবের দ্বন্দ্ব আর থাকে না।

শান্তি নিত্য আত্মার স্বরূপ, সাধনসিদ্ধি নয়

শান্তি প্রত্যেকের হৃদয়েতেই আবৃত আছে। নিজের মধ্যেই তাকে আবিষ্কার করতে হয়, বাইরে থেকে খুঁজে পাওয়া যায় না।

অহংকার আর মন অভিন্ন, একের নাশে অপরের নাশ—ফলে আত্মসিদ্ধি

মনের ভূমিতে অহংকারের প্রাধান্য। অহংকার মন নিয়ে চলে। অহংকার নাশ বা মনোনাশ একই কথা। মনের আর এক অংশের নাম বুদ্ধি। মন ও বুদ্ধির পার্থক্য খুবই কম। বোধের বিকাশের জন্য মন বুদ্ধি দুই-ই আগে সমর্পণ করে দিতে হয় আত্মার কাছে।

শান্তি হল আত্মসত্তায়, সুখ আরাম হল ইন্দ্রিয় মনে

আত্মসমর্পণের সাধনায় বাইরের সাহায্য না পেলেও অন্তর হতেই সাহায্য ও উপাদান দুই-ই পাওয়া যায়। অভ্যাসের ফলে অন্তর থেকে যদি শান্তি না পাওয়া যায় তাহলে বাইরের সুখ ও আরাম কখনওই প্রকৃত শান্তি দিতে পারে না।

অন্তরের এই শান্তি লাভের জন্য বহুরকম মতপথের বিধান আছে এবং ব্রহ্ম, আত্মা, গুরু, মা, ইষ্ট, ঈশ্বর প্রভৃতি বহুরকম নামের উল্লেখও আছে। সবগুলি এক অর্থবোধক। মতপথের দ্বন্দ্ব নিরর্থক।

আত্মবোধে শান্তি, দেহবোধে শান্তি নেই—অশান্তি, অসুখ আছে

জীবনের আসল উদ্দেশ্য হল সেই প্রশান্ত অবস্থাটি লাভ করা। সেজন্য যতক্ষণ একের সন্ধান না পাওয়া যায়, অবিচ্ছিন্ন শান্তি লাভ করা না যায় এবং বিকারবিহীন ত্রিগুণাতীত অবস্থায় না পৌঁছানো যায়, ততক্ষণ এগিয়ে যেতেই হয়। থামলে চলে না।

একেতেই ভূমা সুখ, দ্বৈতে তার অভাব

একেতে অখণ্ড শান্তি। তার মধ্যে কোন ছেদ নেই, কোন দ্বন্দ্ব নেই, কোন বিকার ধর্ম নেই, প্রকৃতির গুণের খেলা নেই। সেই অবস্থাই ভূমা সুখ ও শান্তি।

অবিদ্যা মায়া-ই প্রলোভনের কারণ, বিদ্যা মায়া করে তার নাশ

সুন্দর, মনোহর, প্রাণের তৃপ্তিদায়ক জ্ঞানের যত কথাই হোক না কেন, কোনমতেই যেন তার দ্বারা লুব্ধ হয়ে মানুষ থেমে না যায়। স্বরূপের পরিচয় আগে পাওয়া দরকার।

নিম্নপ্রকৃতির বিকারধর্মী প্রভাব অতিক্রম করতে ঊর্ধ্বপ্রকৃতির সাহায্য একান্ত আবশ্যক

মনের প্রভাবে বা নিম্নপ্রকৃতির প্রভাবে থাকা পর্যন্ত দুঃখকষ্ট কিছুতেই অতিক্রম করা যায় না। দুঃখকষ্ট অতিক্রম করার জন্য ঊর্ধ্বপ্রকৃতির সাহায্য প্রয়োজন হয়।

প্রতিনিয়ত ঊর্ধ্বপ্রকৃতির দ্বারা জীবন পরিচালিত হলে সহজেই লক্ষ্যে পৌঁছানো যায়। লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য চলার পথে ঊর্ধ্বপ্রকৃতিকে প্রতি মুহূর্তে সাথী করে নিতে হয়।

দ্বৈতবোধে সর্বসমস্যার পূর্ণ সমাধান হয় অদ্বৈতবোধে

একেতে পৌঁছে গেলে ভালমন্দ, উচুনিচু, ছোটবড়, পাপপুণ্য প্রভৃতি দুই-এর খেলা বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু সেগুলি অপরের থেকে যায়। তখন সাধকের মতপথের আর প্রয়োজন থাকে না। মতপথগুলি হচ্ছে স্টেশন বা বিশ্রামের স্থান, এটাই শেষ নয়। এসব অতিক্রম করে এগিয়ে যেতে হয়।

খণ্ডের ঘরে অশান্তি, অখণ্ডের ঘরে পূর্ণ শান্তি

সকলের শেষ গতি হল সেই শান্তির রাজ্য, যেখানে আমি তুমি, নাম রূপ ভাব কিছু নেই; আছে শুধু অখণ্ড আনন্দ। সেখানে না-যাওয়া পর্যন্ত থেমে যাবার উপায় নেই।

আগেই মতপথের কথা শুনে বিভ্রান্ত হলে গন্তব্যস্থলে যেতে বিলম্ব হয় শুধু। লক্ষ্যে যাবার পথে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বহুরকম বাধাবিঘ্ন আসে, সেজন্য সাবধান থাকতে হয়।

অপরের সুন্দর সুন্দর কথা শুনে যদি মনের শান্ত ভাবটি নষ্ট হয়, তাহলে সে-সব কথা সুন্দর নয়। সে-সব না শোনাই ভাল।

সত্য শিব সুন্দর হচ্ছে সেই চরমতম অবস্থা, যার বর্ণনা নানাজনে নানারকমভাবে ব্যক্ত করেছেন। সেই অবস্থাতেই পৌঁছানো হল সকলের জীবনের উদ্দেশ্য।

সবার অন্তরে নিহিত আত্মসত্তার প্রভাবেই সবকিছু সিদ্ধ হয়

বাইরের থেকে কেউ কিছু করে দিতে পারে না, যে পারে সে প্রত্যেকের ভিতরেই বসে রয়েছে। সে কোন ব্যক্তি নয়। সে সত্তা। সেখান থেকে সব কিছু ফুটে উঠছে, সেখান থেকেই সাধুসন্ন্যাসী, যোগী সৃষ্টি হচ্ছে।

যা-কিছু সাহায্য ভিতর থেকেই পাওয়া যায়। বাইরে সাধুসন্ন্যাসী মহাত্মারা শুধু বলে দিতে পারেন—কীভাবে চললে অন্তরের সেই শুদ্ধভাব ও জ্ঞানটি সহজে জাগ্রত হয়।

যা-কিছু বিকাশ অন্তর থেকেই হয়। যত কথা, যত ভাব সবই ঈশ্বরের, নিজের বলে দাবি করা চলে না।

ভক্তিতে মন গলে যায়, জ্ঞানবিচারে মনোনাশ হয়—ফলে মুক্তি শান্তি লাভ হয়

মন এত চঞ্চল যে সহজে স্থিরত্বে আসে না। মনটা অ-মন না-হওয়া পর্যন্ত লক্ষ্য স্থির রেখে এগিয়ে যেতেই হয়। নিরন্তর ঈশ্বরকে স্মরণে রেখে চলতে হয়, তাহলেই নিজের ক্ষুদ্র আমিটাকে ভুলে থাকা যায়।

জানাজানি বোঝাবুঝিটা বড় কথা নয়। এককেতে পৌঁছে গেলে সব জানা বোঝার সঙ্গে ক্ষুদ্র আমিটাও লয় হয়ে যায়। তখনই পূর্ণ শান্তি লাভ হয়। যেখানে দুই নেই, সেখানেই শান্তি।

অখণ্ড মহাপ্রাণ সত্তায় তৎপরায়ণ হলে তদ্‌গতচিত্ত হয়

সবই মহাপ্রাণ। মহাপ্রাণ ছাড়া আর কোথাও কিছু নেই। এই দেখতে দেখতে মন শুধু প্রাণকেই দেখতে পায়। বহু সাধনার পরে সাধকদের নির্মানচিত্ত তৈরি হয়, যার দ্বারা তারা শুধু এককেই দেখে। এই এক কখনও হারায় না।

ভগবান, গুরু, জীবনরথের সারথি সবারই অন্তরেতে প্রতিষ্ঠিত। তাঁর শরণাগত হয়ে ব্যাকুলভাবে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করলে প্রত্যেকের বুদ্ধিতে অধিষ্ঠিত হয়ে বুদ্ধিযোগ দিয়ে শরণাগত ভক্তজনকে তিনি সাহায্য করেন। তাঁর নির্দেশেই বদ্ধ মানব মুক্ত হওয়ার সাহায্য পায়।

বুদ্ধিযোগের সাহায্যে অন্তর হতে ভগবান জ্ঞাননয়ন, বোধনয়ন তথা তৃতীয় নয়নটি খুলে দেন। তখন নিজের মধ্যে ভগবানকে, ভগবানের মধ্যে নিজেকে এবং একের মধ্যে বহুকে এবং বহুর মধ্যে একেকে নিরন্তর বোধনয়নে দেখে তাঁর মধ্যে নিজেকে পূর্ণভাবে অনুভব করা সম্ভব হয়। এই হল একের পূজা।

পূজা করতে গেলেও সেই একেকেই পূজা করতে হয়। কথাগুলি সেই একেরই কথা। যোগী, অবতার, মহাপুরুষ, যার মুখ দিয়েই কথা বেরোয়, সেই একের কথা, ঈশ্বরের কথাই। সবার মধ্যে মালিক একজন। কথার মালিক সেই যোগী, সন্ন্যাসী বা মহাপুরুষ নয়।

বহুকথা—সেই একেরই প্রতিধ্বনি। বহুকে প্রয়োজন নেই। বহুর মধ্যে একেকেই ধরতে হয়। কোন মতপথ বা সম্প্রদায়ের দরকার নেই। দরকার শুধু একেকে।

মানলে অমর, না-মানলে কেবল সমর

মনকে প্রশ্রয় দিলে দুঃখকষ্ট বাড়ে, সংগ্রাম বেশি করতে হয়। সেই জন্য আদি মধ্যে অন্তে একের বোধে, একের সঙ্গে যুক্ত থাকার প্রচেষ্টাই জীবনসাধনার সার কথা। [২২।৭।৬৮]

এক চাওয়ারই দ্বিবিধ রূপ—গতি ও স্থিতি, ভোগ ও ত্যাগ

জীবনের গতি শুরু হয় চাওয়া দিয়ে এবং শেষ পরিণতিও এই চাওয়া দিয়েই হয়। চাওয়া বাড়লে জীবনের গতি বাড়ে এবং চাওয়া কমলে জীবনের গতি কমে। গতি বাড়লে অস্থিরতা, চঞ্চলতা, অশান্ত অবস্থা হয়, গতি কমলে স্থির শান্ত সম অবস্থা।

জীবনের আদি অন্তে শান্ত, মধ্যে কেবল অশান্ত

প্রশান্ত চৈতন্যসত্তার বক্ষ থেকেই জীবনের আরম্ভ হয় এবং ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়ে আবার সেই প্রশান্ত চৈতন্যসত্তার সঙ্গে একাকার হয়ে মিশে গিয়েই তার গতির সমাপ্তি হয়। মাঝখানে অশান্ত অবস্থায় থাকা পর্যন্ত শুধু চাওয়া থাকে। অখণ্ড চৈতন্যসত্তার সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্যই এই প্রাণের চাওয়া।

বহু চাওয়া এক চাওয়ারই বিকার, সর্ববিকার নাশে চাওয়া একে ফিরে আসে

এই প্রাণের চাওয়া ভাগ ভাগ হয়েই দেহের চাওয়া, মনের চাওয়া, বুদ্ধির চাওয়া রূপে প্রকাশ পায়। চাওয়া কখনও থাকে স্বল্প, কখনও থাকে বিরাট। যথার্থ চাওয়ারূপ ধর্মই জীবনকে ধারণ, পালন ও রূপান্তরিত করে পূর্ণ করে চলেছে।

এক চাওয়াই বহু মানের কারণ বহু হয়, আবার একে ফিরে আসে

সমস্ত প্রাণীজগতের মধ্যেই এই চাওয়া চলছে। ভূত প্রকৃতি, জড় প্রকৃতি, দৈবী প্রকৃতি, ঈশ্বরীয় প্রকৃতি সকলের মধ্যেই চাওয়া আছে, কিন্তু তার মানের তারতম্য থাকে শুধু।

বীজের থেকে জড়ত্ব ভেঙ্গে যেমন গাছ বেরিয়ে আসতে চায় ও নিজেকে প্রসারিত করতে চায়, বরফ যেমন গলে বিস্তৃত হতে চায়, আবার জল বাষ্প হয়ে আকাশে উঠে বৃষ্টি হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে চায় ও সমুদ্রবক্ষে মিশে যেতে চায়, সেইরকম প্রশান্ত চৈতন্যসত্তার থেকে বেরিয়ে এসে আবার তাঁর বক্ষে ফিরে যাবার জন্য প্রতিটি জীবও ব্যাকুল হয়।

পাহাড় হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে অণুপরমাণুগুলি পৃথক হয়ে ছড়িয়ে পড়ে আবার প্রতিটি ধূলিকণা বা অণুপরমাণু একত্র হওয়ার ইচ্ছায় জমাট বেঁধে পাহাড়ে রূপান্তরিত হয়। এইরকম ভাবে পুনঃপুনঃ ব্যষ্টি ও সমষ্টির প্রকাশ-লীলা চলে।

পরমাত্মার অভিনব জীবলীলা

ব্যষ্টি জীব একবার এক অখণ্ড চৈতন্যসত্তার সঙ্গে মিশে একীভূত হয়ে যায়, আবার নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ব্যষ্টিরূপ ধারণ করে বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়ে পরিভ্রমণ করতে করতে ক্রমশ পুনরায় অখণ্ড চৈতন্যসত্তার দিকে অগ্রসর হতে থাকে।

চাওয়া শুধু মনুষ্যজগতেই সীমাবদ্ধ নয়। পশুপাখিদের মধ্যেও চাওয়ার প্রবৃত্তি দেখা যায়। তাদের মধ্যে

চাওয়া অনুরূপ আহার সংগ্রহ করা, জোড় বাঁধা, নীড় তৈরি করা, বিশ্রাম করা, ডিম ও ছানা তৈরি করা, তাদের লালন পালন করা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশের মধ্যে চাওয়ারই অভিব্যক্তি ক্রমধারায় আত্মপ্রকাশ করে পূর্ণতার দিকে সবাইকে নিয়ে চলেছে।

জীবলীলায় চাওয়ার বৈশিষ্ট্য

প্রাণীজগতের মধ্যে মানুষ একটা বিশেষ স্তর মাত্র। চাওয়ার গতি বা প্রকৃতি হিসাবেই মানুষ সঙ্গ করে। যারা বস্তু চায়, তারা বস্তুর সঙ্গ করে। যারা গুণ বা শক্তি চায়, তারা যেখান থেকে সেটা পাওয়া যায় সেখানেই যায়। যারা শান্ত হতে চায় তারা নির্জনতা খোঁজে। যারা বিশ্রাম চায় তারা ঘুমিয়ে পড়ে।

চাওয়া না-থাকলে আত্মার বিকাশ হয় না। আত্মার বিকাশ উত্থান-পতনের মাধ্যমে পরপর সবাইকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। জীবনের গতির কারণটা হচ্ছে চাওয়া, কার্যটা হচ্ছে পাওয়া। চাওয়া-পাওয়ারূপ পূর্বাপর সম্বন্ধ ধরে, কারণ-কার্যের সম্বন্ধ ধরে জীবনের গতি সবারই পরিণতির দিকে এগিয়ে চলছে।

সৎসঙ্গে যাবার ও চাওয়ার তাৎপর্য

সৎসঙ্গে যাবার উদ্দেশ্য হচ্ছে—অজ্ঞাত বস্তুকে জ্ঞাত হওয়া, অশুদ্ধকে শুদ্ধে পরিণত করা, অপূর্ণ থেকে পূর্ণ হওয়া, সসীম হতে অসীমে যাওয়া, 'না'-কে 'হাঁ'-তে পরিণত করা, দুঃখকে সুখে পরিণত করা, ব্যাধি হতে নিরাময় হওয়া, অভাব থেকে স্বভাবে যাওয়া, ঘৃণাকে ভালবাসায় পরিণত করা, স্বার্থকে পরার্থে ও লঘুকে গুরুতে পরিণত করা, বিষয়কে বিষ্ণুতে পরিণত করা, মায়াকে 'মা'-তে পরিণত করা, মৃত্যুকে অমৃতময় জীবনে পরিণত করা এবং আমিকে তুমিতে পরিণত করা। অর্থাৎ জীবনকে সত্য-শিব-সুন্দরের সঙ্গে পরিপূর্ণ ভাবে যুক্ত করা।

প্রত্যেকেই সৎ অর্থাৎ একের দিকে এগিয়ে চলছে। সৎসঙ্গের মাধ্যমেই হওয়া বা পাওয়ার রহস্য বা তাৎপর্য পরিষ্কার হয় এবং পূর্ণতালাভের জন্য সমস্ত রকম উপাদান সংগ্রহ করা সম্ভব হয়।

সত্য প্রত্যেকের ভিতরেই আছে—এই কথা বলার উদ্দেশ্য হল যে, যা নিজের ভিতরে আছে তা অনুভূত হলে তবেই বাইরেও যে সত্য আছে তা অনুভূত হয়। তা নাহলে বাইরে যা দেখা যায় তা অন্তরে অনুভব করা শক্ত।

সৎ অখণ্ড পূর্ণ

যা সৎ, তা-ই অন্তর, তা-ই বার। আসল কথা 'সৎ'-এর মধ্যে অন্তর বা বার কিছুই নেই। নিজের অন্তরের পরিচয় পেলেই বহিঃপ্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়।

অস্থিরতা চঞ্চলতাই হল সকলের আসল ব্যাধি। কেউ চায় শান্তি, কেউ চায় শক্তি, কেউ মুক্তি, কেউ ভক্তি। কেউ চায় জ্ঞান, বিদ্যা, ঐশ্বর্য। সাধু মহাপুরুষরা দেন এমন ওষুধ যার দ্বারা কামনা-বাসনার বীজ নির্মূল হয়ে যায়।

পূর্ণ সমর্পণের গুরুত্ব

আত্মসমর্পণ কথাটা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। প্রত্যেকের 'আমিটা'-কে পরিপূর্ণভাবে সমর্পণ করে ঈশ্বরের হাতের যন্ত্রস্বরূপ হয়ে যেতে হবে।

ঈশ্বরের কৃপা-করুণার লক্ষণ

যে-সব কাজ অসম্ভব বা কঠিন বলে পূর্বে মনে হয়, সে-সব কাজ যখন অতি সহজে নিষ্পন্ন করা সম্ভব হয় তখনই বুঝতে পারা যায় যে ঈশ্বরীয় কৃপা বা করুণা লাভ হয়েছে।

তিন শ্রেণীর ভক্ত

ভক্ত তিন শ্রেণীর। ভক্তির প্রথম অবস্থায় ঈশ্বরকে ভাল লাগে এবং ভক্ত তখন ঈশ্বরের বিগ্রহ, ছবি, পট বা মূর্তি নিয়েই তুষ্ট থাকে। সেই অবস্থায় ঈশ্বরের অপর ভক্তদের সে ভালবাসে না এবং মানতেও পারে না।

দ্বিতীয় স্তরে এসে ভক্ত ঈশ্বরের অপরাপর ভক্তদের সেবা করে। অসহায়, অজ্ঞান ও দুঃস্থদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন থাকে এবং দোষী ও পাপীদের প্রতি উদাসীন হয়ে থাকে।

তৃতীয় স্তরে এলে ভক্ত সর্বরূপ, সর্বনাম, সর্বভাব, সর্ববোধেই ভগবানকে অনুভব করে। তখন সে সর্ব ইন্দ্রিয় দিয়ে ঈশ্বরকে গ্রহণ করে ও তাঁর সেবা করে। সবাইকে একের মধ্যে এবং এককে সকলের মধ্যে দেখে। One in all and all in One. এখনে এসেই ভক্তের অদ্বৈত বোধ হয়।

অদ্বৈতের ভক্তি স্বতঃসিদ্ধ স্বতঃস্ফূর্ত

অদ্বৈত বোধ হলে ভক্ত সকলকে ঈশ্বরজ্ঞানে সেবা করে। He loves all as Divine, and loves Divine as all. তখন অন্তরে বাইরে সমবোধের ধারা অবিরাম চলতে থাকে।

ভক্তির পরিপক্ক অবস্থায় ভক্তের ভার ভগবানই গ্রহণ করেন

তৃতীয় স্তরে আসতে গেলে বজ্রের মত দৃঢ় বিশ্বাসের প্রয়োজন। এখানে কোন রকম বিচার, সংশয় থাকলে চলে না। তর্ক করলে চলে না। অন্ধের মত বিশ্বাস ও নির্ভরতা থাকা চাই, তাহলেই ভগবান ভক্তকে সর্ব অবস্থায় রক্ষা করেন।

ভক্তের হল মানা, ঈশ্বরের হল জানা

পৃথক করে কোন কিছুর জানাজানির প্রয়োজন থাকে না। জানতে চাইলেই ঈশ্বর হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে হয়। জানার মালিক ঈশ্বর এবং মানার মালিক ভক্ত। 'আমির' নাশ হলেই আত্মানুভূতি হয়। প্রেম বা পরাভক্তি আসে তারও পরের পর্যায়ে। ভক্তির এই চরমতম অবস্থায় পৌঁছলে ভক্ত অতি সাধারণভাবে জীবন যাপন করে।

সত্ত্বগুণীর ভক্তির বৈশিষ্ট্য

ভক্তি মার্গে চলতে গেলে সবকিছুর সমান মূল্য দিতে হয়। সমস্ত কিছুর মধ্যে ঈশ্বরকে মেনে চলতে হয়। সত্ত্বগুণী অন্তরে ঈশ্বরকে ভজনা করে, বাইরে কাউকে জানতেও দেয় না। অথচ বেশির ভাগ লোকই জাঁকজমক করে পূজা করে অপরকে জানিয়ে। সাধনার প্রথম অবস্থায় অন্তরের ভাব খুব গোপনে রাখা বিধেয়।

রাম শব্দের নিগূঢ় তত্ত্ব

রাম—র্ +আ+ ম। 'র' মানে স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণের সমগ্র ক্রিয়াশক্তি। 'আ' মানে আনন্দ। 'ম' মানে পূর্ণজ্ঞান, চৈতন্য। সমগ্র ক্রিয়াশক্তি যখন 'আ' অর্থাৎ আনন্দের সঙ্গে যুক্ত হয় তখন হয় 'রা'। এই অখণ্ড

আনন্দশক্তি যখন সমগ্র জ্ঞান বা চৈতন্যসত্তার সঙ্গে মিলিত হয়, তখন হয় রাম। এই হচ্ছে যুগলমূর্তির তাৎপর্য। এই তত্ত্ব হচ্ছে সকল তত্ত্বের সার তত্ত্ব। তত্ত্ব হচ্ছে সবকিছুর সারাৎসার। এ-ই রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি। 'রা' ও 'ম' হচ্ছে সত্তা ও শক্তি।

রাম অর্থ রাধা-মাধব। 'রা'তে আধা, 'ম'তে আধা। এই আধায় আধায় যুগল সাধা। রাম বা কৃষ্ণ বললে শুধু ব্যক্তিকে বোঝায় না, তত্ত্বকে বোঝায়। সমগ্র শক্তি, সমগ্র জ্ঞান, ও সমগ্র আনন্দের ঘনীভূত মূর্তি হল রাম।

কৃষ্ণ শব্দের নিগূঢ় তত্ত্ব

কৃষ্ণ—ক্ +রি +ষ +ণ। ক =মৃত্যুর বিপরীত অমৃতত্ব। রি—'র' যখন ইচ্ছা যুক্ত হয়ে গতি প্রাপ্ত হয়। 'রি'-এর তত্ত্ব সমগ্র পাপের বিপরীত। 'ষ' মানে নির্বিকারত্ব ও শান্ত অবস্থা। 'ণ' মানে নির্বাণ বা মুক্তি। অর্থাৎ বাইরের বিকারের (outward disturbance) বিপরীত।

রাম বা কৃষ্ণের তত্ত্ব বাদ দিয়ে রামনাম, কৃষ্ণনাম অথবা তাঁদের রূপ চিন্তা করলেও কাজ হয়। ভগবানের বিশেষ রূপ বা নির্বিশেষ রূপে (Personal God বা Impersonal God) বিশেষ পার্থক্য নেই।

ভাব অনুযায়ী সাধনার অনুশাসন

নাম রূপের চিন্তা বা তত্ত্বের চিন্তা প্রত্যেকের নিজের প্রকৃতি অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন রকম হওয়া সম্ভব। সেই জন্যই মহাপুরুষগণ ভগবান সম্বন্ধে বলতে গিয়ে ভিন্ন ভিন্ন লোককে ভিন্ন ভিন্ন রকম ভাবে বলেছেন।

প্রত্যেকের চাওয়া অনুরূপ বা প্রকৃতি অনুরূপ ভিন্ন ভিন্ন রকম ভাবে ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ হলেও সকলেরই প্রতিপাদ্য বিষয় এক ঈশ্বরই। চাওয়া অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন লোকের কাছে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অভিব্যক্ত হয়।

সৎসঙ্গের প্রয়োজনীয়তা

অশান্ত মনকে শান্ত করা এবং মনের সংশয় দূর করা প্রয়োজন। ঠিক ঠিক ভাবে সকলে এগোচ্ছে কিনা এটা মেলানো দরকার। এই সব কারণেই সৎসঙ্গের প্রয়োজন হয়। যারা উন্নত পর্যায়ে সৎ-এর দিকে এগিয়ে যেতে চায়, তারাই সৎসঙ্গে যায়।

সৎ ও অসতের পার্থক্য মূলত গুণগত মানের পার্থক্য

অসৎ ও সৎ-এর মধ্যে শুধু ডিগ্রী বা মানের তারতম্য। ছোট ছেলে বৃদ্ধের পূর্ব অবস্থা এবং অপূর্ণ রূপ (miniature form), এখানেও শুধু মানের তারতম্য।

সৎসঙ্গের মহিমা

সৎসঙ্গ is the place where the beacon light of the lighthouse in the dark ocean can be found। সৎসঙ্গ is the torch-bearer of the Divine light, Wisdom, Perfection, Realization, Absolute Peace and Love।

ভক্ত ও ভগবান অভিন্ন তত্ত্ব

জীবনের উদ্দেশ্য হল চরমতম অবস্থায় পৌঁছানো। ভক্তহৃদয়েই ঈশ্বরের পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি হয়। সেই ভক্ত

ভগবান ছাড়া আর কিছুই জানে না। তাঁকে দর্শন করলেই ভগবানের পরিচয় পাওয়া যায়। এক মুহূর্তও যদি কেউ সৎসঙ্গ করতে পারে তবে সে রাজা হওয়ার চেয়েও অধিকতর লাভবান হয়।

মহাপুরুষের মাধ্যমে পরমাত্মা পরমেশ্বরই নিজেকে প্রকাশ করেন

মহাপুরুষরা সর্বদাই একের কথা বলেন। এই কথাগুলি তাঁদের নিজেদের নয়। তাঁদের মাধ্যমে স্বয়ং ঈশ্বরই বলেন।

সংসারীদের বিষয়চিন্তা মুখ্য, ঈশ্বরচিন্তা গৌণ—মহাপুরুষদের তার বিপরীত

ভক্তের হৃদয় হল নিত্যবৃন্দাবন। প্রত্যেকের হৃদয় যেন নিত্যবৃন্দাবনে পরিণত হয়, সেইরকম চেষ্টা সবারই থাকা উচিত। সাধারণত মানুষের চাওয়াটা সর্বদা ক্ষুদ্র থাকে বলেই এরকম সম্ভব হয় না। মহাপুরুষরা সর্বদা ঈশ্বরীয় কথা বলেন; কিন্তু সাধারণ মানুষের ক্ষুদ্র, ছোট ছোট চাওয়াই বেশি থাকে, তার সঙ্গে অতি সামান্যই থাকে ঈশ্বরীয় জিজ্ঞাসা।

মতবাদের মাধ্যমে ঈশ্বরে পৌঁছান যায় না

সৎসঙ্গে যেতে হলে প্রথমেই শান্তভাব হওয়া চাই। নিজেকে সমর্থন করা (self-justification) কোন মতেই উচিত নয়। ঈশ্বরের মতে বা ভক্তিপথে চলতে গিয়ে নিজের মত বা ইচ্ছা বজায় রাখার চেষ্টা কোনমতেই চলে না।

নিজের মত না চেয়ে ঈশ্বরের মত হতে হবে

নিজের মত করে ঈশ্বরকে না-চেয়ে, ঈশ্বরের মত সবাইকে হতে হবে ও চলতে হবে। পরের মতকে প্রাধান্য দিতে হয় আগে। এটাই হল আসল পূজা।

বিনীত ও নম্রভাব দিব্যগুণ

আত্মসমপর্ণের পথে যত বেশি নম্র হওয়া যায়, ততই অগ্রগতি হয়। বিনীত ও নম্রভাব ঈশ্বরীয় গুণ। একান্তভাবে ঈশ্বরের হয়ে যেতে হবে—এই দিকে লক্ষ্য রেখে চলতে হয়। পরিপূর্ণভাবে ঈশ্বরের হয়ে যেতে পারলে ঈশ্বর তাঁর সমস্ত মাধুর্য ভাণ্ডার ভক্তের কাছে খুলে ধরেন।

করুণাঘন ঈশ্বর ভক্ত জ্ঞানী যোগীর অতীব প্রিয় ও আপন

করুণাঘন ঈশ্বরের অনন্ত মহিমার শেষ নেই। অহংকার ও অভিমান পরিত্যাগ করে ঈশ্বরের কাছে পরিপূর্ণভাবে নিজেকে সমর্পণ করতে পারলে সর্ব অবস্থায় ঈশ্বর ভক্তকে রক্ষা করেন এবং সমস্ত ঈশ্বরীয় মহিমা নিয়ে স্বয়ং ঈশ্বর তার মধ্যে অভিব্যক্ত হন।

মনোরমা শব্দের তাৎপর্য

মনোরমা—মনেতে রহ মা। মা যদি মনে থাকে, তবে আর কোন ভাবনা নেই। সৎসঙ্গে গেলে সব শব্দের কেন্দ্রের অর্থ পরিষ্কার হয়ে যায়। সৎসঙ্গে গেলে জোর করে কিছু ত্যাগ করার প্রয়োজন হয় না। সৎসঙ্গের প্রভাবে আপনিই সব ত্যাগ হয়ে যায়।

কাম-কাঞ্চন ভাবশূন্য মনই শুদ্ধ ও দিব্য মন, ঈশ্বরের নিত্য আসন

রামকৃষ্ণদেব কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ করতে বলেছিলেন। কামযুক্ত মন নিয়ে যার সঙ্গে মেশা হয় তাকে বলে কামিনী। মনেতে যদি মা থাকেন তবে ভার্যার মধ্যেও মাকেই দেখা যায়। তখন কাম প্রেমেতে পরিণত হয়।

অর্থ ও পরমার্থের পার্থক্য

অর্থ যখন পরমার্থের দিক থেকে বিচ্যুত হয়, তখনই কাঞ্চন বলা হয়। সেটাকেই ত্যাগ করতে বলা হয়েছে। প্রাণের প্রয়োজনের জন্য যে অর্থ সেটা কখনও অনর্থ হতে পারে না। অর্থ অন্যকে ঠকিয়ে পুঞ্জীভূত করে রেখে ব্যক্তিগত সুখের জন্য নয়। অর্থ যথার্থ ভাবে ব্যয় করতে হয় সমান ভাবে; অর্থাৎ ঈশ্বরবোধে ঈশ্বরের সেবায় ব্যয় করতে হয়। [২৩।৭।৬৮]

তত্ত্বের দৃষ্টিতে ঈশ্বরই স্বয়ং সাধ্য, সাধক, সাধন ও সিদ্ধি

সাধনার আসল রহস্য—ঈশ্বর নিজেই লক্ষ্য বা উপেয় এবং নিজেই আবার উপায় হয়ে সকলের কাছে আসেন প্রত্যেকের যোগ্যতা অনুসারে যোগ্যতর করে নিজের সঙ্গে মিলিয়ে নেবার জন্য। কাজেই কোন মতপথই ছোট নয়, সমান। প্রত্যেকেই নিজের প্রকৃতি অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন রকম পথের সন্ধান পায়।

প্রেমস্বরূপ ভগবানের অনন্ত মহিমা

প্রেম হচ্ছে ভগবানের ভালবাসার ঘনীভূত অবস্থার নাম। প্রেম সব মতপথেই আছে। ভগবান স্বয়ং প্রেমস্বরূপ। প্রেমস্বরূপ ভগবানের অস্তিত্ব ছাড়া কোথাও কিছু নেই। শক্তি জ্ঞান আনন্দ সবকিছু প্রেমের মধ্যেই আছে এবং এই সবকিছুর মধ্যেও প্রেমই আছে।

সর্ব সাধনার মূল একই

প্রেমস্বরূপের যাকিছু প্রকাশ তা প্রেম ছাড়া কখনও নয়। মায়ের পাঁচটি আঙ্গুলকে মায়ের পাঁচটি সন্তান ধরে থাকলে যেমন মাকেই ধরা হয়, সেইরকম কর্ম ভক্তি জ্ঞান যোগ প্রভৃতির যে যে-পথ ধরেই চলুক, এক ঈশ্বর বা মাকে ধরেই চলেছে।

ঈশ্বরের স্বরূপমহিমা

প্রেমই ঈশ্বর, ঈশ্বরই প্রেম। আনন্দই ঈশ্বর, ঈশ্বরই আনন্দ। জ্ঞানই ঈশ্বর, ঈশ্বরই জ্ঞান। শক্তিই ঈশ্বর, ঈশ্বরই শক্তি। সবটার সঙ্গে ঈশ্বরের সমান সম্বন্ধ। স্বভাবপ্রকৃতি অনুযায়ী বিভিন্ন লোকের কাছে বিভিন্ন ভাবে প্রকাশ হয়। ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে ঈশ্বর সকলকে তাঁর নিজের কাছেই টেনে নিচ্ছেন।

ঈশ্বরানুভূতি হল সত্যের পরিচয়

খেলার শেষে বোঝা যায় যে ঈশ্বরের মধ্যেই সকলে আছে এবং সকলের মধ্যে এক ঈশ্বরই আছেন। তাঁর বাইরে কেউ নেই।

জগৎলীলা হল ঈশ্বরের আনন্দবিলাস

তিনি নিজেকে বৈচিত্র্যরূপে সৃষ্টি করেছেন খেলবার জন্য, নিজেকে নিজে আস্বাদন করার জন্য। প্রেমময় সচ্চিদানন্দঘন ভগবান প্রেমের আবেশে আনন্দের আতিশয্যে নিজেকে নিজের মধ্যে বহুরূপে প্রকাশ করেছেন। এই প্রকাশটাই সৃষ্টি।

সৃষ্টি হচ্ছে তাঁর প্রেম ও ভালবাসার অভিব্যক্তি। কাজেই সৃষ্টির পরিপূর্ণ ধ্বংস কখনও সম্ভব নয়। নিজেকে নিজে আস্বাদন করার জন্য, নিজেকে জানবার জন্য নিজের ভিতর থেকেই তিনি বহুর সৃষ্টি করেছেন।

তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ হলেন প্রেমিক পাগল শিরোমণি

যে তত্ত্বজ্ঞ হয় সে সত্যই পাগল। তত্ত্বজ্ঞ না হলে কেউ পাগল হয় না। এই পাগলের ব্যবহার বড় অদ্ভুত। এ জগতে পাগল ছাড়া কেউ তাদের ভালবাসতেও পারে না।

জীবনের সর্ব সমাধান হয় ভগবৎ (আত্ম) প্রেম ও জ্ঞানে

জীবনে যদি এরকম পাগল হওয়ার মত কারওর সুযোগ আসে তবেই সে হয় সত্যিকারের ভাগ্যবান। তা নাহলে পৃথিবীতে আর এমন কোন বস্তু বা শক্তি নেই যার সাহায্যে মানুষের ব্যথা দুঃখকষ্ট অভাব দূর হয়, প্রাণের ক্ষুধা নিবৃত্ত হয় বা প্রাণের অতৃপ্ত ও অশান্ত ভাব তৃপ্ত ও শান্ত হয়।

ভাগবৎ প্রেমিক পাগল এসেই জীবজগৎকে উদ্ধার করেন

জগতকে ভালবাসেন বলে ভগবান নিজেই পাগলের বেশে এসে জগৎকে রক্ষা করেন। পাগলদের মাধ্যমেই তাঁর মহৎ দান ছড়িয়ে পড়ে। প্রতিটি প্রাণসত্তাকে তিনি নরকের থেকে উদ্ধার করেন; অর্থাৎ প্রত্যেককে আপনার ঘরে, স্বরূপের ঘরে, ঈশ্বরের পাদপদ্মে বা তাঁর রাতুল চরণে, অথবা তাঁর অমৃতময় বক্ষে, শান্তির কোলে পৌঁছে দেন।

এই পাগলরাই হলেন জগৎগুরু, সমগ্র বিশ্বের নিঃস্বার্থ বন্ধু, কাঙ্গালের ঠাকুর। প্রাণের কী বেদনা, কী অভাব সেটা এঁরাই ভাল বোঝেন। সেজন্য এঁরা ওষুধের ব্যবস্থাও এমন ভাবে দেন, যে-ওষুধের কখনো মিশ্রণ হয় না। তাঁদের চরণে একটি প্রণাম পৌঁছালেও তাঁরা সেটা ঈশ্বরের পাদপদ্মে পৌঁছে দেন।

ভক্তের বোঝা ভগবান বয়

পূর্ণ সমর্পণের পরে পাগল হলে ভক্তের ভার তার নিজের আর বহন করতে হয় না, নিজের জন্য কোন চিন্তাও করতে হয় না। স্বয়ং ভগবানই তার ভার বহন করেন। তিনি নিজে শুধু ঈশ্বরের নামে ডুবে থাকেন।

এঁদের পাগল বলার কারণ—গোল বস্তু যেমন সর্বত্র গড়িয়ে যেতে পারে, নিজেকে নিজে রক্ষা করতে পারে না, নিজের ভার সামলাতে পারে না, সেইরকম এঁদেরও নিজের দেহ রক্ষা করবার জন্য কিছুই করতে হয় না।

এঁরা সর্বত্র সর্বদা সমান অবস্থাতে থাকেন। তাঁদের প্রাণের ঠাকুর সর্বত্রই আছেন। সর্বস্থানই মায়ের কোল এই তত্ত্ব তাঁদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়।

যতরকম আঘাত ঝড় ঝঞ্ঝা এসে তাঁকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করুক তাঁর প্রতিটি অণুপরমাণুতে ভগবানই আছেন—এই বোধেই তাঁরা প্রতিষ্ঠিত থাকেন।

সমগ্র প্রাণসত্তার মধ্যে যেখানে যাকিছু হোক, প্রাণের মধ্যেই প্রাণ থেকে যায়। সে জন্য মহাভক্ত প্রহ্লাদ সমস্ত রকম নির্যাতন লাঞ্ছনার মধ্যেও তার প্রিয়তম হরিকেই অনুভব করেছে।

সমর্পণের বিধান

প্রার্থনা করতে হয়—'তুমিই আমার প্রাণের প্রাণ, তুমিই আমার একমাত্র আশ্রয়।' এইভাবে প্রার্থনা করে পরিপূর্ণভাবে নিজেকে ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করে দিতে পারলে সমস্ত রকম বিরুদ্ধ শক্তিই পরাভূত হয়ে ফিরে যায়।

ভক্তের মহিমা অভিনব

ভক্তের আচরণটা শিক্ষনীয় বিষয়। প্রহ্লাদের মত বিশ্বাস, শ্রীরাধা, মীরাবাঈয়ের মত ব্যাকুলতা, রামদাস, তুকারাম বা বাল্মিকীর মত সর্বদা অবিরত মুখে নাম থাকা চাই। হনুমানের মত অনুগত ভক্ত ও নিষ্কামকর্মী হতে হয়।

হনুমান যেমন রামনাম উচ্চারণ করে সমুদ্র পার হয়েছিলেন, সেইরকম ভাবে ভগবানের নামে সংসার সমুদ্রও পার হওয়া যায়। প্রেমভক্তির পথে এঁরাই হচ্ছেন সকলের আদর্শ দৃষ্টান্ত। এঁদের আদর্শ অবলম্বন করে, এঁদের সামনে রেখে চললে এঁরা পাশে এসে সাহায্য করেন। এঁরা নিত্য অমর। ভক্তের মৃত্যু নেই।

জীবনের চরম ও পরম গতি

ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা জীবনে আনন্দ ও প্রেম নিয়ে আসে। জীবন ঈশ্বরময় ও সরস হয়ে যায়। এটাই হল জীবনের চরম ও পরম গতি।

ঈশ্বরের আশ্রিতের নাশ নেই

জীবন শুধু ঈশ্বরের জন্যই যেন হয়, তাহলে বাইরের শত্রু আর কিছুই করতে পারে না। একবার তাঁর হয়ে যেতে পারলে আর কোন ভয় নেই। জীবন ঈশ্বরে সমর্পিত না-হওয়াতেই দুঃখ কষ্ট ব্যাধি এবং শত্রু দ্বারা প্রপীড়িত হতে হয়।

বিনা শর্তে যে প্রার্থনা তাই ফলপ্রদ

অন্তত পাঁচ মিনিটের জন্য হলেও সুযোগ সুবিধা মত একবার তাঁর কাছে প্রার্থনা করলে চিত্ত মন শুদ্ধ হয়ে যায়। তবে কোনরকম মতলব বা স্বার্থবুদ্ধি নিয়ে প্রার্থনা করা উচিত নয়। একাগ্রচিত্তে সরলভাবে প্রার্থনা না-হলে তা ব্যর্থ হয়। সামনে শুধু ভগবানকেই রাখতে হয়।

ভক্ত ও অভক্তের আচরণ

ভক্ত সামনে ভগবানকে রেখে নিজে পেছনে থাকে। যে নিজে সামনে থেকে ভগবানকে পেছনে রাখে সে অভক্ত।

ভক্ত সামনে যাকিছু দেখে সেই সবকিছুর মধ্যে তার প্রিয়তমকেই দেখে। সর্ব রূপ, নাম, ভাব, বোধ সে ঈশ্বরবোধেই গ্রহণ করে। তাঁর সন্তান অণুতম অংশ হলেও মহান ভগবানের কোলে তাঁর প্রিয়বোধে সবাই থাকতে পারে।

'আমি', 'আমার' ব্যবহারশূন্য হলে যথার্থ ভক্তের লক্ষণ প্রকাশ পায়

ভক্তির সাধনা সরস, কোনরকম কঠোরতা নেই। প্রথমে 'আমি' যেন ব্যবহৃত না হয়। 'আমি'-র ব্যবহার হয় পরে। আমার ভগবান, আমার ইষ্ট, আমার গুরু না বলে ভগবানের আমি, ইষ্টের আমি, গুরুর আমি এইবোধে চলতে হয়।

দীনের থেকেও দীনভাবে চলতে হয়। সামনে যে-ই আসুক, তার চাইতেও ছোট হতে চেষ্টা করতে হয়। এটাই হচ্ছে বৈরাগ্য, এটাই হচ্ছে সন্ন্যাস[১]।

অন্তরে একেকে ধরতে পারলেই অন্তর-সন্ন্যাস হয়ে যায়। বাইরে সন্ন্যাস গ্রহণ করে একেকে না দেখে বহুকে যদি দেখা হয় তবে অন্তর-সন্ন্যাস[২] হয় না। যে অন্তরে বাইরে একেকেই দেখে তাঁরই পূর্ণ সন্ন্যাস হয়েছে। অত্মানুভূতি বা Self-realization-এর পরে হয় পূর্ণ সন্ন্যাস[৩]।

আত্মানুভূতিই হল পূর্ণ সন্ন্যাসের লক্ষণ, পূর্ণ পাগল সে-ই

আত্মানুভূতি হলে, পূর্ণ সন্ন্যাস হলে তারাই হয় পাগল। তাদের কিছুই থাকে না, থাকে শুধু ভগবান। তারা 'আমার বোধে' কখনও ব্যবহার করে না। তারা মুক্তি জ্ঞান বা আনন্দ কিছুই চায় না। তারা শুধু বলে—তুমি এই দেহ দিয়ে, প্রাণ মন বুদ্ধি দিয়ে সাজিয়ে আমাকে দেখবার জন্যই নিয়ে এসেছ। জীবনে এ সুযোগ যে দিয়েছে তার চাইতে পরম বন্ধু আর কেউ নেই।

কৃতজ্ঞতাকেই মান দেওয়ার উপায়

প্রতিটি বস্তুর মাধ্যমে ঈশ্বর প্রতিনিয়ত সবাইকে দিয়েই শুধু যাচ্ছেন। সেজন্য প্রতিটি বস্তুর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকতে হয়। এই হলেই সকলকে মান দেওয়া হয়। কীটপতঙ্গ পশুপাখি প্রভৃতি প্রতিটি প্রাণীর কাছ হতেই সকলে উপকৃত হচ্ছে। জ্ঞেয় বস্তু জ্ঞাতার জ্ঞানের সম্পূরক ও পরিপূরক।

প্রেমের সাধনাই অহিংসা

সত্যিকারের ভক্তই হল একমাত্র অহিংসক। ভালবাসাই হচ্ছে অহিংসা। প্রেমের সাধনাই হল অহিংসা।

প্রিয়বোধেই জগতের কল্যাণ করা সম্ভব

ভগবান সকলের মধ্যেই আছেন। তাঁর প্রতি প্রিয়বোধ হলে ভক্ত কখনও কাউকে কষ্ট দিতে পারেন না। প্রিয়বোধ ও আপনবোধেই শুধু জগতের কল্যাণ করা সম্ভব হয়, অশান্তি দূর করা সম্ভব হয়।

বিষয়প্রীতি ও ঈশ্বর-আত্মপ্রীতি এক কথা নয়

বস্তুর প্রতি ভালবাসা বিশুদ্ধ ভালবাসা নয়। দেহের প্রতি ভালবাসাও বিশুদ্ধ ভালবাসা নয়। সবকিছুকে ঈশ্বরবোধে ভালবাসাই হল শুদ্ধ ভালবাসা বা প্রেম। ভগবান সব দেন কিন্তু ভক্তিটা সহজে দেন না।

[২৯।৭।৬৮]

১। অভিনব সংজ্ঞা। ২। বাইরে সন্ন্যাস গ্রহণ করে একেকে না দেখে বহুকে যদি দেখা হয় তবে হয় শুধু বহির্সন্ন্যাস।
৩। স্বানুভূতির দৃষ্টিতে।

নানাত্ব বহুত্বের মূলে নিত্য একই বর্তমান

যেমন একই রাগ বা রাগিনীর সরগম ব্যবহার করে ভিন্ন ভিন্ন ওস্তাদ ভিন্ন ভিন্ন ঢংয়ে গান গেয়ে ভিন্ন ভিন্ন ঘরানা সৃষ্টি করে, সেই রকম একই সত্যের ভাব নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রাণ নানারকম বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে।

মহাপুরুষদের ব্যবহার দ্বৈতবাদীদের মত নয়

সাধক মহাপুরুষগণ যখন কারওর প্রতি রাগ প্রকাশ করেন, তখন বুঝতে হবে সেটা ভান মাত্র, শুধু অভিনয়। প্রকৃত পক্ষে তাঁরা কখনও রাগ করেন না। গায়ক যেমন কখনও কখনও একটা রাগ বা রাগিনীর মধ্যে অন্য একটা স্বর ব্যবহার করে শুধু মধুর করার জন্য।

পরস্পরের সঙ্গে মিলে সামগ্রিক ভাবে পূর্ণতা লাভ করা সম্ভব হয়। একমাত্র অবতার পুরুষ ছাড়া সামগ্রিক-ভাবে সত্যের উপলব্ধি করা কারওর পক্ষেই সম্ভব হয় না। প্রতিটি ভিন্ন মতপথের সাধকই সত্যের কথা একটু ভিন্ন ভাবে বলে।

শরণাগতির বৈশিষ্ট্য

দেহ অবসানের পরে ভিন্ন ভিন্ন স্তরের সাধক, ভিন্ন ভিন্ন লোকে যায়— ধ্রুবলোক, শিবলোক, বৈকুণ্ঠলোক, রামকৃষ্ণলোক প্রভৃতি। কিন্তু শরণাগতির সাধকরা সর্বলোকেই যেতে পারে।

অনুভবসিদ্ধদের মধ্যে ভাষার পার্থক্য হতে পারে কিন্তু সত্যানুভূতির পার্থক্য নয়

বিভিন্ন সাধক সত্যের কথা বিভিন্ন রকম ভাবে বলে। একজীবনে সত্যের কিছুটা অনুভূতি হবার পরে পরবর্তী জীবনে আরও কিছু নূতনের সন্ধান পাওয়া যায়।

স্থূলের মধ্যে স্থূল হয়েই মিশতে হবে। সত্যের সমস্ত রকম মতপথের পরিচয় পেতে গেলে তা দেহ ছাড়া কখনও সম্ভব নয়।

পূর্ণানুভূতির পূর্বে জন্ম-জন্মান্তরের অনুভূতির পার্থক্য খুবই স্বাভাবিক

একজীবনে একরকম ভাবে সত্যের অনুভূতি হবার পরে পরবর্তী জীবনে অন্যরকম ভাবে সত্যের সন্ধান পাওয়া সম্ভব। তখন পূর্বের অনুভূতিটা আবৃত থাকে।

ভগবানের উদ্দেশ্যানুসারে লীলাবিলাস হয়

ভগবান এক হলেও খেলার জন্য নানারকম ভাবে বিভক্ত হন। প্রেমের খেলা খেলতে এসে সেই ভাবের দল (group) নিয়ে খেলতে আসেন। শক্তির খেলায়, জ্ঞানের খেলায় বা যোগের খেলায় খেলতে এসে সেই মতপথের সাধনা যারা করেছে তাদের নিয়ে খেলতে আসেন।

সাধনা ভেদে অনুভূতির ভেদ হতে পারে

সর্বভাবের সাধনায় কোন বিশেষ মতপথের উপর জোর থাকে না। আত্মসমর্পণের সাধনায় প্রেমময় ভগবান স্বয়ংই ভক্তের মধ্যে প্রকাশিত হন। অন্যান্য মতপথের সাধনায় কর্তৃত্ববুদ্ধি বা অহংকার কিছু পরিমাণে থাকে।

প্রেমের সাধনার বৈশিষ্ট্য

ভিন্ন ভিন্ন মত ও পথের সারাংশ দিয়ে ঘর তৈরি করে তার মধ্যে যে সাধক থাকে, সে হল সর্বভাবের সাধক। সর্বভাবের সাধনাই হল প্রেমের সাধনা।

নির্গুণ গুণীর স্বরূপের পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা

দেহ হল সর্বসত্য বা অখণ্ড সত্য। মাথা হল পূর্ণ জ্ঞান বা চৈতন্য। দিকসমূহ হল তাঁর কান। তেজ বা জ্যোতি তাঁর নয়ন। আত্মজ্ঞান হল তার মুখ। অগ্নি তাঁর জিহ্বা। নাক হল তাঁর ভাব ও সৌন্দর্য। ত্বক হল তাঁর স্পর্শ। বাক্ হচ্ছে প্রণব। হস্তদ্বয় হচ্ছে সেবা-কর্ম ও যজ্ঞ। পাদদ্বয় হচ্ছে মুক্তি ও শান্তি। ইচ্ছা তাঁর আত্মলীলা। হৃদয় হল প্রেমানন্দ। মন হল প্রকৃতি। অনন্ততা তাঁর গুণ ও মহিমা। আসন হল তাঁর সমতা। বুদ্ধি হল আধ্যাত্মিক জ্যোতি। ধৈর্য, স্থৈর্য এবং সহিষ্ণুতা হল তাঁর শক্তি। অমৃত তাঁর স্বভাব। অহিংসা ও ক্ষমা তাঁর ধর্ম। ন্যায় তাঁর বিচার। কাল তাঁর শয্যা। মৃত্যু তাঁর ছায়া। জীবন তাঁর গতি ও অভিনয়। নিত্যবর্তমানতা হল তাঁর অস্তিত্ব।

এই হচ্ছে চতুর্বিংশতি তত্ত্বের গূঢ় তাৎপর্য।

সাধনার অবলম্বন বা পদ্ধতি ভিন্ন হলেও তার পরিণাম ভিন্ন নয়

ভিন্ন ভিন্ন মতপথের সাধক ঈশ্বরের যে-কোন একটা বা একাধিক অবয়ব অবলম্বন করে সাধনা করে এবং তদনুরূপ অনুভূতি লাভ করে সত্যের সঙ্গে যুক্ত হয়।

পূর্ণ ঈশ্বরময় হয়ে যাবার বিশেষ সাধন পদ্ধতি

যে সর্ব অঙ্গ অবলম্বন করে সাধনা করে সে সর্বভাবের সাধক হয় এবং ঈশ্বরের সর্বোত্তম অনুভূতি উপলব্ধি করে ঈশ্বরের সঙ্গে সর্বতোভাবে নিত্য অভেদাভেদে যুক্ত হয়ে পূর্ণ ঈশ্বরময় হয়ে যায়।

ঈশ্বরের অনন্ত ভাবের পূর্ণ অধিকারী যুগে যুগে বিরল হলেও অসম্ভব নয়

একটা মাত্র সত্য ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বা দেশে ভিন্ন ভিন্ন লোকের মধ্যে উদ্ভাসিত হয় ভিন্ন ভিন্ন ভাবে। অনন্ত অসীমের এক একটা অঙ্গ বা ভাব এক একজনের কাছে প্রকাশিত হয়। কাজেই পূর্ণ সত্যের সঙ্গে তাদের পরিচয় সম্ভব হয় না। সর্বভাব নিয়ে সাধনা করে ঈশ্বরের পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যুগে যুগে দুই একজনের পক্ষেই সম্ভব হয়।

পূর্ণানুভূতির পূর্বে বহুবার খণ্ডানুভূতি হতে পারে

সামগ্রিক ভাবে সাধনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত বারবার এসে এক একটা ভাব অবলম্বন করে সাধনা করে যেতে হয় সকলকে।

সর্বসিদ্ধির রহস্য (চাবিকাঠি) আছে অনুভবসিদ্ধের কাছে

ভগবান ছাড়া কারওর অস্তিত্বই নেই, কারওর কোন শক্তিই নেই এটা সাধনা করে বুঝতে গেলে বহুজনম লেগে যায়। কাজেই অভিজ্ঞ লোকের কাছে অর্থাৎ অনুভূতিসম্পন্ন লোকের কাছে শুনে তা বিশ্বাস করে মেনে নিলে সহজে হয়ে যায়।

বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর

সবার মধ্যেই ঈশ্বর আছেন এবং ঈশ্বরের মধ্যে সকলে আছে। (You are always with God and God is always with you.) যাচাই করতে গেলে শুধু সময় নষ্ট হয়। বিশ্বাস নিয়ে এগিয়ে যেতে হয়।

ঈশ্বরকে মেনে সাধনা করাই হল পূর্ণতালাভের শ্রেষ্ঠ উপায়

শক্তি জ্ঞান বা যোগের পথে 'আমি'-টা পূর্ণ হয় না। তার চাইতে ঈশ্বরের মধ্যেই সকলে আছে এই বিশ্বাস ধরে চললে সহজে 'আমার আমি'-টা পূর্ণ হয়। বিশ্বাস করে মেনে না নিলে অনন্ত অসীম ভগবানকে জানবার উপায় নেই।

জীবনসাধনার মতপথ ভিন্ন ভিন্ন হলেও লক্ষ্য সবারই এক

অনন্ত অসীম ভগবানকে মাতৃভাবের সাধকরা দুর্গা, কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে ডাকে। আবার অন্যভাবের সাধকরা শিব, বিষ্ণু, নারায়ণ, হরি, রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি নামে ভজনা করে। সর্ব সম্প্রদায়ের সাধকরা এক সত্য ভগবানেরই ভিন্ন ভিন্ন ভাব নাম বা রূপে আরাধনা করে তাদের অন্তরের ভাব অনুসারে।

ঈশ্বরের মহিমা অনন্ত বলেই সকলের পক্ষেই তাঁকে পাওয়া সম্ভব

ঈশ্বরীয় মহিমার শেষ নেই। মা বা ঈশ্বরের কাছে জ্ঞানী-অজ্ঞানী, সাধু-অসাধু, পুণ্যাত্মা বা পাপী সকলেই সমান। বারবার ঈশ্বরের মহিমার কথা শুনতে শুনতে একবার তাঁর সঙ্গে মিশে এক হয়ে যাওয়া যায়। Hear the glory of God, see many times, think many times, and become fully tuned in Love with God once.

রাসলীলাই হল ভগবৎ প্রেমের বিশেষ অধ্যায়

প্রেমের পরিচয় রাসলীলার বর্ণনা ছাড়া শাস্ত্রের মধ্যে বিশদভাবে কোথাও আর পাওয়া যায় না। এর বিশেষ অভিব্যক্তি পাওয়া যায় মহাপ্রভুর জীবনে এবং রামকৃষ্ণদেবের জীবনে। অবতারপুরুষদের মধ্যেই কেবল প্রেমের পূর্ণাঙ্গ অভিব্যক্তি দেখা যায়। রূপ, সনাতন কিছু কিছু প্রেমের শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা করেছেন মাত্র, কিন্তু তাঁদের জীবনে এর বিশেষ অভিব্যক্তি দেখা যায় নি।

প্রেমই সর্বোত্তম, ঈশ্বরের কৃপাসাপেক্ষ

প্রেমের সাধনাতে 'আমি'-টা সম্পূর্ণতা লাভ করে। মহাপ্রভু কখনও অর্ধবাহ্য দশায় এবং কখনও বা বাহ্য দশায় প্রেম বিলিয়ে গেছেন। প্রেমের অবস্থা পরিপূর্ণ ভাবে ব্যক্ত করা যায় না। প্রেমের তরঙ্গ, তার অণুপরমাণুর সমষ্টি এই বিশ্বমূর্তি।

নিত্যসিদ্ধ প্রেম সাধনসাপেক্ষ নয়

আসক্তি বা বন্ধনমুক্ত হয়ে যাবার পরে হয় ভক্তির সাধনা। 'টাকা মাটি, মাটি টাকা'—এই বোধ হয়ে যাবার পরে রামকৃষ্ণদেবের জীবনে ভক্তির সাধনা শুরু হয়। ভক্তির সাধনা থেকে আসে প্রেমের সাধনা। তারপরে আসে সর্বভাবের সাধনা।

প্রেমিক পুরুষদের স্বাতন্ত্র্যবিলাস

সর্বভাবের সাধকদের কাছে আসে সমস্ত মহাপুরুষেরা। প্রেমের সাধক বা সর্বভাবের সাধকদের সংসারের লোকেরা বুঝতেও পারে না, ভালবাসতেও পারে না। কিন্তু তাঁদের কাছে ভিন্ন ভিন্ন ভাবের সাধকরা এসে উপস্থিত হয়। নামের সাধক ও প্রেমের সাধকদের পার্থক্য বোঝা শক্ত।

নিত্যযুক্ত ভগবানের ভক্তই ভগবৎ মহিমা উপলব্ধির অধিকারী

ঈশ্বরীয় নামের চেয়ে শ্রেষ্ঠ জগতে আর কিছুই নেই। নিত্যযুক্ত যে ভক্ত, সে সর্বদাই ভগবানকে দেখতে পায়। সে নিজের ক্ষুদ্র 'আমি'-টাকে ভুলে গিয়ে, 'পূর্ণ আমি'-র মধ্যে মিশে থাকে।

শাস্ত্র অপেক্ষা জীবনদর্শনের গুরুত্ব অধিক

শাস্ত্র বা পুঁথিপুস্তকের উপরে প্রাধান্য না দিয়ে জীবনের প্রাধান্য বেশি দিতে হয়। শাস্ত্রের চাইতেও মহামানবের জীবন থেকে নূতন নূতন সত্যের সন্ধান পাওয়া যায় বেশি।

সর্ব সমর্পণের পরিণামে ভক্তের হৃদয় হয় ঈশ্বরের লীলাভূমি

পরিপূর্ণ ভাবে ঈশ্বরের কাছে নিজের দেহ-প্রাণ-মন-বুদ্ধিকে সমর্পণ করে দিলে ভগবান সেই দেহে অভিব্যক্ত হয়ে নূতন ভাবে খেলা করে যান।

'আমার' মরলেই মৃত্যুর মৃত্যু হয় এবং অমৃতত্বের প্রতিষ্ঠা হয়

'আমার' মৃত্যু হলে, মৃত্যুর মধ্যেও বেঁচে থাকা যায়। [৩১।৭।৬৮]

চতুর্থ অধ্যায়

জীবনের চরম উদ্দেশ্য বৈচিত্র্যের মধ্যে একের আবিষ্কার ও উপলব্ধি

মানুষের এই জীবনটা বড়ই বৈচিত্র্যপূর্ণ। এর মধ্যে সত্য-শিব-সুন্দরকে ধরা, গুরু ইষ্ট বা শিবকে দেখা জীবনের চরম উদ্দেশ্য। সেই জন্যই সবাই প্রস্তুত হয়ে চলেছে।

বৈচিত্র্যের মধ্যে একজনই আছেন। যতক্ষণ পর্যন্ত সর্বেন্দ্রিয় দ্বারা একেকে মেনে নেওয়া না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত সকলকে বৈচিত্র্যের মধ্যেই থাকতে হয়। এক সূত্রের মধ্যে মালার ফুলের মত প্রেমের সূত্রে সবাই গ্রথিত আছে।

মায়ের গলার মুণ্ডমালার তাৎপর্য

মা কালীর গলায় যে মুণ্ডমালা তা তাঁর স্বভাববিজ্ঞান স্ব-আত্মমহিমার প্রকাশসন্তান। একসূত্রে পৃথক পৃথক অভিব্যক্তির বীজ সৃষ্টির মৌলিক উপকরণ গাঁথা। এ তাঁর সগুণ মহিমার এবং নির্গুণ মহিমার বৈশিষ্ট্যের লক্ষণ। স্নেহের সূত্রে সমস্ত বৈচিত্র্য গ্রথিত হয়ে আছে।

অভেদে প্রতিষ্ঠার বিজ্ঞান

এক শুনতে হবে, এক দেখতে হবে, এক জানতে হবে, এক হতে হবে। যতদিন একের সঙ্গে পূর্ণ অভেদ সম্বন্ধ না হয়, ততদিন সকলের প্রস্তুতি হয়ে চলেছে।

নিম্ন প্রকৃতির প্রভাবমুক্ত হওয়ার উপায়

পৃথক বোধে অজ্ঞান অভিমানে হয় নিম্ন প্রকৃতির দাস। সেইজন্য সৎচিন্তা, সৎসঙ্গ, সৎকর্ম এবং সৎজীবনযাপন একান্ত প্রয়োজন। একের বোধে প্রতিষ্ঠার জন্য এই ব্যবহারবিজ্ঞান সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। একেই আত্মসমর্পণের বিজ্ঞান বলা হয়।

আত্মসমর্পণ ও ভক্তিবিজ্ঞানের মর্মার্থ

সমবোধে, সমজ্ঞানে, সমদৃষ্টিতে, সমভাবে অবস্থান আত্মসমর্পণের পরিণাম। আপনবোধে প্রীতিবোধ; এই প্রীতিবোধের নাম ভক্তি। আপনবোধই হচ্ছে স্বভাব। স্বভাবপ্রীতি, আত্মানুরাগ বা শুদ্ধাভক্তি একই কথা।

আপনবোধে স্বভাবপ্রেম সিদ্ধ

স্ব মানে আপন। স্বভাব মানে আপনার ভাব। আপনবোধে সবকিছুকে গ্রহণ করাকে বলে প্রেম। ভাব ব্যতীত আপনবোধে কোন কিছু গ্রহণ করা চলে না।

পৃথক পৃথক বস্তুর বা পৃথক পৃথক ব্যক্তির গুণ, প্রকৃতি, অবস্থার সঙ্গে অভেদবোধের সম্পর্ক স্বভাবের মাধ্যমে গড়ে ওঠে।

অজ্ঞানের বিজ্ঞান

প্রথমে মানুষ বহুত্বকে জানবার জন্যই চেষ্টা করে কারণ তাদের ভিতরে অপূর্ণতার ভাগ বেশি। সেই অভাবটাই প্রয়োজনের রূপ নিয়ে মানুষের মধ্যে ফুটে ওঠে। অভাবের তাড়নায় মানুষের মধ্যে যে ইচ্ছাশক্তি ক্রিয়া করে তা অজ্ঞানের বিজ্ঞান। তার ব্যবহারে অসামঞ্জস্য থাকবেই।

অভাবপ্রধান জীবনের লক্ষণ হচ্ছে স্বার্থ, অহংকার, অভিমান এবং নিম্ন প্রকৃতির প্রভাব। তার ফলে অস্থিরতা, চঞ্চলতা, ভয়, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য প্রভৃতি নিম্ন প্রকৃতির প্রাধান্য অধিক থাকে।

নিম্ন প্রকৃতির গুণের বিকাশের মাত্রার তারতম্য অনুসারে মানবজীবনের মানের পার্থক্য দেখা যায়। এই মান যথাক্রমে গুণের তারতম্য অনুসারে তামসিক, রাজসিক ও সাত্ত্বিক প্রকৃতির রূপ নেয়।

অজ্ঞান প্রকৃতির ক্রমবিকাশ

তামসিক প্রকৃতির লোক সাধ্য ও সামর্থের অভাবে ভীতি, শোক ও মোহের অধীনে কতগুলি জনম অতিবাহিত করে রাজসিক প্রকৃতির প্রভাবে কিছু উন্নত হয়। তারপর আসুরী, রাক্ষসী প্রভৃতি রাজসিক প্রকৃতির প্রভাব ছাড়িয়ে সাত্ত্বিক প্রকৃতির অধীনে আসে। তখন রাজসিক প্রকৃতির দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি অতিক্রম করার জন্য সত্ত্বগুণের আশ্রয় গ্রহণ করে এবং জীবনের মান সৎসঙ্গের মাধ্যমে করে নির্মাণ। তখন শুরু হয় সত্যের অনুসন্ধান, আত্মানুশীলন, ঈশ্বর উপলব্ধির জন্য সাধন ভজন।

ঊর্ধ্ব প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য

নিম্ন প্রকৃতির অধীনে যতদিন জীবন চলে, ততদিন ঊর্ধ্ব প্রকৃতির, ঈশ্বরীয় প্রকৃতির সদ্‌গুণ ও তার প্রভাব হতে মানুষ আপনাকে বহু দূরে রাখে। জীবন সংগ্রামে পুনঃপুনঃ পরাভূত হয়ে, নিঃসম্বল, নিরাশ্রয় এবং অসহায় হয়ে সবলের, বৃহতের আশ্রয় প্রার্থনা করে। এই ভাবে মহতের প্রভাবে নিম্ন প্রকৃতির প্রাধান্য অতিক্রম করে ঊর্ধ্ব প্রকৃতির আশ্রয় গ্রহণ করে। সৎপথে জীবন যাপন করার জন্য সাধ্য সাধন করে।

সাধ্য বিকাশের বিজ্ঞানক্রম

ঊর্ধ্ব প্রকৃতির প্রভাবে অন্তরের অভাব ক্রমশ দূর হয়ে সাধ্যভাবের বিকাশ হতে থাকে। এই প্রকারের ভাবের অভিব্যক্তির মাধ্যমে সত্ত্বগুণের বিকাশে শুদ্ধজ্ঞান বা বোধের প্রকাশ হতে থাকে এবং ঈশ্বরীয় প্রকৃতির সঙ্গে ধীরে ধীরে যুক্ত হয়ে পরিণামে তাঁর সঙ্গে মিশে যায়। সত্ত্বগুণের প্রাধান্যে একের ব্যবহার শুরু হয় এবং একের প্রাধান্য জীবনে আসতে জীবনযাপন অনুসারে সময় লাগে।

সত্ত্বগুণের বিকাশের ফলে দৈবগুণের প্রকাশ হয়

প্রথমে মানুষ ধর্মকর্ম করতে চায়। সেই উদ্দেশ্যে যুক্তি-তর্ক-জ্ঞান-বিচার, জপ-তপ-সাধন-ভজন প্রভৃতির মাধ্যমে আপনার প্রকৃতিকে শোধন করে উন্নত দৈবী প্রকৃতির বা ঈশ্বরীয় প্রকৃতির যোগ্য এবং সমান করে নিজেকে প্রস্তুত করে। তার ফলে সত্ত্বগুণের প্রাধান্য বেড়ে যায়।

সাধ ও সাধ্যের অতীত হল পরাসিদ্ধি

যা কিছু পুঁজিপাট্টা, জ্ঞানবিচার, যুক্তিতর্ক, সিদ্ধি, সমাধি ইত্যাদি সবই ফেলে দিতে হয়। এই অবস্থা এসে গেলে

একের সঙ্গে একাকার হয়ে যায়। সেইজন্য সাধু সন্ন্যাসীর কথাগুলিতে যখন কেউ প্রাধান্য দেয়, তখন হৈ চৈ কোলাহল আর তার ভাল লাগে না। তখন সে ভাবে—

"মন তুমি দেখ আর আমি দেখি
আর যেন কেউ নাহি দেখে।"

উপরোক্ত অবস্থায় সে বলে ও শোনে—একের কথা। একের মধ্য থেকে সে মেশে সবার সঙ্গে একাকার হয়ে। সে বলে না— "তুমি পাপী, তুমি মূর্খ, তুমি অজ্ঞানী।"

পরমসিদ্ধের ব্যবহার অপরে সমর্থন করে না

এই জীবনের মধ্য দিয়েই এগিয়ে যেতে হবে, অপেক্ষা করতে হবে সেই মুহূর্তের জন্য। জাগরণটা কল্পনা থাকবে না। মনের ভিতর সব কিছু লয় হয়ে যাবে। নাম করতে করতে সব তাঁর পায়ে তুলে দিতে হবে। কাজ করার সময়ও সে একের ভাবেই থাকবে। সর্ব অবস্থায় সে একের মধ্যে থাকবে। বাইরের লোক তাকে পাগল মূর্খ বলবে। সে অবস্থা মানবজীবনে বড় দুর্লভ।

চরম ও পরম অবস্থা দুর্লভ হলেও অসম্ভব নয়

উপরোক্ত দুর্লভ অবস্থায় পৌঁছবার জন্য মানুষকে প্রতি মুহূর্ত সচেতন এবং জাগ্রত হয়ে থাকতে হয়। কখন যে সে আসবে সেজন্য সব সময় অপেক্ষা করে থাকতে হয়। ভুলে যাওয়া স্বাভাবিক। বহু নিয়ে মানুষ থাকে বলেই সে ভুলে যায়। ঘুমায় কেন? বহুর মধ্যে আছে বলেই। একের মধ্যে জাগরণ।

সাধারণত সাধকের কাছে পরাসিদ্ধি অজ্ঞাত

একের কথা যদি একঘেয়ে (monotonous) লেগে যায়, তবে বড়ই মুস্কিল হয়। একঘেয়ে লাগলে মনে করতে হবে যে সে তার অহংকারটাকেই বড় করে দেখছে। সকলের কাজ হচ্ছে ঈশ্বরকে তুষ্ট করা, কিন্তু তার পরিবর্তে যদি কেউ মনের সেবা করতে যায় তাহলে তাঁর সেবা করা আর হয় না।

অনুরাগের পথে সচেতনতাই হল মহামিলনের পাথেয়

অনুরাগের পথে অপেক্ষা করে থাকতে হয়, কখন সে আসবে। রাধার মত তৈরি থাকতে হয়। বলতে হয় একটা দিনের শেষে—"মাগো, আমার বোধ হয় ক্রটি হয়ে গেছে, সেইজন্য তোমার সঙ্গে মিলন আজও হল না।" তখন নিজের ক্রটি সংশোধনের প্রতি সচেতন হওয়া যায়। নিজের ক্রটিই হল নিজের মত করে চাওয়া। তাঁর মত নিজেকে তৈরি করা প্রেমভক্তির লক্ষ্য।

ভগবৎ সত্তা স্বতঃসিদ্ধ, স্বতঃস্ফূর্ত, স্বয়ংপ্রকাশ, সর্বতগ, মহান

প্রাণের ঠাকুর, যে যে-ভাবের সাধক হোক সর্বদা তার কাছে ইন্দ্রিয়গোচর হয়। ভক্ত ভগবানকে স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণের মধ্যে দেখতে চায়। কেউ যদি নামের মধ্যে থাকে তবে সে প্রার্থনা করে—হে প্রাণময়, তুমি 'তোমার এই আমার' কাছে প্রেমের বেশে উপস্থিত হও।

অখণ্ডের দৃষ্টিই হল প্রেমের দৃষ্টি (ঋষি দৃষ্টি)

ভগবান ভিখারীর বেশে, পাগলের বেশে, বাঘের বেশে বা যে-কোনও একটা রূপ নিয়ে ভক্তের কাছে আসতে পারে। সর্ববেশ সর্বরূপ এবং সর্বভাবকে ঈশ্বরের নামে গ্রহণ করা সম্ভব হলে ভগবৎ প্রেম পূর্ণ হয়েছে বুঝতে হবে।

অখণ্ড একের দৃষ্টি সবার পক্ষে সম্ভব নয়

যারা প্রেমের সাধনা আরম্ভ করেছে তারা বলে—'তোমাকে দেখবার সাধও আমার নাই, তুমি আমাকে দেখ।' এই ভাবের সাধনা বড় কঠিন।

অভেদ ভাবনার তাৎপর্য

'তুমি দর্শনীয় বস্তু হও এটা আমি চাই না'—এটা আত্মসমর্পণের (surrender) আর একটা অভিনব অবস্থা। সে শুধু বলে, "আমার যা-কিছু আছে সব নাও। 'আমার আমি'-টাকে তুমি নিয়ে নাও।" তার আলাদা অহংকার বলে কোন বস্তু থাকে না। তারা ভগবানের হাতের অস্ত্র হয়ে থাকে।

ভগবানের হাতের দিব্য অস্ত্রের গূঢ়ার্থ

ভগবানের হাতের এই অস্ত্রগুলি অর্থাৎ ডমরু, ত্রিশূল, গদা, সুদর্শন, অসি ইত্যাদি হচ্ছে এক একজন ভক্ত।

সত্যের যত প্রকাশ তার যে আবার কত অধ্যায় আছে তার হিসাব নাই। যতটুকু জানা হয় তার চাইতে অধিক অজানা থেকে যায়। বৈষ্ণব কবি এইজন্যই বলেছেন—

"জনম অবধি হাম রূপ নেহারলুঁ
নয়ন না তিরপিত ভেল।"

এত দেখেও নয়ন আর তৃপ্ত হয় না। তখনই ভক্তের প্রার্থনা আসে ভগবানের অরূপ স্বরূপে মিলিয়ে নেবার জন্য। তখন ভগবান ভক্তকে যে কোথায় মিলিয়ে নেন তা মনোবুদ্ধির অগোচর।

মানুষের পক্ষে ভগবানকে পূর্ণ ভাবে জানা ও পাওয়ার সাধ ভেদজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত

পৃথিবীর এক কোনায় পড়ে থেকে মানুষ কিছুই জানে না। কিছুই যে জানে না এটাও সকলে ভাল করে জানে না। তারা কত সামান্য জানাজানি নিয়ে নিজেরা বলতে যায়। আসলে ভগবানই শুধু জানেন, ভগবানই শুধু বোঝেন। নিজেরা জানতে গেলে তলিয়ে যেতে হবে।

ব্যষ্টি মনের দৃষ্টি হল সীমিত, সসীম

ছোট 'আমি'টা আকাশের দিকে চেয়ে কয়েকটা নক্ষত্র গুণতে পারে শুধু। এই ঘরে বসে মানুষ ঐ ঘরটা দেখতে পায় না। জানবার শুধু আছে এক। জীবনে যার যা-কিছু আছে সব তাঁর কাছে সঁপে দিতে হয়।

সর্ব সমর্পণ বিনা পূর্ণজ্ঞান হয় না

এ২ শক্তিমান আর একজন শক্তিমানের কাছে মার খাচ্ছে। তার চাইতে ছোট আমির সবকিছু তাঁর পায়ে সঁপে দেওয়া ভাল। তিনি যখন ধরেন তখন আর বেরিয়ে যাবার উপায় থাকে না।

ভগবানের কথা শুনবার সৌভাগ্য খুব কম লোকেরই হয়। এই ক্ষুদ্র 'আমি'টাকে কখন তিনি নেবেন এই প্রতীক্ষা করে থাকতে হয়। সৎসঙ্গের মাধ্যমে নিজেকে তৈরি করে তাঁর কাছে নিজেকে পূর্ণাহুতি দিতে হয়।

'শরণাগতি' তাদেরই জন্য, যাদের আর কোন উপায় নেই। ভগবানকে সে বলে—আমি তো তোমাকে ডাকতেও পারছি না। শোবার আগে ভাবতে হয়—আমার তো একটুও যোগ্যতা হল না। আমার তো কোন সাধ্য নেই। আমি কোনও সাধন দ্বারা 'আমি'টাকে সরাতে পারব না, তোমার করে তুমি নিয়ে নাও।

শরণাগতির পথে প্রার্থনা করতে হয়—আমি বড় অসহায়, তুমি আমার মধ্যে বসে আমার অবস্থা সবই জানছ, বুঝছ। আমার অসহায় অবস্থা বুঝে তুমি 'আমার আমি'টাকে নিয়ে যাও। তুমি আমার দেহের অবস্থা, মনের অবস্থা, প্রাণ ও বুদ্ধির অবস্থা দেখছ। এক কথায় আমার উপায়টি তুমি হও, আমি উপায় বার করতে পারছি না।

উপরোক্ত ভাবে প্রার্থনা যদি নিষ্ঠা সহকারে এবং সুদৃঢ় প্রত্যয় সহকারে হয় তাহলে ভগবান নিজে সব করে দেন। অহংকার করে রাত জেগে, উপোস করে তাঁকে ডেকে বললে কোন কাজ হয় না। একনিষ্ঠ ভাবে, সবিনয়ে এই নিবেদন করতে হয়।

ভক্তির পথ সবচেয়ে সুখকর। এই পথ একনিষ্ঠতার পথ। 'আমি পারছি না' এই কথা অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে বলতে হবে। 'আমি পারছি না, তুমি উপায় করে দাও'—এই ভাবে বলতে হয়। এর চেয়ে সহজতম পথ আগে আর কখনও কেউ বলে দেয়নি। এই অসহায় ভাবটা যত বেশি হবে, তত তাঁর আসন টলবে।

ঈশ্বরের করুণাই তাঁর সঙ্গে যুক্ত হবার শ্রেষ্ঠ উপায়

ঈশ্বরই উপায় (means) এবং ঈশ্বরই উপেয় (end)। ঈশ্বর নিজে ধরা না-দিলে তাঁকে ধরা কারও সাধ্য নয়। সকলে 'আমার আমি' বোধে ব্যবহার করে ঈশ্বরকে সীমাবদ্ধ করে রেখেছে।

'কাঙ্গালের ঠাকুর, প্রাণের ঠাকুর, দীনের ঠাকুর, প্রেমের ঠাকুর'—এই নামগুলি যখন ভগবান নিয়েছেন, তখন ভগবানই সকলের উপায় করে দেবেন। ভগবান নিজেই উপায় হয়ে আসেন ভক্তের কাছে।

সকলের আর্তিভাব আসা চাই। 'ওগো, আর পারছি না' বলামাত্র ভক্তের কাতর মিনতি তাঁর হৃদয় স্পর্শ করে। 'আমি আর পারছি না' বলে দ্রৌপদী যখন আর্তিভাবে সভায় শ্রীকৃষ্ণকে ডেকেছিল তখনই বস্ত্র যোগান হয়েছিল।

অহংকারের সাধনায় চিত্তশুদ্ধি হয় না এবং ঈশ্বরাত্মার সঙ্গে যুক্ত হওয়া যায় না

আমার দেহ-মন-প্রাণ দিয়ে যে সাধনা এটা অহংকারের সাধনা। সামান্য একটু পড়াশুনা করেই অনেকে মনে করে তাঁকে জেনে ফেলেছে।

কোনও একটা ভাব ছাড়া ঈশ্বরের সাধনা হয় না এবং তাঁর দর্শনও পাওয়া যায় না

দ্বন্দ্ব যদি করতেই হয় তবে ঈশ্বরের সঙ্গে করাই ভাল। তবেই হয় মুক্তি। যত দ্বন্দ্ব সব তাঁর সঙ্গে হওয়া চাই, এই প্রাণের সঙ্গে হওয়া চাই, যেখানে স্বয়ং তিনি বসে আছেন। তিনি নিজেকে মারতে পারেন না। এটা আর একরকম সাধনা। এটা স্ববিরুদ্ধ দ্বন্দ্ব (challenge)। নিজেকে নিজে কত আর মারবেন?

ভাব অনুসারে হয় সাধনা ও অনুভূতি

এককে ধরবার বহু মত বা পথ আছে। এ যুগে মানুষ জ্ঞানের সাধনার জন্য প্রস্তুত হতে পারে না। শুধু মুখে দেহাতীত, দ্বন্দ্বাতীত, কালাতীত, গুণাতীত বলে সেই বোধে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায় না। 'ব্রহ্মাস্মি' চরমতম অনুভূতির কথা, শুধু মুখের কথা নয়।

জীবনের উদ্দেশ্য যদি হয় পূর্ণতা, তবে পরিপূর্ণতা ছাড়া কোনও কিছুরই অধিক মূল্য নেই। সর্বোত্তম অনুভূতির পরিপন্থী হচ্ছে টাকাপয়সা, নাম যশ খ্যাতি, সাধনভজনের অহংকার, কর্তৃত্বাভিমান, ফলাকাঙ্ক্ষা বা ফলের আশা। এ সব বিদ্যামায়ার বন্ধন বড় মারাত্মক ব্যাপার। তরীটি পারের কাছে এসে ডুবে গেছে, এইরকম অবস্থা।

নিজেকে মাধ্যম করেই ঈশ্বর লীলা করেন

ভগবানের যা-কিছু খেলা সব কিন্তু মহাপুরুষদের মাধ্যমেই সাধিত হয়। তাঁদের মধ্য দিয়ে তিনি নিজেকে অভিব্যক্ত করেন। সৎসঙ্গের মাধ্যম ছাড়া সত্যের পরিচয় পাবার উপায় নেই।

সৎসঙ্গের মাহাত্ম্য

প্রত্যেকের স্বভাব প্রকৃতির যোগ্যতা অনুযায়ী সৎসঙ্গের সুযোগ আসে। সৎসঙ্গ ভগবৎ সম্পদ (Divine interest) অনুভব করার জায়গা। ঈশ্বরের করুণা বা তাঁর অহেতুক কৃপা পাবার যোগ্যতা হঠাৎ এসে যায় এই সৎসঙ্গেই। সেইজন্য সাধুরাও সৎসঙ্গে যায়।

ভগবৎকৃপা লাভের রহস্য

ভগবান ভক্তির ব্যাপারে বড় সচেতন (conscious)। শুদ্ধচিত্ত না হলে ভগবান ভক্তি কাউকে দেন না। একটু খুঁত থাকলে চলবে না। একেবারে পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ হওয়া চাই। ব্যাকুল হতে হয়।

ভক্তির মাহাত্ম্য

ভক্তি হচ্ছে লজ্জাবতী লতার মত অতিশয় স্পর্শকাতর। ভক্তিভাব ভিন্ন অন্য ভাব সে সইতে পারে না। আপনিই গুটিয়ে নেয় নিজেকে। এই ভক্তি হল স্বভাবের প্রীতি বা আপনবোধ। বাইরে তার প্রকাশ ভাব ও মহাভাবের অভিব্যক্তি কামগন্ধশূন্য দেহাতীত বোধ।

রামকৃষ্ণদেব মাথা খুঁড়ে মরেছেন—'মাগো, তুই একটু শুদ্ধাভক্তি দে।' প্রায় ছয় বৎসর এরকম মাথা খুঁড়েছিলেন। রামকৃষ্ণদেবের সাধনের stage-টা সকলে জানে না।

ভক্তহৃদয় কত যে বিনিদ্র রজনী যাপন করে তা ভগবান ছাড়া বাইরের লোক কিছু জানে না। মহাপ্রভুর আর্তিভাব জগৎকে জানিয়ে গেল যে ভক্তি ছাড়া আর কোন সাধনায় অহংকারটা সহজে যায় না।

পৃথক পৃথক সাধনার ফল পৃথক পৃথক

একটা সাধনায় মনের পুষ্টি হয়, প্রাণের হয় না। একটা সাধনায় বুদ্ধির পুষ্টি হয়, বোধের হয় না। এইরকম ভাবে পৃথক পৃথক সাধনার দ্বারা সত্তার পৃথক পৃথক অংশের পুষ্টি সম্পাদিত হয় বটে কিন্তু সর্বাঙ্গীন পুষ্টি হয় না।

জীবনে পূর্ণতার সিদ্ধি পূর্ণতার মাধ্যমেই হয়

জীবনের পূর্ণতার জন্য সেই পূর্ণস্বরূপের আবির্ভাব বা অভিব্যক্তি জীবনের মধ্যে একান্ত প্রয়োজন। পূর্ণাহুতি বা সমর্পণের মাধ্যমে এ সম্ভব হয়। সমর্পিত ভক্তের হৃদয়ে সচ্চিদানন্দস্বরূপ ভগবানের পূর্ণপ্রকাশ এবং তাঁর লীলাবিলাস দেখা যায়। ভক্তের হৃদয়ে তাঁর নিত্য অধিবাস সাযুজ্য যোগের পরাকাষ্ঠা।

ছোট আমির (জীবের) পূর্ণতা অখণ্ড পূর্ণ আমির যোগেই হয়

এই ক্ষুদ্র 'আমি'টা যদি তাঁর হয়ে যায় তাহলে এ দেহ দিয়ে 'আমার' কোন কাজ চলবে না। এই দেহ-মন-প্রাণ তাঁর সেবাতে লাগাতে হবে। যদি নিজের ভিতরে ঈশ্বরের সেবা করা হয়, তাহলে তা বিশ্বকে সেবা করার সমান। অথবা সমগ্র বিশ্বকে তাঁর নামে সেবা করা এক কথা।

ভক্তি ও জ্ঞান ভগবানেরই প্রকাশবিজ্ঞান

ভক্তের পূর্ণ অবস্থা ও জ্ঞানীর পূর্ণ অবস্থা একই। 'ভগবান, ভগবান' ভাবতে ভাবতে এমন একটা অবস্থায় মন চলে যায় যে তার লজ্জা, ভয়, অহংকার, মাৎসর্য, ক্রোধ, কাম সব লয় হয়ে যায়।

উপরোক্ত অবস্থায় কাম হয়ে যায় প্রেম, ক্রোধের জায়গায় আসে সবাইকে এক করে দেখা—তখন হয় করুণা। গুমরে গুমরে মনটা কাঁদে।

ভক্তের মধ্যে বসে ভগবান নিজেই বলেন, নিজেই শোনেন। ভগবানের কথা অহংকার দিয়ে শোনা যায় না। তিনিই সব ভিতর থেকে বলেন। ভক্ত বলে তুমি কোথা থেকে কী ভাবে প্রকাশিত হচ্ছ, আমি তা জানি না। এই ভাবে নিজেকে সম্পূর্ণ ছেড়ে দিলে তিনি সমস্ত জ্ঞানের ভাব নিয়ে প্রকাশিত হন ভক্তের জীবনে।

অবিদ্যাজাত জীবের অভিমান ও অহংকার নাশ হয় সাধনার মাধ্যমে

'আমার আমি' এই কথা শুনতে শুনতে আসবে 'তুমি তোমার' কথা। তাঁর মহিমা আগে সকলের শুনতে হবে। কেউ অশান্ত হলে বুঝতে হবে সে অশান্তের সেবা করেছে। 'অভিমান'-কে দিনের পর দিন বড় করে পুষ্ট করেছে। Surrender-এর পথে অহংকারের 'আমি' কী ভাবে আস্তে আস্তে যে চলে যায়, টেরও পাওয়া যায় না।

সৎসঙ্গের মাধ্যমেই সত্ত্বগুণের বিকাশ হয়

প্রস্তুত হয়ে থাকার মানেই সৎসঙ্গের মাধ্যমে প্রতিদিন সকলের সাত্ত্বিক আহার নিতে হবে। প্রথম প্রথম সৎসঙ্গ প্রীতিকর হয় না। নিজের ভিতরে এক সমসুর ফুটে না-ওঠা পর্যন্ত বারবার সৎসঙ্গে গিয়ে শুনতে হয়। সেই সঙ্গে যে-বোধ হবে সেটা ধরে রাখতে হয়।

নিম্ন প্রকৃতি প্রবল হলে সৎসঙ্গ প্রিয় হয় না

সৎসঙ্গে গিয়ে যদি দেখা যায় যে মন সৎসঙ্গে সায় দিচ্ছে না তখন বুঝতে হবে যে সে তার lower nature বা ego-টাকেই প্রাধান্য দিচ্ছে।

আত্মসমর্পণের পরিণাম (ফলশ্রুতি)

Surrender-এর যে আনন্দ, সে আনন্দটা হচ্ছে 'আমার আমি' থাকবে না। এটাই পূর্ণানন্দ।

প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উভয়েরই বৈশিষ্ট্য স্বতন্ত্র

সৎসঙ্গেও কেউ নিজে আসতে পারে না। তাকে ঈশ্বরই টেনে নিয়ে আসেন। অসৎ পথেও যে লোকে যায়, সেখানেও সে নিজে যেতে পারে না—তাকে তিনিই টেনে নিয়ে যান। [১।৮।৬৮]

মানুষের বিদ্যা অভ্যাসের ক্রমিক মান অনুসারে তার ফল লাভ হয়

ছেলেরা স্কুলে পড়ে, স্কুল থেকে শেষ সার্টিফিকেট পাবার আগে পর্যন্ত। কলেজে ও university-তে পড়ে সেখান থেকে পাশের সার্টিফিকেট ও ডিগ্রি না-পাওয়া পর্যন্ত। এই সার্টিফিকেট ও ডিগ্রি পাবার পরে সবার পক্ষে আর পড়াশুনা করা সম্ভব হয় না। এই বিরাট বিশ্বরূপও একটা বিরাট পাঠাগার। এখান থেকেও একটা সার্টিফিকেট পাওয়া যেতে পারে।

ভগবানকে বিশ্বরূপে দেখা ও জানার অভ্যাসের ফলে সহজেই ইষ্টসিদ্ধি হয়

আমি কিছু নই, আমার কিছু নয়, ঈশ্বরই সব, ঈশ্বরই হন, ঈশ্বরই দেখেন, ঈশ্বরই করেন—এই training বিশ্ব থেকে পাওয়া যায়। সার্টিফিকেট পাবার পরে দেখা যায় 'আমার আমি' শেষ হয়ে গেছে। এই সার্টিফিকেটটাই ভিন্ন ভিন্ন সাধনায় ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধি, যথা—জ্ঞান, যোগ, কর্ম, ভক্তির সিদ্ধিরূপে আসে।

ভক্তিযোগের পাঠ—আমিটা পুরোপুরি যন্ত্র হয়ে যাবে। 'আমি আমার'-এর স্থানে থাকবে শুধু 'তুমি তোমার'। ভক্তের ইষ্ট বা গুরুমূর্তির যে-নাম, যে-রূপই হোক না কেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না বিশ্বমূর্তিরূপে সমগ্র দেহ মন প্রাণসত্তাকে পূর্ণভাবে গ্রহণ করতে পারছে ততক্ষণ পর্যন্ত তার পাঠ চলবে।

ভক্তিযোগের পাঠ পূর্ণ ভাবে গ্রহণ করা হলে দেখা যায় যে ভিন্ন ভিন্ন ভক্ত ভিন্ন ভিন্ন নামরূপধারী গুরু ও ইষ্টকে গ্রহণ করে পরিণামে সমগ্র বিশ্বকেই গ্রহণ করে।

সমগ্র বিশ্বই হল ব্যষ্টির মূল ও পরিণাম

যার গুরু বা ইষ্ট রাম, কৃষ্ণ, হরি বা শিব তার কাছে সমগ্র বিশ্বই হবে রাম, কৃষ্ণ, হরি বা শিব। সেইরকম দুর্গা, কালী বা যে-কোনও নাম বা রূপ যার ইষ্ট সেই নাম বা রূপ হবে তার কাছে সমগ্র বিশ্ব। এখানেই দেখা যায় সমস্ত সাধনার পরিণাম—বিশ্বকে গুরু বা ইষ্টরূপে দেখা। এ-ই হচ্ছে সমগ্র মত বা পথের সার কেন্দ্র, সমন্বয়, সঙ্গম এবং সত্যমূর্তি।

বিশ্বমূর্তি হচ্ছে আসল রূপ। ভিন্ন ভিন্ন নাম ও রূপ তার মধ্যে লয় হয়ে যায়। এ-ই হচ্ছে ব্রহ্ম, আত্মা, ঈশ্বর বা সত্য উপলব্ধি। পূর্ণচৈতন্যের পূর্ণজ্ঞান, পূর্ণশক্তি, অখণ্ড আনন্দ, শাশ্বত শান্তি এবং পূর্ণপ্রেমের সঙ্গে নিত্যযুক্ত অবস্থা।

দ্বন্দ্বের উৎস নির্দ্বন্দ্ব, ভেদের উৎস অভেদ, বৈচিত্র্যের উৎস ঐক্যে বা সমতায়

দ্বন্দ্ব হয় পথে, মতে, গতিতে; কিন্তু কেন্দ্রে কোন দ্বন্দ্ব নেই। এই সারকথা সমস্ত তত্ত্বের সার। এটা ধরে রাখার চেষ্টা করতে হয়। সকলের এই কথা শুনবার ও জানবার সুযোগ হয় না। সর্বসাধনার পরিণাম এ-ই। এই কথা যতক্ষণ না শোনা হয়, ততক্ষণ শ্রবণের বাকি থাকে।

সাধনার সিদ্ধির তাৎপর্য ইষ্ট দর্শন—অভেদ দর্শন

সকল সাধকের ইষ্ট ও গুরু তখনই দর্শন হয়, যখন নাম রূপ মিলে একাকার বিশ্বমূর্তি রূপে দেখা দেয়। যতক্ষণ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দেখা হয় ততক্ষণ পর্যন্ত জ্ঞানী, ভক্ত বা যোগী বলা চলে না।

ভক্ত একজনকেই ভালবাসে, একজনকেই সেবা করে, একজনই তার লক্ষ্য ও উপায়। অন্তর ও বাহির সে এক করে নেয়।

যোগীও এই অনন্ত অসীম মূর্তির সঙ্গে পূর্ণ যুক্ত হয়ে যায়। জ্ঞানীও সেই এক অখণ্ড চৈতন্য বা বোধের সঙ্গে একীভূত হয়ে যায়। কর্মীও সেই অখণ্ড অনন্ত অসীম সত্তার সঙ্গে, তার গতির সঙ্গে, প্রকাশের সঙ্গে এক হয়ে যায়। সমগ্রতার এই একক রূপ বা মূর্তিটির যতক্ষণ দর্শন না হয় ততক্ষণ দ্বন্দ্ব থাকবেই।

সাধনার প্রথমে ভেদ দর্শন, মধ্যে ভেদাভেদ এবং অন্তে অভেদ দর্শন

প্রত্যেকেই নিজের মতকেই ঠিক বলে ভাবে। এইগুলি প্রথম অবস্থা। মধ্য অবস্থায় একটু নরম হয়ে আসে। তখন মুখে বলে সব ঠিক কিন্তু অন্তরে দ্বন্দ্ব থেকে যায়। অন্তে কিন্তু নামের দ্বন্দ্ব আর থাকে না।

একের নামে অশুদ্ধি নেই, অজ্ঞান নেই, অবিশ্বাস নেই, সংশয় নেই, অবিদ্যা মায়া নেই, মৃত্যু নেই, জন্ম নেই। অদ্বৈতে দ্বৈতের কোন দ্বন্দ্ব নেই। এই নির্দ্বন্দ্ব অবস্থাই সকলের সত্যস্বরূপের পরিচয়।

সত্যস্বরূপের পরিচয়

সত্যস্বরূপ আত্মার পরিচয়—আমিও নয়, তুমিও নয়; রূপও নয়, নামও নয়; মনের কোন সংকল্প বিকল্পও নয়। প্রাণের কোন তৃপ্তিও নয়। বুদ্ধির কোন চাতুর্যও নয়। বিকারবিহীন অনন্ত অসীম শান্ত বোধময় অখণ্ড ভূমাস্বরূপ অবস্থা। এটাই হচ্ছে প্রত্যেকের স্বভাবস্বরূপ অবস্থা।

গতি বা লক্ষ্য এক, কিন্তু মত ও পথ বহু

শান্তস্বরূপ অখণ্ডের ঘরে পৌঁছবার বহু পথ রয়েছে। যত রূপ, তত নাম। যত মন বা মত, তত বোধ বা পথ। যত ভাব, তত জ্ঞান, তত স্বভাব। এ সবের লয় স্থান সেই শাশ্বত শান্তিময় ধাম। সে-ই হচ্ছে প্রত্যেকের সত্য পরিচয়।

আপনতা ও স্বয়ংতাই স্বয়ং-এর পরিচয়

তাঁকে কেউ প্রকাশ করতে পারে না, তিনি নিজে প্রকাশ হন। তাঁকে কেউ দেখতে পারে না, তিনি নিজে দেখেন। তাঁকে কেউ শুনতে পারে না, তিনি নিজে বলেন এবং নিজেই শোনেন। তিনি নিজে করেন, অপর কেউ করে না। তাঁকে কেউ জানতে পারে না, তিনি নিজে জানেন। মানুষ কেউই কিছু হয় না, তিনি নিজেই হন। মানুষ কাউকে ভালবাসতে পারে না, তিনি নিজেই ভালবাসা রূপে এসে নিজেকেই ভালবাসেন।

তিনিই একমাত্র কর্তা, একমাত্র শ্রোতা, একমাত্র দ্রষ্টা, একমাত্র জ্ঞাতা। তিনিই হলেন একমাত্র ভোক্তা এবং হোতা, এক অদ্বয়স্বরূপ।

আবার তিনি নির্গুণ, নির্বিকার, অকর্তা, অশ্রোতা, অদ্রষ্টা, অজ্ঞাতা, অভোক্তা, অহোতা, নিত্যনিরঞ্জন। সেই নির্গুণ নির্বিশেষ স্বভাব আনন্দে গুণময় সবিশেষ হয়েছেন।

তিনিই হচ্ছেন সকলের প্রাণের প্রাণ, মনের মন, জ্ঞানের জ্ঞান, দেহসত্তার প্রতিটি অণু পরমাণু, সমস্ত শক্তির মূল কেন্দ্রীভূত শক্তি।

তিনিই হচ্ছেন আবার কর্মীর কর্মশক্তি, কর্মীর প্রেরণা, কর্মকর্তা, এবং কর্মফল। যোগীর যোগ, যোগক্রিয়া, যুক্তি, যোগৈশ্বর্য, যোগের কেন্দ্র ও যোগের ফল। তিনি নিজেই যোগী। তিনিই আবার ভক্ত নিজে। নিজেই ভক্তি, নিজেই ভক্ত বা ভাগবৎ, নিজেই ভগবান। তিনিই আবার জ্ঞানী, জ্ঞানীর জ্ঞান, জ্ঞানক্রিয়া, জ্ঞানের ফল—পরমব্রহ্ম। এ-ই হল সর্বপথের সার তত্ত্ব। এখানে আমিও নাই, তুমিও নাই। "স্বেনৈব পূরিতম্ সর্বম্।" "স্বমহিম্নি মহিম্নঃ।"

তত্ত্ব শ্রবণের অভিনব তাৎপর্য

শুনতে শুনতে 'আমি' হারিয়ে যায়, 'তুমি' আসে। আবার তুমি হারিয়ে গিয়ে কী হয়ে যায় তা বলা যায় না। এই তত্ত্ব না-শুনলে মানুষের ভিতরে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য, লজ্জা, ভয়, বিরক্তি, অস্থিরতা, চঞ্চলতা, রোগ, শোক, আসক্তি ও মৃত্যু সকলকে অক্টোপাশের মত ঘিরে থাকবে। একটাকে ছাড়াতে গেলে আর তিনটা জড়িয়ে ধরবে।

একমাত্র সত্যবোধ বা সত্যবেদন বা সৎসঙ্গের থেকে আসে সেই আত্মার জ্যোতি বা অন্তরের আলো মানুষের কাছে। তখন পাশগুলি পালিয়ে যায়। সেই অন্তরের আলো জ্বালিয়ে রাখার যোগ্যতা হয় সৎসঙ্গে গেলে।

সৎসঙ্গের প্রভাবে অসত্য, মিথ্যা প্রত্যয়, অশ্রদ্ধা, অভক্তি, অবিশ্বাস, যা নিম্ন প্রকৃতির প্রভাবে স্বার্থ অহংকারের স্বরূপ প্রকাশ করে, তা রূপান্তরিত হয়ে ঊর্ধ্ব প্রকৃতি বা দৈবী প্রকৃতির রূপ ধারণ করে। তখন এই সকল বিরুদ্ধ প্রতিদ্বন্দ্বী শত্রুতুল্য স্বভাববিরুদ্ধ বিকৃত গুণগুলির থেকে রেহাই পাওয়া যায়।

সৎসঙ্গের মহিমা

সকলেই পথহারা পথিক। আপন ঘর থেকে বেরিয়ে এসে আর ঘরে ফিরতে পারছে না। বিশ্বের মধ্যে, নানাত্বের মধ্যে অন্ধের মত হাতড়ে বেড়াচ্ছে। একমাত্র উপায় হচ্ছে সৎসঙ্গের আলো।

The beacon light, the searchlight, the sunlight of Satsang can give the way full of light which removes all the darkness, all the ignorance, all the barriers, all the obstacles and kills all the enemies.

দিব্যজীবনে ভগবানের প্রকাশলক্ষণ ও তার সত্য প্রমাণ

ভগবান সৎকে আশ্রয় করে প্রকাশমান। পবিত্রতা হচ্ছে তাঁর আসন, নিঃস্বার্থপরতা তাঁর হাতল (handle), উদারতা তাঁর ছত্র, সেবা তাঁর পরিচারক, প্রেম তাঁর দৃষ্টি, আনন্দ তাঁর গতি ও সৃষ্টি, ন্যায় তাঁর দণ্ড, দিব্যজ্ঞান তাঁর প্রকাশ, সত্য তাঁর প্রাণ; শুভ, কল্যাণ, মঙ্গল তাঁর মন। সৌন্দর্য তাঁর চিত্ত, স্নেহ করুণা তাঁর হৃদয়; ঐক্য তাঁর ধর্ম। ত্যাগ-বৈরাগ্য তাঁর কর্ম; জ্যোতি তাঁর দেহ। অমৃত হচ্ছে তাঁর দান; শূন্য তাঁর বক্ষ, শান্তি তাঁর ঘর। সমতা হচ্ছে তাঁর পদ, স্বভাব তাঁর স্বরূপের পরিচয়।

আত্মবিস্মৃতি সর্ব দুঃখের মূল

স্ব-স্বরূপের পরিচয় হারিয়ে মানুষ কত ক্ষুদ্র জিনিস নিয়েই যে আছে! এ জিনিস আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব কেউ দিতে পারে না। যেমন লক্ষ টাকা হারিয়ে গেলে চেক বইটা দুঃখের কারণ হয়, সেইরকম নিজের স্বরূপচ্যুত হয়ে স্বরূপের পরিচয় শুনলেও মানুষের অন্তর কেঁদে ওঠে।

ঈশ্বরের অনুগ্রহই আশ্রিত ভক্তের হৃদয়েতে সৎসঙ্গের গুরুত্ব ও মহিমা প্রকাশ করে

স্ব-স্বরূপকে জানবার জন্য অন্তর কেঁদে উঠলে ভগবান যেখানে প্রকাশমান সেই সৎসঙ্গে ভগবানই তাকে বহু কৌশলে নিয়ে যান। প্রথম প্রথম সৎকথা ভাল লাগে না। জোর করে ঔষধ গেলার মত সৎকথা শ্রবণ করার পরে ভিতরটা আস্তে আস্তে তৈরি হয়।

এই তৈরি বা প্রস্তুতির প্রধান ভিত্তি হচ্ছে দৃঢ় বিশ্বাস ও ধৈর্য। এই দুইটি হচ্ছে প্রত্যেকের পদক্ষেপ। বিশ্বাস ও ধৈর্য কারওর যেন হারিয়ে না যায়।

আত্মবিস্মৃতির ফলে অবিদ্যা মায়ার জালে বদ্ধ হয় জীব

প্রলোভন, ক্ষণিক সুখের মোহ, নাম যশের আকর্ষণ, বিষয়ের কঠিন আলিঙ্গন সর্বক্ষণই প্রস্তুত হয়ে আছে সকলকে অভ্যর্থনা করার জন্য এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে উপকার করার নাম করে তাদের মধ্যে টেনে নেবার জন্য। সংশয়, অবিশ্বাস, অশ্রদ্ধা, চঞ্চলতা, অস্থিরতা— ধৈর্য ও বিশ্বাসকে হটিয়ে দেবার জন্য সতত ব্যস্ত। এদের কবলে পড়লে ধৈর্য এবং বিশ্বাসের যে অঙ্গহানি হয় তা পূরণ করা বড় কঠিন।

শান্তি কেড়ে নেবার অনেক বন্ধু এবং শ্রদ্ধা, ভক্তি, বিশ্বাস ও ধৈর্যকে নষ্ট করার সাথী অনেক থাকে। কিন্তু এই শ্রদ্ধা, ভক্তি ও বিশ্বাসকে বাড়াতে সাহায্য করবার জন্য সদ্‌গুরু ও ঈশ্বর সহায় হন সৎসঙ্গের মাধ্যমে।

নিষ্ঠার অভাব মায়ার বিলাস ছড়ায়

সত্য, ধর্ম, শ্রদ্ধা, ভক্তি, বিশ্বাস, ধৈর্য, স্থৈর্য, সহিষ্ণুতা এবং শান্তি অন্তরের ধর্ম, বাইরের বস্তু নয়। নিষ্ঠাহীন হলে এ সব আবৃত হয়ে যায়।

নিষ্ঠার গুরুত্ব ও তাৎপর্য

আসল নিষ্ঠাই হচ্ছে অখণ্ড শ্রদ্ধা, বজ্রের মত দৃঢ় বিশ্বাস। সমস্ত পুরুষকার দিয়ে এ দুটিকে রক্ষা করা সকলের কর্তব্য। এই কর্তব্য পালন করলে ভগবান তার সমস্ত রকম কৃপা ও আশীর্বাদ পূর্ণ ভাবে ঢেলে দেন।

[২। ৮। ৬৮]

নূতন প্রজন্মের সমস্যাসকলের সমাধান নূতন ভাবেই হয়

নূতন নূতন মানুষ নূতন নূতন সমস্যা নিয়ে পৃথিবীতে আসছে। সেগুলির মধ্য দিয়ে যে-সত্য উপলব্ধি হচ্ছে তারও বিশেষ একটা তাৎপর্য আছে। সেইজন্য দেখা যায় যুগে যুগে শাস্ত্রে কিন্তু নূতন কথা লেখা হয়।

যুগে যুগে মহাপুরুষদের মাধ্যমেই যুগোপযোগী সত্যের প্রকাশ হয়

ভিন্ন ভিন্ন মহাপুরুষ জগতে এসে সত্যের কথাই বলেছেন। সেগুলি শাস্ত্রের আকারে লেখা না-থাকলে মানুষ তার পরিচয় পেত না। লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে দুই একজনই সত্যের পরিচয় পেয়েছেন। সে-সব কথা শাস্ত্রে লেখা আছে বলেই সাধারণ লোকেরও সে-সব শুনবার সৌভাগ্য হয়।

একই সত্যের কথা লেখা থাকলেও স্থান, কাল, পাত্র, পরিবেশ ও অবস্থা অনুযায়ী সেই সত্যের বিভিন্ন রকম প্রকাশ হয়। সত্য একই থাকে কিন্তু যুগে যুগে তার পোশাক পালটায়।

বাইবেল না-লেখা হলে পৃথিবীর লোক যিশু খ্রিস্টের পরিচয়ও পেত না এবং তাঁর ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত হতেও পারত না। সেইরকম বুদ্ধ চলে যাবার পরেও তাঁর কথা লেখা না-থাকলে বহুলোক উপকৃত হত না। বহু-লোক যে উপকৃত হয়েছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় নানারকম শিল্পকলা, সাহিত্য, সঙ্গীত, ভাস্কর্য প্রভৃতির মাধ্যমে।

চৈতন্যদেবের জীবনে যে ঈশ্বরীয় অভিব্যক্তি হয়েছিল তা তাঁর জীবনী চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যে লেখা আছে, এবং এই চৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করেই লোকে চৈতন্যদেব এবং তাঁর মধ্যে ঈশ্বরীয় অভিব্যক্তির কথা জানতে পারে।

আবার রামকৃষ্ণদেবের জীবনে ঈশ্বরের অভিব্যক্তি এবং ঈশ্বরের বাণী কথামৃত ও লীলাপ্রসঙ্গের মাধ্যমে ধরে রাখা হয়েছে। এইগুলি পাঠ করে লোকে তাঁর পরিচয় পায়।

এইরকম বহু মহাপুরুষের জীবনী, ঈশ্বরের উপলব্ধি ও তাঁর বাণী লিপিবদ্ধ থাকায় তা মানুষের সাধনার পথে অবলম্বন ও সহায়ক হয়েছে। ঈশ্বরের প্রকাশ যাদের মধ্যে হয় তাদের মাধ্যমে ঈশ্বরের মহিমা বা বাণী নূতন পর্যায়ে মানুষ পায়। সেইজন্য এইগুলি রক্ষা করার প্রয়োজন আছে। এইগুলি মানুষকে সাহায্য করে সাধনার পথে। পুঁথিপুস্তকের মাধ্যমে এমন অনেক কথা পাওয়া যায় যা না-পেলে প্রকৃতির ফুলের মত অনেক ঈশ্বরীয় প্রকাশ অজানা ভাবেই শুকিয়ে যেত।

একই সত্যের কথা ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বলা হয়েছে বিভিন্ন লোকের যোগ্যতা ও সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যবহারের উপযোগী করে। কাজেই সত্যকে শুনবার প্রয়োজন আছে। সত্য কখনও একঘেয়ে হয় না। ভিন্ন ভিন্ন মহাপুরুষের কাছে সত্য অভিজ্ঞতার তারতম্য অনুসারে অভিনব ভাবে প্রকাশ হয়েছে।

এক মা কালীর বর্ণনাই এক একজন সাধক এক এক রকম দেয়। কেউ দেয় তারার বর্ণনা, কেউ ভুবনেশ্বরীর, কেউ দুর্গা, জগদ্ধাত্রী প্রভৃতির বর্ণনা। এক মায়েরই বিভিন্ন বর্ণনা। শিব, রাম, কৃষ্ণ, বিষ্ণু, হরি প্রভৃতি ঈশ্বরের কত রকম প্রকাশ—কত রকম ভাবে সত্যের মহিমা ব্যক্ত করেছেন সাধকরা।

একই সত্য ব্রহ্ম বা ঈশ্বর ভিন্ন ভিন্ন সাধকের মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। সর্বসাধারণের যোগ্যতা ও সামর্থ্য অনুযায়ী উপযোগী করে ভিন্ন ভিন্ন সাধক সে-সব ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রকাশ করেছেন।

সব সাধকের সিদ্ধির তাৎপর্য অপরিহার্য

বাড়িতে একজন কর্তা ভাল রোজগার করলে সকলেই ভাল ভাবে থাকতে পারে। আবার যদি প্রত্যেকেই রোজগার করে তাহলে আরও সুন্দর ভাবে চলা সম্ভব। সেই রকম প্রত্যেক সাধকের অনুভূত সত্যকে যদি গ্রহণ করা যায়, তবে সত্যের অনেক নূতন নূতন পরিচয় পাওয়া সম্ভব হয়।

সবার উপযোগী সত্যের বিধানও শাস্ত্রে আছে

পূর্বে অনেক কঠোর সাধনা করে যাঁরা সত্যের উপলব্ধি করেছেন তাঁদের অভিজ্ঞতা হয়েছে যে সর্বসাধারণের পক্ষে এত কঠোরতা করে সত্যকে লাভ করা সম্ভব হবে না। সেইজন্য সকলের পক্ষে সুবিধাজনক ভাবে তাঁরা সত্যলাভের উপায়টা পরিষ্কার করে সহজ ভাবে ধরিয়ে দিয়ে গেছেন।

প্রত্যেক সাধকের অভিজ্ঞতা সব সত্য, কোনটাই মিথা নয়। ঋষিরা যে বলে গিয়েছেন—মিথা কেউ নয়, ছোট কেউ নয়—এটা অতীব সত্য। যদি কোটি কোটি লোকও তা অস্বীকার করে তথাপি তা সত্য।

সত্যই সত্যের পরিচয়

সত্য প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। যাচাই করার, তুলনা করার কিছু নেই। শুধু নিজের দেহ মন প্রাণ বুদ্ধি একসুরে মিলিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে কেউ ছোট নয়, কেউ মিথ্যা নয়। সকলেই সত্যের সঙ্গে যুক্ত আছে। প্রতিটি প্রাণ সত্যকে জানছে, সত্যকেই উপলব্ধি করছে। কথার মাধ্যমে চতুর শিল্পী যখন তা প্রকাশ করে তখন জগৎ তাকে মূল্য দেয়।

আসলে সত্যকে যাচাই করার প্রয়োজন হয় না। প্রত্যেকের ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা সত্যই। এটা কোন প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। কারওর সঙ্গে অমিল থাকলেও তা সত্য। এক মুহূর্ত যদি কেউ কেঁদে ওঠে—তখনও সে সত্যের সঙ্গে যুক্ত আছে।

প্রতিটি জলকণা যেমন জলই, সেই রকম প্রতিটি প্রাণকণাও প্রাণ—মহাপ্রাণের অংশ। এই পৃথিবী যাঁর বুকে আছে, যাঁর মধ্যে লয় হচ্ছে সেটাই সত্য। মানুষ তাঁর বক্ষেই আছে এটা জানলেও সত্য, না-জানলেও সত্য। The whole universe is a part of the Absolute.

একে সত্য, বহুতে দ্বন্দ্ব ও মিথ্যা

বহুর মধ্যে যতক্ষণ, ততক্ষণই দ্বন্দ্ব। যখন একের মধ্যে থাকা যায়, তখন আর দ্বন্দ্ব থাকে না। আসলে একের বাইরে কেউ নেই। মনের যত খেলাই হোক সব সত্য।

এমন মহাপুরুষ নেই যারা জীবনে দুঃখকষ্ট পান নাই। প্রত্যেকে এক সত্য থেকেই এসেছেন, এক সত্যেই আছেন এবং এক সত্যেই থাকবেন।

একের অধীনে বহু, বহুর মূলে এক

ঈশ্বরের বর্ণনা নানারকম ভাবে পাওয়া যায়—কখনও শান্ত, কখনও রুদ্র। কিন্তু সব অবস্থাতে এক ঈশ্বরই আছেন। ঈশ্বরের থেকে কেউ আলাদা (separate) নয়। হাতের সত্তার মূল হচ্ছে দেহসত্তা, দেহসত্তার মূল হচ্ছে চৈতন্যসত্তা। হাত যার সঙ্গে যুক্ত সেই দেহের যে মালিক তারই অঙ্গ।

বাইরে বৈচিত্র্য, অন্তরে দ্বৈত, কেন্দ্রে অদ্বৈত

একজন লোক ভাল গাইতে পারে, কিন্তু অন্য একজন ভাল গাইতে পারে না। গাইতে না-পারার জন্য সে ছোট নয়। একজন হয়ত ভাল বক্তৃতা দিতে পারে, আর একজন পারে না। কিন্তু কেউ ছোট নয়। সকলের মধ্যে বসে তিনিই দেখছেন, বলছেন, জানছেন ও শুনছেন। তাঁকেই সকলে খুঁজছে; আসলে কিন্তু তাঁকে খুঁজতে হয় না।

সামনে একটা আলো থাকলে সেটাকে উপস্থিত সকলেই দেখতে পায় বলে মনে করে। আসলে সকলের মধ্যে বসে এক ঈশ্বরই দেখেন। কারণ কর্তা, ভোক্তা, জ্ঞাতা, দ্রষ্টা একজনই। এর মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব নেই। এটা universal law, এক ভগবানই সবকিছু করেন, দেখেন ও জানেন এবং সকলে তাঁর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ।

মালার ফুলের মত এক ঈশ্বর সূত্রেই সব বৈচিত্র্য গাঁথা

প্রতিটি individual is part of One Supreme and Eternal Being। ব্যষ্টি সত্তা কখনও জ্ঞাতা বা দ্রষ্টা হতে পারে না। এটা না-জানার জন্যই এত দ্বন্দ্ব। মুখে এক ঈশ্বরের কথা বলে অপরের নিন্দা করলে ঈশ্বরের পরিচয় ঠিকমত পাওয়া হয় নাই—এটাই প্রমাণিত হয়।

অদ্বৈতের বক্ষেই দ্বৈতের বিলাস অদ্বৈতেরই আভাস

নিজে কর্তা সাজা ঠিক নয়, অদ্বৈতবাদ ভুল নয়। অদ্বৈতবাদী আচার্য শংকর অদ্বৈতবাদের প্রচার করেও শেষ মুহূর্তে আবার ঈশ্বরের মহিমা কীর্তন করে গিয়েছেন, মাকে বন্দনা করে গিয়েছেন।

অবতারদের অভিনব জীবনের বৈশিষ্ট্য মানবসমাজকে নূতন ভাবে জাগিয়ে দেয়

অবতাররা যখন আসেন তখন তাঁরা অতি বিনীত ও নম্র হয়েই আসেন এবং সর্বদা ঈশ্বরের মহিমা কীর্তন করেই যান। এই বিশ্বরূপ ঈশ্বরেরই সৃষ্টি। প্রত্যেকে এই সৃষ্টির অংশ। ঈশ্বরের মহিমার কথা ভাবলে অপার আনন্দ পাওয়া যায়, তার চাইতে বেশি আনন্দ আর কিছু হতে পারে না।

জ্ঞানসিদ্ধি দুর্লভ হলেও ভক্তিসিদ্ধি দুর্লভ নয়

যাত্রাদলের রাজা সাজার মত ক্ষণিকের জন্য নিজেকে ঈশ্বরবোধে অনুভূত হলেও—এটা ধরে রাখা যায় না। কাজেই ভগবানের গুণগান করার মত যোগ্যতা যেন লাভ হয় সেই প্রার্থনা করা উচিত। সুন্দর বস্তুকে আস্বাদন করার সুযোগ পাওয়া ঈশ্বরের কৃপা ছাড়া হয় না।

সৃষ্টির মধ্যে বাস করে স্রষ্টাকে অস্বীকার ও অমান্য করাই হল অজ্ঞানতার লক্ষণ

ঈশ্বরের মহিমা গুণগান না-করলে কৃতঘ্নতা প্রকাশ পায়, অকৃতজ্ঞ হতে হয়। অকৃতজ্ঞ তাকেই বলে, যে উপকারীর উপকার স্বীকার করে না। অখণ্ড আত্মার প্রকাশ অভিব্যক্তিগুলিকে ভেদজ্ঞানে গ্রহণ করে তার নিন্দা সমালোচনা করে ও আঘাত হানে যে, তাকেই আত্মঘাতী বলে।

এই বিশ্বপ্রকৃতি থেকে সর্বরকমে সর্বদা সকলে উপকার পাচ্ছে। এই উপকারটা স্বীকার করা হয় তখনই যখন তাঁর মহিমা কীর্তন করা হয়। ঈশ্বরকে না-মেনে নিজেরা প্রভু বা কর্তা সাজতে গেলে পৃথিবীর কোন সমস্যারই সমাধান হওয়া সম্ভব নয়।

ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে জীবনের লক্ষ্যে পৌঁছান সম্ভব নয়

ঈশ্বরই একমাত্র কর্তা, প্রভু বা মালিক সবকিছুর, আর সকলে তাঁর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। মানুষের দেহের মধ্যে যেমন বহু ইন্দ্রিয় থাকা সত্ত্বেও প্রাণ না-থাকলে কোন ইন্দ্রিয়ই কোন কাজ করে না, সেইরকম ঈশ্বরকে বাদ দিয়েও কারওর কোন অস্তিত্বই থাকে না।

ঈশ্বরের স্বভাববিলাসই জীবজগৎ

মহাপ্রাণেরই রূপ এই সৃষ্টিজগৎ। সেইরূপ, যার কোন দিনই অভাব হবে না তা হচ্ছে প্রাণ। প্রাণের অভাব কোনও দিনই হবে না। প্রত্যেকটি মানুষ চৈতন্যের প্রকাশ।

মায়ের মহিমা শ্রবণ দ্বারাই মাতৃকরুণা লাভ হয়

সৎসঙ্গে গিয়ে মায়ের মহিমা বারবার শুনতে হয়। যতক্ষণ অহংকার না হারিয়ে যায় ততক্ষণ তাঁর কথা শুনতে হবে। সবটাই বোধময় মহতের মহিমায় পূর্ণ হবে। মায়ের স্মৃতিতে অন্তর ভরে গেলে অহংকারের আমিটা আর টের পাওয়া যায় না, bulb-এর মত fused হয়ে যায়। তখন দেখা যায় অরূপের রূপ, নির্গুণের গুণ, অনুগত, অনুমত অর্থাৎ যেমন ভাবে তিনি চালান তেমন ভাবেই চলা যায়।

মা দুই নয়ন দিয়ে দেখছে সকলকে। মায়ের তৃতীয় নয়ন হচ্ছে বিদ্যানয়ন, দিব্যচক্ষু, জ্ঞানচক্ষু। এই তৃতীয় নয়ন যার আছে সে-ও সব কিছু দেখতে পারে।

ঈশ্বর দর্শনের ফলে অভিমান অহংকার নষ্ট হয়ে যায়

অনেক সাধক বলে ঈশ্বর দর্শন হয়েছে, অথচ আবার বলে—শান্তি নেই তাদের। এটা আবার কী রকম ঈশ্বর দর্শন? তাদের এ রকম অশান্তি হবার কারণ তাদের অহংকার অভিমান লয় হয়নি।

সমর্পণের পরিণাম কী?

ভক্তির সাধনায় 'আমার আমি'র কোন স্থান নেই। মহাপ্রভু জানিয়ে গেলেন জগৎকে সমর্পণের পরিণাম কোথায়। রামকৃষ্ণদেব বিবেকানন্দকে বলেছিলেন—তুই মায়ের গোলাম হয়ে থাকবি। শেষ পর্যন্ত বিবেকানন্দ সত্যই নিজেকে মায়ের হাতের পুতুল বলে উল্লেখ করেছিলেন। যে সত্য সত্যই এই বোধে আসে তার কাছ হতেই জগৎ সবচেয়ে বেশী উপকৃত হয়।

অবতার পুরুষগণ অখণ্ডের দৃষ্টিতে সব দেখেন ও ব্যবহার করেন

প্রাণ না-থাকলে ব্রহ্ম উপলব্ধির মূল্য নেই। সেইজন্য ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব "শিবজ্ঞানে জীব সেবা"-র কথা বলে গিয়েছেন।

প্রত্যেকের ইষ্ট বা গুরুকে যেন বিশ্বমূর্তিতে সকলে সেবা করে। রাম বা কৃষ্ণকে বিশ্বমূর্তিতে মানা উচিত। সমগ্র বিশ্বকে একত্র করলে হয় রাম, কৃষ্ণ, কালী, দুর্গা প্রভৃতি। সমগ্র বিশ্ব হচ্ছে ভগবানের রূপ, তাঁকে সেবা করতে হয়।

ভগবানকে নিয়ে ভগবানের মধ্যে খেলতে হয়, ফলে বিশ্ব হয়ে যায় আপন

বিশ্বকে আপন করতে না-পারলে ঈশ্বর উপলব্ধি হয় না। রাম, কৃষ্ণ, শিব সবই বিশ্বমূর্তিতে সত্য। বিশ্বমূর্তিতে কোন দ্বন্দ্ব নেই।

একান্ত ভাবে যেন সকলে ভগবানের হয়ে যেতে পারে—সেই চেষ্টা করা উচিত। কেউ ছোট নয়। ভগবানের জন্যই যেন সব কাজ হয়। এটাই হল মানবজীবনের উদ্দেশ্য—total aim of life। [৩।৮।৬৮]

সাধুসঙ্গ/সৎসঙ্গের পরিণাম

ভগবানের কথা বারবার শুনতে শুনতেই মানুষ তার হারানো আত্মস্মৃতি ফিরে পায়, স্ব-স্বরূপের পরিচয় পায়। যা সকলে বাইরে খুঁজে এসেছে তাকে সে অন্তরের মধ্যেই পায়। তা-ই হল শাশ্বত শান্তি, তার নামই ভগবান।

গানের রেকর্ড বারবার শুনলে সেই গানের সুর যেমন অজ্ঞাতসারেই ভিতর থেকে ফুটে বেরোয় সেই রকম ভগবানের কথা শুনতে শুনতেও সকলের মধ্যে সেই ঈশ্বরীয় ভাবগুলি প্রকাশ হতে দেখা যায়। নিজেরা চেষ্টা করে লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে দুই একজনের পক্ষেই এটা সম্ভব হয়। সেইজন্য মহাপুরুষরা এসে বারবার সবাইকে সৎসঙ্গের মহিমা জানিয়ে যান। সদ্‌গুরু বা মহাপুরুষদের কাছে গেলে অল্প চেষ্টাতেই সহজ ভাবে শান্তি লাভ হয়।

সামগ্রিক ভাবে কল্যাণ করাই হল মহাপুরুষদের জীবনের লক্ষ্য। শাশ্বত শান্তির দিকে সকলে যেন ধাপে ধাপে এগিয়ে যেতে পারে সেজন্য তাঁরা সিঁড়ি তৈরি করে দিয়ে যান অর্থাৎ নির্দেশ দিয়ে যান। এইগুলি যতদিন অবিকৃত থাকে ততদিনই তার প্রভাব থাকে।

অজ্ঞান প্রভাবে ব্যবহারদোষে সাধুদের কথাও তেমন কার্যকরী হয় না

ভুল ব্যবহারের ফলে মহাপুরুষের দেওয়া নির্দেশগুলি পরে বিকৃত হয়। বিকৃত হয়ে গেলে তার প্রভাব বেশি লোকের পক্ষে কার্যকরী হয় না। দুই-একজনই তা ধরে রাখতে পারে।

মহাপুরুষদের সঙ্গ করলে দিব্য ভাবের অধিকারী হওয়া যায়

মহাপুরুষরা ঈশ্বরীয় মহিমা নিঃস্বার্থ ভাবে সূর্যের আলোর মত চারিদিকে ছড়িয়ে দেন। এই সব মহাপুরুষদের কাছে যাবার যোগ্যতা যাদের হয়েছে, তারা ঈশ্বরের বিশেষ একটা কৃপা লাভ করেছে বুঝতে হবে।

সৎসঙ্গের মাধ্যমে সমস্ত নাম রূপ ভাব বোধ, সমস্ত মতপথকে এক করে গ্রহণ করার যোগ্যতা লাভ হয়।

ঈশ্বর কোন বিশেষ মতপথের অধীন নন। ঈশ্বরকে কোন মত বা পথ তৈরি করে নাই বরং ঈশ্বরই যে-ভাবে নিজের মহিমা প্রকাশ করেন তা-ই মতপথ রূপে পরিগণিত হয়।

যে-কোন দেশের লোক যে-পথেই চলুক, যে-রূপে নামে ভাবেই ডাকুক এক ঈশ্বরকেই চাইছে। ঈশ্বরের এই বিশেষ মহিমার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সুযোগ পেলে একশ বছরের অজ্ঞানতা এক মুহূর্তেই নষ্ট হয়ে যায়।

ক্ষণিকের জন্য সৎসঙ্গ সারাজীবন রাজত্ব ভোগ অপেক্ষা শ্রেয়

মুহূর্তের জন্যও মহাপুরুষের সঙ্গ সারাজীবনের জন্য রাজা হওয়ার চাইতেও অনেক মূল্যবান।

সংসারে মানুষ কত রকম কথা বলে এবং কত রকম কথাই শোনে, কিন্তু তার মধ্যে ভগবৎ প্রসঙ্গ থাকে না, থাকলেও অতি সামান্যই। সৎসঙ্গে এক ঘণ্টাও যদি কেউ শ্রবণের সুযোগ পায় তবে তার পূর্বের চিন্তাধারা অনেক পালটে যায়।

সৎসঙ্গের মাহাত্ম্য

মানুষকে কর্মের প্রেরণা যোগায় সৎসঙ্গ। সৎসঙ্গ মানুষকে দ্বিজ করে দেয়, বিপ্র করে দেয় এবং অবশেষে ব্রাহ্মণত্বে পৌঁছে দেয়। মানুষের সমস্ত রকম অভাব অশান্তি দূর করে সৎসঙ্গ। সেইজন্য ঔষধির মধ্যে মহৌষধি বলা হয় সৎসঙ্গকে।

শান্তি সংসারে নেই, ঈশ্বরেতেই আছে

মানুষ শান্তি চায় ঠিকই কিন্তু শান্তির যথার্থ পরিচয় না-জানার জন্যই ভুলভাবে শান্তি খুঁজে বেড়ায়। একমাত্র শান্তির উপায় হল ঈশ্বর। ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে কোন মতেই শান্তিলাভ সম্ভব নয়।

সংসারে বহু রকম অশান্তির মধ্যেও ঈশ্বরের নাম নিয়ে থাকলে তার মধ্যেই একটা শান্তির প্রলেপ অনুভব করা যায়। এই শান্তিকেই মানুষ প্রকৃতির মধ্যে রূপে নামে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

সবার হৃদয়েতেই শান্তিস্বরূপ ঈশ্বর আছেন

ছোট শিশু প্রথম খেলনাতেই আনন্দ পায়। আরও একটু বড় হয়ে সে আনন্দ পায় খেলার মাঠে। আর কিছুদিন পরে তাতেও যেন তৃপ্তি হয় না—সে বিয়ে করে, একটি দুটি করে সন্তান আসে। কিছুদিন পরে তাতেও অতৃপ্ত ভাব যায় না। যাকে পেলে তৃপ্তি হয়, শান্তি হয় সে-বস্তু কিন্তু মানুষের অন্তরেই রয়েছে, অথচ সে তার সন্ধান জানে না।

শান্তির বস্তু খুঁজতে খুঁজতে অহংকারের আমি যখন লয় হয়ে যায় তখনই সেই শাশ্বত শান্তির বস্তুটি আপনিই প্রকাশিত হয়ে পড়ে। তাকেই ভিন্ন ভিন্ন সাধক ভিন্ন ভিন্ন নামে বলেছে—যেমন কালী, দুর্গা, শিব, রাম, বিষ্ণু, হরি প্রভৃতি অথবা ঈশ্বর, ভগবান, ব্রহ্ম, আত্মা প্রভৃতি।

স্বপ্রকাশ ঈশ্বর শুদ্ধচিত্তে অনুভূত হয়

ঈশ্বরকে পেতে হলে ব্যাকুলতা বাড়ানো দরকার। চেষ্টা করে তাঁকে পাওয়া যায় না। কারওর মধ্যে ঈশ্বরীয় প্রকাশ হওয়াটা তার নিজের হাতে নয়।

ঈশ্বর-আত্মাই গুরুরূপে অন্তরে ও বাইরে সবকে চালিত করেন

গাড়িতে যন্ত্রপাতি ইঞ্জিন থাকা সত্ত্বেও যেমন গাড়ি নিজে চলতে পারে না, চালকের প্রয়োজন হয় সেই রকম মানুষও নিজে কিছুই করতে পারে না। তার মধ্যে পরিচালক শক্তি (leading energy) হচ্ছে গুরুমূর্তি।

গুরুমূর্তি বাইরে থেকে প্রেরণা দেয়, প্রয়োজনীয় উপাদান যোগায় আবার ভিতরে বসে সে-ই set করে দেয়। একেরই দুই প্রকাশ।

এই গুরুমূর্তি হচ্ছে নৈর্ব্যক্তিক (impersonal form)। কিন্তু এই গুরুই আবার সামনে স্থূলরূপ নিয়ে এসে মানুষকে তার ভিতরের ঈশ্বরীয় গুণগুলি বাড়াতে সাহায্য করেন।

আত্মগুরু প্রথমে শরণাগতির মাধ্যমে এবং পরে স্বানুভূতিরূপে শিষ্যের হৃদয়ে অভিব্যক্ত হন

গুরু শিষ্যের মধ্যে ভাবের দ্বারা ভাবের উদ্দীপন করেন, ভাবের দ্বারা ভাবের সমন্বয় সাধন করেন। তারপরে বোধের বিকাশ করে অখণ্ড বোধসত্তার মধ্যে মিলিয়ে নেন। এই ভাবটা অন্তরের ভাব অর্থাৎ innermost secret nature।

ভাবশুদ্ধির পর স্বরূপে স্থিতি হয়

অন্তরে শরণাগতির ভাব না-জাগলে বাইরের থেকে আঘাতের প্রয়োজন হয়। যতদিন এই অন্তরের ভাবটা না জাগে ততদিন কেউ মুক্তি বা স্বাধীনতার আস্বাদন করতে পারে না। সত্যভাব জাগলেই মানুষ স্বয়ংপূর্ণ হয়ে যায়, অর্থাৎ স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন সে কোনও জাগতিক বস্তুর উপরে নির্ভরশীল হয়ে থাকে না।

লোকে টাকার পিছনে ছোটে; কিন্তু নিরপেক্ষ সাধুর পিছনে ছোটে রাজা মহারাজারাও। তারা লক্ষ লক্ষ টাকা ঢালে তাঁদের সেবার জন্য।

'The Substance of all' বললে ঈশ্বরকেই বোঝায়। তিনি হচ্ছেন All Love, প্রেম দিয়ে গড়া।

মানুষের মধ্যে ঈশ্বর নিজেকে প্রকাশ করেন স্বভাবের দিব্য রূপায়ণের মাধ্যমে

ঈশ্বরের প্রথম প্রকাশ শক্তি (Power), দ্বিতীয় প্রকাশ জ্ঞান (Wisdom), তৃতীয় প্রকাশ প্রেম (Love)। সবশেষে মানুষই ঈশ্বর হয়ে যায়।

শক্তির মধ্যে সব পাওয়া যায় না, জ্ঞানেও সব পাওয়া যায় না; আনন্দ বা প্রেমে তাঁকে পাওয়া যায়।

ঈশ্বর স্বয়ং স্বভাবে, স্ববোধে নিজের সঙ্গেই নিজে লীলা করেন

প্রথম ঈশ্বরই মানুষ হয়েছিলেন, পরে সেই মানুষই আবার ঈশ্বর হয়ে যায়। তখন সে 'সবেতে এক এবং একেতে সব এবং তদূর্ধ্বেও নিজেকে দর্শন ও অনুভব করে—এ-ই স্বানুভূতি। ঈশ্বরই স্বসংবেদ্য স্বানুভবদেব'—One in All and All in One and beyond, beyond also। তাঁকেই অবতার পুরুষ বা সদ্‌গুরু বলা হয়।

অবতার পুরুষ বা সদ্‌গুরুদের সমস্ত বস্তুর মধ্যেই একের জ্ঞান থাকে। তাঁরা তখন একেতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যান। এই জ্ঞানেতে প্রতিষ্ঠিত হলেই অখণ্ড শান্তির অধিকারী হওয়া যায়।

জানাটাকে জ্ঞান বলে না। জ্ঞান হচ্ছে এক বা সমবোধে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবার নাম, unity in the differences।

Unity হচ্ছে ঈশ্বর নিজে। তিনি নিজে সমান। মহাপুরুষদের মধ্যে spirit of unity দেখা যায়। তাঁরা সকলকে একবোধে নেন।

প্রত্যেকে এক চৈতন্যেরই প্রকাশ এটা স্মরণ রাখতে হবে। কিন্তু নিজেদের ব্যক্তিগত ইচ্ছা অনিচ্ছা, পছন্দ অপছন্দ রেখে আবৃত হয়ে আছে। আলাদা পছন্দ অপছন্দ বা নিজেদের ইচ্ছা পরিত্যাগ করলেই আবরণ সরে যায়। তখন সকল অবস্থাতেই সর্ববস্তুর সংস্পর্শে থেকেও সর্বদা ঈশ্বরকেই অনুভূত হয়।

অবতার পুরুষ, মহাপুরুষ এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে অনুভূতির পার্থক্য

শ্রীকৃষ্ণের চাওয়া-পাওয়ার কিছু ছিল না; তথাপি নিরন্তর তিনি কাজ করে গিয়েছেন লোকশিক্ষার জন্য। অথচ সাধারণ লোক শুধু 'আমার আমি' বোধ নিয়েই থাকে। মহাপুরুষদের মধ্যে সেই ব্যক্তিগত 'আমার' বোধ বা অহংকার থাকে না।

'আমার আমি' বোধশূন্য অবস্থার কথা শাস্ত্র পড়ে ঠিক ধারণা করা যায় না। যদি কোন জীবনের মধ্যে এ সব অবস্থা প্রকাশ হতে দেখা যায় তবে তাঁর দ্বারা সকলে অশেষ উপকৃত হয়।

'আমার আমি' বোধ পরিপূর্ণ ভাবে লয় হয়ে গেলে জীবন মহাপ্রাণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। তখন তার আর কোন অভাববোধ থাকে না, পূর্ণতার সঙ্গে যুক্ত থাকে বলে। এই সব মহাপুরুষদের সান্নিধ্যে গেলে মোহ আসক্তি আপনিই চলে যায়।

আসল মুক্তি হয় তখনই যখন 'আমার আমি' বোধ থাকে না। 'আমার আমি' বোধ থাকা পর্যন্ত বন্ধনের মধ্যেই পড়ে থাকতে হয়।

ভগবানকে নিজের করে নিতে চাইলে আরও বেশি বন্ধনের মধ্যে পড়তে হয়। তার চাইতে নিজে ভগবানের হয়ে যেতে হয়।

মহাপুরুষদের কাছে ব্যক্তিগত সুখ সুবিধা বা প্রার্থনা নিয়ে যাওয়া উচিত নয়। শাশ্বত বস্তুর প্রার্থী হয়ে যেতে হয়। জ্ঞান অজ্ঞানের পারে যাবার জন্য যেন সকলের প্রার্থনা থাকে।

শান্তি মিশনের মাধ্যমে শান্তি আসে না, শান্তি আসে ঈশ্বরের কৃপায়

এই অশান্তিময় জগতে শান্তি মিশন গঠন করে শান্তিলাভ হবে না। শাশ্বত শান্তির অধিকারী যাঁরা হয়েছেন সেই সব মহাপুরুষদের কাছে যেতে হবে। তাঁদের কাছে গিয়ে জাগতিক দুঃখ আধিব্যাধি, রোগশোকের কথা না-বলে স্বরূপের ঘরে যাবার সেই পথটির সন্ধান জেনে নিতে হবে, যেখানে মারামারি কাটাকাটি দ্বন্দ্ব বিরোধ কিছু নেই।

যাঁরা শান্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছেন তাঁরাই বিনা প্রতিদানে সবাইকে শান্তিলাভের পন্থা বলে দেন, কিন্তু দেখা যায় সেই শাশ্বত সুখ ও শান্তি কেউ চায় না।

শান্তিস্বরূপ ঈশ্বরের মধ্যে বাস করলেই শান্তিলাভ

সাধকরা জয় পরাজয়ের মাঝখানে যখন থাকেন তখনই ঠিক তাঁদের শান্তির অবস্থা। শান্তির বাণী প্রচার করতে গিয়ে কারওর মধ্যে হতাশার ভাব যেন না আসে।

সর্ব চাওয়ার পরিসমাপ্তিতে হয় অহংকারের নাশ, অহংদেবের প্রকাশ

মহাপুরুষদের 'অহংকারের আমি' থাকে না; সেইজন্য তাদের কোন চাওয়াও থাকে না। খুব উচ্চ অবস্থা বা চিত্তের পরিশুদ্ধ অবস্থাতে ঈশ্বরকে চাওয়াও থাকে না। অন্যান্য চাওয়া অপেক্ষা শ্রেয় হলেও তখনও অজ্ঞান জাত অহংকার ও অপূর্ণতা থাকে বলে এ-ও প্রস্তুতির পর্যায়ে পড়ে। 'ঈশ্বরকে চাই' এটাও একটা প্রস্তুতি (preparation)।

মহাপুরুষদের 'অহংকারের আমি'টা একেবারেই লয় হয়ে যায়। তখন তাঁদের মধ্যে 'আমিত্বের আমি' বোধ ফুটে ওঠে। এই অবস্থা বুদ্ধি দিয়ে ধারণা করা যায় না।

কাঁচা আমি অহংকার হল প্রকৃতিজাত, বিকারী ও পরিণামী কিন্তু পাকা আমি প্রকৃতিপতি, প্রভু, স্বামী, নিত্যমুক্ত, নির্বিকার, নিরাকার, অপরিণামী

'আমি'র অনেক রকম স্তর আছে—'অপূর্ণ বা কাঁচা আমি', 'পূর্ণ বা পাকা আমি' প্রভৃতি। একেবারে অহংকার-শূন্য (egoless) হওয়াটাই সকলের লক্ষ্য থাকা উচিত। পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ হলেই শুধু এটা সম্ভব হয়।

বিবেকসিদ্ধির পূর্ব পর্যন্ত স্বার্থবুদ্ধি ও ভেদজ্ঞান থাকে

আত্মপক্ষ সমর্থনের ভাব (self-justification) যতক্ষণ পর্যন্ত থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত জ্ঞানের প্রকাশ আবৃত থাকে অজ্ঞানের দ্বারা। আত্মসমর্পণের অর্থ 'আমার আমি' স্থানে 'তোমার আমি' বোধ হয়ে যাবে। একান্ত ভাবে তাঁর হয়ে যেতে পারলেই শান্ত হওয়া যায়।

সমস্ত বহিঃপ্রকৃতির দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় সকলেই কেন্দ্রের দিকে এগিয়ে চলছে। কেন্দ্রে গেলে সেখানে কোনরকম বিকার থাকে না। একেবারে শান্ত অবস্থা। সে নিজে অনাসক্ত ও উদাসীন ভাবে কাজ করছে বলে কোন প্রকার বিশৃঙ্খলা হয় না, কর্মফলের বন্ধনও হয় না। বিরাট কর্মের মধ্যেও এই শান্ত অবস্থা হওয়া সম্ভব। অহংকারের প্রভাব বেশি থাকলে কাজে ত্রুটি গাফিলতি বেশি দেখা যায়। ঈশ্বরীয় বোধে কাজ করলে সুশৃঙ্খল ভাবে কাজ করা যায়।

গুরু পূর্ণতার দিশারী

অখণ্ড স্মৃতি হচ্ছে গুরু। মনটা যখন চঞ্চলতার দিকে ছড়িয়ে পড়ে তখন এই বোধের স্মৃতিই রক্ষা করতে পারে। গুরুদত্ত নাম বা বীজের সাহায্যে সমস্ত রকম দুর্লভ বস্তুই পাওয়া যায়। নাম করার ফলে চিত্তাকাশে বা চিদাকাশে তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। সেই তরঙ্গের সঙ্গে মন যুক্ত হলে আধ্যাত্মিক অনুভূতি হতে থাকে।

ধ্যানের পরিণামে হয় চিত্তশুদ্ধি তার পরে হয় বিবেকসিদ্ধি

স্মরণ ও ধ্যানের ফলে মন এমন স্থানে যেতে পারে এবং এমন চিন্তাধারার সঙ্গে যুক্ত হতে পারে যা রেডিও দ্বারাও সম্ভব হয় না। ওঁকার ধ্বনি সাধনার দ্বারা ধরা যায়। নির্জন নদীতীরে বা জঙ্গলে, পাহাড়ে, পর্বতে জ্ঞানের তরঙ্গের প্রভাব সহজে ধরা পড়ে বলে সাধকরা সেখানে গিয়ে সাধনা করতে চান।

প্রথম তিন প্রকার গুরুর পরিচয়

গুরু তিন প্রকার। তমোগুণী গুরু হল শাস্ত্র, পুঁথি প্রভৃতি। রজোগুণী গুরু হল স্থূলদেহধারী গুরু। সত্ত্বগুণী গুরু হল বিবেকসিদ্ধি সূক্ষ্মবোধ অর্থাৎ ভগবৎ কৃপা বা করুণা। সত্ত্বগুণী গুরুর সঙ্গ দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হয়; অর্থাৎ স্মৃতি থেকে যে-ভগবৎ নাম বা কথা শোনা হয়, তা-ই তৃতীয় গুরুমূর্তি। নামের প্রভাবে কামনা-বাসনা চঞ্চলতা কমে যায়।

ভগবৎ নামের সঙ্গে তার ভাব ও বোধের প্রত্যক্ষ যোগ প্রমাণসিদ্ধ

বাক্‌ই সত্যকে প্রকাশ করে। শব্দহীন বাক্ হয় না এবং বাক্ ছাড়াও বোধ প্রকাশ হয় না। শব্দহীন বোধ হয় না, বোধ ছাড়া শব্দও হয় না। যেমন, শিব উচ্চারণ করলে একটা বোধ হয়।

নামকে অবহেলা করা উচিত নয়। নামের সাহায্যেই ভবনদী পার হওয়া যায়। নামের মধ্যে পূর্ণ ঈশ্বরীয় শক্তি রয়েছে। এই নামের সাহায্যেই প্রহ্লাদ কত রকম লাঞ্ছনা ও নির্যাতন পেয়েও অক্ষত ছিল। যবন হরিদাসের কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তাকে কাজীর বিচারে বাইশ বাজারে শতাধিক করে বেত্রাঘাত করা হয়েছিল সে হরিনাম করত বলে। হরির নামে সে জীবিত ছিল। হরি তাকে রক্ষা করেছেন। শ্রীমৎ মহাপ্রভু স্বয়ংই তা প্রকাশ করেছেন।

ভক্তের অবলম্বন

সকলের অন্তরে বাইরে একমাত্র ঈশ্বরই আছেন, তিনি সকলকে রক্ষা করবেনই—এই বিশ্বাস নিয়ে চলতে হয়। একমাত্র ঈশ্বরই আছেন, আর সকলে তাঁর ছায়ামাত্র।

ঈশ্বর বিজ্ঞানের মর্মকথাই হল ঈশ্বর সৃষ্ট সর্ববস্তুর মধ্যেই স্বয়ং অনুস্যূত আছেন

বস্তুকে বস্তু বলে না-ধরে তার মধ্যে ঈশ্বরকেই ভাবনা করতে হয়। ঈশ্বরকে খুঁজে বেড়াতে হয় না। প্রতিটি বস্তুর মধ্যেই ঈশ্বর আছেন। পাথরের কাছে প্রার্থনা নিবেদন করলেও সাড়া পাওয়া যায়। বহু সাধক জীবন্ত শালগ্রাম শিলা বহন করেন। ঈশ্বরের প্রতিমা মাটি, কাঠ, পাথর, ধাতু প্রভৃতি দ্বারা তৈরি হয়। সাধক তার মধ্যে নিষ্ঠা, ভক্তি ও প্রেম সহকার ইষ্টমূর্তির সন্ধান করে তার সাক্ষাৎ পায়। এটা তর্কের বিষয় নয়। শুদ্ধচিত্তে অনুভূতির বিষয়। সর্ববস্তুর মধ্যে সচ্চিদানন্দস্বরূপ ঈশ্বরাত্মা ব্রহ্মের অনুভূতিই হল স্বানুভূতি। মানবজাতির কাছে এ-ই হল সর্বোত্তম আবিষ্কার (highest discovery)।

পাথর হেয় বস্তু নয়। তাঁর প্রেমের ঘনীভূত অবস্থার প্রকাশ হল কাঠিন্য (hardness)। মেদিনী শুধু মাটি নয়, স্নেহপদার্থ দিয়ে তৈরি। মেদিনী হল মায়ের কোল। সন্তানকে বক্ষে ধারণ করবার জন্য কঠিন রূপ ধারণ করেছে। ভক্ত প্রহ্লাদের কথা পাথরের স্তম্ভের মধ্যেও যে হরি আছেন তা তার পিতা হিরণ্যকশিপু না-মেনে স্তম্ভকে পদাঘাত করাতে স্তম্ভ থেকে বেরিয়ে বিষ্ণুর নৃসিংহ অবতার হিরণ্যকশিপুকে বধ করেন। হিরণ্যকশিপুর যে-সমস্ত অনুগত কর্মচারী প্রহ্লাদকে কঠোর তাড়ন-পীড়ন করে শাস্তি দিয়েছিল তাদেরও বিষ্ণুর নৃসিংহ অবতার বধ করেন, আর প্রহ্লাদকে আদর করে বরণ করে নেন শ্রেষ্ঠ ভক্ত হিসাবে এবং তাঁকে দিব্য বরদানে ভূষিত করেন।

ঈশ্বরের পরিচয়

মাটি থেকেই গাছপালার জন্ম হচ্ছে, যার থেকে সকলে প্রাণশক্তি পেয়ে থাকে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের চারদিকে একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায় যে ঈশ্বর সকলকে লালন পালন ও পুষ্ট করার জন্য এবং তাদের জাগ্রত করার জন্য কত রূপে কত বেশেই প্রকাশিত হয়ে রয়েছেন।

ঈশ্বর হচ্ছেন সমগ্রতার একক মূর্তি (Totality of Oneness)। প্রত্যেকেরই গুরু হচ্ছেন সেই ঈশ্বর বা বিশ্বচৈতন্যস্বরূপ আত্মা। তাঁর ব্যক্তিক রূপের নামই শিব, নারায়ণ, কালী, তারা প্রভৃতি। এই প্রত্যেকটি নামই সামগ্রিক রূপ বা বিশ্বরূপকেই নির্দেশ করে।

সৎসঙ্গে প্রত্যেক দিন নিষ্ঠা ও একাগ্রতা সহকারে শ্রবণের ফলে মানুষের কুচিন্তা চলে যায়। নিম্ন মনের গতি বস্তুকে ধরে রাখতে চায়। মধ্য মনের গতি কার্যের মধ্যে থাকে, উর্ধ্ব মনের গতি সমগ্র কারণের সন্ধানে রত থাকে। তারপরে আসে মনের শান্ত অবস্থা।

সোনার সঙ্গে খাদ না-মেশালে যেমন গয়না হয় না, সেইরূপ জ্ঞানের সঙ্গে অজ্ঞান না-মেশালে জ্ঞানের ব্যবহার সম্ভব হয় না

মানুষের খাদ্যের মধ্যে যেমন শুধু সারটুকু গ্রহণ করলেই চলে না, তার মধ্যে কিছু কিছু অসার পদার্থও থাকে, সেই রকম সৎসঙ্গে শুধু সার কথাটা একবারে বলে দিলে চলে না। অনেক কথার মধ্যে আসল সার বস্তুটা বলা হয়। বারবার শুনতে শুনতে সার বস্তুটা গ্রহণ করা যায়।

অনুভবসিদ্ধ পুরুষ ব্যতীত মানুষের মধ্যে অবিদ্যা অজ্ঞানের প্রভাবজনিত গোঁড়ামি থাকে

মহাপুরুষদের মধ্যে কোন মতের গোঁড়ামি থাকে না। একজন নাস্তিক এলেও তার সঙ্গে তার ভাবেই কথা বলে এবং কথার মাধ্যমে তার ভাবধারার সম্প্রসারণ করে দেন।

নাস্তিক্য ও আস্তিক্য উভয়ই অজ্ঞানপ্রসূত

আসলে মানুষ নাস্তিক কেউই নয়। কিছু মেনে, বিশ্বাস করে এবং নির্ভর করে তাকে চলতেই হয়। ঈশ্বরই একমাত্র নাস্তিক। জ্ঞান অজ্ঞান তাঁর কাছে সমান প্রিয়। অজ্ঞানটা জ্ঞানেরই পূর্বাবস্থা অর্থাৎ বীজের মত সুপ্ত অবস্থা বা অপূর্ণ অবস্থা।

ঈশ্বরের আত্মলীলার দিব্য বিজ্ঞান

মানুষের কাছে যা তম, ঈশ্বরের কাছে তা-ই মত। ঈশ্বরের ইচ্ছার বিলাসেই জগৎ সংসার। সবার মধ্যেই তাঁর কাজ চলছে। মানুষের মধ্যে মাত্রাগত ভাবে বা অতীব সীমিত ভাবে তার প্রকাশ শুরু হয় এবং স্বভাবের ক্রমিক অন্তর্বিকাশের সঙ্গে জন্মজন্মান্তর তার উৎকর্ষ সাধিত হতে থাকে। পরিণামে সাধনভজনের উৎকর্ষের মাধ্যমে বিশেষ কোনও জন্মে পরিশোধিত ও পরিবর্ধিত হয়ে ঈশ্বরের মতের সঙ্গে মিশে এক হয়ে যায়। তখন ব্যষ্টি জীবের আর ব্যষ্টি ভাব থাকে না। তার জীবনে পূর্ণ দিব্য রূপায়ণ হয় সত্ত্বগুণের প্রভাবে। তারপর শুদ্ধসত্ত্বগুণের বিকাশে ঈশ্বরের ধর্ম প্রাপ্ত হয়। গীতার ভাষায় "মম স্বাধর্ম্যমাগতাঃ", অর্থাৎ জীবের জীবত্ব খসে যায় দেবত্বের বিকাশে, পরে দেবত্বও ঈশ্বরত্বে বিলীন হয় স্বাত্মবোধের উদয়ে।

প্রাকৃত বিদ্যার প্রভাবে প্রথমে সবাই চলে। ক্রমবিবর্তনবাদের বিজ্ঞান অনুসারে প্রাকৃত ধর্ম ও বিজ্ঞান উৎকর্ষ লাভ করে অধ্যাত্ম ধর্ম ও বিজ্ঞানের মাধ্যমে ক্রমপর্যায়ে। বিবর্তনবাদের বিজ্ঞান অনুসারে অধ্যাত্ম ধর্ম ও বিজ্ঞান ক্রমপর্যায়ে ঈশ্বরীয় ধর্ম বিজ্ঞানের পরিণতি লাভ করে। এ-ও শেষ কথা নয়। ঈশ্বরীয় বিজ্ঞানের সম্যক্ প্রকাশ, বিকাশ ও পূর্ণতা সিদ্ধ হয় নির্বিশেষ ভাবে ব্রহ্ম আত্ম ধর্মবিজ্ঞানের মাধ্যমে। তখন জীব/মানুষের পূর্ণতা লাভ হয় ব্রহ্ম আত্ম বোধে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে; সুতরাং সামান্যতম হতে ঈশ্বরীয় মতে উত্তীর্ণ হয়ে পরিশেষে ব্রহ্ম আত্মতত্ত্বে অর্থাৎ অখণ্ড সমজ্ঞান বা একজ্ঞানের সঙ্গে নিত্যযোগে স্থিতি হয়।

প্রবক্তা ও বক্তব্যের মাধ্যমেই মানুষ পরিণতি লাভ করে

প্রত্যেক সাধকের কাছে মানুষ কিছু-না-কিছু শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। বর্তমানে অনেকেরই প্রখর 'ধী' নেই। শিক্ষার অনেক প্রয়োজন। মহাপুরুষদের জীবনের মধ্য দিয়ে সত্যের একটা যুগদর্শন পাওয়া যায়। তাঁদের অনুভূতিগুলি লিপিবদ্ধ থাকলে তা মানুষের কাজে লাগে। ভগবৎ স্মৃতিকে পুষ্ট করার জন্য এসব ধরে রাখা প্রয়োজন।

গুরুবাণীই হল মানুষের সর্বোত্তম রক্ষাকবচ

বোধসত্তার মধ্যেই প্রত্যেকে আছে এবং প্রত্যেকের মধ্যেই বোধসত্তা আছে এই স্মৃতি সর্বদা বোধে জাগ্রত থাকলে বিরুদ্ধ অবস্থার মধ্যেও মায়ের কোলেই থাকা যায়। বিরুদ্ধ অবস্থাগুলিও মাতৃরূপ।

লাভ লোকসানের উর্ধ্বে হল perfection, অর্থাৎ পরমতত্ত্বে প্রতিষ্ঠা

সৎসঙ্গের কোন কথা যে কার অন্তর স্পর্শ করবে তা আগে কেউ বলতে পারে না। কাজেই শ্রবণের খুব প্রয়োজন। শক্তি-জ্ঞান-ভক্তি যা-কিছু লাভ হয় সব আবার মাকে ফিরিয়ে দিতে হয়। [৪।৮।৬৮]

সকলের সত্য পরিচয়

'দেবতা' হচ্ছে সংস্কৃত শব্দ। দেবতা অর্থ দেও + তা। তা অর্থে 'আমার আমি'। সকলের 'আমার আমি' বোধকে দিয়ে দিতে বলা হচ্ছে। কাকে? যার কাছ থেকে এটা সবাই পেয়েছে, অর্থাৎ সমগ্র মূর্তি সচ্চিদানন্দ সত্তাকে।

যাঁর থেকে সকলের উৎপত্তি এবং যাঁতে পরম শান্তি, প্রেম, আনন্দ, জ্ঞান, শক্তি প্রভৃতি পাওয়া যায়— তিনি হচ্ছেন একই সত্তা। তাঁর নামই সচ্চিদানন্দ সত্তা। সকলে তাঁর বক্ষেই বিরাজ করে এবং এটাই হচ্ছে সকলের একমাত্র পরিচয়।

অভাব, অভিযোগ, দুঃখকষ্ট প্রভৃতি মনের বৃত্তি/ভ্রান্তি। এটা সকলের পরিচয় নয়। পূর্ণতার মধ্যে সকলে ছিল, আছে এবং থাকবে। এ-ই হল সকলের আসল পরিচয়।

এই পূর্ণতার মধ্যে থেকে এবং পূর্ণতার স্বভাবগুণে পরিচালিত হয়ে কোনও এক সময় স্বরূপের স্মৃতি আবৃত হয়ে যায়। তখন স্বভাবগুণেরই কোন অংশের প্রাধান্যে জীবন মেতে থাকে। পূর্ণ অংশের স্মৃতি আবৃত থাকায় নিজেকে সসীম ও সীমাবদ্ধ ভেবে ভুল করে।

প্রত্যেকেই সেই পূর্ণস্বরূপকে ভুলে গিয়েছে। পূর্ণতাকে মনে না-রাখতে পারলেই অশান্তি পেতে হয়। অশান্তির কারণ স্বল্পতা। শান্তির কারণ স্বভাব, পূর্ণতার অখণ্ড স্মৃতি। এ হচ্ছে অমৃতস্বরূপ। এই অমৃতস্বরূপের সঙ্গে পুনরায় মিলিত হতে হবে এবং নিত্যযুক্ত থাকতে হবে। নিজের ভিতরেই ঈশ্বরকে আবিষ্কার করতে হবে।

নিজ অতিরিক্ত কোন কিছু ভাবনা চিন্তা কামনা হল অজ্ঞান—তার ফল আত্মবিস্মৃতি ও দুঃখকষ্ট

ছোট ছোট জিনিসের প্রতি মন দিয়েই মানুষ আসল জিনিস হারিয়ে ফেলে। বহির্মুখী দৃষ্টি থাকার জন্যই মানুষ তার স্বরূপ ভুলে গেছে, তাঁকে পৃথক করে রেখেছে। মানুষ নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থ বজায় রাখতে গিয়ে মনের পছন্দ অপছন্দ বা ভালমন্দ বিচারের উপরে অতিরিক্ত রকম প্রাধান্য দিয়ে অখণ্ডস্বরূপ বা পূর্ণকে খণ্ড খণ্ড করে ব্যবহার করে। তার ফলে পৃথক বোধের অভিজ্ঞতা ও তার সংস্কার তৈরি হয়েছে এবং পূর্ণশান্তি ও আনন্দ হতে বঞ্চিত হচ্ছে।

ঈশ্বর শুধু কল্পনা নয়। সমস্ত বিকৃতির মধ্যে নিত্য, শাশ্বত বা সত্য বস্তুকে মানুষ ভুলে গেছে। যা নিত্য নয়, সত্য নয়, শাশ্বত বা অমৃতময় নয় তা নিয়েই মানুষ সারাজীবন মেতে থাকে; যদিও মুখে শান্তির কথা বলে বা দুই পাতা বই পড়ে ঈশ্বরের কথা বলে। তাদের জীবনে কথার সঙ্গে আচরণের মিল থাকে না।

হৃদয়েতে প্রত্যেকেরই পূর্ণতা নিহিত আছে—তার স্মরণ দ্বারাই তার পরিচয় জানা যায়

প্রতি মুহূর্তে চিন্তা, বাক্, কর্ম, আচরণ ও জীবনযাপন প্রণালী এইগুলির মধ্যে মিল বা সামঞ্জস্য থাকা দরকার।

তা না-হলে শান্তিলাভ হয় না। যাদের এইগুলির মধ্যে যথার্থ সামঞ্জস্য হয়েছে তারা শান্ত, স্থির, পূর্ণ। এই পূর্ণতা প্রত্যেকের মধ্যে রয়েছে, শুধু খুঁজে বার করতে হবে।

প্রবৃত্তির পথে আত্মবিস্মৃতি, সংসারদশা ও ভোগ, নিবৃত্তির পথে মুক্তি, শান্তি, আত্মস্থিতি

অধিকাংশ লোকেরই জীবনের গতি অমৃতস্বরূপের দিকে না-গিয়ে মরজগতের পরিবর্তনশীল ও বিকারধর্মী প্রকৃতির অধীনেই ধাবিত হয়। এই বহির্মুখী দৃষ্টি ফিরিয়ে অন্তর্মুখী করতে হবে। অন্তরের গুপ্ত সম্পদ সকলের হৃদয়েই আছে, তারই সন্ধান করা দরকার।

দোষদৃষ্টি হয় আত্মবিস্মৃতির ফলে

সাধারণত অনেকেই নিজের দোষ অপরের ঘাড়ে চাপায়, নিজের দোষ দেখে না। তার ফলে নিজেদের অন্তরে নূতন করে আর একটা আবরণ পড়ে। প্রত্যেকেই যে পূর্ণ এটাই আবিষ্কার করতে হবে।

তত্ত্বের দৃষ্টিতে নিজের মধ্যে নিজের দ্বারা নিজেকেই পূর্ণরূপে জানা যায়

যিশু খ্রিস্ট বলেছিলেন —(১) ঈশ্বর স্বর্গে থাকেন। (২) প্রত্যেকের হৃদয়ই ঈশ্বরের রাজ্য। (৩) আমি এবং আমার পিতা একজনই। তাহলে দেখা যায়—আমিই উপায়, আমিই উপেয়। অথবা আমিই পথ, আমিই পথের লক্ষ্য বা কেন্দ্র।

এই 'আমি'র মধ্যে লুকিয়ে আছে পরমাত্মার অস্তিত্ব। এটা আবিষ্কার করা বা উপলব্ধি করাই হল জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। কাজেই সকলকে আত্মোপলব্ধি করতে হবে, পূর্ণতার আস্বাদন করতে হবে।

ভূমাই হল নিজের যথার্থ পরিচয়

মানুষের নামরূপটাই সব নয়। প্রত্যেকেই সমগ্রতার সমষ্টি সেই একক সত্তার মূর্ত বিগ্রহ। তাঁকেই অখণ্ড ভূমা শাশ্বত শান্তি বলা হয়।

সমগ্রতার দৃষ্টিতে ঈশ্বর অনুভূতি

ঈশ্বর শুধু একটা মূর্তি নয়, একটা ভাবও নয়। সমগ্র নাম-রূপ-ভাবের একক মূর্তি। সমগ্র শক্তি, জ্ঞান, আনন্দ, প্রেমের পূর্ণ স্বরূপ। সেইজন্য তাঁকে অনন্ত অসীম বলা হয়। সমগ্রকে বা সমগ্রতার ঘনীভূত একক রূপকে পৃথক পৃথক রূপে পূর্ণ ভাবে পাওয়া সম্ভব নয়।

জীবন সমস্যার সম্যক্ সমাধান

'আমি' এবং সমগ্র বিশ্ব বা বিশ্বরূপ এক। 'আমি' বিশ্বরূপ থেকে আলাদা নই। 'আমি' বললে সেই অখণ্ড অদ্বয় পূর্ণস্বরূপকে বোঝায়। এটা সকলকে উপলব্ধি করতে হবে। এ উপলব্ধি না-হওয়া পর্যন্ত জগতের কোন সমস্যারই সমাধান হওয়া সম্ভব নয়। মিথ্যাকে সত্য বলে এবং সত্যকে মিথ্যা বলে সমস্যা দূর হয় না।

জীবন অখণ্ড, এক (One of Infinite)। তাঁর মধ্যে সকলেই আছে কিন্তু কেউ সচেতন নয়। যেমন সমুদ্রের মধ্যে অসংখ্য বুদ্বুদ প্রতীয়মান হয় সেইরকম এক অখণ্ড মহাপ্রাণ সমুদ্রের মধ্যে অসংখ্য প্রাণ ওঠে, ভাসে আবার লয় হয়ে যায়।

পূর্ণতাবোধের অন্তরায় ও তার বিকার-জনিত প্রতিক্রিয়া

ছোট 'অহংকার-যুক্ত আমি'কে 'পূর্ণ আত্মস্বরূপ আমি'র বদলে ব্যবহার করাটাই হল পূর্ণতা লাভের অন্তরায়। অনন্ত অসীমকে 'ত্বং' বলে ধরতে হবে।

নিজেকে ঈশ্বরের দাস, সন্তান, অনুরাগী ভক্ত ও প্রকৃতি বা তাঁর সনাতন অংশ বলে ভাবতে হবে। তাহলে নিম্ন প্রকৃতির অন্তর্গত সমীমের বিকার প্রাধান্য পায় না। তা না-হলে পৃথকবোধে সসীমের অন্তর্গত নানাবিধ বিকারের মধ্যে বাস করে পূর্ণতার অভাবে অশান্তি ভোগ করতে হয়।

প্রতিদিন ঐকান্তিক ভাবে বিশেষ প্রার্থনা করলে বিশেষ শুভ ফল পাওয়া যায়

প্রতিদিন অন্তত পাঁচ মিনিটের জন্য হলেও প্রার্থনা করতে হবে—আমার কোন শক্তি নেই, সামর্থ্য নেই। আমি সমস্ত জগতের কাছে ঋণী। এই ভাব ধরে বিশ্বের সবকিছুকে মান দেবার অভ্যাস করে ও ঈশ্বরের নামে গ্রহণ করে জীবনে চললে অহংকারের আমিটা বাড়তে পারে না। এই 'ক্ষুদ্র অহংকারের আমি'ই হল সবচেয়ে বড় শত্রু।

অনন্ত অসীমের পরিবর্তে সসীমের সেবার ফলেই মানুষের দুঃখকষ্ট

সসীমের সেবা না-করে সেই শাশ্বত শক্তির সেবা করতে হবে। সেই শাশ্বত সত্তার কথা ভাবতে হবে। অতিরিক্ত দেহাত্মবোধ থাকার জন্য মানুষ শাশ্বত স্বরূপ থেকে দূরে সরে গেছে, কেন্দ্রের স্মৃতি বিস্মৃত হয়ে যাচ্ছে।

সকলে এক অখণ্ড সত্তার মধ্যেই আছে, তাঁর বাইরে কেউই নেই। বেশির ভাগ লোকই ব্যক্তিগত চিন্তা বেশি করে এবং সমস্ত বিশ্বের নিন্দা করে। নিজের অহংকারকেই নিন্দা করতে হয়, পরিহার করতে হয়।

আত্মপক্ষ সমর্থন করার অভ্যাস (self-justification) সম্পূর্ণরূপে বর্জন করতে হয়। নিজেকে অনন্ত অসীম অখণ্ড একক সত্তা বলে ভাবতে হবে।

মিথ্যার প্রভাবমুক্ত হওয়ার বিশেষ উপায়

বর্তমানের পরিচয় সকলের আসল পরিচয় নয়। প্রত্যেকেই যে সত্যের পূর্ণরূপ সেই পরিচয় পেতে হবে। কারওর জন্ম মিথ্যা নয়। পূর্ণতা লাভের জন্যই সকলের জন্ম।

ক্ষুদ্র অহংকারের আমিকে অনন্ত অসীম আমির মধ্যে নিত্যযুক্ত সমবোধে উপলব্ধি করতে হবে। একেই বলে আত্মোপলব্ধি বা ঈশ্বরানুভূতি। এ ছাড়া আর কোন সত্যের জন্য যেন কেউ মাথা না ঘামায়।

প্রার্থনার মাধ্যমে পূর্ণ আত্মসমর্পণের বিধান

অজ্ঞাতসারে সকলেই কেন্দ্রের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, এটা অবগত হওয়ার জন্য প্রার্থনা করতে হয়—"আমি তোমার সন্তান, সেবক। আমাকে নাও। আমার আমিত্ব নাও। তুমি যে অমর, আনন্দঘন, প্রেমঘন, শান্তিস্বরূপ এটা ভুলে গিয়েছি। তুমি নিজে এসে আমার হৃদয়ে উদয় হও।" অল্প সময়ের জন্য হলেও এ ভাবে প্রতিদিনই একটু প্রার্থনা করা উচিত।

কাজের সময় নিজেকে জাহির করার অভ্যাস পরিহার করতে হয়। বাক্ সংযত করতে হয়। দৈনন্দিন জীবনে যত কম কথা বলা যায়, ততই ভাল। এই অভ্যাসগুলি আয়ত্তে আনা সম্ভব হলে সামগ্রিক ভাবে উন্নতি লাভ হয়।

যুক্তিতর্কের উপরে বেশি জোর দেওয়া উচিত নয়। কেন্দ্রে যেতে সহায়তা করা অপেক্ষা তা আত্মপক্ষ সমর্থন অধিক করে। এটা মানুষের বড় ক্ষতি করে। এই অভ্যাসের ফলে অপরকে ছোট করে মানুষ নিজে বড় হতে চায়। এটা অহংকারের কাজ।

প্রার্থনার ফলশ্রুতি

সরল প্রার্থনা মানুষকে অনন্ত জ্ঞান, অন্তরচৈতন্য, অনন্ত শক্তি, অন্তরের প্রশান্তি, বিশুদ্ধ জ্ঞান, অশেষ কৃপা, অপার আনন্দ, ভগবৎ প্রেম, শাশ্বত শান্তি ও পূর্ণতা দিতে পারে।

দৈনন্দিন কর্তব্যের তালিকায় প্রার্থনার স্থান থাকা উচিত। এর চাইতে বেশি কিছু করা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। এ যুগে এর চাইতে বেশি সামর্থ্যও নেই, সময়ও নেই।

প্রার্থনার মধ্যে থাকবে—"কী আমার কর্তব্য জানি না, আমি অতি ছোট, সদসৎ কি আমি তা-ও জানি না এবং কী করতে হবে তা-ও বুঝি না। কৃপা করে তুমি আমাকে তোমার কোলে টেনে নাও। আমাকে তুমি সাহায্য কর।"

ধন, শক্তি, খ্যাতি, নাম, যশ, প্রতিপত্তির আকাঙ্ক্ষা করা উচিত নয়। এ-সবের জন্য প্রার্থনাও করা উচিত নয়। অহংকারকে ভুলে যাবার চেষ্টা করতে হয়। প্রার্থনা করতে হয়—তিনি যেন সকলকে পূর্ণ করে নেন, তাঁর সঙ্গে মিলিয়ে নেন।

জগন্মাতার কোলেই তাঁর শ্রেষ্ঠ সন্তানেরা পুষ্ট হয়ে চলেছে

জীবন ধারণের জন্য সকলকে তিনি যথেষ্ট সুযোগ দিয়েছেন। দৈনন্দিন জীবনে চারপাশের বস্তু, ব্যক্তি ও জীবমাত্রকেই জগজ্জননীর প্রকাশ বলে গ্রহণ করা উচিত।

ঈশ্বর-আত্মাকে বাদ দিয়ে মানুষের সর্ব সাধনার ফলই বিকারী ও পরিণামী

মানুষ বিজ্ঞান, রাজনীতি, দর্শন, ধর্ম সম্বন্ধে কত আলোচনা করে কিন্তু স্থির ও শান্ত হতে না-পারলে এ-সবের কোন মূল্যই নেই। এই সব নানাবিধ আলোচনা ঈশ্বরের নামে গ্রহণ না-করলে তা নিষ্ফল হয়। এগুলি মানুষের শান্তিলাভের অন্তরায় হয় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষের জীবনকে অস্থির, চঞ্চল, স্নায়বিক দুর্বল, উত্তেজিত, বিক্ষিপ্ত, বিব্রত, সীমিত, পীড়াদায়ক ও দুর্বিসহ করে তোলে।

বিশেষ নির্দেশ

প্রত্যেক বাড়িতে ছোটদের পড়ার টেবিলে একটি প্রার্থনার ছবি থাকা বাঞ্ছনীয়। এটা অনেক সাহায্য করে। একটি ছোট বালক বা বালিকা প্রার্থনায় বসেছে এ রকম ছবি ছোটদের অন্তরকে সুনিয়ন্ত্রিত করে।

ঈশ্বরের কৃপালাভের জন্য প্রার্থনার গুরুত্ব

বেশি বয়সে মনকে সহজে বশীভূত করা যায় না—সেজন্য সকলের আগে ছোটদের সুযোগ দিতে হয়। প্রার্থনায় বসবার জন্য তাদের উৎসাহ দিতে হয়। প্রার্থনা তাদের জীবন গঠনে সাহায্য করে এবং পূর্ণতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। ঈশ্বরের কৃপা ছাড়া কোন কাজই সুনিপুণ ভাবে করা সম্ভব হয় না।

দেবতাগণই মানুষকে নিঃস্বার্থে দান ও কর্তব্যসাধনের বিজ্ঞান শিক্ষা দেন

দেবতারাই সকলকে শেখান কী করে দিতে হয়। সূর্যদেবতা সকলকে কী ভাবে বিনা শর্তে আলো দিতে হয় তা-ই শিক্ষা দেন। পবনদেবতা শিক্ষা দেন বিনা দ্বিধায় কী উপায়ে বিশুদ্ধ ভাবে চিন্তা ও কাজ করা যায়।

অগ্নিদেবতা শিক্ষা দেন সবকিছুকে কী ভাবে পবিত্র ও বিশুদ্ধ করে প্রকাশ করা যায়। নানাত্ব বহুত্বকে যথার্থ একেতে পরিণত করা যায়। সর্ববিধ পাপ, মল, কর্মের সংস্কার ও বীজকে নাশ করা যায়।

বরুণদেবতা শেখান কী ভাবে অপরকে সন্তুষ্ট করা যায় এবং চারদিকে পরিব্যাপ্ত হয়ে, নিঃস্বার্থ ভাবে অপরের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করে গতিশক্তি ও পরিণতির সাহায্য করা যায়। ইনি যজ্ঞ ও আত্মদানের মহিমা শিক্ষা দেন।

ধরিত্রী দেবী সকলকে শেখান সহ্য, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা এবং আকাশ শিক্ষা দেয় কী ভাবে ব্যাপক, প্রশান্ত, অচল, উদার, সরল ও নির্মল হতে হয়। আকাশের কাছ থেকে মানুষ শিক্ষা পায় কী বা কেমন করে ক্ষুদ্র বৃহৎ আপামর সমগ্র সৃষ্টিকে আপন বক্ষে আশ্রয় দেওয়া যায় বিনা প্রতিবাদে। তা-ছাড়াও সর্বাবস্থায় কেমন করে সৌম্য শান্ত উদার মহান নির্বিকার স্থির নিষ্ক্রিয় অচল অটল নিস্পৃহ নির্দ্বন্দ্ব নির্মোহ নির্বিশেষ নিরপেক্ষ নিরাসক্ত এবং মুক্ত থাকা যায়। সেই জন্য ঋষিবাণীতেও পাওয়া যায়, আত্মা আকাশবৎ নিত্যমুক্ত অন্তর-বাহির-শূন্য নির্লেপ অনন্ত মহান শুদ্ধ বুদ্ধ শান্ত নির্বিকার নিরাকার নির্গুণ নির্বিশেষ নির্দ্বয় নিষ্কল নির্মল নিরঞ্জন শাশ্বত অচল অটল প্রশান্ত অখণ্ড অসীম অপরিমেয় নিত্যপূর্ণ স্বপ্রকাশ বর্তমান।

এই ভাবে সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন অংশ আপন আপন কর্মে রত থেকে বিশ্বলীলা—জীবজগতের সৃষ্টি, পুষ্টি, তুষ্টি ও স্থিতির জ্ঞান ও ব্যবহারবিজ্ঞানকে নিরন্তর প্রকাশ করে চলেছে।

বিশ্বপ্রকৃতির অনন্য মহিমা

এই বিশ্বপ্রকৃতি সর্বোত্তম পাঠাগার, গবেষণাগার, পরা ও অপরা বিদ্যা এবং জীবনদর্শনের সর্বোত্তম শিক্ষাস্থল। প্রকৃতির সর্বস্তরেই সর্বপ্রকাশ ও ক্রিয়ার মাধ্যমে সকলকে নিরন্তর যথার্থ শিক্ষার আদর্শ ও দৃষ্টান্ত স্থাপন করে যাচ্ছে। এদের কাছ হতে শিক্ষা গ্রহণ না-করলে জীবন পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে না।

প্রকৃতির পাঠাগারে শিক্ষা সমাপ্ত না-হলে পূর্ণতা লাভ হয় না

প্রকৃতির সর্বস্তরের শিক্ষার মানের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে জীবন পরিপূর্ণতা লাভ করে। মানুষ যদি প্রকৃতির সমগ্র স্তরের শিক্ষাকে গ্রহণ করতে অসমর্থ হয় তাহলে তার জীবনের পূর্ণতা বা শান্তিলাভের চাবিকাঠি পাওয়া সম্ভব নয়।

সমগ্র প্রকৃতিকে সেবা করতে দেখে মানুষেরও সেবা করার ইচ্ছা জাগ্রত হওয়া উচিত। কিন্তু মানুষের এত বেশি রকম ব্যক্তিগত স্বার্থচিন্তা, দাবি-দাওয়া, পছন্দ-অপছন্দ, অনুযোগ-অভিযোগ থাকে যে তাদের কর্ম সেবাতে পরিণত না-হয়ে অহংকারের কর্ম হয়। ঈশ্বরীয়বোধে কর্ম হলে তবেই হয় সেবা।

প্রকৃতির দেওয়া অহংকার প্রকৃতিকে ফিরিয়ে দিলেই মুক্তি

মানুষের পরম শত্রু হল অহংকার। অহংকার মানুষকে অখণ্ডের থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। অহংকার যেন প্রশ্রয় না পায় সে বিষয়ে সকলের সচেতন থাকা একান্ত প্রয়োজন।

মাতৃবোধে বা গুরুবোধে প্রকৃতিকে মানতে পারলে, অর্থাৎ 'মেনে মানিয়ে চললে' দীব্যজীবন ও মুক্তিলাভের আর অন্তরায় থাকে না। বিশ্বপ্রকৃতি জীবনবন্ধন ও মুক্তিলাভের অন্তরায় নয়। জীবনবন্ধন ও মুক্তির অন্তরায় হল নিজের মন এবং তা হতে জাত কাম, কর্ম ও কর্তৃত্ব। বিশ্বপ্রকৃতি জগন্মাতারই মূর্ত রূপ। মায়ের চারটি রূপকে বিশেষ ভাবে ভাবনা করার কথা স্বানুভবসিদ্ধ পুরুষগণ বলে থাকেন। মায়ের এই চারটি রূপ হল—(১) গর্ভধারিণী মাতা, (২) জগন্মাতা, (৩) বিশ্বমাতা, (৪) পরমাত্মা। মাতৃভক্ত সন্তান মায়ের এই চার রূপের যে-কোনও একটিকে প্রীতিপূর্বক আপনবোধে বা নিজবোধে সেবা ও ভজন করলে তার নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত দিব্য আত্মস্বরূপের বোধে সুখে ও শান্তিতে অবস্থান করতে পারে। [৬।৮।৬৮]

সর্পের তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

সাপ হচ্ছে অনন্তের প্রতীক, শক্তির প্রতীক, সমস্ত সংস্কারের প্রতীক, সমস্ত ইচ্ছার প্রতীক এবং সমস্ত কুটিলতার প্রতীক। এই সবগুলির মধ্যেই একটা মৌলিক সূত্রের পরিচয় পাওয়া যায়।

কুণ্ডলিনী শক্তির বিশেষত্ব বা তাৎপর্য

যার প্রকাশে ও যার প্রভাবে জীবনীশক্তি উদ্বুদ্ধ হয়ে সম্প্রসারিত হয় এবং অনন্ত অসীমের দিকে পরিচালিত হয়ে পরিণামে অখণ্ড সত্তার সঙ্গে মিলিত হয় তাকেই কুণ্ডলিনী শক্তি বলে।

যাঁদের মধ্যে কুণ্ডলিনী শক্তি উদ্বুদ্ধ হয়ে পূর্ণতার রূপ নেয় তাঁরাই সিদ্ধপুরুষ, অবতারকল্প মহাপুরুষ প্রভৃতি আখ্যা পান। তাঁদের অন্তর্শক্তি অন্যান্য সাধকদের সাহায্য করার কাজে সর্বদাই যুক্ত থাকে। প্রয়োজন বোধে তাঁরা একই সময়ে আপনার শক্তিকে দেশ, কাল ও পাত্রের মধ্যে বিভিন্ন ভাবে ছড়িয়ে দিতে পারেন।

মহাপুরুষরা কখনও কখনও সাপের বেশে সাধকদের কাছে আসেন গতি দিতে। তাঁরা সূক্ষ্ম বেশে এসে পথ করে দিয়ে যান। কুলকুণ্ডলিনী ও সাপের তত্ত্বার্থ এক। কুলকুণ্ডলিনী হল সেই অনন্ত শক্তি, যা প্রত্যেকের মধ্যে কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে।

মানুষের স্নায়ুমণ্ডলীর মধ্য দিয়ে সর্পগতির মত এঁকেবেঁকে চলে সমস্ত বিশ্বব্যাপী বিদ্যুৎশক্তি প্রাণশক্তির গতি। এই প্রাণের গতি রুদ্ধ হয়ে থাকে কামনা-বাসনার জন্য। তার ফলে ক্রিয়াশক্তি নিস্তেজ হয়। এই প্রাণের গতি পথ পেলে স্বরূপের মহিমা প্রকাশিত হতে থাকে। তখন দিব্যজীবন এবং ঈশ্বরীয় জীবন শুরু হয়।

তপস্যার তাৎপর্য বা আধ্যাত্মিক রহস্য

তাপ দিয়ে প্রাণের গতির পথগুলিকে আস্তে আস্তে পরিষ্কার করতে হয়। এই তাপই হচ্ছে তপস্যা। পুনঃপুনঃ একই চিন্তা ও কর্মের আচরণ দীর্ঘকালব্যাপী অনুষ্ঠিত হলে তাকে অভ্যাস বলে। এই অভ্যাস দৃঢ় হলে এবং দীর্ঘস্থায়ী হলে অন্তরে তাপ সৃষ্টি হয়। এই তাপের নামই তপস্যা।

তপস্যার বলে সুপ্ত ও সঙ্কুচিত অন্তরচেতনা তার জড়ীভূত অবস্থা ছেড়ে সক্রিয় গতি নিয়ে স্নায়ুমণ্ডলীর মধ্য দিয়ে অন্তরে ও বাইরে সম্প্রসারিত হয়ে পড়ে। একেই কুণ্ডলিনীশক্তি, প্রাণশক্তি, প্রকৃতিশক্তি, চেতনাশক্তি, আত্মশক্তি, গুরুশক্তি, বিদ্যাশক্তি, ইচ্ছাশক্তির মহাসম্প্রসারণ ও মহাজাগরণ বলে।

কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণ ও তার পরিণামে স্বভাবযোগ ও আত্মতত্ত্ব লাভ

যখন প্রাণশক্তি সমগ্র সুপ্ত স্নায়ুমণ্ডলীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হতে থাকে তখন তার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অভিব্যক্তিগুলি অনুভূতির মধ্যে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং বোধসত্তার সঙ্গে মিশে এক হয়ে প্রকাশ পায়। তার ফলে উপলব্ধির মাত্রা উত্তরোত্তর বেড়ে সত্যদর্শনের যোগ্য করে তোলে। এ-ই হল স্বভাবের যোগ এবং আত্মতত্ত্ব লাভ।

গ্রন্থিভেদের রহস্য

দেহের ভিতরে নিষ্ক্রিয় নিস্তেজ সঙ্কুচিত কুণ্ডলীকৃত স্নায়ুমণ্ডলীর গুচ্ছকে গ্রন্থি বলা হয়। প্রাণশক্তি সম্প্রসারণের ফলে এই গ্রন্থিগুলি সক্রিয় ও সতেজ হয়। তখন এই স্নায়ুমণ্ডলীর মধ্য দিয়ে প্রাণচৈতন্য সমভাবে প্রবাহিত হতে থাকে। এই অবস্থাকেই গ্রন্থিভেদ বলে।

দেহের ভিতরে স্নায়ুমণ্ডলীর জড়ীভূত ও সঙ্কুচিত অবস্থা যার যতটা খুলেছে সেই অনুযায়ী যোগী শরীর বা সাধকের শরীর বলা হয়।

স্নায়ুমণ্ডলীর জট্ বা গ্রন্থিগুলি যা সাপের মত পাকিয়ে পাকিয়ে থাকে এবং যা পদ্মের পাপড়ির অনুরূপ প্রতীয়মান হয় তা খুলে গেলে বা সম্প্রসারিত হলে সুপ্ত চেতনা বা জড়ীভূত প্রাণ গতিশীল হয়ে প্রকাশিত হয়। তার ফলে ব্যক্তিগত স্বার্থ, দ্বন্দ্ব-বিরোধ, অভাব-অজ্ঞান দূর হয়ে আত্মসত্তার মহৎ গুণগুলি অভিব্যক্ত হয়। তখন মানুষ আত্মজ্ঞানের অধিকারী হয়ে অখণ্ড নিত্য অব্যয় অপরিণামী ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হয়।

কুণ্ডলিনীর জাগরণ ও গ্রন্থিভেদের পরিণাম

ক্রমপর্যায়ে আত্মসত্তার মহৎ গুণগুলি জীবনে যখন প্রকাশ হতে থাকে তখন মানুষ স্থির শান্ত পুষ্ট ও শুদ্ধ মন দিয়ে দেহের অভ্যন্তরে পদ্মের আকারে পাকানো গ্রন্থিগুলির তাৎপর্য অনুভব করতে পারে। এই শুদ্ধমন, শুদ্ধচিত্ত, সমদৃষ্টি বা তৃতীয় নয়ন একই কথা।

সাপের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা

জীবনীশক্তির আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সাধকরা এই শক্তিকে সাপের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

সাপ শব্দের আধ্যাত্মিক অর্থ—সা+অপ্। সা অর্থে ব্রহ্মবিদ্যা, ব্রহ্মস্বরূপিনী সচ্চিদানন্দময়ী আদ্যাশক্তি সনাতনী। তিনি ত্রিগুণাময়ী, বিশ্বমাতা, জগৎজননী, নারায়ণী। তিনিই অনন্ত বিশ্বপ্রসবিনী, অনন্ত বিশ্বস্বরূপিনী, আবার তিনি বিশ্বাতীতা, অব্যক্তা, নিত্যাপূর্ণা, অমৃতময়ী, শাশ্বত সত্য, নির্গুণা, অনির্বচনীয়া।

অপ্ অর্থ নীর, প্রাণ, শক্তি প্রভৃতি। সা এবং অপ্ যোগ করে নির্গুণ গুণময়ের, নিত্যলীলাময়ের, নির্গুণসগুণের একটি বিজ্ঞানসম্মত ব্যবহারিক রূপ সমগ্র বিশ্বচৈতন্যকে প্রকাশ করে। তাঁর সগুণ মহিমা বিশ্বশক্তি, বিশ্বপ্রকৃতি রূপে অভিব্যক্ত।

প্রেমের দৃষ্টিতে এই সাপের আর দুইটি সুন্দর আধ্যাত্মিক তত্ত্ব এবং তার প্রাণস্পর্শী অর্থ পাওয়া যায়—

(ক) স+অপ্ = সাপ। 'স' অর্থে অখণ্ড বোধময় সত্তা, সত্যস্বরূপ, যা নির্গুণ, নির্বিশেষ, নিরাকার হয়েও তাঁর স্বভাবশক্তি বা স্বরূপশক্তি যুক্ত হয়ে স্বয়ং প্রকাশমান। 'অপ্' অর্থে জল এবং প্রাণশক্তিকেও বোঝায়। এর দ্বারা ক্রিয়াশীলতা এবং প্রকৃতিকে বোঝায়। তাহলে সেই নির্গুণ নির্বিকার নির্বিশেষ অখণ্ড সত্য তার স্বরূপশক্তি বা স্বভাবপ্রকৃতি যুক্ত হয়ে সগুণ মহিমায় স্বেচ্ছায় লীলায়িত হয়ে আপনাকে প্রকাশ করছে।

(খ) সাপ সম্বন্ধে আর একটি তত্ত্ব ভাবুক ভক্তের ভাবানুরাগের উপযোগী হয়ে অনুভূত হয়। 'সা' মানে সচ্চিদানন্দময়ী মাতা। 'প' অর্থে তার পদ বা চরণ। এই 'পদ' দ্বারা 'পদ্যতে, সম্পদ্যতে, গম্যতে' অর্থাৎ গতিশীল, ক্রিয়াশীল হয়ে প্রকাশমান হয়। মাতৃচরণকে রূপক ভাষায় সাপ বলা হয়েছে। মা তাঁর চরণ দিয়ে নামরূপময় জগৎকে গতিশীল করে প্রকাশ করছে, কারণ চরণ দিয়ে সকলে চলে বা গমন করে। এই যে নামরূপময় গতিশীল জগৎ এ-ই মাতৃচরণ। এ-চরণে সকলেরই সমান অধিকার।

বেদান্তবাদীর দৃষ্টি ও প্রেমিকের দৃষ্টির পার্থক্য

বেদান্তবাদী জ্ঞানীদের ভাষায়—জগৎ মায়া। কিন্তু প্রেমিক ভক্তের ভাষায় এই মায়ার অর্থ মা + আয়া। অর্থাৎ মা-ই এসেছে সন্তানের কাছে বহুবেশে, বহুসাজে সন্তানের প্রয়োজন মেটাতে, সন্তানকে পুষ্ট করতে, তুষ্ট করতে এবং তাকে পূর্ণ করে নিজের মধ্যে মিলিয়ে নিতে। সেইজন্য নানাত্ব বহুত্বের বেশে এসে সন্তানকে এই পরিপূর্ণতা দিয়ে যায়।

মায়ের প্রকাশসন্তান প্রথমে বৈচিত্র্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তার যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার পরিণামে মায়ের সঙ্গে মিশে এক হয়ে যায়

নানাত্ব বহুত্ব হচ্ছে অখণ্ড চৈতন্যশক্তি মহাপ্রাণরূপী মায়ের ভিন্ন ভিন্ন গুণের প্রকাশ, যা-দিয়ে সে সন্তানকে সাজিয়ে সর্বাঙ্গে পুষ্টি দিয়ে তাকে সমত্বের ও অমৃতত্বের অধিকারী করে তুলছে।

নানাত্ব বহুত্বের সংস্পর্শে এসে মায়ের প্রকাশসন্তান নানাত্ব বহুত্বের অন্তর্নিহিত গুণ, শক্তি এবং প্রাণের সঙ্গে যুক্ত

হয়ে উত্তরোত্তর আপনার গুণ, শক্তি ও বোধের অভিজ্ঞতাকে সঞ্চয় করে পরিণামে পরিশোধিত, পরিমার্জিত, নির্মল ও বিশুদ্ধবোধের অধিকারী হয়ে নিত্যাপূর্ণা সেই অখণ্ডচৈতন্যময়ী সচ্চিদানন্দময়ী ব্রহ্মস্বরূপিনী মাতার অমৃতময় বক্ষে বিলীন হয়ে মাতৃময় হয়ে যায়, অর্থাৎ আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়।

তত্ত্বানুভূতির ভিত্তিতে আত্মার ব্যাখ্যা

আত্মার অর্থ হল—(ক) 'আয় ত মা' অর্থাৎ মাকে আহ্বান করা হচ্ছে। নিজের জীবনে প্রতিটি আচরণের মধ্যে মায়ের সঙ্গে মিলিত হয়ে মায়ের হৃদয়ে আপন হৃদয় সংযুক্ত হওয়া মানেই আত্মস্বরূপে আসা; (খ) আত্মা শব্দের দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে অ+তমা। যা তম নয়, অর্থাৎ অজ্ঞান আঁধারযুক্ত নয়। যা পূর্ণচৈতন্যময়, শুদ্ধ সত্ত্বময়। যার কোন প্রতিবন্ধক, প্রতিদ্বন্দ্বী, বিরুদ্ধভাব ও প্রতিকূলতা নেই তাকেই আত্মা বলে।

সাপের কুটিল ক্রূর স্বভাবের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা এবং স্ব-স্বরূপানুভূতির রহস্য

বাস্তব দৃষ্টিতে সাপকে একটা ক্রূর, হিংস্র প্রাণীরূপে সকলে গ্রহণ করে, কেননা এ সকলেরই প্রাণভয়ের কারণ হয়। ক্ষুদ্র একটা প্রাণী দাম্ভিক, অহংকারী মানুষের মধ্যেও ভয়ানক ক্রূর ও কুটিল স্বভাবের প্রকৃতি ও তার বোধকে জাগিয়ে তোলে। সেইজন্য সাপকে কুটিলমতির (cunning nature, mischievous nature, damaging nature) সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। হিংস্র ব্যাঘ্র প্রভৃতি প্রাণী অপেক্ষাও সর্পভীতি মানুষের অধিক। তার কাছে সর্প পরমশত্রু বলে পরিগণিত।

সাপ ভয়ানক ভীতির উদ্রেক করে। ঈশ্বর উপলব্ধির পথে এই ভয় বিশেষ বাধা স্বরূপ। সর্বদা 'আমার আমি' নিয়ে থাকা সত্ত্বেও সাপ দেখলেই মানুষ ভীত হয়। সাপরূপে মা-ই এসে সকলকে ভয়টাকে জয় করতে সাহায্য করে। ভয়ের সঙ্গে সকলের বোধের সম্পর্ক জাগিয়ে দেয়। সমস্ত জগতের সঙ্গে একাত্মবোধের সম্পর্ক জাগাবার উদ্দেশ্যে মায়ের এত আয়োজন। বোধের অভাবই হল আসল অভাব।

তন্ত্র বিজ্ঞানে সাপের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য

তন্ত্র দর্শন বিজ্ঞানে সাপের অর্থ সত্তাশক্তি যুগ্মরূপ বা তার নিদর্শন। সত্তাশক্তি ও শিবশক্তি একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। 'স' অর্থে—সত্য-শিব-সুন্দর। অপ্‌কে জল বা প্রাণ অর্থে নারায়ণও বলা হয়েছে। শৈব তন্ত্রের ও বৈষ্ণব তন্ত্রের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় এক। অখণ্ড চৈতন্যসত্তা ও অনন্ত চৈতন্যশক্তির অভেদ দর্শনে সাপ শব্দের অর্থ কোথাও কোথাও শিব-নারায়ণ বা হরিহরও বলা হয়েছে, কারণ শিবের অঙ্গভূষণ হিসাবে সাপের বিশেষ ব্যবহার দেখিয়ে তার তত্ত্ব নিরূপণ করা হয়েছে যে শিব নিত্য প্রাণযুক্ত বা শক্তিযুক্ত হয়ে শিব হয়েছেন। প্রাণশূন্য, শক্তিশূন্য শিবের পরিচয় শব। যদিও শবের মধ্যেও সেই শক্তি বা প্রাণ ক্রিয়ারহিত, গতিশূন্য অবস্থায় সঙ্কুচিত হয়ে থাকে। সেই জন্য বলা হয় যে—প্রাণশূন্য, শক্তিশূন্য শিব হয় না। সাপকে শক্তি বা প্রাণের প্রতীক হিসাবে এখানে ব্যবহার করা হয়েছে।

তন্ত্রের আলোকে সাপের পরিচয়

মহাপ্রাণশক্তি, চৈতন্যশক্তি, মহামায়া, ব্রহ্মবিদ্যা, আত্মশক্তি, পরমাপ্রকৃতি, পরমেশ্বরী, আদ্যাশক্তি, বিশ্বজননী, ভগবতী মাতা দুর্গাদেবীর দশভূজার এক ভূজতে ধৃত বোধশক্তির প্রতীক অস্ত্র হিসাবে সাপকে দেখানো হয়েছে।

নারায়ণ বা বিষ্ণু কারণসলিলে বা মহাপ্রাণসলিলে অনন্তনাগের উপরে শায়িত আছেন। অনন্তনাগকে সেখানে বাহনরূপে দেখানো হয়েছে। সর্পকুলের অধিষ্ঠাত্রী মনসাদেবী শিবের কন্যা বলে খ্যাত। শিব হল বোধসত্তা। তাঁর প্রকাশসন্তান মনসাদেবী ও তাঁর অংশভূত সর্পকুল বোধশক্তিরই অংশবিশেষ।

সিদ্ধমহাপুরুষের কাছে সমস্ত তত্ত্বগুলি অন্তরের বোধের থেকে আসে বলে প্রত্যেক শব্দের অন্তর্নিহিত গূঢ় তত্ত্ব এবং অর্থের (true or central meaning) সঙ্গে তারা নিত্যযুক্ত থাকে। তাদের এই যুক্তিসঙ্গত বোধার্থই হচ্ছে আপ্তবাক্য, যা নিত্যসত্য ও অখণ্ডনীয়। ভিতরের সমস্ত বোধের সঙ্গে সাধকদের অখণ্ড সত্য পরিচয় থাকে বলে তাদের কোন ভয় থাকে না, মানের বালাইও থাকে না।

ভয় আসে পৃথকবোধ বা ভেদজ্ঞান হতে। অখণ্ড বোধের সঙ্গে যথার্থ ভাবে যুক্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত যে পৃথকবোধ বা ভেদজ্ঞান তাকেই অজ্ঞান বলা হয়েছে। এই অজ্ঞানই যথার্থ অভাবের কারণ।

অজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য

অজ্ঞান হতেই নিম্ন প্রকৃতির প্রভাব যথা দম্ভ, দর্প, অভিমান, গর্ব, পারুষ্য ও অহংকার প্রভৃতি এবং জীবনে তার প্রক্রিয়া যথাক্রমে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য রূপে প্রকাশ পায়।

স্থূলতাদি ভেদে বস্তুর গুণ ও প্রকৃতির বিচার

অপ্ মানে জল, যা প্রাণের ভিন্নরূপ। তা কঠিন বরফ, তরল এবং বাষ্পীয় এই ত্রিবিধ অবস্থার মধ্যে প্রকাশমান হয়। কঠিন জড় অবস্থায় তার স্থূলরূপ আপনাকে পৃথক সত্তারূপে প্রকাশ করে। এ-ই স্থূলের প্রকৃতি, গুণ ও ধর্ম।

তরল অবস্থায় তা সূক্ষ্ম ও ব্যাপক হয়ে সমতা প্রাপ্তির সহায়ক হয় এবং অন্যান্য প্রকাশের সঙ্গে মিলন ইচ্ছুক প্রকৃতি গুণ ও ধর্মের পরিপোষক হয়। আবার বাষ্পীয় অবস্থায় তা সর্বব্যাপকত্ব, সর্বযুক্ত, সমন্বয়সূচক প্রকৃতি গুণ ও ধর্মের দ্যোতক।

সত্তাশক্তির তাত্ত্বিক বিজ্ঞান

শিব শব্দের মানে সমগ্র জ্ঞান বা চৈতন্যসত্তা। বিষ্ণুশক্তি শিবের ক্রিয়াশীল শক্তি। সত্তা যে কী বস্তু তা পূর্ণ ভাবে বলা যায় না। অংশমাত্র বলা সম্ভব এবং পূর্ণতার পরিচয় সম্বন্ধে ইঙ্গিত বা নির্দেশ মাত্র করা সম্ভব হয়।

শাক্ত সকলেই। কারণ প্রত্যেকেই শক্তির অভিব্যক্তি। সকলে অখণ্ড মহাপ্রাণের অন্তর্গত; তার মধ্যে জাত স্থিত এবং তার সঙ্গেই নিত্যযুক্ত। মহাপ্রাণ চৈতন্যের একটা রূপ শাক্ত এবং আর একটা রূপ বৈষ্ণব।

শাক্ত ও বৈষ্ণবাদি মতবাদের ভিন্নতা আপেক্ষিক, অভিন্নতা মৌলিক

বৈষ্ণবের 'আমার আমি' বোধ থাকে না। সব তাঁর। শাক্তেরও সেই অবস্থা। লক্ষ্য উভয়ের এক কিন্তু চলার পথে, আচরণে উভয়ের মধ্যে কিছু পার্থক্য থাকে।

ভিন্ন ভিন্ মত পথের উৎপত্তি ও গন্তব্যস্থল এক, শুধু আচরণ ও ব্যবহারের দিকে বাহ্যিক তারতম্য প্রয়োজন-বোধে থাকলেও তার গুরুত্ব বিশেষ নেই। বাহ্যিক ব্যবহারে অধিক গুরুত্ব দিলে গন্তব্যস্থলে পৌঁছানো যায় না।

অভেদ জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য

সমগ্র বোধের প্রকাশ তার নাম তত্ত্ব। শোনা যায় যোগীদের কাছে সাপ আসে। যোগী মানে কোন বিশেষ সম্প্রদায় নয়। সকলেই তো সত্তার সঙ্গে নিত্য অভেদে যুক্ত হয়ে আছে। কেউই বিযুক্ত নয় তবে তারা সে বোধে সকলেই সচেতন নয়। যারা সচেতন তারা সাপকে আপনবোধে গ্রহণ করে।

মনসা শব্দের আধ্যাত্মিক রহস্য

মনসা শব্দের অর্থ সমগ্র মন থেকে মন দ্বারা জাত অর্থাৎ মানস অভিব্যক্তি। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীভগবদ্গীতায় ১০ম অধ্যায়ের বিভূতি যোগে 'মানসা জাতা' কথাটি ব্যবহার করেছেন। এর তাৎপর্য হল যে ঈশ্বরের সংকল্পমাত্র যে সৃষ্টির অভিব্যক্তি তার মধ্যে তাঁর সগুণ মহিমার ব্যবহারিক বিজ্ঞান ও তাঁর ইচ্ছাশক্তির সম্যক্ পরিচয় বহন করে।

অধ্যাত্ম বিজ্ঞানে মনের পরিচয়

সমগ্র মন অর্থে কোথাও কোথাও বিশ্বকেও নির্দেশ করা হয়েছে। কারণ ''মনোময়ম্ ইদং বিশ্বং ব্রহ্মৈব আত্মৈব, ন চাপরম্।'' এই বিশ্ব ব্রহ্ম এবং আত্মার মনোময় রূপের অভিব্যক্তি। অন্য কিছু নয়।

স্বপ্ন ও ধ্যানের মাধ্যমে ভীতিপ্রদ দৃশ্য এবং মনোরম দৃশ্যের সঙ্গে সাময়িক ভাবে পরিচয় হলেও তার রহস্য কেবল আত্মবোধেই সিদ্ধ হয়

বারবার স্বপ্নে সাপকে দেখলে মানুষের ভয় অনেকটা কেটে যায়। এই ভাবে ভয় দূর হয়। সাপ যেন ছোবল্ মারতে আসছে স্বপ্নে এরকমও দেখা যায়। তার ফলে ভয় কমে যায়।

অনেক সময় সাধক আসনে বসে ভীতিপ্রদ মূর্তি দেখে—ভীষণ উগ্ররূপ ধারণ করে জন্তু জানোয়ার আক্রমণ করছে, কখনও বা অগ্নিমূর্তি তাকে গ্রাস করছে, কখনও বা গভীর অন্ধকার তাকে গ্রাস করছে এবং কোথায় তলিয়ে যাচ্ছে ইত্যাদি। আবার কখনও উজ্জ্বল জ্যোতি সমুদ্রের মধ্যে ডুবে যায়।

মানবপ্রকৃতির জটিলতা এবং গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের বিজ্ঞানভিত্তিক বর্ণনা

মনুষ্যদেহের মত জটিল দেহ (complicated body) প্রাণীজগতের মধ্যে আর নেই। কারণ মনুষ্যদেহের গঠন প্রণালী ও তার আভ্যন্তরীণ স্নায়ুমণ্ডলীর ক্রিয়া মস্তিষ্কের বিকাশজনিত প্রক্রিয়া মন-প্রাণ-বুদ্ধির ক্রমপরিমাণ অভিব্যক্তি প্রাণীজগতের অন্যান্য জীব থেকে মানুষকে অধিক চিন্তাশীল ও শক্তিশালী করেছে।

স্বপ্নের মাধ্যমে ষাঁড় আদি ভিন্ন ভিন্ন প্রাণী দর্শনের বিশেষত্ব

ষাঁড় হচ্ছে রজোগুণ, অহংকারের প্রতীক এবং শিবের বাহন। সাদা হাতি হচ্ছে শান্তি সংযম বা স্থিরত্বের এবং সত্ত্বগুণের প্রতীক। সাপ ও হাতি দর্শন দ্বারা মন শান্ত হয়ে আসে। বানর দেখলে মন চঞ্চল হয়। এগুলি সবই ক্রমবিকাশের স্তর।

সর্ব শব্দের মূলে যে নাদ তার মাহাত্ম্য বর্ণনা

শব্দশাস্ত্র সাধারণ লোকের চিত্তবিভ্রম ঘটায়। সেইজন্য সাধকেরা সমস্ত শব্দকেই নাদের প্রতিধ্বনি বলেন। অনুভূতির রাজ্যে বহু শব্দের অন্তর্গত মূল ধ্বনি বা শব্দটিকে লক্ষ্য করতে হয়। তারপরে দেখা যায় একনাদ বা ধ্বনিরই অভিব্যক্তি হল শব্দ সমষ্টি।

বৈচিত্র্যের মধ্যে একের সন্ধান হয় হৃদয়ের গভীরে

চারদিকে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে ঈশ্বর তার মধ্যে স্থির, অশান্তের মধ্যে শান্ত। তাই বলা হয় হৃদয়গুহার দ্বার দিয়েই একের দিকে যাওয়া সম্ভব হবে।

সত্ত্বাশক্তির অভিন্ন তত্ত্বের তাৎপর্য

শিবশক্তি—শিব সকলের উপরে, মা বা শক্তি নিচে। এই উপর বা নিচ অর্থে কোন স্থান বা দিককে নির্দেশ করা হচ্ছে না। এই উপর নিচের তত্ত্ব হচ্ছে—'পর' অর্থে সত্তা, অদ্বয় এক প্রশান্ত অবস্থা। সেই 'পর' যখন 'উ' যুক্ত হয় অর্থাৎ উদ্বেলিত হয়, উদ্ভাবিত হয়, উন্মেষিত হয়, উদ্দীপ্ত হয়, উল্লসিত হয়, উদিত হয়, উদ্গত হয়, উদ্গীত হয় ও উদ্বুদ্ধ হয় তখন তার সক্রিয় গতি, শক্তি, জ্ঞান, আনন্দের অভিব্যক্তি নিরবচ্ছিন্ন ভাবে চক্রাকারে চলতে থাকে, চরতে থাকে, যেন চালিত হয়। এই উপর নিচ তার ব্যবহারিক নির্দেশ। উপরের আর একটি অর্থ—'উপ' মানে সমীপে, নিকটে ও সাথে। 'র' মানে শক্তি। শক্তির সাথে সত্তার যুগল নির্দেশ।

'উপর' শব্দের দ্বিতীয় আর একটি অর্থ সর্বব্যাপী আকাশ—যা নিত্য এবং যা প্রকাশক ও আধেয় তা নির্মল, বিশুদ্ধ সত্তা, প্রশান্ত শিবময় অবস্থা। তাকেই পুরুষ বলা হয়। সে সর্বদা নির্লিপ্ত, নির্মল, স্বচ্ছ অখণ্ড অস্তিত্ব। তার প্রকাশই হচ্ছে নিচ। এই নিচ হচ্ছে শক্তি, গতি, সমষ্টিগুণ, প্রকৃতি যা মহাপ্রাণরূপে, মহাচৈতন্যরূপে সেই পুরুষ সত্তা আকাশের বুকে নিত্যযুক্তা হয়ে লীলা করে চলেছে। এঁকেই গুরু, মাতা বা ইষ্ট বলা হয়।

ভাবমুখে থাকার তত্ত্বার্থ

ভাবমুখে থাকার অর্থ হল সত্তাশক্তি যুক্ত হয়ে থাকা, সমত্বের মধ্যে থাকা। ভিতরে শিব স্থির, বাইরে শক্তি সমস্ত চঞ্চলতা, সমস্ত গতিশীল প্রকাশের সঙ্গে যুক্ত আছে। সেইজন্য যে স্থিরত্বে থেকে বাইরে সকলের সঙ্গে মিশছে সে জানে যে মা তাকে ধরে রেখেছে।

মাতৃতত্ত্ব ও মাতৃমহিমা সর্বতোমুখী ও সর্বানুস্যূত

যেখানে গুণ, যেখানে রূপ—সেখানে শক্তি, সেখানে জ্ঞান, আকর্ষণ, আনন্দ; সেখানেই প্রেম, সেখানেই মা। যা দেখা যায়, সে সবই মা।

মায়ের বক্ষ ছাড়া সন্তান থাকতে পারে না। সন্তান তাঁর বুকে সমস্ত সময়েই আছে। অখণ্ড আনন্দ, অখণ্ড জ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত আছে। এই কথাগুলি কর্ম করবার আগে সকলেরই স্মরণ করা উচিত। তাঁর সঙ্গে সকলে নিত্যযুক্ত।

আমি ও আমার শব্দের নিগূঢ় তত্ত্ব

সমগ্র 'আমি'টা হচ্ছে বোধসত্তা, 'আমার' হচ্ছে তার প্রকাশ। একটা গাছকে কী দিয়ে বোঝা যায় এবং জানা যায়? দুই বোধের মিলনে বোধ জেগে ওঠে। সকলেই অখণ্ড চৈতন্যের মধ্যে রয়েছে—ঋষিরা এই সত্যই প্রকাশ করেছেন।

ঋষি শব্দের তত্ত্বার্থ

ঋষি—'ঋ' ধাতুর (শব্দের) মানে সমগ্র জ্ঞান এবং দর্শন। 'ষ' মানে সমগ্র মাতৃকাশক্তি (মায়া, মহামায়া এবং যোগমায়া)। এই 'ষ' যখন গতিশীল হয় 'ই' যুক্ত হয়ে অর্থাৎ ইচ্ছা দ্বারা, তখনই জ্ঞানের ধারা ক্রমপর্যায়ে অভিব্যক্ত হয়। সেইজন্য ঋষিরা দ্রষ্টা এবং তাঁরা সব জায়গায় যেতে পারেন।

শব্দের অর্থ তাঁদের কাছ হতেই নিতে হয় যাঁদের শব্দের অনুভূতি হয়েছে।

'ঋষি' শব্দ উল্টা করলে হয় সিঁড়ি (ষিঋ) অর্থাৎ steps to knowledge of oneself। গুরুদেবের কাজ হচ্ছে মৃত্যু থেকে তাঁর আশ্রিত সন্তান বা শিষ্যকে অমৃতত্বে নিয়ে যাওয়া, লঘুকে গুরু করে দেওয়া।

জগন্মাতার সঙ্গে তাঁর সন্তান যোগযুক্ত হয়েই আছে, শরণাগতির মাধ্যমেই তা অনুভবগম্য হয়

সন্তান দেহের মধ্যে আছে, আবার সে অখণ্ড জ্ঞানময়ী মায়ের বুকেও রয়েছে। সকলেই তাঁর সঙ্গে যুক্ত আছে। যোগ কেউ করতে পারে না, যুক্ত হয়েই আছে। দরকার কেবল শরণাগতির।

সত্যানুভূতির তাৎপর্য

বিষ্ণু যোগমায়া শক্তির বুকে রয়েছেন। শক্তি বা প্রাণটাই সব। প্রাণের মধ্যে কান পেতে শোনা যায় তাঁর অমৃতময় বাণী। সেই অমৃতময় বক্ষেই সকলে নিত্য আছে। একেই বলে সত্যানুভূতি।

সত্যের বক্ষেই মিথ্যা ভাসে, মিথ্যা মায়া সত্যময়ী অনন্ত রূপিণী অসীমা মায়ের সান্ত সসীম ভাবাবেশ মাত্র

মায়ের বৈধব্যবেশ যখন কোন বস্তু দ্বারা, কোন গুণ বা বিশেষণের দ্বারা সীমাবদ্ধ হয় তখনই তাকে মায়া বা সসীম বলা হয়। কিন্তু এই সসীম বা মায়ারূপে স্বয়ংপূর্ণা অসীমা মা নিজে। এই বোধই সর্ববিধ সীমাকে অতিক্রম করে নিয়ে যায় স্বরূপ স্বভাবের অনন্ত অসীম শাশ্বত অমৃতসত্তায়।

বিধবার তত্ত্বত কোনও বন্ধন নেই, কিন্তু ব্যবহারিক দৃষ্টিতে যে বন্ধন দৃষ্ট হয় তা বিধবা শব্দের পরিপন্থী

বৈধব্য হচ্ছে মুক্তি বা স্বাধীনতার প্রতীক। বি+ধবা=বিধবা। 'বি' অর্থ গুণ বা বিশেষণ। 'ধবা' মানে পরিষ্কার, সাদা, স্বচ্ছ। বি অর্থাৎ বিশেষরূপে বন্ধনমুক্ত বা স্বাধীন। মা হচ্ছে দিগ্‌বসনা—উলঙ্গ, কোন বন্ধন নেই। বিধবার কোন বন্ধন নেই।

অখণ্ড আনন্দের অধিকারী কে?

অখণ্ড বিশুদ্ধ চৈতন্যের নিরবচ্ছিন্ন, অপরিবর্তনশীল অনুভূতি যা হৃদয়ের অন্তরে ও বাইরে স্বপ্রকাশ বোধ-জ্যোতির মাধ্যমে নিত্য প্রকাশমান তাকেই 'অখণ্ড আমি' বলা হয়।

অখণ্ড বোধসত্তার প্রতিটি ধারা বা প্রকাশই অখণ্ডের জ্ঞাপক, নির্দেশক এবং পরিচায়ক। শব্দ, রূপ এবং নামগুলি যা স্থূল, সূক্ষ্ম, কার্য-কারণের মধ্যে রূপায়িত হয় তা এই অখণ্ড বোধসত্তার অভিব্যক্তি বা প্রকাশ। এই অখণ্ড বোধসত্তাই হচ্ছে অখণ্ড মহাপ্রাণসাগর।

অখণ্ড মহাপ্রাণসাগরের সকল অভিব্যক্তির সত্তা ও শক্তির উপাদান নিত্য সমান। পার্থক্য শুধু প্রকাশের পরিমাণ। তাই শিব-দুর্গা, সীতা-রাম, লক্ষ্মী-নারায়ণ, রাধেশ্যাম, হরি, বিষ্ণু, কালী, কৃষ্ণ, আল্লা প্রভৃতি প্রত্যেকের মধ্যেই সেই অখণ্ড এক সত্তার অভিব্যক্তি সমান ভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

সমগ্র বিশ্বের নামরূপময় সকল প্রকাশ, সকল জীবন সেই অখণ্ড এক সচ্চিদানন্দ সাগরের ধারাবাহিক অভিব্যক্তি বা প্রকাশ মাত্র। প্রত্যেকেরই নিমিত্ত কারণ, উপাদান কারণ এবং কার্য-কারণের মধ্যে সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ সত্তার স্বভাব সমান ভাবে প্রকাশ হয়।

বৈচিত্র্য হয়েছে সত্তা ও শক্তির খেলা ও তার ব্যবহার। সর্ব নাম, রূপ নিয়ে বিশ্বরূপ। যে-কোন নাম, রূপ, ভাব ও বোধকে অখণ্ডবোধে মেনে নিলেই সেই অখণ্ড বিশ্বরূপে মিশে যাওয়া যায়।

পূর্ণ আমির পরিচয়

সৎ-এর দুইটি দিক আছে। একটি সঙ্কুচিত অবস্থা, আর একটি সম্প্রসারিত অবস্থা। একটা সসীম, একটা অসীম। সম্প্রসারণ ও সঙ্কোচন—এই দিয়ে গতি তৈরি হয়। দুটো মিলিয়েই পূর্ণ আমি।

সাম্য অবস্থা সৃষ্টিশূন্য, অদ্বৈত— বিষম অবস্থা সৃষ্টি এবং দ্বৈত, বৈচিত্র্য

গুটিপোকা স্বরচিত জালে নিজে আবদ্ধ হয়, আবার নিজেই বেরিয়ে আসে। দুটো মিলিয়েই পূর্ণ। এই দুই হচ্ছে কেন্দ্র বা অন্তর এবং বাহির বা পরিধি। অর্থাৎ সত্তা-শক্তি, পুরুষ-প্রকৃতি, আমি ও তুমি। এই দুই-এর সংযুক্ত অবস্থাকেই পূর্ণ বলা হয়। কোনও একটার প্রাধান্য অধিক হলে বা সমান অবস্থা বিচ্যুত হলে বা বিকৃত হলে সৃষ্টির অভিব্যক্তি শুরু হয়। [৭।৮।৬৮]

রাখী/ঝুলন পূর্ণিমার বৈশিষ্ট্য

রাখী পূর্ণিমা বা ঝুলন পূর্ণিমা সমগ্র পৃথিবীর অন্তর্নিহিত প্রকৃতি বিজ্ঞানের বিরাট এক প্রভাব সকলের দেহ প্রাণ মনের মধ্যে ঢেলে দেয়। এটা বিরাট এক প্রাণবন্ত বোধময় সত্যবস্তু, যা প্রথমে সকলে বুঝতে পারে না।

অধ্যাত্মবিজ্ঞানীদের মধ্যে কেউ কেউ বলে—এ-ই হল অস্তিত্ববোধের সারসত্তা এবং এ-ই ভগবৎ জীবন প্রাণ।

রাখী পূর্ণিমার সত্য তাৎপর্য হচ্ছে—যে-পূর্ণিমা তিথিতে বিশ্বপ্রকৃতির অন্তরসত্তার বৈভব, প্রাচুর্য বা ঐশ্বর্যের অভিব্যক্তি হয়। এই বৈভব বা ঐশ্বর্য হচ্ছে মহাপ্রাণ প্রকৃতির প্রাণসম্ভারের পূর্ণ প্রকাশ। তা-ই রাখী পূর্ণিমা অর্থাৎ মায়ের পূর্ণ ইচ্ছাশক্তির অভিব্যক্তি।

সৃষ্টিতত্ত্বের রহস্য ঝুলন পূর্ণিমার অন্তর্নিহিত বিজ্ঞান

পৃথিবীতে প্রাণের প্রকাশ প্রথম পর্যায়ে ফুটে ওঠে বৃক্ষলতা গুল্মাদি এবং গাছপালার মধ্যে। এদের আর এক নাম খাদ্যশস্য এবং ঔষধি বনস্পতি। উন্নত পর্যায়ের প্রাণী বা জীবের ধারণ, পোষণ, রক্ষণ প্রভৃতি বিকাশের অপরিহার্য উপাদান এরা। এই শস্য বা ঔষধিরূপে প্রাণমায়ের অবদান মহাপ্রাণরূপী মায়ের অন্য সন্তানদের জন্য নিত্য আত্মপ্রাণদান করে চলেছে। তার ফলে জীবনের বৃহত্তর প্রকাশ বা অভিব্যক্তি সম্ভব হচ্ছে।

শদ্যাদি এবং ঔযধি বনস্পতি প্রভৃতিকে প্রাণদান করছে প্রকৃতি মায়ের আর এক রূপ চন্দ্রমা। তার পরিচয় গীতায় আছে—

"গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা।
পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ।।"

পূর্ণিমার মাধ্যমে মহাপ্রাণরূপী চৈতন্যময়ী বোধময়ী জ্ঞানময়ী সত্যময়ী সেই সচ্চিদানন্দময়ী ব্রহ্মস্বরূপিনী ব্রহ্মমাতা বিশ্বজননী তাঁর প্রকাশসন্তানদের আপন প্রাণ হতে প্রকাশ করে, আপন প্রাণের বক্ষে ধারণ করে আপনার প্রাণ দিয়ে তাদের পোষণ করে, রক্ষা করে আবার আপনার মধ্যেই পূর্ণ করে মিলিয়ে নেন। এ তাঁর সত্যস্বরূপ শক্তি ও জ্ঞানের স্বরূপ, আনন্দ ও প্রেমের স্বরূপ, অমৃত, শান্তি ভূমাস্বরূপ, নিত্যলীলার অভিনয় স্বরূপ।

পূর্ণিমারূপী মা তাঁর সন্তানদের অর্থাৎ এই বিশ্ব, প্রাণীজগৎ, জীবজগৎ এবং উন্নত পর্যায়ের মানুষের মধ্যে আপনাকেই প্রকাশ করছে স্বমহিমায় স্বভাববোধে। সেইজন্য রাখী পূর্ণিমা তার নাম। জীবনকে রাখে যে পূর্ণিমা, প্রাণ দিয়ে প্রাণের মাঝে। তাই রাখীবন্ধন।

নক্ষত্রপুঞ্জেরও শুভদৃষ্টি আছে। একের থেকে অন্যের মধ্যে যে দৃষ্টি বিনিময় হয় তা কল্যাণকর জিনিস। তার নামই শুভদৃষ্টি। তার প্রকাশ পার্থিব জগতে বোধ, ভাব, নাম, রূপে তথা জ্ঞান, মন, প্রাণ, দেহে কারণ ও কার্যের পদ্ধতি সহ তরঙ্গায়িত হয়ে, লীলায়িত হয়ে ঝুলতে ঝুলতে নেমে আসে। আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানে এর নাম ঝুলন দেওয়া হয়েছে। অপ্রকাশ বা অব্যক্ত হতে প্রকাশের অভিব্যক্তি।

ঝুলনের মাধ্যমে সৃষ্টির মহিমা ব্যক্ত

যেমন চারাগাছ হতে বড় গাছ হয়, ছোট শিশু যেমন আস্তে আস্তে বড় হয়, সূর্যোদয়ের সময় ধীরে ধীরে যেমন আলো ছড়িয়ে পড়ে সেইরকম এমন একটা বস্তু আছে যাকে প্রকাশ করা যায় না কিন্তু সে নিজে নিজেই প্রকাশ হয়ে চলেছে। স্বয়ংপ্রকাশ সে—আপন ইচ্ছায় আপনি প্রকাশ হয়ে আপনার সঙ্গে খেলা করে। সেই বস্তুটি 'আমি'র অন্তরালে বা ব্যক্তিগত 'আমি'কে কেন্দ্র করে তার মধ্য দিয়ে তার ইচ্ছা, উদ্দেশ্য, প্রয়োজন তথা আপনার আনন্দবিলাস নিরন্তর ব্যক্ত করে চলেছে।

নিরন্তর আত্মদানই মহাপ্রাণের ধর্ম

মহাপ্রাণরূপী মায়ের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য (highest characteristic) হচ্ছে কেবল দেওয়া। অর্থাৎ আত্মদানের পদ্ধতিতে স্বভাবস্বরূপে স্বমহিমা প্রকাশ করা। এ তাঁর সত্য স্বভাবধর্ম।

পৃথিবীতে কেউ বলতে পারে না—তাঁকে (প্রকাশককে) আমি জানি। সে-ই কেবল জানে। তাঁকে শোনা যায় না, সে-ই শোনে। তাঁকে বোঝা যায় না, সে-ই কেবল বোঝে। তাঁকে দেখা যায় না, সে-ই দেখে। মাঝখান থেকে একটা ছোট আমি উঠে বলছে—জানি পারি বুঝি। এটাই হচ্ছে অজ্ঞানজাত মিথ্যা অহংকার বা ego। এটাও ছন্দের মধ্যে একটা বিশেষ অবস্থা।

ঝুলনের অন্তরবিজ্ঞান ও তার বিজ্ঞাতার পরিচয়

যে বস্তু ঝুলতে ঝুলতে নেমে আসছে তার কেন্দ্র রয়েছে উপরে। তাকেই হৃদয় বলা হয়। রাখী পূর্ণিমার দিনে তার বিশেষ ব্যবস্থা বিশেষরূপে নিজেকে প্রকাশ করে। ঝুলনের আসল রহস্য চাপা পড়ে গেছে। ঝুলনের দিনে আনুষ্ঠানিক ভাবে রাধাকৃষ্ণকে সাজিয়ে সকলে একটু আনন্দ পায়।

মূল প্রাণের বহিঃপ্রকাশ এই ঝুলনের মাধ্যমে ঝুলতে ঝুলতে, দুলে দুলে বহির্বিশ্বের বৈচিত্র্যের রূপ নিয়েছে। এর অন্তর্নিহিত সত্যের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় হয়েছে তাঁরাই সত্যদ্রষ্টা, তত্ত্ববিদ্। তাঁরা এর সত্য রহস্য পূর্ণ ভাবেই জানেন। কিন্তু তাঁদের কাছে শ্রদ্ধাযুক্ত চিত্তে, ভক্তি ও বিশ্বাসের সঙ্গে জিজ্ঞাসা নিয়ে যদি কেউ না-আসে তাহলে এই বিরাট সত্যের রহস্য অপরে অবগত হতে পারবে না।

তত্ত্ববিদের তত্ত্বকথা স্বানুভবসিদ্ধ ও মৌলিক

অপরে জিজ্ঞাসু হয়ে গ্রহণ না-করলেও তত্ত্ববিদ্ বা সত্যদ্রষ্টাদের উদার হৃদয় বিশ্বপ্রকৃতির অন্তর্নিহিত গুহ্যতম সত্যের রহস্য ও তার ব্যবহারবিজ্ঞান বিশ্বমানবের কল্যাণের জন্য এবং সেবার জন্য তাঁদের সত্য উপলব্ধিকে ব্যবহার করতে সর্বদাই প্রস্তুত। তাঁরা সাধারণ ভাবে সকলের জন্য তা বিতরণ করে দিয়ে যান। সর্ব রূপ-নাম-ভাবের অন্তর্নিহিত যে-বোধ নিহিত থাকে তার সঙ্গে তাঁদের প্রত্যক্ষ পরিচয় হয়। সেই অনুভূতির দৃষ্টিতেই তাঁরা ঘোষণা করেন—"সর্ব বস্তুর মধ্যেই ব্রহ্ম আত্মা ঈশ্বর অনুস্যূত আছেন।" তাঁদের এই অনুভূতি ও কথা শুধুমাত্র অনুমানভিত্তিক নয় বা শাস্ত্রের কথার প্রতিধ্বনি নয়—এ তাঁদের স্বানুভবসিদ্ধ বাণী। তাঁরা তত্ত্বদ্রষ্টা, তত্ত্ববেত্তা বলে সাক্ষীরূপে এই অনুভূতির অধিকারী হন।

প্রত্যেকের সত্য পরিচয়

সকলের সত্য পরিচয় হচ্ছে—এক অখণ্ড মহাপ্রাণ যা সচ্চিদানন্দরূপে স্বয়ং প্রকাশমান ও নিত্যপূর্ণ তারই ব্যবহারিক রূপ। সুতরাং প্রত্যেকেরই পরিচয় সমবোধে সমযুক্ত।

সৃষ্টির উপাদান সত্তা এক, কিন্তু তার প্রকাশভঙ্গিমা অনন্ত

বোধসাগরের তরঙ্গায়িত রূপ হল নামরূপময় এই বিশ্ব এবং তারই অন্তর্গত এই ব্যষ্টিজীবন। সকলেরই উপাদান সত্তা মূলত এক, কিন্তু তার ব্যবহারিক প্রকাশ ভিন্ন ভিন্ন।

প্রকাশক সত্তার প্রকাশসমূহ প্রকাশকের প্রেমানন্দের বিলাস মাত্র। এই প্রেমানন্দের অভিব্যক্তি তাঁর শুদ্ধ একক ইচ্ছায় আপনার মাঝে আপনি বিকারবিহীন পরিণামের খেলা খেলে চলেছে।

সত্তার প্রকাশধারার মধ্যে বাহির-অন্তর ভেদে সর্ব বৈচিত্র্যের পরিণাম এক

সত্তার একটা বহিঃপ্রকাশ আছে যা নামরূপের মাধ্যমে স্থূল ও সূক্ষ্মের বিকারযুক্ত রূপে দেহেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বাইরে রূপায়িত হচ্ছে। এই অংশের সত্য বিকারধর্মী ও পরিবর্তনশীল। এই নামরূপের স্থূল অংশের বিকার বা পরিবর্তনকে আবির্ভাব, তিরোভাব, উদয়-অস্ত এবং জন্মমৃত্যু রূপে বলা হয়।

প্রকাশধারার বহির্ভাগে নামরূপের ভেদ দৃষ্ট হলেও বোধের ঘরে তারা সবই অভিন্ন, এক

দেহেন্দ্রিয়াতীত বোধসত্তার লীলাভিনয় দেহেন্দ্রিয়গ্রাহ্য বোধের কাছে অজ্ঞাত ও অবোধ্য। এই কারণে নামরূপের দ্বারা সত্যের বিজ্ঞান আবৃত। অখণ্ড বোধসত্তার সঙ্গে যুক্ত এবং পূর্ণভাবে অবগত হয়েছে যারা তাদের সাহায্য ব্যতীত নামরূপের অতীত, কার্য-কারণের অতীত, স্থূল দেহ ইন্দ্রিয়াদির অতীত সেই পূর্ণ বোধময় সত্তার সত্য রহস্যবিজ্ঞানটির পূর্ণ পরিচয় পাওয়া সম্ভব নয়।

ঝুলন/রাখী পূর্ণিমায় রাখীবন্ধনের মর্মার্থ

ঝুলনের দিনে এদেশে পরস্পরের সঙ্গে মিলনের প্রথা ছিল। এই দিনে রাখী বন্ধন হত। রাখীবন্ধন হচ্ছে আপনজনের সঙ্গে প্রিয়বোধের মিলন, ভালবাসার বিনিময় করা; সকলের একই কামনা, একই ইচ্ছা পূর্ণ হওয়ার জন্য, অমর হওয়ার জন্য।

সকলেই চায় প্রাণে মনে মুখে কাজে স্বভাববোধের একতানগতি, যাকে বলা হয় স্বভাবপ্রীতি অর্থাৎ অখণ্ড বোধের পরিণতি।

বেদের যুগে মিলনের জন্য যে-প্রার্থনা ছিল তার রূপ ছিল এইরকম—"পরস্পর সংযুক্ত হয়ে একীভূত যেন হই। বাক্য মোদের সংযুক্ত হোক। পরস্পরের মানসিক ঐক্য হোক। এক হোক মোদের প্রার্থনা। আমাদের সিদ্ধান্ত এক হোক। হৃদয় মোদের সমভাবাপন্ন হোক। ইচ্ছা মোদের সমান হোক, সার্থক হোক মোদের মিলন।"

অদ্বৈতের বক্ষে দ্বৈত ও নানাত্ববিলাসের মধ্যে পুনরায় অভেদ মিলনের প্রার্থনার ফলশ্রুতি

ঋষিযুগে সর্বসাধারণের জন্য অতি সহজ সরল ছিল মিলনের প্রার্থনা। পৃথক পৃথক অনন্ত ব্যষ্টি প্রকাশরূপে প্রতীয়মান অসীম, অদ্বয়, অখণ্ড এক পরমাত্মবোধের সঙ্গে সংযুক্ত হতে, অন্তর ও বহিঃপ্রকৃতির সামঞ্জস্য বিকাশ করতে এবং সর্বসত্য অনন্ত শক্তি, জ্ঞান, আনন্দ, অখণ্ড প্রেম ও শাশ্বত শান্তি ও জ্ঞানস্বরূপ সেই অনন্ত অসীম অদ্বয়সত্তা যাকে চৈতন্যস্বরূপ আত্মা ও ব্রহ্ম বলা হয় এবং যার স্বভাবপ্রকৃতি যা সর্বভূতে আপনাকে এবং আপনাকে সর্বভূতে এক করে প্রকাশ করে তার সঙ্গে পূর্ণভাবে সম্মিলিত হতে তাদের সেই আন্তরিক প্রার্থনার নির্বিশেষ ও আশ্চর্যজনক প্রভাব আছে।

মিলনের ফলেই হয় পূরণ। কারওর সংস্পর্শে গেলে তার কাছ হতে আসে বেদন। বেদনের পরিণাম হচ্ছে বেদ।

বেদনার মাধ্যমে বেদের পূর্ণাঙ্গ অভিব্যক্তির নিগূঢ় রহস্য

প্রথমে বেদনা তমঃ অবস্থা। দ্বিতীয় রজঃ অবস্থায় হয় বেদন এবং সংবেদন। সংবেদনের জড়ীভূত তমোগ্রস্ত সসীম চেতনাকে বেদনা বলা হয়। তাকে সম্প্রসারিত করে এই রজঃ, গতি বা কর্ম। তার ফলে হয় সংবেদন অর্থাৎ চেতনার উন্মেষ। বেদনার 'আ'-কারটা হল তমঃ-এর আবরণ। তা অপসারিত হয়ে বেদন হয়। এই বেদন পরিব্যাপ্ত হয়ে অখণ্ড রূপ নিয়ে পূর্ণ যখন হয় তখন তার 'ন'টা থাকে না। তখন হয় বেদ অর্থাৎ অনন্ত অসীম পূর্ণবোধসত্তা।

প্রতিবস্তুর সংস্পর্শে এলে হয় সন্তাপ। সন্তাপটা আস্তে আস্তে হয় সমতা। সমত্ববোধের নাম বেদ।

মিলনের বিজ্ঞান

সকলেই চায় সমত্ব বা শান্তি। কিন্তু সকলের সঙ্গে মিল না-হলে সমত্ব বা শান্তি আসতে পারে না। প্রথমে সকলের সঙ্গে মিশতে ভাল না-লাগলেও জোর করে মিশবার ফলে এমন একটা অবস্থা আসে যে অবসরকালে বিশ্রাম নেবার সময়েও তাদের কথাই মনে আসবে।

সংসারে জন্ম-মৃত্যু, জরা-ব্যধি, দুঃখ-কষ্টের মধ্যে অমৃতময় অদ্বয় আত্মারই পরিচয় ব্যক্ত হয়

সাঁতার শিখতে গেলে যেমন প্রত্যেককে জলে নামতেই হবে এবং কিছু জল খেতেই হবে সেই রকম শান্তি পেতে হলেও সংসারে থেকে ঘাত প্রতিঘাত সহ্য করেই তা পেতে হবে। যা-কিছু বেদন, শক্তি, জ্ঞান, আনন্দ, প্রেম সবকিছুই রয়েছে এই পৃথিবীতে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে। যেমন ঘি তৈরি হয় মাখন হতে। মাখন হয় দুধ হতে, দুধ আসে গরুর বাঁট হতে। গরু ঘাস খায়। ঘাস ও লতাপাতার সারবস্তু দুধরূপে পরিণত হয়। এই সারবস্তু মিশে আছে প্রকৃতির সর্বস্তরে।

জ্ঞাতার অধীন হল জ্ঞেয়

দুঃখের জ্ঞাতা হবার জন্য দুঃখের সঙ্গে যুক্ত হতে হবে, সুখের জ্ঞাতা হতে গেলে সুখের সঙ্গে যুক্ত হতে হবে। এই রকম প্রকৃতির সর্বভাবের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সর্বভাবের জ্ঞাতা হয়েছেন ঈশ্বর। দুঃখটা যে কী, যে জানে তার দুঃখ থাকে না।

একবোধে সব 'মেনে মানিয়ে চলা'ই হল রাখী পূর্ণিমার অন্যতম বৈশিষ্ট্য

রাখী পূর্ণিমা এনে দেয় মিলনের সুযোগ। একের সঙ্গে অপরের আজ মিলতে হবে। কাউকে বাদ দেওয়া চলবে না।

একের বহুতে নেমে আসা, অর্থাৎ বহুর ভাব, নাম ও রূপের অভিব্যক্তিতে সেই একের পর্যায়ক্রমে অবতরণের নাম ঝুলন।

একেতে ফিরে যাবার যে গতি তা জীবনে আসে পূর্ণ ব্যাকুলতার মাধ্যমে। এই ব্যাকুলতা আসে একের বা সেই অখণ্ডের সঙ্গে মিলিত হবার স্মৃতি হতে।

জীবনে অখণ্ডের স্মৃতি জাগলেই ব্যাকুলতার তীব্রতা পুনর্মিলন ঘটায় অখণ্ডের সঙ্গে

জীবনে চলার পথে বিশেষ কোন এক সময়ে এই অখণ্ডের স্মৃতি জেগে ওঠে। ব্যাকুল হয়ে তখন সে অখণ্ডের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য জীবনের সসীমতার, সঙ্কীর্ণতার মোহবন্ধন ও অজ্ঞানের আবরণ ছিন্ন করে ছুটে চলে অখণ্ড বোধের ঘরে। এই ছুটে চলাই হল তার আত্মসাধনা। এই সাধনার ফলে সেই অখণ্ড পূর্ণতার সঙ্গে প্রেমে আনন্দে জ্ঞানে ও শক্তিতে পুনর্মিলন হয়।

আত্মলীলায় ঈশ্বর বহু হয়েও এক

অবিরাম ঈশ্বরের অভিব্যক্তির ঘনীভূত রূপ হল বিশ্বমূর্তি। এই বিশ্বের প্রতিটি বস্তু ও জীবনই ঈশ্বরের স্বরূপ অভিব্যক্তি। প্রত্যেকের মধ্যেই স্বয়ং ঈশ্বর বিদ্যমান থেকে তাঁর স্বরূপমহিমা নিরন্তর ব্যক্ত করে স্বভাবের লীলা করে চলেছেন।

অবিদ্যার অভিমান অদ্বয় বোধের পরিপন্থী

সবার মধ্যেই ঈশ্বরের স্বভাবলীলার অভিব্যক্তিকে উপলব্ধি করতে বাধা সৃষ্টি করে সসীম বোধের অহংকার ও অভিমানরূপ বোধের বৃত্তি। 'ত্বংকার বোধে' অহংকার অভিমানের প্রভাব থাকে না। তখন পূর্ণ ঈশ্বরীয় বোধের অনুভূতি অবিরাম চলতে থাকে।

জ্ঞানময় তপের মাধ্যমে বহির্মুখী প্রকাশে অদ্বৈতের দ্বৈতবিলাস, আবার অন্তর্মুখী প্রকাশে তার অদ্বৈতে নিবাস (স্থিতি)

প্রতি জীবের অন্তরে প্রজ্ঞানঘন ঈশ্বর সত্তায় তার জ্ঞানময় তপের প্রভাবে অনন্ত কামনা-বাসনার সূক্ষ্ম সংস্কার ঘাত প্রতিঘাতে আলোড়িত হয়ে সমস্ত সীমা ও বন্ধনকে অতিক্রম করে অনন্ত অসীমের দিকে ছড়িয়ে পড়ে ও পরিণামে ভূমাবোধসত্তায় মিশে যায়।

অশান্তিময় জীবনে শান্তির সন্ধান মেলে মহাপুরুষদের কৃপায়, অন্য কোনও ভাবেই নয়

সকলে শান্তি চায় ঠিকই, কিন্তু তার উপায় জানতে হবে মহাপুরুষ বা সিদ্ধপুরুষদের কাছ থেকেই। অথচ মহাপুরুষ বা সিদ্ধপুরুষদের কথা কেউ শোনে না এবং মানেও না। তাঁরা চলে গেলে কোথায় কী নোট রেখে গেছেন সে-সব নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়।

মহাপুরুষ ও অবতারপুরুষগণ জীবিতাবস্থায় মান পান না, দেহত্যাগের পরে তাঁদের নিয়ে কত মাতামাতি হয়, হয় কত কল্পনা, রচনা

রামকৃষ্ণদেব যখন এসেছিলেন তখনকার দিনে জ্ঞানীগুণীরা তাঁর কথা শুনতে যেত না অথচ পরে শ্রী'ম'র ডায়েরি কথামৃত পড়ার জন্য এখন কত ভিড়। ত্রৈলঙ্গস্বামী, বামাক্ষেপা প্রভৃতি মহাপুরুষদের বেলায়ও ঠিক এই একই রকম আচরণ দেখা গেছে। তাঁদের জীবিতকালে কেউ তাঁদের কথা কথা নিতে আসে নাই।

আনন্দস্বরূপের বক্ষে তাঁর সমগ্র কারণ-কার্য প্রকাশে আনন্দই শুধু স্ফুরিত হয়

ঝুলনের পিছনে রয়েছে ভগবৎ প্রেম ও আনন্দ। সন্তান সৃষ্টির মধ্যে যেমন আনন্দ থাকে, সমগ্র সৃষ্টির মধ্যেও সেই রকম আনন্দের প্রকাশ রয়েছে। এটা অনীশ্বরীয় নয়।

সমতার মধ্যে অসমতা হল কার্য এবং সমতা হল কারণ

সংসার মিথ্যা নয়, বিবাহ মিথ্যা নয়, দাম্পত্য প্রেম মিথ্যা নয়। কিন্তু সবকিছুর মধ্যেই সমান ভগবৎ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। কোনটারই বিষম আধিক্য ভাল নয়। সেইজন্য ভগবান হচ্ছেন সমতা অর্থাৎ balanced state, মধ্যম পথে প্রতিষ্ঠিত।

জীবন নদীর তরী, মাঝি, সওয়ারি ও গন্তব্যস্থলের তত্ত্বার্থ

প্রাণের মাঝখান দিয়ে মনতরী নিয়ে যেতে হবে। প্রাণের দুই তীরে আছে তীর্থ। সুখ-দুঃখ, জন্ম-মৃত্যু। বুদ্ধি হল হাল। আমি হল মাঝি। যাত্রী হচ্ছে আমিত্ব। আমিত্বকে নিয়ে যেতে হবে। আমি মাঝি; আমার আর কোন কাজ নেই, শুধু তাঁকে বহন করা ছাড়া। তাঁর আদেশ পুরোপুরি 'মেনে মানিয়ে চলতে' হবে।

ব্যষ্টি জীবনের মাধ্যমে পরমাত্মার অভিনব লীলাখেলা

পৃথক পৃথক ভাবে প্রত্যেকেই আদ্যাশক্তির সত্তায় সত্তাবান ও তাঁর শক্তি দ্বারাই পরিচালিত। তাঁকেই নিরন্তর অনুসরণ করে চলেছে কেউ অজ্ঞানে, কেউ সজ্ঞানে। কাউকে দিয়ে তিনি পালন করাচ্ছেন, আবার কাউকে দিয়ে রক্ষা করাচ্ছেন। কাউকে দিয়ে দান করাচ্ছেন, কাউকে দিয়ে গ্রহণ করাচ্ছেন। আবার কাউকে দিয়ে ধ্বংস করাচ্ছেন এবং কাউকে দিয়ে সেবা করাচ্ছেন।

অতীব রহস্যপূর্ণ কর্মের বিজ্ঞান, আত্মজ্ঞানে মেলে তার সমাধান

আপাতপ্রতীয়মান কর্মের পার্থক্য প্রত্যেকের মধ্যে প্রকাশ পেলেও একাধিক কর্মের অভিব্যক্তি কারও কারও মধ্যে দেখা যায়। কর্মের প্রকৃতি বড় জটিল, "গহনা কর্মণোঃ গতিঃ।"

জীবনের আদি-মধ্য-অন্তে ভেদ দৃষ্ট হলেও অভেদেই তার পরিসমাপ্তি

একই ব্যক্তি সৃষ্টি স্থিতি ধ্বংসের কাজে লিপ্ত আছে কিন্তু সচেতন নয়। জীবনের মধ্যে যে জীবনের স্বভাব মহিমা ভিন্ন ভিন্ন কর্মের মাধ্যমে অভিব্যক্ত হয় তার উদ্দেশ্য প্রথম অবস্থায় অনুভবগম্য হয় না। সেইজন্য বিরুদ্ধ প্রকাশগুলির সঙ্গে মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। তথাপি মানুষ তার মধ্যে চলেছে, তার মধ্যে থাকবে, কারণ এ-ই প্রকৃতির স্বভাবধর্ম। পরিণামে বিরোধ নেই। [৮।৮।৬৮]

অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে পিতামাতার তাৎপর্য

এক সত্তারই দুই রকম প্রকাশের পরিচয় পাওয়া যায়। একটা হল সমষ্টি সত্তা (universal Self বা Self above), আর একটা হল তৎ অন্তর্গত ব্যষ্টি সত্তা (individual Self বা Inner Self)। সকলের মধ্যে যে Self আছে সে অর্থাৎ Inner Self হল মাতা এবং Self above বা universal Self হল পিতা। এই দুই-এর মাঝে সকলে আছে। ব্যষ্টি আমিটা এই দুই-এর মাঝখানে।

পিতা থেকে আসে সন্তাপ। বাইরে থেকে সবটাই আসে সন্তাপ। সন্তাপ = সম + তাপ বা তাপী। উল্টা করলে হয় পিতা।

মাতা হচ্ছে তাপ; মাঝে, অন্তরে বা মধ্যে আছে বলে তাকে মা বলা হয়। সবাই যার মধ্যে আছে এবং সবার মধ্যে যে আছে, তাকে মা বলা হয়।

মায়ের মধ্যে সকলে আছে বলে মাকে অন্তরে বা মধ্যে, পিতাকে বাইরে বা ঊর্ধ্বে ধ্যান করা হয়। ধ্যান করার ফলে উপর থেকে যে আশীর্বাদ আসে সেটা অন্তরে মায়ের দ্বারা গৃহীত হয়ে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ ভাবে সম্পূরিত, সংযুক্ত ও একীভূত হয়। যেমন পিতা বাইরের থেকে রোজগার করে আনে আর ভিতরে বসে মা-ই সব সাজিয়ে-গুছিয়ে ব্যবস্থা করে দেয়। এক Self-এরই অন্তর ও বাইরের সংযুক্ত কাজ।

এই জন্য তমকে মাতা, রজকে পিতা বলা হয় এক মতে। আবার সত্ত্বকে পিতা, রজকে মাতা বলা হয় আর এক মতে। মাঝখানে আত্ম-সন্তান। রজকে উল্টা করলে হয় জড়। জড়কেই আবার তম বলা হয়। তমের নিজস্ব কোন স্বাতন্ত্র্য নেই।

সন্তানের নিজস্ব কোন শক্তি নেই। পিতৃধন ও মাতৃধনের পূর্ণ অধিকারী হয় সন্তান। এই পিতৃ ও মাতৃ-সম্পদে সমৃদ্ধ হয়ে সে পূর্ণ হয়ে ওঠে। মাতা-পিতার সঙ্গে তার বিচ্ছেদ হয় না। মাতা-পিতার সত্তায় সে পরিণত হয়।

সত্ত্বাদি তিনগুণের বৈশিষ্ট্য

তত্ত্বের ভাষায় পাওয়া যায় সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এক সত্তাশক্তির ত্রিবিধ প্রক্রিয়া ও তার প্রকাশ। সত্ত্বের কাজ ও লক্ষণ—প্রকাশধর্ম এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ সমভাব। রজঃ-এর কাজ ও লক্ষণ—সক্রিয়তা, গতিশীলতা বিকারশীল ও পরিণাম ধর্মী। তমঃ-এর কাজ ও লক্ষণ হল আবরণ ও বিক্ষেপ সৃষ্টি করা, নিষ্ক্রিয়তা, শান্ত ও জড়ভাব।

রজঃ তমঃকেও রজঃতে পরিণত করে এবং সত্ত্বকেও রজোধর্মে আনার প্রয়াস করে। সত্ত্বকে স্থির থাকতে দেয় না। ত্রিবিধ গুণ বা প্রকৃতির পরস্পর সংমিশ্রণের ফলে নামরূপময় বিশ্বের অভিব্যক্তি স্থিতি ও তার পরিণাম হয়।

আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে মাতাপিতার সঙ্গে সন্তানের সম্বন্ধ

মাকে বহু জায়গায় তমঃ বলা হয়েছে কারণ তাঁর ধৈর্য, স্থৈর্য, সহিষ্ণুতা অনেক বেশি। সন্তান হিসাবে সকলের স্থান দুই-এর মধ্যে। বাবা ও মা উভয়কেই সমভাবে সকলের দরকার। শুধু বাবা বা শুধু মাকে দিয়ে চলে না। দুটো শক্তি নিয়ে সকলেই যুক্ত (united)। বাইরে থেকে যে সন্তাপ আসে সেগুলি নিয়ে মা ভিতরে বোধে এনে অনুভূতিগম্য করে প্রকাশ করে (unity of Consciousness)। বোধকে বৃহত্তর ও অখণ্ড করার জন্য মা সর্বদাই ভিতরে বসে কাজ করছে।

প্রত্যেকের অন্তরপ্রাণচৈতন্য ও প্রকৃতির সঙ্গে বহির্প্রাণচৈতন্য ও প্রকৃতির মাতাপিতা বোধের সম্বন্ধ। এই দুই-এর সংযোগেই সকলের জীবন। মা, বাবা ও সন্তানকে কেন্দ্র করে বোধসত্তা ও বোধশক্তির পূর্ণ অন্তর ও বহিরভিব্যক্তি। এই হল আনন্দঘন নিত্যলীলাময় শাশ্বত অমৃতের অমূর্ত ও মূর্ত পরিচয়। প্রত্যেকের সংসারেই এই পূর্ণাঙ্গ ছবিটি সত্যের সুস্পষ্ট পরিচয় দিয়ে যায়; কিন্তু তার সঙ্গে সকলে পূর্ণ ভাবে পরিচিত নয়। সেই তুলনায় বিশ্ব হল এক অনন্ত অসীম বিরাট পরিবারের সত্য পরিচয় বা রূপ। ঋষিদের কাছেই এই বিরাট সত্যের পরিচয় ধরা পড়েছিল; কিন্তু বর্তমানে এটা বহুলাংশে বিকৃত হয়ে আছে।

ঋষি শব্দের তত্ত্বার্থ[১] (১)

সমগ্র সত্তাশক্তির পরিচয় ঋষিরাই ব্যক্ত করে গিয়েছেন। ঋষ্ ধাতু হতে 'ঋষি' শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে। ঋষ্ ধাতুর অর্থ সর্বব্যাপী অখণ্ড জ্ঞান। তা ইচ্ছাযুক্ত হয়ে সর্বত্র গতিশীল ও ক্রিয়াশীল হয় এবং জ্ঞানসত্তার বক্ষে খেলা করে।

১। অভিনব সংজ্ঞা।

এই দুইটি সংমিশ্রণের বোধ যাঁর আছে, সেই বিজ্ঞাতাই ঋষি[১]। অর্থাৎ যাঁর মধ্যে সমগ্র জ্ঞান, সত্তাশক্তির নির্গুণ সগুণ মহিমা যুগপৎ অভিব্যক্ত বা অনুভূত হয়েছে তাঁকেই ঋষি বলে।

সবের মধ্যেই এক তত্ত্ব আছে। সর্ববস্তুর মধ্যে এই একের জ্ঞান আছে যাঁর, সর্ববস্তুতে একেকে সমানবোধে দেখেন যিনি তাঁকেই বলা হয় ঋষি[২]। তাঁদের নির্দেশ অনুসরণ করে চললে সেই একের সন্ধান পাওয়া যায়।

অখণ্ড বোধস্বরূপে পরিণত হওয়ার অন্যতম উপায়

সাধু সন্ন্যাসী বা গুরুর নির্দেশ অনুযায়ী চললে তাঁদের মতই হওয়া যায়। অর্থাৎ পিতৃধন ও মাতৃধন পেলে এবং তার সঙ্গে পূর্ণ যুক্ত হলে অখণ্ড বোধস্বরূপে পরিণত হওয়া যায়।

ঋষি ও ষোড়শী শব্দের তত্ত্বার্থ (২)

ঋষির 'ঋ' হল অখণ্ড সত্তার সত্য, 'ষি' হল তার শক্তি। মায়া, মহামায়া, যোগমায়া এই তিনটি শক্তির সমগ্রতাকে অর্থাৎ সমগ্রতার একক মূর্তিকে ষোড়শী[৩] বলে।

ষোড়শীর মর্মার্থ

ষোড়শীর পরিচয়—(১) মায়া, মহামায়া, যোগমায়া; (২) সৎ, চিৎ, আনন্দ; (৩) অস্তি, ভাতি, প্রীতি; (৪) ঘোর, প্রবৃত্তি, প্রখ্যা; (৫) তমঃ, রজঃ, সত্ত্ব; (৬) সন্ধিনী, সংবিৎ, হ্লাদিনী; (৭) বহিঃ, অন্তর, কেন্দ্র; (৮) স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ; (৯) ক্ষর, অক্ষর, পুরুষোত্তম; (১০) ব্যষ্টি, সমষ্টি, সমষ্টির অতীত; (১১) সগুণ, নির্গুণ, নির্গুণগুণী; (১২) অভাব, ভাব, মহাভাব বা স্বভাব; (১৩) অজ্ঞান, জ্ঞান, প্রজ্ঞান; (১৪) সন্তান, মাতা, পিতা; (১৫) ইচ্ছা, জ্ঞান, ক্রিয়া; (১৬) তিনি, তুমি, আমি।

ঋষি শব্দের তত্ত্বার্থ (৩)

ষোড়শী ইচ্ছা দ্বারা গতিশীল হয়ে যার মধ্যে প্রকাশমান হয় তাকেই বলে ঋষি। ষোলকলা পূর্ণ ঋষিদের ব্রহ্মপুরুষ এবং ষোড়শী মাতার অর্থ এক। সত্যপিতা, সত্যমাতাকে পরিপূর্ণ ভাবে গ্রহণ করা হলেই ঋষি হওয়া যায়।

স্বানুভূতির দৃষ্টিতে মাতাপিতা ও সন্তানের পরিচয়

মন হচ্ছে মাতা, বুদ্ধি হচ্ছে পিতা। হৃদয় মাতা, মস্তিষ্ক পিতা। মনের সঙ্গে হৃদয়ের এবং বুদ্ধির সঙ্গে মস্তিষ্কের সংযোগ আছে। মন ও বুদ্ধি থেকে সকলে বুদ্ধির প্রসাদ পায় এবং হৃদয়েরও প্রসাদ পায়।

বুদ্ধি হল চৈতন্যের বীজ (seed of Conscciouness)। মন হল গর্ভ (womb)। এই বীজ পিতা দিচ্ছে মাতাকে। মাতা ভিতরে তা পোষণ করে, যার ফল সন্তানরূপে অভিব্যক্ত হয় বা প্রকাশিত হয়। জমিতে যেমন বীজ বপণ করা হয়। মাতা যেন ক্ষেত্র, বীজ হল গর্ভাধান। এই বীজ মাতা তার গর্ভে ধারণ করে বৃক্ষরূপ সন্তান প্রসব করে। এই বৃক্ষকে সযতনে মাতা ও পিতা অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষ সংযুক্ত তত্ত্বাবধানে পোষণ করে তাকে পূর্ণ করে তোলে। তখন ডালপালা ফুলে ফলে সুশোভিত হয়ে জীবনের পূর্ণরূপ সত্যের পরিচয় প্রকাশিত হয়। ফল দান করে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে সমগ্রতার মধ্যে বিলীন হয়ে যায়। মানবজীবন এইরূপেই পূর্ণ উপলব্ধি লাভ করে সমগ্রতার সঙ্গে আপনাকে বিলীন করে দেয়।

১। আত্মবোধের দৃষ্টিতে। ২। অদ্বয় বোধের দৃষ্টিতে। ৩। তত্ত্ব দৃষ্টিতে।

ঋষিদৃষ্টিতে বোধ ও মুক্তির বিশ্লেষণ

ঋষিদের শ্রেষ্ঠ অবদানের অপভ্রংশ শুধু এখন পাওয়া যায়। সেটা ধরে তার মূলে যাওয়া সম্ভব হতে পারে। তাঁরা শুধু মুক্তির কথা বলেননি। তাঁরা আরও অনেক কথাই বলে গেছে। এ যুগে বেশির ভাগ লোকেই ভোগের কথা ছাড়া ভাবে না, বোঝেও না। বর্তমানে যারা শুধু মুক্তি খোঁজে তারাও তার সন্ধান পায় না। জীবিত অবস্থাতেই মুক্তি লাভ করা যায়। স্বর্গ ও শান্তি, আনন্দ ও প্রেম পরিপূর্ণ ভাবে এখানেই লাভ করা যায়। কাজেই দুর্লভ এই মানবজীবনের কোন কিছুকে বর্জন করে কোন কিছু পাওয়া যায় না।

ত্যাগবৈরাগ্য ও মুক্তির তাৎপর্য

ত্যাগবৈরাগ্যের মহিমা যারা প্রচার করে গিয়েছে তাদের অনুভূতির মূলে ছিল জগতের অনিত্যতাবোধ ও তৎপ্রতি মোহ আসক্তি বশত যে অজ্ঞান এবং তার ফলে দুঃখ কষ্ট জরা ব্যাধি মৃত্যু। তারা এসব অসত্য ও অনাত্মবোধে পরিত্যাগ করতে শিক্ষা দিয়ে যায়।

এই দেহেতে এ রকম অবস্থা আসতে পারে যাদের দেহবোধ রূপান্তরিত হয়েছে। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন মতবাদগুলির সঙ্গে কোথায় কোথায় সকলের যোগ আছে সেটা ধরতে না-পারলে দুঃখকষ্টের অবসান সম্ভব নয়।

সব মতপথই ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত, তাদের মধ্যে ব্যবহারিক ভেদ দৃষ্ট হলেও মূলত কোন ভেদ নেই

কোন মতপথের সঙ্গে কোন জীবনেরই বিরোধ থাকার কথা নয়। প্রত্যেকটি মতপথের সঙ্গে সকলে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে কমবেশি যুক্ত আছে। ঈশ্বর যখন সব জায়গাতেই, সবকিছুতেই আছেন সুতরাং তাঁর সঙ্গে সকলেই নিত্য যুক্ত আছে।

অহংকার ত্যাগই হল আসল ত্যাগ, আর সব ত্যাগই হল গৌণ ও অবান্তর

কিছু বাদ দেবারও নেই, কিছু ত্যাগ করারও নেই। ত্যাগ করতে হবে শুধু 'আমার আমি' বোধের ভাবকে। ত্যাগ বললে লোকে শুধু বাইরের বস্তু ত্যাগের কথাই বলে, ভিতরের ত্যাগ তাদের হয় না। 'আমার আমি' বোধ ত্যাগ করতে পারলে হয় ভিতরের ত্যাগ। এই ভিতরের ত্যাগ হলে জনকরাজার মত সমগ্র ভোগ ঐশ্বর্যের মধ্যেও নির্বিকার থাকতে পারা যায়।

অন্তরের ত্যাগ অর্থাৎ 'আমার আমি' এই অহংকার অভিমান ত্যাগ পরিপূর্ণ ভাবে হয় না, যদি ঈশ্বরকে জীবন পূর্ণ সমর্পণ করে না-দেওয়া হয়। এই অন্তরের ত্যাগ না-হলে, বাইরের ত্যাগে ভোগ তৃষ্ণা যায় না। সেইজন্যই সাধু সন্ন্যাসীদের মধ্যে মাঝে মাঝে ভোগের তৃষ্ণা জেগে উঠতে দেখা যায়।

কর্তাবোধে ভোগ ও বন্ধন, অকর্তাবোধে ভক্তি ও মুক্তি

সকলের ভিতরে যা হচ্ছে, দুঃখ কষ্ট আনন্দ তৃপ্তি সবটাই তাঁকে দিতে হবে। তাঁকে ভোগ করতে দিতে হবে। 'আমি কোনটাই হতে চাই না' এই অবস্থাটা হচ্ছে পরাবৈরাগ্য বা সর্বোত্তম বৈরাগ্য।

'কর্তার আমি' থাকবে না এই দেহে, সে-ই থাকবে। 'কর্তার আমি' শূন্য হয়ে ঈশ্বরের আমি থাকবে। অর্থাৎ বোধের আমি হয়ে থাকবে। আমার এই শূন্যবক্ষে পিতামাতা বা সত্তাশক্তির সমগ্র ঐশ্বর্য ভাগে ভাগে দিয়ে আমাকে পূর্ণ করে তারা সাজাচ্ছে।

বৈরাগ্যের লক্ষণ

বুদ্ধি মন কিছুই তো কারও নিজস্ব নয়। শূন্য অবস্থায় দুই-এর মাঝখানে থাকলে কোন কিছুই স্পর্শ করবে না। এ-ই ঠিক পরাবৈরাগ্য।

কারওর কিছু চাইবার দরকার নেই। আপনিই আসবে। কারণ চাইতে গেলেই বিব্রত ও সঙ্কুচিত হতে হয়। একেবারে 'আমার বোধ' ছেড়ে দিয়ে 'তোমার বোধে' পূর্ণতাতে পূর্ণ হয়ে থাকা যায়।

ব্যষ্টি প্রাধান্যের ইচ্ছা ও চেষ্টাই হল অশান্তির কারণ

কোন কিছুকে ব্যক্তিগত স্বার্থে অধিক প্রাধান্য দিলে সেই বৃত্তিগুলি মনের মধ্যে থেকে যায়, তার ফলে কেন্দ্রের থেকে আরও দূরে সরে যেতে হয়। সমষ্টির মধ্যে থেকে ব্যক্তিগত মুক্তি, শান্তি পৃথক করে ধরে রাখা যায় না। তার জন্য বৃথা চেষ্টা করে অধিক বিব্রত হতে হয়।

মুক্তি অপেক্ষা মহামুক্তি শুধু শ্রেয়ই নয়, সর্ব সমাধান তা-ই

কোন কোন যুগে ব্যক্তিগত মুক্তিকে অধিক প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী যুগে মুক্তির আরও উন্নততর সত্যানুভূতি প্রকাশিত হয়েছে। একে মহামুক্তি নামে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। পরিপূর্ণ ভাবে ঈশ্বরে আত্মসমর্পণযোগে তাঁর সত্তা ও শক্তির সঙ্গে নিজেকে অখণ্ডবোধে যুক্ত করে পরিপূর্ণ ঈশ্বরের হয়ে জীবনধারণই হচ্ছে মহামুক্তির বিশেষত্ব। সংসারে নিজে কাজ চালাতে গেলেই ঝামেলা, ঈশ্বরকেই কাজ চালাতে দিতে হয়। অখণ্ড আমির থেকে আলাদা হতে গেলেই মার খেতে হয়।

কাঁচা আমি মুক্তি চায়, পাকা আমি নিত্যপূর্ণ—তাতেই মহামুক্তি

ক্ষুদ্র আমির যতগুলি চাওয়া কোনটাই তার নিজের নয়; ভালটাও নয়, মন্দটাও নয়। 'পূর্ণ আমি'র চাওয়ার ফলে মহামুক্তির পথ সুগম হয়। এই মহামুক্তির সাধনার বিজ্ঞান তথা বিশেষ পদ্ধতি হচ্ছে—জীবনে একেবারে সর্বসমর্পণ করে থাকতে হবে; অর্থাৎ ঈশ্বরীয়বোধে, সমবোধে সবকিছু গ্রহণ করে 'মেনে মানিয়ে চলা'। কোন কিছু চাইবার দরকার নেই। ভগবানকে চাওয়ারও দরকার নেই। ভগবানকে জানবার বা বোঝবারও দরকার নেই। নিজের করে কোন কিছু চাওয়া বা রাখাই চলবে না।

সাক্ষী দ্রষ্টা হয়ে থাকাই মহামুক্তির লক্ষণ

অহংকার অভিমানের ছোট আমির প্রাধান্যকে অনাসক্ত ও উদাসীন ভাবে সম্পূর্ণরূপে পরিহার করে, নিজের ভিতরে যা কিছু সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ ইত্যাদির প্রতি কোন রকম গুরুত্ব না দিয়ে পরিপূর্ণ দ্রষ্টাবোধে একেবারে সাক্ষীচেতা হয়ে সেগুলি শুধু দেখে যাওয়া। কোন কিছু জানবার বোঝবারও প্রয়োজন নেই।

সহজ যোগ কাকে বলে?

জানা-বোঝার বিষয়বস্তুগুলি আসে আর যায়। তাদের কোন স্থিতি নেই। এগুলি ক্ষণস্থায়ী, ভাসমান ও চলমান দৃশ্য (passing show) মাত্র। এগুলির সঙ্গে যুক্ত হলেই সুখ-দুঃখের ভোক্তা হতে হয়। কিন্তু এগুলির প্রতি অনাসক্ত ও উদাসীন থাকলে এগুলি কারওর ভিতরে উদয় হলেও তাকে আর বিব্রত করতে পারে না। এই সহজ যোগটা হল সর্বসাধনতত্ত্ব সার (essence of all)।

সাংখ্যযোগ, জ্ঞানযোগ, রাজযোগ, কর্মযোগ, হটযোগ ও ভক্তিযোগ প্রভৃতির সমতত্ত্বের মৌলিক সূত্র দিয়ে তৈরি হল এই 'সহজ যোগ'। এই উপায়ে সর্বদাই শান্ত ও স্থির থাকা যায়। একেবারে প্রশান্ত অবস্থা। এই অবস্থা হল স্বয়ং ঈশ্বরের, সর্বদাই এক অবস্থা। এই অবস্থা হলে ছোট আমির রূপান্তর হয়ে অখণ্ড পূর্ণ 'বোধসত্তার আমি' অর্থাৎ 'পুরুষোত্তমের আমি' অভিব্যক্ত হয় জীবনে।

'পুরুষোত্তমের আমি'র তাৎপর্য

'পুরুষোত্তমের আমি'র বোধে কোন ভাল-মন্দ বোধ নেই। সর্বদাই সে সমভাব বা একভাবে আপনবোধে বিরাজ করে। তার এই সমভাবের মধ্যে দুই বা বহুভাবের আবির্ভাব ও তিরোভাব, উৎপত্তি ও লয় তার স্বপ্নবিলাস মাত্র (creation of dream, i.e. sameside game of His Self-Consciousness)। সকলেরই যে এই পথটা অবলম্বন করতে হবে তা নয়। যার ভাল লাগবে সেই অনুসরণ করবে শুধু।

সত্যের সত্য পরিচয়

শাস্ত্রে এক জায়গায় লেখা আছে—আমি শূন্যেরও উপরে শূন্য। সেখানে আমিও নেই, তুমিও নেই; ধর্ম নেই, অধর্ম নেই, পুণ্য নেই, পাপ নেই; ভাল নেই, মন্দ নেই; ব্যক্ত অব্যক্ত কিছুই নেই। যা আছে তা নিত্য শাশ্বত বোধময় পূর্ণ-সত্তাই শুধু। এ-ই অখণ্ড ভূমা অদ্বয় অব্যয় অমৃতময় শাশ্বত সনাতন পরমব্রহ্ম পরমাত্মা পরমেশ্বর পুরুষোত্তম ভগবানের পূর্ণাঙ্গ সত্য পরিচয়।

ভূমাবোধের লক্ষণ

অখণ্ড ভূমার সত্যবোধে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই সকল জীবনের পরম লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য প্রত্যেকেই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে এগিয়ে চলছে। সেই পরম লক্ষ্যে পৌঁছলে মাঝখানের মতপথ, সসীমের 'আমি', 'তুমি'র বোধ, ব্যক্তিগত বাহাদুরী, অহংকার অভিমান প্রভৃতি লয় হয়ে যায়।

এই অখণ্ডের মধ্যে জাত হয়ে ও বাস করে তাঁর অনন্ত শক্তির দ্বারাই যথার্থ ভাবে পরিচালিত হয়ে তাঁর আকর্ষণে প্রতিটি জীবনই পুষ্ট হয়ে চলছে।

খণ্ডবোধে ভেদের বাহার, অখণ্ডবোধে ভেদের সমাহার

সকলকে যেখানে যেতে হবে সেখানে ভেদাভেদ কিছুই নেই। এখন যে ভিন্ন ভিন্ন বলে মনে হয় এটা শুধু মতপথের ব্যবধানের জন্য। প্রত্যেকেই যে মনের ভাব অনুযায়ী ঠিক ঠিক চলছে, এটাই শুধু মহাপুরুষরা ধরিয়ে দেন।

পূর্ণতাই সমতা, সমতাই হল সমাধান

মত ও পথ যে-রকমই হোক না কেন, শেষে শুধু একই থাকবে। স্রষ্টা, ভোক্তা, কর্তা বলে আলাদা কিছুই থাকবে না। ছাদে উঠে গেলে সিঁড়িগুলির মূল্য যেমন সমভাবে অনুভূত হয়, সেই রকম সম অবস্থাটাই সকলের কাম্য।

শব্দের পরিচয় শব্দবোধেই হয়, অন্য বোধে নয়

সমবোধের অবস্থাকেই কেউ বলেছে God, কেউ ঈশ্বর, আল্লা, আত্মা, ভগবান প্রভৃতি। আবার ব্যক্তিগত

নামেও অনেকে বলেছে, যেমন—হরি, কৃষ্ণ, রাম প্রভৃতি। শেষ কথা হল যে 'আমার আমি' বোধ একেবারেই থাকবে না।

সত্য এক কিন্তু মতপথ অনন্ত

সকলকেই যে এক রাস্তা ধরে চলতে হবে তা নয়। যে যে-মতপথ ধরেই চলুক এক তত্ত্বেই এবং এক সত্যেই পৌঁছাবে। হৃদয় ধরেই কেউ এগিয়ে যাক বা মাথা ধরে এগিয়ে যাক অথবা এ দুটো একত্র ধরে কিংবা পা দুটো ধরে এগিয়ে যাক তাতে কিছু এসে যায় না। কেউ যেন হতাশ না হয়। প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন ভাব দিয়ে গড়া। প্রত্যেকেই এগিয়ে চলেছে। কেউ ভুল নয়।

অহংকারের উদয়ে মিথ্যার উদয়—অহংকার লয়ে মিথ্যার লয়, সত্যের জয়

আসল কথাটা সকলের মনে রাখতে হবে যে 'অহংকারের আমি'টা থাকলে চলবে না। থাকবে শুধু মা, জানবে শুধু মা। ওই অবস্থায় গেলে জন্মমৃত্যুও থাকবে না। মৃত্যুরও মৃত্যু হয়ে যাবে। থাকবে শুধু দিব্যজীবন ঈশ্বরের আমি। আর তাঁর শক্তিরূপে মাতা তুমি। তারপরে অভেদ সেই 'পূর্ণ আমি', যার কোন রূপ নেই, নাম নেই, বর্ণ নেই, লিঙ্গ নেই; আছে শুধু 'অস্তিমাত্র সচ্চিদানন্দঘন পূর্ণসত্তা।' তখন পিতৃসম্পদ ও মাতৃসম্পদ যা-দিয়ে বর্তমানের আমি গড়া তা সমান হয়ে যাবে, equilibrium stage-এ আসবে, অর্থাৎ total consummation।

সমানে মুক্তি ও ভগবান—অসমানে ভোগবন্ধন, শয়তান

'সমত্বের আমি'বোধে প্রতিষ্ঠিত হলে তখনই মুক্তির রাজ্যে প্রবেশ করা যায়। এই অবস্থার থেকেও সাধকদের অনেক সময় পতন হতে দেখা যায়, সামান্যতম অহংকার অভিমানের বীজ বিদ্যমান থাকলে। তখন আবার দুরবস্থা শুরু হয়, দুর্ভোগ শুরু হয়।

'যারা বলে সদাই আমার আমার
সংসারেতে সর্বক্ষেত্রে খায় তারা মার
এমন করে দুঃখ পেয়ে মরে অহংকার
পুনর্জীবিত হয়ে সে বলে সবই তোমার।'

অহংকারের মাধ্যমে শাস্ত্র ব্যাখ্যা হয়, অহংকার নাশে স্বানুভূতির প্রকাশ হয়

সাধকদের মধ্যে যখন 'আমার আমি'র ব্যবহার বেশি বেড়ে যায় তখন তারা শাস্ত্রের বাক্যের উপরই বেশি গুরুত্ব দেয় এবং নিজ মতপথ সমর্থনের জন্য শাস্ত্রের নজিরই বেশি স্থাপন করে।

সর্বপ্রকার যোগ সাধনার পরিণামে মনের শোধন, মনোনাশ, মনোলয় হয়—ফলে ঈশ্বর-আত্ম-ব্রহ্মবোধে প্রতিষ্ঠিত হয়

যারা নাম করে, নামের শক্তি তাদের অহংকার অভিমানকে গ্রাস করে। যারা ভক্তি ভরে ভজন করে, আস্তে আস্তে তাদের অহংকারটা 'পূর্ণ আমি'র সত্তায় মিশে যায়। যারা ভক্তি ভাবে ধ্যান করে তাদের 'অহংকারের আমি'টা 'পূর্ণ আমি'র মধ্যে ডুবে যায়। যারা জ্ঞান বিচার করে তাদেরও অবশেষে এমন অবস্থা হয় যে 'দেহাত্মবোধের

আমি'টা লোপ পেয়ে যায়। যোগের পথেও মনের নাশ হয়ে যায়, আর কিছুই থাকে না। মন তার আহার না-পেয়ে বোধের ঘরে মিশে যায়।

মতবাদের ভেদ থাকলেও সত্যানুভূতি ভেদাতীত

অনেক মতপথ রয়েছে এবং কত যে মতপথ হারিয়ে গেছে তার ঠিকানা নেই। অনেকে ভাবে অপরে ঠিক পথে চলেছে, তার নিজের পথটা ভুল। আবার অনেকে ভাবে তার নিজের পথটাই ঠিক, অপরে ভুল পথে চলেছে। আসলে ভুল কোনটাই নয়। সবাই নিজের ভাব অনুযায়ী ঠিক পথে চলেছে। প্রতিটি ব্যষ্টিজীবনই অখণ্ড সত্তা ও শক্তির অন্তর্গত। সেই অখণ্ড শক্তির দ্বারাই সকলে পরিচালিত। জীবনমাত্রই তাঁর সন্তান, তাঁর অংশ বা প্রকাশ।

মনেতেই অজ্ঞানের বিকার হয়, বোধস্বরূপ আত্মা সর্ববিকারমুক্ত

আধ্যাত্মিক পথে ভুলের কোন স্থান নেই, পাপের কোন স্থান নেই। পাপপুণ্য, ভালমন্দ সব ব্যবহারিক জগতে মনের বিষয়রূপে মানুষের মধ্যে আছে। ঈশ্বরের মধ্যে নেই।

ব্যবহারিক জীবনের সর্বপ্রকার ভেদ পার্থক্যের মূলে একই বোধাত্মা যা পরমসিদ্ধিরূপে জীবনে প্রকাশ পায়

ব্যবহারিক জীবনে প্রত্যেকের সঙ্গে গুণ, প্রকৃতি ও আচরণের মধ্যে যে পার্থক্য দেখা যায় তার মূলে রয়েছে সেই পূর্ণশক্তির এবং সত্তার উদ্দেশ্য ও ইচ্ছা। প্রতিটি জীবনকে নিজের অধীনে রেখে, তত্ত্বাবধান করে, পূর্ণ করে নেবার দায়িত্ব তাঁর নিজের। ব্যক্তিগত মতপথের উপর তার প্রাধান্য যখন এসে পড়ে তখন স্থূলদেহের উপরে তার অধিক লক্ষণ প্রকাশ পায়।

মানুষের অধীন নয় ঈশ্বর, ঈশ্বরের অধীন মানুষ এবং সর্বসৃষ্টি

ঈশ্বরের ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র ও স্বাধীন। ঈশ্বর মানুষের ইচ্ছা, উদ্দেশ্য, যুক্তি ও বিচারের অধীন নয়। মানুষ যেটাকে ভুল বা পাপ বলে গ্রহণ করে ঈশ্বরের কাছে সেরূপ নয়।

যোগ্যতা অনুসারে সাধনার পথ সবার ভিন্ন হলেও সমাপ্তি সবার পরম ঐক্যে

দেহ মনের গঠন অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন মতপথ অবলম্বন করে এগিয়ে গেলেও পৌঁছায় সকলে একই লক্ষ্যে। সেখানে মনের বিকার, ভেদজ্ঞান, অহংকার নেই।

সকলেই ঠিক, কারণ সকলেই এক সত্যের অন্তর্গত, এক সত্যের দ্বারা অন্তরে বাইরে অধিষ্ঠিত। কাউকে জোর করে মতান্তরিত করা উচিত নয়। মতপথ সব একতত্ত্বেরই ব্যবহার বিজ্ঞান। দেহেন্দ্রিয়ের গঠন, রুচি, গুণ, প্রকৃতি ও সামর্থ্য ব্যবহারের উপযোগী করে সাধকগণ ভিন্ন ভিন্ন মতপথ অবলম্বন করে চলে। পরিণামে মতপথের মূলে পৌঁছে যায়।

সমর্পণ যেখানে যে-ভাবেই হোক, নিঃশর্ত হলেই পূর্ণ ফলপ্রদ হয়

আত্মসমর্পণের বিজ্ঞানেও নানারকম মতবাদ আছে। কেউ বলে রূপের মধ্যে আত্মসমর্পণ করতে হয়, কেউ বলে শক্তির মধ্যে, কেউ বলে জ্ঞানের মধ্যে, কেউ বলে কর্মের মধ্যে, কেউ বলে নামের মধ্যে, কেউ বলে ভাবের

মধ্যে, কেউ বলে আনন্দের মধ্যে, কেউ বলে প্রেমের মধ্যে আবার কেউ বলে সমষ্টির মধ্যে আত্মসমর্পণ করতে হবে। দেখতে হবে কার মধ্যে কী ভাব ফুটে ওঠে।

অহংকারের আমির উদয়াস্ত আছে কিন্তু অহংদেবের আমি স্বতঃসিদ্ধ, স্বতঃস্ফূর্ত

'ছোট আমি'র পরিসমাপ্তি পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। 'ছোট আমি'র শেষ আছে কিন্তু যার থেকে এই 'আমি' উঠছে তার কিন্তু শেষ নেই। মৃত্যুটা শেষ নয়, এটা শুধু পরিবর্তনের মধ্যে বিশ্রাম মাত্র এবং দেহপোশাক পরিবর্তন মাত্র। 'আমি'রূপ অভিব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সেই পূর্ণের মধ্যে উঠছে, আবার লয় হয়ে যাচ্ছে সেই পূর্ণের মধ্যেই।

পূর্ণের আমির পরিচয়

এই অনন্ত অসীম অখণ্ড 'পূর্ণ আমি' বা সত্তার মধ্যে, সত্তার উদ্দেশ্যেই সকলের জীবন। এই 'পূর্ণ আমি'র সন্ধান পেলে, 'আমার আমি' বোধ আর থাকে না। কারণ 'পূর্ণ আমি'র কোন দাবি-দাওয়া থাকে না। সে হল 'সত্তাস্ফূর্তি প্রদাতা' স্বয়ংপূর্ণ, স্বয়ংপ্রকাশ, অদ্বয় অব্যয় শাশ্বত নিত্য অমৃতময়।

'পূর্ণ আমি' এমন ভাবে নিজেকে সবকিছুর মধ্যে প্রকাশ করে যে, পৃথক ভাবে ব্যক্ত হয়েও সে পৃথক নয়। কখনও কখনও নিজেকে পৃথক বলে দাবি করে বটে কিন্তু সেটা তাঁর নিজের সঙ্গে নিজের লুকোচুরি খেলা। সেইজন্য নিজেকে নিজে খুঁজে বেড়ায়, আবার খুঁজে পায়। নিজের হয়ে নিজে কর্ম করে, আবার নিজেই তার ফল গ্রহণ করে, ভোগ করে। কোথাও কোন আধারে সে কর্তা ভোক্তা সাজে আসক্ত হয়ে জীবন যাপন করে; আবার কোথাও বা অকর্তা, অভোক্তা, অনাসক্ত, উদাসীন হয়ে জীবন যাপন করে।

পূর্ণ আমির সেবক হয়ে চলাটাও আত্মসমর্পণের অন্তর্ভূক্ত বিজ্ঞান

কেউ কেউ বলে 'তাঁর আমি' হয়ে থাকা চলে। তাঁকে সবটা দিয়ে অর্থাৎ অন্তরে বাইরে তাঁকে মেনে, তাঁর হয়ে থাকা যায়। এটাও এক ধরনের আত্মসমর্পণ। 'অহংকারের আমি'টা 'পূর্ণ আমি'র অধীন যেন হয়ে যায়, অর্থাৎ 'পূর্ণ আমি'র বোধে নিরন্তর সেবাপরায়ণ হয়ে চলে সেই চেষ্টাই সকলের করা উচিত।

যা-কিছু ঘটে চলেছে সব কারণ-কার্য, কার্য-কারণ সম্বন্ধ ধরেই

পতন কারওর হতে পারে না। ভ্রষ্ট বা ভ্রান্তি কথা 'পূর্ণ আমি'র বোধে অচল। ভ্রষ্ট কেউ হতে পারে না অতীতের সমস্ত কর্ম যা ভুল বলে ভাবা হয়েছে এতদিন, তার ধারণা পালটে যাবে একদিন। প্রত্যেকের বর্তমান অবস্থায় আসতে অতীতের ভ্রান্তি বা পাপ সাহায্যই করেছে। এই ভাবে চিন্তা করলে পাপপুণ্য বলে কোন কথা আর আসবে না। তখন আত্মপ্রত্যয় এসে যাবে। কেউ কোন মতেই ভুল পথে চলছে না। যা-কিছু হয়েছে, সব এগিয়ে দেবার জন্যই। ভুল বা পাপ বলে কিছু নেই, এ সব অস্ত্র হিসাবে প্রয়োজন হয়।

ঋষিদের আশ্রমে যে-সব শিষ্য থাকত, ঋষিরা তাদের সমস্ত অবস্থা ও ভাবের সঙ্গে আস্তে আস্তে পরিচয় করিয়ে দিতেন। ফলে তারা সকলেই পরস্পর পরস্পরকে গ্রহণ করত। পরস্পরের মধ্যে মতবাদ আদান প্রদান করে সবাই এগিয়ে যেত এবং সমবোধে প্রতিষ্ঠিত হত।

ঋষিদের অনুশাসন মেনেই আশ্রমবাসীগণ তাদের শিক্ষা ও সাধনলক্ষ্যে পৌঁছাত

সত্যময়ী মায়ের বক্ষে তাঁর প্রতিটি প্রকাশসন্তান সত্য দিয়েই গড়া। প্রত্যেকেই সত্য, সত্যের মধ্যেই আছে

সত্যের দ্বারাই পরিপুষ্ট হয়ে চলছে; অর্থাৎ বোধসাগরে জাত প্রতিটি ব্যষ্টিজীবন বোধের দ্বারাই পুষ্ট হয়ে অখণ্ডবোধে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ-ই সত্যানুভূতির চরমতম অবস্থা।

অখণ্ডের সঙ্গে নিত্যযুক্ত ভাবনার দ্বারা মনের দিব্যরূপায়ণ

সকলে অনন্ত শক্তির মধ্যেই আছে। এই বিশ্বাসটা ধরে রাখতে পারলে কারওর আর মৃত্যুভয় থাকবে না। অখণ্ড জ্ঞানের বোধে থাকলে, অজ্ঞান এসে আর কাবু করতে পারে না। অখণ্ড আনন্দে, অখণ্ড প্রেমের মধ্যে সবাই আছে। কারওরই কোন অভাব নেই। এই কথা বারবার স্মরণ করলে সকলের ভিতর থেকে আপনিই আনন্দ, প্রেম, শক্তি সবকিছু ফুটে উঠবে।

পূর্ণতার বুকেই প্রত্যেকে রয়েছে। অনন্ত অসীম অখণ্ডজ্ঞান আনন্দ প্রেম সবটাই সকলের মধ্যে পূর্ণ ভাবেই রয়েছে এবং সবাই এই পূর্ণতার মধ্যেই আছে। একে স্মরণ করা অর্থে আত্মধ্যান, ঈশ্বরভজন বা মনন, ইষ্টনিষ্ঠা, ব্রহ্মসাধন বলা হয়।

মাঝখানে 'আমার আমি' বোধে থেকে লোকে উল্টাপাল্টা ভেবে এই অনন্ত শক্তি আনন্দ হতে দূরে সরে থাকে।

পূর্ণের আমিবোধে থাকার লক্ষণ

সকলেই পূর্ণ; কিন্তু 'আমার আমি' বোধে নয়। 'আমার আমি' বোধ একেবারে থাকবে না। তার জায়গায় যা থাকবে তা এখন ভাবা যায় না। এটা পরে আপনিই হয়ে যাবে। সকলে পূর্ণের মধ্যেই আছে, পূর্ণের ঘরেই আছে ভাবতে ভাবতে 'আমার আমি'টা অর্থাৎ অহংকার বিলয় হয়ে যাবে।

আত্মপ্রত্যয়ের মাধ্যমেই আত্মবোধে প্রতিষ্ঠা সিদ্ধ হয়, নতুবা নয়

নিজেদের ভিতরে আত্মপ্রত্যয় আনা দরকার। প্রত্যেকের মধ্যেই বজ্রের মত শক্তি রয়েছে। সামান্য একটু মনের বৃত্তির কাছে কারও বশ্যতা স্বীকার করা উচিত নয়। সকলের পরিচয় Oneness অর্থাৎ অখণ্ড এক। কাজেই অচঞ্চল, অবিব্রত থাকা উচিত প্রত্যেককেই। তাহলেই অনন্ত শক্তি প্রকাশিত হবে। [৯।৮।৬৮]

সংসারে মানুষ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি নামক দু'টি পৃথক ভাবধারাতে চলে

সংসারে মানুষ দু'টি ভাবধারাতে চলে। এই ভাবধারা মানুষের জন্মগত প্রকৃতি, গুণ, শক্তি ও বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয়।

প্রতিটি মানুষই কতগুলি সংস্কারের ঘনীভূত জীবন্ত প্রকাশ। এই সংস্কারগুলি হল অতীত অতীত জন্মের চিন্তা, কর্ম, কর্মফলের অভিজ্ঞতা, ভোগেচ্ছা, কাম, সুখ, দুঃখ, স্বার্থ, মান ও অহংকারের পুঞ্জীভূত অতি সূক্ষ্ম বৃত্তি। এই বৃত্তিগুলি দ্বারাই প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির ধারা তৈরি হয়। সংসারী মানুষ সহজে তা অতিক্রম করতে পারে না।

এই সংস্কারসমূহ মানুষের জন্মজন্মান্তরের বিশেষ কারণ হয়। প্রতিজন্মেই সংস্কারগুলির কিছু-না-কিছু রূপান্তর, পরিবর্ধন এবং শোধন হতে থাকে। এই সংস্কারগুলির ধারাবাহিক অভিব্যক্তি বা প্রকাশ মানুষের জীবনে তার শক্তি, গুণ ও প্রকৃতি যথাযথ পর্যায়ক্রম এবং মানকে প্রকাশ করে। এই প্রকাশমানের মধ্যে মানুষের শ্রদ্ধা, ভক্তি ও বিশ্বাসের তারতম্য বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয়।

সংসারে মানুষের মধ্যে দুই শ্রেণী আছে যথা, আস্তিক্য বুদ্ধিযুক্ত ঈশ্বরবিশ্বাসী এবং নাস্তিক্য বুদ্ধিযুক্ত ঈশ্বরবিরোধী

মানুষের প্রকৃতিকে সাধারণত দুইটি ভাগে বিভক্ত করা হয়ে থাকে। একদল মানুষের প্রকৃতি, গুণ ও স্বভাব আস্তিক্য-বুদ্ধিপ্রধান। আস্তিক্য বুদ্ধি অর্থ ঈশ্বরবিশ্বাসী হয়ে মহৎ বা ঈশ্বরকে মেনে তার আদর্শ অনুযায়ী চলা। এই মতের বশবর্তী যারা তাদের মধ্যে বেশির ভাগই ধর্মানুরাগী, শ্রদ্ধা, ভক্তি, বিশ্বাসের অনুশীলনকারী, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের দ্বারা নৈতিক মানের উন্নতি প্রয়াসী এবং সত্যানুভূতি ও মুক্তিলাভের জন্য ঐকান্তিক যত্নশীল।

দ্বিতীয় আর একদল মানুষের প্রকৃতি জন্মগত সংস্কার অনুযায়ী নাস্তিক্য বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত। নাস্তিক্য বুদ্ধি অর্থ ঈশ্বরে অবিশ্বাসী হয়ে, মহৎ বা শ্রেষ্ঠকে, ঈশ্বরকে না-মেনে দম্ভ, দর্প, অভিমান অহংকারের বশবর্তী হয়ে কাম-ভোগপরায়ণ, ঘোর কুটিল, স্বার্থপর জীবন, দেহগত ভোগসুখের জন্য স্থূলবুদ্ধি অজ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত হয়ে চলে।

নাস্তিক্য বুদ্ধির বৈশিষ্ট্য

নাস্তিক্য বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হলে তারা ঈশ্বরবিদ্বেষী, জন্মান্তরবাদে অবিশ্বাসী, অহংকার-অভিমানী স্বার্থান্বেষী এবং ভোগসুখ অনুরূপ আদর্শে বিশ্বাসী হয়ে সংসারে প্রাধান্য পেতে চায়। এদের ধর্মবিশ্বাস নেই, শুচিতাবোধ নেই। সত্যকে বিকৃত করে, মিথ্যাকে আশ্রয় করে, অধর্ম পথে চলে এরা বাহাদুরী পেতে চায়।

অল্প কিছু সংখ্যক লোক আস্তিক্য ও নাস্তিক্য ভাবের মাঝামাঝি একটা মিশ্রিত অবস্থায় জীবন যাপন করে। তাদের ভোগ স্বার্থ পুরোমাত্রায় আছে আবার ঈশ্বরভীতি, ধর্মভীতিও কিছু আছে। স্বার্থসিদ্ধির জন্য তারা কখনও ঈশ্বরকে মানে আবার স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হলে ঈশ্বরকে অবিশ্বাস করে ও তাঁর নিন্দা করে।

নাস্তিক্য বুদ্ধির ব্যবহারিক লক্ষণ

অধিকাংশ মানুষই অল্প শিক্ষা লাভ করার ফলে নাস্তিক্য বুদ্ধির দলভুক্ত। নাস্তিক্য বুদ্ধি 'না'-এর ব্যবহার বেশি করে। এখানে 'না' অর্থ অভাব ও অপূর্ণতা। সেজন্য তাদের মধ্যে শ্রদ্ধা, ভক্তি, বিশ্বাসের পরিবর্তে অশ্রদ্ধা, অভক্তি ও অবিশ্বাস বেশি। জ্ঞানের পরিবর্তে অজ্ঞানের প্রভাব বেশি। অজ্ঞান হল অপূর্ণ জ্ঞান। জ্ঞানের অভাব অর্থ জ্ঞানের পূর্বাবস্থা।

আস্তিক্য বুদ্ধির ব্যবহারিক লক্ষণ

আস্তিক্য বুদ্ধির অধিকারীদের মধ্যে আস্তিক্য বা 'হ্যাঁ'-এর ব্যবহার বেশি। 'অ'-এর ব্যবহার ততোধিক নয়। সত্যের আদর্শের প্রতি এদের শ্রদ্ধা, ভক্তি, বিশ্বাস অধিক। দুই দলের মধ্যে ব্যবহারিক জগতে মতবিরোধ ও দ্বন্দ্ব প্রায়ই হয়।

শুদ্ধসত্ত্বগুণী সাধকের পরিচয়

উপরোক্ত দুই দলের উপরে আর এক বিশেষ শ্রেণীর লোক আছেন যাঁদের সত্যের সাধক বলা হয়। তাঁরা উভয় মতবাদের উর্ধ্বে এই দুই-এর যথার্থ জ্ঞান ও বোধের আলোর মধ্যে থাকেন। এই আলো হচ্ছে সমত্বজ্ঞান বা প্রজ্ঞাস্থিতি। এঁরা মহাপ্রাণের সঙ্গে সংযুক্ত।

প্রকৃতি শক্তির আবর্তন ও বিবর্তনের পরিচয়

প্রকৃতির রাজ্যে দু'টি গতি আছে। একটি ঊর্ধ্বগতি— প্রাণের সম্প্রসারণের গতি, জ্ঞানবিজ্ঞানের অভিনিবেশ দ্বারা স্বভাববোধের অভিব্যক্তি, অমৃতের দিকে, ভূমার দিকে যে গতি।

দ্বিতীয়টি নিম্নগতি— প্রাণের সংকোচনের গতি, দেহগত ভোগসুখের প্রতি আসক্তি, জড়বস্তু ও স্থূলদেহের প্রীতি, সসীমবোধে ব্রতী।

নাস্তিক্য বুদ্ধির ব্যবহারের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ

নাস্তিক্য বুদ্ধির মধ্যে 'অ'-এর ব্যবহার বেশি হতে দেখা যায়, যেমন—অজ্ঞান, অভাব, অসার, অকর্ম, অধর্ম, অসুর, অশ্রদ্ধা, অভক্তি, অবিশ্বাস, অন্যায়, অসুখ, অশান্তি, অনাত্মীয়, অহংকার, অভিমান, অপূর্ণতা।

আস্তিক্য বুদ্ধির ব্যবহারের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ

আস্তিক্য বুদ্ধির মধ্যে 'অ'টাকে বাদ দিলে যা হয় তা নাস্তিক্য বুদ্ধির ঠিক বিপরীত অর্থ; যেমন—জ্ঞান, ভাব, সার, কর্ম, ধর্ম, সুর, শ্রদ্ধা, ভক্তি, বিশ্বাস, ন্যায়, সুখ, শান্তি, আত্মীয়, নিরহঙ্কার, নিরভিমান, পূর্ণতা প্রভৃতি।

নাস্তিক্য বুদ্ধি ও আস্তিক্য বুদ্ধির যথার্থ বোধ হলে তবে সমান ভাবে ব্যবহার করার যোগ্যতা আসে; তা না-হলে একে অপরের দ্বারা বিব্রত হয়।

সর্ববোধের মাধ্যমেই স্ববিরুদ্ধ ভাববোধের সমাধান সিদ্ধ হয়

সমবোধে উভয়কে সমানভাবে ব্যবহার করার যোগ্যতা এলে ঈশ্বরের সঙ্গে পূর্ণ ভাবে যুক্ত হওয়া সম্ভব। নতুবা যে-কোন একটা দ্বারা পরিচালিত জীবন ঈশ্বরীয় বোধে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না, ঈশ্বরের সন্ধানও পায় না। ধর্ম অধর্মের দ্বারা প্রপীড়িত হয়। এইরূপ অধর্ম আবার ধর্মের অভাবে প্রসারতা লাভ করতে পারে না। এইরূপে পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে দ্বন্দ্ব ও বিরোধিতা করে জীবনের গতিকে ব্যাহত করে।

কোনকিছুর প্রতি অতিরিক্ত আসক্তি বা গোঁড়ামি সত্য উপলব্ধির সহায়ক নয়, বরং পরিপন্থী। এই উভয়ের ঊর্ধ্বে ঈশ্বর স্বয়ং সমভাবে প্রতিষ্ঠিত।

প্রজ্ঞাস্থিতি ও স্থিতপ্রজ্ঞের ব্যবহারিক লক্ষণ

বোধের সমতা অর্থাৎ ধর্মে-অধর্মে, জ্ঞানে-অজ্ঞানে, পাপে-পুণ্যে, সুখে-দুঃখে, জয়ে-পরাজয়ে, লাভে-ক্ষতিতে, ভালয়-মন্দে, আনন্দে-নিরানন্দে সমভাবাপন্ন ও সমত্ববোধে প্রতিষ্ঠিত হতে গেলে সমত্বের সাধনাই সর্বোত্তম এবং এটাই একান্ত প্রয়োজন। অবশ্য যদি উভয়ের প্রতি উদাসীন থাকা সম্ভব হয় তা সমত্বের সর্বোত্তম গতি এনে দেয়। তখনই প্রজ্ঞাস্থিতি হয়। স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণই সমবোধ, সমজ্ঞান, সমদর্শন, সমব্যবহার।

কর্মবন্ধন হতে মুক্তির উপায়

কর্ম করে কর্মফলের ঊর্ধ্বে থাকতে বলা হয়েছে। কর্মফলে আসক্ত হলে চলে না। কর্মফলের জন্য কর্ম করলেও চলে না, আবার নৈষ্কর্ম্যের প্রতি আসক্তি থাকলেও চলে না। কর্মের ফলটি নিজে ব্যবহার না-করে ঈশ্বরকে নিবেদন করে দিলে শুভাশুভ কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়।

ইষ্টের সঙ্গে যোগযুক্ত থাকার বিশেষ উপায়

কর্মের ফল ভগবতী মাতাকে সমর্পণ করে দিলে, তাঁর সঙ্গে পরিপূর্ণ ভাবে যুক্ত হওয়া সম্ভব হয়। কিন্তু ফলাকাঙ্ক্ষা, কর্তৃত্ব অভিমান থাকলে এবং কর্মের ফল নিজের নামে রাখলে ঈশ্বরের বা ভগবতীমাতার সঙ্গে পূর্ণ পরিচয় বা যোগযুক্ত হওয়া সম্ভব হয় না।

আস্তিক্য বুদ্ধির উৎকর্ষ লাভের উপায়

আস্তিক্য বুদ্ধির প্রাধান্যে অর্থাৎ শ্রদ্ধা, ভক্তি, বিশ্বাস সহকারে ঈশ্বরের অস্তিত্বে ও তাঁর প্রকাশে নিঃসন্দেহ হয়ে জীবনের সমস্ত ব্যবহার, চিন্তা ও কর্মকে এবং তার ফলকে ঈশ্বরে সমর্পণ করে দিলে অতি অল্পকালের মধ্যে জীবনের গতি নাস্তিক্য বুদ্ধি থেকে আস্তিক্য বুদ্ধির দিকে ক্রমশ এগিয়ে চলে।

আস্তিক্য বুদ্ধির পরিণামে আসে সমত্ববোধে বা আত্মবোধে প্রতিষ্ঠা

আস্তিক্য বুদ্ধির দিকে ক্রমশ এগিয়ে গেলে অজ্ঞান থেকে জ্ঞান, অসত্য থেকে সত্য, অসুর থেকে সুর, অভাব থেকে ভাব, অধর্ম থেকে ধর্ম, অশ্রদ্ধা-অভক্তি-অবিশ্বাস থেকে শ্রদ্ধা-ভক্তি-বিশ্বাস, কামভোগ থেকে ত্যাগ-বৈরাগ্য এবং দেহপ্রীতি থেকে ঈশ্বরপ্রীতির দিকে, অর্থাৎ অখণ্ড আত্মপ্রীতির দিকে, মৃত্যু থেকে অমৃতের দিকে, সীমা থেকে ভূমার দিকে, নানাত্ব বহুত্ব থেকে অখণ্ড একের দিকে পরিণতি আসে। তারপরে পরস্পর স্ববিরুদ্ধ, ভাবগুলি সমান হয়ে যায়, স্বভাববোধে আসে এবং দুই পাশে তখন সে-সব পড়ে থাকে। এ-ই শাশ্বত অমৃতের পথ। এই সহজ সরল মধ্যম পন্থাই হল ঈশ্বরীয় পন্থা। দুই পাশের পরস্পরবিরোধী ভাবগুলি তখন আর প্রতিকূলে নয়, অনুকূলে এসে যায়।

আকাশচারী পাখির সঙ্গে ঈশ্বরে সমর্পিত জীবনের তুলনামূলক বিশ্লেষণ

ঈশ্বরে সমর্পিত জীবনে পাখির মত দু'পাশের আস্তিক্য বুদ্ধি ও নাস্তিক্য বুদ্ধি হল দু'টি ডানা, জ্ঞান ও ভক্তির প্রতীক যেন পরস্পর স্বভাববিরোধী ভাবগুলির প্রতিরূপ, গোটান পাখাদু'টি হল কর্ম ও যোগ্যতার প্রতীক এবং তার নিবেদিত ও সমর্পিত কর্মফল পাখির লেজের মত পিছনে পড়ে থাকে। সে তখন সন্মুখে অমৃতময় ভূমানন্দলোকে, অনন্ত অসীম অধ্যাত্মগগনে এবং চিদানন্দসাগরে চিরমুক্ত নিত্য শাশ্বত অখণ্ডের মধ্যে প্রেমানন্দে চরে বেড়ায়।

ক্রমবিবর্তনের বিজ্ঞান অনুসারে জীবনের অধ্যাত্ম বিকাশের পরিচয় মেলে

জীবনের প্রথমে সকলেরই 'না' এবং 'অ'-এর প্রাধান্য বেশি থাকে, অর্থাৎ নাস্তিক্য বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হয়। তারপরে পারিপার্শ্বিক চাপ, প্রাকৃতিক ও দৈববিপর্যয়ে এবং নানাবিধ পরিবর্তনের মধ্যে জীবনের পরিক্রমা পর্যায়ের পর পর্যায়ে কখনও দ্রুত এবং কখনও মন্থর গতিতে এগিয়ে চলে; তখন দেখা যায় অভাব, অজ্ঞান ও অধর্মের ক্রমবিকাশ যথাক্রমে ভাব, জ্ঞান ও ধর্মের দিকে জীবনকে চালিত করে। এই ভাবে পূর্বাবস্থা থেকে পরবর্তী অবস্থায় ক্রমবিকাশের ধারা অনুযায়ী মানুষ এগিয়ে যায়।

সব রকম গোঁড়ামি মুক্তিপথের পরিপন্থী

ধর্মের জ্ঞানভাব ও অধিক আচার নিয়মের জটিলতার মধ্যে বেশিদূর এগোন যায় না। ফলে, একটা গোঁড়ামি, দলগত, সম্প্রদায়গত ও মতপথগত সীমার অধীনেই অনেকেই থেকে যায়। এটা মুক্তির পথের পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায়।

পরস্পরবিরোধী ভাব ও অবস্থার মধ্যে স্থিতপ্রজ্ঞ হয়ে থাকার বিশেষ উপায়

ধর্মের গোঁড়ামিকে অতিক্রম করে ধর্মাধর্মের ঊর্ধ্বে এই দু'টোর মাঝপথে সমভাবে চলার সুবিধা ও যোগ্যতার জন্য ভগবানের আশ্রয়ে থেকে ভগবানকে স্মরণ করে চলার কথা বলা হয়। তাহলে ধর্মাধর্ম পরস্পরবিরোধী ভাবগুলির মধ্যে সমানবোধে স্থিতপ্রজ্ঞ অবস্থায় থাকা যায়।

মহাপ্রাণরূপী ঈশ্বরেতে মনোনিবেশ করার ফলে স্ববিরুদ্ধ অবস্থাগুলি আর থাকে না

ভগবানের শরণ নেওয়া মানে মহাপ্রাণস্বরূপের মধ্যে মনস্বরূপকে নিমজ্জিত করা। কারণ, মহাপ্রাণ নিত্য, অদ্বয়, অব্যয়, অমৃতময়, শাশ্বত বস্তু। কিন্তু মন অনিত্য, বিকারী ও পরিণামী।

ভগবানের নাম ও প্রাণ সমার্থবোধক। সুতরাং মহাপ্রাণের সঙ্গে অর্থাৎ ভগবৎ নামের সঙ্গে মন সংযুক্ত হয়ে গেলে মনের বিকার ও পরিণাম বন্ধ হয়ে যায়। তখন মন প্রশান্ত, স্থির হয়ে অ-মন আখ্যা প্রাপ্ত হয়। এই প্রশান্ত স্থির মনে মহাপ্রাণের স্বরূপ নির্বিকারে তার স্বভাবমহিমা সমানবোধে অভিব্যক্ত হয়।

সর্ববস্তুকেই ঈশ্বরের নামে 'মেনে মানিয়ে চললে' স্বাত্মবোধে প্রতিষ্ঠা হয়

সর্ববস্তুর মধ্যেই যে মহাপ্রাণ আছে তা ঈশ্বরীয় কোন নাম যুক্ত করে মনের মধ্যে ধরতে হয় ও তাঁর নামে সবকিছু ব্যবহার করতে হয়। অত্যন্ত হেয় কোন বস্তু, ব্যক্তি বা কর্মকেও বাদ দিলে চলে না। অর্থাৎ জীবনে 'আমার আমি' বোধের ব্যবহার না-করে সেখানে ঈশ্বরের নাম যুক্ত করে 'তুমি তোমার' বোধের ব্যবহার করতে হয়। জীবনের সর্ব আচরণে সচেতনে 'তুমি তোমার' বোধের ব্যবহার হলে মনের প্রাধান্য কমে প্রাণের প্রাধান্য বেড়ে যায়। যেমন বসন্ত রোগের বীজ হতে 'টিকা' তৈরি হয় এবং সেটা দিয়েই আবার বসন্তের প্রতিষেধ হয়।

অখণ্ড সত্যের ব্যবহার দ্বারাই অখণ্ড সত্যের অনুভূতি সিদ্ধ হয়

সত্যের ব্যবহার সত্যকে দিয়েই হয়। তার জন্য সত্যের আশ্রয়ে সত্যকে মেনে, সত্যের সাহায্যে সত্যময় হওয়ার প্রচেষ্টা করতে হয়। তার অন্তরায়গুলিতে সত্য অরোপিত করে বা সত্যনামের বোধ যুক্ত করে ব্যবহার করতে হয়। তাহলে অখণ্ড সত্যের পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়।

নাস্তিক্যবাদ কী?

যেটা ব্যবহার করে সত্য বা ঈশ্বরের বিরোধিতা করা হয় তা-ই সত্যবিরোধী, অনীশ্বরীয়, তা-ই নাস্তিক্যবাদ। এটা জীবনে কখনও বৃহত্তর কল্যাণে বা উপকারে আসে না, বরং সর্বতোভাবে তার পরিপন্থী হয় এবং বিরোধিতা করে। কারণ নাস্তিক্যবাদ ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী নয়। কাজেই নাস্তিক্যবাদ দ্বারা নাস্তিকতাকে অতিক্রম করা যায় না, আর আস্তিকতাকে অতিক্রম করার প্রশ্নই ওঠে না।

না-মানলে কখওই জানা যায় না এবং না-জানলে তার ব্যবহারও যথার্থ ভাবে করা যায় না। নাস্তিক্যবাদের এই হল বিশেষ ত্রুটি।

মানা ও জানার প্রসঙ্গ

অজ্ঞান অজ্ঞানকেই জানে না, জ্ঞানকে জানবে কী করে? সে বৃহৎকে মানে না; সুতরাং নিজেকেও জানে না। কারণ, বোধের অপূর্ণতা এবং শ্রদ্ধা-ভক্তি-বিশ্বাসের অভাব থাকতে তা-ই হয় তার অন্তরায়। আবার অপর

পক্ষে এগুলির সাহায্যে ক্রমশ সে পূর্ণতার দিকে এগিয়ে যায়। বৃহতের দিকে, মহতের দিকে যাওয়া মানেই তাকে বিশ্বাস করে মেনে নেওয়া।

কাম ও নিষ্কাম প্রসঙ্গ

প্রথমে কোন একটা কামনা যথা উচ্চাকাঙ্ক্ষা যদি না থাকে তাহলেও মহতের দিকে এগোন যায় না। পূর্ণের কাম হচ্ছে ভগবানের। তাতে সে উদাসীনবৎ, নিষ্ক্রিয়, অনাসক্ত, সর্বপ্রকাশে নিত্যসমান। কিন্তু তিনি সত্যসংকল্প, সত্যকাম হয়েও নিষ্কাম।

খণ্ড চাওয়া ও অখণ্ড চাওয়ার বৈশিষ্ট্য

অখণ্ড পূর্ণ ও অসীমের মধ্যে স্বল্প, সসীম বা খণ্ড করে চাইলে ফাঁক থেকে যায়। চাওয়া এবং হওয়া শেষ হয় না। সেজন্য কামনা থেকে যায়। চাইতে হয় ভূমাকে, পূর্ণকে, অখণ্ডকে, অনন্ত অসীমকে। এই চাওয়ার ফলেই অনন্ত, অসীম, পূর্ণ ও ভূমার সঙ্গে অখণ্ড এক হয়ে মিশে যাওয়া সম্ভব হয়।

পূর্ণকে ও অখণ্ডকে পূর্ণ ও অখণ্ডবোধে গ্রহণ করলে, মানলেই পূর্ণতাবোধ হয়, নতুবা নয়

এই পথ কোন কিছুকে বর্জন করার পথ নয়, গ্রহণের পথ। এ স্বয়ংসম্পূর্ণ। সবার জন্যই খোলা। সকলেরই অধিকার আছে এই পথে। জীবনের পূর্ণতার জন্য সবটাকেই গ্রহণ করতে হয় ঈশ্বরবোধে, আত্মবোধে; এবং বিশ্বাস করে স্ববোধে মেনে নিতে হয়। তাহলে পূর্ণতা সহজে আসে।

অতীত ও বর্তমানের মধ্যে বোধের ব্যবহারের পার্থক্য

ঋষিযুগের ঋষিদের সত্যবোধ ও তার ব্যবহারবিজ্ঞান পুরোটা এখন আর নেই। ব্যবহার দোষে সে-সব হারিয়ে গেছে এবং বিকৃত হয়ে গেছে। আসল সত্যের জিনিসগুলি বিকৃত হওয়া বা হারিয়ে যাওয়ার ফলে বর্তমান যুগের মানুষকে জীবনে সংকীর্ণতার মধ্যে অপূর্ণ জ্ঞান নিয়ে চলতে হচ্ছে।

ঋষিদের সত্যানুভূতির পরিচয়—জগৎ ও ব্রহ্ম অভেদ। জগৎটা মিথ্যা নয়। সত্যময় এবং সত্যেরই প্রকাশরূপ এই জগৎ। জগৎকে মিথ্যা বললে জগতের অন্তর্গত জীবন ও সবকিছুই মিথ্যা হয়ে যায়। তার ফলে সত্যের পরিচয় আর পাওয়া যায় না। তবে "ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা" রূপ যে শাস্ত্রের অমর বাণী তার তাৎপর্য ও অন্তর্নিহিত নিগূঢ় অর্থ বা বোধ ব্রহ্মজ্ঞ বা ব্রহ্মবিদ্ পুরুষের কাছে পাওয়া যায়, শাস্ত্র ব্যাখ্যায় নয়।

জগৎ, ব্রহ্মবোধে সত্য। জগৎ ও ব্রহ্ম সেই বোধে অভেদ। এই বোধ হচ্ছে অখণ্ড শাশ্বত নিত্য এক সত্যবোধ, স্ববোধ বা আপনবোধ। জগৎ হচ্ছে 'নিজবোধরূপ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ।' কিন্তু এই বোধকে বাদ দিয়ে অথবা এই বোধের অভাবে বা অপূর্ণতায় জগতের কোন বোধই পূর্ণ সত্য নয়, খণ্ড সত্য মাত্র, প্রাতিভাসিক সত্য, ব্যবহারিক সত্যের অংশমাত্র।

পারমার্থিক সত্যের অন্তর্গত নানাত্ব বস্তুত্বের সমষ্টির অখণ্ড রূপ হচ্ছে এই জগৎ। এই সমষ্টি একবোধের নামই ব্রহ্ম, আত্মা, ঈশ্বর, ভগবান ইত্যাদি। ব্রহ্ম, আত্মা বা ঈশ্বরের স্বভাবের অভিব্যক্তি হচ্ছে এই বিশ্বজগৎ।

মিথ্যা অজ্ঞান খণ্ড ও দ্বৈতবোধের লক্ষণ

পৃথক পৃথক বোধ হল ভেদজ্ঞান বা অজ্ঞান। এই অজ্ঞান বোধ দ্বারাই জগতে পৃথক বোধ আসে। এই পৃথক

বোধ অখণ্ড বোধসত্তার অংশ মাত্র। কাজেই মিথ্যা হল পূর্ণ সত্যের আংশিক প্রকাশ মাত্র। অপূর্ণতা বোধের পূর্বাবস্থা।

অখণ্ড সত্যের প্রকাশ ও ব্যবহার অস্তিত্ববিহীন হতে পারে না এবং অসত্য ও অসুন্দর হতে পারে না। সত্য প্রকাশের পূর্বাভাস বা পূর্বাবস্থা হচ্ছে মিথ্যা এবং পরবর্তী অবস্থা হল পূর্ণ এবং অখণ্ড সত্য।

সত্যের পরিচয় অখণ্ড, খণ্ড নয়

ঋষিদের পূর্ণসত্যের অনুভূতি প্রথমে হয় বহির্বিশ্বের সত্য প্রকাশের ধারা ধরে অন্তরে, পরে হৃদয়ে তাঁরা পূর্ণ করে উপলব্ধি করেছেন তাঁকে। সেই পূর্ণসত্যের বিজ্ঞান যাঁদের অন্তরে অনুভূত হয়েছে তাঁরা বলেন এক সত্যের অন্তর বাহির অখণ্ড ও অভেদ।

অন্তর-বাহির ভেদে সত্যের পরিচয়

অন্তরের ব্যবহারবিজ্ঞানই হচ্ছে বাইরের রূপ। সুতরাং বাইরে সত্য হচ্ছে অব্রহ্ম, অন্তরে ব্রহ্ম। বাইরে সে অনাত্মা, অন্তরে সে আত্মা। বাইরে ক্ষর, অন্তরে সে অক্ষর-ঈশ্বর। বাইরে অজ্ঞান, অন্তরে জ্ঞান। বাইরে প্রাণ, অন্তরে মহাপ্রাণ। বাইরে নিম্ন প্রকৃতি বা বহির্প্রকৃতি—অহংকার অভিমানপূর্ণ জীবন—অন্তরে উর্ধ্ব প্রকৃতি বা ঈশ্বরীয় প্রকৃতি জীব। বাইরে অসৎ, ভিতরে সৎ। আবার হৃদয়ের কেন্দ্রে সেই সত্য হল পরমব্রহ্ম, পরমাত্মা, পরমেশ্বর, জ্ঞানঘন প্রজ্ঞান।

অখণ্ড পূর্ণ বিশ্বাসের ফল অখণ্ড, পূর্ণ এবং খণ্ড বিশ্বাসের ফল খণ্ড ও অপূর্ণ

প্রথমে পূর্ণ বিশ্বাস করে মেনে নিতে হয় যে সকলে এক অখণ্ড সত্যেরই বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র এবং ব্রহ্মাণ বা আত্মনের মধ্যে বাস করছে। এক অখণ্ড মহাপ্রাণসাগর চৈতন্যময়, অমৃতময় ঈশ্বরের অনন্ত শক্তির মধ্যে বাস করছে। তারপরে তাঁর সঙ্গে পূর্ণ ভাবে যুক্ত হলে নির্মল ও বিশুদ্ধ জ্ঞানের অধিকারী হয়ে ব্রহ্ম, আত্মা, ঈশ্বরবোধে মুক্ত হয়ে নিত্য শাশ্বত পরমব্রহ্ম, পরমাত্মা, পরমেশ্বরের বা প্রজ্ঞানের ধ্যানে রত হয়ে তাঁর সঙ্গে একাত্মবোধে প্রজ্ঞানঘন স্বভাব স্বরূপ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

কামনা অনুরূপ সিদ্ধি হয়, পূর্ণ সমর্পণের পর আর কামনা থাকে না

সাধক ভগবানকে লাভ করতে চায়—এটাও একটা শুদ্ধকামনা। সমস্ত সিদ্ধি ও পূর্ণতালাভের মূলে থাকে শুদ্ধকামনা। কিন্তু পূর্ণ আত্মসমর্পণ হলে আপনিই কামনারূপ অসার বস্তুটি মল আকারে বার হয়ে যায়।

সকামে বিকার, নিষ্কামে নির্বিকার

কামনাকে জোর করে বাদ দিলে বিকার হয়। জোর করে বাদ দিতে গিয়ে অনেকে পূর্ণতাকে স্বল্পতা বা আংশিক শূন্যতা দিয়ে পেতে চায়। পূর্ণতাকে পূর্ণতা দিয়েই উপলব্ধি হয়। নিজেকে পূর্ণবোধে প্রতিষ্ঠিত হতে গেলে নিজের মধ্যে শূন্যতা সৃষ্টি করতে হয় ঈশ্বরের সাহায্যে। তাহলে পূর্ণতার প্রভাব অন্তরের শূন্যতাকে নিজবক্ষে মিলিয়ে নেয় এবং অন্তরে স্ব-মহিমায় বিরাজ করে। এ-ই আত্মসমর্পণের পরাকাষ্ঠা।

ঈশ্বরকে অবলম্বন করে চিন্তা ও কর্মেতে অভাব থাকে না, কিন্তু বিষয়ের অবলম্বনে তাতে অভাবই প্রাধান্য পায়

কোন একটা বিষয় নিয়ে আনন্দে মগ্ন হতে গেলে আনন্দের উপকরণ একান্ত প্রয়োজন। যদি এই উপকরণ ঈশ্বরকে কেন্দ্র করে হয় তবে আর অভাব বা শূন্যতা থাকে না। কিন্তু বিষয়কে কেন্দ্র করে হলে অন্তরের কামভাব অধিক বেড়ে যায়। কামভাব দিয়ে তা কোন দিনই পূর্ণ হয় না।

মুক্তিলাভের অন্যতম উপায়

কামনা ও তার শুভাশুভ ফলকে ঈশ্বরে সমর্পণ করতে হয়। তাহলেই মুক্ত হওয়া যায়। তখন আর কোন বন্ধন থাকে না।

ভগবান ও জীব মূলত অভিন্ন হলেও ব্যবহারে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে

ভগবান কামনাশূন্য নয়। তাঁর মধ্যে যখন সৃষ্টির ইচ্ছা জাগে তখন তিনি সৃষ্টির আনন্দে মেতে ওঠেন। তিনি শুদ্ধসংকল্প, শুদ্ধকাম। তাই তাঁকে ইচ্ছাময়, কামময় পুরুষ বলা হয়। কিন্তু ইচ্ছা এবং কামকে তিনি স্ববশে ব্যবহার করেন, তার অধীন তিনি নন। এ-ই তাঁর স্বতন্ত্র মহিমা এবং স্বভাবের বিশেযত্ব। কিন্তু জীব কামাধীন, কামাহত—সুতরাং সে বদ্ধ।

মুক্তপুরুষদের বৈশিষ্ট্য

মুক্ত পুরুষদের যখন সাধু সন্ন্যাসী করে পৃথিবীতে পাঠানো হয় তখন তাঁদের মধ্যেও একটা বিশেষ ইচ্ছা, শুভ সংকল্প, শুভ কামনা দিয়ে পাঠানো হয় এবং তাঁদের মধ্যে ঈশ্বর নিজে কাজ করেন বলে তাঁরা সাধারণের মত কামনা ও ভোগপ্রকৃতির দাস হন না।

মুনিদের অপেক্ষা ঋষিরা শ্রেষ্ঠ, ঋষিদের মধ্যেও স্তরভেদ আছে

যাঁরা ঋষি, তাঁদের মধ্যেও শুদ্ধ কামনা এবং ইচ্ছার প্রকারভেদ আছে। তার পরিচয় পাওয়া যায় ঋষিত্বের স্তরবিভাগের মধ্যে। ঋষিদের মানের স্তর যথাক্রমে—(১) ব্রহ্মবিদ্, (২) ব্রহ্মবিদ্‌বর, (৩) ব্রহ্মবিদ্ বরীয়ান, (৪) ব্রহ্মিষ্ঠ। ভগবানের যখন প্রয়োজন হয় তখন এই ধরনের ঋষিদেরও সংসারে পাঠিয়ে দেন।

সত্যদর্শন ও ঈশ্বরোপলব্ধির অন্যতম উপায়

জীবনে যার যা আছে, তার মধ্যে ঈশ্বরকে ধরিয়ে দেওয়াই সত্যদর্শন। জীবনের সমস্ত চিন্তা, কর্ম ও কর্মফলের মধ্যে সমবোধে ঈশ্বরকে 'মেনে মানিয়ে চললে' বিষ্ণুপ্রীতি তথা ঈশ্বরানুভূতি সহজে হয়।

সমবোধে স্থিতির বৈশিষ্ট্য

জগতের অন্তর্নিহিত সত্তার সঙ্গে নিজের একত্ববোধই হচ্ছে সত্যবোধ। জগতের সবকিছুকে ঈশ্বরীয় ভাবে সমবোধে গ্রহণ করলেই এই সত্যবোধ সহজে হৃদয়ে জেগে ওঠে।

ঋষিদের অমরত্ব বোধ হল—সবার মধ্যে সমবোধে মিলে সমত্ব বা পূর্ণতা লাভ। এই বোধে থাকতে হলে সবার মধ্যে নিজেকে এবং নিজের মধ্যে সবকে মানতে হয়, গ্রহণ করতে হয়।

অনীশ্বরীয় ও ঈশ্বরীয় ভাববোধের দৃষ্টিতে সাম্যবাদের বিশ্লেষণ

ঋষিরা সবচেয়ে বড় সাম্যবাদী। কার্ল মার্ক্স হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধ ও মুসলমান ধর্মের সারতত্ত্ব নিয়ে তাঁর সাম্যবাদ লিখতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু ঈশ্বরবিরোধী মনোভাবের জন্য তাঁর লেখা বিকৃতরূপে প্রকাশিত হল। অবশ্য তাঁর লিখিত মতবাদের প্রতি তাঁর নিজেরও আস্থা বা পূর্ণ বিশ্বাস ছিল না।

কার্ল মার্ক্স-এর লিখিত মতবাদটি ঈশ্বরানুভূতির অন্তরায় তো বটেই এমনকি জাগতিক সত্যেরও পরিপন্থী। কারণ, জগতের আপেক্ষিক সত্য কতগুলি ঘটনাকে কেন্দ্র করে পূর্ণ ভাবে উপলব্ধি করা যায় না। পারমার্থিক সত্য, সে তো গভীর ধ্যানলব্ধ সত্য যা পুঁথি পুস্তক পাঠে কারও পক্ষে অনুভব করা সম্ভব হয়নি, হবেও না।

ঋষিরা সাম্যবাদী ছিলেন। তাঁরা একাত্মবোধে বা সমবোধে পরস্পর পরস্পরকে সহযোগিতা করতেন। সম্পূরক ও পরিপূরক হতে তদ্‌বোধে জীবন যাপন করতেন। তাঁদের মধ্যে সর্বোত্তম সাম্যবাদী নীতির মৌলিক পরিচয় পাওয়া যায়। জীবনের সর্বক্ষেত্রে সমবেত ভাবে এগিয়ে যাবার প্রচেষ্টায়, সকলের সমান উন্নতি, আত্মবিকাশ ও সমভাবে পূর্ণসত্যের উপলব্ধির জন্য তাঁদের ছিল একনিষ্ঠ ও স্বহৃদয়ে সাধনা।[১]

সমত্ববোধের তাৎপর্য

জীবনে সমত্বকে ভিত্তি করে সমত্বে প্রতিষ্ঠিত হতে হয়। সমত্বই হল যোগ। প্রেমের নীতি সমত্বে প্রতিষ্ঠিত। সমত্বে অর্থাৎ সমানবোধে হয় স্বভাব এবং স্বভাববোধে হয় প্রেম। জীবনের কামনা সমান ভিত্তিতে এগিয়ে চলবে।

হৃদয়বৃত্তির বৈশিষ্ট্য

হৃদয়ের ধর্ম সমান না-হলে সহানুভূতি, শুভেচ্ছা, অনুকম্পা, মৈত্রী ও প্রেম সম্ভব হয় না। এইগুলি সমবোধে

১। ঋষিদের সমবেত প্রার্থনা মন্ত্র ছিল :

"সং গচ্ছধ্বং সং বদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্।
দেবা ভাগং যথা পূর্বে সঞ্জানানা উপাসতে।।
সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী সমানং মনঃ সহ চিত্তমেষাম্।
সমানং মন্ত্রমভি মন্ত্রয়ে বঃ সমানেন বো হবিষা জুহোমি।।
সমানী ব আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ।
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি।।"

জীবনের সর্বস্তরে সর্ব ব্যবহারে আচরণে চিন্তায় ভাবনায় অনুভূতিতে সর্ব অবস্থায় সমানের তাৎপর্য ও মর্যাদা রক্ষার স্বপ্ন ও সাধনা সফল করেছিলেন ঋষিরা। তাঁদের উত্তরসাধক বর্তমানের মনুষ্যসমাজ সেই ভাবধারাকে ভুলে গিয়ে তাদের স্বার্থ ও মতলব সিদ্ধির জন্য সাম্যবাদের বিকৃত ব্যবহার চালু করেছে এবং তার ফলও ভোগ করতে হচ্ছে সবাইকে।

ঋষিদের সাম্যবাদে ছিল হৃদয়বৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি উভয়ের মধ্যে এক মধুর সমন্বয়, যার ফলে জীবনের সর্বতোমুখী গতির মধ্যে অনুভূতির balance স্বাভাবিক ছিল। বর্তমান যুগে যে-সাম্যবাদের কথা শোনা যায় এবং যারা তা প্রচার করে তাদের হৃদয়বৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির মধ্যে কোন সামঞ্জস্য দেখা যায় না। তাদের সাম্যবাদ হল বাহ্যিক বস্তুতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এক কল্পিত অবৈজ্ঞানিক অযৌক্তিক মতবাদ ও দলীয় স্বার্থসিদ্ধির দুঃস্বপ্ন মাত্র। তার দ্বারা সমাজতন্ত্রের ও রাষ্ট্রতন্ত্রের সমস্যার সম্যক্ সমাধান সম্ভব নয়। কেবল শক্তির অপপ্রয়োগ, ধনক্ষয় ও লোকক্ষয় এবং ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত অশান্তি হল তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। রাষ্ট্রশাসন ব্যবস্থা, সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলার অবনতি ও দুর্নীতির অবাধ বিস্তার—এ সবই তার সাক্ষ্য স্বরূপ।

প্রতিষ্ঠিত হলে সকলেই সুখে বাস করতে পারে। হৃদয়বৃত্তির সম্যক্ পুষ্টির অভাবে পরস্পরের মধ্যে মতের ও ভাবের অমিল, পরমত অসহিষ্ণুতা, বিদ্বেষ ও পরস্পরবিরোধী আচরণ, পরনিন্দা, পরচর্চা, হিংসা-দ্বেষ-দ্বন্দ্ব বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। হৃদয়ের ধর্ম প্রসারিত না-হলে সমাজজীবন সর্বাঙ্গসুন্দর হতে পারে না।

পশুজীবন থেকে ঈশ্বরীয় জীবনে উত্তরণের বিজ্ঞান

বোধের কেন্দ্রে সংযুক্ত না-হলে পশুজীবনের রূপান্তর হয় না। মানুষ পশুভাবাপন্নই থেকে যায়, পাশবিক জীবনই যাপন করে। উন্নত আদর্শ গ্রহণ করে তদনুরূপ জীবন যাপনের দ্বারা দানবের স্তর হতে মানব, দেবতার স্তরে দেববোধে উন্নত হয়ে তৎপর বিশুদ্ধ জ্ঞানের অধিকারী হয়ে ঈশ্বরীয় জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রাণের ধারণার তাৎপর্য অনুসারে তার পরিণামের তারতম্য হয়

প্রাণকে সমান ভিত্তি ধরে নিলে বোধে সংযুক্ত হওয়া যায়। যে-অবান্তর চিন্তা সকলের মনের মধ্যে ঢুকে এতদিন সকলকে কষ্ট দিচ্ছে তার মাঝে ঋষিদের সেই উদার দৃষ্টি, সর্বমতের ঐক্য এবং একাত্মবোধ গ্রহণ করতে হয়। তাহলে চিত্তমল শোধন হয়ে প্রজ্ঞানঘন অখণ্ড এক অমৃতময় সত্তায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়।

ভগবান সেই মহাপ্রাণ। মানবদেহের মধ্যে প্রাণের প্রকাশ, বাল্‌বের আলোর মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎশক্তি প্রকাশের মত। মহাপ্রাণের মধ্যে রয়েছে ঈশ্বরের অনন্ত অসীম নির্গুণ ও সগুণ মহিমা পূর্ণ ভাবে; সেইজন্য প্রাণ অমৃতসত্তা। এই মহাপ্রাণের মধ্যে মন ডুবলে অনন্ত অসীমের অনুভূতি প্রকাশ পায়।

বিষয়কে মনের চাহিদা দিয়ে আলাদা ভাবে গ্রহণ করে ব্যবহার করার ফলে বিষয়ের প্রভাব মনেতে প্রাধান্য পায়। তখন বিষয়ের মধ্যে মন ডুবে থাকে। তার ফলে বিষয়ের প্রতিক্রিয়া জীবনকে অভিভূত করে।

বিষয়ের বদলে মনেতে বিষয়ী তথা সেই মহাপ্রাণচৈতন্যের স্মরণ-মনন-ধ্যানের দ্বারা মনে বিষয়ের প্রভাব দূরীভূত হয়ে মন বা চিত্ত শুদ্ধ হয়ে যায়। তার ফলে নির্বিষয় শুদ্ধচিত্তে সংসারে বিষয়ের মধ্যে নির্বিকারে নির্দ্বন্দ্ব মুক্ত অবস্থায় থাকা যায়। আবার বিষয়টাকে ভিতর থেকে ফেলে দিলে অনায়াসে বিষয়ের মধ্যেও ভাসতে পারা যায়।

সীমার সাধনা অনীশ্বরীয় বোধে হয়, ভূমার সাধনা হয় ঈশ্বরীয় বোধে

ঋষিদের যে সমত্বের প্রার্থনা তার অর্থ—ভগবান সকলের ভিতরে সমান। পূর্ণতা হচ্ছে সবেতে সমান।

ঈশ্বরই সব চাওয়া-পাওয়ার কারণ ও কেন্দ্র। সেইজন্য তাঁকে সর্বশক্তিমান বলা হয়। ছোট চাওয়ার ফলে সসীম এবং ভূমাকে চাওয়ার ফলে পূর্ণতার পরিচয় পাওয়া যায়।

ব্যষ্টিবোধে অপূর্ণতা, সমষ্টিবোধে ও তদূর্ধ্বে হয় পূর্ণতা

মহাপ্রাণের মধ্যে যখন মন ডুবে যায় তখন সবই প্রাণময় বা বোধময় হয়ে যায়। সেটাই সকলের পূর্ণ স্বরূপ।

খণ্ডবোধে হয় কামনা-বাসনা, অখণ্ডবোধে তার অভাব

সদসৎ, ধর্মাধর্ম প্রভৃতি দ্বৈতবোধে অখণ্ডবোধের স্বানুভূতি পূর্ণ ভাবে থাকে না। অখণ্ডবোধ মনের কামনা-বাসনার দ্বারা বিভক্ত হয়।

সমত্বের মর্মার্থ

দেহ-মন-প্রাণ-বুদ্ধির সামঞ্জস্য হচ্ছে সমত্ব। সকলের মধ্যেই এই সমত্ব প্রকাশের অপেক্ষায় আছে।

'আমার আমি' বোধের পরিণামে মৃত্যু, 'ভূমা আমি' বোধে অমৃতত্ব

ঈশ্বরকে 'আমার আমি'র মত চাইতে গেলেই সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। এটা পূর্ণতার পরিপন্থী। অমরত্বে পৌঁছতে হলে ভূমাতে মিশে গিয়ে ভূমা হতে হয়।

ভূমাবোধে অমৃতময় মহাপ্রাণের সঙ্গে হয় মিলন বা ঐক্য

ভূমা হওয়ার অর্থ হচ্ছে মাতৃময় হয়ে যাওয়া। ভূমা—ভূ+মা। মাতৃময় হওয়ার অর্থ হচ্ছে মহাপ্রাণের সঙ্গে মিশে যাওয়া, প্রাণে প্রাণে প্রাণময় হয়ে যাওয়া। এই প্রাণই হচ্ছে চৈতন্যসত্তা বা বোধসত্তা। এ-ই আবার অমৃতসত্তা। সুতরাং ভূমা হওয়ার মানে প্রাণময় হওয়া, চৈতন্যময় হওয়া, বোধময় হওয়া, আমিময় অর্থাৎ আত্মময় এবং অমৃতময় হওয়া। এ-ই জীবনের পূর্ণতা। পূর্ণ হয়ে থাকার নাম ভূমা।

মহাপ্রাণের মধ্যে প্রাণ, প্রাণময় হয়ে অখণ্ড রয়েছে। বাইরে মনের মাধ্যমে দুই বা ততোধিক দেখায়। নানাত্ব বহুত্বের মূল রয়েছে মনে। অস্থির চঞ্চল অসংযত মনের স্বভাব হচ্ছে নানাত্ব বহুত্বের প্রীতি, সৃষ্টি ও ধৃতি। মনের মূল রয়েছে অমৃতময় মহাপ্রাণে। মহাপ্রাণের সগুণ ও নির্গুণ দ্বিবিধ স্বভাব। সগুণে বিশ্বলীলা, নির্গুণে স্বরূপস্থিতি।

অসংযত দুর্বল ইন্দ্রিয়গুলির মূলে রয়েছে এই অস্থির চঞ্চল মনের প্রভাব। মন শান্ত ও সমাহিত হলে ইন্দ্রিয়গুলিও সংযত হয়। তখন তার বহির্গতি ও প্রীতি আপনিই বন্ধ হয়। সমাহিতচিত্তে অখণ্ড একবোধের স্মৃতি ফুটে ওঠে। তরঙ্গায়িত মনের মত নানাত্ব বহুত্বের স্মৃতি আর থাকে না।

সমর্পণের বিজ্ঞান

আত্মসমর্পণের বিজ্ঞান হচ্ছে সমষ্টির মিলিত এক অখণ্ড বোধসত্তার স্বানুভূতি। এর কাজ অন্তরে ও বাইরে সমভাবে প্রযুক্ত। এই একবোধের বিজ্ঞান যেমন অন্তরে আছে তেমন বাইরেও বিদ্যমান। অহংকারের আমি তা বুঝতে পারে না। তুমি এবং তোমার নামে সব 'মেনে মানিয়ে' নিলে সমবোধের ব্যবহার জেগে ওঠে।

অখণ্ড বোধের আমির বহুরকম প্রকাশ। আমির বিভিন্ন প্রকাশগুলিকে অখণ্ড প্রাণ ও বোধে মানলে সর্বজ্ঞ হওয়া যায়।

প্রণবের রহস্য

চাওয়া-পাওয়া বন্ধ হলে অন্তরে পরনাদ প্রণবের ধ্বনি শোনা যায়। প্রণব শব্দের অর্থ প্র+নব। নবপ্রকরণ, নবপ্রকাশ, নবপ্রাণ, নবগ্রহ, নবগুণ, নবপ্রকৃতি, নবপ্রদেশ, নবপ্রভা, নবপ্রজ্ঞা, নবরস ও নবপ্রতাপ। প্রণবের কথা দিনের পর দিন শুনলে মন তাঁর বোধে মিশে যায়।

মহাপুরুষদের কথার মাহাত্ম্য

মহাপুরুষদের কাছে শান্তির উপায় মেলে। তাঁরা এমন ভাবে শান্তির কথা বলেন, জ্ঞানবিজ্ঞানের কথা বলেন, যার ফলে উদ্বেগ বা দুঃখ দূর হয়ে যায়।

পুকুরে কচুরিপানা প্রথম প্রথম সরিয়ে দিলে আবার চলে আসে। তারপরে একদিন একেবারে সবগুলো তুলে

ফেলে দিলে জলটা পরিষ্কার হয়ে যায়। সেই রকম মহাপুরুষদের কথা নিরন্তর স্মরণ মননের ফলে মনের বিকার নাশ হয়।

অহংকারের পরিণাম

অহংকার মানবজীবনের উন্নতির পথে, মুক্তির পথে, সত্যানুভূতি বা আত্মোপলব্ধির পথে প্রধান প্রতিবন্ধক। কারণ, অহংকার দ্বারা মানুষ ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য অখণ্ডকে, পূর্ণকে খণ্ড খণ্ড করে নিজের মত করে ভাগ করে পেতে চায় ও ব্যবহার করতে চায় এবং সীমা দিয়ে অসীমকে বাঁধতে চায়।

কোন কিছুকে নিজের দখলে পাবার ইচ্ছা ও প্রচেষ্টা হল অহংকারের প্রকৃতি ও কাজ। অহংকার কখনও বড়কে, শ্রেষ্ঠকে, ঈশ্বরকে মানে না।

ঈশ্বরের স্মরণ মননের মাহাত্ম্য

ঈশ্বরের মহিমা নিরন্তর চিন্তা করলে দেহের ক্ষুধাও কমে যায়। সেইজন্য মহাপুরুষরা কম খেয়ে বা না-খেয়েও থাকতে পারেন। তাঁদের রসনা তৃপ্তির জন্য আহার নয়। তাঁরা খাওয়ার জন্য বাঁচেন না, বাঁচবার জন্য খান।

আহার্য গ্রহণের উদ্দেশ্য

খাওয়ার জন্য যদি বাঁচা হয় তাহলে কোনদিনই তার সমাধান হয় না। তা পশুর জীবন। কিন্তু বাঁচবার জন্য যদি খাওয়া হয়, তার জন্য অধিক পরিশ্রম করতে হয় না।

প্রকৃতির রাজ্যে ভগবানের বিধান এমন সুন্দর ভাবে সাজানো আছে যে, শিশু জন্মাবার আগে মাতৃস্তনে দুধ তৈরি হয়। গর্ভে শিশুর আহার খুঁজতে হয় না, সময়মত মা-ই তাকে আহার জুগিয়ে যায়। সেইরূপ, মহাপুরুষদের আহারও ঈশ্বর এমন ভাবে ব্যবস্থা করেন যে অন্যের কাছে তা দুর্বোধ্য। অন্যেরা চেয়ে পায় না, মহাপুরুষরা না-চেয়ে পান—এটা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায়।

মহাপুরুষদের স্বভাবের বৈশিষ্ট্য

মহাপুরুষদের কামনা-বাসনা ও সাধ থাকে না। সাধারণ মানুষের মত কোন ইচ্ছাই তাঁদের থাকে না। তাঁরা নিষ্কাম, নিরাশী, নির্মম, নির্লোভি, সদাতুষ্ট, যথালাভে ভোগে সমতৃপ্ত। তাঁদের মত হতে গেলে জীবনের সামনে যখন যা-কিছু আসে, তাকে সমবোধে গ্রহণ করতে হয়। সমবোধেই করতে হয় ব্রহ্মসমর্পণ।

আহার শুদ্ধির তাৎপর্য

আত্মাকে নিবেদন করলে অন্ন শোধিত হয়। আহারশুদ্ধি না-হলে, চিত্ত নির্মল হয় না। চিত্তশুদ্ধি না-হলে ঋষিদের মত বোধের পূর্ণতা হয় না।

ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সবকিছু গ্রহণ করাকে আহার বলে। সর্ব ইন্দ্রিয়ের কাজ হল আহার সংগ্রহ করা। ইন্দ্রিয়ের এই আহরণ শুধু অহংকারের তৃপ্তির জন্য নয়, আত্মার সেবার জন্য। আত্মার তৃপ্তিতে ইন্দ্রিয়সকলও তৃপ্ত হয়।

মানুষের সত্য পরিচয়

মানুষের পরিচয় অহংকার নয়। অহংকারের অতীত দেহ-ইন্দ্রিয়-মন গুণাতীত, নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত আত্মা। এই আত্মা হল অমৃতময় বিশুদ্ধ বোধসত্তা। দেহ-ইন্দ্রিয়-মন-অহংকার প্রভৃতি তাঁর সেবক ও পরিচারক। এদের কাজ এই বোধসত্তারূপ অমৃতময় আত্মার পরিচর্যা করা।

অহংকার ব্যবহারের ফলে কী হয়?

দেহ-মন-ইন্দ্রিয়াদিতে অহংকারবশত পৃথকবোধে নিজের মনে করে কর্তা সেজে তাদের ব্যবহার করলে যথার্থ সুখের পরিবর্তে অশান্তি, জ্ঞানের পরিবর্তে অজ্ঞান, আনন্দের পরিবর্তে নিরানন্দ, প্রেমের পরিবর্তে কাম এবং অমৃতত্ব আস্বাদনের পরিবর্তে মৃত্যুর অধীন হয়ে মৃত্যুর রাজ্যে বাস করতে হয়। 'তাই বারে বারে অহংকার জন্মে আর মরে।'

দেহের আহার ও বোধের আহার সম্পূর্ণ ভিন্ন

অহংকার জানে শুধু পেটে খেতে। শুদ্ধবোধের আহার সম্বন্ধে তার কোন পরিচয় নেই। পশুপাখিরা শুধু পেটে খেতে চায়। পেটভর্তি আহার পেলেই তারা যথেষ্ট মনে করে। এই আহার সংস্থানের জন্য তারা শুধু হিংসা বৃত্তির সাহায্য নেয়। আহার, নিদ্রা, মৈথুন ও সন্তান উৎপাদন ছাড়া পশুজীবনের আর কোন বৈশিষ্ট্য নেই।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের যথার্থ অনুশীলনের ফলে জীবনের পরম লক্ষ্যে পৌঁছান সম্ভব

মানুষের জীবনে আহার, নিদ্রা, মৈথুন ও সন্তান উৎপাদন ছাড়াও এমন একটা বৈশিষ্ট্য ও সুযোগ আছে যা জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলন দ্বারা তাকে জীবনবোধের এক নূতন পর্যায়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। এই নূতন সত্যানুভূতির গভীর হতে গভীরতর প্রদেশে সে খুঁজে পায় জীবনসত্তার অমৃতময় স্বরূপ।

জীবনের চরম লক্ষ্যের পরিচয়

জীবনসত্তার অমৃতময় স্বরূপের পরিচয় হল—এ দেহ-ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধির অতীত, দেশকালাতীত, কার্যকারণাতীত, গুণাতীত, ভাবাতীত, দ্বন্দ্বাতীত, সচ্চিদানন্দস্বরূপ, অজর, অমর, অপাপবিদ্ধ, নিত্যশুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত, স্ববোধে স্বয়ংপূর্ণ, স্বয়ংপ্রকাশ, নির্গুণ-সগুণ স্বভাব সমান, অদ্বয়-অব্যয়-শাশ্বত, অমৃতময়, অচ্যুতস্বরূপ, নির্বিকার, প্রজ্ঞানঘন, নিরঞ্জন, অনন্ত অসীম ভূমা সত্তা। এ-ই জীবের যথার্থ সত্য পরিচয়।

মুক্ত আত্মার জীবন বন্ধনের কারণ

বস্তুজগতের সংস্পর্শে এসে মুক্ত জীবসত্তা দেহ-ইন্দ্রিয়বোধে আসক্ত হয়ে, বস্তুজগতের আকর্ষণের দ্বারা প্রলুব্ধ হয়ে নিম্ন প্রকৃতির বশীভূত হয়ে পড়ে।

'তখন সীমার টানে
রূপনামের বন্ধনে
বাস করে অজ্ঞানে
ভোগ-ইচ্ছা ও কামে
অহংকার ও অভিমানে।'

অশুদ্ধ ও শুদ্ধ উভয়বিধ আহারের ফলাফল

আহার পরিশুদ্ধ হলে বিকারের সম্ভাবনা থাকে না। বিকারধর্মী কার্য-কারণ লক্ষণগুলি শত্রুবৎ আচরণ করে। আহারশুদ্ধি হলে তারা মিত্রবৎ হয়ে যায় এবং সর্বদাই অখণ্ড আত্মবোধের সেবায় রত থাকে।

'সর্বেন্দ্রিয়দ্বার হয় যদি আত্মার
তাদের শুধু সেবার অধিকার।
নিবেদন করে জানাবে বারবার
হে মহাপ্রাণ, প্রভু সবার
লহ তব সন্তানের অহংকার
তব মাঝে সর্বসত্য শুদ্ধ নির্বিকার।।'

মহাপ্রাণের বক্ষে তার প্রকাশবিজ্ঞানের ফলশ্রুতি

'মহাপ্রাণ সাগরে তাঁর প্রকাশ সন্তান
সর্বজীবন প্রাণ তাঁরে করে আত্মদান
অখণ্ডে মিশে থাকবে নিত্য পূর্ণ সমান।'

মহাপ্রাণের সঙ্গে প্রাণের সর্বসাধন যোগের এই হচ্ছে বিজ্ঞান।

প্রার্থনা করতে হয়—'হে মহাপ্রাণ, তুমিই তোমাকে খাচ্ছ।' মহাপ্রাণের সঙ্গে প্রাণের নিত্যযোগ এই ভাবেই হয়। শব্দ শোনার আগে বলতে হয়—তুমিই বল, তুমিই শোন, তোমার কথা তুমি শোন শ্রবণের মধ্যে বসে। সর্ব ইন্দ্রিয় দ্বারা যখন যে-কর্ম হয় সব তাঁর নামে নিবেদন করতে হয়। তাহলেই সহজে চিত্তশুদ্ধি হয়। দেহ-ইন্দ্রিয়-প্রাণ-মন শুদ্ধ ও শান্ত হয়। তার ফলে অমৃতলোকের সত্য পরিচয় সহজে জীবনে প্রকাশ হয়। প্রজ্ঞাস্থিতির ফলে বাইরে স্ববিরুদ্ধ কিছু দেখলেও মন চঞ্চল হয় না।

শান্ত মনই শুদ্ধ মন, শুদ্ধ মনের প্রার্থনা কেমন?

মন শান্ত রাখতে হলে যখন যা জোটে তাই তাঁকে সমর্পণ করে গ্রহণ করতে হয়। তবেই পরিণামে সমত্ববোধে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়। জীবনের সর্বপর্যায়েই সবকিছুর মধ্যে একমাত্র চৈতন্যময়ী, বোধরূপী মহাপ্রাণ মাতা-ই আছেন।

আমি খাই না, তুমি খাও; আমি দেখি না, তুমি দেখ; আমি বুঝি না, তুমি বোঝ—এইভাবে প্রতিদিন জীবনের ব্যবহার করলে অনায়াসে চিত্তশুদ্ধি হয় এবং মুক্তি শান্তির অধিকারী হওয়া যায়।

প্রাণই খায়, আমি খায় না। প্রাণই তার খাবারের ব্যবস্থা করে। কাঁচা আমি দিয়ে কোনদিনই কিছু পূর্ণ ভাবে বোঝা যায় না। জানে শুধু একজন—সে মহাপ্রাণ ভগবান। তাঁর আমি এবং অহংকারের আমি এক নয়।

পূর্ণ আত্মার 'আমি'র ত্রিবিধ পরিচয়

আমির তিনটি রূপ—(১) কেন্দ্রে প্রজ্ঞানের আমি। (২) অন্তরের জ্ঞানঘন আমি। (৩) বাইরের অজ্ঞান অহংকারের আমি।

কেন্দ্রে প্রজ্ঞানের আমি—মহাপ্রাণ, অদ্বয়-অব্যয়-অমৃতময়, স্বয়ংপূর্ণ, স্বয়ংপ্রকাশ, অখণ্ড বোধময় কেবল সাক্ষীচেতা উপদ্রষ্টা। তাঁকেই পরমব্রহ্ম, পরমাত্মা, পরমেশ্বর, পরমগুরু, ভগবান আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

অন্তরের জ্ঞানঘন আমি—মহাপ্রাণ, অদ্বয়-অব্যয়-স্বভাবসমান, শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-অমৃতময় বোধসত্তা, জীব, আত্মা,

অক্ষর ব্রহ্ম, ঈশ্বর, প্রভু, নিয়ন্তা, বিশ্ববিধাতা, কর্তা, ভোক্তা, জ্ঞাতা, গুরু, ভর্তা, মাতা, পিতা প্রভৃতি তাঁর পরিচয় বা নাম। এ-সব একেরই ভিন্ন ভিন্ন নাম।

বাইরের অজ্ঞান অহংকারের আমি—দেহ ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধিযুক্ত অশুদ্ধ বোধের আমি, জন্ম জরা ব্যাধি মৃত্যুর অধীন আমি। তার প্রকৃতি ঈশ্বরবিমুখ। বহির্মুখী বিষয়ের প্রতি অতিশয় আসক্ত ও কাম-ভোগপরায়ণ। লোভ, ক্রোধ, দম্ভ, দর্প, অহংকারের বশবর্তী হয়ে পরদোষদর্শী, হিংসাপরায়ণ, অসংযত, অমার্জিত, অসমাহিতচিত্ত, স্বার্থ ও অভিমানের প্রাধান্যে ধর্মদ্রোহী, নীতিবিরোধী, সমাজবিরোধী, আইন শৃঙ্খলার বিরোধী, অন্যায় ও নিষ্ঠুর কর্মে ব্রতী, আত্মঘাতী, মোহগ্রস্ত, নিম্ন প্রকৃতির বশীভূত পশুপ্রকৃতির আমি। [১১।৮।৬৮]

বিশ্বাসের মর্মার্থ

ঈশ্বরের উপলব্ধির অন্যতম সহায়ক হচ্ছে অখণ্ড বিশ্বাস। এই অখণ্ড বিশ্বাস ভক্তের শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। এই বিশ্বাসের অন্তরায় হচ্ছে বহির্মুখী দৃষ্টিভঙ্গি। বস্তুজগতের প্রয়োজনসিদ্ধি দ্বারা এই বিশ্বাস তৈরি হয় না। প্রয়োজন অনুসারে অন্তর থেকেই এই বিশ্বাস ফুটে ওঠে।

বিশ্বাস হচ্ছে বস্তুনিরপেক্ষ, জ্ঞান হল বস্তুসাপেক্ষ। জ্ঞানীর জ্ঞান বাইরে থেকে আসে, তার পথ আলাদা। অনেক কঠোরতা ও সপস্যা তার দরকার হয়। ভক্তকেও অনেক কঠোর পরীক্ষায় পাশ করতে হয়।

ভক্ত যোগী জ্ঞানীর বৈশিষ্ট্য

ভক্ত থাকে সংসারে যুক্ত। যোগী ও জ্ঞানী সংসারের বাইরে থাকে। ভগবৎ মহিমা শুনতে শুনতেই ভক্ত সোনা হয়ে যায়, তার আর আলাদা তপস্যা দিয়ে চিত্ত শোধন করতে হয় না।

জ্ঞানীর আদর্শ হচ্ছে জ্ঞানলাভ করা, প্রেমিক বা ভক্তের আদর্শ হচ্ছে প্রেমিক হওয়া। জ্ঞানীর কাছে জ্ঞানই তার অবলম্বন, ভক্তের অবলম্বন ভালবাসা। ভগবান ভক্তের কাছে সর্ব ইন্দ্রিয়ে, সর্বস্নায়ুতে, সর্ব অণুতে অনুভূত হয়। তার কাছে জ্ঞানের বিচারে, যুক্তি তর্কে পরীক্ষার কোন স্থান নাই। ভগবান ভক্তকে অন্যের চাইতে অধিক পরীক্ষা করে নেন।

বহির্বিশ্বের সমস্ত প্রকাশের মধ্যে ঈশ্বরকে জ্ঞানী ধরে বুদ্ধি দিয়ে, যোগী ধরে মন দিয়ে, ভক্ত তাঁকে সর্বভাব ও সর্ব ইন্দ্রিয় দিয়ে ধরে। সেইজন্য তার অনুরাগ বা ভালবাসার প্রয়োজন হয়।

ভক্তের কাছে সর্বপরীক্ষাতেই মাধুর্য রস এসে সমস্ত জটিলতাকে অজ্ঞাতসারে সহজ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ করে দিয়ে যায়। সবটাই তার কাছে রসময় প্রেমময় বলে অনুভূত হয়। সে আর কিছু জানে না। তার মধ্যে যখন প্রেমের রস সঞ্চারিত হয় তখন তার দেহের সমস্ত অণু পরমাণুগুলি নাচতে থাকে।

ভক্তির চরমতম অবস্থায় ভক্তের বুদ্ধির দরজা একবারে বন্ধ থাকে। বুদ্ধিটা যেন দরজা বা কপাট, ইন্দ্রিয়গুলি জানালা, মনটা হল যেন ঘুলঘুলি। এই সবগুলিই রুদ্ধ হয়ে যায়। তখন মনের গতিটা গভীর অন্তরে চলে যায়। অহংকারের আমি কিছুই জানতে পারে না। আবেশিত হয়ে ঈশ্বরীয় সত্তায় মিশে যায়। দেহের সমস্ত জড়তা বা কাঠিন্য শিথিল হয়ে যায়। সেই জন্যই বলা হয় ভক্তের রসাস্বাদন অপরে বুঝতে পারে না।

দিব্য জ্ঞান ও দিব্য প্রেমের বৈশিষ্ট্য

ভিন্ন ভিন্ন সাধনার দ্বারা যে-বিকাশ হয় তাকে ঈশ্বরীয় জ্ঞান বলে। প্রেম এমনই একটা বস্তু যা কোন প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। নিজের উপযুক্ত অবস্থা সৃষ্টি করে নিজেই প্রকাশিত হয়।

ভক্তের হৃদয়ে ভগবান নিজেই খেলা করে যান। ভক্তের কাছে শক্তি, জ্ঞান, আনন্দ সবই চলে আসে। দুঃখের মধ্যেও সে আনন্দকেই খুঁজে পায়। সে সর্বত্র ঈশ্বরকেই দেখে। তার ঈশ্বরদর্শন, যোগীর আত্মদর্শন ও জ্ঞানীর ব্রহ্মদর্শন সম অর্থবোধক। সে নিজের নয়ন, শ্রবণেন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি সবই ভগবানকে সমর্পণ করে দেয় বলে গীতা উপনিষদ ভাগবৎ প্রভৃতি অনর্গল তার মুখ দিয়ে বেরোয়।

ঈশ্বরকে কেবল দেখতে হয়। ভক্ত ঈশ্বরকে শুধু দেখে। যোগীর মন যখন খেতে চায় বিবেক তাকে শাসন করে নয়তো কোন ফাঁকে অহংকার এসে প্রবেশ করতে পারে। ভক্তের অহংকার করার কোন অধিকারই থাকে না।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে সর্বনাশের বিনিময়ে শ্রীগীতার প্রকাশ

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ না-হলে গীতা প্রকাশিত হবার সুযোগ পেত না। কাজেই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধটা সকলের কাছে আশীর্বাদ স্বরূপ। বর্তমানের সমস্যাগুলোরও একটা প্রয়োজন আছে। সংসারে অশান্তি না-থাকলে শান্তির সন্ধান কেউ করত না।

জ্ঞানী, যোগী ও ভক্তের পরস্পরের সাধন ভিন্ন হলেও তাদের সিদ্ধির মূল এক

জ্ঞানী ও যোগীকে যে-ভাবে কঠোর নিয়মের মধ্যে চলে ত্যাগ-বৈরাগ্যের অনুশীলন করতে হয় এবং তার জন্য তাদের যে-পরিমাণ পুরুষকার প্রয়োগ করতে হয়, ভক্তি সাধনায় ভক্তকে সেইরূপ কঠোরতা ও পুরুষকার অপেক্ষা শরণাগতি ও দৈবের উপরে নির্ভরতা বেশি রাখতে হয়। আত্মসমর্পণের জন্য ভক্তের কিছুই গায়ে লাগে না।

অবিদ্যাজাত সংশয় হল সাধন-সিদ্ধি পথের অন্তরায়

মনে সংশয় থাকলে সাধনপথে কারও অগ্রগতি হয় না। এই সংশয়ের জন্যই তারা বুঝতে পারে না যে ভগবান প্রতিনিয়ত সকলের মধ্যে অবস্থান করে যথাযথ ব্যবস্থা করছেন, সকলকে রক্ষা করে চলেছেন।

ভক্ত ও ভগবানের সম্বন্ধ

ভক্তকে ভগবান তাঁর হৃদয়ে রাখেন। ভক্ত যেমন ভগবানের মহিমা কীর্তন করে, ভগবানও সেইরূপ সর্বদা ভক্তের গুণগান করেন।

ভালবাসার মধ্যে এমন মাদকতা আছে যা অন্য কোনও ভাবে পাওয়া যায় না। ভক্ত মাতৃনাম বা হরিনামের নেশায় ভজন করতে করতে কোথায় যে ডুবে যায়, তা বাইরের থেকে বোঝা যায় না।

ঈশ্বরের নামের মাহাত্ম্য

সমস্ত শক্তি একত্র করলে যা হয় তার চাইতেও ভগবানের নামের শক্তি অনেক বড়। নাম ও নামী এক। ঈশ্বরের যে-নামই উচ্চারিত হোক সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে নামীর আবির্ভাব হয়। নামী ভিতরে প্রকাশ হয় বলেই মানুষ নাম করতে পারে। নামের শক্তি ভক্ত স্ব-হৃদয়ে অনুভব করে।

ভাব-ভক্তি ভগবানের সঙ্গে অভিন্ন

জ্ঞান সকলে দিতে পারে কিন্তু ভক্তি বাইরে থেকে দেওয়া যায় না। ভগবান ভক্তের কাছে সর্বদাই উপস্থিত থাকেন। ভাবের রূপ অনন্ত অসীম, তাকে মাপা যায় না। ভক্ত ভাব দিয়ে ভগবানকে ভালবাসে। ফুলের সঙ্গে যেমন গন্ধ যুক্ত থাকে, সেইরকম ভক্তির সঙ্গেও ভাব যুক্ত থাকে। শুদ্ধাভক্তির সঙ্গে ভাব থাকবেই। এটা বড় দুর্লভ।

ভাবশুদ্ধি না-হলে ভাবের বিকার হয়

ভক্তের হৃদয়ে ভগবান বাস করে লীলা করেন এটা ভগবানেরই কথা। তথাপি মানুষের মন সংশয়পূর্ণ থাকার জন্য ভাবগুলি এলেও আবার চলে যায়। এজন্য ভাবগুলি সমর্পণ করে দিতে হয়। এ-সবের মধ্যে অহংকারের আমি ব্যবহার করলে সব নষ্ট হয়ে যায়।

নিচুর কাছে নিচু হতে ভগবানই জীবন দিয়ে শেখান

ভগবান নিজে যখন আবির্ভূত হন তখন তিনি সর্বাপেক্ষা অধিক দুঃখ বরণ করে নেন। দীনতম বেশে অতি নিচু হয়ে এঁরা আসেন। মানুষ কখনও এত নিচু হতে পারে না। তারা বড় হতে চায় এবং তার জন্য শুধু দ্বন্দ্ব কলহ নিয়েই থাকে।

যথার্থ ভক্তকে অনেকেই মানতে পারে না

মতবাদের পক্ষপাতদুষ্ট গোঁড়া, ধর্মান্ধ, বিদ্যাভিমানী অনেককেই যথার্থ শুদ্ধভক্তের সম্বন্ধে মন্তব্য করতে শোনা যায়। এটা অজ্ঞানতারই পরিচয়। ধ্রুব, প্রহ্লাদ, হনুমান, চৈতন্যদেব, রামকৃষ্ণদেব প্রভৃতির মত ভক্ত আর কেউ হবে না এরকম কখনও হতে পারে না। শুদ্ধভক্তের জাতি, মান প্রভৃতি থাকে না। কারও সঙ্গে শুদ্ধভক্তের তুলনাও চলে না।

ভক্তের দায়িত্ব ভগবানই নেন

ভক্তকে ভগবানই মলিন অবস্থা থেকে তুলে নিয়ে নির্মল শুদ্ধ অবস্থায় পৌঁছে দেন। সেই অবস্থায় কালীরূপ, দুর্গারূপ, কৃষ্ণরূপ প্রভৃতি সব রূপেতেই সে এক সত্য দেখে। তার কাছে সব ভাবই সত্য।

মতবাদের গোঁড়ামি সত্যানুভূতির অন্তরায়

মতবাদের মধ্যে বসে থাকলে এগোন যায় না। প্রত্যেকের জীবনের লক্ষ্য ভগবান বা ঈশ্বর। মাঝপথে কে, কী বলে বা করে তা দেখবার প্রয়োজন নেই। ছাদে উঠে গেলে দেখা যায়, ছাদও যা দিয়ে তৈরি, সিঁড়িও তাই দিয়েই তৈরি।

যতক্ষণ ভগবানের প্রতি ভালবাসা না-আসে ততক্ষণই মতপথ নিয়ে দ্বন্দ্ব। ঈশ্বরে প্রেম এসে গেলে মন, বাক্য ও কর্ম সমান হয়ে যায়। এই তিনটার সমান অবস্থার নাম হল ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত অবস্থা, প্রশান্ত অবস্থা। সেই অবস্থায় কোন বিকার থাকে না। মানুষের ভিতরে ঈশ্বরের প্রকাশ হলে মানুষের এই রকম প্রশান্ত অবস্থা হয়।

ত্যাগের রহস্য

কর্ম ত্যাগ না করে কর্মের ফলটা শুধু ত্যাগ করতে হয়। সাধারণ মানুষ জগতের ভাবনা ভেবেই অস্থির। শুদ্ধভক্তের কিন্তু কোন ভাবনা থাকে না। তার সম্মুখে যে কর্ম আসে তাই সে অনাসক্ত হয়ে নিষ্কাম ভাবে করে যায়। অর্থাৎ সে দ্রষ্টাবোধে থাকে এবং স্বয়ং ভগবানই তার মধ্যে বসে কর্ম করেন।

সান্তবুদ্ধি অনন্ত ঈশ্বরাত্মাকে জানতে পারে না, কিন্তু মানতে পারে

ঈশ্বরের অনন্ত প্রকাশের মধ্যে বুদ্ধি হচ্ছে একটা সামান্য স্পন্দন মাত্র। কাজেই বুদ্ধির বিচার দিয়ে ঈশ্বরকে মাপা যায় না। সান্ত কখনও অনন্তকে জানতে পারে না। বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী হলেও ঈশ্বরকে জানা যায় না। সিদ্ধ-মহাপুরুষদের মধ্যে পরিপূর্ণ ভাবে ঈশ্বরীয় ভাব প্রকাশিত হয়।

চিত্তশুদ্ধি না-হলে সমাধিসিদ্ধি হয় না

'আমি বোধ' থাকা পর্যন্ত নির্বিকল্প সমাধি হয় না। 'আমার আমি বোধ' পরিপূর্ণ ভাবে চলে গেলে যা থাকে সেটা মুখে ব্যক্ত করা যায় না। সেখানে আমি বা তুমিবোধ কিছুই থাকে না। শুধু বোধে বোধময় অবস্থা।

চিত্তশুদ্ধির তাৎপর্য

অহংকারটা শুদ্ধ হলে হয় ভেদজ্ঞানের লয় ও অভেদ জ্ঞানের উদয়। ঈশ্বরের নামের এমন মহিমা যে, নিয়ত নাম স্মরণ করতে করতে অহংকার শুদ্ধ হয়ে ঈশ্বরের দাস, সেবক, সখা, প্রকৃতি প্রভৃতি হয়ে যায়। শুদ্ধচিত্ত হলে ভগবানের নাম শোনামাত্রই তদ্ভাবে ভাবিত হয়ে যায়। প্রত্যেকের মধ্যেই অনন্ত শক্তি, জ্ঞান, আনন্দ, প্রেম ও শান্তি রয়েছে, কিন্তু সবই আবৃত হয়ে আছে অহংকারবোধে। সাধনার মাধ্যমে তা প্রকাশিত হয়।

ভগবানের অনন্ত মহিমা শুনতে শুনতে মানুষের ভিতরে ভক্তিভাবের ও প্রেমরসের সঞ্চার হয়। তার ফলে, ভিতরের সংকীর্ণতা ও অসম্পূর্ণ অবস্থা দূর হয়ে অনন্ত শক্তি প্রকাশিত হয়।

এক ঈশ্বরীয় শক্তির ত্রিবিধ ব্যবহারিক পরিচয়

প্রত্যেকের ভিতরে এক চৈতন্যশক্তিরই তিনটা স্তর যথাক্রমে দেহেন্দ্রিয়ে মায়া, অন্তর মনে মহামায়া, হৃদয়কেন্দ্রের বোধে যোগমায়া। জীবনের প্রথম অবস্থায় 'আমার আমি' বোধে দেহেন্দ্রিয়ের প্রাধান্যই মায়ার প্রকাশ। দ্বিতীয় স্তরে 'তোমার আমি' বোধে ধর্মজীবন মহামায়ার প্রকাশ। তৃতীয় স্তরে 'আমি আমার' শুদ্ধবোধে যোগমায়া শক্তির প্রকাশ।

মায়া, মহামায়া ও যোগমায়া এই তিন শক্তির একক রূপ যেখানে, সেখানে 'আমির আমি বোধ'। যেখানে এই তিন স্তরের সমষ্টি শক্তি বা অনন্ত শক্তি সত্তার সঙ্গে বিলীন হয়ে থাকে সেটাই হচ্ছে তুরীয় অবস্থা। সেখানে আমার তোমার, আমি ও তুমি প্রভৃতি বোধের ব্যবহার নেই। এই অবস্থা প্রশান্ত অস্তি মাত্র।

এক ঈশ্বরের সাকার নিরাকার ভেদে দ্বিবিধ পরিচয়

মহাপুরুষদের শরীরটাই ঈশ্বর নয়। তাঁদের মধ্য দিয়ে অখণ্ড ঈশ্বরীয় বোধের ভাব প্রকাশিত হয়। ঈশ্বর বললে মহাপ্রাণকেই বোঝায়।

নিম্ন অধিকারীর জন্য রূপের প্রয়োজন হয়। হৃদয়ে ঈশ্বরকে একবার অনুভূত হলে দেখা যায় ঈশ্বর সর্ববস্তুর মধ্যেই রয়েছেন।

ভক্তির চরমতম অবস্থায় ভক্ত একজনকেই পূজা করে। সর্বব্যাপী এক বিশুদ্ধ চৈতন্যসত্তা রূপে, নামে, ভাবে বোধে জ্ঞানী-যোগী ভক্তের দ্বারা যুগ যুগ ধরে আরাধিত হয়ে আসছেন। নির্গুণ সগুণ উভয়ই তার সত্য পরিচয়।

অখণ্ড রূপ-নাম-ভাবের ধারণা ও ব্যবহারের দ্বারা জীবন অখণ্ড স্বরূপের সঙ্গে একীভূত হয়ে যায়

নানারকম বৈচিত্র্যের মধ্যে থাকলেও, ঈশ্বরের মধ্যেই সকলে আছে—এই বিশ্বাসটা সর্ব অবস্থায় সকলকে রক্ষা করে। প্রেমময়ী মা, করুণাময় গুরু সকলকেই কোলে রেখেছেন।

সর্বরকম বৈচিত্র্যময় প্রকাশকেই সমবোধে সর্বদা গ্রহণ ও ব্যবহার করলে নিত্য ঈশ্বরবোধে যুক্ত থাকা যায় এবং ঈশ্বরের পরিচয় পূর্ণ ভাবে পাওয়া যায়। ভগবানের সঙ্গে যখন বোধে একাত্ম হয়ে যায় কেউ তখন নাম, যশ, অর্থ আর সে চায় না।

সৎসঙ্গের মাধ্যমেই সচ্চিদানন্দস্বরূপের সত্তা প্রকাশিত হয়

পরমানন্দে থাকতে হলে সৎসঙ্গের সাহায্য নিতে হয়। ভগবৎ-মহিমা শুনতে শুনতেই আনন্দের সন্ধান পাওয়া যায়।

শুধু শক্তি পেলে বিব্রত হতে হয়। তখন এর থেকে একটা অভিজ্ঞতা মাত্র লাভ হয়। শক্তির বিকার হয়। শক্তি মনোধর্ম কিন্তু বোধের ধর্ম নির্বিকার, সমান। মনে অভিজ্ঞতার মাত্রা পূর্ণ হলে বোধস্বরূপের প্রকাশ হয়। বোধস্বরূপের প্রকাশই ঈশ্বরের প্রকাশ।

অর্থ ও পরমার্থের ব্যবহার সিদ্ধ হয় অখণ্ডবোধে, খণ্ডবোধে নয়

অর্থ না-থাকলে চাওয়ার প্রবৃত্তি থাকে, আবার অর্থ বেশি থাকলেও অশান্তি। তার চাইতে এ দুটোর কোনটাকেই না-চাওয়া অথবা দুটোকে সমবোধে মেনে নিলেই সমত্বে প্রতিষ্ঠিত থাকা যায়। সমত্বই হচ্ছে ঈশ্বরের তথা আত্মবোধের স্বরূপ। সমত্বই হল যোগ (শ্রীগীতার ভাষায়)।

সৎসঙ্গের মাহাত্ম্য

প্রত্যেকের ভিতরে যে অহংকারের আমি আছে সে আসল সারবস্তু সমত্বকে ভুলে থাকে। সূর্য উঠলে অন্ধকার যেমন দূর হয়ে যায়, সেইরকম সৎসঙ্গের মাধ্যমে অজ্ঞান-মোহরূপ আঁধার দূর হয়।

দ্বৈতবোধে হয় ভীতি ও ভ্রান্তি, অদ্বৈতবোধে তার হয় অবসান

ভগবানের প্রকাশ হলে মৃত্যুভয় থাকে না। তখনই পূর্ণ শান্তি হয়। আবার মৃত্যুভয় না-থাকলেই মুক্তি বা ঈশ্বরের প্রকাশ হয়। এ-ই হল পূর্ণতার লক্ষণ।

সৎসঙ্গের তাৎপর্য

কৃষ্ণের বাঁশী শুনে, শিবের সঙ্গীত শুনে গোপীদের বা ভক্তের যেমন চাওয়া-পাওয়া, অভাব-অভিযোগের দিকে খেয়াল থাকত না, সৎসঙ্গের কথাগুলি শুনতে শুনতে মানুষেরও সেইরকম অবস্থা হয়। পরে একদিন সে দেখতে পায় ও জানতে পারে যে পূর্ণতার সঙ্গে সে যুক্ত হয়েই আছে।

সমবোধে বা সাক্ষীবোধে অন্তরে বাইরে সবকিছু 'মেনে মানিয়ে চলাই' হল সর্ব সাধনার সার

সংসারে যে-যেমন ভাবে চলছে তেমনই চলতে পারে যদি সমবোধে দৃষ্টিভঙ্গিটা পরিবর্তন করে নেয়। সর্বদা সাক্ষীচেতা হয়ে দেখার অভ্যাস করতে হয় যে, প্রত্যেকের ভিতরে মা-ই সব করে যাচ্ছেন, মানুষ কিছুই করে না।

সমসার দৃষ্টিতে সংসারকে মানতে পারলেই পরাসিদ্ধি লাভ হয়

এই বিরাট বিশ্বের বাইরে কারওর যাবার উপায় নেই। ডাঙ্গাতে কেউ কখনও সাঁতার শিখতে পারে না। ডাঙ্গায় বাস করেও জলে নেমে জল না-খেয়ে যেমন কখনও সাঁতার শেখা যায় না সেই রকম সংসারের অভিজ্ঞতা না-নিয়ে সংসার ত্যাগ করলেও ঈশ্বর উপলব্ধি পুরোপুরি হয় না। এই সংসারে থেকেই সারবস্তুটি বার করে নিতে হয়।

অহংকারের সীমার দৃষ্টিতে অসীমকে সসীম দেখায়, গুরুবাণী অনুসারে চললে সীমার মধ্যে অসীমের প্রকাশ হয়

মহাপ্রাণসমুদ্রের মধ্যে থেকেও যদি কেউ ক্ষুদ্র মন ও বুদ্ধি নিয়ে থাকে তাহলে গণ্ডীর মধ্যে বা সীমার মধ্যেই সে বাস করে। মহাপ্রাণসমুদ্রের মধ্যে মিশে গেলে আর নানাত্ব বহুত্বের প্রভাব থাকে না। অহংকার শোধন করে ত্বংকারে থাকতে হয়।

প্রবৃত্তির পথে হয় বৈচিত্র্যের প্রকাশ, নিবৃত্তির পথে হয় বৈচিত্র্যের নাশ

অতিরিক্ত বহির্মুখী দৃষ্টিভঙ্গি থাকার জন্য জীবনে মৃত্যুভয় আসে কিন্তু অন্তর্মুখী মনে অনাসক্ত ভাবে অমৃত বোধে অভী হয়ে থাকা যায়।

অমৃতের মধ্যে বাস করতে পারলে ক্রোধ মোহ কামনা বাসনা প্রভৃতি আর থাকে না। অমৃতত্ব লাভের জন্মগত অধিকার সকলেরই আছে। বিশ্বাস ধরে এগিয়ে গেলে সকলেই সেই অবস্থায় পৌঁছতে পারে কারণ প্রত্যেকের ভিতরেই তা আছে কিন্তু সে-সম্বন্ধে অনেকেই সচেতন নয়। সদ্‌গুরুই শিষ্যকে সেই অবস্থায় পৌঁছে দেন।

অনাত্মার সঙ্গ ও প্রভাবে আত্মার জীবদশাপ্রাপ্তি হয়, আবার আত্মগুরুর সঙ্গ ও অনুগ্রহে জীবের আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠা হয়

এক সিংহশিশু ভেড়ার দলে বড় হয়ে ভেড়ার অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছিল। কিন্তু সিংহের দ্বারাই আবার সে তার স্বরূপের বোধ ফিরে পায়। বর্তমানে মানুষেরও সেইরূপ অবস্থা, নিজের স্বরূপকে সে ভুলে গেছে। সদ্‌গুরুই সকলকে স্বরূপের পরিচয় দিয়ে স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করে দিতে পারেন।

স্বরূপের ঘরে পৌঁছবার বিশেষ উপায় হল দৃঢ় বিশ্বাস। ভক্তির পথই রসাল। সতর্কতার সঙ্গে অতি সহজে স্বয়ং ঈশ্বরই সেই নির্বিকার অবস্থায় ভক্তকে পৌঁছে দেন। [১২। ৮। ৬৮]

অখণ্ড চিদানন্দ সত্তাই ব্যক্তি ও নৈর্ব্যক্তিক রূপে অভিব্যক্ত হয়

পৃথিবীর সর্ববস্তুর মধ্যে একটা আকর্ষণ শক্তি আছে। তার মূলে সর্বব্যাপী এক অখণ্ড বিশুদ্ধ চৈতন্য সত্তা বিদ্যমান। একেই ভগবান বলে। এ কোন ব্যক্তিবিশেষ না হলেও ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে এরই অভিব্যক্তি দেখা যায়।

চিদানন্দস্বরূপ ঈশ্বরাত্মা সর্বপ্রকাশের প্রকাশক

ঈশ্বর আনন্দস্বরূপ। যেখানেই আনন্দের প্রকাশ, সেখানেই সকলে আকৃষ্ট হয়। সবকিছুর মধ্যে আনন্দ আছে বলেই তার প্রতি সকলের আকর্ষণ থাকে। এই আনন্দের আকর্ষণ শক্তি সৃষ্টি, স্থিতি সংহারের মধ্যে সমভাবে বিদ্যমান।

ধ্বংসের মধ্যে যে আনন্দ আছে তার দ্বারা নূতন সৃষ্টির ইঙ্গিত পাওয়া যায়। মৃত্যুর মধ্যেও যে আনন্দ লুকিয়ে আছে তা-ও প্রমাণিত হয়েছে; কিন্তু সেই আনন্দের সন্ধান সাধারণ লোকে জানে না।

সত্যের মূল হল হৃদয়ে, বাইরে তার প্রকাশ-আভাস

সকলেই পূর্ণ শান্তি পেতে চায় কিন্তু বাস্তব জগতের সীমাবদ্ধ বস্তুর মধ্যে তা খুঁজে পেতে চায় বলেই চিরস্থায়ী আনন্দ তারা পায় না। আবার কখনও কখনও এমনও দেখা যায় যে চারদিকের আকর্ষণীয় বস্তুর দিকে দৃষ্টিপাত না-করে অনেকে আত্মভোলা সাধু লোকদের কাছে যায় স্থায়ী আনন্দ বা শাশ্বত শান্তিলাভের জন্য।

শাশ্বত শান্তির সত্য পরিচয়

শাশ্বত শান্তি বা স্থায়ী আনন্দ বললে একটা অপরিবর্তনীয়, অচল, স্থিতিশীল বা জড় অবস্থাকে বোঝায় না। সমষ্টিজীবনের গতির সঙ্গে ব্যাষ্টিজীবনের গতির অভেদ মিলনে শাশ্বত আনন্দ অনুভূত হয়। অথবা সমগ্র শক্তির অতীত অখণ্ড শাশ্বত বোধসত্তার স্থিতিতে অর্থাৎ বিশ্বাতীত বিশুদ্ধ চৈতন্যসত্তার ধ্রুবাস্মৃতিতে ভূমা সুখ ও শান্তি অনুভূত হয়।

সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরাত্মার সগুণ নির্গুণ দ্বিবিধ স্বভাব

ঈশ্বর প্রশান্ত, স্থির এবং নিষ্ক্রিয়; আবার তিনি সক্রিয় এবং গতিশীল। অর্থাৎ নির্গুণ সগুণ উভয় স্বভাবেই তিনি বিদ্যমান। তিনি সর্বব্যাপী, সর্বধারী, সর্বজ্ঞ, সর্বপ্রকাশের অধিষ্ঠানসত্তা ও সক্রিয় শক্তি। তাঁর এই গতির মধ্যে মিশে গেলেই ব্যষ্টিজীবনের মধ্যে অনন্ত শক্তি, অনন্ত জ্ঞান, আনন্দ প্রভৃতি অনুভূত হয়।

দৃশ্যের স্বরূপ জড় হলেও দ্রষ্টার স্বরূপ চৈতন্যময়

সসীম অবস্থা হচ্ছে জড় অবস্থা। জীবন কখনও জড় নয়। মহাপ্রাণের থেকে যে প্রাণের অভিব্যক্তি তা জড় হতে পারে না। কেন্দ্রের দিকে যতই অগ্রসর হওয়া যায় অর্থাৎ ঈশ্বরের গতির সান্নিধ্যে যাওয়া যায় ততই বহির্বিশ্বের বৈচিত্র্যের প্রতি মানুষের আসক্তি কমে যায়।

জ্ঞানসিদ্ধ মহাপুরুষের সান্নিধ্যেই অপরেও জ্ঞানসিদ্ধ হয়

যাঁরা অনন্ত শক্তি, অনন্ত জ্ঞান ও আনন্দের অধিকারী হয়েছেন তাঁদের সংস্পর্শে গেলে তাঁরা মানুষের মধ্যে ঈশ্বরীয় ভাব জাগ্রত করে দেন।

ক্রমবিবর্তনবাদের বিজ্ঞান স্থূল দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না, স্ববোধের দৃষ্টিতে তা হৃদয়েতে অনুভূত হয়

যেমন শৈশব থেকে ক্রমে ক্রমে মানুষ বার্দ্ধক্য অবস্থায় কেমন করে পৌঁছায় তা বিষদ ভাবে মনে রাখতে পারে না, সেইরকম আত্মবোধের ক্রমবিকাশের পদ্ধতিটা প্রথমে ধরা পড়ে না। দীর্ঘদিন ঈশ্বরীয় ভাবে জপতপ সাধনভজন করার পরে সাধকেরা ঈশ্বরীয় বোধে প্রতিষ্ঠিত হন।

সৎসঙ্গের গুরুত্ব অপরিহার্য

সৎসঙ্গের একান্ত প্রয়োজন। নিরন্তর সৎসঙ্গের মাধ্যমেই কামনা-বাসনাগুলি নষ্ট হয়ে যায়। যাঁরা সমত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন এবং যাঁদের জীবনে সমবোধের একতানগতি চলছে তাঁদের সঙ্গই করতে হয়। বড় জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান হলেও ঈশ্বরীয় ভাববিহীন শুধু নীরস বিচার বিশ্লেষণ দ্বারা শান্তিলাভ হয় না।

সমানে শান্তি, অসমানে শাস্তি ও অশান্তি

যাঁরা সমত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন তাঁদের কাছে গেলে সর্বদা তাঁদের কথাবার্তা, আচরণ, ভাবভঙ্গি সবকিছুর মধ্যেই দিব্যভাবের প্রকাশ দেখা যায়। তাঁদের সঙ্গের প্রভাবে বেশ অল্প কিছুদিনের মধ্যেই মানুষের অন্তরের ভাব পরিবর্তিত হয়।

ভেদজ্ঞান থেকেই হয় ভীতির জন্ম, অভেদজ্ঞান অভী করে দেয়

যতদিন পর্যন্ত মানুষের ক্ষুদ্র সসীম বস্তুর প্রতি আকর্ষণ থাকে, ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দ থাকে এবং পরস্পরের প্রতি ভেদবুদ্ধি থাকে ততদিন পর্যন্ত তাদের মৃত্যুভয় থাকে। তাদের সুখ-শান্তি লাভের আশা স্বপ্ন মাত্র।

সুখী লোকেরা দুঃখীর দুঃখ বোঝে না, বুঝতেও চায় না

অনেকে ভাবে ঈশ্বরকে সব সমর্পণ করে দিলে খাওয়াবে কে ? ভোগ ঐশ্বর্য ও সুখের মধ্যে বাস করে যাদের মনে এইসব প্রশ্ন জাগে তারা কখনও বুঝতে পারে না দীন দরিদ্র রাস্তার ভিখারিদের জীবন কী ভাবে চলে।

ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে পরস্পরবিরোধী স্বভাব

ধনীরা দারিদ্র্যকে ভয় পায় কিন্তু গরিবরা দারিদ্র্যকে ভয় পায় না। তারা ধনীকে ভয় পায় অথচ ঐশ্বর্যের কামনা করে। মানুষের শুদ্ধ স্বভাব ধনীও নয়, দরিদ্রও নয়।

ধনীরা প্রাচুর্যের মোহে আছন্ন থাকার জন্য শান্ত নির্বিকার কিছুতেই হতে পারে না। আবার গরিবরাও অভাব অনটনের জন্য শান্ত ও স্থির থাকতে পারে না। অভাব ও প্রাচুর্যের বোধ শান্তিলাভের অন্তরায়।

প্রাচুর্য ও অভাব উভয়ই পক্ষান্তরে শান্তির অন্তরায়

ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে শান্তিলাভ কখনও হতে পারে না। পৃথিবীর ঐশ্বর্যশালী দেশগুলি প্রাচুর্যের আতিশয্যরূপ ব্যাধিতে ভুগছে; আবার দরিদ্র দেশগুলি অভাব অনটনের পীড়নে ভুগছে। এই রকম ধনী দরিদ্র উভয় দেশই প্রাচুর্য ও অভাবের বিকারজনিত ফলভোগে অসংযত ও অশান্ত জীবনের প্রত্যক্ষ প্রমাণ ও পরিচয়। যথার্থ শান্তির সন্ধান তারা জানে না এবং তাদের কাছ থেকে তা কেউ পেতে পারে না।

ঈশ্বরভিত্তিক যেই দেশের আদর্শ ও সংস্কৃতি সেই দেশই যথার্থ শান্তির ধারক ও বাহক

একমাত্র ঈশ্বরীয় ভাবধারায় আবহমান অনুপ্রাণিত ও পরিচালিত দেশই সর্ব অবস্থায় জীবনের ভার সমতা রক্ষা করে চলতে পারে। সংযত ও শান্ত অন্তরপ্রকৃতির গঠনমূলক শিক্ষা ও আদর্শের তারা-ই যথার্থ অধিকারী। তাদের কাছেই যথার্থ শান্তি ও মুক্তিলাভের অথবা ঈশ্বর ও আত্মানুভূতির সর্বোত্তম বিজ্ঞান পাওয়া যায়।

শান্তি সাধনার বিজ্ঞান স্বতন্ত্র

জীবনে যথার্থ শান্তি চাইলে তার জন্য তদনুরূপ সাধনপথ অনুসরণ করতে হয়। শুক্তোর মত মাংস রাঁধলে যেমন মাংসের যথার্থ আস্বাদন হয় না, আবার মাংস রান্নার মত শুক্তো রান্না করলে শুক্তোরও যথার্থ আস্বাদ পাওয়া যায় না, সেইরকম যথার্থ শান্তি, মুক্তি ও ঈশ্বরানুভূতির জন্য তদনুরূপ সংযম ও সাধনার বিজ্ঞান পরিপূর্ণ ভাবে অনুসরণ না-করা হলে যথার্থ ফল পাওয়া যায় না।

সিদ্ধিলাভের রহস্য

তীব্র ব্যাকুলতা, নিষ্ঠা ও একাগ্রতা সহকারে সাধনায় রত হলে স্বল্পকালের মধ্যেই আশাতিরিক্ত ফল পাওয়া সম্ভব হয়।

শুদ্ধভক্ত গুরুকৃপায় ঈশ্বরাত্মার উপলব্ধি পায়

যথার্থ ভক্ত না-হলে গুরুকৃপা ইষ্টকৃপা পাওয়া যায় না। গুরুকৃপা ব্যতীত ঈশ্বরোপলব্ধি বা আত্মোপলব্ধি হওয়া সম্ভব নয়।

ভাবের ঘরে চুরি না-করে শুদ্ধ ভাবের আচরণ দ্বারাই নিজের মুক্তি এবং অপরের মুক্তিও সম্ভব হয়

সাধু সন্ন্যাসী না-সেজে অন্তরের সাধুবোধ জাগানোই জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত। ঈশ্বরীয় বোধে সরল শিশুর মত স্বভাব হয়ে যায়। ঈশ্বরীয় ভাব সকলের মধ্যে প্রকাশিত হলেই সমাজের যথার্থ কল্যাণ হয়।

শুদ্ধ বুদ্ধির মধ্যেই সত্যের প্রকাশ হয়, স্ববোধে সব 'মেনে মানিয়ে চলার' মাধ্যমে বুদ্ধি শুদ্ধ হয়

শুধু বুদ্ধির সাহায্যে সত্যের সন্ধান মেলে না। প্রাণধর্মে স্বভাবমহিমার সঙ্গে অন্তরের বোধ মিলিত হলে অমৃতত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রাণের বোধে মনটাকে যুক্ত রাখতে হয়। প্রাণকে দেখার মানেই ঈশ্বরকে দেখা। প্রাণের মধ্যে মনটা ডুবে গেলে ঈশ্বরের স্পর্শ অনুভব করা যায়।

প্রাণ ধরে সাধনাই সহজতম

অতীতের সঙ্গে মেলাতে গেলে বর্তমানে চলা যায় না। তার চাইতে প্রাণকে ধরে চলা অনেক সহজ। সর্বভূতে প্রাণকে দেখার নামই ব্রহ্মদর্শন।

দীর্ঘকাল কঠোর তপস্যা করা বর্তমানে ক্ষীণজীবি মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। ইচ্ছামত কঠোর তপস্যা করে দেহের ও মস্তিষ্কের বিকার হতে পারে এবং অতিরিক্ত মাত্রায় অহংকার ও অভিমান বাড়তে পারে। অতিরিক্ত অহংকার অভিমান সত্যানুভূতির অন্তরায়। কাউকে ছোট করে নিজে বড় হওয়া যায় না।

শান্তিলাভের উপায় মেনে চললেই শান্তিলাভ হয়

ক্ষুদ্র 'অহংকারের আমি'র পরিশোধন হওয়া দরকার। অহংকারের জন্য আজকাল মা-বাবাকে প্রণাম করতে বা শ্রদ্ধা করতেও অনেকে ভুলে গেছে। শান্তি পেতে চাইলে শান্তিলাভের উপায়গুলি হুবহু মেনে চলতে হয়।

মন, মুখ ও কাজ একসুরে হলেই সিদ্ধিলাভ হয়

সাধারণত লোকে শ্রবণ করে একরকম, বলে এক রকম, কাজ করে অন্যরকম। কোনটার সঙ্গে কোনটার সামঞ্জস্য থাকে না বলে তাদের মনের অশান্ত ভাব দূর হয় না।

ইষ্টনিষ্ঠা ও নির্ভরতাই হল পরম সিদ্ধিপ্রদ

লোকে ভাবে কী ভাবে সংসার চালাব। 'আমার বোধে' কর্তৃত্বাভিমানে সংসারে সকলে কাজকর্ম করে বলেই কর্তব্যের অজুহাতে তাদের মনে এ-সব প্রশ্ন জাগে। ঈশ্বরের উপর পরিপূর্ণ ভাবে নির্ভর করলে ঈশ্বরই সব প্রয়োজন মেটাবার ব্যবস্থা করেন।

যথার্থ ব্যবহারের মাধ্যমে জীবনের দিব্য রূপায়ণ হয়

সবকিছুর যথার্থ ব্যবহার না-হলে ব্যবহারদোষে দুঃখকষ্ট, অশান্তি আসে। ভগবান যদি কাউকে প্রচুর ঐশ্বর্য দেন এবং সে ঐশ্বর্যের যথার্থ ব্যবহার সে না-করে তাহলে পরের জীবনে তাকে দারিদ্র্যের মধ্যে থাকতে হয়।

অকৃতজ্ঞতাবোধে ব্যবহারদোষে বিকারের ফলে ভূঃ এবং ভুবর্লোক পর্যন্ত বারবার মানুষকে যাতায়াত করতে হয়। স্বঃ পর্যন্ত গেলে অনেকটা রেহাই পাওয়া যায়। কারণ স্বঃলোক হচ্ছে ধার্মিক ও সাত্ত্বিক প্রকৃতি লোকের স্থান। এরই অপর নাম স্বর্গ। মহঃ ও জন হচ্ছে অন্তরমন ও হৃদয়। একেই বলা হয় ব্রহ্মা বা স্রষ্টার আবাসভূমি। এখানে সাধারণ মানুষ প্রবেশ করতে পারে না। তপর্লোক হচ্ছে জীবাত্মার ভূমি। তারপরে সত্যলোক, ঈশ্বর বা আত্মার ভূমি।

দৃশ্যবোধে অজ্ঞানে বাস, দ্রষ্টা-সাক্ষীবোধে অজ্ঞানের বিনাশ

পৃথিবী বা বাস্তববোধ নিম্নমনের প্রকাশ। এই বাস্তবের দৃশ্যবোধ অর্থাৎ সৃষ্টির বোধে যুক্ত মন অজ্ঞান মোহ আসক্তি ও বিকারগ্রস্ত। এ-ই জীবনের বন্ধন। অনাত্মাবোধে এগুলি বাস্তব। 'আমার বোধে' অহংকার অভিমানই মোহ অজ্ঞান। আত্মবোধে অর্থাৎ 'আমি আমার' বা 'আমির আমি' বোধে সবই অখণ্ড সত্য অদ্বয় অব্যয় ব্রহ্ম আত্মা ঈশ্বর—স্বয়ংপূর্ণ স্বয়ংপ্রকাশ সচ্চিদানন্দঘন ভূমাস্বরূপ।

ঈশ্বরবোধে সব 'মেনে মানিয়ে চললে' এবং তাঁর উপর নির্ভর করলে অজ্ঞানমুক্ত হওয়া যায়

পৃথিবীর সবকিছু ঈশ্বরেবোধে না-মানা পর্যন্ত দুঃখ দুর্দশার থেকে, নানাত্ব বহুত্বের থেকে রেহাই নেই কারওর।

প্রার্থনা করতে হয়—"আমি অন্ধ, খোঁড়া; তুমি আমাকে ধরে নিয়ে চল।" এইভাবে নিরন্তর প্রার্থনা করলে এবং ঈশ্বরের উপর পরিপূর্ণ ভাবে নির্ভর করলেই সব হয়ে যায়। এই বিশ্বাসটা দৃঢ়ভাবে ধরে রাখতে পারলে অপরের মধ্যেও এই বিশ্বাস সঞ্চারিত হয়।

বিশ্বাসের তাৎপর্য

বিশ্বাস হচ্ছে ভগবানের আসন। বিশ্বাসের মধ্য দিয়েই সে অসম্ভবকে সম্ভব করে দেয়। যার কোন সামর্থ্য নেই, যার জীবনভর সংগ্রাম করে যেতে হয় তার মাধ্যমেও ঈশ্বর অনেক কাজ করে যান। জ্ঞান যোগ কর্ম ও ভক্তি এই সর্ববিধ সাধনের মধ্যে বিশ্বাসই মৌলিক ভিত্তি। বিশ্বাসের অর্থ বি + শ্বাস—বিগত শ্বাস। শ্বাস অর্থে

গতি, কর্মকে নির্দেশ করে। সর্ব কর্ম ও গতি যেখানে শেষ হয়ে যায় তা হল আত্মা (সমবোধ)। সমবোধে স্থিতি ও প্রতিষ্ঠাই হল বিশ্বাসের তাৎপর্য ও মর্মার্থ। অন্য অর্থে বিধিগত শ্বাস হল বিশ্বাস, অর্থাৎ সমবোধে, একবোধে বা আপনবোধে সবকিছু ব্যবহারই হল বিশ্বাস[১]।

শ্রদ্ধার তাৎপর্য

প্রত্যেকের জীবনই শ্রদ্ধা দিয়ে গড়া। শ্রদ্ধা অনুরূপ প্রত্যেকের জীবন হলেও জীবনে শ্রদ্ধার পূর্ণ অভিব্যক্তি না-হওয়া পর্যন্ত জীবন পূর্ণ শান্তি ও মুক্তি লাভ করতে পারে না। এই শ্রদ্ধার যথার্থ অনুশীলন দ্বারাই শ্রদ্ধার পূর্ণ বিকাশ হয়। তার ফলে ঈশ্বরীয় বোধে জীবন পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রদ্ধা বিশ্বাসেরই এক বিশেষ রূপ। শ্রদ্ধার মর্মার্থ হল সত্যকে ধারণ করার নির্বিশেষ যোগ্যতা। সত্যই সত্যকে ধারণ করে, মিথ্যা সত্যকে ধারণ করতে পারে না। শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস এক বোধ ও ভাবেরই দ্বিবিধ ব্যবহার। মহাজন বাণী হল, "বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর।" এখানে বস্তু অর্থে পরম ইষ্টকে অর্থাৎ ঈশ্বর-আত্মাকেই নির্দেশ করে, আবার "শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানম্" অর্থাৎ শ্রদ্ধাবান ব্যক্তিই জ্ঞানলাভের অধিকারী, অপরে নয়। শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস যখন এক/সমার্থবোধক, অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধাও সেইরূপ একার্থবোধক। পূর্বেরটা এবং পরেরটা উভয়ই পরস্পরবিরোধী। এটা দ্বৈতবোধেরই বৈশিষ্ট্য। কিন্তু অদ্বৈতবোধ অখণ্ড বলে সেখানে স্বগতভেদ, স্বজাতীয় ভেদ ও বিজাতীয় ভেদ—এই ত্রিবিধ ভেদের কোনও অস্তিত্ব নেই। অধ্যাত্মবিদ্যায় শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের তাৎপর্য ও মহিমা সর্বাপেক্ষা অধিক। [১৩। ৮। ৬৮]

জগতে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের তত্ত্ববিজ্ঞান

এক অখণ্ড পূর্ণ বিশুদ্ধ চৈতন্যসত্তার বুকে তার অনন্ত প্রকাশ বিভূতির ঘনীভূত রূপ এই বিশ্বজগৎ। ভূমা বোধসত্তাকে কেন্দ্র করে তার এই অনন্ত প্রকাশধারার সৃষ্টি, বৃদ্ধি বা প্রসারতা, স্থিতি ও লয় সাধিত হয়। বোধময় এই সত্তাই হল সর্বজীবনের উৎস। জীবনের সর্ববিধ প্রয়োজনীয় উপকরণ কেন্দ্রসত্তার থেকেই আসে।

কেন্দ্রসত্তা থেকে কেউ বিচ্ছিন্ন নয়। শুধু বৈচিত্র্যময় বহির্প্রকাশের দিকে মানুষের মনের দৃষ্টি অধিক থাকার ফলে কেন্দ্রের অখণ্ড বোধময় পূর্ণ সত্তার স্মৃতি সাধারণত আবৃত থাকে। মনের বোধে নিজেদের পৃথক ভেবে মানুষ মৃত্যুভয় ও নানাবিধ চিন্তাভাবনার দ্বারা প্রপীড়িত হয়ে অস্থির ও চঞ্চল হয়। সেজন্য মহাপুরুষগণ সকলকে এই সত্তার পরিচয়টা ধরিয়ে দিয়ে যান।

সৃষ্টির মূল সত্তার পরিচয় সাধনার মাধ্যমে সিদ্ধ হয়

রূপ, নাম, ভাব, শক্তি, জ্ঞান প্রভৃতি বোধময় অখণ্ড সত্তারই ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ মাত্র। এই সত্যকে উপলব্ধি করাই হল মনুষ্যজীবনের একমাত্র লক্ষ্য। এই সত্য উপলব্ধিই হল আধ্যাত্মিক সাধনা বা প্রাণের সাধনা।

জীবন সাধনার রহস্য হল অন্তরশক্তির সাহায্যে বৃহত্তর একটা নূতন গতি সৃষ্টি করা, যার দ্বারা পূর্ণতা অনুভব করা যায়।

ঈশ্বর হলেন মৌলিক সত্তা, মিশ্র বা যৌগিক সত্তা নয়

ঈশ্বরের মধ্যে ঈশ্বর ছাড়া অন্যকিছু সত্তা নেই। সর্ববিধ বৈচিত্র্যের মধ্যে এক ঈশ্বরই নিত্য বিদ্যমান। মনের দৃষ্টিতে প্রাণের, তথা বোধসত্তার, প্রকাশধারাতে ভেদ বা পার্থক্য কল্পিত হয়। তার ফলে বৈচিত্র্যময় নামরূপের

১। অভিনব সংজ্ঞা।

ধারণা সৃষ্টি হয়। প্রতিটি রূপ ও নাম আপাতদৃষ্টিতে অর্থাৎ মনের ধর্ম অনুযায়ী স্বতন্ত্র ও পৃথক পৃথক সত্য বলে মনে হয়। এ-ই নিত্যসত্যের বুকে মনের ভ্রান্তিবিলাস।

মৌলিক সত্তার বুকে নাম, রূপ কল্পিত—ইন্দ্রিয়ে বিষয়

নাম, রূপের কোন পৃথক অস্তিত্বসত্তা নেই। তা নিত্য বোধসত্তারই প্রকাশ স্বরূপ। সর্ববস্তুকে ঈশ্বরীয় নাম যুক্ত করে তদ্‌বোধে ব্যবহার করলে মনের ভ্রান্তি দূর হয় এবং ঈশ্বরীয় বোধের স্বরূপ স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশিত হয়।

ঈশ্বরপ্রসঙ্গ অনধিকারীর কাছে শুনলে বিভ্রান্তি হয়, অনুভবসিদ্ধদের কাছে শুনলে বিভ্রান্তি কাটে, বিশ্বাস দৃঢ় হয়

ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন নাম বা সাধনপ্রণালীর কথা শুনে মানুষ বিভ্রান্ত হয়; কাজেই মহাপুরুষগণ বোধস্বরূপ মহাপ্রাণকেই ধরিয়ে দেন সহজ করে। এই মহাপ্রাণের সঙ্গে মনটাকে যুক্ত করতে হয়। মহাপ্রাণের মধ্যে নাম, রূপ সবই সত্য। প্রথমে জড়ের মধ্যে এই সত্য উপলব্ধি করা খুব কঠিন। মহাপ্রাণই মানুষের সব চেয়ে নিকটে। অনন্ত শক্তি এই প্রাণের।

মানুষের জন্মজন্মান্তরের সংস্কারাদি প্রাণ থেকে উঠে প্রাণের মধ্যেই সঞ্চিত থাকে, এগুলি ঈশ্বরাত্মবোধের অন্তরায়

মানুষের অনন্ত জীবনের কামনা-বাসনার সংস্কার কাঁথা সেলাইয়ের মত এই প্রাণের মধ্যে গাঁথা রয়েছে। এই সংস্কারগুলির জন্যই মূলপ্রাণ তথা বোধসত্তার সন্ধান পাওয়া যায় না। সকলে বাইরে এই প্রাণকেই খুঁজে বেড়ায়, কিন্তু মহাপুরুষদের নির্দেশ মেনে চললে অন্তরে এই প্রাণের পরিচয় সহজে মেলে।

ভগবান হলেন অখণ্ড প্রাণচৈতন্য, বহু সাধনা ও তপস্যার মাধ্যমে প্রথমে হৃদয়েতে তাঁর উপলব্ধি হয় পরে বাইরেও হয়

চৈতন্যস্বরূপ প্রাণই ভগবান। মহাপুরুষগণ পাহাড়ে পর্বতে নিজেরা বহু তপস্যা করে এটা উপলব্ধি করেন এবং কৃপা করে সকলকে ধরিয়ে দেন। এই ভাবে তাঁদের মাধ্যমে সকলে ঈশ্বরের অনন্তস্বরূপ উপলব্ধি করার সুযোগ পায়।

সিদ্ধকে অনুসরণ করেই অপরে সিদ্ধ হয়, সিদ্ধগুরুর মহিমা কীর্তনই যথার্থ গুরুদক্ষিণা

মহাপুরুষদের নির্দেশ মেনে চললে অপরেও তাঁদের মত মহাপুরুষ হতে পারে। গুরুদক্ষিণা এ ভাবেই দিতে হয়। যখন অনন্ত অসীমের সঙ্গে যুক্ত হওয়া যায়, প্রাণ দিয়ে প্রাণের সঙ্গে মিশে যাওয়া যায়, তখনই ঠিক ঠিক গুরুদক্ষিণা দেওয়া হয়।

স্বানুভবসিদ্ধ পুরুষ তাঁর স্বানুভূতির বিজ্ঞান ব্যক্ত করে যান অপরের জন্য

মহাপুরুষগণ তাঁদের পূর্ণ সত্য উপলব্ধির বিজ্ঞানের এমন একটা মৌলিক ছাঁচ রেখে যান, যা অবলম্বন করে অপরেও তদনুরূপ সত্য উপলব্ধি করতে পারে।

জীবনের বহির্মুখী দৃষ্টিকে অন্তর্মুখী করার অভ্যাস করলে অতি সহজে অনুভব করা যায় যে মনের সর্ববিধ চাওয়া-পাওয়ার মূলে আছে অন্তরের প্রাণচৈতন্য। তারও কেন্দ্রে রয়েছে অখণ্ড বিশুদ্ধ নির্বিকার চৈতন্যসত্তা। এ-ই পরমব্রহ্ম, পরমাত্মা, পরমেশ্বর, ভগবানের স্বরূপ।

অন্তরাত্মাই গুরু—তিনিই স্বয়ং সাধ্য, সাধক, সাধন ও সিদ্ধি পরম

অন্তরপ্রাণচৈতন্যই সকলের গুরু, ইষ্ট বা মা। সৃজন, পালন, নিধন, পূরণের নিয়ন্তা এই অন্তরপ্রাণচৈতন্যই সকলকে জন্ম দিয়ে, ধারণ করে, পালন করে পরিশেষে পূরণ করে আপনার মাঝে পুনরায় বিলীন করে নেয়।

অন্তরপ্রাণের দিকে দৃষ্টি গেলেই সমত্ববোধের অন্তরায়গুলি আস্তে আস্তে চলে যায়। এটা শুধু আশ্বাসবাণী নয়, এটাই একমাত্র সত্য।

প্রাণ ও মনের ঐক্যে সিদ্ধি, অনৈক্যে দ্বন্দ্ব-বিরোধ

মহাপ্রাণরূপী মাতার কাছে সন্তানের দাবি নিরন্তর থাকে, এটা অতীব সত্য। অন্তরপ্রাণের কাছে মনের দাবি অকপট ভাবে নিবেদন করলে সহজে তার সঙ্গে মনের যোগাযোগ হয়। তার ফলে সে মনের দাবি সহজে পূরণ করে। তখন অন্তরপ্রাণের প্রত্যক্ষ পরিচয় পাওয়া যায়। এই ভাবে প্রাণের সঙ্গে মনকে যুক্ত করতে পারলেই ঈশ্বরের সঙ্গে একীভূত হওয়া যায়। তখন মনের আর আলাদা অস্তিত্ব থাকে না।

মহাপুরুষদের চিত্ত অন্তরপ্রাণচৈতন্যের সঙ্গে অভেদে যুক্ত থাকে বলেই অনন্ত অসীম ঈশ্বরের মহিমা তাঁরা সতত অনুভব করেন। কিন্তু মনের প্রাধান্যে সাধারণ লোক বহির্জগতের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে। প্রত্যহ রাত্রিতে নিদ্রার পূর্বে এবং সকালে শয্যাত্যাগের পূর্বে এই মহাপ্রাণের কাছে বিনীত ভাবে প্রার্থনা জানালে প্রত্যক্ষ ফল সকলে পেতে পারে।

মন ও প্রাণের সম্বন্ধ মূলত অভিন্ন, বুদ্ধিদোষে ভিন্ন মনে হয়

মন হল কতগুলি চিন্তার সমষ্টি, যার কোন স্থায়ী ভিত্তি নেই। কাজেই মনের দাসত্ব না-করে প্রাণচৈতন্যের সেবা করলে মনের বিকারজনিত কুফল হতে সহজেই মুক্তিলাভ করা যায়।

অন্তরপ্রাণই হল বোধসত্তা, তার সেবা ও ধ্যানের ফলে তার সঙ্গে অভেদে যুক্ত হওয়াই হল জীবন্মুক্তি

অন্তরপ্রাণের কাছে মনকে সমর্পণ করতে হয়। অন্তরপ্রাণই চৈতন্যসত্তা বা বোধসত্তা। অন্তরপ্রাণের সেবা করতে করতে অনন্ত অসীমের সঙ্গে মিশে যাওয়া যায়, কিন্তু মনের সেবা করলে শুধু অহংকারের পৃথক অস্তিত্ববোধ বেড়ে যায়। অন্তরপ্রাণের কাছে চিত্ত সমর্পণ করলে অনন্ত শক্তি-জ্ঞান-আনন্দ-প্রেম সবই পাওয়া যায়।

সব সাধনাই প্রাণচৈতন্যের সঙ্গে অভেদে মিলনের সাধনা

মহাপুরুষগণ এই প্রাণচৈতন্যকেই ঈশ্বর, আত্মা, ব্রহ্ম, গুরু, ইষ্ট, মাতা প্রভৃতি নামে অভিহিত করেন। তাঁরা এই সব নামে সাধন, ভজন, জপতপ, ধ্যানধারণা করে শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত হয়ে অমৃতত্ব ও শান্তির আস্বাদন করেন এবং অপরকেও তদ্ভাবে অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ করেন।

গৌণপ্রাণ ও মুখ্যপ্রাণ

স্থূল শরীরের চেতনা তথা ইন্দ্রিয়চেতনাকে গৌণপ্রাণ বলা হয়। অন্তরের শুদ্ধ চেতনাকে মুখ্যপ্রাণ বলা হয়। এই মুখ্যপ্রাণই হচ্ছে মহাপ্রাণচৈতন্য, আত্মা বা ঈশ্বর।

শ্বাস-প্রশ্বাস যে-কেন্দ্রের থেকে ওঠে সেটা হচ্ছে মুখ্যপ্রাণ। এই শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি ও তার কেন্দ্রের প্রতি মনোনিবেশ করলে মুখ্যপ্রাণের সন্ধান সহজেই মেলে।

মুখ্যপ্রাণের সেবায় গৌণপ্রাণ মুখ্যপ্রাণে মিশে যায়, তার ফলে হয় জীবন্মুক্তি

সাধকরা শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে নিতে প্রাণের কেন্দ্রের দিকে দৃষ্টি রাখেন; অর্থাৎ মুখ্যপ্রাণের গতির সঙ্গে গৌণপ্রাণ এবং মনের গতির যোগ সাধন করেন। তার ফলে তাঁদের গৌণপ্রাণের ভোগবৃত্তি ও মনের চঞ্চল গতি প্রশান্ত হয়ে স্থিরতা প্রাপ্ত হয়। একেই চিত্তবৃত্তি নিরোধ বলে। চিত্তবৃত্তি নিরোধ হলে নির্বিকার ও নির্বিকল্প সমাধি লাভ হয়। তখন সাধক অনন্ত অসীম বিশুদ্ধ বোধময় চৈতন্যসত্তার স্বরূপতা প্রাপ্ত হন। এ-ই ব্রহ্ম, আত্মা, ঈশ্বরের স্বরূপ। সেই অবস্থা থেকে সাধকরা অনন্ত শক্তি, জ্ঞান ও আনন্দের অধিকারী হয়ে বাহ্যজগতে নেমে আসেন। তখন তাঁদের দ্বারা অনেক অসম্ভব কাজও সম্ভব হয়।

মুখ্যপ্রাণের সঙ্গে অভেদে মিলনের প্রার্থনা জীবন্মুক্তির অন্যতম সাধনা

জীবনে পূর্ণভাবে মহাপ্রাণের আত্মপ্রকাশের জন্য এবং তাঁর সঙ্গে অভেদে মিলিত হওয়ার জন্য তাঁর কাছে সাধকরা প্রার্থনা করেন—"হে মহাপ্রাণ, তুমি অনন্ত অসীম। তোমাকে কেউ প্রকাশ করতে পারে না। তুমি কৃপা করে আমার অন্তরে প্রকাশিত হও এবং আমাকে তোমার মধ্যে অভেদে মিলিয়ে নাও।" অন্তরপ্রাণের কাছে প্রার্থনা করলে পূর্ণতাই পাওয়া যায়; কিন্তু মানুষ তার আপাতপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলিই শুধু চায় এবং তা না-পেলেই চঞ্চল অস্থির হয়ে পড়ে।

চাওয়া-পাওয়া উভয়ই অপূর্ণতার লক্ষণ

ছোট ছোট জিনিসগুলি চাওয়া ঠিক নয়, তাহলে বড় কিছু আর চাওয়া যায় না। ভিখারির মত বারবার ক্ষুদ্র জিনিস চাইলে সমস্যার সমাধান হয় না। নূতন নূতন কামনা-বাসনার জন্য নিত্য নূতন সমস্যা সৃষ্টি হয়।

ব্যাকুলতার তীব্রতা অনুসারে প্রার্থনা পূরণ করে অন্তরপ্রাণ

মনের অনন্ত কামনা-বাসনা অন্তরপ্রাণ কখনও একসঙ্গে পূরণ করে না। ব্যাকুল ভাবে মন যে জিনিস চায়, অন্তরপ্রাণ তাই আগে পূরণ করে। ছোট ছোট চাওয়ার জন্য মনের চঞ্চলতা অস্থিরতা বেড়ে যায়, ফলে কোন চাওয়াই সহজে পূর্ণ হয় না।

মহাপ্রাণের কাছে চাইতে হলে বৃহৎ কিছু অর্থাৎ ভূমাকেই চাইতে হয়। পূর্ণতারূপ অখণ্ড একটিমাত্র শুদ্ধ কামনা বারবার মহাপ্রাণের কাছে জানালে সে তা অবশ্যই পূরণ করে।

নিত্যপূর্ণের বক্ষে চাওয়া-পাওয়া সবই অবিদ্যাজনিত কল্পনা

মহাপুরুষদের কাছে অনেকেই ছোটখাট চাওয়া নিয়ে উপস্থিত হয়, আসল জিনিস কেউ চায় না। এই আসল জিনিস হল জীবনের পূর্ণতা। এর পরে আর কোন চাওয়াই থাকে না। এই একটা মাত্র চাওয়া নিয়েই থাকতে হয়।

জীবনের উদ্দেশ্য পূর্ণতা লাভ করা। পূর্ণতালাভ না-হলে জীবনের কোন মূল্য নেই। অনন্ত অসীমের সঙ্গে যুক্ত হলেই শুধু অপরের কল্যাণ করা সম্ভব হয়। অখণ্ডের সঙ্গে সবাই নিত্য যুক্ত হয়েই আছে কেবল বুদ্ধিদোষে, সচেতনতার অভাবের জন্য খণ্ড চাওয়া আসে। নিজ অতিরিক্ত অন্য কিছু কল্পনাই হল বুদ্ধিদোষ।

ভক্তের বোঝা ভগবান বয়, এ-ই সত্যের পরিচয়

ঈশ্বরের কাছে পরিপূর্ণ ভাবে আত্মসমর্পণ করলে ঈশ্বর ভক্তের এবং ভক্তের অধীনস্থ সকলের ভারই গ্রহণ করেন। যে ঈশ্বরের জন্য সংসার ছেড়েছে, তার পরিবারের কেউ না-খেয়ে মরেছে এরকম কখনও শোনা যায় নাই। বংশে একজন মহাপুরুষের আবির্ভাব হলে বংশের পূর্বপুরুষগণ পর্যন্ত উদ্ধার হয়ে যায়।

জাগতিক বিদ্যা ও আত্মবিদ্যার মধ্যে পার্থক্য

ইস্কুল কলেজে বস্তুজগতের অভাব অনটন দূর করার শিক্ষাই দেওয়া হয়, কিন্তু মহাপুরুষগণ আত্মজ্ঞানের সাহায্যে সকলকে পূর্ণতা লাভের শিক্ষাই দেন বা অনুপ্রাণিত করেন।

দেহেন্দ্রিয়ের বিকারজনিত ব্যাধির ওষুধ ডাক্তার বৈদ্যের কাছে পাওয়া যায়, কিন্তু ভবব্যাধির ওষুধ মহাপুরুষদের কাছে পাওয়া যায়। মন বুদ্ধির পরপারে অতীন্দ্রিয়লোকের সত্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ থাকে মহাপুরুষদের। সেজন্য ভবরোগের কারণ অজ্ঞানজনিত কর্তৃত্বাভিমান, বিষয়াসক্তিরূপ মোহের মহৌষধ আত্মজ্ঞান বা সমবোধের ব্যবহারবিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁরাই একমাত্র অভিজ্ঞ। সুতরাং ভবব্যাধি নিরাময়ের অষুধ তাঁদের কাছেই পাওয়া যায়।

জাগতিক উত্থান বা নাম-যশই সব নয়। এগুলি ক্ষণস্থায়ী এবং দুঃখকষ্ট অশান্তিরূপ ভববন্ধনের কারণ। সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয় পেতে হলে ঈশ্বরের সঙ্গে তদ্‌বোধে যুক্ত হতে হয়। মহাপুরুষগণ ঈশ্বরের নির্দেশ পেয়ে সকলকে ভবব্যাধি নিরাময়ের জন্য বিধান দেন।

প্রাণচৈতন্য ও মনের কাজের মধ্যে পার্থক্য

প্রাণচৈতন্যই সবকিছু করে কিন্তু কর্তাবোধে মন ভাবে সে-ই সব কিছু করে। এটাও অজ্ঞানতার লক্ষণ। ব্যক্তিগত নাম, যশ, খ্যাতি, বিদ্যা, শক্তি ও ঐশ্বর্য জাগতিক বা বাস্তব দৃষ্টিতে অধিক প্রয়োজনীয় মনে হলেও এগুলি অখণ্ড সুখশান্তি লাভের সহায়ক না-হয়ে অন্তরায় সৃষ্টি করে বেশি। এমন মহাপুরুষও দেখা যায় যাঁরা জীবনে অর্থ স্পর্শ করেন নাই। তাঁরা বস্তুজগতের নানাত্ব বহুত্বের মধ্যে মাথা গলান না।

ভোগ নিবৃত্তির উপায়

দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হলে একবারই ভাল করে দুঃখকষ্ট সব ভোগ করতে হয়, তারপরে যেন আর ভোগ না-করতে হয়। দুর্ভোগ শেষ না-করে জমিয়ে রাখতে নেই। ভোগের সংস্কার ভোগ করেই শেষ করতে হয়।

মহাপুরুষগণ ভোগের সংস্কার টেনে বার করে সেটা ভুগে শেষ করে দিয়ে যান, যেন ভোগের অবশিষ্ট কিছু না থাকে। পরবর্তী জীবনে যেন সুস্থ সবল দেহ নিয়ে আসতে পারেন। সুস্থ সবল দেহ না হলে ঈশ্বরচিন্তা বা আত্মচিন্তায় বিঘ্ন সৃষ্টি হয়।

সাধুসঙ্গের মাধ্যমেই সদ্ভাব ও সদ্বোধের প্রকাশ ও বিকাশ হয়

প্রত্যেকের ভিতরে ঈশ্বরীয় ভাব লুকিয়ে আছে। মহাপুরুষদের সঙ্গ করলে প্রাণের মধ্য থেকেই একে একে ঈশ্বরীয় ভাবসকল প্রকাশিত হয়। অন্তরপ্রাণের মধ্যে মন দিয়ে মন্থন করে ঈশ্বরীয় ভাবসকল তুলে আনতে হয়।

সদ্‌গুরুর অধিষ্ঠান ও কার্যাদির মূল কেন্দ্রই হল হৃদয়

মনের প্রশান্ত অবস্থাই হল গুরুমূর্তি বা ইষ্টমূর্তি। দৃঢ় সংকল্প নিয়ে চেষ্টা করলে গুরুই ঠিক ঠিক পথ দেখিয়ে দেন।

আত্মারামের লীলাভিনয় স্বভাবে ও স্ববোধে নিত্য সাধিত হয়

প্রেমের ঠাকুরকে অনুরাগ সহকারে ডাকলে তিনি আসবেনই। ভক্তের ডাক কখনও বৃথা যায় না। অনুরাগের তারতম্য অনুসারে সময়মত ভগবানের দর্শন মেলে।

ভগবানেরও একটা কৃত্রিম অভাব আছে। নিজেই ভক্ত সেজে ভক্তের মুখে নিজের নাম শুনতে তিনি ভালবাসেন। সংসারে মা যেমন সন্তানের মুখে মধুর মা নাম শুনতে ভালবাসে, ভগবতী মাতাও তেমনই নিজের সন্তানদের মুখে নিজের নাম শুনতে ভালবাসেন। ভগবান প্রত্যেকের অন্তরে বসে নিজেই নিজের নাম অবিরাম করে চলেছেন। ভগবান সকলের মধ্যে বসে নিরন্তর 'হংস' মন্ত্র জপ করছেন।

আপনবোধে হৃদয়েতেই হয় ঈশ্বরাত্মার বোধোদয়

মানুষের জীবন খুবই রহস্যময়। পরিপূর্ণ ভাবে আত্মসমর্পণ করা হলেই ঈশ্বরের মহিমা বোঝা যায়। ভগবানের মহিমা নিষ্কাম ভাবে নিরন্তর যে কীর্তন করে, ভগবান তার সব ভার গ্রহণ করেন।

ঈশ্বরাত্মার বিস্মৃতিই হল আসল দুঃখ, অন্য সব দুঃখ গৌণ

জীবনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুঃখকষ্টগুলির জন্য ব্যস্ত হওয়া উচিত নয়। ভগবানের দর্শন না-পাওয়াটাই একমাত্র দুঃখ। অন্য সব দুঃখ সে তুলনায় কিছুই নয়। জাগতিক দুঃখ স্বকল্পিত স্বপ্নবিলাস মাত্র।

পূর্ণ সমর্পণের মাধ্যমেই আত্মস্মৃতির জাগরণ হয়

জীবনের প্রথম পর্যায়ে যদি পূর্ণ ভাবে আত্মসমর্পণ করা যায়, তাহলে অবশিষ্ট জীবনের ভার ঈশ্বরই গ্রহণ করেন। এই বিশ্বাসটা ঈশ্বরানুভূতির সর্বোত্তম সহায়ক। [২০।৮।৬৮]

ভক্ত, যোগী ও জ্ঞানীর দৃষ্টিতে ঈশ্বরই স্বয়ং প্রভু ও বিভু, অন্য কেউ নয়

ভক্তিপথের সাধক বলে মানুষ ঈশ্বর বা মায়ের হাতের যন্ত্র মাত্র। তিনি যেমন চালান, তেমনই চলে; সে কখনওই কর্তা হতে পারে না। ঈশ্বরই সবকিছু জানেন, বোঝেন ও করেন। কাজেই তিনিই কর্তা। দুইজন কর্তা হয় না।

নিম্ন প্রকৃতি স্বতন্ত্র নয়, দিব্য ঈশ্বরপ্রকৃতির অধীন, এ-ই মুক্তির বিজ্ঞান

মানুষের কর্তব্য শুধু তার ভিতরের নিম্ন প্রকৃতিটাকে ঊর্ধ্ব প্রকৃতির কাছে পরিপূর্ণভাবে সমর্পণ করে দেওয়া। নিম্ন প্রকৃতির প্রভাবে সকলেই পৃথক পৃথক কর্তা সাজতে গেলে বহু কর্তা হয়ে যায় এবং প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন রকম পছন্দ অপছন্দ ভালমন্দ বিচারবোধ দ্বারা নিজেদের ঈশ্বর থেকে পৃথক মনে হয়। এটাই অজ্ঞানতা। এই অজ্ঞানই মানুষের ঈশ্বরীয় বোধকে আবৃত করে রাখে।

ঈশ্বরীয় বোধে জীবন যাপনের তাৎপর্য

মানুষের কর্তব্য ঈশ্বরের কাছে নিজেকে সমর্পণ করে দেওয়া; অথাৎ ঈশ্বরীয় বোধে জীবন যাপন করা। দেহ-মন-প্রাণ-বুদ্ধি তিনি ব্যবহার করবেন। মানুষ শুধু দ্রষ্টা হিসাবে থাকবে।

চাওয়ার মৌলিক তত্ত্ব

চাওয়ার দুটো অর্থ আছে। একটা হল কোন কিছুর অভাব পূরণের জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করা এবং দ্বিতীয় অর্থ

হল দেখা। এই দেখাও দুই প্রকারের, যথা বস্তুকে দেখা এবং নিজেকে দেখা। সুতরাং দ্রষ্টাও দুই প্রকার। দৃশ্যের দ্রষ্টা ও আত্মস্বরূপের দ্রষ্টা[১]।

সদ্‌গুরুর অনুশাসন লঙ্ঘন করে ইচ্ছামত কোনও সাধনাই সফল হয় না—ফল বিপরীত হয়

জীবনসাধনার পথে প্রথমে অদ্বৈতের ভক্তি আসে না। প্রথম দ্বৈতভাবের ভক্তি দিয়েই সাধনা আরম্ভ করতে হয়। জীব ঈশ্বরের সনাতন অংশ এই বোধ ধরে সাধনার পথে প্রথম চলতে হয়। 'ব্রহ্মাস্মি' না বলে নিজেকে ব্রহ্মের অণু বলে ভাবতে হয়। 'শিবোহং' না বলে শিবদাসোহং' ভাবতে হয়।

পূর্ণ আত্মসমর্পণের ফলসিদ্ধি হল দীব্যজীবন লাভ

পূর্ণ আত্মসমর্পণের ফল হল অভিনব। তখন ভগবানই একমাত্র কর্তা, আর সকলে তাঁর আনন্দলীলার সঙ্গী। পূর্ণ ভাবে আত্মসমর্পণের ফলে দেহেন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, ও বুদ্ধি নববোধের প্রভাবে পরিশোধিত হয়। তখন সাধক দিব্যজীবন লাভ করে ঈশ্বরের লীলার সাথী হয়ে যায়।

যিনি অন্তর্যামী তিনিই জগতের নিয়ন্তা

হৃদয় থেকে যে-রকম প্রেরণা আসে সেই অনুযায়ী যেমন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের চালনা হয়, সেইরকম প্রত্যেকের অন্তরে যিনি অন্তর্যামী হয়ে বসে আছেন তাঁর নির্দেশেই সকলে পরিচালিত হয়।

ভক্তিসাধনার ফলসিদ্ধি

যতক্ষণ পৃথক 'আমিবোধ' থাকে ততক্ষণ পূর্ণতা লাভ হয় না। আমিও কর্তা, তিনিও কর্তা এ ভাবে দুই কর্তা কখনও থাকে না। শুধু শক্তি ও জ্ঞানের জন্য সাধনাতে কর্তৃত্বভাব থেকে যায়। শ্রেষ্ঠ অনুভূতি হল—আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী; আমি ঘর, তুমি ঘরণী; আমি রথ, তুমি রথী।

দীব্যজীবন লাভের সাধনা

জ্ঞান শব্দের অর্থ সর্ববস্তুর মধ্যে একত্বকে দেখা। একের জ্ঞান লাভ করে সেই জ্ঞান যে ঈশ্বরকে সমর্পণ করতে পারে, সে-ই আসল ভক্ত। দেহ-মন-প্রাণ-বুদ্ধির মধ্যে সামঞ্জস্য এসে গেলে তা-ও ঈশ্বরকে সমর্পণ করতে হয়। তখন মা বা ঈশ্বর তার মধ্যে ইচ্ছামত প্রকাশিত হতে পারেন।

দ্বৈতবোধে পূর্ণতা সিদ্ধ হয় না

যতদিন মনের মধ্যে অভিযোগ, বিক্ষেপ, পছন্দ, অপছন্দ প্রভৃতি বৃত্তিগুলি থাকে ততদিন পূর্ণতা লাভ হয় না। পূর্ণতা লাভের লক্ষণ হল স্থির ভাব, সমবোধ, সরলতা, একনিষ্ঠতা, নম্রতা, আনন্দ ও প্রশান্ত অবস্থা।

ভক্তিসিদ্ধিতে অভিমান অহংকার সুসংযত ও মার্জিত হয়ে যায়

অহংকার অভিমান বজায় রেখে ভক্তিপথের সাধনা হয় না। ভক্তির পথে অহংকারের প্রাধান্য থাকতে পারে না। পরিপূর্ণ ভাবে এই অহংকার রূপায়িত হয়ে যায়।

১। অভিনব সংজ্ঞা।

আত্মসমর্পণের ফলে অহংকার ইষ্ট-গুরু-মাতাই স্বয়ং ব্যবহার করেন

ভগবতী মাতাকে পরিপূর্ণ ভাবে আত্মসমর্পণ করার ফলে, অহংকারের পরিবর্তে সমগ্র দেহেন্দ্রিয় মন-প্রাণ-বুদ্ধির মধ্যে বসে স্বয়ং ঈশ্বর বা মা এইগুলি পরিচালনা করেন। তখন দেহ-মন-প্রাণ-বুদ্ধি সবই মায়ের অধিকারে থাকে। কথা যা বলা হয়, মা-ই প্রতিষ্ঠিত থেকে মা-ই বলেন। শ্বাস-প্রশ্বাস ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরিচালনার মধ্যেও সদাজাগ্রত মায়ের শক্তি নিরন্তর কাজ করে, যার ফলে মন, বুদ্ধি ও প্রাণের পৃথক পৃথক দাবি বন্ধ হয়ে যায়। নিজের কিছু করার ক্ষমতা-ই থাকে না। সেই অবস্থায় দেহের মধ্যে চৈতন্যময়ী মা যে-ভাবে প্রকাশিত হন দেহেন্দ্রিয় মন পৃথক করে তা জানতে পারে না; কারণ এগুলির মধ্যে বিশুদ্ধ চৈতন্যের প্রবাহ অবিরাম ধারায় বয়ে যায়।

অহংকার অভিমানের ব্যবহারে বিকার বাড়ে, নাশ হয় না

অহংকার অভিমান দিয়ে মাকে দেখতে শুনতে জানতে বুঝতে গেলে চৈতন্যময়ী মাকে বিষয়রূপে গ্রহণ করতে হয়। তার ফলে, কর্তৃত্বাভিমানের বিকার হয়, কিন্তু পরিশোধন হয় না।

সত্যানুভূতি অদ্বৈতবোধে হয়, দ্বৈতবোধে নয়

সত্যের অনুভূতিতে দ্রষ্টা ও দৃশ্যের বিলুপ্তি ঘটে, তাদের প্রাধান্য থাকে না। মতবাদের প্রাধান্যে নিজের বোধই একমাত্র অনুভূতি এই গোঁড়ামি সত্যানুভূতির যথার্থ পরিচয় নয়।

সত্যানুভূতিতে আমি-তুমি, ইহা-উহা, অস্তি-নাস্তি প্রভৃতি কল্পনার অবকাশ নেই

ব্রহ্ম, আত্মা, ঈশ্বর, মাকে জেনেছি বলা চলে না; জানি না তা-ও বলা চলে না। দেখেছি বলা চলে না, দেখিনি তা-ও ঠিক নয়। কারণ দেখেছি, জেনেছি বললে তা সসীম ও দৃশ্য হয়ে যায়। সসীম দৃশ্য মাত্রই অস্থায়ী অনিত্য। অহংকার অভিমানের সসীমবোধে পরিবর্তনশীল, বিকারশীল সসীম দৃশ্যের অনুভূতি হয়। অখণ্ড বোধের অনুভূতি হতে পারে না।

অপর পক্ষে দেখিনি, জানিনি বললেও সত্যের অপলাপ হয়, কারণ স্বয়ংপ্রকাশ অখণ্ড বোধস্বরূপের নিরন্তর অভিব্যক্তি দেহেন্দ্রিয়-প্রাণ-মন-বুদ্ধির সংবিৎ-এর মধ্যে অবিরাম ধারায় নিরন্তর অভিব্যক্ত হয়ে চলছে। এই বোধস্বরূপ আত্মা বা মাতা একাধারে যেমন স্বয়ং কর্তা-ভোক্তা-জ্ঞাতা তেমনি আবার অকর্তা-অভোক্তা-অজ্ঞাতা। সর্বকালে সর্ব-অবস্থাতেই সে আমি এই বোধস্বরূপে স্বয়ং প্রকাশমান।

অনন্ত অসীম ঈশ্বরকে পৃথক দৃশ্যরূপে দেখেছি, জেনেছি ও বুঝেছি বললে নিজেকে ঈশ্বরের চেয়ে বড় বলা হয়। কাজেই, জানা বোঝার কর্তা একমাত্র তিনি। কর্তৃত্ব ভাব চলে গেলেই পূর্ণতায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়। মনের প্রকৃতির কাজ হল দেখা, শোনা ও জানা।

অহংকার মাকে জানেও না মানেও না

অনন্ত অসীমকে কোন কিছু দিয়েই মাপা যায় না। মা নিজের ইচ্ছায় এই বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছেন। সকলের অন্তরে বসে প্রয়োজনমত সবকিছু মা-ই করছেন অথচ সকলে এই মাকে না-মেনে অহংকারবোধে নিজে কর্তা সেজে বলে—সে-ই সব কিছু করে। এটাই অজ্ঞানতা ও মূঢ়তা।

পূর্ণ সাত্ত্বিক ও দৈবভাবের মাধ্যমেই ঈশ্বরের প্রকাশ অভিব্যক্ত হয়

ঈশ্বরীয় ভাবের প্রকাশে অকর্তা ভাব, নম্রতা, সরলতা, সমতা, প্রশান্ত ভাব প্রভৃতি দৈবীগুণগুলি পরিপূর্ণ মাত্রায় জীবনে অভিব্যক্ত হয়। তখন 'সবই ঈশ্বর' এই বোধ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অনুভূত হয়।

নানাত্ব বহুত্বই হল জীববোধের লক্ষণ

যতক্ষণ নানাত্ব বহুত্ব থাকে ততক্ষণ প্রশান্ত অবস্থা হয় না। চিত্তের প্রশান্ত অবস্থায় দুঃখকষ্ট অশান্তি এলেও মানুষকে চঞ্চল বা বিব্রত করতে পারে না। দুঃখকষ্টগুলিকেও সে মাতৃবোধে গ্রহণ করে। সাধক তখন শিবময় অবস্থায় থাকে।

পূর্ণ সমর্পণের ফলে আর দ্বন্দ্ব-বিরোধ থাকে না, ইষ্টস্ফূর্তি বা অদ্বৈতানুভূতি হয়

পূর্ণ ভাবে আত্মসমর্পণ হলে কোন রকম দ্বন্দ্ব-বিরোধ থাকে না। মায়ের ইচ্ছায় বা রামের ইচ্ছায় সব হচ্ছে এই বিশ্বাসে ভক্ত সর্ববিধ প্রতিকূল অবস্থাকে মেনে নেয়। কারওর নিজের পৃথক ইচ্ছায় কিছুই হয় না। নিজের স্বতন্ত্র ইচ্ছার মূল্য যদি থাকত তবে পক্ষাঘাত হলে মানুষ হাত নাড়তে পারে না কেন?

চিত্তমূলে কারণ সন্ধান দ্বারাই চিত্তবিকার প্রশমিত ও শান্ত হয়, শান্তচিত্তই হল শুদ্ধচিত্ত যার মাধ্যমে ঈশ্বরাত্মার প্রকাশ-বিকাশ স্বতঃসিদ্ধ হয়

প্রতিটি চিন্তা বাক্য কোথা থেকে উঠছে, প্রতিটি কর্ম কে সম্পাদন করছে—এ সবের কারণ বা উৎসের সন্ধান করতে গেলেই মনের অস্থিরতা ও চঞ্চলতারূপ বিকার শান্ত হয়ে যায়। তখন মনের অহংকার ও অভিমান আর থাকে না। এই ভাবে নিয়ত অন্তরকেন্দ্রের দিকে বা বোধের দিকে লক্ষ্য করলে পৃথকবোধ বা অহংকার শোধন হয়ে যায়। চিত্তের শোধন হলে সর্বদাই ঈশ্বরীয় বোধে থাকা যায়। এ-ই হল আত্মসমর্পণের লক্ষণ ও পরিণাম।

ঈশ্বরের শরণাগত না-হয়ে শুধু বুদ্ধির সাহায্যে কখনও ঈশ্বরকে জানা যায় না। [২৩। ৮। ৬৮]

প্রকৃতির বৈচিত্র্যময় প্রকাশের মূলে যে এক সত্য নিহিত আছে তা তপস্যার মাধ্যমে মানুষ আপন হৃদয়ের গভীরে স্ববোধে অনুভব করে

প্রকৃতির ভিতরে গুপ্তশক্তি, বিদ্যা, সুপ্তচেতনা, জ্ঞান প্রভৃতির সন্ধান ধীরে ধীরে আবিষ্কার করে মানুষ অনুভব করে যে, এইগুলির কোনটাই ভিন্ন ভিন্ন নয়, এক সত্যেরই বৈচিত্র্যময় প্রকাশ মাত্র।

ঋষিদের তপস্যার ফলে স্বহৃদয়ে ভূমা এক চিদানন্দ সত্তার সাক্ষাৎ দর্শন পেয়েছেন, তাঁকেই তাঁরা ব্রহ্ম, আত্মা নামে অভিহিত করেছেন

প্রাচীনকালে ঋষিরা অখণ্ড ভূমা এক শাশ্বত সত্যকেই অন্তরে বাইরে সমান ভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। এই অখণ্ড সত্যের বহিঃপ্রকাশরূপ বিশ্বকে তাঁরা ব্রহ্মাণ বা আত্মন নাম দিয়েছেন এবং অন্তরে তাকে ব্রহ্ম বা আত্মা নামে অভিহিত করেছেন।

অখণ্ড ভূমা ব্রহ্ম বা আত্মাই অদ্বয় অব্যয় শাশ্বত অমৃতময় স্বয়ংপূর্ণ স্বয়ংপ্রকাশ। এই পরমসত্যই হচ্ছে অদ্বয়তত্ত্ব, সর্বপ্রকাশের কেন্দ্রসত্তা। তার প্রকাশস্বরূপতার মধ্যে কোন ভেদ নেই, কিন্তু নির্গুণ-সগুণ, অন্তর-বাহির,

অদ্বৈত-দ্বৈত মতবাদগুলি কল্পিত মাত্র। এই আত্মা, ব্রহ্ম বা ঈশ্বরই সকলকে অন্তরে বাইরে তাদের প্রয়োজনীয় সবকিছু সম্ভার জোগায়।

সাধকের পরিচয়

যাদের কেন্দ্রসত্তা, আত্মা বা ব্রহ্মের দিকে দৃষ্টি থাকে এবং যারা তার সত্য উপলব্ধি করার চেষ্টা করে তাদেরই সাধক বলে। স্বল্পের দিকে তাদের দৃষ্টি থাকে না।

অখণ্ডবোধের অনুভূতিই পরাসিদ্ধি

জীবনের প্রথম পর্যায়ে মানুষ সসীম নিয়েই থাকে। পরে সংসারজীবনে প্রবেশ করে নানারকম ঘাত প্রতিঘাত এবং নানাবিধ সমস্যা দ্বারা বিব্রত হলে তাদের দৃষ্টি অনন্ত অসীমের প্রতি যায়। তখন অনুভূতিসম্পন্ন কোন আত্মজ্ঞ বা ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের সংস্পর্শে এসে তাঁর প্রভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিনিসের প্রতি তাদের মোহ আসক্তি কেটে যায়। সেগুলি ছাড়তে তখন তাদের আর কষ্ট হয় না। আত্মবোধের প্রভাবে আপনা থেকেই সব ত্যাগ হয়ে যায়।

খণ্ড খণ্ড অনাত্মাবোধের প্রভাব অখণ্ড একাত্মবোধে লয় হয়ে যায়

আত্মবোধের প্রভাবে প্রীতিপূর্বক ত্যাগ হয়, তা না-হলে জোর করে ত্যাগ হয় না, ত্যাগের চেষ্টা করলেও সুফল হয় না। সামনে সর্বদা কোন বড় আদর্শকে ধরে রাখলে ছোটকে ত্যাগ করা সহজ হয়। আত্ম সাধনার বিশেষ রহস্য হল যে, একবার বৃহতের দিকে দৃষ্টি গেলে নিজের রুচি ও প্রবৃত্তি অনুযায়ী ঠিক ঠিক সঙ্গ এবং সাহায্য সাধকের মিলে যায়।

জীবের হৃদয়ে পরমাত্মা স্বয়ং বিরাজিত, তথাপি স্ববুদ্ধিদোষে সে আত্মবিস্মৃত

প্রত্যেকের ভিতরে ব্রহ্ম বা আত্মার অনন্ত শক্তি-জ্ঞান-আনন্দ-প্রেম ইত্যাদি সুপ্ত আছে, কিন্তু সে বিষয়ে সকলে পূর্ণ সচেতন নয় বলেই সমস্যাসঙ্কুল জীবনে শান্তির সন্ধান পায় না। প্রত্যেকের আসল পরিচয় হল সে নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত এবং সে অনন্ত অসীম বোধস্বরূপ ব্রহ্ম বা আত্মা। যতদিন পর্যন্ত আত্মস্বরূপের এই পরিচয় মানুষ পূর্ণ ভাবে অবগত হবার জন্য চেষ্টা না করে, ততদিন পর্যন্ত তার কোন আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্ভবপর হয় না।

"সবার উপরে মানুষ সত্য"—এর অর্থ মানুষই দিব্য অমৃত আত্মবোধের অধিকারী

একমাত্র মনুষ্যজীবনের মাধ্যমেই পূর্ণভাবে আত্মোপলব্ধি বা ঈশ্বরোপলব্ধি সম্ভবপর হয়। অন্য কোনরকম জীবনের মাধ্যমে, এমনকি দেবদেবীদের জীবনের মাধ্যমেও তা সম্ভবপর হয় না। সুতরাং দুর্লভ মনুষ্যজীবন পেয়ে স্ব-স্বরূপ বা আত্মস্বরূপের উপলব্ধির জন্য প্রত্যেকেরই চেষ্টা করা উচিত। দুর্লভ মনুষ্যজীবন পেয়ে তার অপব্যবহার করলে পশুজীবনের তুল্যই হয়।

অনুভবসিদ্ধ আত্মজ্ঞ পুরুষের সঙ্গ প্রভাবে জীবের জীবত্ব নাশ হয়ে শিবত্বে প্রতিষ্ঠা হয়

সৎসঙ্গের মাধ্যমে ঈশ্বর-ব্রহ্ম-আত্মোপলব্ধির বিজ্ঞান বারবার শুনলে এবং ঈশ্বরীয় বোধে নিত্যপ্রতিষ্ঠিত আত্মজ্ঞ মহাপুরুষদের সংস্পর্শে কিছুকাল থাকলে আত্মদর্শন বা ঈশ্বরোপলব্ধির জন্য তীব্র ব্যাকুলতা সহজেই অন্তরে জাগ্রত হয়। এইরূপ তীব্র ইচ্ছা বা ব্যাকুলতা অন্তরে জাগলে বুদ্ধি, চিন্তাশক্তি ও প্রাণশক্তির ধারা বা

গতি নূতন ভাবে তৈরি হয়। তখন বৃথা সময় নষ্ট না-করে আধ্যাত্মিক সাধনায় মন আবিষ্ট হয় এবং অবিলম্বেই আত্মবোধের উন্মেষ হয়।

আত্মবিজ্ঞানের মাধ্যমে জড়বিজ্ঞানের পরিপূর্ণতা সিদ্ধ হয়

শুধুমাত্র জড়বিজ্ঞানের শিক্ষা দ্বারা জীবনের পূর্ণতা লাভ সম্ভবপর নয়। আত্মবিজ্ঞানের যথার্থ অনুশীলন ব্যাতীত ব্যাক্তিগত এবং সমাজজীবনের সর্বাঙ্গীন উন্নতি সম্ভবপর হয় না। অন্তরের সুপ্ত চেতনাকে জাগ্রত করার জন্য আত্মবিজ্ঞানের শিক্ষা সমাজজীবনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন।

আত্মজ্ঞানের মাধ্যমে আত্মজ্ঞানের বিকাশে সর্বজ্ঞান-বিজ্ঞানের সমাধান

মানুষের অন্তর্নিহিত সুপ্ত আত্মচেতনাকে জাগ্রত করতে মহাপুরুষদের সাহায্য সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন। তাঁদের কৃপাশিস ও নির্দেশে যথার্থ সাধনা করে মানুষ অখণ্ড শক্তি-জ্ঞান-আনন্দ-প্রেমের অধিকারী হতে পারে। জীবনে আত্মজ্ঞানের অভিব্যক্তি হলে মানুষ পূর্ণতা লাভ করে স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়।

আত্মজ্ঞ মহাপুরুষের কৃপায় ও স্বকীয় অনলস প্রচেষ্টায় বস্তুবাদী লোক কী ভাবে আত্মবাদী হয়?

শুধুমাত্র বস্তুজগতের জ্ঞান দিয়ে আত্মজ্ঞান লাভ করা যায় না, শাশ্বত শান্তির সন্ধানও পাওয়া যায় না। আত্মজ্ঞান ও শাশ্বত শান্তি অর্থ দ্বারা ক্রয় করা যায় না। এটা সাধনলব্ধ উপলব্ধির বিষয়। সৎসঙ্গের মাধ্যমে আত্মতত্ত্বের পরিচয় অবগত হয়ে চিত্ত উদ্বুদ্ধ হয়, তদ্‌বোধে ধর্মে মতি ও সাধনার প্রবৃত্তি জাগে। আত্মজ্ঞ মহাপুরুষরূপ গুরুর কৃপায় ঈশ্বরের আশীর্বাদে ব্যক্তিগত চেষ্টায় ও সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয়, অর্থাৎ আত্মোপলব্ধি বা ঈশ্বরোপলব্ধি হয়।

বহির্বিশ্বের বৈচিত্র্যের ধারণা অন্তরবোধের মাধ্যমে সিদ্ধ হয়ে পরিণামে আত্মবোধে পর্যবসিত হয়

চতুর্যুগ বাইরের বিষয় নয়। তা অন্তরের উপলব্ধির বিষয়। আত্মোপলব্ধির সম্প্রসারণের এবং তার ধারাবাহিক প্রকাশ অভিব্যক্তির উপর ভিত্তি করে যুগের ধারণা হয়। আত্মবোধের প্রভাবে ব্যবহারিক জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়। অন্তরের বোধ অনুসারে ব্যবহারিক জীবনের মানের তারতম্য হয়। এই তারতম্যের মান অনুযায়ী আবার যুগের ধারণা হয়ে থাকে।

ভারতের জীবনাদর্শের বৈশিষ্ট্য একত্ববোধ/সমত্ববোধ, তার যথার্থ ব্যবহারের মাধ্যমেই সাম্যবাদ সিদ্ধ হয়, অন্যথা নয়

আত্মোপলব্ধির বিশেষত্ব হচ্ছে সমত্ববোধ বা একত্ববোধ। এই একত্ববোধই প্রাচীনকাল হতে ভারতের সর্বোত্তম আদর্শরূপে গণ্য হয়ে আসছে। এই একত্ববোধের দ্বারাই যথার্থ সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা হওয়া সম্ভবপর। যথার্থ আত্মজ্ঞান লাভ করে সমবোধে বা একত্ববোধে প্রতিষ্ঠিত না হলে সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা কোনদিনই সম্ভবপর হয় না।

মনোধর্ম সর্বতোভাবেই আত্মবিরোধী, কিন্তু আত্মধর্ম পরামুক্তি ও শান্তিভিত্তিক

সমবোধে বা একত্ববোধে প্রতিষ্ঠিত না-হওয়া পর্যন্ত অশুদ্ধ ও অপূর্ণ জীবন। অশুদ্ধ জীবনে মনোধর্মের প্রভাব অধিক। মনোধর্মের বিশেষত্ব হল, তা অহংকার অভিমানের দ্বারা পরিচালিত। অহংকার অভিমানের প্রাধান্যে জাতীয়

জীবনে আসে সংকীর্ণতা, স্বার্থপরতা, হীন কপটতা, কুটিলতা, পরমত অসহিষ্ণুতা, পরশ্রীকাতরতা, পরদোষদর্শিতা, হিংসা-দ্বেষ প্রভৃতি। এইগুলিই জাতীয় জীবনের উন্নতির সর্ববিধ অন্তরায়।

একাত্মবোধই হল জীবনের সমগ্র দ্বন্দ্ব-বিরোধের অবসান ও শান্তি প্রতিষ্ঠার মহৌষধ

একাত্মবোধের জাগরণে ও প্রসারতায় জাতীয় জীবনে ব্যাপক ভাবে তার প্রভাব কার্যকরী হয়। তখন পরস্পরের সঙ্গে পরস্পর মিলিত হয়ে পরস্পরের কল্যাণের নিমিত্ত সর্বাঙ্গীন উন্নতি করতে সমর্থ হয়, এবং শান্তিপূর্ণ ভাবে সকলের পক্ষে জীবন যাপন করা সম্ভবপর হয়।

অখণ্ড বোধই ঈশ্বরাত্মা বোধ, সেই বোধে সংসারে বাস করেও নির্বিকার, অনাসক্ত ও মুক্ত থাকা যায়

অখণ্ড চৈতন্যস্বরূপ আত্মা বা ঈশ্বরের স্বভাব নিত্য সমান। মানুষের মধ্যে এই ঈশ্বর নিত্য বিদ্যমান। এই ঈশ্বরীয় বোধে যুক্ত থেকে সর্ব অবস্থায় মানুষও সমান ভাবে থাকতে পারে। অখণ্ড আত্মবোধের সঙ্গে নিজের পৃথক আমিত্বকে পরিপূর্ণ ভাবে যুক্ত রাখলে জীবনে আর কোন দ্বন্দ্ব বা বিক্ষেপ থাকে না। তখন 'অখণ্ড পূর্ণ এক ভূমার আমি' অর্থাৎ 'পরমাত্মার আমি'র স্বরূপ অনুভূত হয়। এই অবস্থায় সংসারে বিষয়ের মধ্যে থেকেও নির্বিকার ভাবে জীবনে চলা যায়।

সমত্ববোধের সাধনা সবার পক্ষেই সম্ভব, কেবল সৎসঙ্গের সঙ্গে যোগাযোগের প্রয়োজন

সমত্বযোগের বিজ্ঞানের মাধ্যমে আত্মতত্ত্ব অনুশীলনের চেষ্টা সংসারীদের পক্ষে সম্ভবপর হতে পারে। তার জন্য তাদের কঠোর তপস্যার প্রয়োজন হয় না।

চিত্তের মাধ্যমেই চিৎস্বরূপ আত্মার প্রকাশ-বিকাশ হয়, মাধ্যমের দোষে আত্মা জীবদশা প্রাপ্ত হয়, চিত্তের দোষ কাটে চিদাত্মার স্মৃতির মাধ্যমে

একান্ত আপনবোধে যে-নির্মল প্রীতির ভাব জাগে তা অন্তরবোধের বা আত্মবোধের অখণ্ড লক্ষণ। এই নির্মল প্রীতির ভাব বস্তু-ব্যক্তি-ঐশ্বর্য-সম্পদ-নাম-যশ-খ্যাতির মাধ্যমে যখন প্রকাশিত হয় তখন মাধ্যমের দোষে তার অখণ্ডতা খণ্ডিত হয়ে ব্যক্ত হয়। এই মাধ্যমের দোষকে শোধন করে নিলে অখণ্ড প্রীতিবোধের ধারা অবিরাম অভিব্যক্ত হয়। এই মাধ্যমের শোধন করা অর্থ হচ্ছে চিত্তের শোধন করা।

অখণ্ড আত্মস্বরূপের বক্ষে খণ্ড দৃষ্টি হল অজ্ঞানতা, অখণ্ড দৃষ্টি হল জ্ঞানসত্তা

অখণ্ড আত্মবোধের প্রকাশধারার মধ্য থেকে অংশবিশেষকে পৃথক ভাবে গ্রহণ করা ও ব্যবহার করার ফলে চিত্তের মলিনতা ঘটে। চিত্তের মলিনতার ফলে আত্মবোধের অখণ্ডতা ও তার নির্মল প্রীতির ভাব আবৃত হয়ে অশুদ্ধ চিত্তের ব্যবহারে পৃথক পৃথক ভাবে প্রতীয়মান হয়। তখন বোধস্বরূপের প্রকাশধারার মধ্যে বস্তু-ব্যক্তি-প্রকৃতি প্রভৃতি রূপে ভেদদৃষ্টি জন্মে।

মনের পৃথক বোধের প্রভাবে থেকে জীবনে চলতে গিয়ে মানুষ আনন্দস্বরূপ অখণ্ড বিশুদ্ধ আত্মার অনুভূতি বিষয়বোধের মাধ্যমে খণ্ড খণ্ড করে পায়। তাতে পরিপূর্ণ তৃপ্তি না-পেয়ে চিত্ত বিষয়ান্তরে ভ্রমণ করে। তার ফলে চিত্তের বিকার বাড়তেই থাকে। এই বিকারই হচ্ছে মলিনতা। চিত্তের মলিনতাকে শোধন করার সহজ উপায় হচ্ছে বস্তু, ব্যক্তি প্রভৃতিকে একান্ত আপনবোধে অর্থাৎ আত্মা বা ঈশ্বরবোধে গ্রহণ করে তদ্‌বোধে তার ব্যবহার করা।

মনের বোধে না-চলে বোধের মনে চলাই সহজ যোগ, বোধের বোধে চলা হল পরাসিদ্ধি

মনের প্রাধান্যে না-চলে বোধের প্রাধান্যে সব কিছু 'মেনে মানিয়ে' চলতে হয়। এই ভাবে বোধের প্রাধান্যে সংসারে সবকিছুকে ব্যবহার করার ফলে সহজেই আত্মজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা হয়। সংসারীদের জন্য এই বিধান সহজসাধ্য।

মনের বোধে বন্ধন, সমবোধে বা একবোধে হচ্ছে মুক্তি বা আত্মপ্রতিষ্ঠা

আত্মবোধে বা ঈশ্বরীয় বোধে যাঁরা প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন তাঁদের সংস্পর্শে থেকে তাঁদের নির্দেশে চললে মনের প্রভাব কেটে যায় এবং জীবনে বোধের প্রভাব বেড়ে যায়। বোধের প্রভাবে ভেদদৃষ্টি দূর হয় এবং সমদৃষ্টি অর্থাৎ সমবোধের প্রতিষ্ঠা হয়। সমবোধের প্রতিষ্ঠা হলেই আত্মোপলব্ধি বা ঈশ্বরোপলব্ধি স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে প্রকাশিত হয়।

মলিনচিত্তে আত্মভাবনা হয় না, শুদ্ধচিত্তে আত্মা অতিরিক্ত কোনও ভাবনা আসে না

অশুদ্ধচিত্তে প্রথম প্রথম সবকিছু গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। অর্থাৎ অখণ্ড আত্মবোধের ধারা অশুদ্ধচিত্তে অভিব্যক্ত হয় না। চিত্তের মল শোধিত হলে অখণ্ড আত্মবোধের ধারা অবাধিত ভাবে নিরন্তর প্রকাশিত হয়।

চিত্ত শুদ্ধ হয় সৎসঙ্গের প্রভাবে ও সদাচারের মাধ্যমে, তার ফলে আত্মার ধ্রুবাস্মৃতি জেগে ওঠে

অশুদ্ধচিত্তে ঈশ্বরপ্রসঙ্গ বা আত্মপ্রসঙ্গ ভাল লাগে না বলে কেউ গ্রহণ করতে পারে না। তখন সদুপদেশ পেলেও তা কার্যকরী হয় না। সৎসঙ্গের মাধ্যমে সত্যশ্রবণের ফলে এবং জপ-ধ্যান-জ্ঞান ও বিচার প্রভৃতি সাধনার দ্বারা চিত্তের শোধন হলে শ্রবণমাত্র অন্তরে আত্মবোধ বা ঈশ্বরীয় বোধের স্ফুরণ হয়।

আত্মপ্রসঙ্গ শ্রবণই হল মঙ্গল, কল্যাণ, মুক্তি—অনাত্মার কথা হল দুঃখ-কষ্ট, ব্যথা-বেদনা

মহাপুরুষদের সঙ্গ করে তাঁদের উপদেশাদি শ্রবণের ফলে যাদের চিত্তের ব্যাকুলতা জাগে তারা আত্মবোধ এবং ঈশ্বরীয় বোধ লাভে সমর্থ হয়। সুতরাং সর্বপ্রথম আত্মপ্রসঙ্গ বা ঈশ্বরপ্রসঙ্গ শ্রবণের একান্ত প্রয়োজন। শ্রবণের মাধ্যমে বিষয়চিন্তার পরিবর্তে ঈশ্বরচিন্তার প্রভাব বাড়ে। সাধু মহাপুরুষদের মুখে ভগবৎপ্রসঙ্গ শুনতে শুনতে অন্তরে শুভসংস্কার জাগ্রত হয়। তখন ভগবৎজীবন যাপনের ইচ্ছা জাগে।

তাপের দ্বারা চিত্তের প্রসারণ হয়, আরাম ভোগের দ্বারা চিত্তের সঙ্কোচন হয়

আঘাত ছাড়া সাধারণত বিষয়ী লোকের চেতনা জাগ্রত হয় না। তপস্যা ব্যাতীত অন্তরের চেতনা বা অন্তরশক্তি সম্প্রসারিত হয় না। রোগ-শোক, অভাব-অনটন ও দুঃখ-কষ্টের মাধ্যমে এক প্রকার তপস্যার ক্রিয়া সাধিত হয়। যার ফলে কিছুটা অন্তরচেতনা উদ্বুদ্ধ হয়।

সর্ববিধ প্রতিকূল অবস্থাকে অনুকূলে সমান গ্রহণ করলে বা মেনে নিলে অতি সহজেই বিকারমুক্ত হওয়া যায়

অন্তরের সুপ্ত চেতনাকে জাগ্রত করার জন্য সর্ববিধ বিরুদ্ধ অবস্থা, প্রতিকূলতা, অপ্রীতিকর ঘটনা, অপরের অবাঞ্ছিত আচরণ, উপেক্ষা ও আঘাতের প্রয়োজন হয়। এগুলি সাধকের চিত্তশোধনের সহায়ক হয়। এগুলি সাধককে সমত্বে প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করে। সহজ ভাবে ঈশ্বরের দানরূপে গ্রহণ করলে এগুলি থেকে সম্যক্ শিক্ষালাভ করা যায়। ভূমার সাধনায় এগুলি অন্তরায় নয় বরং সহায়ক।

আত্মবোধে মনের সমস্ত বিরুদ্ধ ধর্মগুলি সমত্বে মিশে যায়

দুটি সমশক্তি এক জায়গায় মিলিত না হলে একত্বের প্রকাশ হয় না। সমত্বের বিজ্ঞান ব্যাতীত বিরুদ্ধ ভাবগুলিকে একত্বে আনা যায় না। আরোহণ ও অবরোহণ বা আকর্ষণ ও বিকর্ষণরূপ দ্বিমুখী গতিকে মনের বোধে কখনওই একত্র মিলিত করা সম্ভবপর হয় না। কিন্তু আত্মবোধে বা সমবোধে সহজেই তা সম্ভবপর হয়। আত্মবোধ হল দ্রষ্টা ও দৃশ্য, সব এক চিৎস্বরূপ আমিই স্বয়ং[১]—সর্ব সমস্যার সমাধান ও নিরসন।

সর্বশূন্য তত্ত্বের তাৎপর্য

শূন্যের মধ্যে শূন্য অভেদে মিলে যায়। সব যখন এক হয়ে যায়, তখনই হয় সর্বশূন্য। এই শূন্য অর্থ অস্তিত্ববিহীন নয়, নানাত্ব বহুত্বের অভাব। ভিন্ন ভিন্ন রূপের সঙ্গে পূর্ণ ভাবে অভেদমিলন হয় না। সমান ধর্ম না হলে একত্বে মিলন হয় না।

বিভিন্ন অভিব্যক্তির মধ্যে এক তত্ত্বই পূর্ণ ভাবে নিহিত আছে

অজ্ঞান অর্থ একের মধ্যে নানাত্ব বহুত্বের প্রতিভাস। জ্ঞানের অর্থ নানাত্ব বহুত্বরূপ বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্বের বোধ। ঈশ্বরের জন্য যাদের চিত্ত ব্যাকুল হয়েছে, তাদের সঙ্গ করলে অপরের মধ্যেও ব্যাকুলতা জাগে।

ব্রহ্ম-আত্মা-ঈশ্বর-অখণ্ড সত্য-অমৃতত্ব-শাশ্বত শান্তি-ভূমানন্দ ও সুখ প্রভৃতি শব্দ একই অর্থবোধক; অর্থাৎ এক তত্ত্বেরই ভিন্ন ভিন্ন নাম মাত্র।

আত্মবক্ষে আত্মলীলা দ্বৈতবোধে শুরু হয়ে অদ্বয়বোধে পরিসমাপ্ত হয়

জীবনের যাত্রা সসীম হতে শুরু করে অনন্ত অসীম অখণ্ডের ঘরে গিয়ে সমাপ্ত হয়। রুচি সামর্থ্য ও স্বভাব-প্রকৃতি অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন পথ অবলম্বন করে জীবন নানাবিধ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে পরিশেষে অখণ্ডের ঘরে গিয়ে মিশে যায়।

মন ও বুদ্ধির অপূর্ণতা বোধের বোধ অর্থাৎ আত্মবোধ বা ঈশ্বরীয় বোধে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

সমত্বের পূর্ণস্থিতিই হল আসল একত্ব বা সমত্ব

একত্বের অর্থ সর্বশূন্য নয়, বরং সমষ্টির একক স্থিতি বা সমস্থিতি। এ-ই হল পূর্ণতার লক্ষণ।

এক তত্ত্বের দ্বিবিধ প্রকাশ—সবেতে এক, একেতে সব

সবকিছুকে বাদ দিয়ে একটা একত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। তাতে সবকিছুকে শূন্য করা হয় না, বরং সবকিছুর মধ্যে একেরই অধিষ্ঠান স্বীকৃত হয়। আবার সবকিছুকে একবোধে গ্রহণ করে একটা একত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। এই দ্বিবিধ প্রণালীর মাধ্যমে একত্বের বোধই হচ্ছে অখণ্ড পূর্ণ ভূমার সত্য পরিচয়। এ নিত্য অদ্বৈত। সবার সঙ্গে সমবোধে যুক্ত হয়েই অন্তর পূর্ণ হয় এবং অখণ্ড ভূমার সঙ্গে মিশে যায়। ("All divine for all time, as it is" —"All in all, All in One, One in all, One in One and beyond, beyond."[২])

১। অভিনব সংজ্ঞা।   ২। Formula of Four-এর অন্তর্ভুক্ত সংজ্ঞা।

খণ্ড বোধে খণ্ড সিদ্ধি, অখণ্ড বোধে অখণ্ড সিদ্ধি

বুদ্ধি-মন-প্রাণ ও দেহের পৃথক পৃথক সাধনাতেও সিদ্ধিলাভ করা যায়, কিন্তু তা আংশিক সফলতা বা সিদ্ধি। সবটা মিলিয়ে যে-সাধনা, তার থেকে আসে পূর্ণ সফলতা বা অখণ্ড সিদ্ধি। সমত্ববোধেই অখণ্ড সিদ্ধিলাভ সহজে হয়। দেহ- প্রাণ-মন-বুদ্ধি সব মিলে সমসূত্রে না-আসা পর্যন্ত পূর্ণতার পরিচয় পাওয়া যায় না। সর্বজীবে সমবোধ বা সমদৃষ্টি আত্মজ্ঞানের লক্ষণ।

ব্রহ্ম ও জগৎ অভিন্ন তত্ত্ব—প্রজ্ঞানের বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের প্রজ্ঞান

ব্রহ্ম ও জগৎ পৃথক বস্তু নয়। ব্রহ্মেরই বিজ্ঞানঘন রূপ হচ্ছে জগৎ। জগতের সত্য পরিচয় হল ব্রহ্ম। ব্রহ্মেরই জগৎ, জগতেরই ব্রহ্ম। যেমন বোধের মন, মনের বোধ; তেমন মনের সৃষ্টি, সৃষ্টির মন। অর্থাৎ বোধের জগৎ, জগতের বোধ। নিত্য ও লীলা অখণ্ড বোধের খেলা। প্রকাশক ও প্রকাশ, সত্তা ও শক্তি, পুরুষ ও প্রকৃতি, এক ও বহু, আমি ও তুমি সবার মধ্যে এক ব্রহ্মই স্বয়ং প্রকাশমান।

গ্রহ-নক্ষত্র, চন্দ্র-সূর্য, বৃক্ষলতা, কীটপতঙ্গ, পশুপাখি, মনুষ্য, দেবদেবী, ঈশ্বর সবই এক ব্রহ্মেরই বিজ্ঞানরূপ। প্রজ্ঞানঘন পরমাত্মার এ-ই পরিচয়।

মনের বোধে জগৎ, বোধের মনে ঈশ্বর, বোধের বোধে ব্রহ্ম আত্মা স্বয়ং

ঈশ্বরীয় বোধে জড় ও চেতন, জ্ঞান ও অজ্ঞান প্রভৃতি পার্থক্য বা ভেদ অসিদ্ধ। ধ্যানে অনুভূত আত্মা বা ঈশ্বরীয় বোধের সঙ্গে বাস্তববোধের ভেদ মনের কল্পনা মাত্র। 'মনের বোধে' জগতের বৈচিত্র্য দৃষ্ট হলেও আত্মবোধে কোন বৈচিত্র্য বা ভেদ থাকে না।

আত্মার স্বকল্পিত কল্পনাই হচ্ছে অবিদ্যা মায়া, কল্পনাশূন্য শুদ্ধ চৈতন্যই হল আত্মার নিত্যস্বরূপ

চৈতন্যের স্বেচ্ছাকৃত বা কাল্পনিক সংকোচনের ফলে, তার প্রকাশমাত্রার স্বল্পতাই অজ্ঞান, মায়া ও মিথ্যারূপে প্রকাশ পায়; কিন্তু চৈতন্যের সম্প্রসারণের ফলে অর্থাৎ তার স্বরূপস্থিতিতে অজ্ঞান বা মিথ্যা মায়া অপসারিত হয়। আত্মজ্ঞানের অভাবে অজ্ঞানের তথা মিথ্যা মায়ার খেলাকে সত্য বলে মনে হয়। কিন্তু আত্মজ্ঞানের উদয় হলে অজ্ঞানরূপ মিথ্যা মায়ার অবসান ঘটে। তার অস্তিত্ব তখন খুঁজে পাওয়া যায় না।

অজ্ঞান মায়ার বিশেষত্ব হচ্ছে সত্যকে অসৎ বা মিথ্যারূপে প্রতিভাত করা অর্থাৎ অখণ্ড নিত্য একবোধের স্বরূপকে খণ্ড খণ্ড, পৃথক পৃথক রূপ-নাম-ভাবকে সত্য বলে প্রকাশ করা।

আত্মজ্ঞানের অভাবেই অর্থাৎ অজ্ঞানে হয় জগৎলীলা, জ্ঞানে হয় তার অবসান

অজ্ঞান মায়ার অদ্ভুত লীলাচাতুর্য জগৎ প্রপঞ্চকে প্রকাশ করছে। এর শক্তিও অনাদি অনন্ত। নামরূপের বৈচিত্র্য সৃষ্টি করার কার্যে এর দক্ষতার তুলনা নেই, কিন্তু আত্মজ্ঞানের উদয়ে এই অজ্ঞান মায়ার জগৎরূপ দৃশ্যের অদ্ভুত খেলার অবসান ঘটে।

অজ্ঞান মায়ার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পরিচয়

অজ্ঞান মায়ার অস্তিত্ব যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ তার নামরূপ বৈচিত্র্যের লীলাভিনয়ও চলতে থাকে। সেইজন্য একে সৎ ও অসৎ দুই-ই বলা হয়। কিন্তু এ শুধু সৎও নয়, শুধু অসৎও নয়। আবার সদসৎও নয় এবং সদসৎ

শূন্যও নয়। একেই অনিবর্চনীয়া অঘটন-ঘটন-পটীয়সী অবিদ্যাশক্তি এবং আত্মার সংকল্পানুবিধায়িনী-স্বরূপশক্তি, ত্রিগুণাপ্রকৃতি আদ্যাশক্তি, মায়া-মহামায়া-যোগমায়া, নিয়তি প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়।

অজ্ঞান মায়া প্রকৃতির প্রভাবমুক্ত হওয়া সম্ভব একমাত্র ঈশ্বর-আত্মা-গুরুর কৃপায়, নতুবা নয়

অজ্ঞান মায়ার প্রভাব হতে মুক্ত হওয়া অতীব কঠিন। কেবলমাত্র এর করুণা অথবা ঈশ্বর বা আত্মার শুভদৃষ্টির ফলে শরণাগত সাধকগণই এর স্বরূপ অবগত হয়ে ব্রহ্ম-আত্মা-ঈশ্বর উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়।

অজ্ঞান মায়ার প্রভাবে থেকে সত্য উপলব্ধি, ঈশ্বর বা আত্মোপলব্ধি করা সম্ভবপর নয়। প্রকৃতপক্ষে মায়াশক্তি ও ঈশ্বরের মধ্যে কোন ভেদ নেই। বৈচিত্র্যময় জগৎখেলা ঈশ্বরের আত্মলীলা। জগতের প্রতিটি প্রকাশসত্তারূপে ঈশ্বরই স্বয়ং বিদ্যমান। এই বোধে জীবনের অন্তরে বাইরে সবকিছুকে ব্যবহার করলে ঈশ্বরের লীলার তাৎপর্য পূর্ণ ভাবে অনুভূত হয়। এক বোধময় আত্মসত্তার অস্তিত্বেই মায়াশক্তি ও তার লীলাখেলার অস্তিত্ব ও তার প্রকাশ-বৈচিত্র্য। এটা উপলব্ধি করাকেই পূর্ণ সত্যোপলব্ধি বলে।

বৈচিত্র্যের মাঝে অছে মিলন মহান, সমষ্টিবোধ তথা আপনবোধে তা অনুভূত হয়

প্রতি বোধ যুক্ত হয়ে সমষ্টিবোধ হয়। এই সমষ্টিবোধে অমৃতত্ব ও আত্মতত্ত্বের উপলব্ধি হয়। সেইজন্য প্রকৃতির অন্তর্নিহিত প্রতিটি বস্তুকেই আত্মবোধে বা ঈশ্বরবোধে পূজা করার বিধান দেওয়া আছে। প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের বাহ্যিক ভেদ দৃষ্ট হলেও বোধময় অস্তিত্ব সত্তায় এদের সমসম্বন্ধ আছে।

একবোধ বা সমবোধেই হল ঈশ্বরাত্মানুভূতি

সর্ববস্তুতে অখণ্ড মাতৃবোধ, আত্মবোধ বা ঈশ্বরীয় বোধ একই কথা। এই অখণ্ড একবোধে শোক-মোহ-দুঃখ-মৃত্যুভয় থাকে না। এই অখণ্ড একবোধে যাঁরা প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন তাঁরা নির্বিকারচিত্তে সবকিছুর মধ্যেই আত্মবোধের খেলা অনুভব করেন।

দ্বৈতবোধ বা ভেদবোধের বৈশিষ্ট্য

অখণ্ড সমবোধের উপলব্ধি না-হওয়া পর্যন্ত ভেদদৃষ্টি থাকে। ভেদদৃষ্টির ফলে, আপন-পর ভেদাভেদ জ্ঞান হয়। এই আপন-পর ভেদাভেদ দ্বৈতবোধে মোহ-আসক্তি-স্বার্থ-অভিমান-মৃত্যুভয় প্রভৃতি থাকে। তখন আত্মরক্ষার প্রয়োজনে শত্রুবোধে অপরকে আঘাত করতে মন চায়। একাত্মবোধের মহিমা শুনে তার পূর্ণ উপলব্ধির পূর্ব পর্যন্ত জীবনের আচরণে দ্বৈতবোধের প্রভাব থাকে।

আত্মবোধের নিরন্তর অভ্যাসের ফলে সমবোধের প্রতিষ্ঠা হয় এবং বিশ্বাস দৃঢ় হয়

আত্মবোধে সর্বকর্ম এবং সর্ববস্তুর ব্যবহার দীর্ঘকাল অভ্যাস করলে ধীরে ধীরে হৃদয়ে সমবোধের প্রতিষ্ঠা হয়। সমবোধে প্রতিষ্ঠিত হলে হৃদয়ে অখণ্ড বিশ্বাসের অভিব্যক্তি হয়। এই অখণ্ড বিশ্বাস গড়ে তোলা খুবই শক্ত। বিশ্বাসের তাৎপর্য হল বিধিগত শ্বাস এবং বিগত শ্বাস। বিগত শ্বাসের তাৎপর্য বিধিগত শ্বাস অপেক্ষা স্বতন্ত্র। বিধিগত শ্বাসের ভিত্তি হল প্রেমভক্তি। সম্পূর্ণ শরণাগতি ও আত্মসমর্পণের ভিত্তি ও পরিণাম হল বিধিগত শ্বাসের ফলশ্রুতি। ভক্তি-বিশ্বাসে বিজ্ঞানসিদ্ধি হয় ভক্তের হৃদয়ে যে-ভাবে তা-ই হল বিধিগত শ্বাসের চরম উৎকর্ষ। এই

বিশ্বাসের অধিকারী হল ঈশ্বর-গুরু-ইষ্ট অনুরাগী বিশিষ্ট ভক্তজীবন। প্রেমভক্তির পরাকাষ্ঠাই হল এই বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের অধিকারী ভক্ত দুর্লভ হলেও অসম্ভব নয়। এই বিশ্বাসের অধিকারী ভক্ত ভাবশুদ্ধির ফলে ইষ্ট-গুরু-ঈশ্বরাত্মার স্বভাবধর্ম প্রাপ্ত হয়। স্বভাবসমাধি, আনন্দসমাধি প্রভৃতি ভক্তিসমাধির মাধ্যমে এ লব্ধ হয় বলে এটা ভাবসমাধির পর্যায়ভুক্ত। এই ভাবসমাধি হল সবিকল্প ও সবীজ সমাধি, অর্থাৎ এই সমাধির উদয়-অস্ত আছে। এটা পুনঃপুনঃ ঘটতে পারে কিন্তু একনাগাড়ে দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। তথাপি এর মাধ্যমে ভক্ত গুরু-ইষ্ট-ঈশ্বরাত্মার স্বভাবমহিমা দর্শন, আস্বাদন ও অনুভব করে আপনাকে ধন্য মনে করে—এ-ই ভাগবৎ জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এইরূপ ভক্ত ঈশ্বরের লীলা অবতারের বিশেষ পার্ষদ। ঈশ্বরের অতীব প্রিয় তারা। কিন্তু জ্ঞানী সিদ্ধপুরুষ হল ঈশ্বরের আত্মা স্বয়ং।

অপর পক্ষে বিগত শ্বাস যে-বিশ্বাস তার অধিকারী হল বিবেকবিচারসিদ্ধ জ্ঞানী। জ্ঞানী হৃদয়ে যে-প্রাণক্রিয়ারূপ শ্বাসকার্য হয় তা সমাধির মাধ্যমে প্রজ্ঞাস্থিতিতে নিরসন হয়। তার ফলে হয় নির্বিকল্প সমাধি। সমাধিস্থিতিতে শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি নিরোধ হয়ে যায়। সেইজন্য বলা হয়েছে বিগত শ্বাস, অর্থাৎ যেখানে শ্বাস-প্রশ্বাসরূপ প্রাণের ক্রিয়া সম্যক্‌রূপে স্তব্ধ বা রহিত হয়ে যায়। এমতাবস্থায় একাদিক্রমে একুশ দিন পর্যন্ত চলতে পারে, তার বেশি নয়। একুশ দিনের বেশি হলে আর প্রাণের ক্রিয়া ফিরে আসে না। তখনই হয় আত্মার কৈবল্য লাভ ও দেহের চির অবসান। সবসংস্কার শূন্য হয়ে যায় বলে সে-জ্ঞানীর পুনরায় দেহধারণের বীজ সংস্কার থাকে না। মুক্তি বিজ্ঞানে কৈবল্যমুক্তি হচ্ছে সর্বোত্তম। জ্ঞানসিদ্ধ পুরুষের ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ হয়, অর্থাৎ ব্রহ্মবোধে তার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা হয়। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ ব্রহ্মই স্বয়ং। তিনি বোধে বোধে বোধময়, অর্থাৎ ব্রহ্ম স্বয়ং। এ পূর্ণ স্বানুভবসিদ্ধ বলে যুক্তিতর্কের অতীত। অতএব সিদ্ধ ভক্তের বিশ্বাস যেমন বিধিগত শ্বাস, সেইরূপ সিদ্ধ জ্ঞানীর বিশ্বাস হল বিগত শ্বাস।

কোন কিছুর বিশ্বাস গড়ে ওঠার প্রথম অবস্থায় তাকে ভেঙ্গে দেওয়া খুব সহজ। কিন্তু সেই বিশ্বাস দৃঢ় ও গাঢ় হয়ে অখণ্ডের রূপ যখন নেয় তখন কোন শক্তিই তাকে নষ্ট করতে পারে না।

দেশের ও দশের সেবা যথার্থ ভাবে সম্ভব হয় ঈশ্বর-আত্মা-গুরুর কৃপায়, নতুবা নয়

ঈশ্বরীয় বোধে প্রতিষ্ঠিত না হলে যথার্থ নিষ্কাম ভাবে দেশের ও দশের সেবা বা কল্যাণ করা কখনও কারও পক্ষেই সম্ভবপর নয়।

ঈশ্বর-আত্মা-গুরুর কৃপায় হৃদয়বৃত্তি ও বিবেকের উদয় হয়, তার দ্বারাই দেশের ও দশের যথার্থ মঙ্গল-কল্যাণ সম্ভব

আত্মজ্ঞান বা ঈশ্বরীয় জ্ঞানের সাহায্য ব্যাতীত কেবলমাত্র জড়বিজ্ঞানের অনুশীলন ও তার ব্যাপক প্রচারের দ্বারা জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব। শুধুমাত্র বুদ্ধিবিজ্ঞানের উপর নির্ভর করে জগতের, এমনকি ব্যক্তিগত কোন সমস্যারও সমাধান হয় না। কিন্তু যথার্থ হৃদয়বত্তার সাহায্যে বিবেকজ্ঞানের দ্বারা সর্ববিধ সমস্যার সমাধান করা সম্ভবপর হয়।

অখণ্ড আত্মবোধ বা ঈশ্বরীয় বোধের শক্তি দ্বারা অসম্ভবও সম্ভব হয়। এই ঈশ্বরীয় শক্তি ও ঈশ্বর অভেদ। সুতরাং সচ্চিদানন্দময়ী জগৎজননী ভগবতী মাতার সাহায্যে তাঁর প্রকাশসন্তান সর্বজীবন তাঁর অপার করুণাঘন স্বরূপকে অন্তরে বাইরে অভেদে অনুভব করার চেষ্টা করলে, প্রেমময়ী মাতার স্নেহ-ভালবাসার দ্বারা সিঞ্চিত হয়ে তাঁর অমৃতময় বক্ষে শান্তিতে বাস করতে পারে।

সমগ্র সৃষ্টি, সর্ব রূপ-নাম-ভাব হল অখণ্ড বোধের স্বভাবের বিস্তার

মাতা যেমন সন্তানকে বুকে ধারণ করে ও হাতে ধরে রাখে সেইরূপ অখণ্ড বোধসত্তা তাঁর সকল প্রকাশ-সন্তানকে আপন বক্ষে রেখে আপন বোধের দ্বারাই তাদের লালন পালন ও পূরণ করে চলেছেন। জীবনের অন্তরে বাহিরে, উর্ধ্বে অধঃ ও চারপাশে সর্ব রূপ-নাম-ভাবের মাধ্যমে অখণ্ড বোধস্বরূপ ব্রহ্ম-আত্মা-ঈশ্বর, গুরু-ইষ্ট-মাতার স্বভাবের লীলা অভিনয় অবিরাম ধারায় চলেছে।

আত্মবিদ্যা পুঁথিগত জ্ঞানের অধীন নয়, হৃদয়বোধের সম্যক্ পরিচয়

শুধু পুঁথি-পুস্তকের জ্ঞানের উপরে নির্ভর না-করে, শ্রদ্ধা-বিশ্বাস ও ভক্তি সহকারে আত্মজ্ঞানের অনুশীলন দ্বারা দিব্যজীবন লাভ করাই সকলের কর্তব্য।

বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহুদূর

দৃঢ় বিশ্বাসের দ্বারা যা সম্ভবপর হয়, যুক্তি-তর্ক-বিচারের দ্বারা তা সম্ভবপর হয় না। জীবন সমস্যার সমাধান ঈশ্বরের কৃপা ছাড়া কেবল নিজের চেষ্টায় হয় না।

ঈশ্বর-আত্মবোধে সব 'মেনে মানিয়ে চলার' ফলে হয় জীবনের সর্ব সমস্যার সমাধান

যারা আত্মবোধে বা ঈশ্বরবোধে সবকিছুকে গ্রহণ করে, ব্যবহার করে ও সেবা করে তারা-ই ধন্য, তারাই শ্রেষ্ঠ সাধক এবং তারাই দিব্যজীবন লাভ করে। এই বোধে চলতে পারলে জগতের কোন সমস্যাই আর থাকে না।

সর্ব প্রশ্নের উত্তর প্রশ্নের মূলেই নিহিত থাকে

নিজের সমস্যা নিজেকেই সমাধান করতে হয়। প্রাণের মধ্য থেকে যে-প্রশ্ন ওঠে, প্রাণের কেন্দ্র থেকেই তার সমাধান মেলে। [২৬।৮।৬৮]

আত্মযজ্ঞ হল স্ববোধে স্বভাবের বিলাস

আত্মযজ্ঞ হচ্ছে বোধের যজ্ঞ বা প্রাণচৈতন্যের যজ্ঞ। বোধের যজ্ঞে বোধের ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রকাশসমূহ ওঠে, ভাসে ও ডোবে। অর্থাৎ বোধের প্রকাশসমূহ পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে দ্বৈতাদ্বৈত ভাবে খেলা করে আবার বোধস্বরূপে মিশে যায়।

আত্মযজ্ঞই হল আত্মলীলা, আপনে আপন, পরমে পরম, স্বয়ং-এ স্বয়ং

স্বভাববোধে বোধস্বরূপ হতে বোধ উঠে বোধের প্রীতি নিমিত্ত স্ববোধের দ্বারা বোধকে ব্যবহার করে বোধস্বরূপের মহিমা প্রকাশ করে। এর অর্থ আত্মযজ্ঞে আত্মা স্বয়ং আত্মাকে আত্মবোধে ব্যবহার করে আত্মার স্বরূপ প্রকাশ করে। অর্থাৎ আত্মবোধে আত্মাই আত্মাকে আত্মাহুতি দেয়।

দ্বৈতবোধে কাম-কর্ম-কর্তৃত্বের ব্যবহার সিদ্ধ হয়, কিন্তু অদ্বৈতবোধে অসিদ্ধ

একাত্মবোধই হল অদ্বৈত বোধ। এই বোধে সর্ববিধ দ্বৈতভাবের অভাববশত দেবার ও নেবার প্রশ্ন থাকে না। কিন্তু এই বোধের অভাবে এবং বহুবোধে অজ্ঞানের প্রভাবে অর্থাৎ নানাত্ব বোধে দেবার-নেবার, কর্তা-কর্ম-করণ প্রভৃতির ব্যবহার থাকে। আত্মা স্বয়ং নিত্য অখণ্ড শুদ্ধ বোধস্বরূপ। শাশ্বত সমতাই তার সর্বোত্তম স্বভাব বা প্রকৃতি।

নিত্যাদ্বৈত স্ববোধ আত্মার বক্ষে তার লাস্যভাব স্বভাব মাধ্যমে হয় লীলাবিলাস

অখণ্ড আত্মার বক্ষে আপন স্বভাবের লীলাবিলাসের ইচ্ছা জাগে। এই লীলাবিলাস হচ্ছে লাস্যভাব[১]। অর্থাৎ স্বভাববোধে বোধস্বরূপ স্বপ্রকাশ আত্মা স্বেচ্ছায় যা-কিছু ভাবনা করে বা কল্পনা করে তা-ই তার লাস্যভাব। এই লাস্যভাবকে আত্মার মানসপ্রকৃতি বা স্বভাবপ্রকৃতি বলে।

আত্মার লীলাময় রূপই হচ্ছে তাঁর ঈশ্বরীয় রূপ

বোধস্বরূপ স্বপ্রকাশ আত্মার মানসপ্রকৃতি স্বভাব আনন্দের আতিশয্যে স্পন্দিত হয়ে উদ্বুদ্ধ হয়। তার ফলে, বোধসত্তার বক্ষে বোধের গতি তৈরি হয়। বোধের গতিসকল পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে মহাপ্রাণরূপে অথবা সগুণ ঈশ্বররূপে অভিব্যক্ত হয়।

সমগ্র জীবজগৎ হল তাঁর লীলাবিলাস, আত্মজ্ঞানীর কাছে এটাই স্বানুভূতি[২]

মহাপ্রাণ কল্পনা প্রভাবে আপনার বক্ষে বহুভাবে নিজেকে ব্যক্ত করে। মহাপ্রাণ বা অনন্ত মানসপ্রকৃতির বৈচিত্র্যময় অভিব্যক্তির সমষ্টি হচ্ছে এই বিশ্বরূপ। সুতরাং বিশ্বরূপ হচ্ছে চিৎসত্তার স্বভাবরূপ বা লীলাময় রূপ।

স্বপ্রকাশ ঈশ্বরের বৈশিষ্ট্য হল তিনি স্বয়ং প্রকাশক ও প্রকাশরূপে অভিন্ন

মহাপ্রাণের বুকে তার কোন অভিব্যক্তি পৃথক ভাবে থাকতে পারে না। বহির্দৃষ্টিতে বৈচিত্র্যময় মানস অভিব্যক্তিগুলিকে রূপ, নাম, ভাবে পৃথক দেখা গেলেও বস্তুত তারা পৃথক নয়। সর্বপ্রকাশের মধ্যেই বোধস্বরূপ স্বভাব-আত্মা স্বয়ং বিদ্যমান।

প্রাণের বক্ষে প্রাণ লীলা করে। অর্থাৎ অখণ্ড বোধসাগরে বোধের তরঙ্গসমষ্টি নৃত্য করে। এই বোধে, প্রাণচৈতন্যের অন্তরে ও বাইরে তার সর্ববিধ প্রকাশরূপের মধ্যে কেবলমাত্র প্রাণচৈতন্যেরই পরিচয় পাওয়া যায়। বস্তুজগৎ তার একটা বিশেষ অভিব্যক্তি মাত্র।

মহাপ্রাণরূপে পরমাত্মা এবং বিশ্বরূপে মহাপ্রাণ। সুতরাং বিশ্বরূপে পরমাত্মাই স্বয়ং প্রকাশমান।

আমিতত্ত্বের তাৎপর্য

আমি শব্দের মানে- -'আ' তে আনন্দ, 'ম' তে মা, 'ই' তে ইচ্ছা। আনন্দময়ী মা ইচ্ছা দ্বারা ব্যক্ত হয়ে বা বিস্তৃত হয়ে 'আমি বোধে' প্রকাশিত হয়। 'আমি' হচ্ছে বোধস্বরূপের প্রকাশলক্ষণ। আনন্দ-স্বরূপিনী মা যখন ইচ্ছা দ্বারা নিজেকে প্রকাশ করে তাকেই আত্মবিলাস বা 'আমির' প্রকাশ"বলে। সুতরাং বিশ্বলীলা হচ্ছে পরমাত্মার লীলাবিলাস বা 'অখণ্ড আমির' লীলাবিলাস।

পরমাত্মার আমিই সর্ব আমির অধিষ্ঠান, সুতরাং আত্মলীলার অধিষ্ঠানও এই অদ্বয় আমি

পরমাত্মার লীলাবিলাস বা অখণ্ড আমির লীলাবিলাসে সর্ববিধ প্রকাশের মধ্যে সত্তা ও শক্তিরূপে অর্থাৎ বোধ ও মনরূপে "এক আমি নিত্যবিদ্যমান"।

১। আত্মার স্বভাবশক্তির বক্ষে ইচ্ছার স্ফূর্তি জাগে। স্বভাবে ইচ্ছাবিলাস হল স্ববোধ আত্মার লাস্যভাব। এই হল লীলা-বিলাসের কারণ। ২। স্ববোধ বা আপনবোধের স্ফূর্তি।

নিত্যলীলা অর্থে বোধের সঙ্গে বোধের খেলা অর্থাৎ আমির সঙ্গে আমির খেলা। বোধের মধ্যে বোধ বা আমির মধ্যে আমি—এ-ই অদ্বয় তত্ত্ব।

অদ্বৈতের দ্বৈতবিলাস

বোধের মধ্যে মন এবং মনের মধ্যে বোধ অথবা আমির মধ্যে তুমি বা তুমির মধ্যে আমি—এ-ই অদ্বৈতের দ্বৈতবিলাস। দ্বৈতবোধে অদ্বয়স্বরূপের অর্থাৎ বোধস্বরূপের অখণ্ডতা বোধের বৃত্তি দ্বারাই আবৃত হয়ে দ্বৈতরূপে প্রতিভাত হয়।

মনের তাৎপর্য

বাধিত বোধের বৃত্তিকেই বোধের বিকৃত রূপ বা গুণ বলা হয়। বোধের গুণেরই অপর নাম মন। অর্থাৎ বোধের সঙ্কুচিত এবং স্পন্দিত প্রকাশরূপের নামই মন[১]।

অখণ্ডবোধের আমি হল প্রজ্ঞানের আমি, তারই বিজ্ঞানময় রূপ হল লীলাময় ঈশ্বরের আমি, তারই স্বভাব বিজ্ঞান হল বিশ্বমন[২]

বোধের স্পন্দনের প্রথম রূপ ইচ্ছা। তার পরিপূর্ণ রূপ হচ্ছে মন। মনের স্পন্দনই হচ্ছে চিন্তা বা কল্পনা। সমষ্টি ইচ্ছা, চিন্তা ও কল্পনা অখণ্ড বোধসত্তার বক্ষে অর্থাৎ পরমাত্মার আমির বক্ষে ক্রমধারায় অভিব্যক্ত হয়ে বিশ্বরূপে তার আত্মলীলা সম্পাদন করে। আত্মলীলার ক্রমধারা যথাক্রমে সূক্ষ্মতম, সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্ম ও স্থূলরূপে অভিব্যক্ত হয়। সবগুলির মধ্যেই বোধসত্তা ও শক্তিরূপে 'আমি' প্রকাশমান। 'অখণ্ড আমিই' সর্ব 'আমির' বেশে নিত্য নব ভাবে লীলা করে চলেছে।

অদ্বয় আত্মার ত্রিবিধ পরিচয়

তত্ত্বত আত্মার অর্থ হচ্ছে নিত্য-শাশ্বত-অখণ্ড-বিশুদ্ধ বোধস্বরূপ। সূক্ষ্ম ব্যবহারিক অর্থ হচ্ছে অন্তঃকরণ অর্থাৎ মন-বুদ্ধি-অহংকার ও চিত্ত। স্থূল ব্যবহারিক অর্থ হচ্ছে দেহ-ইন্দ্রিয়, ভোগ্যবস্তু প্রভৃতি।

যজ্ঞ শব্দের তাৎপর্য (তত্ত্বার্থ)

যজ্ঞের অর্থ সমবোধের ক্রিয়া। নিষ্কাম ভাবে যজ্ঞানুষ্ঠানকেই যজ্ঞ বলা হয়। একাত্মবোধের নাম প্রীতি। এই প্রীতিবোধে কায়মনোবাক্যে কোন কিছু নিষ্পন্ন করাকেই যজ্ঞ[৩] বলা হয়।

যজ্ঞ ও কর্মের পার্থক্য

যজ্ঞ ও কর্মের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে। শুদ্ধবোধের প্রীত্যর্থে অর্থাৎ সমবোধে কর্ম করাই যজ্ঞ। কিন্তু মনের স্বার্থ ও কামনা সিদ্ধির নিমিত্ত কিছু করাকে কর্ম বলে। আবার নিষ্কাম ও সকামবোধে কর্ম দ্বিবিধ। নিষ্কাম কর্ম ও যজ্ঞ এক অর্থবোধক। সকাম কর্ম সু ও কু ভেদে দ্বিবিধ। একে বিধিপূর্বক কর্ম ও নিষিদ্ধ কর্ম বলে।

১। তত্ত্বের দৃষ্টিতে। ২। বিশ্বমন হল সমষ্টিমন যার অভিব্যক্তি ব্যষ্টিমন। সমষ্টিমন ঈশ্বরের স্বভাব, ব্যষ্টিমন জীবের স্বভাব।
৩। অভিনব সংজ্ঞা।

বোধ ও মনের পার্থক্য—বোধের স্বরূপ অদ্বৈত, মনের স্বরূপ দ্বৈত[১]

বোধের প্রীতি ও মনের প্রীতি সাধনের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। অখণ্ড সমত্বের স্থিতিভাবনাই বোধের প্রীতি অর্থাৎ প্রজ্ঞাস্থিতি বা সমদৃষ্টিই বোধের প্রীতি। কিন্তু মনের প্রীতি হল পৃথক পৃথক ভাবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে ভোগাশক্তি।

আহুতির তত্ত্বার্থ

আহুতি অর্থ যোগ্যতা, শক্তি, জ্ঞান প্রভৃতি লাভের নিমিত্ত বৃহৎ ও মহতের উদ্দেশ্যে কিছু নিবেদন করা। মুক্তি-শান্তি-অমৃতত্ব-আত্মতত্ত্ব বা ঈশ্বরতত্ত্ব প্রভৃতির সত্য পরিচয় লাভের নিমিত্ত বিবিধ ক্রিয়ার সাধনকে বা অনুষ্ঠানকে আহুতি[২] বলে।

আহুতির প্রকারভেদ

আহুতির প্রভারভেদ আছে। স্থূলবস্তু হতে আরম্ভ করে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর এবং সূক্ষ্মতম ভিন্ন ভিন্ন স্তরের আহুতি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সাধিত হয়। সোজা কথায় ক্ষুদ্র সসীমকে, নানাত্ব বহুত্বকে একত্বে সমর্পন করাকেই আহুতি[৩] বলে।

আত্মাহুতির বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পরিচয়

সর্ববিধ আহুতির মধ্যে আত্মাহুতি উত্তম। এই আত্মাহুতি ত্রিবিধ ভাবে সাধিত হয়। তন্মধ্যে পূর্ণাহুতি হচ্ছে সর্বোত্তম। এই পূর্ণাহুতির লক্ষণ ব্যষ্টি আমিসত্তাকে সমষ্টি আমিসত্তা বা তদূর্ধ্বের আমিসত্তার কাছে পূর্ণ ভাবে সমর্পণ করা।

পূর্ণ আহুতির নিগূঢ়ার্থ

পূর্ণ আহুতি বা পূর্ণ আত্মসমর্পণের সাধনা হচ্ছে ব্যক্তিগত জীবনের মানসিক প্রীতির ভাবকে প্রশ্রয় না-দিয়ে অন্তরে ও বাইরে সর্ববিধ রূপ-নাম-ভাবকে অর্থাৎ বস্তু-ব্যক্তি-কর্ম ও সবকিছুকে অখণ্ডবোধে বা সমবোধে অর্থাৎ ঈশ্বর বা আত্মবোধে গ্রহণ করে 'মেনে মানিয়ে চলা'।

প্রাণচৈতন্যের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ/অভিব্যক্তির বৈশিষ্ট্য

সর্ববস্তুই প্রাণচৈতন্যের প্রকাশরূপ। জড় ও চেতনের ভেদদৃষ্টি বোধের দ্বিবিধ ব্যবহার মাত্র। এক বোধসত্তাই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে নিজেকে জীবনরূপ ধরে প্রকাশ করে। জীবমাত্রই প্রাণচৈতন্যের মূর্ত রূপ। অন্যান্য জীবের তুলনায় মানুষের মধ্যে প্রাণচৈতন্যের অভিব্যক্তির মাত্রা অধিক দেখা যায়।

প্রাণচৈতন্যের স্পন্দনে গড়া, স্পন্দনে ভরা জীবন সবার

মানুষের বুদ্ধি-চিত্ত-মন-অহংকার-ইন্দ্রিয় এবং স্থূলদেহ বোধস্বরূপ আত্মা বা প্রাণচৈতন্যের বিভিন্ন স্পন্দন মাত্র। এই স্পন্দনগুলি পরস্পর সংযুক্ত হয়েই জীবনলীলা সম্পন্ন করে।

বোধে গড়া জীবনে বোধের প্রকাশ-বিকাশের মানের তারতম্য হয় ব্যবহার দোষে

বোধের মাত্রাভেদে জড় ও চেতনের পার্থক্য দৃষ্ট হয়। জড়ত্ব হচ্ছে প্রাণচৈতন্যের সঙ্কুচিত ও ঘনীভূত

১। দ্বৈত অর্থে একাধিক নানাত্ব, বহুত্ব ও বৈচিত্র্যকে বোঝায়। ২। অভিনব সংজ্ঞা। ৩। তত্ত্ব দৃষ্টিতে।

অবস্থা। বোধের বা প্রাণচৈতন্যের স্পন্দনের মাত্রার তারতম্য ভেদে তার প্রকাশসমূহের মধ্যে নানাত্ব-বহুত্ব বা বৈচিত্র্য সৃষ্ট হয়।

বৃহত্তর স্পন্দনের অধীনের ক্ষুদ্রতর স্পন্দনের সমষ্টি সক্রিয় হয়ে বৃহত্তর স্পন্দনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় ও বৃহত্তর বোধে মিশে যায়

বৃহত্তর বোধের স্পন্দন দ্বারা সঙ্কুচিত ও ক্ষুদ্রতর বোধের স্পন্দন অর্থাৎ চৈতন্যের দ্বারা জড়ত্ব শোধিত হয় বা চৈতন্যময় হয়। প্রাণচৈতন্যের ঘনীভূত ও সঙ্কুচিত অবস্থা আধার, দেহ বা ক্ষেত্ররূপে আশ্রয় করে প্রাণচৈতন্য যখন প্রকাশিত হয় তখনই তাকে জীব বলা হয়।

বোধের বহির্মুখী ধারাকে অবিদ্যা এবং অন্তর্মুখী ধারাকে বিদ্যার ব্যবহার বলা হয়

জীবদেহে মনের মাধ্যমে প্রাণচৈতন্যের দ্বিবিধ ব্যবহার হয়। জড় ও স্থূল বিষয়ের প্রতি মনের গতিকে বিষয়প্রবৃত্তি বলে। অর্থাৎ মনের বহির্মুখী গতিকে অবিদ্যাশক্তি বা নিম্ন প্রকৃতি বলে। নিম্ন প্রকৃতির কাজ হচ্ছে নানাত্ব বহুত্ব অর্থাৎ পৃথক পৃথক ভাবে সসীমের মধ্যে যুক্ত থাকা। একেই অজ্ঞান বলা হয়। অপর পক্ষে সূক্ষ্ম প্রাণচৈতন্যের প্রতি মনের গতিকে বিষয়নিবৃত্তি ও বোধের প্রবৃত্তি বলে। অর্থাৎ মনের অন্তর্মুখী গতিকে বিদ্যাশক্তি বা ঊর্ধ্ব প্রকৃতি বলে। ঊর্ধ্ব প্রকৃতির কাজ হল একত্ব বা সমত্ববোধে যুক্ত থাকা। একেই জ্ঞান বলা হয়।

বোধের প্রকাশের মধ্যে সঙ্কোচন ও সম্প্রসারণ বিজ্ঞান জীবজগতের সমগ্র কার্য নিষ্পন্ন করে

বোধের প্রকাশধারায় সঙ্কোচন ও সম্প্রসারণ বা নানাত্ব-বহুত্ব ও একত্ব এই দ্বিবিধ গতির পরিচয় পাওয়া যায়। সঙ্কোচনের মাধ্যমে নানাত্ব-বহুত্বরূপে ক্রমধারায় বোধের প্রকাশ হতে থাকে। অপর পক্ষে সম্প্রসারণের মাধ্যমে বিভিন্ন বোধের রূপ ক্রমধারায় পরস্পর সংযুক্ত হয়ে একত্বের বা সমত্বের রূপ ধারণ করে। উভয় গতির মধ্যেই বোধের দ্বিবিধ পরিণাম আহুতিযোগ বা সমর্পণযোগের মাধ্যমে সাধিত হয়। বোধ একবার ঊর্ধ্ব প্রকৃতি থেকে নেমে নিম্ন প্রকৃতির মধ্যে খেলা করে, আবার নিম্ন প্রকৃতি থেকে ঊর্ধ্ব প্রকৃতিতে উঠে তার মধ্যে লীলা করে।

নিম্ন প্রকৃতি ও ঊর্ধ্ব প্রকৃতির পরস্পরের কার্য ও তার সমাধান

ঊর্ধ্ব প্রকৃতির অভিমুখে উঠে যাবার সময়ে নিম্ন প্রকৃতির নানাত্ব বহুত্বের প্রতি আসক্তি এবং তার পৃথক পৃথক ভাবগুলি পর্যায়ক্রমে ঊর্ধ্ব প্রকৃতির ভাব ও গতিশক্তির মধ্যে নিজেদের সমর্পণ করে বা আহুতি দেয়। তার ফলে, তারা ঊর্ধ্ব প্রকৃতির ভাব ও গতিশক্তির সঙ্গে পরিপূর্ণ ভাবে মিশে যায়। অর্থাৎ নিম্ন প্রকৃতি পরিশোধিত হয়ে ঊর্ধ্ব প্রকৃতিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

ঊর্ধ্ব প্রকৃতির মাধ্যমে নিম্ন প্রকৃতির সমগ্র বিজ্ঞান ঊর্ধ্ব প্রকৃতির বিজ্ঞানে রূপান্তরিত হয়, তার ফলে হয় সম্যক্ বোধ সংবিৎ[১]-এর উদয়

ঊর্ধ্ব প্রকৃতিতে রূপান্তরিত হওয়ার সময় পর্যায়ক্রমে স্থূলদেহের বৃত্তি ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিতে পরিণত হয়, ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি অহংকারের মাধ্যমে মনের বৃত্তিতে পরিণত হয়, মনের বৃত্তি বুদ্ধির বৃত্তিতে পরিণত হয়, বুদ্ধির বৃত্তি বোধস্বরূপে পরিণত হয়। সেই বোধের স্মৃতিকেই ধ্রুবাস্মৃতি বা প্রজ্ঞাস্থিতি[২] বলা হয়।

১। সংবিৎস্বরূপ হল বিশুদ্ধচৈতন্য আত্মা/ব্রহ্ম, ব্রহ্মসাগর, অর্থাৎ সংবিৎসাগর। ২। অভিনব সংজ্ঞা।

সৎসঙ্গের মাধ্যমে শুদ্ধবোধের পরিচয় শ্রবণ করে তার স্মরণ-মনন দ্বারা নিম্ন প্রকৃতির প্রভাব কমে অর্থাৎ চিত্তের শোধন হয়। তখন উর্ধ্ব প্রকৃতির প্রভাব সহজেই জীবনে কার্যকরী হয়।

পুরুষকার ও তার কার্যের তত্ত্বপূর্ণ বিশ্লেষণ

দৃঢ় ভাবে প্রচেষ্টার মাধ্যমে অন্তরে শুভসংস্কারের বৃত্তিগুলি জেগে ওঠে। আত্মপ্রচেষ্টাকেই পুরুষকার[১] বলা হয়। এই পুরুষকারের দ্বারা স্বভাবপ্রকৃতির সর্ববিধ মল পরিশোধিত হয়। স্বভাবপ্রকৃতি ক্রমধারায় পরিশোধিত হয়ে শূদ্র স্তর থেকে বৈশ্য স্তর, বৈশ্য স্তর থেকে ক্ষত্রিয় স্তর, ক্ষত্রিয় স্তর থেকে পরিশেষে ব্রাহ্মণের স্তরে উপনীত হয়।

পুরুষকারের মাধ্যমে সকাম হতে নিষ্কাম কর্মের যোগ্যতা লাভ হয়। কর্মযোগের সাধন বিনা প্রকৃত জ্ঞানী, যোগী ও ভক্ত হওয়া যায় না। কর্ম-যোগ-ভক্তি ও জ্ঞান পরস্পরের সঙ্গে অভেদে যুক্ত। এইগুলি স্বভাবপ্রকৃতির বিকাশের বা অভিব্যক্তির মাধ্যম ও লক্ষণ। এদের মধ্যে কোনটার প্রাধান্য জীবনে অধিক হলেও অন্যগুলির সঙ্গে যুক্ত থাকে। কোনটার অভাব থাকলে বা কোনটা অবহেলিত হলে স্বভাববোধের সামঞ্জস্য বা সমতা থাকে না।

বহুবিধ নামেই পূর্ণতার ব্যবহার হয়

স্বভাবপ্রকৃতির অভিব্যক্তির লক্ষণ ও ভাব অনুযায়ী বিভিন্ন মতপথের সৃষ্টি হয়েছে। সব মতপথেরই পরিণাম বা লক্ষ্য এক। এই এক লক্ষ্যই হচ্ছে পূর্ণতালাভ। এই পূর্ণতাকেই মুক্তি-শান্তি-অমৃতত্ব-ঈশ্বর-আত্মা প্রভৃতি বলা হয়।

পূর্ণতা সিদ্ধির জন্য শ্রদ্ধা-ভক্তি-বিশ্বাসের ভূমিকা সর্বোত্তম

পূর্ণতালাভের সর্ববিধ সাধন পথে বিশ্বাস হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ সহায়ক। শ্রদ্ধা-ভক্তি-বিশ্বাস সত্যবোধ বা আত্মবোধের প্রকাশ। এগুলি পরস্পর অভেদে যুক্ত এবং এক অর্থবোধক। শ্রদ্ধাহীনের বিশ্বাস হয় না, আবার বিশ্বাসের অভাবে শ্রদ্ধাবানও হওয়া যায় না। শ্রদ্ধা-বিশ্বাস বিনা ভক্তির সাধন হয় না, আবার ভক্তি বিনাও শ্রদ্ধা-বিশ্বাসের বিকাশ হয় না। এদের যে-কোন একটা সাধন দ্বারাই অপর দু'টিও সিদ্ধ হয়। বিশ্বাসে 'মেনে মানিয়ে চললে' অভিজ্ঞতার মাত্রা বেড়ে শুদ্ধ জ্ঞানের প্রকাশ হয়।

শুদ্ধ জ্ঞান ও প্রেমের লক্ষণ হল একত্বে

একত্বে স্থিতি বা সমানে স্থিতিই হচ্ছে শুদ্ধ জ্ঞানের লক্ষণ। এ-ই হল আবার প্রেমের লক্ষণ। দুই বা বহুত্বই অজ্ঞানের লক্ষণ। দ্বৈত ও অদ্বৈত উভয় বোধেই জ্ঞান ও ভক্তির ব্যবহার আছে। দ্বৈতবাদের ভক্তিতে বিরহ থাকে। অদ্বৈতবাদের ভক্তিতে বিরহ থাকে না। দ্বৈতবাদের ভক্তি সাধ্য, সাধক ও সাধনযুক্ত। কিন্তু অদ্বৈতবাদের ভক্তি সত্তা ও শক্তির অভেদে স্থিতি ও প্রীতি। অর্থাৎ সমবোধে বা আপনবোধে অবিরাম ধারায় অস্তি-ভাতি-প্রেম-প্রীতি।

দ্বৈত ও অদ্বৈত বোধের সাধন ও সিদ্ধির বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পরিচয়

দ্বৈতবোধের সাধনা মনের স্তরের সাধনা, অদ্বৈতবোধের সাধনা শুদ্ধবোধের সাধনা। দ্বৈতবোধের সাধনার পরিণাম স্বভাবের সিদ্ধি এবং অদ্বৈতবোধের সাধনার পরিণাম স্ববোধের সিদ্ধি। দ্বৈতবোধের সাধনার মাধ্যমে স্বভাবের সিদ্ধি লাভ করে তারপরে অদ্বৈতবোধের সাধনায় স্ববোধের সিদ্ধিলাভ হয়।

১। তত্ত্বার্থ।

কাম-কর্ম-কর্তৃত্বের সাধনায় চিত্তের মূলে জগৎ, জগতের মূলে চিত্ত

কল্পনার মাধ্যমে অন্তরে স্বভাববোধের বিকাশ প্রথমে স্পন্দনাকারে থাকে। তারপরে ভাবনা অনুরূপ তা কর্মের মাধ্যমে বাইরে অভিব্যক্ত হয়। সূক্ষ্ম অভিব্যক্তিগুলি চারু ও কারু ভেদে দ্বিবিধ। সাহিত্য-দর্শন-শিল্পকলা-সঙ্গীত-কাব্য-নাটক ইত্যাদি চারুশিল্পের অন্তর্গত। স্থূলবস্তুর উৎপাদন কারুশিল্পের অন্তর্গত। সৃষ্টিমাত্রই স্বভাবপ্রকৃতির বহিরভিব্যক্তি। এক প্রাণচৈতন্যেরই নানাবিধ প্রকাশের মধ্যে অন্তর-বাহির ভেদে প্রাণের দ্বিবিধ ক্রিয়া দেখা যায়।

পূজার নিগূঢ়ার্থ, মনের বোধ ও প্রাণের বোধের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ব্যবহার

প্রাণের বোধে প্রাণের প্রকাশকে পূজা-অর্চনা[১] বলা হয়। বোধের বিজ্ঞানকে প্রাণের বিজ্ঞানের মাধ্যমে সহজে অনুভব করা যায়। প্রাণের ধর্ম নিজেকে ছড়িয়ে দেওয়া।

দ্বৈতবোধ ও অদ্বৈতবোধের ব্যবহারের লক্ষণ

অদ্বৈতবোধ হলে অনর্থ ভাবনা, মৃত্যুভয় প্রভৃতি থাকে না। দ্বৈতবোধে ধর্মাধর্ম, পাপপুণ্য, সদসৎ প্রভৃতি থাকে। দ্বৈতবোধ মনোধর্ম। মনোধর্মকে বোধের ধর্মের সঙ্গে যুক্ত করাই সর্বসাধনার অভিপ্রায়।

অহংকারের লক্ষণ

অহংকার স্বভাবমনের অপূর্ণ বা বিকৃত রূপ। এর মাধ্যমে মনোধর্ম বিস্তার লাভ করে। অহংকার দ্বিবিধ। একটা মনের বোধের বা অবিদ্যাশক্তি অথবা অজ্ঞানের অহংকার। অপরটি হচ্ছে বোধের অহংকার বা বিদ্যাশক্তির অহংকার। প্রথমটি অশুদ্ধ, কিন্তু দ্বিতীয়টি শুদ্ধ। দ্বিতীয় অহংকার শুদ্ধচিত্তের অহংকার। একেই শুদ্ধসাত্ত্বিক অহংকার বলে।

দ্বৈতবোধের মূলে অদ্বৈতবোধই বিরাজ করে

দ্বৈতবোধের মধ্যে থেকেও তদূর্ধ্বে অদ্বৈতবোধের স্থিতি। মনের মধ্যে বাস করে অথবা মনরূপে ব্যক্ত হয়েও বোধের শাশ্বত স্বরূপ নিত্যপূর্ণ শুদ্ধ অখণ্ড।

জ্ঞানগঙ্গা ও সুষুম্নার তত্ত্বার্থ

জ্ঞানগঙ্গার দুই তীর ধর্ম-অধর্ম, সত্য-অসত্য, ভাল-মন্দ ইত্যাদি। দুইয়ের মধ্যে একের স্থিতি। এর অপর নাম সুষুম্না। সুষুম্নার অর্থ—সু + ষুমন + আ। 'সু' হচ্ছে আদি, অবিমিশ্র, সুন্দর, পবিত্র, শান্ত ইত্যাদি। 'ষুমন' অর্থ হচ্ছে নির্মল বা শুদ্ধবোধের প্রকাশশক্তি। 'আ' অর্থে আনন্দ, আগত, আকর্ষণ, আবাস, আকাশ ইত্যাদি। অথবা স্ত্রী লিঙ্গ অর্থে 'আ' যুক্ত। সুতরাং সুষুম্নার অর্থ শুদ্ধচিত্ত বা সমাহিতচিত্তের আবাস, কেন্দ্র। অর্থাৎ বোধস্বরূপের মিলনভূমি। এ-ই আদ্যাশক্তি বা আত্মশক্তির কেন্দ্র। যোগের ভাষায় একে মধ্যম পথ বলে।

সুষুম্নার অধ্যাত্ম পরিচয়

সুষুম্নার দুই পাশে জ্ঞানশক্তি ও মনোশক্তি অর্থাৎ পরা ও অপরা শক্তির গতিপথ ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ি। সুষুম্না নাড়ির অন্তর্গত ষড়চক্রে অবস্থিত বোধসত্তার সঙ্গে ইড়া-পিঙ্গলা নাড়ির মাধ্যমে জ্ঞান ও মনের শক্তির মিলন ঘটে। অর্থাৎ বিদ্যা ও অবিদ্যাশক্তির মিলন ঘটে। তার ফলে, অনুভূতির প্রকাশ হয়।

১। অভিনব সংজ্ঞা।

জীবনের সর্বসাধনার সমন্বয়ই হল মধ্যম পথ—এ-ই হল আপনবোধে সব 'মেনে মানিয়ে চলা'

মধ্যম পথ ধরে সাধনা করাই সর্বোত্তম। মধ্যম পথের সাধনার অর্থ সংসারে থেকে অর্থাৎ দুর্গে থেকে যুদ্ধ করা। মধ্যম পথের সাধনার বিজ্ঞানে কর্ম-যোগ-জ্ঞান ও ভক্তির সমান সম্বন্ধ থাকে। একবোধে বা আপনবোধে গ্রহণ করে 'মেনে মানিয়ে চলাই' এর সাধনা। মানার অভ্যাসে অহংকার অভিমানের শোধন তাড়াতাড়ি হয়। মানিয়ে চলার অভ্যাসে শুদ্ধচিত্তের শুদ্ধবোধস্বরূপ পরমাত্মার সঙ্গে যোগাযোগ হয় ও তার অনুভূতি সুস্পষ্ট হয়।

আপনবোধে গ্রহণ করার সময় পূর্বসংস্কার অনুযায়ী বিরুদ্ধ অবস্থা, ঘটনা ও প্রতিকূলতার সঙ্গে মুখোমুখি যুক্ত হতে হয়। তার ফলে, অনেক সময় দুঃখকষ্ট অধিক মাত্রায় সহ্য করতে হয়। স্বেচ্ছায় দুঃখকষ্ট বরণ করার ফলে তপস্যার কাজ হয়ে যায়। তখন তপস্যার তেজে চিত্তের মল সহজেই পরিশোধিত হয়। বিনা তপস্যায় চিত্তশুদ্ধি হওয়া সম্ভবপর নয়।

সর্বোত্তম তপস্যাই হল আপনবোধে সব 'মেনে মানিয়ে চলা'

'মেনে মানিয়ে চলার' মাধ্যমে সর্বোত্তম তপোশক্তির অভিব্যক্তি সংসারে থেকেও হতে পারে। তপস্যার অনলে অজ্ঞান-মোহ ও ভোগাশক্তি জ্বলে পুড়ে যায় অর্থাৎ মনের চঞ্চলতা অস্থিরতারূপ বিকার শোধিত হয়ে বোধে রূপান্তরিত হয়।

আপনবোধ হয় চিত্তশুদ্ধি, তার মধ্যেই হয় চিদাত্মার স্ফূর্তি (প্রকাশ)

শান্তমন বা শুদ্ধচিত্তই হচ্ছে শুদ্ধবোধের লক্ষণ। এই শুদ্ধচিত্ত বা শান্তচিত্তই হচ্ছে হৃদয়ের পবিত্রতা। এ-ই ঈশ্বরের বা শুদ্ধবোধস্বরূপের আসন। ব্রহ্ম-আত্মা-ঈশ্বর-গুরু ও মাতা শুদ্ধচিত্তরূপ হৃদাসনে নিত্য অধিষ্ঠিত।

সমবোধ মানেই আপনবোধ, তার মাধ্যমেই হয় সর্বসাধনার সিদ্ধি ও সমাধান

গুরুবোধে গুরুসেবা হয়, লঘুবোধে গুরুর অবমাননা করা হয়। অপরের সুখে সুখী এবং অপরের দুঃখে দুঃখী হওয়া আপনবোধের লক্ষণ। আপনবোধের সম্প্রসারণে সমবোধের দৃষ্টি খোলে। সমদৃষ্টির সাধনে গুরুসেবা হয় এবং গুরুদক্ষিণা দেওয়া হয়। এই ভাবে গুরুদক্ষিণা দেওয়া হলে লঘুবোধের প্রভাব আর থাকে না।

সমবোধের পূর্ণ মাহাত্ম্য

সমবোধ এবং সদ্‌গুরু এক অর্থবোধক। সমবোধের চিন্তাই গুরুচিন্তা। সমবোধের স্মরণ-মনন-ধ্যান করাই গুরুকে স্মরণ-মনন-ধ্যান করা। সমবোধে ক্রিয়া অনুষ্ঠান করাই গুরুর সেবা।

গুরুচিন্তার মাধ্যমে সাধকের মনে গুরুশক্তিই কাজ করে। অর্থাৎ সমবোধের চিন্তার মাধ্যমে সাধকের মনে বোধের শক্তি ক্রিয়া করে। গুরুবোধে তথা সমবোধের সঙ্গে চিত্তের পরিপূর্ণ মিলন হয়ে গেলে সাধক সদ্‌গুরুতে পরিণত হয়। [২৭।৮।৬৮]

জীবনবিজ্ঞানের অপরিহার্য অঙ্গ হল ধর্ম ও কর্ম

জীবন নিয়েই সমাজ এবং সমাজ নিয়েই জীবন। সুতরাং ব্যক্তিগত জীবন ও সমাজজীবনের সঙ্গে ধর্মকর্মের নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে। ধর্মকর্মের মাধ্যমেই জীবনের গতি ঊর্ধ্বগামী ও নিম্নগামী হয়। ধার্মিক ও কর্মীর পরিচয় আচরণের দ্বারাই নির্ণীত হয়।

বস্তুত ধর্ম ও কর্মের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। প্রাণচৈতন্যের এক প্রকৃতিরই দ্বিবিধ প্রকাশ জীবনের অন্তর ও বাহির। অন্তর্প্রকৃতির স্বরূপই ধর্ম এবং বহির্প্রকৃতির স্বরূপ হল কর্ম। অন্তর হল কারণ, বাহির হল কার্য। আবার বাহির কারণ, অন্তর কার্য। সুতরাং অন্তর-বাইরের ভেদ যেমন স্বভাব প্রকাশের ভেদ, ধর্ম-কর্মের ভেদও সেইরূপ প্রকাশের প্রকারভেদ।

ধর্ম ও কর্মের আভ্যন্তরীণ বিজ্ঞান

বোধস্বরূপ আত্মাই মনের মাধ্যমে চিন্তা করে, মন আবার ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে কর্ম করে। অন্তরের চিন্তা অনুরূপ বাইরের কর্ম, আবার বাইরের কর্ম অনুরূপ অন্তরের চিন্তা। এ-ই হল ধর্মের কর্মময় রূপ এবং কর্মের ধর্মময় রূপ।

ধর্ম হল সূক্ষ্ম, কর্ম হল স্থূল। আবার কর্ম যেখানে সূক্ষ্ম তা-ই ধর্মের রূপ। এবং ধর্ম যেখানে স্থূল তা-ই কর্মের রূপ। সেইজন্য বলা হয় অন্তরের র্ধম অনুরূপ বাইরের ক্রিয়া অনুষ্ঠান এবং বাইরের ধর্ম অনুরূপ অন্তরের কর্মানুষ্ঠান বা চিন্তন-মনন-ধ্যান হয়। আবার অন্তরের চিন্তন-মনন অনুযায়ী বাইরের ধর্মানুষ্ঠান এবং বাইরের ধর্মানুষ্ঠান অনুযায়ী অন্তরের চিন্তন-মনন-ধ্যান ইত্যাদি সাধিত হয়।

গুণভেদে ধর্ম-কর্মের আচরণ ও ফলের তারতম্য

ত্রিগুণাপ্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ ভেদে ধর্মকর্ম তথা ধার্মিক ও কর্মীর আচরণে তারতম্য হয়। সত্ত্বগুণের প্রাধান্যে নিষ্কাম ধর্ম ও কর্মানুষ্ঠান হয়। তার ফলে, সাত্ত্বিক, ধার্মিক ও কর্মী অনাসক্ত, নির্দ্বন্দ্ব ও শান্ত স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। অপর পক্ষে তামসিক ও রাজসিক ভাবের ধর্মকর্ম অনুষ্ঠানের দ্বারা সকাম ধার্মিক ও কর্মী মোহ, আসক্তি ও বিকারগ্রস্ত হয়।

কর্তৃত্বাভিমানী ধার্মিক ও কর্মীর স্বার্থলোভ ও ফলাসক্তি অধিক থাকে। সেইজন্য তারা সুখের আশায় দুঃখের মধ্যেই বাস করে। কিন্তু সত্ত্বগুণী নিষ্কাম ধার্মিক ও কর্মীর চিত্ত শুদ্ধ থাকার ফলে কর্তৃত্বাভিমান ও কর্মফলে তাকে বদ্ধ হতে হয় না। পূর্ণ আত্মসমর্পণযোগে ব্রহ্মবোধে তথা সমবোধে, একাত্মবোধে বা ঈশ্বরবোধে কর্ম করে সে জীবন্মুক্ত হয়।

সকাম ও নিষ্কাম ধর্ম-কর্মের ফলভেদ

সকাম ধার্মিক ও কর্মীর কর্মফলে বন্ধন হয়। দ্বৈতবোধে অশুদ্ধচিত্তে সকাম কর্ম হয় এবং অদ্বৈতবোধে শুদ্ধচিত্তে নিষ্কাম কর্ম হয়। দ্বৈতবোধে কর্মানুষ্ঠানের সফলতার মাধ্যমে অদ্বৈতবোধের কর্মানুষ্ঠানের যোগ্যতা তৈরি হয়।

ধর্ম ও কর্মের তত্ত্বার্থ

ধর্ম ও কর্মের সহজ অর্থ—ধর্ম = 'ধৃ' বা 'ধ'তে রহ মন। অথবা 'ধৃ' বা 'ধ'তে রমন। ধৃ হল ধৈর্য, ধারণা, ধৃতি। তাতে মন যুক্ত রাখা বা তৎপ্রীতিই হল ধর্ম[১]।

কর্ম = 'ক' তে রহ মন অথবা 'ক' তে রমণ। 'ক' অর্থে অখণ্ড চিদাকাশ, অখণ্ড সুখ, সগুণ ঈশ্বর, হিরণ্যগর্ভ, নারায়ণ অথবা আদ্যাশক্তি মহাপ্রাণচৈতন্য, কালী ও কৃষ্ণ। তাতে মন যুক্ত রাখা এবং তৎপ্রীতিই হচ্ছে কর্ম[২]।

সহজ ভাবে র্ধম ও কর্মের অর্থ যথাক্রমে—ধর্ম হল ধর মা অথবা মাধব অথবা মহেশ অথবা মহৎ। রুচি ও ভাব অনুযায়ী যে-কোন নামের বা সর্বনামেরই ব্যবহার হতে পারে।

১। অভিনব সংজ্ঞা। ২। অভিনব সংজ্ঞা।

কর্ম অর্থ সেইরূপ—কর মা অথবা মাধব অথবা মহেশ অথবা মহৎ।

ধর্ম ও ধার্মিক, কর্ম ও কর্মীর আধ্যাত্মিক পরিচয়

মনের দ্বারা বোধের ধারণা ও ব্যবহারকেই যথার্থ ধর্ম বলে। এবং যার মন বোধের সেবা করে অর্থাৎ শুদ্ধবোধের দ্বারা সবকিছু ব্যবহার করে সে-ই যথার্থ ধার্মিক। সমবোধের সেবায় সর্বেন্দ্রিয় যুক্ত রাখাই হচ্ছে কর্ম এবং যার সর্বেন্দ্রিয় সমবোধের সেবায় নিত্যযুক্ত সে-ই যথার্থ নিষ্কাম কর্মী।

অধর্ম ও অকর্মের পরিচয়

ধর্মের অপূর্ণ অবস্থাকেই অধর্ম এবং ধর্মশূণ্য কর্মের বিকৃত রূপকেই অকর্ম বলা চলে।

যথার্থ ধর্মের পরিচয়

ধর্ম ও অধর্মরূপ দ্বৈতবোধের একান্ত অভাবই যথার্থ ধর্ম। যথার্থ ধার্মিকের ধর্মাধর্মরূপ দ্বৈতবোধ থাকে না। সেই রকম কর্ম ও অকর্মরূপ দ্বৈতবোধের একান্ত অভাবেই যথার্থ কর্ম বা নিষ্কাম কর্ম হয়। যথার্থ নিষ্কাম কর্মীর কর্ম ও অকর্মরূপ দ্বৈতবোধ থাকে না।

মুক্তি ও নির্দ্বন্দ্ব অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য আপনবোধে সব 'মেনে মানিয়ে চলাই' হল সহজতম উপায়

ধর্ম-অধর্মে এবং কর্ম-অকর্মে সমবোধই শুদ্ধচিত্তের লক্ষণ। শুদ্ধচিত্তেই ঈশ্বরের অনুভূতি বা আত্মানুভূতি লাভ হয়। ধর্ম ও অধর্ম, কর্ম ও অকর্ম সর্বভাবকেই মা, মাধব ইত্যাদি বোধে সমর্পণ করতে হয়। অর্থাৎ সমবোধে গ্রহণ করে 'মেনে মানিয়ে চলতে' হয়। তাহলেই ভালমন্দ প্রভৃতি দ্বন্দ্বের বিকার ও বন্ধন হতে চিত্তকে মুক্ত রাখা যায়। তা না-হলে জীবিত অবস্থায় দুঃখকষ্ট প্রভৃতি দ্বন্দ্ব-বিরোধ কাটে না।

ধর্মকর্ম হল জীবনবিজ্ঞানের অপরিহার্য অঙ্গ

ধর্মকর্ম জীবনের সাথী। কর্ম ছাড়া ধর্ম এবং ধর্ম ছাড়া কর্ম হয় না। ধর্মকর্ম কতগুলি অনুষ্ঠানমাত্র নয়। সমগ্র জীবন এর সঙ্গে যুক্ত। সুতরাং জীবনব্যাপী এর সাধনা চলতে থাকে। সবকিছুকে মাতৃবোধে ধারণা করা এবং তদ্‌বোধে ব্যবহার দ্বারাই যথার্থ ধর্ম এবং কর্ম অনুষ্ঠান হয়।

কাম-কর্ম-কর্তৃত্ব জীবনের বিলাস, জীবনবন্ধনের কারণ—পূর্ণ সমর্পণের মাধ্যমে অমৃতময় দীব্যজীবন লাভ হয়

কর্তৃত্ববোধে ফলাকাঙ্ক্ষা নিয়ে কাজ করে কেউ যথার্থ ধার্মিক ও নিষ্কাম কর্মী হতে পারে না। সর্ববিধ কামনা-বাসনা ও কর্মের ফল ঈশ্বরে সমর্পিত হলে মানুষ দিব্যজীবন লাভ করে। তারপরে কর্তৃত্বাভিমানকেও পূর্ণ ভাবে সমর্পণ করে ঈশ্বরীয় স্বভাবপ্রকৃতি প্রাপ্ত হয়।

সাধনার মাধ্যমে ক্রমপর্যায়ে কাম-কর্ম-কর্তৃত্বের পরিশোধন হয়, তার ফলে জীবনের দিব্যরূপায়ণ হয়

সাধনার মাধ্যমে প্রথমে কামনা-বাসনার শোধন হয়, দ্বিতীয় স্তরে কর্মফলে অনাসক্তি আসে এবং পরিশেষে কর্তৃত্ববোধের অবসান ঘটে। কর্তৃত্ববোধ থাকা পর্যন্ত সাধক মুক্তির আস্বাদন পায় না। তার ভোগের সংস্কার থেকে যায়।

শুভাশুভ দ্বিবিধ সংস্কার অনুসারে সংসারজীবন তৈরি হয়; আত্মবিচার ও আত্মসমর্পণের মাধ্যমে সর্বসংস্কারশূন্য হলে জীবন্মুক্তি

সংস্কারের বীজ চিত্তের গভীরে লুকিয়ে থাকে। তার বহু শাখাপ্রশাখা সূক্ষ্মাকারে চিত্তের গভীরে লুকিয়ে থেকে প্রকাশের অপেক্ষা করে। সুযোগ পেলেই তারা বিকাররূপে আত্মপ্রকাশ করে। শুভসংস্কারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অশুভসংস্কারের বৃত্তিগুলি অনেক সময় অভিব্যক্ত হয়। আবার পৃথক পৃথক ভাবেও তারা আত্মপ্রকাশ করে।

শুভচিন্তা ও তদনুরূপ কর্মের দ্বারা শুভসংস্কার তৈরি হয়। এবং অশুভচিন্তা ও তদনুরূপ কর্মের দ্বারা অশুভসংস্কার তৈরি হয়। শুভাশুভ সংস্কারের মিশ্রণ দ্বারাই অধিকাংশ জীবন তৈরি। তার মধ্যে কারও জীবনে শুভসংস্কারের প্রাধান্য বেশি এবং কারও জীবনে অশুভসংস্কারের প্রাধান্য বেশি। শুধু শুভসংস্কার দ্বারা তৈরি জীবন খুব কমই দেখা যায়।

আত্মবিস্মৃতির ফলে শুভাশুভ সংস্কার গড়ে ওঠে, তীব্র ব্যাকুলতা ও ইষ্ট-গুরুর কৃপায় আত্মস্মৃতি জেগে ওঠে, সর্বসংস্কার পালায়

শুদ্ধ সোনার সঙ্গে খাদ না-মিশালে যেমন অলঙ্কার তৈরি হয় না, সেইরূপ শুভসংস্কারের সঙ্গে অশুভ সংস্কারের মিশ্রণ না-হলেও জীবন তৈরি হয় না। শুভসংস্কারের মাধ্যমে সাধনভজন করে সিদ্ধি লাভ করলেও অশুভসংস্কারকে পরিপূর্ণ ভাবে নির্মূল করা যায় না। দেহ ধারণ করলে আত্মাকে দেহের সুখদুঃখের সঙ্গে কিছুটা জড়িয়ে পড়তে হয় এবং সংসারের মলিনতার সঙ্গেও যুক্ত থাকতে হয়।

শুদ্ধ-মুক্ত আত্মা স্বভাবপ্রকৃতি যোগে আত্মবিস্মৃত হয়ে অহংকার বশে নিজেকে কর্তা-ভোক্তা-জ্ঞাতা বলে অনুভব করে—এ-ই তার জীবদশা প্রাপ্তি; আত্মার জীবদশা হচ্ছে আত্মার স্বপ্নবিলাস

আত্মা নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত হয়েও বিকারশীল এবং নশ্বরদেহের সঙ্গে যুক্ত থাকার ফলে অহংকারের বশে মনের মাধ্যমে দেহের সুখদুঃখের বিকার অনুভব করে। জীবনরূপে আত্মা স্বয়ং চিন্তা ও কর্মের মাধ্যমে শুভাশুভ সংস্কার তৈরি করে তার ফল ভোগ করে। দেহেতে বাস করে দেহের ধর্মের সঙ্গে বিরোধ করে চলা যায় না।

সমবোধই আত্মবোধ—আত্মবোধে কোন বিকার থাকে না

দেহ-ইন্দ্রিয়-অহংকার-মন-বুদ্ধি বোধস্বরূপ আত্মারই বোধের স্পন্দিত অভিব্যক্তি মাত্র। সুতরাং বোধস্বরূপ আত্মা সর্বপ্রকাশে সমভাবে যুক্ত। এইরূপ সমবোধে দেহেন্দ্রিয় মনের বিকার অনুভূত হয় না।

দ্বৈতবোধে হয় বোধ, অদ্বৈতবোধে হয় তার নাশ

দ্বৈতবোধে কর্তৃত্বাভিমান থাকার জন্য বোধের বিকার অনুভূত হয়। পূর্বজন্মের দ্বৈত সংস্কারের বিকারের ফল বর্তমান জীবনেও মানুষকে ভোগ করতে হয়। সুতরাং অদ্বৈতবোধে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য সকলের চেষ্টা করা উচিত। অদ্বয়বোধস্বরূপে পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্ব পর্যন্ত দ্বৈতবোধের বিকারজনিত সংস্কারের ফল যথাসম্ভব চেষ্টার মাধ্যমে শোধন করতে হয় এবং অশোধিত অংশ ভোগ করে শেষ করতে হয়।

বোধস্বরূপ ঈশ্বর আত্মা তাঁর স্বভাবলীলায় যুক্ত থেকেও অবিকারী ও অপরিণামী

শুদ্ধ বোধস্বরূপ ঈশ্বর বা আত্মা সৎ-অসৎ তথা জ্ঞান-অজ্ঞানরূপ স্বভাববোধে লীলা করে। বৈচিত্র্যময় সংসারে

সর্বপ্রকাশের মধ্যে কেন্দ্রসত্তারূপে বোধস্বরূপ ঈশ্বর স্বয়ং বিদ্যমান। তিনি বিকারের মধ্যে এবং পরিণামের মধ্যে থেকেও নিত্যনির্বিকার ও অপরিণামী।

অদ্বয়বোধে (আপনবোধে) সংসার হয় সমসার

কেবলমাত্র অদ্বৈতবোধেই বৈচিত্র্যময় সংসারে বিকারধর্মী নশ্বর দেহে নিত্য নির্বিকার থাকা যায়। সর্ব রূপ-নাম-ভাবে বোধস্বরূপ ঈশ্বরই বর্তমান। ঈশ্বরীয় বোধেই অর্থাৎ শুদ্ধ একবোধে সংসারের যথার্থ পরিচয় মেলে।

অখণ্ড শুদ্ধবোধস্বরূপ ঈশ্বর-আত্মা মনের মাধ্যমে স্বভাবলীলা আস্বাদন করেন

'আমার বোধের' মাধ্যমে অর্থাৎ মনের মাধ্যমে অখণ্ড বোধস্বরূপ আত্মা বা ঈশ্বর নিজেকে বহুভাবে প্রকাশ করে সর্বপ্রকাশে কেন্দ্রসত্তারূপে অবস্থান করে স্বমহিমা আস্বাদন করে। তাঁর বিশ্বলীলার এ-ই মর্মার্থ। ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির সর্ববিধ ক্রিয়ার মধ্যে এক বোধস্বরূপ ঈশ্বরেরই স্বভাবমহিমা ব্যক্ত হয়।

সমবোধ হল একবোধ বা অদ্বয়বোধ, অদ্বয়বোধে সবকিছু দর্শনই হল ঈশ্বরাত্ম ব্রহ্ম দর্শন

বৈচিত্র্যময় সর্বপ্রকাশের মধ্যে একবোধের দর্শনই হচ্ছে ঈশ্বরদর্শন। এই একবোধ বা সমবোধের দৃষ্টি না-জাগলে জীবন তৃপ্ত ও মুক্ত হয় না। শিব-রাম-কৃষ্ণ-হরি-গুরু-মাতা-দুর্গা-কালী ইত্যাদি সকলেই অখণ্ড বোধস্বরূপ ঈশ্বরের মূর্ত রূপ। সর্ব রূপ-নাম-ভাব-বোধের সঙ্গে এদের সমান সম্বন্ধ।

অখণ্ড একবোধে অর্থাৎ সমবোধে এক সত্য, এক ধর্ম, এক কর্তা, এক বিজ্ঞাতা, এক দ্রষ্টা ও সাক্ষীচেতার পরিচয় মেলে।

মনের বোধ ও বোধের মনের তাৎপর্য

মনের বোধে রূপ ও নামের ভেদ বিকার সৃষ্টি করে। কিন্তু বোধের মনে রূপ ও নামের ভেদদৃষ্টি থাকে না। বোধের বোধে শুধু বোধ ছাড়া আর কিছু অনুভূত হয় না। কারণ বোধের স্বরূপ সমধর্মী। সমধর্মী না-হলে কোন অনুভূতি হয় না।

অখণ্ড ভূমা আমির বক্ষে তার নিরন্তর প্রকাশই হল তার লীলাভিনয়, অনন্ত বিশ্ব তারই পরিচয়

নিত্য-শাশ্বত-অমৃতময়-অদ্বয়-অব্যয়-অখণ্ড এক ভূমা আমির বক্ষে তার ছোট্ট একটা ইচ্ছা তারই অংশবিশেষে অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রূপ প্রকাশ করে তার মধ্যে অনন্ত জীবদেহে 'আমিবোধে' খেলে চলেছে। তারই অংশবিশেষ আবার বিশ্বরূপে অভিব্যক্ত।

অখণ্ড আমির বক্ষে অখণ্ড আমির লীলায় খণ্ড আমির কোনও সত্তা নেই

বোধস্বরূপ অখণ্ড আমির ক্ষুদ্রতম ইচ্ছার লীলাবিলাস নানা ভাবে সসীম ও অসীমে সৃষ্টি-স্থিতি ও সংহারের মাধ্যমে নিজের সগুণ ও নির্গুণ স্বভাবমহিমার অতি সামান্য অংশই ব্যক্ত করছে। বাকি পুরো অংশ জীবরূপী আমির বোধে ধরা পড়ে না।

মনের বোধে দ্বৈত এবং বোধের মনে অদ্বৈত

শুদ্ধবোধের স্বরূপে সর্ববিধ দ্বৈত ভাবের অভাব। সেখানে মোহ, দ্বন্দ্ব, কলহ, বিবাদ নেই। মনের বোধে তথা আমার বোধে মত ও পথের দ্বন্দ্ব। মনের বোধই দ্বৈত এবং বোধের মন অদ্বৈত। কিন্তু বোধের বোধে দ্বৈতও নয়, অদ্বৈতও নয়, দ্বৈতাদ্বৈতও নয়। এ বোধস্বরূপ মাত্র। একেই পরমতত্ত্ব বলে। এরই প্রকাশে সব প্রকাশমান। এরই সত্তায় সব সত্তাবান। এর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। এ স্বয়ংপূর্ণ স্বয়ংপ্রকাশ।

মনের বোধের বিজ্ঞান রহস্য

অন্তরের একবোধের স্পন্দনসমষ্টি মন রূপে প্রকাশ পায়। মনের বোধের স্পন্দনগুলিকেই চিন্তা বলে। চিন্তার মাধ্যমে মন বাইরে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে। শুদ্ধবোধস্বরূপ অখণ্ডের আমি অন্তর্বোধের স্পন্দনগুলিকে বৈচিত্র্যের মাধ্যমে স্বভাবপ্রীতির সূত্রে বেঁধে বিশ্বরূপে স্বমহিমার স্বরূপ ব্যক্ত করছেন।

পরমাত্মার স্বভাবলীলায় স্ববোধেরই মহিমা প্রকাশ পায়

সোনার দোকানে স্বর্ণকার যেমন এক সোনা দিয়ে নানাবিধ অলঙ্কার তৈরি করে, সেইরূপ অখণ্ড বোধসাগরের বক্ষে বোধস্বরূপ আত্মা বা ঈশ্বর স্ববোধে বোধের বহুপ্রকাশ সৃষ্টি করে বিশ্বরূপে নিজের মহিমা ব্যক্ত করেন।

'বোধসাগরে বোধেরই লাগিয়া খেলে বোধ জীবনরূপ ধরিয়া'

বোধের স্পন্দনমাত্রই বোধের বৃত্তি। বোধের বৃত্তি দিয়েই বোধের ব্যবহার হয়। বোধের ব্যবহারের পূর্বাপর অবস্থা ধরে বোধের তারতম্য বোধই নির্ণয় করে। স্বপ্রকাশধর্মী বোধ বোধের বৃত্তি দ্বারাই বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে বোধের খেলা করে। এই বোধের খেলাতে বোধের দ্বিবিধ অভিব্যক্তি দুই পক্ষ হয়ে দ্বৈতবোধে অদ্বয়বোধস্বরূপের স্বমহিমা ঘোষণা করে।

বোধের বক্ষে বোধের লীলায় বোধই স্বপক্ষ ও বিপক্ষ আবার বোধই স্বয়ং নিরপেক্ষ

একবোধের দুই পক্ষ সদসৎ, ভাল-মন্দ, জ্ঞান-অজ্ঞানরূপে বোধের বক্ষে খেলা করে। জ্ঞান ও অজ্ঞান একবোধেরই দুই নাম। বোধের খেলাতে বোধই বিজ্ঞাতা, বোধই সক্রিয়, বোধই কর্মফল। স্বপক্ষে ও বিপক্ষে একবোধের দ্বিবিধ গতির পরিণাম বোধস্বরূপেই মিশে যায়।

লীলায়িত বোধে কেন্দ্রসত্তা ঈশ্বর, অন্তরসত্তা জীব এবং বহিঃসত্তা জড়জগৎ

বোধের খেলায় বোধের প্রকাশে বোধের পূর্বাপর সম্বন্ধ ধরে বোধের কেন্দ্র, অন্তর ও বাহির এই ত্রিবিধ বোধের অভিব্যক্তি হয়। এই ত্রিবিধ বোধের অভিব্যক্তির নাম ঈশ্বর, জীব ও জড়জগৎ। এক বোধস্বরূপেরই তিনটি স্তর। জড় হচ্ছে দেহ, জীব হচ্ছে দেহের অন্তরে প্রাণচৈতন্য এবং ঈশ্বর হচ্ছেন প্রাণচৈতন্যের কেন্দ্রসত্তা। এই হচ্ছে বোধস্বরূপের ত্রিবিধ স্তর।

মর্ম, ধর্ম ও কর্মের তাৎপর্য

সমস্ত শাস্ত্রের সার কথা এক অখণ্ড বোধস্বরূপের স্বরূপমহিমার গাথা। অর্থাৎ কেন্দ্রে একবোধের

সারমর্ম[১], অন্তরে দ্বৈত ভাব বোধের ধর্ম[২] এবং বাইরে বোধের আভাসে কর্ম[৩]। জ্ঞানীর কাছে বোধের স্বরূপ জ্ঞান, যোগীর কাছে বোধের স্বরূপ শক্তি ও নিষ্কাম কর্মীর কাছে বোধের স্বরূপ গতিরূপে অনুভূত হয়।

উপনিষদ্ শব্দের মর্মার্থ

উপনিষদের অর্থ—বোধস্বরূপ আত্মার সমীপে অর্থাৎ কেন্দ্রবোধসত্তা, পাশে অন্তর ও বহির্বোধসত্তার অবস্থান। অর্থাৎ ঈশ্বরের সঙ্গে জীব ও জড়ের সমান সম্বন্ধ।

শ্রীগীতার মর্মার্থ

গীতার অর্থ—জীবনের কেন্দ্রসত্তা অর্থাৎ হৃদয়বোধের স্বমহিমার অবাধিত অবিমিশ্র ভাবে স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি।

শ্রীচণ্ডীর মর্মার্থ

চণ্ডীর অর্থ—বোধস্বরূপের বক্ষে কেন্দ্র ও অন্তরবোধসত্তার বৈচিত্র্যময় অভিব্যক্তির লীলাভিনয়ে স্বপক্ষে ও বিপক্ষে বোধের স্বভাবমহিমার অভিব্যক্তি।

বোধ, প্রাণ ও মনের বৈশিষ্ট্য

বোধের স্বরূপকে স্ববোধের মাধ্যমে বোধই শুধু জানে। প্রাণের স্বরূপকে প্রাণের মাধ্যমে প্রাণই শুধু জানে। মনের স্বরূপকে মন নিজে জানে না। বোধের সাহায্যে মন নিজের পরিচয় জানতে পারে।

বোধের কথা বোধই বলে, বোধই শোনে। বোধের স্বরূপকে বোধই দেখে, বোধই জানে। বোধের প্রীতি বোধের মধ্যে স্থিতি। মনের প্রীতি দেহের মধ্যে বা জড়ের মধ্যে মনের স্থিতি। মনের প্রীতি বিকারের প্রতি আসক্তি। কিন্তু বোধের প্রীতি নির্বিকার স্বরূপসত্তায় নিত্যস্থিতি।

অখণ্ড ভূমার আমি সর্বাধিষ্ঠান—অদ্বয় অব্যয় নিত্য সমান

অখণ্ড বোধের আমি অন্তরে, বাইরে ও তদূর্ধ্বে সমান ভাবে বিদ্যমান। অর্থাৎ ঈশ্বরে, জীবে, জড়তে এবং সবার ঊর্ধ্বে। [২৮।৮।৬৮]

ঈশ্বর-আত্মা-ভগবান এক অখণ্ড সত্যমূর্তি; তাঁর উপলব্ধির জন্য সকল মতপথই সমান সত্য ও গুরুত্বপূর্ণ

এক ঈশ্বরের অনুভূতির জন্য বহু মত ও পথ আছে। ভিন্ন ভিন্ন মতবাদের মাধ্যমে এক ঈশ্বরই অনুভূত হয়। সব মতবাদই সমান সত্য এবং ঈশ্বর উপলব্ধির সহায়ক। নিত্য অখণ্ড পূর্ণ সত্যের মধ্যে তার সর্ববিধ মত, পথ ও ব্যবহারও সত্য।

বৈচিত্র্যময় বিশ্বরূপে প্রতিভাত সত্য নিত্যলীলাময় এক ঈশ্বরেরই পরিচয়

সৃষ্টির প্রতিটি প্রকাশরূপে ঈশ্বরই স্বয়ং অভিব্যক্ত এবং ঈশ্বরীয় বোধে সবকিছু ব্যবহার করলে অর্থাৎ গ্রহণ করে 'মেনে মানিয়ে চললে' অখণ্ড ঈশ্বরীয় বোধের সঙ্গে নিত্য যুক্ত থাকা যায়। এটা ঈশ্বরানুভূতির সহজ উপায়

১। অভিনব সংজ্ঞা। ২। অভিনব সংজ্ঞা। ৩। অভিনব সংজ্ঞা।

বা সাধনা। এই মত অনুযায়ী বিশ্বজগতের সবকিছু নিয়েই ঈশ্বরের সত্য পরিচয়। কারণ ঈশ্বরের বাইরে কোনকিছুর অস্তিত্ব ও প্রকাশ সম্ভবপর নয়।

সর্বসত্যময় ঈশ্বরের মহিমাও সত্যপূর্ণ

ঈশ্বর অনন্ত শক্তি-জ্ঞান-আনন্দ-প্রেমস্বরূপ। তিনি স্বয়ংপূর্ণ, স্বয়ংপ্রকাশ। তাঁর নিজের প্রাপ্তব্য ও অপ্রাপ্তব্য, দ্রষ্টব্য ও অদ্রষ্টব্য, জ্ঞাতব্য ও অজ্ঞাতব্য কিছুই নেই। তথাপি তিনি স্বয়ংপূর্ণ হয়েও নিত্যলীলাময়। এই নিত্যলীলা হল তাঁর নিজের সঙ্গে নিজের খেলা। সুতরাং তিনি জগদাতীতরূপেও সত্য, জগৎকর্তারূপেও সত্য আবার জগৎরূপেও সত্য।

ঈশ্বরের নিত্যলীলায় স্বয়ংই বেত্তা, বেদ ও বেদন

তাঁর স্বভাবে একঘেয়েমির অবকাশ নেই। স্বভাব আনন্দের আতিশয্যে নিজেই জীবনরূপ ধারণ করেন। জীবনের মাধ্যমে নিত্য নূতন ভাবে স্বমহিমায় বৈচিত্র্যময় প্রকাশসকল ব্যক্ত করে নিজেকে নিজেই আস্বাদন করেন। এই তাঁর নিত্যলীলার তাৎপর্য।

প্রতি জীবনই হল সচ্চিদানন্দ ভগবানের লীলামাধ্যম—তার মধ্যে হয় তাঁর পূর্ণ লীলাবিলাস

প্রত্যেক জীবনের মধ্যে অখণ্ড পূর্ণ সচ্চিদানন্দঘন ভগবান স্বমহিমায় নিজেই লীলাভিনয় করে চলেছেন। জীবনের বন্ধন ও মুক্তি ঈশ্বরের এই স্বভাবলীলার অংশমাত্র। এই জীবনলীলায় স্বভাব আনন্দ আস্বাদন করতে করতে তিনি কোন এক সময়ে স্ব-স্বরূপে স্থিত হয়ে শান্ত হয়ে যান। সর্বজীবনের এক কারণ, এক তত্ত্ব, এক রহস্য এবং একই পরিণতি। জীবনদর্শনের এই সত্য পরিচয় অবগত হলে দুঃখ-কষ্ট, চিন্তা-ভাবনা, জন্ম-মৃত্যুর ভীতি দ্বারা মানুষ আর প্রপীড়িত হয় না।

পূর্ণ সত্য ঈশ্বরাত্ম বিজ্ঞান, অপূর্ণ সত্য হচ্ছে আপেক্ষিক বিজ্ঞান ও বস্তু বিজ্ঞান

বর্তমানের শিক্ষাপদ্ধতি শুধু জড়বস্তুকে অবলম্বন করে এগিয়ে চলছে। জীবনবেদের অনুশীলন সেই অনুপাতে প্রসারতা লাভ করে নাই। জড় বিজ্ঞানের মাধ্যমে পৃথক পৃথক ভাবে প্রকৃতির অন্তর্নিহিত শক্তির সন্ধান চলছে। তার ফলে আপেক্ষিক সত্যের পরিচয় সম্বন্ধে অনেকেই পরিচিত হয়েছে, কিন্তু সবকিছুর অন্তর্নিহিত, বহির্ভূত ও অতীত যে অদ্বয়তত্ত্ব অখণ্ড সত্য নিত্য বিদ্যমান সেদিকে সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়নি। এই অখণ্ড সত্যই হচ্ছে ঈশ্বর স্বয়ং। এই ঈশ্বরের পূর্ণ পরিচয় অবগত না-হলে শুধুমাত্র আপেক্ষিক সত্য দ্বারা মানবজাতির চরম কল্যাণ সাধিত হতে পারে না।

ধর্মশাস্ত্রের দুটি অংশ—একটি হল বস্তুতান্ত্রিক, অপরটি হল স্বানুভূতিভিত্তিক

যে-সকল শাস্ত্রীয় বিধান ও অনুশাসনের দ্বারা পূজাপার্বনের ক্রিয়াকলাপ ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলি সম্পাদনের প্রথা প্রাচীনকাল হতে প্রচলতি হয়ে আসছে তার মধ্যে প্রকৃতির অন্তর্নিহিত বস্তুসামগ্রীর সঙ্গে এবং পরস্পর সর্বজীবনের সঙ্গে যে-অভেদ সম্বন্ধ সমসূত্রে গাঁথা আছে তার পরিচয় পাওয়া যায়।

বৈচিত্র্যের মধ্যে নিত্য এককে এবং বিকারের মধ্যে নির্বিকারকে জানা ও মানাই হল সত্য ঈশ্বরাত্মদর্শন

অন্তরে ও বাইরে পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের এক অবিচ্ছেদ্য সত্য সম্বন্ধ নিত্য বিদ্যমান। এই বোধে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার নামই ঈশ্বর দর্শন। অর্থাৎ অন্তরে ও বাইরে সর্বপ্রকাশের মধ্যে একবোধ বা সমবোধের অনুভূতিকেই আত্মোপলব্ধি বা ঈশ্বরোপলব্ধি বলে।

অখণ্ড একাত্মানুভূতিকেই ব্রহ্ম-আত্মা-ঈশ্বর-সত্যদর্শন বলা হয়। এরই অপর নাম পরমতত্ত্ব বা অদ্বয়তত্ত্ব। অখণ্ডবোধে যাঁরা পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হন তাঁদের তত্ত্বজ্ঞ, ব্রহ্মজ্ঞ, আত্মজ্ঞ প্রভৃতি বলা হয়। তাঁরাই মুক্তপুরুষ। তাঁদের সঙ্গ করলে এবং তাঁদের অনুশাসন মেনে চললে অপরের মধ্যেও এই বোধ জাগ্রত হয়।

শরণাগত ভক্তের সঙ্গে তত্ত্বজ্ঞ গুরুর অভিন্ন সম্বন্ধ স্বানুভূতির বিষয়

মুক্তপুরুষের সঙ্গে যথার্থ সত্যান্বেষী আত্মজিজ্ঞাসুদের মধুর সম্বন্ধ থাকলে গুরুশিষ্যের সম্পর্ক তৈরি হয়। গুরুশিষ্যের এই মধুর সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য এবং চিরস্থায়ী। শিষ্য যথার্থ আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হলে তত্ত্বজ্ঞ গুরুর মধ্যে লয় হয়ে যায়।

তামসিক, রাজসিক ও সাত্ত্বিক প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ব্যবহার

বোধস্বরূপে তামসিক জড়তার প্রভাব থাকে না। সর্ববিধ তামসিক জড়তার প্রভাব, জড়ত্বের কঠিন আবরণ এবং রাজসিকতার বিক্ষেপ প্রভৃতি দ্বারা জীবদেহ গঠিত এবং তা বহির্প্রকৃতির অঙ্গ। অন্তর্প্রকৃতি সত্ত্বপ্রধান এবং সমধর্মী।

তমঃ-এর লক্ষণ কঠিন আবরণ, আঘাতের মাধ্যমে হয় তার সম্প্রসারণ—সত্যের প্রভাবে হয় তার বিকারের শোধন, শুদ্ধসত্ত্বে মুক্তি আস্বাদন

জড়ত্বের কঠিন আবরণরূপ বন্ধন মোচনের জন্য আঘাতের প্রয়োজন হয়। প্রকৃতি এই আঘাতের আয়োজন করে নানাবিধ ঘটনার মাধ্যমে। সর্ববিধ পরিবর্তন বহির্প্রকৃতির অন্তর্গত। ধ্বংসের মাধ্যমে বহির্প্রকৃতির সবকিছু রূপান্তরিত হয়। তামসিকতা ও জড়ত্বের আবরণকে অপসারণের জন্য বৃহত্তর প্রয়োজনে বৃহদাকারে ধ্বংসাত্মক ঘটনা ঘটে। বহির্প্রকৃতির মধ্যে বৃহদাকারে ধ্বংসের ফলে বহুসংখ্যক জীবনের দেহনাশ হয়।

শুভাশুভ সংস্কারের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ব্যবহার

মনুষ্যজীবন অতি দুর্লভ জীবন। মনুষ্যজীবনেই আত্মজ্ঞান লাভের বা ঈশ্বর উপলব্ধির সর্বোত্তম সুযোগ পাওয়া যায়। শুভ ও অশুভ সংস্কারের মিশ্রণে মানুষের দেহ তৈরি হয়। অশুভ সংস্কারের জীবনে বহির্প্রকৃতির বা নিম্ন প্রকৃতির প্রভাব অধিক থাকে। তারাই বারবার ধ্বংসের মধ্যে পতিত হয়। কিন্তু শুভ সংস্কার পূর্ণ জীবনে অন্তর্প্রকৃতির প্রভাব অধিক থাকে। তারা ধ্বংসাত্মক বহির্প্রকৃতির প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে পারে।

অশুভ সংস্কারের প্রভাবে তৈরি দেহের বিনাশে জীবনকে প্রকৃতির মধ্যে বিদেহ অবস্থায় দীর্ঘকাল থাকতে হয়। যতদিন পর্য্যন্ত স্থূলদেহ ধারণের সুযোগ না পায় ততদিন তাকে সেই অবস্থায় অপেক্ষা করতে হয়। শুভ সংস্কারের প্রভাবে তৈরি দেহের বিনাশে উন্নততর জীবনলাভের সুযোগ পেতে বিলম্ব হয় না।

অমৃত সত্তাই সবার সত্য পরিচয়

প্রত্যেকের জীবনসত্তা অমৃতময়। দেহের ধর্ম বিকারশীল ও পরিবর্তনশীল। দেহের মৃত্যু হয়, দেহীর মৃত্যু নেই। এই দেহীর পরিচয় পূর্ণ ভাবে অবগত হলে জীবন অমৃতত্ব লাভ করে অর্থাৎ মুক্ত হয়। এই অমৃতত্বকেই ঈশ্বরতত্ত্ব বলা হয়। সর্ববিধ বিকারের মধ্যে প্রত্যেকের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত চৈতন্যসত্তা অর্থাৎ ঈশ্বর, আত্মাকে স্মরণে রেখে জীবনযাপন করলে দেহের বিকারে ও বিনাশে জীবন বিব্রত হয় না।

ঈশ্বরীয় মহিমাকীর্তনের মাধ্যমেই ঈশ্বরের স্মৃতি জাগ্রত হয়

ঈশ্বরের স্বরূপ স্মরণে রাখার জন্য ঈশ্বরের মহিমা শ্রবণ প্রথমে দরকার হয়। তা না-হলে ঈশ্বরীয় বোধের স্মৃতি জীবনে জাগ্রত করা খুবই কঠিন। ঈশ্বরীয় মহিমা শ্রবণের ফলে, তা মননের সুবিধা হয়। শ্রবণ অনুরূপ মনন হলে অন্তরে একটা নূতন তাপের সৃষ্টি হয় এবং অন্তর্শক্তির জাগরণ হয়, যার দ্বারা বাইরের ধ্বংস বা বিকার থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

তপস্যার সত্য তাৎপর্য

অন্তরে ঈশ্বরীয় মননের ফলে যে তাপের সৃষ্টি হয় তাকেই তপস্যা বলা হয়। এই তপস্যার অনলে তমঃ ও রজঃ-এর সর্ববিধ বিকার শোধিত হয়। অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি হয়। চিত্তের শোধন হলে মোহ আসক্তি দেহবন্ধন কেটে যায়।

ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ ছাড়া জীবনে আর উত্তম গতি সম্ভব নয়

ঈশ্বরীয় মহিমা যতই শ্রবণ ও মনন করা যায় ততই মঙ্গল। কারণ তার মাধ্যমেই জীবন পূর্ণতা লাভ করে। এ ছাড়া অন্যান্য প্রসঙ্গ অবান্তর। তা দ্বারা বিকারধর্মী বহির্প্রকৃতির প্রভাব বাড়ে ছাড়া কমে না।

যথার্থ ভাবে ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ মননের দ্বারা জীবনে নূতন ভাবতরঙ্গ সৃষ্টি হয় এবং শুভ সংস্কার বৃদ্ধি পায়। তার ফলে, ঈশ্বরের কৃপা অধিক মাত্রায় পাওয়া সম্ভবপর হয়। ঈশ্বরের কৃপালাভ হলেই ঈশ্বরীয় অনুভূতি সহজে হয়।

বহির্প্রকৃতির কার্য হচ্ছে বৈচিত্র্যের রূপায়ণ

বহির্প্রকৃতির ধ্বংসাত্মক ক্রিয়াকলাপ নবসৃষ্টির অবতারণা করে। নূতন ভাবে সবকিছুকে রূপায়িত করার জন্য তার এই আয়োজন।

বন্ধন ও মুক্তি সর্বসংস্কারের কারণ মন

জীবনে ভালমন্দ, শুভাশুভ দুইরকম সংস্কারই থাকে। মনের সংকল্প দ্বারাই ভালমন্দ, শুভাশুভ তৈরি হয়। এগুলি সব মনের চিন্তা বা কল্পনার বিকারজনিত ফল। সৎ-এর চিন্তা দ্বারা সৎ সংস্কারের প্রভাব বাড়ে, অসৎ-এর চিন্তা দ্বারা অসৎ সংস্কারের প্রভাব বাড়ে।

বৈচিত্র্যময় জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও ধ্বংসের মূলে এই মন। সুতরাং মনই বন্ধন ও মুক্তির কারণ। বহির্মুখী বৈচিত্র্যমুখী বা বহুমুখী মনই বন্ধনের কারণ এবং কেন্দ্রাভিমুখী একত্ব, সমত্ব ও অখণ্ডমুখী মনই মুক্তির কারণ। মনের বহুমুখী গতিকে অসৎবৃত্তির গতি বলা হয় এবং একমুখী গতিকে সৎবৃত্তির গতি বলা হয়।

সচ্চিদানন্দের প্রকাশ-বিকাশ সচ্চিদানন্দই, তার কখনও প্রত্যবায় হয় না

সত্যের অখণ্ড স্বরূপকে ঈশ্বর বলা হয়। অখণ্ড সত্যই চিদানন্দস্বরূপ। সামগ্রিক ভাবে সত্যের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য সৎপ্রসঙ্গের মাধ্যমে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন একান্ত প্রয়োজন। তার ফলে, সদাশ্রয়ী হওয়া যায়। সদাশ্রয়ী হলে একান্ত মনে ঈশ্বরের অনুধ্যান করা সম্ভবপর হয়। তার পরিণামে ঈশ্বরের অনুভূতি লাভ হয়।

দিব্যজীবন লাভের সহজতম উপায়

প্রতিনিয়ত ঈশ্বরকে স্মরণে রেখে জীবনে সর্ববিধ কর্তব্য করাই হচ্ছে দিব্যজীবন লাভের সহজতম উপায়। অন্তর্মনে ঈশ্বরকে না-চেয়ে যারা বস্তুজগতের বিষয় নিয়েই মত্ত থাকে তাদের কামনা-বাসনার মাত্রা বেড়েই চলে। তার ফলে, তারা ঈশ্বরে একান্ত ভাবে মনোনিবেশ করতে পারে না এবং যথার্থ সুখশান্তিও পায় না।

পরমাত্মাই সর্বভূতাত্মা, হৃদয়েতে আপনবোধে তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ বা স্ফূর্তি

যিনি একমাত্র কর্তা-ভোক্তা-দ্রষ্টা-জ্ঞাতা তিনিই সকলের অন্তরাত্মা। তিনি সকলের প্রাণের প্রাণ, মনের মন, বোধের বোধ, অতীব আপন। তিনিই স্বয়ং সকলের সত্তা ও শক্তি। অন্তরের শুদ্ধবোধে অর্থাৎ শুদ্ধচিত্তে তাঁর পরিচয় মেলে। প্রথমে অন্তরে তাঁর অনুভূতি জাগে, তারপরে বাইরে ও সর্বপ্রকাশে সমভাবে তাঁর উপলব্ধি হয়। তখন অন্তরে বাইরে অভেদে সমদর্শন হয়।

স্বানুভবসিদ্ধ জীবন সর্বযোগের সমন্বয় বিজ্ঞানে স্বানুভূতির ভাষায় সবাইকে অনুপ্রাণিত করে

জীবনে পূর্ণতা লাভের জন্য বা আত্মোপলব্ধির জন্য মহাপুরুষ বা আত্মজ্ঞ পুরুষগণ কর্ম-ভক্তি-ধ্যান ও জ্ঞানের সমন্বয়মূলক সাধনপদ্ধতি যথার্থ ভাবে সকলকে ধরিয়ে দেন। তমঃ ও রজোগুণের শোধনের জন্য প্রথমে কর্মপরায়ণতা শিক্ষা দেন, সত্ত্বগুণের অভিব্যক্তির জন্য ভক্তি সাধন শিক্ষা দেন, সমত্ববোধের বিকাশ ও স্থিতির জন্য নিষ্কাম কর্ম ও ধ্যানযোগ শিক্ষা দেন। অজ্ঞানের মোহ আসক্তি হতে মুক্ত হবার জন্য ত্যাগ-বৈরাগ্য ও বিচারপূর্বক জ্ঞানযোগ শিক্ষা দেন।

নির্গুণ গুণী রসরাজ ঈশ্বর স্বয়ং সর্ব ভাব-বোধের অধিষ্ঠান, কারণ-কার্যের পূর্ণ সমাধান

অখণ্ড আত্মা বা ঈশ্বরই কারণের কারণ, মহাকারণ। তিনি আবার কারণ ও কার্যরূপে স্বয়ং প্রকাশমান। নির্গুণে ও সগুণে তিনিই স্বয়ং। সকলের বোধ-বুদ্ধি-মন-প্রাণ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে তাঁরই প্রকাশ বিচিত্র ধারায় অভিব্যক্ত। সেজন্য তাঁকে রসময় বলা হয়।

রসস্বরূপ আত্মা বা ঈশ্বর সর্বজীবনের সত্য অধিষ্ঠান। মুখ্য (মহাপ্রাণ) এবং গৌণপ্রাণরূপে তিনি জীবজগতে বিরাজমান। মুখ্যপ্রাণই হচ্ছে চৈতন্য, গৌণপ্রাণ হচ্ছে মন। বোধ, চৈতন্য ও মন অভেদ।

জীবজগৎ হচ্ছে এই মহাপ্রাণেরই লীলায়িত রূপ বা অভিব্যক্তি। সবার মধ্যে এক অখণ্ড মহাপ্রাণই অবিরাম স্বমহিমায় নানাভাবে লীলা করছে।

সর্বব্যাপী মহাপ্রাণ অঙ্গের সর্বত্রই অনুস্যূত হয়ে আছে বলে তাকে অঙ্গিরস বলা হয়

দেহ ও প্রাণচৈতন্য হচ্ছে আধার ও আধেয়। একেরই দ্বৈতবিলাস। এই প্রাণচৈতন্যই হচ্ছে অঙ্গিরস। কারণ সর্ব অঙ্গেই সে সমভাবে বিচরণ করে তাদের সচেতন ও সক্রিয় রাখে।

আত্মবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে হৃদয়ের পরিচয়

প্রাণের কেন্দ্রকে হৃদয় বলা হয়। 'কেন্দ্র' অর্থে বিশেষ কোন নির্দিষ্ট স্থানকে বোঝায় না। এ সর্বব্যাপী, সর্বাশ্রয়ী, সর্বধারী, সর্বজ্ঞ, অখণ্ড বোধসত্তা। কিন্তু দেহের অভ্যন্তরে অবস্থিত হৃদয়কেন্দ্রকে অন্তঃকরণ বা অন্তরিন্দ্রিয় বলা হয়। সুতরাং কেন্দ্রের হৃদয় এবং হৃদয়ের কেন্দ্র উভয়েরই ব্যবহার অখণ্ড বোধময় আত্মা বা ঈশ্বরের দ্বৈতবিলাস।

সত্যানুভূতির অপরিহার্য বিজ্ঞান

সর্বব্যাপী এই অখণ্ড হৃদয় সত্তার যে-কোন স্থানে, যে-কোন প্রকাশে, যে-কোন অঙ্গে, অন্তরে বা বাইরে মনোনিবেশ করলে তাঁর সঙ্গে অভেদে যুক্ত হওয়া যায়। আবার কেন্দ্রহৃদয়ের অন্তর্গত ব্যক্তিগত জীবনের হৃদয়কেন্দ্রে মন স্থির করে ধ্যান করে আত্মোপলব্ধি বা ঈশ্বরোপলব্ধির বিধান দেওয়া হয়। বিশ্বপ্রকৃতির অন্তর্গত কোন বস্তু, শব্দ, শক্তির গতিকে কেন্দ্র করে মনোনিবেশ করলেও ঈশ্বরীয় অনুভূতি লাভ করা যায়।

ঈশ্বরানুভূতির অন্যতম সাধনবিজ্ঞান

সরল অন্তরে ঈশ্বরের নামে মনোসংযম করলে এবং সহৃদয়ে তাঁকে প্রকাশিত হবার জন্য বারবার ব্যাকুল ভাবে প্রার্থনা জানালে হৃদয়ে ঈশ্বরের আবেশ এবং প্রকাশ অনুভূত হয়।

ঈশ্বরবোধে, আত্মবোধে বা সমবোধে সবকিছু গ্রহণ করে 'মেনে মানিয়ে চললে' সহজেই ঈশ্বরানুভূতি লাভ করা যায়। সবকিছুকে সমবোধে গ্রহণ করে 'মেনে মানিয়ে চলার' সাধনাকেই আত্মসমর্পণের সাধনা বলা হয়।

আত্মসমর্পণযোগে সিদ্ধির তাৎপর্য

আত্মসমর্পণের সাধনায় যুক্তি-তর্ক-জ্ঞান বিচারের কোন প্রাধান্য চলে না। অহংকার অভিমান বজায় রেখে আত্মসমর্পণের সাধনা হয় না। আত্মসমর্পণযোগে দৃঢ় বিশ্বাস ও ঐকান্তিক নির্ভরতার একান্ত প্রয়োজন। অহংকার অভিমান অর্থাৎ 'আমার আমি বোধ' বজায় রেখে আত্মসমর্পণের সাধনা সফল হয় না।

পূর্ণ আত্মসমর্পণযোগে সাধক ঈশ্বরের মাধুর্যস্বরূপের সর্বোত্তম অনুভূতি লাভ করে থাকে। অহংকার অভিমান দ্বারা পুরুষকারের মাধ্যমে সাধনা করে ঈশ্বরের ঐশ্বর্যভাবের অনুভূতিলাভ হয় সত্য, কিন্তু মাধুর্যভাবের উপলব্ধি হয় না।

অন্তরের তীব্র ব্যাকুলতা ও প্রার্থনা ঈশ্বরানুভূতির অতি গুরুত্বপূর্ণ পাথেয়

ঈশ্বরের শরণাগত ভক্তের ব্যাকুল প্রার্থনা কখনও ব্যর্থ হয় না। তার প্রতিটি আহ্বানেই একটি করে সিঁড়ি[১] তৈরি হয়। এই সিঁড়িকে অবলম্বন করেই সে ঈশ্বরের কাছে পৌঁছে যায়, অথবা ঈশ্বর তার কাছে নেমে আসেন।

সকাম ও নিষ্কাম সাধনার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ তাৎপর্য

ভক্তি সাধনায় সকাম ও নিষ্কাম উপাসনার রীতি আছে; আবার বৈধীভক্তি ও রাগানুগাভক্তি সাধনারও বিধান আছে। ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির মনোভাব নিয়ে ঈশ্বরকে ডাকা আর্ত ভক্তের লক্ষণ। এ-ই সকাম উপাসনা। সকাম উপাসনার ফলে ঈশ্বরের আংশিক শক্তি লাভ হয় সত্য, কিন্তু ঈশ্বরের পূর্ণ পরিচয় প্রত্যক্ষ ভাবে মেলে না। কামনা-বাসনা নিয়ে তাঁকে ডাকলে সবসময় তা পূরণও হয় না। একটিমাত্র কামনা নিয়ে তাঁকে ডাকলে তা অবিলম্বে সফল হয়।

১। আত্মবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে।

প্রত্যক্ষ অনুভূতি ও দর্শনের তাৎপর্য

নিষ্কাম উপাসনার দ্বারা এবং রাগানুগাভক্তির সাধনা দ্বারা ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ দর্শন ও অনুভূতি লাভ হয়। কিন্তু এইরূপ ভক্ত অতীব দুর্লভ।

সর্বসমর্পণযোগের ফলশ্রুতি হল ঈশ্বরের নিত্যলীলার নিত্যসাথী

ঈশ্বরীয় লীলায় সৃষ্টি-স্থিতি-ধ্বংসের খেলা অপরিহার্য অঙ্গ। ধ্বংসেরও বিশেষ তাৎপর্য আছে। পূর্ণ আত্মসমর্পণযোগের মাধ্যমে ঈশ্বরের নিত্যলীলা সৃষ্টি-স্থিতি-ধ্বংসের খেলায় অনাসক্ত ও নির্বিকার ভাবে অংশগ্রহণ করে তাঁর লীলাখেলার সাথী হওয়া যায়।

ঈশ্বরের হাতের অস্ত্র বা তাঁর নিত্যলীলার সাথী হয় তারাই যারা বিনা শর্তে পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে

পরিপূর্ণ ভাবে ঈশ্বরকে আত্মসমর্পণ করলে সাধকের ব্যক্তিত্ব-কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব ও জ্ঞাতৃত্ব ভাবের পরিশুদ্ধি হয়। তার ফলে সে ঈশ্বরের হাতের অস্ত্র হয়ে যায় এবং ঈশ্বরের সঙ্গে শুদ্ধবোধে নিত্য যুক্ত থেকে তাঁর কাজের সহায়ক হয়।

নির্গুণতত্ত্ব/পরমতত্ত্বের অনুভূতি সাধক পায় সগুণতত্ত্বের অনুভূতির স্থিতি ও দৃঢ়তার ভিত্তি অনুসারে

সর্ববিধ সাধনার উন্নত অবস্থায় প্রথমে সগুণ ঈশ্বরের দর্শন ও উপলব্ধি হয়। তারপরে সাধকের অন্তর্প্রকৃতির স্বভাব অনুযায়ী নির্গুণ ঈশ্বরের সাধনায় সর্বোত্তম অনুভূতি পরমতত্ত্বের পরিচয় পায়।

পরমতত্ত্বের অনুভূতিই হচ্ছে পরমার্থলাভ, সর্ব কার্য-কারণের পরিসমাপ্তি

পরমতত্ত্বের সঙ্গে পরিপূর্ণ ভাবে যুক্ত হলে অথবা তার পূর্ণ উপলব্ধি হলে সর্বসাধনার পরিসমাপ্তি ঘটে। তখন সাধ্য, সাধক ও সাধনা একীভূত হয়ে যায়। পৃথক করে কর্তা-ক্রিয়া-কর্ম; স্রষ্টা-সৃজন-সৃষ্টি; ভোক্তা-ভোগ-ভোগ্য; জ্ঞাতা-জ্ঞান-জ্ঞেয়; দ্রষ্টা-দর্শন-দৃশ্য প্রভৃতি ত্রিবিধ অসৎ-আগন্তুক ধারণার একান্ত ভাবে পরিসমাপ্তি ঘটে। তখন শুধু সচ্চিদানন্দ অর্থাৎ অস্তি-ভাতি-প্রীতিধারা অবিরাম স্বয়ংপ্রকাশ হয়ে চলে। [২৯। ৮। ৬৮]

আত্মসমর্পণের সাধনায় শরণাগতির গুরুত্ব

আত্মসমর্পণের সাধনা শরণাগতি দিয়ে শুরু করতে হয়। জীবনের সর্ববিধ আচারে ও ব্যবহারে সর্বদা সমর্পণের লক্ষণগুলির প্রকাশ সম্বন্ধে সচেতন থাকতে হয়। শরণাগতির সাধনায় জোর করে কিছু করার থাকে না, জ্ঞানবিচার বা যুক্তিতর্কেরও কোন প্রকার প্রাধান্য চলে না। এইপথে খুব সহজেই চিত্তশুদ্ধি হয় এবং ঈশ্বরের দর্শন ও অনুভূতি লাভ হয়।

শরণাগতির সাধনায় 'মেনে মানিয়ে চলার' তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য

আত্মসমর্পণের সাধনায় ঈশ্বরীয় বোধে সবকিছুকে গ্রহণ করে শুধু 'মেনে মানিয়ে চলতে' হয়। এই 'মেনে মানিয়ে চলার' পিছনে যে-শক্তি কাজ করে তা অন্যান্য সাধনার পথে বহু তপস্যা করে অর্জন করতে হয়। কিন্তু আত্মসমর্পণের সাধনায় সবকিছু 'মেনে মানিয়ে চলার' ফলে অন্তর থেকে সেই শক্তি আপনা হতে অতি সহজেই প্রকাশ পায়।

দেহেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে কর্মের ফলে যে-অভিজ্ঞতা তার পরিণামে হয় বস্তুর জ্ঞান এবং তদনুরূপ বিশ্বাস

দেহেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে মনোযোগ সহকারে কোন কর্ম কিছুকাল করার ফলে তার থেকে একটা অভিজ্ঞতা তৈরি হয়। বহু অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হলে হয় বস্তুর যথার্থ জ্ঞান ও বিশ্বাস। কোন কিছু জানবার পরে হয় জ্ঞান। জ্ঞানলাভের পরে সেই বস্তুর বিজ্ঞান সম্বন্ধে একটা অভিজ্ঞতা হয়। এই অভিজ্ঞতা অর্থাৎ জ্ঞানের বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানের জ্ঞান যা-দ্বারা ধৃত থাকে তার নাম বিশ্বাস[১]।

বস্তুর জ্ঞানের ব্যবহারের ফল হল বিজ্ঞান, তার পরিণাম হল বিজ্ঞানের জ্ঞান—এই জ্ঞানের ব্যবহারের ফলে হয় যে-সূক্ষ্মজ্ঞান তা-ই আত্মজ্ঞান ও আত্মবিশ্বাস (১)

বস্তুর জ্ঞানের ব্যবহারের নাম বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞানের ফল সূক্ষ্মজ্ঞান। এই সূক্ষ্মজ্ঞানের যে-বিজ্ঞান তাই আত্মবিজ্ঞান। এই আত্মবিজ্ঞানের পরিণাম আত্মজ্ঞান। এই আত্মজ্ঞানই হচ্ছে আত্মবিশ্বাস বা অখণ্ড শ্রদ্ধা[২]।

অখণ্ড বিশ্বাসের তাৎপর্যপূর্ণ মাহাত্ম্য

অখণ্ড বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা আদি, মধ্যে ও অন্তে সমভাবে অনুভূত হলে জীবন পূর্ণ শ্রদ্ধাময় হয়ে যায়। অখণ্ড ভাবে মানার পরিণামে অখণ্ড বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা অতি সহজে এসে যায়।

শ্রদ্ধা-ভক্তি-বিশ্বাসের মাধ্যমে ঈশ্বরে আত্মসমর্পণের সাধনায় 'মেনে মানিয়ে চলার' তাৎপর্যপূর্ণ পরিণাম

আত্মসমর্পণের পথে সবকিছুকে ঈশ্বরীয় বোধে গ্রহণ করা একমাত্র অখণ্ড শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের দ্বারাই সম্ভব হয়। শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আবার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার উপরে নির্ভরশীল। শরণাগতির মাধ্যমে আত্মসমর্পণের সাধনায় 'মেনে মানিয়ে চলার' অভ্যাসে পূর্ণ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস খুব সহজে গড়ে ওঠে। তখন অস্থিরতা, চঞ্চলতা কমে গিয়ে শান্তভাব আসে। একেই ঈশ্বরের অহেতুক কৃপা[৩] বলে। এর জন্য কোন প্রকার কঠোর সাধনার প্রয়োজন হয় না।

শরণাগতির সাধনা হল বিনা শর্তে ঈশ্বরের উপর পরিপূর্ণ নির্ভরতা

পরিপূর্ণ ভাবে শরণাগতির মাধ্যমে আত্মসমর্পণের ফলে ঈশ্বরীয় গুণগুলি আপনিই প্রকাশিত হয়। ঈশ্বরকে সবকিছু সমর্পণ করে শুধু তাঁর শরণাগত হয়ে চলতে হয়। এই অবস্থায় কোন কিছু শিক্ষার বা জানাজানির প্রবণতা থাকে না। বিড়ালছানার মত পরিপূর্ণ ভাবে মায়ের বা ঈশ্বরের উপরে নির্ভর করে থাকতে হয়।

বৈধীভক্তি অথবা রাগভক্তির সাধনার যোগ্যতার অভাবে শুধুমাত্র শরণাগতির সাধনাও ফলপ্রদ হয়

বৈধীভাবে জপ-তপ-স্মরণ-মনন-ভজন-পূজন-ধ্যান-যোগ-জ্ঞান-বিচার সহকারে আত্মসমর্পণের সাধনা করলে তা অনতিবিলম্বে ফলপ্রদ হয়। কিন্তু বৈধীভাবে কোন প্রকার সাধনভজন করার যোগ্যতা কারও না থাকলেও পরিপূর্ণ নির্ভরতা সহকারে শরণাগত হয়ে ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করলেও তাঁর দর্শন ও অনুভূতি লাভ করা যায়।

সাধনার পরিপক্ক অবস্থায় ঈশ্বরানুরাগের মাত্রানুসারে ঈশ্বরীয় গুণ-ভাবের বিশেষ প্রকাশ সাধকের হৃদয়েতে হয়

ঈশ্বরের উপরে একান্ত ভাবে নির্ভর করে চললে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ হতে বাধ্য। রাজার আগে আগে

১। অভিনব সংজ্ঞা। ২। তত্ত্বদৃষ্টিতে। ৩। অভিনব সংজ্ঞা।

যেমন রাজকর্মচারীরা চলে সেইরকম কারও মধ্যে ঈশ্বরীয় স্বরূপ প্রকাশ হওয়ার পূর্বে ঈশ্বরীয় গুণগুলি পরপর প্রকাশ হতে থাকে।

পূর্ণ আত্মসমর্পণের ফলেই হয় হৃদয়ে ঈশ্বরের অভিব্যক্তি—তার ফলে হয় সাধকের মধ্যে ঈশ্বরীয় ভাব ও গুণের সম্যক্ প্রকাশ

ঈশ্বরের গুণ ও শক্তি ধরে সাধনা করে নানাবিধ শক্তি ও গুণের অধিকারী হওয়া যায়, কিন্তু ঈশ্বরোপলব্ধির জন্য তাঁর শরণাগত হতে হয়। আর্তিভাবে সবকিছু ঈশ্বরে সমর্পণপূর্বক তাঁর উপরে পরিপূর্ণ ভাবে নির্ভর করে চললে ঈশ্বর স্বয়ং তার মধ্যে অভিব্যক্ত হন। ঈশ্বর স্বয়ং যার মধ্যে অভিব্যক্ত হন তার মধ্যে ঈশ্বরীয় গুণগুলিও আপনা হতেই প্রকাশিত হয়।

শরণাগত ভক্ত হল গুরু-ইষ্টের যন্ত্র বা লীলামাধ্যম

শরণাগতি বা আত্মসমর্পণের পথে একেবারে মায়ের বা ঈশ্বরের হাতের যন্ত্র বা অস্ত্র হয়ে থাকতে হয়। তার মধ্যে মা স্বয়ং খেলেন।

মাকে বা ঈশ্বরকে সবকিছু পরিপূর্ণ ভাবে সমর্পণ করার ফলে ভক্তের বিনাশ হয় না, বরং তাকে পরিপূর্ণভাবে শোধন করে এবং ঈশ্বরীয় ভাবধারায় রূপান্তরিত করে তার মধ্যে বসে স্বয়ং সবকিছু ব্যবহার করেন। এই অবস্থায় সর্বরকম ঈশ্বরীয় গুণ ও শক্তির অধিকারী হয়েও ভক্ত নিজে কখনও তা ব্যবহার করে না।

সমর্পণের বিজ্ঞানে কাম-কর্ম-কর্তৃত্বের পূর্ণ সমাপন হয় ক্রমপর্যায়ে, যার ফলে হয় জীবন্মুক্তি

আত্মসমর্পণের সাধনা তিন ভাগে সাধিত হয়। প্রথমে সর্ববিধ কামনা-বাসনার সমর্পণ করতে হয়। দ্বিতীয়, সর্ববিধ কর্মফলের সমর্পণ, তৃতীয় বা পরিশেষে সর্ববিধ কর্তৃত্বভাবের সমর্পণ করতে হয়। এই ত্রিবিধ সমর্পণ সম্পূর্ণ হলে জীবন ত্রিগুণের বিকার হতে মুক্ত হয়। অর্থাৎ চিত্তের পরিশুদ্ধি হয় এবং তখন অবিরাম ধারায় অখণ্ড ঈশ্বরীয় অভিব্যক্তি স্বতঃস্ফূর্ত চলতে থাকে। এ-ই অনুভূতির সর্বোত্তম অবস্থা।

পূর্ণানুভূতির উদয়ের পূর্বেই ব্যক্তিত্বের অবসান হয়, ব্যষ্টিভাবের বীজ/কারণ নির্মূল হয়

অনুভূতির সর্বোত্তম অবস্থায় ব্যক্তিত্বের আমিভাব ঈশ্বরীয় সত্তায় পরিপূর্ণ ভাবে মিশে যায়। তার ফলে, ঈশ্বর স্বয়ং তার মধ্যে বসে লীলা করেন।

সমর্পণের সাধনায় প্রার্থনার গুরুত্ব অধিক— পরিণামে ভক্ত ও ভগবানের হয় অভেদ মিলন

ঈশ্বরের কাছে নিয়ত আন্তরিক ভাবে প্রার্থনা করার ফলে শরণাগত ভক্তের মধ্যে অভিনব ভাবে ঈশ্বরীয় অভিব্যক্তি হয়। পূর্ণ ভাবে শরণাগত ও সমর্পিত ভক্ত ঈশ্বরের অতীব প্রিয়পাত্র। তার মধ্যে বসে ঈশ্বর স্বয়ং আপন স্বভাবমহিমা ব্যক্ত করেন।

উত্তম ভক্তের হৃদয়ে ঈশ্বরাত্মার পূর্ণ অভিব্যক্তির ফলে বেদাদি শাস্ত্রের অভিনব প্রকাশ-বিকাশ ঘটে— সে হয় বহুজনের দিব্য প্রেরণা ও আনন্দের কারণ

উত্তম ভক্তের হৃদয়ে ভগবান নিত্যনূতন ভাবে লীলা করেন। তার মুখে বেদ-বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্রের সার কথা অর্থাৎ মূল প্রতিপাদ্য বিষয় অতি সহজ-সরল ভাবে আপনা আপনিই প্রকাশিত হয়। উত্তম ভক্তের জীবনে ঈশ্বরীয়

অভিব্যক্তি যে-রকম অভিনব ভাবে প্রকাশিত হয়, অন্যান্য সাধনার মাধ্যমে সে-রকম হতে বিশেষ দেখা যায় না। শরণাগত উত্তম ভক্তের সঙ্গ করে সকলেই আনন্দ ও শান্তি পায়।

মহাপুরুষদের সান্নিধ্যে অল্পকাল থাকলেও তা শুভ ফলপ্রদ হয়

মহাপুরুষদের কাছে গিয়ে শান্ত হয়ে বসে থাকলে অনেক উপকার পাওয়া যায়। নিজের থেকে কোন কিছু অবান্তর প্রসঙ্গ জিজ্ঞাসা না-করে তাঁদের তরফ থেকে কিছু শুনবার অপেক্ষায় প্রস্তুত থাকতে হয়।

মহাপুরুষদের প্রণাম করবার বিজ্ঞান প্রসঙ্গে নির্দেশ

মহাপুরুষদের প্রণাম করার উপকারিতা মনের শুভাশুভ সংস্কারের উপরে নির্ভর করে। প্রথম প্রথম মহাপুরুষদের অঙ্গ স্পর্শ না-করে দূর হতে প্রণাম করার অভ্যাস করতে হয়। এই অভ্যাসের ফলে প্রণাম বিষয়ে একটা সচেতনতা জাগে। এই অভ্যাস দৃঢ় হলে তার ফলে শ্রদ্ধা-ভক্তি-বিশ্বাসের মাত্রা বাড়ে। তখন অবস্থা বুঝে মহাপুরুষগণই চরণ স্পর্শ করে প্রণাম করার অনুমতি দেন।

শিক্ষার মাধ্যমে জীবনের বিকাশ ও প্রসারতা লাভ হয়। শিক্ষা গ্রহণ ও তা ধারণের যোগ্যতা বাড়াবার পক্ষে সর্ববিধ প্রস্তুতির মধ্যে প্রণাম করা একটি অপরিহার্য অঙ্গ। শিক্ষাপ্রার্থী জিজ্ঞাসুর মনের প্রস্তুতি নিরূপিত হয় এর দ্বারা। এর অভাবে অথবা এর অপব্যবহারে শিক্ষার্থীর অন্তর্প্রস্তুতি সুষ্ঠু ভাবে তৈরি হয় না।

প্রকৃত শিক্ষক বা গুরু শিক্ষার্থীর আচরণ ও ব্যবহারের লক্ষণ দেখে তার মনের যথার্থ প্রস্তুতির পরিচয় অবগত হন। প্রণামবিহীন যে-কোন প্রস্তুতি শিক্ষার্থীর অযোগ্যতার পরিচয় দেয়।

জীবনে বৃহৎ ও মহৎ হতে গেলে বৃহৎ ও মহতের সান্নিধ্যে গিয়ে তাঁদের শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। অখণ্ড নিত্য সৎবস্তু বৃহৎ ও মহতের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে।

সম্মান, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের ব্যবহার প্রসঙ্গ

নিত্যসৎকে মানাই হচ্ছে সম্মান করা, তাকে ধারণ করা হচ্ছে শ্রদ্ধা, তার মধ্যে স্থিতি ও তার ব্যবহার হচ্ছে বিশ্বাস। সম্মানের দ্বারা সম্মানের বোধ বাড়ে, শ্রদ্ধার ব্যবহারে শ্রদ্ধার বোধ বাড়ে এবং বিশ্বাসের অনুশীলনে বিশ্বাসের বোধ বাড়ে। শ্রদ্ধায় ব্যবহারে প্রীতি, আসক্তি ও স্থিতিই ভক্তি।

প্রণাম ব্যতীত সম্মানের অঙ্গহানি হয়। শ্রদ্ধা-বিশ্বাসের একান্ত অভাবে ভক্তির অনুশীলন এবং বিকাশ অসম্ভব।

শ্রদ্ধা, ভক্তি ও বিশ্বাসের সমবেত অনুশীলন ব্যতীত জীবন কখনওই মহৎ হতে পারে না। যথার্থ সম্মানবোধের অভাবে শ্রদ্ধা, ভক্তি, বিশ্বাসেরও যথার্থ বিকাশ হওয়া সম্ভবপর নয়। আন্তরিক ভাবে প্রণাম অভ্যাসের অভাবে যথার্থ সম্মান, শ্রদ্ধা প্রভৃতি প্রকাশ পায় না।

গুরুর কাছে শিক্ষার্থীর জ্ঞানলাভের বিজ্ঞান প্রসঙ্গে নির্দেশ

শ্রদ্ধাবান, ভক্তিমান ও বিশ্বাসী শিক্ষার্থী শিক্ষাগ্রহণের এবং জ্ঞানলাভের যোগ্য অধিকারী। শিক্ষার্থীর শ্রদ্ধা-ভক্তি-বিশ্বাসপূর্ণ আচরণে প্রীত হয়ে শিক্ষক বা গুরু তাকে যথার্থ শিক্ষাদান করে থাকেন। গুরু প্রীত হলে শিক্ষার্থীর শিক্ষাগ্রহণের ও ধারণের কোন প্রকার অন্তরায় আর থাকে না। গুরুকৃপায় সহজেই সে পূর্ণ শিক্ষা গ্রহণ করে জ্ঞানলাভ করতে পারে। অপর পক্ষে যথার্থ শ্রদ্ধা-ভক্তি-বিশ্বাসের অভাবে শিক্ষার্থী গুরুকৃপা লাভে বঞ্চিত হয়। ফলে সে যথার্থ শিক্ষা লাভ করতে পারে না। যথার্থ শিক্ষার অভাবে জীবন ব্যর্থ হয়।

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণের তারতম্য ভেদে মানুষের রুচি, যোগ্যতা ও স্বভাবপ্রকৃতি তৈরি হয়। শিক্ষার

মাধ্যমে এই গুণের রূপান্তর ও শোধন হয়। তার ফলে, স্বভাবপ্রকৃতিরও শোধন হয়। স্বভাবপ্রকৃতির গুণ অনুযায়ী উত্তম, মধ্যম ও অধম অধিকারীর মান নিরূপিত হয়। অধিকারীর স্বভাবের মান অনুযায়ী শিক্ষার মান নির্দিষ্ট হয়। শিক্ষা অনুরূপ জীবনের বিকাশ হয়।

প্রণাম প্রসঙ্গে বিধি ও নিষেধ

মাতাপিতা, আত্মীয়, গুরুজনদের সম্মানার্থে চরণ স্পর্শ করে প্রণাম করার রীতি এদেশে প্রাচীনকাল হতেই চলে আসছে। কিন্তু দেবদেবীর মূর্তি ও বিগ্রহকে দূর হতে প্রণাম করার বিধানই প্রচলিত।

অষ্টাঙ্গ-অষ্টবিধ প্রণামের নিগূঢ় তাৎপর্য

বহুবিধ প্রণামের মধ্যে অষ্টবিধ প্রণাম ধর্মজগতের শিক্ষা ও আচরণের অন্তর্গত। প্রণামের প্রতিটি ভঙ্গিমারই বিশেষ তাৎপর্য আছে। এই তাৎপর্যের ভাবার্থ ও অন্তর্নিহিত তত্ত্বার্থ শুধু পড়ে বা শুনে অনুভবগম্য হয় না। অনুভবসিদ্ধ গুরুর কাছ হতে সযতনে শিখতে হয়।

মহাপুরুষদের চরণ ছুঁয়ে প্রণাম করা সম্বন্ধে বিধিনিষেধের নিগূঢ় তাৎপর্য

সাধুসন্ত মহাপুরুষদের চরণ স্পর্শ করে প্রণাম করার মধ্যে গতানুগতিক রীতি ছাড়াও আরোও গভীর রহস্যপূর্ণ তত্ত্ব নিহিত আছে। গুণ ও প্রকৃতি ভেদে প্রত্যেকের শরীরে ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও মনের গতির মানের তারতম্য হয়। এই গতির স্পন্দনের তারতম্য ভেদে শরীরের তাপেরও তারতম্য হয়। সমপর্যায়ের গতির মানের সঙ্গে পরস্পর যোগাযোগ হলে উভয়েরই আনন্দস্ফূর্তি হয়। তার ফলে, উভয়েরই উপকার হয়। কিন্তু বিষমগতির মানের সঙ্গে পরস্পর যোগাযোগ হলে উভয়ের মধ্যে বিপরীত ক্রিয়া দেখা যায়। তার ফলে উভয়েরই ক্ষতি হয়। তবে যার শক্তি অধিক থাকে সে বিকারকে সামলে নিতে পারে, অপরে পারে না। সেই জন্যই চরণ স্পর্শ করে প্রণাম করা সম্বন্ধে মহাপুরুষদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়।

মহাপুরুষদের দেহশুদ্ধি, অন্তরশুদ্ধি ও বিবেকসিদ্ধির ফলে তাঁদের অন্তরের প্রাণ ও অনুভূতির স্পন্দন স্বতন্ত্র— সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁদের স্বভাবপ্রকৃতির ভেদ বা পার্থক্য গুণাত্মক

মহাপুরুষদের শরীরে শুদ্ধসত্ত্ববোধের স্পন্দন অধিক মাত্রায় থাকার ফলে তাঁদের দেহ শুদ্ধ ও পবিত্র থাকে। অর্থাৎ শান্ত ও সমাহিত ভাবের সঙ্গে পরিপূর্ণ যুক্ত থাকে। সেই অবস্থায় তমোগুণী ও রজোগুণী প্রণামকারীর অশুদ্ধ দেহ-ইন্দ্রিয়-মন-প্রাণের বিষম স্পন্দনের সঙ্গে স্পর্শের মাধ্যমে যোগাযোগ হলে উভয়ের মধ্যে বিদ্যুৎশক্তির গতির মত একটা তীব্র আলোড়ন হয়। তার ফলে, মহাপুরুষগণ নিজেদের সামলে নিতে পারেন কিন্তু প্রণামকারীর পক্ষে তা সম্ভবপর হয় না।

মহাপুরুষদের চরণ স্পর্শ করে সবার প্রণাম করা সম্পর্কে নিষেধের কারণ

কোন প্রকার বিধি নিষেধ না থাকলে যখন তখন যে-কোন নবাগত দর্শনপ্রার্থী অথবা বিব্রত প্রপীড়িত পরিচিত প্রার্থী মহাত্মাদের অন্তর্মুখী অথবা বহির্মুখী ভাবের অবস্থা না-বুঝতে পেরে তাঁদের স্পর্শ করে প্রণাম করে। তার ফলে, বহুল ক্ষেত্রে প্রণামকারীর তো অপকার হয়ই, এমনকি মহাত্মাদের অঙ্গেও নানাবিধ বিকার ফুটে ওঠে। এই সব কারণেই সাধারণত মহাত্মাদের চরণ স্পর্শ করে প্রণাম করা বিধেয় নয়।

মহাপুরুষদের স্বতঃস্ফূর্ত ব্যবহারের মাধ্যমে অপরের মঙ্গল ও কল্যাণ সাধিত হয় সম্যক্ ভাবে

মহাপুরুষদিগকে দূর হতে যথাবিধি প্রণাম করলেও সুফল পাওয়া যায়। মহাত্মাদের আশীর্বাদই প্রণামকারীর পক্ষে ফলপ্রদ। তবে তাঁরা যখন কাউকে স্বেচ্ছায় স্পর্শ করে কিছু বলেন বা ভাবস্থ থাকেন তার ফলে উভয়ের মধ্যে একটা সমধর্মী ভাবশক্তির আদান-প্রদান হয়। তা বহির্দৃষ্টিতে সাধারণ মানুষের পক্ষে বোধগম্য নয়।

প্রণামকারী মহাপুরুষকে স্পর্শ করে উপকার পায় না, মহাপুরুষ তাকে স্পর্শ করলে সে উপকার পায়

ব্যক্তিগত স্বার্থের ভাব নিয়ে মহাপুরুষদের চরণ স্পর্শ করে প্রণাম করলে বিশেষ কোন কল্যাণ হয় না। কিন্তু মহাপুরুষদের পক্ষ থেকে স্বেচ্ছাকৃত স্পর্শের ফলে, বিশেষ উপকার হয়। তার ফলে, অন্তরে শুদ্ধভাবের সঞ্চার হয়, অস্থিরতার পরিবর্তে স্থিরতা, অজ্ঞানের পরিবর্তে জ্ঞানের উন্মেষ এবং ভোগাসক্তির পরিবর্তে ভক্তিভাবের সঞ্চার হয়। কিন্তু অহংকার অভিমানের ভাব নিয়ে নিজের থেকে কেউ তাঁদের স্পর্শ করলে এই সব ভাবের সঞ্চার হয় না।

অধ্যাত্মজগতে বিশেষ করে শক্তিসাধকদের মধ্যে মানের তারতম্য হেতু পরস্পরের প্রতি আচরণের মধ্যে অনেক সময় স্বকীয় স্বার্থসিদ্ধির বিকৃত ব্যবহার দেখা যায় প্রণামের মাধ্যমে

অনেক সময় অনেক কু-মতলবী সাধক অন্য সাধু মহাত্মাদের কাছে এসে প্রণাম করার মাধ্যমে তাঁদের শক্তি হরণের চেষ্টা করে। এই সব ব্যাপার সাধারণের বোধগম্য হয় না। সাধনার রাজ্যে সাধনার নানাবিধ প্রকারভেদ আছে। তদনুযায়ী সাধকদের শক্তির মানেরও তারতম্য আছে। প্রত্যেক মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তির স্বাভাবিক অভিব্যক্তির মধ্যেও মানের তারতম্য আছে। সাধনার মাধ্যমে সাধকদের মধ্যে সেই অন্তর্নিহিত সুপ্ত শক্তির ব্যাপক অভিব্যক্তি ঘটে। এই শক্তি অপরের মধ্যে সঞ্চারিত করে তাঁরা অপরের অন্তর্নিহিত শক্তিকেও উদ্বুদ্ধ করে দিতে পারেন আবার বিকৃত করেও দিতে পারেন। শক্তির সাধনায় উত্থান পতন আছে। ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং অপরের ক্ষতি করার জন্য যে সাধন তা নিম্ন প্রকৃতির সাধন অর্থাৎ তমঃ-রজোগুণপ্রধান শক্তির সাধন। এই সাধনার সিদ্ধি সাধককে আরও বেশি অভিমানী, দাম্ভিক, অহংকারী ও লোভী বানিয়ে দেয়। সাধকের মধ্যে সংযমের অভাবজনিত ধারণা, শক্তির অভাবজনিত বিকার হয়। তার শ্রদ্ধা-ভক্তি-বিশ্বাসের মানও উন্নত পর্যায়ের নয়। সেইজন্য তার সিদ্ধি তার পতনের কারণ হয়। তবে সৎসঙ্গ ও সদ্‌গুরুর সাহায্যে তার সাধন মানের উন্নতি হলে শ্রদ্ধা-ভক্তি-বিশ্বাসের মানেরও উন্নতি হয় এবং তদনুরূপ সাধনসিদ্ধি মানেরও অধিকারী সে হতে পারে। তার জন্য তার অধিক সচেতন হতেই হয়, নতুবা তার দিব্যজীবন লাভ বা জীবন্মুক্তি লাভ সম্ভব হয় না।

মহাপ্রাণের অভিনব লীলাখেলা

সূর্যকে বিশ্বপ্রকৃতির প্রাণকেন্দ্র বলা হয়। প্রাণীজগতে সকলের সঙ্গেই তার অভেদ সম্বন্ধ আছে। প্রাণশক্তি অদৃশ্য, কিন্তু তার কতগুলি প্রকাশলক্ষণ শুধু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। কারণ অদৃশ্য, কার্য হল দৃশ্য। কার্য সাধিত হয় দেহেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে। তার কারণ হল মন। আবার মনের কার্য সাধিত হয় বুদ্ধি বা অহংকারের মাধ্যমে। বুদ্ধির কারণ হল ত্রিগুণাপ্রকৃতি। প্রকৃতির কারণ হল ঈশ্বরাত্মা। ঈশ্বর সমগ্র প্রকৃতির প্রভু, সুতরাং সৃষ্টির প্রভু। প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাঁকে বিশ্বলীলায় অবতীর্ণ হতে হয়। তিনি কার্যের সঙ্গে যুক্ত হলেও প্রকৃতিজাত কার্যের দ্বারা বদ্ধ নন। কিন্তু ঈশ্বর হলেন সগুণ ব্রহ্ম অর্থাৎ শক্তির ব্যবহারের সঙ্গে যুক্ত পরমতত্ত্বস্বরূপ চিদানন্দ। সেই অর্থে নির্গুণ ব্রহ্মের একধাপ নিচে হলেন সগুণ ব্রহ্ম। নির্গুণ ব্রহ্ম বলতে অখণ্ড ভূমা স্বয়ংপূর্ণ, স্বয়ংপ্রকাশ, স্বতঃসিদ্ধ, স্বসংবেদ্য স্বানুভবদেব। যিনি

সগুণ হয়েও নির্গুণ, মূর্ত হয়েও অমূর্ত, দ্বৈত হয়েও অদ্বৈত এবং নিত্যাদ্বৈত স্বয়ং। এ-ই হল বেদান্তের সিদ্ধান্ত। অর্থাৎ নির্গুণ ব্রহ্মই হলেন পরমতত্ত্বস্বরূপ, পরাৎপরম, কারণাতীত কারণ। তাঁর কোনও কারণ নেই, কেননা ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয় নির্বিকার নির্বিকল্প নিরাকার নিত্য শাশ্বত সনাতন অচ্যুত নিরঞ্জন অদ্বয় অব্যয় অপরিণামী অবিনাশী অপরিমেয় অগাধ গম্ভীর।

মহাপ্রাণের দ্বিবিধ প্রকাশ—চেতন ও অচেতন, পরা ও অপরা

অখণ্ড প্রাণশক্তির মধ্যে জড় ও চেতনভেদে দ্বিবিধ প্রকৃতির লক্ষণ প্রকাশ পায়। অন্তর্প্রকৃতিকে প্রাণচৈতন্য বা মহাপ্রাণশক্তি বলে, বহির্প্রকৃতিকে বিদ্যুৎশক্তি বা জড়শক্তি বলে। জ্ঞানের শক্তিকে পরাগতি এবং মনের শক্তিকে অপরাগতি বলে। প্রথমে এই দ্বিবিধ গতিরই প্রভাব জীবনে বিষম থাকে। উভয়ের মধ্যে সমতা সাধিত হলেই জীবনের পূর্ণতা লাভ হয়।

প্রকৃতির বিজ্ঞান রহস্য

পরা ও অপরাগতির সংযোগে বিদ্যুৎশক্তি বহির্প্রকৃতির সর্ববিধ ক্রিয়া নিষ্পন্ন করে। প্রাণচৈতন্যের পরা ও অপরাগতিও সংযুক্ত হয়ে জীবনের সর্ববিধ ক্রিয়া নিষ্পন্ন করে। মনুষ্য শরীরের বাম অঙ্গে প্রাণের পরাগতির প্রভাব এবং দক্ষিণ অঙ্গে অপরাগতির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

সূর্য থেকে প্রাণশক্তির পরাগতি ব্রহ্মতালু দিয়ে প্রত্যেকের দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে ইড়া নাড়ির মাধ্যমে দেহে বোধের ক্রিয়া করে তারপরে বাঁ পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলির মাথা দিয়ে ভূমিতে চলে যায়। আবার ভূমি থেকে ডান পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলির মাধ্যমে প্রাণশক্তির অপরাগতি দেহের মধ্যে প্রবেশ করে পিঙ্গলা নাড়ির মাধ্যমে দেহে ক্রিয়া করে তারপরে ব্রহ্মতালু ভেদ করে সূর্যে চলে যায়।

ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ির বিজ্ঞান রহস্য

ইড়া নাড়ি জ্ঞানশক্তির ধারক ও বাহক এবং পিঙ্গলা নাড়ি ক্রিয়াশক্তির অর্থাৎ মনোশক্তির ধারক ও বাহক। বাম নাসিকায় শ্বাস হচ্ছে ইড়া নাড়ির লক্ষণ। দক্ষিণ নাসিকার শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া হল পিঙ্গলা নাড়ির লক্ষণ। ইড়া নাড়িতে শ্বাস-প্রশ্বাস কালে সাধনভজন ফলপ্রদ হয়। পিঙ্গলা নাড়িতে শ্বাস-প্রশ্বাস কালে কর্ম ফলপ্রদ হয়।

অবিরাম ধারায় মহাপ্রাণের দ্বিবিধ গতিশক্তি সূর্য থেকে ভূমিতে এবং ভূমি থেকে সূর্যে প্রতিটি জীবনের মাধ্যমে সক্রিয় আছে। এই দুই গতির মধ্যে সমানে স্থিতিই হচ্ছে পূর্ণতা বা মুক্তির লক্ষণ। দ্বিবিধ গতিশক্তির সমত্বে স্থিতি শুধু সুষুম্না নাড়ির মাধ্যমে সহস্রারে অনুভূত হয়। কিন্তু পরা ও অপরাগতির মধ্যে সমতার অভাবে কোনওটার প্রাধান্যে বিকার সৃষ্টি হয়। মহাপুরুষমাত্রই এই দ্বিবিধ গতির সাম্য অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত থাকেন। তাঁদের মনের গতি সুষুম্নায় সক্রিয় থাকে। সুষুম্নার মধ্যে আরও তিনটি সূক্ষ্ম নাড়ি নিহিত আছে। তাদের নাম, অবস্থান ও ক্রিয়া যথাক্রমে সুষুম্নার মধ্যে মূলাধার হতে মণিপুর পর্যন্ত হল বজ্রানী নাড়ি। সিদ্ধযোগীদের এই নাড়ির মধ্যে মন সক্রিয় হয়। মণিপুর থেকে বিশুদ্ধাক্ষ পর্যন্ত হল চিত্রানী নাড়ি। মহাযোগীদের চিত্ত এই নাড়িতে গতাগতি করে। অনাহত হতে সহস্রার পর্যন্ত হল শঙ্খিনী নাড়ি অবস্থিত। এই নাড়ির মধ্যে সিদ্ধমহাযোগী ও অবতারপুরুষদের চিত্ত সক্রিয় থাকে।

সুষুম্না নাড়ির প্রসঙ্গে স্বানুভবসিদ্ধ মহাপুরুষদের বাণী হল একটি পদ্ম ডাঁটার অন্তর্নিহিত আঁশ বা সূত্র অথবা একটি চুলের একশত ভাগের এক ভাগের সমান হল এই নাড়ির গতিপথ। এই পথে যেই মন প্রবিষ্ট হয় তার

জ্যোতি হল বিদুৎ বা তড়িৎসম জ্যোতি। এই নাড়ি অপেক্ষা অধিক সূক্ষ্ম হল বজ্রানী, তদপেক্ষা সূক্ষ্ম হল চিত্রানী। আর সর্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম অর্থাৎ সূক্ষ্মতম হল শঙ্খিনী। শঙ্খিনী নাড়ির মধ্যে শুদ্ধবোধের গতি সক্রিয় থাকে। এই শুদ্ধবোধ প্রসঙ্গে স্বানুভবসিদ্ধের বাণী হল—"সূর্যকোটি প্রভাদীপ্তম্ চন্দ্রকোটি সুশীতলম্।" অর্থাৎ শুদ্ধবোধ হল কোটি সূর্যের জ্যোতির সমান এবং কোটি চন্দ্রের মত সুশীতল। এটা তর্কের বিষয় নয়, অনুমানের বিষয়ও নয়, স্বানুভবসিদ্ধ। সুতরাং মন ও বুদ্ধির মাধ্যমে এ ধারণা করা অসম্ভব। এটা অনধিকারীদের জন্য নয়। ঈশ্বরাত্মা ব্রহ্মতত্ত্ব হল স্বানুভবসিদ্ধ, বাক্য-মনের অতীত। মন-বুদ্ধি সেখানে প্রবেশ করতে পারে না। তার আগেই মন-বুদ্ধি ফিরে আসে বা বিলীন হয়ে যায়।

অন্তরের ও বাইরের দ্বিবিধ শক্তির মধ্যে স্থিতিলাভের সাধনা দ্বারা সাধকগণ ঈশ্বরাত্মবোধে প্রতিষ্ঠিত হন

সাধারণত সাধকগণ সাধনার মাধ্যমে মহাপ্রাণের দ্বিবিধ গতিশক্তির মধ্যে সমানে স্থিতিলাভের চেষ্টা করেন। এই শক্তির স্থিতিশীলতার মাত্রার তারতম্য ভেদে সাধকদের শক্তির তারতম্য দেখা যায়। এর পরিপূর্ণ সমতাই হচ্ছে ঈশ্বরের স্বরূপ। যারা এই শক্তির সমতার সঙ্গে যুক্ত হয় তারাই শুধু ঈশ্বরের সঙ্গে একীভূত হয়ে যায়।

মহাপ্রাণের মধ্যে সাম্য অবস্থা হতে বিষম অবস্থার সৃষ্টি, আবার সাম্য অবস্থায় ফিরে এলে লয় বা জীবন্মুক্তি

মহাপ্রাণশক্তির সাম্য অবস্থা থেকেই সর্বজীবনের উৎপত্তি। পুনরায় সাধনার মাধ্যমে শক্তির বিষম অবস্থা থেকে ক্রমধারায় সমতাতে প্রতিষ্ঠিত হলেই জীবনের পূর্ণতা লাভ হয়।

মহাপুরুষদের পদদ্বয় স্পর্শ করে প্রণাম করবার সময় প্রণম্যের অন্তর্নিহিত পরা ও অপরা প্রাণচৈতন্যের সঙ্গে প্রণামকারীর পরা ও অপরা প্রাণের গতির ক্ষণিকের যোগাযোগ হয়

মহাপুরুষদের চরণ স্পর্শ করে প্রণাম করার সময়, তাঁদের দুই চরণের বৃদ্ধাঙ্গুলির মাধ্যমে তাঁদের মধ্যে মহাপ্রাণশক্তির পরা ও অপরাগতির স্থিতিশীল অবস্থার সঙ্গে প্রণামকারীর গতিশীল পরা ও অপরা প্রাণশক্তির ক্ষণিকের জন্য যোগাযোগ হয়। মহাপুরুষদিগকে চরণ স্পর্শ করে প্রণাম করার ফল বা উপকারিতা প্রণামকারীর প্রাণশক্তির পরা ও অপরাগতির মানের তারতম্য অনুযায়ী হয়ে থাকে।

সাধারণ মানুষের অন্তরের স্থিতি ও গতির মান তমঃ-রজোগুণ প্রধান, সিদ্ধমহাপুরুষদের অন্তরের স্থিতি ও গতি শুদ্ধসত্ত্বপ্রধান

সাধারণ মানুষের জীবনের স্থিতি ও গতির মান তামসিক ও রাজসিক গুণের দ্বারা পরিচালিত। কিন্তু সিদ্ধ-মহাপুরুষদের জীবনের স্থিতি ও গতির মান শুদ্ধসত্ত্ব ও সত্ত্বগুণের দ্বারা পরিচালিত। বাইরে থেকে উভয়ের স্থিতি ও গতির লক্ষণ বহুলাংশে সমান দেখা গেলেও অন্তর্সত্তায় তা সমান নয়। শুদ্ধসত্ত্বপ্রধান সমত্বের সঙ্গে তমোপ্রধান সমত্বের পার্থক্য এবং সাত্ত্বিক কর্ম ও আচরণের সঙ্গে রাজসিক কর্ম ও আচরণের পার্থক্য সাধারণ বুদ্ধির পক্ষে অনুভবগম্য নয়।

মহাপুরুষগণ তাঁদের জীবনব্যাপী সাধনার ফল, জ্ঞান ও অনুভূতি আপামর সকলের কল্যাণের জন্যই প্রয়োগ করেন

মহাপুরুষদের জীবনের আদর্শ হচ্ছে জগতে সকলের কল্যাণ করা। তাঁদের চিন্তায়, বাক্যে ও আচরণে যেন

অপরের কোনরকম ক্ষতি বা অপকার না হয় সে বিষয়ে তাঁরা সর্বদাই সচেতন থাকেন। তাঁদের অনুগত ও অনুরাগী, পরিচিত ও অপরিচিত ভক্তজন ছাড়াও ভিন্নমতাবলম্বী ধার্মিক ও অধার্মিক সকলের উপকারার্থে তাঁরা নিরপেক্ষভাবে শুদ্ধবোধের দৃষ্টিতে সকলের সঙ্গেই যথোপযুক্ত ব্যবহার করেন।

মহাপুরুষদের নিঃস্বার্থ কর্মবিজ্ঞানে স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ দোষদৃষ্টিবশত সমালোচনা করে

সর্বদা শুদ্ধবোধে প্রতিষ্ঠিত থেকে মহাপুরুষগণ অপরের স্বভাবপ্রকৃতি ও গুণের মল আবরণ ও বিকার যাতে সহজ ভাবে পরিশোধিত হয় তার জন্য অধিকারীভেদে ব্যবস্থা করেন। তাঁদের এই ব্যবস্থার মধ্যে তাঁদের সর্বদাই সচেতন দৃষ্টি থাকে। কিন্তু অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন অনেকেই অধিকারীভেদে আচরণে ও ব্যবস্থায় তারতম্য দর্শনে ভুল বুঝে বিব্রত বোধ করে এবং সমালোচনা করে।

প্রণামের মাধ্যমে অন্তরের সত্ত্বাদি গুণভেদে প্রণামকারীর মধ্যে প্রণামের ফলাফলের তারতম্য হয়

প্রণাম করার মাধ্যমে প্রণামকারীর যাতে উপকার হয় তা সদ্‌গুরুমাত্রই সকলকে বুঝিয়ে দেন। প্রণামকালে প্রণামকারীর মনোভাবের উপর প্রণাম করার ফলাফল নির্ভর করে। সত্ত্বগুণের প্রাধান্যে শুদ্ধমনের প্রণাম সর্বাধিক ফলপ্রদ হয়। সেইজন্য প্রণামকালে চিত্তে যাতে সত্ত্বগুণের প্রাধান্য থাকে সে বিষয়ে প্রণামকারীকে সচেতন থাকতে হয়। চিত্তে তামসিক ও রাজসিক ভাবের প্রাধান্যে প্রণামের ফল তদ্‌ভাব অনুরূপ হয়।

অধ্যাত্ম সাধনা হল সত্ত্বগুণের সাধনা ও তার বিকাশ, তার মাধ্যমে তমঃ ও রজোগুণজাত অশুদ্ধ মলাদি বিকারের শোধন ও স্থিতি হলেই হয় চিত্তশুদ্ধি ও ঈশ্বরানুভূতি

আধ্যাত্মিক জগতে সর্ববিধ সাধনার উদ্দেশ্য প্রথমে চিত্তের শোধন করা, তারপরে শুদ্ধচিত্তে সত্যের পূর্ণ অনুভূতি লাভ করা। সত্ত্বগুণের প্রভাবে তমঃ ও রজোগুণের শোধন হলেই চিত্তের শোধন হয়। তমোগুণী ও রজোগুণী চিত্তই হল অশুদ্ধচিত্ত। অশুদ্ধচিত্তের লক্ষণ স্বল্পবুদ্ধি, কামনা, বাসনা, ফলাশা ও কর্তৃত্বাভিমান। সত্ত্বগুণের প্রাধান্যে এগুলির পরিশোধন হয় ও চিত্তের সমত্বে স্থিতি হয়। এই স্থিতি সমতাই হচ্ছে অন্তরের পবিত্রতা। এই পবিত্র হৃদয়েই ঈশ্বরের পূর্ণ অনুভূতি হয়।

পবিত্রতাই হল শুদ্ধ জ্ঞানের ভিত্তি, তা-ই মর্যাদাবোধের সম্পূরক এবং প্রণামের মাধ্যমেই হয় তার প্রতিষ্ঠা

পবিত্র সঙ্গ, পবিত্র চিন্তা, পবিত্র কর্ম পবিত্র জীবনের বিশেষত্ব। পবিত্রতাই শুদ্ধ জ্ঞান। শুদ্ধ জ্ঞান লাভই সর্ববিধ শিক্ষার উদ্দেশ্য। পবিত্র জীবন না-হলে শুদ্ধ জ্ঞান লাভ হয় না। পবিত্র জীবনের মর্যাদা অশুদ্ধ ও অপবিত্র মনে কেউ দিতে পারে না। মর্যাদাবোধের অভাবে জীবনের পূর্ণতা এমনকি কোন প্রকার উন্নতিও সম্ভবপর হয় না। প্রণামের মাধ্যমে মর্যাদাবোধ বাড়ে।

আত্মসমর্পণের সাধনা প্রথম অবস্থায় কঠিন হলেও অভ্যাসের মাধ্যমে তা সহজ ও সম্পূর্ণ হয়, ফলে ঈশ্বরাত্মার সঙ্গে অদ্বয়বোধে প্রতিষ্ঠা হয়

আত্মসমর্পণের সাধনায় নিজেকে একেবারে অসহায়বোধে সমর্পণ করে দিতে হয়। এই ভাবে সাধনা প্রথম প্রথম কঠিন মনে হলেও অভ্যাসের ফলে সহজেই অনুভব করা যায় যে ভক্তের মধ্যে স্বয়ং ঈশ্বরই বসে সাধনা করেন।

ঈশ্বরের করুণার মাধ্যমেই হয় তাঁর সঙ্গে ভক্তের অভেদ যোগ, অন্যথায় নয়—এটা সর্বতোভাবে মাধুর্যময়

কৃপা করে ভগবান স্বয়ং প্রকাশিত না-হলে সাধনার দ্বারা তাঁকে প্রকাশ করা যায় না। অন্যান্য সাধনার মাধ্যমে সিদ্ধিলাভ করেও পরিণামে পূর্ণ আত্মসমর্পণ করতে হয়। এ ঐশ্বর্যের সাধনা নয়, মাধুর্যের সাধনা। আদিতে, মধ্যে, অন্তে সবটাই মধুর।

ঐশ্বর্যের সাধনা ও মাধুর্যের সাধনার পরিণামের পার্থক্য

মাধুর্য বা আত্মসমর্পণের সাধনার পথে পতনের সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু ঐশ্বর্যের সাধনায় বিঘ্ন অনেক। নিজে কর্তা হতে গেলে ঈশ্বর আড়ালে থাকেন। তার ফলে, কর্মফল ভোগ করতে হয়। কর্মফল ভোগেই বন্ধন। আবার ভোগ ত্যাগ করলেই মুক্তি। অহংকার সরে গেলেই তিনি হৃদয় অধিকার করে প্রকাশিত হন।

সমর্পণের সাধনা স্বল্প হলেও বৃথা নয়—পূর্ণ হলে পূর্ণ ফলপ্রদ

আত্মসমর্পণের কথা বারবার শুনতে শুনতেই সমর্পণের ইচ্ছা জাগে। পূর্ণ ভাবে জীবনে আত্মসমর্পণ করা সম্ভবপর না-হলে, স্বল্পমাত্র সম্ভবপর হলেও শুভ ফল পাওয়া যায়। দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে পরিপূর্ণ ভাবে আত্মসমর্পণ করতে হয়।

নির্জনে বসে হৃদয়েতে অনুরাগের সঙ্গে ঈশ্বরের সাধনা করলে সহজেই তা ফলপ্রদ হয়

ঈশ্বর প্রত্যেকের হৃদয়ের কেন্দ্রে বসে আছেন। তাঁকে মা, ঠাকুর, গুরু বা মহাপ্রাণরূপে সম্বোধন করে আহ্বান করলে তার প্রত্যক্ষ ফল পাওয়া যায়। নির্জনে বা একান্তে বসে অবান্তর চিন্তা না-করে তাঁর সঙ্গে কথা বললে তিনি শুনতে পান। প্রেমের সাধনায় বা রাগানুগাভক্তির সাধনায় এই ভাবেই আরম্ভ করতে হয়। পরিণামে চিত্ত শুদ্ধ হলেই ঈশ্বরের সঙ্গে মিলন ঘটে।

যোগ্যতার মাধ্যমেই সাধনবিজ্ঞান ফলপ্রদ হয়, অন্যথায় নয়

অসংযতচিত্তের কাছে যোগের কথা, অভক্তের কাছে ভক্তির কথা, অজ্ঞানের কাছে জ্ঞানের কথা বলে লাভ হয় না। সকলের পক্ষেই সর্বাপেক্ষা সহজ সাধন হল শরণাগতির সাধনা।

শাস্ত্রমুখে ঈশ্বর বা মহাজন বাণী—শাস্ত্রের সারাৎসারই হল এক সত্য ধর্ম ঈশ্বর আত্মা। তাঁর স্বরূপমহিমা ও তার অনুভববিজ্ঞান প্রসঙ্গ স্বানুভবসিদ্ধের মাধ্যমেই শরণাগত ভক্তের কাছে ব্যক্ত ও অনুশাসিত হলে তা অবশ্যই ফলপ্রদ হয়। অনুভবসিদ্ধ না-হয়ে শাস্ত্রের কথা অপরের কাছে ব্যক্ত করলে বা অনুশাসিত হলে তা সম্যক্ ফলপ্রদ হয় না। এই প্রসঙ্গে বিশেষ নির্দেশ হল, জিজ্ঞাসিত না-হলে শাস্ত্রবাণী বলা উচিত নয়, তার অনুশাসনও করা উচিত নয়। কারণ অনধিকারীর পক্ষে তা অপপ্রয়োগ ও বিপরীত ফলপ্রদ হয়। সেজন্য ধর্মশাস্ত্রের নির্দেশ সম্বন্ধে বলা হয়েছে—অতপস্বীকে তপস্যার কথা, অভক্তকে ভক্তির কথা, অজ্ঞানীকে জ্ঞানের কথা, অযোগীকে যোগের কথা, অসাধককে সাধনার কথা, শুনতে অনিচ্ছুককে ধর্মের কথা শোনাবে না এবং ঈশ্বরাত্মা, অবতারপুরুষ, সিদ্ধপুরুষ, ধার্মিক, সাধক ও ব্রাহ্মণের প্রতি বিদ্বেষী ও সমালোচককে ঈশ্বরাত্ম ধর্ম ও ব্রহ্মবিজ্ঞান প্রদান বা বিতরণ করবে না। এই নিষেধ অমান্য করলে বক্তা ও শ্রোতা উভয়েরই বিকার, অশুভ, অকল্যাণ ও অমোঘ ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী। অপর পক্ষে যোগ্য পাত্রে তা সর্বদাই শুভফলদায়ক ও মুক্তিপ্রদ। [৩০।৮।৬৮]